অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৩য় ও ৪র্থ)
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের বাণী ও চরিতামৃত সহ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত —

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol—VI)
(Collected writings of Achintyakumar Sengupta)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৯

সম্পাদনা :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯

ও

দুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

সূচীপত্র

জীবনী-সাহিত্য :

আলেখ্য-সূচী

জীবনী-সাহিত্য

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

।। তৃতীয় খণ্ড ।।

বি. দ্র. : অচিন্ত্যকুমারের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী-সাহিত্য চারিটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম দুইটি খণ্ড পূর্ববর্তী রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ '৯১'তম অধ্যায় থেকে। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত হোল। চতুর্থ খণ্ড পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

"অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ মানুষে খুঁজবে। মানুষলীলা কেন? এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন। মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে। অথবা শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস দেখছি। যেন বলছে, আমি মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। তিনিই এক এক রূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে কখনও ছলরূপে—কোথাও বা খলরূপে।" **—শ্রীরামকৃষ্ণ**

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমংগলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি ভূরিদা জনাঃ॥"

"তোমার কথা অমৃততুল্য। সন্তপ্তজনের জীবনদান করে, কবিকুল-দ্বারা উচ্চারিত হয়ে সমস্ত পাপ বিনাশ করে, শুনতেই এ মধুমঙ্গল। দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে বিধান করে সকলশ্রী। যাঁরা পৃথিবীতে এ কীর্তন করেন তাঁরাই বহুদাতা।" **—শ্রীমদ্‌ভাগবত**

।। ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ।।

ভূমিকা

শুধু কথা আর কথা। ঈশ্বর অশেষ বলে তাঁর বিষয়ে কথাও অন্তহীন। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' শেষ কথা বলা যায় না বলেই এত কথা, এত কান্না। ঈশ্বর যে অনির্বচনীয়, অবাঙমনসোগোচর, সেটুকু বোঝাবার জন্যেও বা কত কথার আড়ম্বর। যে কাঁদে কথাই তার একমাত্র উপায়। তার একমাত্র আনন্দ।

'শব্দজালং মহারণ্যং।' কিন্তু মহারণ্যকে বোঝাবার জন্যেও চাই শব্দ। সব শাস্ত্র-পুরাণ বেদবেদান্ত ঘুরে এসেই বলা যায় ঈশ্বর আরো দূরে। পাঁজি পড়ে নিলেই বলা যায় বিশ আড়া জল লেখা থাকলেও পড়ে না এক ফোঁটা। তাই বলে কথাকে একেবারে ফেলে দেবে কি করে? 'যতো বাচো নিবর্তন্তে—' বাক্যে প্রকাশ করতে চাইবে, তবেই না সে আসবে ফিরে-ফিরে। ঠাকুর বললেন, ভক্ত ভালো, বিদ্বান ভক্ত আরো ভালো। যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

শিল্পী যেমন তার প্রতিমাকে সুন্দর করে নানা লাবণ্যসম্ভারে তেমনি ঈশ্বর প্রসঙ্গকেও সুন্দর করি বাক্যের প্রসাধনে, ভাবের রূপৈশ্বর্যে। আর এ বাক্য যত গাঁথি তত মাতি। যত ভজি তত মজি। আর-সব কথা ক্লান্ত করে ঈশ্বরকথা করে না। আর-সব অন্বেষণ অবসাদ আনে ঈশ্বরসাধন অনির্বেয়। যত পান তত পিপাসা, যত পথ তত পাথেয়। কাজলের ঘরে গেলে যেমন কালি লাগে আতরের ঘরে এলে তেমনি সুগন্ধ। সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় সৎকথাকে সুলভ করি।

জপ-তপ ধ্যান-জ্ঞান অনেক শুনেছি, যাই বলো, ভালোবাসার মত কিছু নয়। বৃন্দাবনে গোপীদের অনেক জ্ঞানের কথা বলতে এসেছিল উদ্ধব। কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন বলে তোমরা বিরহে ব্যাকুল কেন? কৃষ্ণ তো সর্বাত্মক, তোমাদের সঙ্গে তো তাঁর বিয়োগ নেই। তিনি মথুরায় আছেন বৃন্দাবনে নেই এ তো হতে পারে না। আমরা অতশত বুঝি না জ্ঞানের কথা। আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি গুজিয়েছি খাইয়েছি পরিয়েছি তাকে ধ্যান করে পেতে যাব কোন দুঃখে? যে মন দিয়ে ধ্যান করব সে মন কি আর আমাদের আছে? আমরা কাঁদছি, আমাদের সেই ভালোবাসার ধনকে এনে দাও। তোমাদের কান্নাই হরিগুণগান। বললে উদ্ধব। তোমাদের হরিকথাগীত লোকত্রয় পবিত্র করুক।

তাই হরিকথা বলে যাই প্রাণ ভরে। যদি ডাক-নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে মনে অনুরাগের রঙ লাগে। যদি বজ্রসার নিষ্ঠার থেকে চলে আসে বিগলিত ভক্তি। পবিত্রতার পরিপূর্ণতা।

৬ই ফাল্গুন ১৩৬১ **অচিন্ত্যকুমার**

তৃতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি

স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
উদ্বোধন-প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত শ্রীশ্রীসারদা দেবী
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত
স্বামী জগদীশ্বরানন্দকৃত নবযুগের মহাপুরুষ
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা
উদ্বোধন-প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ
শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ
লক্ষ্মী দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসকৃত শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতি
শ্রীপ্রমথনাথ বসু রচিত স্বামী বিবেকানন্দ
বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দকৃত প্রেমানন্দ জীবনচরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত আত্মচরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'মেন আই হ্যাভ সিন'
স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা
অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিত ভক্তিযোগ
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন প্রণীত গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য
Life of Sri Ramkrishna (Advaita Ashrama)
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তকৃত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী
শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা লিখিত কেশবচরিত

৯১

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন।

বরানগরে ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল নরেনের। বিকেল থেকেই আড্ডা জমিয়েছে সেখানে। সঙ্গে বন্ধু সাতকড়ি লাহিড়ি আর দাশরথি সান্ন্যাল। রাত দুটো, চার বন্ধু ঘুমিয়েছে একসঙ্গে, খবর এসে পৌঁছুল, বাবা আর নেই। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন। আরামশয্যা থেকে উন্মূলিত হল নরেন। প্রথমটা সম্মূঢ় হয়ে গেল। জীবনের প্রথম প্রতিবেশী মৃত্যুকে দেখলে। যে অপেক্ষা করে না, কিছুমাত্র কৈফিয়ত শোনে না, সবলে কেশ আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায়।

ছুটল ঘরের দিকে। ভবনাথ বললে, 'দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।'

'জন্মান্তরে তুই নরেনের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।' ভবনাথকে নিয়ে রহস্য করেন ঠাকুর।

এমনি ভাব নরেনের সঙ্গে। গাছের সঙ্গে যেমন ছায়া। একটি পাতা যেন ফুলের বৃন্তে।

'ভবনাথ, বাবুরাম—এদের প্রকৃতি ভাব।' বলেন ঠাকুর: 'আর হরীশ তো মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম বলেছে ঐ ভাবটা ভালো লাগে। ভবনাথেরও তাই।'

যে যে-ভাবে আছে, যার যে-ভাব ভালো লাগে। স্ব-ভাবটিই আসল ভাব। আমার অঙ্কে মাথা, আমি সাহিত্য দিয়ে কি করবো। আমার চিত্রে অভিরুচি, আমি চাই না মসীজীবী হতে। স্বভাব কখনো বর্জনীয় নয়। স্বভাবে নিধনও শ্রেয়।

শুধু একটু বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়া। কামকে প্রেম করা। ক্রোধকে তেজ করা। লোভকে ব্যাকুলতায় নিয়ে যাওয়া। অবন্ধন স্রোত থেকে বন্দরে নৌকো ভেড়ানো। শুধু একজনকে বা একটাকে ধরো। যাকে ভালো লাগে, যাকে ভালোবাসি, যাকে ভাবলে অন্তর-বাহির আলোকিত হয়ে ওঠে। ভাবো তো ডুবে গিয়ে ভাবো। ধরো তো পাকা করে ধরো। নড়নচড়ন নেই, ছাড়ানছোড়ান নেই।

'ভাব কি জানো?' বললেন ঠাকুর, 'তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানো। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা। যেমন তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। প্রথম অবস্থায় তুমি-টুমি, ভাব বাড়লে তুই-মুই। যেমন ধরো, নষ্ট মেয়ে। পরপুরুষকে প্রথম-প্রথম ভালোবাসতে শিখছে, তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা। তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠল, তখন আর কিছু নেই—একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়াল। তখন যদি সে পুরুষ আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে,

তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কিনা বল্। তেমনি যে ভগবানের জন্যে সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা বল্।'

কালীবাড়ির নবতে বাজনা শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন কেশব সেনকে, 'দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা! একজন পোঁ করছে, আরেকজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগরাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোহহং সোহহং করব! আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাব। কেন শুধু ব্রহ্ম-ব্রহ্ম করব! শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখা মাধুর্যে—সব ভাবে ডাকব। আনন্দ করব বিলাস করব।'

হায়, রুদ্ধরন্ধ্র বাঁশি হয়ে পড়ে আছি। নানা অহঙ্কারে আর মোহে ফোকরগুলি বন্ধ হয়ে আছে। তাই আর বাজছে না একটুও। ছিদ্র যদি শূন্য হয়, বাজবে কি করে? দরজা যদি না মুক্ত হয় আসবে কি করে সে অতিথি-পথিক?

তাই, 'শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।' পূর্ণ করা সোজা, শূন্য করাই তপস্যা।

ভবনাথ যে দক্ষিণেশ্বরে আসে তার বাড়ির লোক পছন্দ করে না। তার চেয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যে নাম লিখিয়েছে সে অনেক ভালো। কিন্তু প্রাণ জানে তার টানের কথা। 'তুই এত দেরিতে দেরিতে আসিস কেন?'

'আজ্ঞে পনেরো দিন অন্তর দেখা করি।' ভবনাথ হাসল। 'সেদিন আপনি নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসিনি।'

'সে কি রে?' ঠাকুর ফোড়ন দিলেন: 'শুধু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ, এ সবও চাই।'

তোমাকে দেখব অথচ তোমাকে ধরতে পারব না এ সইব কি করে? তুমি আমার মুখোমুখি বসবে অথচ কথা কইবে না এ যে আমার মরণাধিক যন্ত্রণা। শুধু চোখের উপর চোখ রাখলেই চলবে না, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখো। আর আমার বুকের মধ্যে তোমার পা দুখানি। কি করে তোমার কৃপা আকর্ষণ করব তাই ভাবি। কায়দা-কানুন কিছুই জানি না, শুধু কর্ম দিয়েছ দুহাত ভরে, তাই করে যাচ্ছি উদয়াস্ত। ক্লান্ত করছি নিজেকে, যদি তোমার দক্ষিণ সমীরের আনন্দটি অহেতুক এসে স্পর্শ করে। তুমি একখানি হাত সন্তর্পণে তুলে ধরো। তখন এক হাতে তোমাকে ধরব আরেক হাতে কাজ করব। কখন আবার আরেকখানি হাতও তুলে নেবে। তখন দুহাতে ধরব তোমাকে। আর কোনো সাধন-ভজন জানি না আমরা। কর্ম আর ক্লান্তি—এই আমাদের সাধন-ভজন।

'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি—দুজনে যেন স্ত্রী-পুরুষ।' বললেন ঠাকুর, 'তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।'

হরি-নামের মাহাত্ম্যের কথা হচ্ছিল সেদিন। ঠাকুর বললেন, 'যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন।'

ভবনাথ বললে, 'হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।'

সব অহঙ্কারের পোশাক যেন খুলে দিতে পারি গা থেকে। যেন মা'র কোলে নগ্ন শিশু হয়ে খেলা করতে পারি। অহঙ্কার করছি, কিন্তু এ অহংটি কার? ঠাকুর বললেন, 'মান করাতে একজন সখী বলেছিল, শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে। বৃন্দে বললে, এ অহং কার? এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণগরবে গরবিনী।'

চৈতন্যদেব অবতার হয়ে যেকালে হরিনাম প্রচার করেছিলেন সেকালে এ অবশ্য ভালো—এই বলেও অন্তত লেগে যাক সকলে। যদি চৈতন্যমন্ত্রেও চৈতন্য হয়। রসিকতা করলেন ঠাকুর: 'চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে। তাদের জিগগেস করা হল, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বললে, যদি বাবুরা খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালোই হয়েছে।'

'কিন্তু যাই বলো,' বললেন ঠাকুর, 'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ বলে জ্ঞান করি। আর আমি ওর অনুগত।'

অনুগত তো কী সুরাহা হল নরেন্দ্রের! বাবার মৃত্যুতে জগৎ-সংসার নিবে গেল এক ফুঁয়ে। সৌভাগ্যের ঝাড়-লণ্ঠনটা মৃত্যুর পাথরের উপর ছিঁড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সংসার সরতে-সরতে থমকে দাঁড়াল পাতালের গুহামুখে। ছোট-ছোট ভাই আর মা, পাঁচ-সাতটি আর্ত মুখ তাকিয়ে রয়েছে নরেনের দিকে! বাবা এটর্নি ছিলেন, রেখে যাননি সংস্থান? দূরস্থ আত্মীয় পালন করে-করে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রেখে গেছেন ঋণ। আয়ের ঘরে শস্যহীন মাঠ, ব্যয়ের ঘরে লবণাক্ত বন্যা। সেবার বি-এ দিয়েছে নরেন। কত রঙিন ভাবনার ফোঁড়-সেলাই করে বিচিত্র করে রেখেছিল জীবনের নক্সা। সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর সব আচ্ছাদনের আগে গ্রাসাচ্ছাদন। উদরপূরণ না হলে উদার অম্বর অর্থহীন। কিন্তু উদরপূরণের ব্যবস্থা কি! সঞ্চিত টাকা নেই, জমিদারি নেই, কৃপালু আত্মীয়-রক্ষক কেউ নেই আশে-পাশে। চারদিকে শুধু একটা নিস্তৃণ মরুবিস্তার। থাকবার মধ্যে আছে এই নগ্ন পদ আর দৃপ্ত বাহু।

'আর কেউ নেই?' কে যেন জিগগেস করল কানে-কানে।

তুমি আছ? করুণানিধান হয়ে আছ? কে জানে! আছ তো, এত দুঃখ কেন, দারিদ্র্য কেন, কেন এত অপ্রতিকার অবিচার? পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা আস্ত জামা নেই, চাকরির জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ আফিস থেকে ও আফিস, এ দরজা থেকে ও দরজা। সর্বত্র এক উত্তর। এক নিরুত্তর নিশ্ছিদ্র প্রত্যাখ্যান। হবে না, জায়গা নেই, পথ দেখ। পাথুরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, ঠেলতে লাগল লৌহদুয়ার। নিশ্চল নিষেধ রয়েছে দাঁড়িয়ে—দুর্ধর্ষ ঔদাসীন্য। এতটুকু টলে না, এতটুকু পথ ছাড়ে না। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে কেউ আনে না এতটুকু ছায়া-স্নেহ। রাশি-রাশি নৈরাশ্যের বালুকায় শুধু বৈফল্যের অনাবৃষ্টি।

বন্ধুরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সুখীরা সহানুভূতি করতে আসে, আর অপরিচিত জনস্রোত ফিরেও তাকায় না। সর্বত্রই একটা নীতিহীন অসামঞ্জস্য। একটা পাগলের খামখেয়াল।

তবে কি তিনি নেই ? এ সমস্ত কি একটা দায়িত্বহীন দানবের রচনা ? আর কার কাছে প্রার্থনা করবে ? নিজের কাছেই প্রার্থনা করে নরেন। আশ্রয় নেয় আত্মশক্তির তরুতলে। দৃঢ়হস্তে সরিয়ে দেব এ দুর্দিনের যবনিকা। উচ্ছেদ করব এ দুঃখ-দুর্যোগের আবর্জনা। ওঁ সহোঽসি সহং ময়ি ধেহি। ওঁ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। তুমি সহনশক্তির ঘনীভূত মূর্তি, আমাকে সহিষ্ণুতা দাও। তুমি অন্যায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণ্ডদাতা, আমাকে অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের শক্তি দাও।

শুধু একটা গাড়োয়ানই বুঝি ডেকে জিগগেস করে। খালি গাড়ি নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। চেনা গাড়োয়ান। বাবা থাকতে কত দিন চড়েছে এ গাড়ি, ভাড়ার উপরে বকশিস দিয়েছে গাড়োয়ানকে—

'বাবু, আসুন না ! কোথায় যাবেন ?' নুয়ে পড়ে জিগগেস করল গাড়োয়ান।

'পয়সা নেই।'

'তাতে কি ! আসুন না ! আমি নিয়ে যাব।'

রাজী হয় না নরেন। পায়ের নিচে প্রস্তররুক্ষ পথ পেয়েছি, মাথার উপরে নগ্ন নিষ্ঠুর আকাশ—আমি একাই যেতে পারব দিগন্ত পর্যন্ত। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল গাড়োয়ান। চাবুকের শব্দটা নরেনের বুকে লাগল একটা তীক্ষ্ম চমকের মতো।

আমি কোচোয়ান হব। একদিন বলেছিল সে বাবাকে। এ মহাজড়বুদ্ধির দেশটাকে নিয়ে যাব রাজসিক কর্মৈশ্বর্যে। সত্ত্বগুণের ধুয়ো ধরে দেশ নেমে যাচ্ছে তমোময় মহাসমুদ্রে। জম্মালস বৈরাগীর লেপ মুড়ি দিয়ে অক্ষম জড়পিণ্ড শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরাবিদ্যার ছলনায় ঢাকতে চাচ্ছে নিজের মূর্খতা। ভণ্ডের দল তপস্যার ভান করে অবিবেক আর অবিচারকে মানছে ধর্ম বলে। নিজের আলস্য আর অসামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য নেই, অহোরাত্র অন্যের দোষদর্শন। এ তামসী রাত্রির অবসান ঘটাবো, চতুর্দিকে হানব শুধু চেতনার চাবুক, বেগবীর্যহীন তামসিকতার ঘোড়াকে উজ্জীবিত করব দিবস্পতি ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবায়।

হায়, সংকল্পও বুঝি কল্পনা ! নইলে তুচ্ছ একটা চাকরিও জোটাতে পাচ্ছি না এত দিন ধরে ! পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পাচ্ছি না ভাইগুলোকে। মায়ের মুখের বিষাদ ও ক্লান্তির করুণ রেখাটি অটুট হয়ে রয়েছে।

'এ কি, স্নান করে উঠেই চললি কোথায় ?' মা দাঁড়ালেন এসে পথের সামনে : 'খাবি নে ?' চোখ নামাল নরেন। বললে, 'বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

মনে-মনে একটু আরাম পেলেন ভুবনেশ্বরী ? বাড়িতে আজ পর্যাপ্ত আহার নেই সকলের, হাত শূন্য। এমন অদিনে বাইরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে—সেটা শুধু আস্বাদনীয় নয় আরাধনীয়।

পথ ছেড়ে দিলেন ভুবনেশ্বরী। শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল নরেন। মনে খটকা লাগল। নরেন কি ছলনা করল ? তবে কি সে অনশনে থাকবে ?

খালি পায়ে রোদে ঘুরে-ঘুরে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়েছে। গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নিচে বসেছে বিশ্রাম করতে। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সুখে-শান্তিতে আছে খেয়ে-পরে। সুখে শান্তিতে আছে বলেই হয়তো ঈশ্বরভক্ত। জানত সব নরেনের কথা। তার ভাগ্যহীন দুঃসময়ের কথা। তার চেষ্টা ও অসাফল্যের কাহিনী। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বসল তার পাশটিতে। গান ধরল :

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—'

'নে, নে, রাখ তোর ব্রহ্মনিশ্বাস।' ক্ষোভে অভিমানে ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন : 'যারা খেয়ে-পরে সুখে-সৌভাগ্যে আছে তাদেরই ভালো লাগে ব্রহ্মনিশ্বাস। ইজিচেয়ারে শুয়ে টানাপাখার হাওয়া খাচ্ছে আর ভাবছে, ব্রহ্মনিশ্বাস খাচ্ছি! আর ক্ষুধার তাড়নায় যার মা-ভাইয়েরা কষ্ট পাচ্ছে, দোরে-দোরে ঘুরে একটা যে চাকরি জোটাতে পাচ্ছে না, তার আর ব্রহ্মনিশ্বাস নেই, বজ্রনিশ্বাস!'

বন্ধুকে অকারণে আঘাত দিল হয়তো। তা আর কি করবে! পেটে ভাত নেই, বলে কিনা আফিঙের মৌতাত চড়াও। কর্ম জোটে না একটা, বলে কিনা ধর্ম করো।

ঠনঠনের ঈশান মুখুজ্জের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। সকাল বেলা। মাস্টারমশাই এসে খবর দিলে নরেনকে। বললে, তোমাকে যেতে বলেছেন।

গিয়ে কি হবে! চাকরি জুটিয়ে দেবেন একটা? উপবাসী মা-ভাইয়ের মুখে অন্ন তুলে দেবেন? তবু গেল নরেন। প্রণাম করে ঠাকুরের পাশটিতে এসে বসল।

ঠাকুরের কেমন চিন্তিত ভাব। সব খবর রেখেছেন আদ্যোপান্ত। নরেনের বাড়ির কষ্টে তাই তিনিও বিমর্ষ। হঠাৎ নরেনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ঈশানকে তোর কথা বলেছি। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। একটা কিছু যোগাড় হয়ে যাবে হয়তো।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল নরেন। এমনি কত লোকই কত আশ্বাস দিয়েছে এতদিন। শুধু কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাসটিই টের পাওয়া যায়নি।

উপরের ঘরে চলে এসেছেন ঠাকুর। বলছেন মাস্টারকে, 'সংসারে কিছুই নেই। ঈশানের সংসার ভালো তাই—তা না হলে ছেলেরা যদি রাঁড়খোর গাঁজাখোর মাতাল অবাধ্য এই সব হত, কষ্টের একশেষ হত। সকলেরই ঈশ্বরের দিকে মন—বিদ্যার সংসার! এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ দু-চার বাড়ি দেখলাম। নইলে, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা—তারপর রোগ শোক দারিদ্র্য। দেখে বললাম, মা। এইবেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।' একটু থামলেন ঠাকুর। বললেন, 'এই দেখ না, নরেন্দ্র কি মুশকিলেই পড়ছে! বাপ মারা গেছে, বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না, কাজকর্মের এত চেষ্টা করছে, জুটছে না একটাও। এখন কি করে বেড়াচ্ছে দ্যাখো।' হঠাৎ জনান্তিকে বললেন, 'তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাও না কেন? পরিবারের সঙ্গে বেশি ভাব হয়েছে বুঝি?'

নিচে হঠাৎ গান শোনা গেল। কে গায় রে? কার কণ্ঠস্বর?

এ কি আর চিনতে ভুল হয়? নরেনের গলা। নরেন গান করছে। কী গান করছে?

'বহিছে রূপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে?' না কি 'ওহে ধ্রুবতারা মম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে!'

৯২

কে জানে কী গান! ঠাকুর তাকে গান গাইয়ে ছাড়ছেন।

ঈশ্বর কি শুধু কোমলকান্ত পদাবলী? শুধু কি কলিতললিত বংশীস্বর? বিলাস-আলস্যে সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকলেই কি বলব তিনি আছেন? তাঁর আবির্ভাব কি শুধু আরামরম্যতায়? কণ্টক-শয়নে তিনি নেই? নেই কি কোপকর্কশ বজ্রবহ্নিতে? তাঁর আশীর্বাদ কি শুধু ধনমান সাফল্য-স্বাচ্ছন্দ্য? এই আঘাত আর অভাব, সংগ্রাম আর ব্যর্থতা—এ কি নয় তাঁর অনুকম্পা? সুখের পেলবতাটুকুই তাঁর স্পর্শ, দুঃখের কাঠিন্যটুকুই আর তাঁর স্পর্শ নয়? হায়, সুখ হচ্ছে চকিতে একটু ছোঁয়া, দুঃখই নিবিড় আলিঙ্গন। যা দেন সব নেব নতশিরে। খরশর হোক, হোক বা পুষ্পবৃষ্টি। জল যেখান থেকেই আসুক, কুম্ভ থেকেই হোক বা কূপ থেকেই হোক, হোক তা খাল-বিলের বা বর্ষা-বাদলের, নেব সব অঞ্জলি ভরে। ঈশ্বর সুখকর নন দুঃখকরও নন, ঈশ্বর কল্যাণকর। নন শুধু শীতনিবারিণী কন্থা, তিনি আবার হিমরাত্রির অনাবরণ। তাই ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরের নাম করে নরেন।

পাশের ঘর থেকে একদিন শুনতে পেলেন ভুবনেশ্বরী। ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'চুপ কর। ছেলেবেলা থেকেই তো কত ভগবান-ভগবান করলি—ভগবান তো সব করলেন!'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল নরেন। সর্বংসহা যে মা তিনিও অস্থির হয়েছেন। ভগবান তাঁর কান্নাও কানে নেননি। তবে তাঁকে করুণাময় বলি কি করে? যিনি কল্যাণ করেন তিনি একটু করুণা করতে পারেন না?

পর-দুঃখে কাতর হয়ে তাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর: 'ভগবান যদি দয়াময়ই হবেন তবে দুর্ভিক্ষে লাখ-লাখ লোক দুটি অন্নের জন্যে কেঁদে-কেঁদে মরে কেন?'

ঠিকই বলেছিলেন। যার ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা আছে সে যদি এত কান্নায়ও বিচলিত না হয়, তবে কী বলব? হয় বলব তিনি নেই বা তাঁর ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা নেই, কিম্বা বলব তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ঠুর অনাত্মীয়। কেউ নন তিনি আমাদের।

এই প্রশ্ন নিয়েই একদিন সটান গিয়েছিল ঠাকুরের কাছে।

'বলুন ঈশ্বর কিসে দয়াময়? দয়াময় তো, এত দুঃখ কেন দিনে-রাত্রে? যারা নিষ্পাপ-নির্দোষ তাদের কেন এত যন্ত্রণা?'

আয়ত-স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, বোস পাশটিতে। একটু স্তব্ধ হয়ে তাকা একবার রাতের আকাশের দিকে।

কোথায় রাতের আকাশ! রাতের আকাশের মতই রহস্যগভীর যে দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে রইল নরেন।

হ্যাঁরে, কী দেখছিস? গুঁড়ো-গুঁড়ো কাঁচের টুকরোর মত কত তারা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশে গুনতে পারিস? কেউ পারে? একথালা শুপোরি, গুনতে নারে বেপারী। তেমনি গুনতে পারিস গঙ্গাপারের ক্যাঁকড়া? চেয়ে দ্যাখ ভালো করে। শর্বরীর নীলাম্বরীতে কুচি-কুচি চুমকি। একটা দুটো নয়, লক্ষ-লক্ষ, হয়তো কোটি-কোটি। তার মধ্যে তোর এই পৃথিবী। হাওয়ায় উড়ে আসা ছোট্ট একটা বালুকণা। সেই পৃথিবীই বা কি কম বড়! হাঁটতে শুরু করলে পথ আর ফুরোয় না একজন্মে। অন্তরীক্ষের প্রেক্ষিতে তোর এ বিশাল পৃথিবীই বা কি। তুচ্ছ একটা কীটাণু। তার মধ্যে আবার তুই! তোর মস্তিষ্ক! তোর হৃৎস্পন্দন।

নরেন মাথা নোয়াল।

হ্যাঁ, নত কর মাথা। কার বিচার করবি তুই, কোন আইনে? সেই বিচারদৃষ্টি কতদূর প্রসারিত করবি? তারপর শেষে আকাশে এসে ঠেকবে না? এই কালো রাত্রির আকাশ? তখন কী বলবি রে নরেন? এতগুলো তারা কেন? কোন ভূতের বাপের পিণ্ডি দিতে? সূর্য-চন্দ্র বুঝি, কিন্তু তারা দিয়ে কি মানুষ ধুয়ে খাবে? কী উত্তর দিবি? যদি বলি ওরা সব চিন্তামণির নাচ-দুয়ারের মণি-মাণিক্য, পারবি মেনে নিতে? বলি, বিচার কতদূর যাবে? শেষে সকল পথ পায়ে হেঁটে দুয়ারে এসে আছড়ে পড়বি! বিচার থা পাবে না। না পাক, নোয়াব না মাথা। ঈশ্বরের কাছেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াব। লড়ব নয় মরব। আকাশটাকে ছিনিয়ে আনব দুহাতে।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলের সামনে পড়ে গিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। যেন জল খাচ্ছিলেন ডুবে-ডুবে। মুখে ঠাট্টা, অন্তরে কান্না। মুখে রাগ, অন্তরে অনুরাগ!

তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিলেন ভুবনেশ্বরী। আর কিছুর জন্যে নয়, যে চেলি পরে আহ্নিক করছিলেন সেটা শতছিন্ন হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাটা: 'আমাকে একখানা চেলি বা গরদের কাপড় কিনে দিতে পারিস? এটা পরে আর পারা যায় না।' মাথা হেঁট করল নরেন। কোথায় পাবে সে চেলি-গরদ? সে বেকার, উদয়াস্ত ভূতের বেগার খাটছে। কোথায় পাবে সে পট্টবস্ত্রের পয়সা? লজ্জা মা পাবে কেন, লজ্জা পেল ছেলে। মা'র সমুখ থেকে চলে গেল ম্লানমুখে।

সেইদিনই বিকানির থেকে এক মাড়োয়ারি এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে মিছরির থালা, তার উপরে একখানা গরদের কাপড়। দেখে ঠাকুরের বড় খুশি-খুশি ভাব। ডুমো-ডুমো মিছরি দিয়ে ভর্তি-করা গরদ-ঢাকা থালা নামিয়ে প্রণাম করল মাড়োয়ারি। দু দিন পরে নরেন এসে হাজির। যাকে মানে না সেই আবার টানে। যারে নিন্দে তারেই বন্দে।

'শোন, কাছে আয়—' নরেনকে ডাকলেন ঠাকুর।

নরেন কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল, বসল না।

'শোন, এই মিছরির থালা আর গরদখানা তুই নিয়ে যা—'

উচ্চশব্দে হেসে উঠল নরেন। পরবার নেংটি নেই দরবারে যেতে চায়। মিছরি দিয়ে আমি কী করব? আমি কি ছোট ছেলে যে মিষ্টি দিয়ে ভোলাবেন? আর গরদ—'গরদখানা তোর মাকে নিয়ে দে গে। তার আহ্নিক করবার চেলি ছিঁড়ে গিয়েছে। সে এ গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল নরেনের। তা আপনি কি করে জানলেন? আপনাকে বললে কে?

ওরে, আমি জানতে পাই। উৎসটি ঠিক থাকলে ধ্বনিটি ঠিক আমার কানে লাগে। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণের সময় এক হাতে নিজের কাপড় ধরে আরেক হাত তুলে ডাকছিল কৃষ্ণকে। প্রথম-প্রথম শত কান্নায়ও কৃষ্ণ সাড়া দেয়নি। কিন্তু দ্রৌপদী যখন দু হাত তুলে দিলে, ছেড়ে দিলে, তখনই বস্ত্রভার কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণ। যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন। তেমনি যে দু হাত ছেড়ে দিয়ে ডাকে, তাকে তুলে নেন ভগবান। তার ডাকটি ঠিক শোনায়।

'শোন, নিয়ে যা গরদখানা। তোর নিজের জন্যে বলছি না, তোর মা'র জন্যে।'

'মার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন?'

'ভিক্ষে?'

'তা ছাড়া আবার কি! মা আমার কাছে চেয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিনে দিতে। যখন উপার্জন করতে পারব তখন কিনে দেব। আপনার কাছ থেকে ভিক্ষে করে নেব কেন?'

নরেনের তেজ দেখে প্রসন্নবয়ানে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'এ না হলে নরেন! আমরা হলুম নর আর তুই যে নরের ইন্দ্র।'

কিছুতেই নিল না নরেন। গরদের কাপড় মা'র কত দরকার, আকস্মিক ভাবে পেয়ে গেলে কত খুশি হতেন—তা জেনেও টলল না একচুল। মা আমার কাছে চেয়েছেন, আমি রোজগার করে তা কিনে দেব। কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে নিতে যাব কেন? না, কিছুতেই ভিক্ষে করব না। স্বয়ং ভগবানের কাছেও নয়।

নরেন চলে গেলে ডাকলেন রামলালকে। বললেন, তোকে একটা কাজ করতে হবে রামনেলো!

কি কাজ?

'কাল শিগ্‌গির করে খেয়ে নিয়ে চলে যাবি কলকাতায়। সেই শিমলেয় নরেনের বাড়িতে। বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যখন বুঝবি নরেন বাড়িতে নেই, সটান চলে যাবি তার মা'র কাছে। ঠিক তার মা'র হাতে এই গরদখানা আর এই মিছরির থালা পেঁছে দিয়ে আসবি। বুঝলি? বলবি, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। কি, পারবি তো?'

পারব।

'দেখিস বাইরে থেকে যেন ডাকাডাকি করিসনে।' নরেনকে যেন কত ভয়

ঠাকুরের। 'দেখিস অন্যের হাতে গিয়ে যেন পড়ে না। নরেন টের পেলে দরজা বন্ধ করে দেবে।' কিন্তু ঠাকুর যখন নিজে নরেনকে খুঁজতে আসেন, বাড়ির ভিতর ঢোকেন না। বাইরে থেকে বলেন, 'নরেন কোথায়, নরেনকে ডেকে দাও।'

কিন্তু রামলালের জন্যে অন্য ব্যবস্থা। তাকে তাগ বুঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে নরেনের দৃষ্টি এড়িয়ে।

চাদরের তলায় থালা আর কাপড় লুকিয়ে গ্যাসপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রামলাল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের তিন নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। দুপুরের রোদ উঠে এসেছে মাথার উপর। চারদিক ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কখন না-জানি নরেন বেরোয় বাড়ি থেকে। তার দৈনন্দিন চক্রাবর্তে।

কি হল? নরেন আজ আর বেরুবে না নাকি? না, ঐ বেরুচ্ছে। খুলেছে সদর দরজা। মলিন চাদরখানা গায়ে ফেলে চলেছে পথ দিয়ে। অমনি ঐ ফাঁকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে রামলাল। একেবারে ভুবনেশ্বরীর দরবারে।

'আপনাকে এই মিছরির থালা আর গরদের কাপড় পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর।'

গরদের কাপড়! পাঠিয়ে দিলেন লোক দিয়ে! হাসলেন ভুবনেশ্বরী। কি করে জানলেন তিনি? তিনি কি দূরের ভাষা শুনতে পান? শুনতে পান মনের মৌন? বললেন, 'এইখানে কি কথা হল বিলের সঙ্গে, তাই দক্ষিণেশ্বরে অমনি টেলিগ্রাম হয়ে গেল?'

কেন হবে না? তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যত ডেকেছ যত কেঁদেছ সব শুনেছেন। শুধু কথাটুকুই শোনেন না, বলতে না পারার ব্যথাটিও শোনেন। এক মুসলমান নমাজের সময় হো আল্লা হো আল্লা বলে খুব চেঁচিয়ে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই অত চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান। শুনতে পান তোর অস্ফুটতম দীর্ঘনিশ্বাস।

নরেন বাড়ি ফিরে এসে দেখল মা গরদের কাপড় পরে বসে আছেন পুজোর ঘরে। এ কে ওস্তাদ বীণকার! সব সুরের রাগিণীই যেন জানেন খেলতে। কখনো আঘাতে কখনো আনন্দে, কখনো কড়িতে কখনো কোমলে। শুধু তার বাঁধা সুর বাঁধার মুখেই যন্ত্রণা। এই বুঝি ছিঁড়ে গেল তার, শুরু হল বেসুরের আর্তনাদ। বিচ্ছিন্ন তারের ঝঙ্কারকে কবে নিয়ে যেতে পারব একটি সঙ্গীতের সমগ্রতায়? পৃথক-পৃথক জিজ্ঞাসাকে গ্রথিত করতে পারব একটি মহাবিশ্বাসের মূলসূত্রে?

যত দিন তা না পারি তত দিন হাজরার কাছে গিয়ে বসি।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করে হাজরা। তারই মধ্যে আবার দালালির চেষ্টা করে। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা আছে তা শোধবার ফিকির খোঁজে। জপ করে তার বেজায় অহঙ্কার। রাঁধুনে বামুনদের কথায় বলে, ওদের সঙ্গে কি আমরা কথা কই? শোনো কথা! রাঁধুনে বামুনরা যেন আর মানুষ নয়।

শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছে সেদিন। ইচ্ছে দু-এক রাত্তির থেকে

যায় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাকে যত্ন করে থাকতে বললেন। কিন্তু হাজরা ঝামটা মেরে উঠল। বললে, 'এ ঘরে নয়, ওকে খাজাঞ্চির ঘরে পাঠিয়ে দাও।'

মানেটা বুঝতে পেরেছেন ঠাকুর। মানেটা আর কিছুই নয়, এখানে থাকলে পাছে হাজরার দুধ-মিষ্টিতে ভাগ বসায়। যদি তার বরাদ্দে কিছু টান পড়ে। এত হিসেবী এত স্বার্থপর! ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আমি ওর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর সংসারে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু জপ-তপ করে তোর এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না?'

লজ্জা করবে কি! জটিল-কুটিল না হলে লীলারস জমবে কি করে?

কিন্তু নরেন বলে, 'হাজরা খুব ভালো লোক।'

'তুমিও একদিন বলবে, আমি বলে রাখছি।' হাজরা লক্ষ্য করে ঠাকুরকে: 'এখন আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু দেখো, পরে আমাকে তোমার খুঁজতে হবে।'

আমি হচ্ছি সংশয়। আমি হচ্ছি স্বার্থপরতা। আমি হচ্ছি ব্যবসাবুদ্ধি। সংশয় ছাড়া প্রত্যয়ের দাম কোথায়? স্বার্থপরতা না থাকলে কোথায় আত্মত্যাগের মহিমা? ব্যবসাবুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত কুলোবে না বলেই তো শরণাগতির শান্তিজল।

থেকে-থেকে রসিকতা করে। সত্ত্বগুণের রঙ শাদা, রজোগুণের লাল, তমোগুণের কালো। সত্ত্বগুণে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, রজ তম ঈশ্বর থেকে তফাত করে। হাজরাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'বলো তো, কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে?'

'নরেনের ষোলো আনা।' নির্লিপ্ত মুখে বললে হাজরা। 'আমার এক টাকা দুই আনা।'

'বলো কি? আর আমার?'

'তোমার এখনো লালচে মারছে—তোমার বারো আনা।'

বাইরের বারান্দায় হাজরার কাছে গিয়ে বসেছে নরেন। হাজরাও অভাবী লোক, জীবিকার্জনের জন্যে সংগ্রাম করে, আবার সেই সঙ্গে নিবিষ্ট নিষ্ঠায় জপধ্যান করে, তারই জন্যে বোধ হয় পক্ষপাত। কিন্তু বেশিক্ষণ ঠাকুরকে না দেখেও থাকা যায় না। বারান্দা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে বসল নরেন।

'তুই বুঝি হাজরার কাছে বসেছিলি?' বললেন ঠাকুর, 'আহা, তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।'

সবাই হেসে উঠল।

'হাসলে কি হবে? আমি তাকে বলি, তুমি শুধু বিচার করো তাই তুমি শুষ্ক। সে বলে, আমি সৌরসুধা পান করি, তাই শুষ্ক। যদি শুদ্ধা ভক্তির কথা বলি, যদি বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকাকড়ি কিছু চায় না, সে বিরক্ত হয়, বলে, কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপচে যাবেই, খাল ডোবাও পূর্ণ হবে। শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার ষড়ৈশ্বর্যও হয়, টাকাকড়িও হয়। কি হয় না হয় কে বলবে?'

কৃপাবৃষ্টি অজস্র ধারায় পড়ছে দিবানিশি। সেই বৃষ্টির জল ধরি তেমন পাত্রই এখনো হতে পারছি না। কিন্তু আমি যদি তোমার কৃপাপাত্র না হই, তবে আর কোথায় পাবে তোমার কৃপার পাত্র ?

নরেন অন্য কথা পাড়ল। বললে, 'গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। আপনার কথা হচ্ছিল—'

'কি কথা ?' একটু বোধ হয় কৌতূহলী হলেন ঠাকুর।

'এই আপনি কিছু লেখাপড়া জানেন না—আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা।'

তা তো ঠিকই বলছিলি। আমি শুধু সার কথা জেনে নিয়েছি। বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; আর গীতার সার ত্যাগী। আর বই পড়ে কি হবে ? জানবার পর এখন শুধু সাধন-ভজন। সর্ষে পিষে তেল, মেদিপাতা বেটে রঙ আর কাঠ ঘষে আগুন বের করো।'

আরো এক দিন তর্কের মুখে বলেছিল নরেন : 'তুমি দর্শনশাস্ত্রের কী জানো ? তুমি তো একটা মুখখু।'

সেবার ঠাকুর করেছিলেন রসিকতা। বলেছিলেন, 'নরেন আমাকে যত মুখখু বলে আমি তত মুখখু নই।' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে লিখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন : 'আমি অক্ষর জানি।'

ঠাকুরের ইচ্ছে নরেন একখানা গান গায়। মাস্টারকে বললেন তানপুরাটা পেড়ে দিতে। নরেন বাঁধতে লাগল তানপুরা।

বাঁধা আর শেষই হয় না। বিনোদ বললে, 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেক দিন হবে।' আর সকলের সঙ্গে ঠাকুরও হেসে উঠলেন। বললেন, 'ইচ্ছে করছে তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং-টং শুরু হয়েছে—তারপর আবার তানা নানা নেরে নুম হবে।' 'যাত্রার গোড়ায় অমনি বিরক্ত হয়।' ফোড়ন দিলে ভবনাথ।

নরেন ঝলসে উঠল : 'সে না বুঝলেই হয়।'

সদানন্দ ঠাকুর প্রসন্ন স্নেহে বলে উঠলেন, 'ঐ ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।'

১৩

দারিদ্র্যের রন্ধ্র দিয়ে উঁকি দিতে চাইল অবিদ্যা। নানাভাবে কি পরীক্ষা করে নেবে না ? তুমি কি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, না, ইস্পাত দিয়ে। পরীক্ষায় না ফেলে কি করে বুঝব তুমি দুর্বাসনারজ্জু নারীকে প্রত্যাহার করতে পেরেছ ?

একটি সুন্দরী মেয়ের নজর ছিল নরেনের উপর। শুধু সুন্দরী নয়, ধনিনী। ভাবলে, তার এই দুর্যোগের সুযোগে টোপ ফেলি। গোপনে প্রস্তাব করে পাঠাল, সভূমিভূষণা আমাকে গ্রহণ করো। শুধু দারিদ্র্যমোচন হবে না, নিঃসংগতার অবসান হবে। রুক্ষবেশ ছেড়ে ধরো এবার রাজবেশ।

ধ্যান ভেঙে মুনিরা তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছে নারীর পায়ে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ও-সব মুনি-ঋষির চেয়ে দৃঢ়ব্রত।

প্রথমটা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিল নরেন। মেয়েটা তবু ফেরে না। শেষে

কাঁদতে শুরু করল। ভাবলে নারীর বল, চোখের জল। ছলনাজাল গুটিয়ে বিস্তার করলে শোকজাল। যদি এবার একটু বিগলিত হয় সেই পাষাণপিণ্ড।

কিন্তু পাষাণের চেয়েও কঠোর নরেন্দ্রনাথ। ধ্রুব, নির্বিচল। তার শুধু এক প্রার্থনা: 'ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি, সত্যং উপৈমি অনৃতাৎ।' হে ব্রতপতি, যে দীক্ষা দিয়েছ তাই আমাকে রক্ষা করুক। মিথ্যা থেকে দূরে থেকে যেন সত্যেই শরণাগত থাকি। আর কাউকে চিনি না, তুমিই শক্তি দাও। সাহস দাও।

সেই রজনীরঞ্জিনী দুঃখশৃঙ্খলা নারী চলে গেল দুয়ার থেকে।

কিন্তু এবার যে এল প্রলুব্ধ করতে, সে বারবধূ। সে জ্বলন্ত দুষ্কৃতাগ্নিশিখা। গুরুকে এসেছিল পরখ করতে, শিষ্যকে একবার দেখবে না বাজিয়ে?

আগে বীর্যলাভ, পরে ব্রহ্মলাভ। আগে বীর্যানন্দ, পরে ব্রহ্মানন্দ।

বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়িতে গিয়েছে নরেন। কি অমন দারিদ্র্যদুঃখে ম্লান হয়ে আছিস। চল ফুর্তি করবি চল। 'ন পুণ্যং সুখতঃ পরং।' সুখের চেয়ে আর পুণ্য নেই। দু ঢোক খেলেই দেখবি সমস্ত জগৎসংসার একটা রঙিন ফানুস হয়ে উড়ে চলেছে। রাজী হয়নি প্রথমে। সে কি কথা, তুই না গেলে গান গাইবে কে? ফুর্তির মুখে হরিনাম—যেন মুড়ির সঙ্গে ফুটকড়াই। যেমন ভোজন তেমন দক্ষিণা। চল চল মনমরা হয়ে বসে থাকিস নে মুখ গুঁজে।

গান গাইবে এই শুধু জানে নরেন। কিন্তু এ কাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্ধুরা? মাংসপাঞ্চালীকায়া শৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণী। নববিহঙ্গের বন্ধনবাগুরা।

বুঝল এও এক মহামায়ার খেলা। বিচলিত হল না। বিমোহিত হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি?'

স্ফুরৎচকিতচক্ষে তাকাল একবার মোহিনী। উত্তর দিল না।

'তোমার বাবার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কেন পা বাড়ালে এ পথে?'

আবার কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাত। আবার স্তব্ধতা।

'নিজের কথা একবার ভাবো? ভবিষ্যতের কথা? কি হবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? নিত্য ভিক্ষায় তনুরক্ষাই সাধনা? কিন্তু যখন ভিক্ষে আর মিলবে না?'

অপাঙ্গবীক্ষণ নেই আর মোহিনীর! চোখের দৃষ্টিটি এবার স্থির হয়েছে, শান্ত হয়েছে। ভরে উঠেছে তাতে হতাশার কুয়াশা, লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে! 'যখন থাকবে না এই শরীর? কি সম্বল নিয়ে যাবে তুমি ওপারে?'

এবার বুঝি দিগদর্শন হল মেয়েটির। দেখল চারদিকে শুধু ধু-ধু করছে মরুভূমি। কোথাও এতটুকু পিপাসার জল নেই, নেই অনুতাপের অশ্রুলেখা। দ্রুতপায়ে চলে গেল। বললে গিয়ে বন্ধুদের, অমন লোকের কাছে পাঠাতে আছে আমাকে?'

ঠাকুর নরেনকে বলেন, শুকদেব। তাই শুনে বিশ্বনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'ব্যাসদেবের ব্যাটা শুকদেব।'

কায়রোতে এক দিন পথ হারিয়ে ফেলেছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গীদের সঙ্গে

ঈশ্বরীর কথা বলতে-বলতে। সঙ্গী সস্ত্রীক ফাদার লয়সন, শিকাগোর মিস ম্যাকলিয়ড আর সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা এম্মা ক্যালভে। পথ হারিয়ে চলে এসেছেন একটা নোংরা গলির মধ্যে।

দুদিকে সার-সার ঘর, দরজা-জানলা খোলা। সেই সব জানলা আর দরজার সামনে অর্ধনগ্ন নারীর দল বসে আছে দেহের বেসাতি সাজিয়ে। কিছু লক্ষ্য করেননি স্বামীজী, ঈশ্বরোন্মাদনার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আছেন। চারদিকে শুধু ঈশ্বরপ্রতিভাস। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য না ফিরিয়ে ছাড়বে না মেয়েগুলো। কে একটা মুখরা মেয়ে তাঁকে ডাকতে লাগল হেসে-হেসে। দেহে যৌবনের এমন দিব্যশোভা নিয়ে কোথায় তুমি চলে যাচ্ছ, উদাসীন!

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। কি করে অবিলম্বে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে স্বামীজীকে তার জন্যে তাড়া দিতে লাগল। কিন্তু সহসা বিবেকানন্দ দল ছেড়ে সেই পণ্যাঙ্গনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি করেছ! নিজেদের দেবীত্বকে ঢেকেছ এ কোন সৌন্দর্যসজ্জায়! আত্মস্বরূপকে দেখ. দেখ সেই দেবীবৈভব! এ করেছ কি!' বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। রূপজীবাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন কেঁদেছিলেন যীশুখৃষ্ট।

মেয়েগুলির মুখে আর কথা নেই। একজন এগিয়ে এসে স্বামীজীর গৈরিক বাসের এক প্রান্ত স্পর্শ করল, সেই প্রান্তভাগ চুম্বন করে ভাঙা-ভাঙা স্পেনী ভাষায় বলতে লাগল, 'হোমব্রি ডে ডিওস, হোমব্রি ডে ডিওস—দেব-মানব, দেব-মানব।'

আরেকজন চোখ ঢাকল দুহাতে। স্বামীজীর সেই চক্ষুচ্ছটা যেন সে সইতে পারছে না তার পাপলিপ্ত আত্মা যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল বকে গিয়েছে নরেন্দ্রনাথ, নাস্তিক হয়ে গিয়েছে। মদ আর তার অনুষঙ্গ কিছুতেই তার অরুচি নেই। কেউ যদি এ প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, কি উত্তর পেলে সে সুখী হবে বুঝতে পেরে নরেন বলে, 'বেশ করেছি। যদি কেউ বুঝে থাকে ও-সব ক্ষণিক সুখভোগেই সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকা যায়, তবে তাকে তা বুঝতে দিতে আপত্তি কি? যাও, সরে পড়ো, যত পারো নিন্দা করো মনের সুখে। নিন্দা করে আনন্দিত হও।'

কথা কানে হাঁটে। দেয়ালে শোনে। বাতাসে লেখা হয়ে যায়। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কানে উঠল। তাও আবার কানে এল নরেনের। তবে আর কি, ঠাকুরও এবার বিশ্বাস করুন তাঁর নরেন মন্দিরের দ্বার ছেড়ে চলে এসেছে নরকের দরজায়! তাঁর সেই বৃহদ্‌ব্রতধর ব্রহ্মতেজা নরেন! ভবনাথ তো একেবারে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'নরেনের এমন হবে এ কথা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি।'

ঠাকুর পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'দূর শালারা চুপ কর। আমার মা'র কথার চেয়ে তোদের কথা বড় হবে? আমার মা বলে দিয়েছেন, সে কখনো ও রকম হতে পারে না, তার জীবনে যোষিৎসঙ্গ হবে না কোনোদিন। তার জন্যে ভাবতে হবে না তোদের। ফের যদি ও কথা বলিস তোদের মুখ-দর্শন করব না।'

কথা শুনে আনন্দে বুক ভরে গেল নরেনের। সত্যদর্শী অন্তর্যামী ঠিক দেখতে পেয়েছেন তার অন্তরের মানচিত্র। তিনিই তাকে রক্ষা করবেন আমরণ।

কেউ যদি কখনো বলে, সে কি মশাই, এ তো নরেনও বলে, তখন ঝলসে ওঠেন ঠাকুর: 'এ তো নরেন বলে! নরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর নরেন এক না।'

'আপনি নরেনকে এত ভালোবাসেন কেন? নিজের ছোট হুঁকোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন, হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল!' আরেকজন কে নালিশ করলে ঠাকুরের কাছে: 'ও যে হোটেলে খায়! ওর এঁটো কি খেতে আছে?'

'ওরে শালা, তোর কি রে? নরেন হোটেলে খাক বা না খাক, তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস আর নরেন যদি হোটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেন হতে পারবি নে।'

কেবল নরেন আর নরেন! নরেন যে আপনাকে গাল দেয় তার হিসেব রাখেন? 'নরেন আমাকে গাল দেয়, কিন্তু আমার ভিতর যে শক্তি আছে তাকে সে মানে, তাকে সে গাল দেয় না।'

সে আশ্চর্য শক্তিই বরাবর রক্ষা করে এসেছে নরেনকে। সে শক্তিই তো ত্রৈলোক্যাকর্ষণী বংশীধ্বনি। নিরন্তর বেজে চলেছে বাতাসপ্রবাহে। শোণিত-প্রবাহে। আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল স্বামীজীর। কোনো মন্দ ভাব থেকে নয়, অমনি। ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার দেখি। দেখা হল আরেকবার। কোথায় সুন্দরী। দেখলেন একটা বাঁদরের মুখ! স্বপ্নে কখনো স্ত্রীলোক দেখেননি স্বামীজী। একবার কিন্তু দেখে ফেললেন। একটি স্ত্রীলোক মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে হল ঘোমটা খুলে মুখখানি দেখি! যাই ঘোমটা খোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর!

'অন্যেরা কলসী বাটি, নরেন্দ্র জালা। অন্যেরা ডোবা পুষ্করিণী, নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদারপুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই, আর এরা সব পোনা, মৃগেল, কাঠিবাটা।' বলছেন ঠাকুর, 'নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়িতে তাই ডানদিকে বসে। আর ভবনাথের মেদি ভাব, ওকে তাই অন্য দিকে বসতে দিই।' ওর বিষয়ে নালিশ করতে আসিসনে। ওকে আমার তামাক সাজতে পর্যন্ত দিই না, দিই না শৌচের জল বইতে। ও সব কাজের জন্যে অন্য লোক আছে। তোরা আছিস।

'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'

'কে নরেন্দ্র?' জিগগেস করলেন প্রতাপ মজুমদার।

'ও আছে একটি ছোকরা।' বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দ্যাখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছে হয় না কি, এই রসের সাগরে ডুব দিই! আচ্ছা, মনে কর এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। তা হলে তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। কেন, কিনারায় বসবি কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে

ডুবে যাব আর প্রাণ হারাব। তখন আমি বললুম, বাবা সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।'

দুটোর একটা করো। হয় পাগলামি ছেড়ে দাও, নয় তো ঈশ্বরের নামে পাগল হও। নববৃন্দাবন প্লে হচ্ছে কেশব সেনের বাড়িতে। নরেন শিব সেজেছে। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। অভিনয়ের মধ্যেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনকে নেমে আসতে বলো। হ্যাঁ, ঐ বেশেই নেমে আসুক আমার সামনে। চোখের সম্মুখে দাঁড়াক একবার স্থির হয়ে, শিব হয়ে।'

নরেন ইতস্তত করছে। কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন তখন এস না নেমে।' কে নামে, কে ওঠে! নরেন অবতার মানে না, তাতে কি এসে যায়! এতে যেন আরো উথলে উঠছে ঠাকুরের ভালোবাসা। নরেনের গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'মান করলি তো করলি, আমরাও তোর মানে আছি রাই।'

ওরে, কতক্ষণ বিচার? নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শোনা যায়? যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যেই লুচি-তরকারি পড়ে, বারো আনা শব্দ কমে যায়। অন্যান্য খাবার পড়লে আরো কমতে থাকে। দই পড়লে তখন কেবল সুপসাপ। খাওয়া হয়ে গেলে নিদ্রা। তেমনি ঈশ্বরকে যত লাভ হবে ততই বিচার কমবে। তাঁকে লাভ হলে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে আর শব্দ বা বিচার থাকে না। তখন শুধু নিদ্রা—সমাধি।

নরেনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, মুখে হাত দিয়ে আদর করছেন আর বলছেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!'

ক্রমশ বহির্জগতের হুঁশ চলে যাচ্ছে। একেই বুঝি বলে অর্ধবাহ্যদশা, যা শ্রীগৌরাঙ্গের হত। আশ্চর্য, এখনো নরেনের পায়ের উপর হাত, যেন ছল করে নারায়ণের পা টিপছেন। অত গা টেপা পা টেপা কেন? কেন কে বলবে! এ কি নারায়ণের পদসেবা, না, শক্তিসঞ্চার!

তারপর হাতজোড় করে বলছেন, 'একটা গান গা। নইলে উঠতে পারব কেমন করে? গোরাপ্রেমে গর্গর্ মাতোয়ারা।' বলেই নিজে গান ধরেছেন: 'দেখিস রাই, যমুনায় যে পড়ে যাবি! সখি, সে বন কত দূরে। যে বনে আমার শ্যামসুন্দর। ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়। আমি যে চলতে নারি—' উঠতে চেয়েই আবার বসে পড়ছেন। বলছেন, 'ঐ একটা আলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে যে আসছে আমাকে কে বলে দেবে! ধর একটা গান ধর—'

নরেন গান ধরল:

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে
সপ্ত লোকে ভোলে শোক, তোমারে পাইয়ে—
কোথায় আমি অতি দীনহীন!'

ঠাকুরের নেত্র নিমীলিত। দেহ স্পন্দহীন। সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গের পর বলছেন বিহ্বলকণ্ঠে, 'আমাকে কে লয়ে যাবে?' সঙ্গীহারা বালক যেমন অন্ধকার

দেখে তেমনি।

'কে যায় অমৃতধামযাত্রী, আজি এ গহন তিমির রাত্রি, কাঁপে নভ জয়গানে।'

১৪

কেশবের খুব অসুখ। দেখতে এসেছেন ঠাকুর। আগের বার যখন অসুখ হয় তখন কালীর কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলেন। বলেছিলেন, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তাহলে কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব? এবার অসুখ কিছু বাড়াবাড়ি। এমনিতে কতবার গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। শেষ দিকে, একেবারে শুধু-গায়ে। ফল হাতে করে। এখন একেবারে বিছানা নিয়েছে।

'দেখ কেশব কত পণ্ডিত। ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কত লোক তাকে মানে, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে।' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের। 'কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। একেবারে অভিমানশূন্য।'

একদিন এসে কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। প্রতাপ মজুমদার বললেন, আজ সব থেকে যাব এখানে। বাড়ি ফিরে আর কাজ নেই।

'না, না, আমার কাজ আছে। আমাকে যেতে হবে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এই যে সেই মেছুনীর মত করলে।' ঠাকুর হেসে উঠলেন: 'আঁস-চুপড়ির গন্ধ না হলে বুঝি আর ঘুম হয় না? এক মেছুনী মালিনীর বাড়িতে অতিথি হয়েছে। মাছ বিক্রি করে আসছে, তাই হাতে চুপড়ি। মালিনী তাকে ফুলের ঘরে শুতে দিয়েছে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল, কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। কি গো, ছটফট করছ কেন? জিগগেস করলে মালিনী। কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম আসছে না। মেছুনী মিনতি করল, আমার আঁস-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাই আনিয়ে দিল মালিনী। তখন আঁস-চুপড়িতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে মেছুনী ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

গল্প শুনে কেশব আর তার দলের লোকের হাসি আর থামে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। যে ঘরে বিকারী রুগী সেই ঘরেই আবার আচার-তেঁতুল—সেই ঘরেই আবার জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? আচার-তেঁতুল—এই দেখ', ঠাকুর তাকালেন সবাইয়ের দিকে, 'বলতে-বলতে আমার মুখে জল এসেছে। সামনে থাকলে কি হয় কে বলবে! মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার-তেঁতুল। ভোগবাসনা জলের জালা। আর সব কিনা এই রুগীর ঘরে।'

দিন কতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকো। কদিন এমন জায়গা ঘুরে এস যেখানে আচার-তেঁতুল নেই, জলের জালা নেই। চলে যাও নির্জনে। নীলের নিলয়ে। হয় নীল সমুদ্রে, নীল অরণ্যে, নীল আকাশের নিঃসীমায়। নীল হচ্ছে অনন্তের রঙ, অবিনশ্বরতার রঙ। তোমার নির্জনতার রঙও হচ্ছে নীল। নির্জনে থাকতে-

থাকতেই নীরোগ হবে। নীরোগ হয়ে ঘরে ফিরে এলে আর ভয় নেই।

'অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে তখনই চারদিকে বেড়া লাগে। পাছে ছাগল-গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হলে বেড়ার আর দরকার থাকে না। তখন হাতি বেঁধে দিলেও কিছুই হয় না গাছের। যদি নির্জনে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে বল বাড়িয়ে বাড়ি গিয়ে সংসারী করো, কামিনী-কাঞ্চন তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

দলের মধ্যে ছিলেন একজন সদরওয়ালা। বললেন, 'সংসারত্যাগের যে প্রয়োজন নেই, বাড়িতে থেকেও যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এ জেনে মনে বড় শান্তি হল।'

'যা আছে হোথায় তা আছে হেথায়।' রামকৃষ্ণ বললেন দীপ্তস্বরে: 'ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে ? যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ তো করতেই হবে। এ যুদ্ধ সংসারে থেকেই সুবিধে। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে—রোগ হলে সেবা পর্যন্ত।' দেখছ না আমাকে ! সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ হয়ে সংসারীর শিরোমণি।

'আমার তো মাগ আছে। ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটি আছে। হরে-প্যালাদের খাইয়ে দিই। আবার হাবির মা এলেও ভাবি।'

পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে, নিত্যে-অনিত্যে, মিশেল হয়ে আছে। বালি ছেড়ে চিনিটুকু নাও। থাকো পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে কিন্তু গা ঝকঝক করছে। থাকো পানকৌটির মতো। পাখা ঝাপটেই গায়ের জল ঝেড়ে ফেল। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো।

'একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল, আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী ছিল। সে বললে, কেন মিছে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে ? পেটের ভাতের জন্যে দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও। আর তাই যদি হয় এই এক ঘরই ভালো।'

তার মানে জ্ঞানলাভ করে সংসারে থাকো।

'জ্ঞান হয়েছে তা কেমন করে জানব ?' জিগগেস করলেন সদরালা।

'জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর তখন তিনি নন। তিনি তখন ইনি। হৃদয়মধ্যে বসে আছেন।'

অন্তরের মধ্যেই সেই স্থিরধাম। কেউ চলেছে দ্বারকানাথ, কেউ মথুরায়, কেউ বা কাশীতে। কিন্তু প্রভু রয়েছেন অন্তরের নিরালায়। পিপাসিত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে, মানস-সরোবরেই সঞ্চিত আছে জলপুঞ্জ। সেই মন-সরসীতে এবার স্নান করো। অনেক রুদ্ধ ঘরে কান পেতেছ। এবার নিজের অন্তরে এসে কান পাতো। এবার শুনতে পাবে সে দুয়ার খোলার শব্দ।

সদরালার তবু সংশয় যায় না। বললেন, 'মশায়, আমি পাপী, কেমন করে বলি যে তিনি আমার ভিতরে আছেন ?'

একটু যেন বিরক্ত হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঐ তোমাদের পাপ আর পাপ। এ সব বুঝি খৃষ্টানি মত ? সে দিন একটু বাইবেল পড়া শুনলাম। তাতে কেবল

ঐ এক কথা। পাপ আর পাপ! আমি তাঁর নাম করেছি, রাম কি হরি বলেছি, আমার আবার পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। দৃপ্ত বিশ্বাস। তপ্ত বিশ্বাস।'

'মশায়, কেমন করে অমন বিশ্বাস হবে?'

'তাঁতে অনুরাগ করো। তাঁকে ভালোবাসো। ডাকো। তাঁর জন্যে কাঁদো—'

'কেমন করে ডাকবো?'

ডাক দেখি মন ডাকের মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে। কেমন করে ডাকবো!

তাও আমায় শিখিয়ে দিতে হবে?

'আমি মা বলে এইভাবে ডাকতাম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে যে হবে! আবার কখনো বলতাম, ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন—আমি কিছুই যে জানি না—দয়া করে দেখা দিতে যে হবে—'

ঠাকুরের করুণ স্বরে সকলের হৃদয় গলে গেল। মহিমাচরণ তো কেঁদে আকুল। ওরে বিশ্বাস কর, তাঁর নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস? অন্ধ বিশ্বাস?

ওরে, অন্ধ হওয়াই সুবিধে। যার চোখ আছে সে তো নিজের অহঙ্কারে ঘুরে বেড়ায়। যার চোখ নেই তার হাত একজনকে এসে ধরতে হয়। ওরে তুই হাত-ধরা লোক কোথায় পাবি? প্রভুই এসে তোর হাত ধরবেন।

কিন্তু কেশবের এমন অসুখ হল কেন? শুধু খাটতে-খাটতে দেহপাত হল। শুধু লেখা আর লেখা। বক্তৃতা আর বক্তৃতা।

যোগীন যখন প্রথম ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম করে দাঁড়ায়, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'এই দক্ষিণেশ্বর থেকেই। আমি নবীন চৌধুরীর ছেলে।'

চিনতে পারলেন। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের নাম কে শোনেনি? এঁদের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেত সেকালে। যেমন অন্যের জাত নিতে পারতেন তেমনি জাত দিতেও পারতেন অকাতরে। কিন্তু ঠাকুর আশ্চর্য হলেন, দক্ষিণেশ্বরের লোক তাঁকে চিনল কি করে? প্রদীপের নিচেই তো অন্ধকার। মন্দিরের যত কাছে, ঈশ্বরের তত দূরে। সামনের মাঠকে হলদে লাগে, দূরের মাঠই সবুজ।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেন না ঠাকুরকে। গেঁয়ো যুগীরই ভিখ মেলে না। তাই তিনি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখানকার কথা কি করে জানলে?'

'খবরের কাগজ থেকে।'

'কোথাকার কাগজ?'

'কেশব সেনের। কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন কাগজে।'

কি লিখেছ, পড়িয়ে শোনাও তো ? এমন কথা জিগগেসও করলেন না ঠাকুর। ডাকিয়ে আনালেন কেশববাবুকে। বাহবা দিলেন না। বরং ধমকিয়ে বললেন, 'আমি কি মান-ভিখারী ? আমি কি ইদানীং-সাধু ?'

কেশব হাত জোড় করে বসে রইল।

'যা করেছ করেছ, আর লিখো না।'

কিন্তু কেশবের কথা কে লেখে ! একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—চেয়ে দেখ কত বড় শক্তি ! কিন্তু আজ ব্যাধির কবলে পড়ে কী নিঃসহায় ! শীতকাল। ঠাকুর দেখতে এসেছেন কেশবকে। গায়ে সবুজ বনাতের গরম জামা। জামার উপর আবার একখানি বনাত। সন্ধ্যা হয়-হয়। কেশবের বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন উপরে। বৈঠকখানার দক্ষিণে বারান্দা। সেখানে তক্তপোশ পাতা। তার উপরে বসাল ঠাকুরকে। বসে আছেন তো বসেই আছেন। কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ভিতরে। তাঁর কেশবের পাশটিতে। বসে-বসে তার কণ্ঠ-ভরা কাশির আওয়াজ শুনছেন। কত কীর্তন করেছে কেশব। ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে কত নেচেছে। কেশবকে বেশিদিন না দেখতে পেলেই অধীর হয়েছেন। সেবার যেন বড় বেশি ছটফট করছেন। রাজেন মিত্তির পাশে বসা, তাকে বলছেন, বার-বার, দ্যাখো দিকিন কেশব আসছে কিনা। রাজেন মিত্তির একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে। কই, কোথায় কেশব ! আবার কোথাও একটু শব্দ হল। দ্যাখো আবার দ্যাখো। আবার ফিরে এল রাজেন। কেশবের কেশাগ্রেরও দেখা নেই। ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত। রাই বলে, ওই এল বুঝি প্রাণনাথ।' তার পরে স্বরে অনুযোগ মেশালেন : হ্যাঁ, দ্যাখো, কেশবের চিরকালই কি এই রীতি ? আসে আসে আসে না !'

কিন্তু সেদিন না এসে আর পারল না কেশব। কিন্তু সঙ্গে সেই দলবল।

'রাজ্যের কলকাতার লোক জুটিয়ে এনেছেন ! আমি কিনা বক্তৃতা করব ! তা আমি পারবো-টারবো-নি। করতে হয় তুমি করো। আমি তোমার খাবো দাবো থাকবো—' তবে তুমি যদি একা-একা আস, বেশ হয়। দুজনে মিলে মনের সুখে কথা কই সঙ্গোপনে। ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে, আমি একবার টানলাম।

'কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের সেদিন বলছিলুম, এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন। তারপর তুমি যখন এলে, বললুম, ঐ গো তোমাদের গোবিন্দ আসছেন। আমি এতক্ষণ খচমচ করছিলুম, জমবে কেন ?'

ঐ দল-দল করেই গেল ! পাকা আমি কি দল করতে পারে ? আমি দলপতি, আমি দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি, এ আমি কাঁচা আমি।

'কিন্তু তোমরা এত দেরি করছ কেন ? কতক্ষণ বাইরে বসে থাকব ? আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

'তিনি এখন এই একটু বিশ্রাম করছেন। একটু পরেই আসছেন এখানে।'

'হ্যাঁ গা, তার এখানে আসবার কি দরকার ? আমিই যাই না কেন ভিতরে !'

ডাক্তার বলে গেছে বিশ্রামে রাখতে। তাই কেশবের শিষ্যরা খুব হুশিয়ার। এই একটু চুপচাপ আছে কেশব। এখুনি যদি আবার তাকে ব্যস্ত করা হয়—

কিন্তু ঠাকুরের ধৈর্য মানছে না। যাই-যাই করছেন।

'আজ্ঞে এই একটু পরেই আসছেন তিনি।'

'যাও, তোমরাই অমন করছ। না, আমিই ভিতরে যাই—'

প্রসন্ন ভুলোতে এল ঠাকুরকে। কেশবের কথা ছাড়া আর কথা কোথায় মন-ভুলানো ! প্রসন্ন বললে, 'তাঁর অবস্থা আরেকরকম হয়ে গেছে। আপনারই মত মা'র সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন, শুনে কাঁদেন-হাসেন।'

এত দূর ! সেবার কেশবকে বললেন, বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব তো বললেই, তার শিষ্যরাও বললে। আবার বললেন, বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব। তখন কেশব বললে, 'মশায়, এখন এত দূরে নয়। তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।'

কালী শুধু মানা নয়, কালীর সঙ্গে কথা বলা ! শুনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হয়েছে। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে নিয়ে এল সে ঘরে। আসবাবে ঠাসা, চেয়ার, কৌচ, আলনা, গ্যাসের আলো। ঠাকুর বসলেন একটা কৌচে। তখন যেন ভাবাবেশ কাটেনি সম্পূর্ণ। ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করে বললেন, 'আগে এ সব দরকার ছিল। এখন আর কী দরকার !' বলতে-বলতেই আবার আবেশ উপস্থিত। বলছেন, 'এই যে মা এসেছ ! এসো। আবার বারাণসী শাড়ি পরে কী দেখাও ! হাঙ্গামা কোরো না। বোসো গো বোসো।' এই কেশবের বাড়িতেই আগে একবার বলেছিলেন ঠাকুর, 'মা গো, এখানে তুই আসিসনি। এরা তোর রূপটূপ মানে না। কেবল নিরাকার নিরাকার করে।'

আজ একেবারে সটান এসে পড়েছেন। তায় আবার সেজেগুজে এসেছেন।

হরীশ ঠিকই বলে। ঠাকুরকে দেখিয়ে বলে, 'এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। তবে ব্যাঙ্কে টাকা দেবে। নইলে টাকা নয়, ফাঁকা।'

ঠাকুর বলছেন আপন মনে, 'দেহ হয়েছে আবার যাবে। দেহ আর আত্মা। কিন্তু আত্মা যাবে না। যেমন শুপুরি। কাঁচা বেলায় ফলে আর ছালে লেগে থাকে, আলাদা করা যায় না। কিন্তু পাকলে শুপুরি আলাদা হয়ে যায় ছাল থেকে। কিন্তু পাকবে কখন ? যখন তাঁর দর্শন মিলবে। তখন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা হয়ে যাবে।'

কেশব আসছেন। পূব দিকের দরজা দিয়ে আসছেন। আসছেন দেয়াল ধরে-ধরে। কী হয়ে গিয়েছে চেহারা ! কঙ্কালের উপর শুধু একটা চামড়ার প্রলেপ। চোখ মেলে তাকানো যায় না। বুক ফেটে যায় !

১৫

এই সেই বীর-বিদ্রোহী ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র।

কেশবের সমস্ত ধর্মসাধনার মূলে হচ্ছে তার মা, সারদাসুন্দরী। কেশব প্রাচীন ধর্ম-কর্ম মানছে না এই তাঁর বিষম চিন্তা। অভিভাবকরা ঠিক করেছেন কুলগুরুর মন্ত্র দিতে হবে তাকে। দিন ঠিক হয়েছে। গুরুদেব উপস্থিত। সব উপকরণ সাজিয়ে মা বসে আছেন। অভ্যাগত-নিমন্ত্রিতের ভিড় বাড়ছে। কিন্তু যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন তার দেখা নেই। কেশব চলে এসেছে দেবেন ঠাকুরের আশ্রয়ে। বলে পাঠিয়েছে পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র আমি নেব না।

বাড়ির আর সবাই ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছিঁড়ে খায় কেশবকে, কিন্তু সারদা-সুন্দরী নিজের দুঃখকে ছেলের সত্যের চেয়ে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যভ্রষ্ট হয় সে দুঃখ যে দ্বিগুণ হয়ে বাজবে।

ব্রাহ্মসমাজের ক'খানা বই মা'র হাতে দিতে গেল কেশব। বললে, পড়ে দেখ।

সুন্দর-সুন্দর কথা। কেশব ব্রহ্মজ্ঞানী হবে, গুরুর থেকে মন্ত্র নেবে না—কি এর তাৎপর্য ভালো বুঝতে পারেননি সারদা। কোথায় সে ব্রাহ্মসমাজ কে জানে। কিন্তু এ বইয়ে যা লেখা আছে তা যদি ওদের ধর্ম হয় তো মন্দ কি। গুরুঠাকুরকে দেখালেন বই। বললেন, 'কেশব কি ধর্ম পেয়েছে দেখুন।'

গুরুঠাকুর পড়লেন যত্ন করে। বললেন, 'এ তো খুব ভালো ধর্ম। তুমি ভেবো না, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মঙ্গল হবে।'

সুন্দর অক্ষরে মাকে কটি প্রার্থনা লিখে দিল কেশব। রোজ তাই পড়েন সারদা-সুন্দরী। নির্মল একটি তৃপ্তির স্পর্শে অন্তর-বাহির জুড়িয়ে যায়। হরিমোহন সেন, কেশবের জ্যাঠামশাই, একদিন দেখে ফেললেন। কী পড়ছ দেখি?

নাটক-নভেল কিছু নয়। ঈশ্বরের কথা। ঈশ্বরকে প্রার্থনা।

'কে লিখে দিয়েছে? কার হাতের লেখা?' গর্জে উঠলেন হরিমোহন।

চোখ নত করলেন সারদাসুন্দরী। কথা কইলেন না।

'বুঝতে পেরেছি কার। কেশবের।' বলেই হরিমোহন কাগজ কখানা ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো-টুকরো করে।

ছেলেকে গিয়ে আবার ধরলেন সারদাসুন্দরী। বললেন, 'আমাকে আরেকবার লিখে দে।' কেশব বললে, 'লিখে লাভ নেই, আবার ছিঁড়ে ফেলবে।'

বিশ বছরের ছেলে, বিজ্ঞ অভিভাবকদের কথা রাখে না, এ অসহ্য। কিন্তু যে হরিমন্ত্র দিয়ে জগজ্জনকে নববিধানে দীক্ষিত করতে এসেছে, তার কাছে কিসের গুরুমন্ত্র! যে নিজে জগদগুরু তার কাছে আবার কিসের গুরুজন!

হিন্দু পরিবারে থেকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষা না নেওয়া গুরুতর পরীক্ষা। কি হল জানবার জন্যে ছেলে সত্যেনকে পাঠিয়ে দিলেন দেবেন ঠাকুর। সত্যেন গিয়ে খবর দিল, জিতেছে কেশব। দেবেন ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন।

বক্তৃতা করে ফিরতে লাগল কেশব। একেকটা বক্তৃতা তিন-চার ঘণ্টা ধরে। যতক্ষণ স্বরভঙ্গ না হয় ততক্ষণ উচ্চগ্রামে বলে যাও হরিনাম। অগ্রসর হও, ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাও। যিনি আমাদের আলোক আর শক্তি, পিতা আর বন্ধু, তাঁর দিকে স্থির চোখে ভিখারীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকো। তিনি তোমার অন্তরে দেবেন জ্ঞান, হৃদয়ে প্রেম, আত্মায় পবিত্রতা আর দুহাত ভরে দেবেন শৌর্যে আর সাহসে। এগিয়ে যাও।

'হ্যা গা, ছেলেকে একটু দাবতে পারো না?' বললে কে এক হিতৈষিণী। 'রাত্রে ঘুমোয় না, মারা যাবে যে।'

ছেলে আমার অসাধ্যসাধন করবে। গর্ব না করে প্রার্থনা করেন সারদাসুন্দরী। ছেলেবেলা থেকেই সে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। ছেলেবেলা থেকেই গরদের চেলি পরে নাকে তিলক গায়ে ছাপ এঁকে গলায় মালা দিয়ে ভক্ত সাজতে সে ভালোবাসে। সে যে একটা কাণ্ড-কারখানা করবে এ আর বিচিত্র কি।

দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে সিংহল গেলেন কেশব সেন। আর কিছুর জন্যে নয়, জাহাজে চড়া স্লেচ্ছাচার—এ কুসংস্কার অমান্য করবার জন্যে। কলুটোলা সেনপরিবারে এ এক নিদারুণ ঘটনা। কিন্তু কেশব ছাড়া আর কার হবে এ দুঃসাহস! সারদাসুন্দরী ভয় পেলেন পরিণাম ভেবে। আর কেশবের বালিকা-বধূ কান্নার রোল তুললে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সে কান্না আর শোনা গেল না। দিগ্বিজয় করে ফিরল কেশব। খৃস্টানির সংস্পর্শে যত কুরীতি-দুর্নীতি এসেছিল সমাজে তার বিরুদ্ধে লড়তে লাগল। লড়তে লাগল যত অন্ধ সংস্কার ও যত বন্ধ দরজার বিরুদ্ধে। মেয়েদের অবরোধ ঘুচে গেল, নতুন ব্রাহ্মিকার সাজে পরদার বাইরে আসতে লাগল একে-একে। ব্রাহ্মণ যুবকেরা ছিঁড়ে ফেলল পৈতে। দেবেন ঠাকুরও উপবীত ত্যাগ করলেন।

এ দিকে রণে ভঙ্গ দিতে লাগল পাদরিরা। যে খৃস্টধর্ম তারা প্রচার করছে, সেটা যে মেকি তাই বাইবেল দেখিয়ে প্রমাণ করল কেশব। পাদরির উপর পাদরিগিরি চালালো। কেশবের সভায় লোক ধরে না, আর পাদরির সভায় ঠনঠন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যপদে বরণ করা হবে কেশবকে। সেই উপলক্ষে দেবেন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিরাট উৎসব। পত্রপুষ্প-পতাকা আর দীপমালার শোভা। সে শোভার সভাপতি কেশব।

কেশব ঠিক করল স্ত্রীকে নিয়ে যাবে সে সভায়। মা'র কাছে অনুমতি চাইল আগের রাত্রে। বীর-বিপ্লবীর মা সারদাসুন্দরী, অনুমতি দিলেন। স্ত্রী তো শয্যাসঙ্গিনী নয়, স্ত্রী সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে যাবে ঠিক সীতার মত।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেয়ের দল ধমকালো সারদা-সুন্দরীকে। 'বউকে সেতখনার মধ্যে বন্ধ করে রাখো। নইলে জাত-কুল সব যাবে।' সে কথা কানে নিলেন না মা। কিন্তু গৃহস্বামী হরিমোহনের আদেশ আরো দুর্দান্ত। ফটকের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। সর্বক্ষণ মোতায়েন রাখো দারোয়ান। স্ত্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কেশব। বললে, 'হয় আমার সঙ্গে

চলো, নয় পরিবারের গুরুজনদের সঙ্গে থাকো। এই শুভমুহূর্ত—দ্বিধা করবার, দেরি করবার সময় নেই।' পঞ্চদশী কিশোরী বধূ স্বামীর সহগামিনী হল।

পরিচিত প্রাচীন চাকর, সেও পর্যন্ত শাসন করে উঠল: 'আরে, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, তুমি কোথা যাও?'

বন্ধ ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। স্ত্রীকে পাশে পেয়ে কেশবের শক্তি দ্বিগুণ দুর্জয় হয়ে উঠল। রূঢ় ধমক দিল দারোয়ানকে: 'খোলো দরজা।' সম্মুঢ়ের মত দরজা খুলে দিল দারোয়ান। বাড়ির কাছেই পালকির আড্ডা। একটা পালকি ভাড়া করে স্ত্রীকে বসিয়ে দিলে। নিজে চলল পায়ে হেঁটে।

শুধু বন্ধনমোচনেই নয় যোগসাধনের সহধর্মিণী। নৈনীতালের নির্জন পর্বতে সস্ত্রীক শিলাসনে বসে ধ্যান করছে কেশব। কেশবের পরনে ব্যাঘ্রচর্ম আর স্ত্রীর পরনে গৈরিক। মহাদেবের অপর্ণা।

উৎসবগৃহে বিচিত্র আমিষ-ভোজ্যের আয়োজন হয়েছে। অশাস্ত্রীয় মাংস। কেশব ইংরিজি শিখে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, আহারব্যাপারে নিশ্চয়ই তার কুসংস্কার নেই। কিন্তু যে আমিষবস্তুই কাছে আনে কেশব বলে, খাই না। ক্ষুব্ধ হলেন দেবেন ঠাকুর। কিন্তু উপায় কি! বাড়ির ভিতর রুগীর জন্যে তৈরি কিছু নিরামিষ রান্না ছিল তাই দেওয়া হল কেশবকে। তাতেই কেশবের অখণ্ড তৃপ্তি। তার তো আহার নয়, তার আহুতি। সে যে কর্মজ্ঞানমার্গ থেকে চলে আসবে ভক্তিমার্গে। সে তো শুধু ভাঙবার জন্যে নয়, বাঁধবার জন্যে, কাঁদবার জন্যে।

ব্রাহ্মসমাজে খোল করতাল ঢোকাল কেশব। নিন্দা কুৎসা উপহাস করতে লাগল সকলে। কিন্তু স্বদেশের ধর্মপ্রকৃতির নিগূঢ় মর্মটি ঠিক বুঝতে পেরেছে কেশব। হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে হবে, ভক্তিকে প্রগাঢ় করতে হবে ভালোবাসায়। ছাড়তে যেমন বিদ্রোহী ধরতেও তেমনি। কীর্তনরসে কঠোর ব্রাহ্মধর্মকে রসসিঞ্চিত করলেন। আগে ছিলেন যীশুখৃষ্ট এখন 'প্রমত্ত মাতঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ।'

হেসেছে কেঁদেছে নেচেছে! জগজ্জনকে মাতিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরনেশায় বিভোর করেছে! হায় হায় সে-কেশবের এই দশা! কোথায় সেই কনককান্তি, সেই বিদ্যুৎ-উন্মেষ-দৃষ্টি। সেই বাগবজ্রে বংশীধ্বনি!

দল—দলই ওকে দ'লে দিয়েছে। লাট করে ফেলেছে। ভগবান যোগ করতে গিয়ে ও দলের সঙ্গে যোগ দিলে! ওরে যোগ মানে সমষ্টিকরণ নয়, ইষ্টিকরণ। যোগাড় করা বা যোগান দেওয়া নয়, শুধু ভগবানে মনোযোগ।

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না।' নব্যবাঙলার মাতব্বর ছোকরাদের বলছেন ঠাকুর: 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই যে কথায় আছে না—যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরানি। তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিল কেশব সেন।'

কেশব সেন বলে ছল বলরামকে, 'তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে। তাই অত ঘাটাঘাটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভালো একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ফুল দেবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে—'

তাতে আবার একজন রাগ করল,। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, 'আমরা তো আর কেশববাবু নই যে তাঁর মত আপনাকে দেখব। না হয় কাল থেকে আপনাকে আর বিরক্ত করতে আসব না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।'

কেশব দেয়াল ধরে-ধরে টলতে-টলতে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না। কখন ইতিমধ্যে কৌচ ছেড়ে নিচে নেমে বসেছেন ঠাকুর। কেশবও তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে।

ঠাকুরের ভাবাবস্থা। মা'র সঙ্গে কি কথা কইছেন আপন মনে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি।' চেঁচিয়ে বলতে লাগল কেশব। ঠাকুরের বাঁ হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতে। হাত বুলুতে লাগল।

ঠাকুর তখন মাতোয়ারা। বলছেন ভাবারূঢ় হয়ে: 'যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলেই এক চৈতন্য। ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকেবেঁকে ঘুরে আসতে হত, এক রাজ্যের পথ। বন্যে এলে একাকার। তখন সোজা নৌকো চালিয়ে দিলেই হল।'

চোখ চাইলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কলকাতায় এলে ডাব-চিনি-দিয়েছিলুম সিদ্ধেশ্বরীকে। মা'র কাছে মেনেছিলুম, যাতে অসুখ সেরে যায়।'

কিন্তু এবার, এবার কি মানেননি?

৯৬

ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দটা হল সাকার ভাব। তারপর ঢং-এর অংটি থেকে গেল অনেকক্ষণ। ঐ অংটি হল নিরাকার। ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন ঠাকুর।

'নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। বাণ শিখতে হলে আগে কলাগাছ তাক করতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সলতে। তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি।'

এক সন্নেসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছে। গিয়ে সন্দেহ হয়েছে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতের দণ্ড ঠেকিয়ে দেখতে গেল তাঁর গায়ে লাগে কিনা। একবার দেখল লাগল, আবার দেখল লাগল না। একবার দেখল মূর্তি, আবার দেখল অমূর্তি। ঘট আর আকাশ। ঢং আর অং। সন্নেসী বুঝল ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। কাঠ মাটি মনে কোরো না সাকার মূর্তিকে। শোলার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে, বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন বাপকে মনে পড়ে, তেমনি। প্রতিমায় সত্যের উদ্দীপনা। রূপের মধ্যেই অরূপরতন। ভক্তির জন্যে

সাকার, মুক্তির জন্যে নিরাকার। মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, ঈশ্বরকে ফিরতে হয় না সঙ্গে-সঙ্গে। ভক্তি দেওয়াই কঠিন, ছুটি পায় না ভগবান, লেগে থাকতে হয় সব সময়। তাই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, ভক্তি দিতে কাতর হই। এমনি কত কথা বলে যাচ্ছেন ঠাকুর। প্রিয়তন্ময়ের মত শুনছে কেশব সেন।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই করো। আনন্দময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেথা ইচ্ছে সেথা যাও।

'দেখনি ময়রার দোকানে ছানা চিনি মিশিয়ে একটা ঠাশা তৈরি করে। পরে তা থেকেই তৈরি হয় গোল্লা আর বরফি, তালশাঁস আর আতা সন্দেশ। ছানা চিনির রূপান্তরে যেমন নানান রকম সন্দেশ, তেমনি ভাব ভক্তির রূপান্তরে নানান রকম বিগ্রহ—শিব, দুর্গা, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। পলতা থেকে কলকাতাতে যে জল আসে রাস্তায় আর বাড়িতে, তা একই জল, কিন্তু সে কলের জল কোথাও পড়ছে সিংহের মুখ দিয়ে, কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে। নানা রূপে ঈশ্বরই খেলা করছেন।'

যাই বলো, দল চাই নে, চাই উদারবুদ্ধি। গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চে কলমির দল। স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদার-বুদ্ধির দল নেই। এত কথা বলছেন, একবারও জিগগেস করছেন না, কেশব তুমি কেমন আছ? কেবল ঈশ্বরের কথা। নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনো জিগগেস করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি?

প্রতিমায় পুজো হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? তিনিই তো মানুষ হয়ে লীলা করছেন। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি, তাঁর নিত্য লীলা চমৎকার।'

তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম। বেলপাতা তুলতে গেলুম সে দিন। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে খানিকটা আঁস উঠে এল। দেখলুম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। ফুল তুলতে গিয়ে দেখি, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পুজো হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।

হাসিমুখে তাকালেন কেশবের দিকে। বললেন, 'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে।'

উৎসুক হয়ে তাকালো কেশব।

'শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই এই অবস্থা। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পর শরীরে এসে আঘাত লাগে। দেখনি সেই গঙ্গার উপরে বড় জাহাজ? বড় জাহাজ যখন গঙ্গা দিয়ে চলে যায়, তখন প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। শেষে, ওমা দেখি, পাড়ের গায়ে জল ধপাস-ধপাস করছে, আর পাড়ের খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়েঘরে হাতি ঢুকলেও এমনি হয়। কুঁড়েঘরে হাতি ঢুকলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহঘরে প্রবেশ করেছে। তোলপাড় করে ভেঙে দেবে না তো কি!' কেশব চক্ষু নত করল।

'হয় কি জানো ? আগুন লাগলে কতগুলো জিনিস পুড়িয়ে-টুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হৈহৈ কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথম কাম ক্রোধ এই সব রিপু নাশ করে, পরে অহংবুদ্ধির উৎখাত হয়। তারপর তোলপাড় !' ঠাকুর থামলেন একটু। বললেন, 'তুমি মনে করছ, সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি একবার নাম লেখাও, আর চলে আসবার যো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ছেড়ে দেবে না ডাক্তার সাহেব। তুমি নাম লেখালে কেন ?'

কেশব হাসতে লাগল। হাসপাতালে উপমাটি বড় ভালো লেগেছে।

কত রুগী হাসপাতালে ঢোকে এসে জাঁক করে। কিন্তু যখন দেখে ইনচার্জ ডাক্তার কিছুতে ছাড়ে না তখন একদিন ফাঁক বুঝে চম্পট দেয়। কেউ বা আবার চাদর বালিশ নিয়ে সরে পড়ে। কোথায় রোগ সারাবে, তা নয় চুরি করে। ধর্মপথে এসে আবার জাহান্নমে যায়।

'তখন আমার দারুণ অসুখ। মাথায় যেন দুলাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। নাটাগড়ের রাম কবরেজ দেখতে এল। সে এসে দেখে আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল ! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে !'

যে খানদানি চাষা, সে চাষ করাই চায়, হাজা-শুকো মানে না। আর কিছু জানে না সে চাষ ছাড়া। তেমনি জীবনের দৈন্য-দুর্ভিক্ষেও হরিনাম ছাড়ে না। মা যদি সন্তানকে মারে, সন্তান মা-মা বলেই কাঁদে। গলা ধরে যদি ফেলেও দেয় তবুও তার মা-মা ডাক। সে তো আর যাকে-তাকে মা বলছে না, তার মাকেই মা বলছে। তাই ছন্দে একটি মন্ত্র বাঁধলেন ঠাকুর। 'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

দুঃখ তো শরীরের ব্যাপার, আর মন, তুমি তো আনন্দের মৌচাক। দুঃখের হুলেই এই মধুকণা সঞ্চিত হচ্ছে। সারা জীবনই তো দুঃখ—রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা। যারা বলে আগে দুঃখ দারিদ্র্য যাক, পরে ঈশ্বরভজন করা যাবে, তারা সেই সমুদ্র-স্নানার্থী তীর্থবাসীর মত। ভাবছে, সমুদ্রের ঢেউ আগে থামুক, পরে স্নান করে নেব। হায়, সমুদ্রের ঢেউ কোনোদিন থামবে না, স্নানও হবে না সেই তীর্থংকরের। ঢেউয়ের মধ্যেই স্নান করে নিতে হবে। দুঃখের মধ্যেই নিতে হবে আনন্দস্পর্শ। এ তো দুঃখের ঢেউ নয়, এ হচ্ছে সুখস্বপ্নরসরাশির ঢেউ।

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন হরিকথামৃতপান হয় না সেদিনই দুর্দিন।

'তোমার শেকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্ছে।' কেশবের দিকে আবার তাকালেন ঠাকুর। 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শেকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভালো করে গজাবে। তাই এই হুলুস্থুল।'

কেশবের মা দাঁড়ালেন এসে দরজার পাশে।

'মা আপনাকে প্রণাম করছেন।'

আনন্দে হাসলেন ঠাকুর।

'মা বলছেন কেশবের অসুখটি যাতে সারে।' কে একজন বললে মায়ের হয়ে। ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো। তিনিই দুঃখ দূর করবেন।' পরে লক্ষ্য করলেন কেশবকে : 'বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। যেখানে যত বেশি ঈশ্বরীয় কথা সেখানেই তত বেশি আরাম। দেখি, তোমার হাত দেখি।' কেশবের একখানি হাত তুলে নিয়ে ওজন করতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন, 'না তোমার হাত হালকা আছে। যারা খল তাদের হাত ভারি হয়।'

সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মা বললেন, 'কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

ঈশ্বর দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দু ভাই জমি বখরা করে, আর দড়ি মেপে বলে, এ দিকটা আমার, ও দিকটা তোমার। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে আমার আমার করছে। আরো একবার হাসেন। ছেলের সংকটাপন্ন অসুখ। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলে, ভয় কি মা, আমি ভালো করব। বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।'

কেশবের একটা কাশি উঠল। সে কাশি আর থামে না। কঠিন কষ্টকর কাশি। বুকের মধ্যে ব্যথার ধাক্কা লাগছে সকলের। বেগটা একটু থামল। থামতেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। দেয়াল ধরে-ধরে চলে গেল আপন ঘরে। তার শেষ শয্যায়।

কেশবের বড় ছেলেটিকে ঠাকুরের পাশে এনে বসাল অমৃত। বললে, 'এইটি কেশবের বড় ছেলে। আপনি আশীর্বাদ করুন। ও কি, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন।'

'আমার আশীর্বাদ করতে নেই।' বলে ছেলেটির সর্বাঙ্গে হাত বুলুতে লাগলেন ঠাকুর। অমৃত বললে, 'আচ্ছা, তবে গায়ে হাত বুলোন।'

সে হাত মানেই তো অপরিমেয় করুণার পারাবার।

'অসুখ ভালো হোক, ও সব কথা আমি বলতে পারি না। ও ক্ষমতা আমি মা'র কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

কেশবকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি কি কম লোক গা! যারা টাকা চায় তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশবের যাবার কথা—কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর-বার করছে, কখন কেশব আসেন।' মিষ্টিমুখ করলেন ঠাকুর। এইবার উঠবেন গাড়িতে। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে এসে তুলে দিচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখলেন, নিচে আলো নেই। বললেন ঠাকুর, 'এ সব জায়গায় ভালো করে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। দেখো এ রকমটি যেন হয় না আর কোনোদিন।'

এলোপ্যাথিতে কিছু হচ্ছে না। ডাকা হল মহেন্দ্রলাল সরকারকে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। তবু তারই মধ্যে বাড়ির এক পাশে দেবালয় তৈরি করাল।

প্রতিষ্ঠার দিনে, উত্থানশক্তি নেই, তবু জোর করে নেমে এল নিচে। একটা চেয়ারে বসিয়ে চার-পাঁচজনে ধরে নামাল অতিকষ্টে, বেদী এখনো শেষ হয়নি, না হোক, যা হয়েছে এই বেদীতে বসেই আমি উপাসনা করব।

এসেছি মা, তোমার ঘরে। ওরা আসতে বারণ করেছিল, কোনোমতে শরীরটা এনে ফেলেছি। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। আমার বড় সাধ ছিল কয়েকখানা ইট কুড়িয়ে এনে তোমাকে একখানা ঘর করে দি। তুমি মা নিজেই স্বহস্তে ইট কুড়িয়ে এনে এই প্রশস্ত দেবালয় করিয়ে দিলে। এখন বড় সাধ, ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, আমার কাশী মক্কা, আমার জেরুশালেম। মা আমার দয়া, মা আমার পুণ্যশান্তি, আমার শ্রীসৌন্দর্য, আমার সম্পদস্বাস্থ্য। বিষম রোগযন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা।

রোগের তাড়নায় দিন-রাত আর্তনাদ করছে কেশব। সে নিদারুণ বেদনার নিবারণ নেই। শরীরের রক্ত দিলে যদি উপশম হত, শত-শত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

মা, আমার মুখ যেন তোমার নিন্দা না করে, তুমি আমাকে ভেঙে-ভেঙে তোমার কোলের মধ্যে টেনে নিচ্ছ মা।

'বাবা, আমার শাপেই তোমার এত যন্ত্রণা—' সারদাসুন্দরী বললেন কাঁদতে-কাঁদতে। মায়ের বুকে মাথা রাখল কেশব। বললে, 'এমন কথা তুমি মুখেও এনো না। তোমার মত মা কে পায়? তুমি আমার বড় ভালো মা, তোমার গর্ভে জন্মেই তো আমি এত ভালো হতে পেরেছি—'

কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হল ঠাকুরকে। ঠাকুরের মনে হল, একটা অঙ্গ যেন পড়ে গেল। এমন কম্প এল যে লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন। তারপর তিনদিন বেহুঁশ।

সিঁদুরেপটির মণি মল্লিকের ছেলেটি মারা গেছে। উপযুক্ত ছেলে—এ শোক রাখবার জায়গা নেই। ছেলেকে শ্মশানে পুড়িয়ে রেখে ঠাকুরের কাছে সটান এসে উপস্থিত। ঘরভরা লোক। সব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তার দিকে। ঠাকুরেরও চোখ পড়ল, জিগগেস করলেন, 'কি গো, আজ অমন শুকনো দেখছি কেন?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মণি মল্লিক। বললে, 'আমার ছেলেটি আজ মারা গেল। আসছি সব শেষ করে।'

সহসা সমস্ত ঘর বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ক্রমে-ক্রমে নানা জনে নানা রকম সান্ত্বনার কথা আওড়াতে লাগলো। সব মামুলি, বাজে কথা। কিন্তু ঠাকুর তো কিছু বলছেন না। এই দারুণদহন শোকে তাঁর কি একটু মৌখিক সহানুভূতিও পাওয়া যাবে না? ঠাকুর এত হৃদয়হীন। বুড়ো মণি মল্লিক আকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। ঠাকুর দুটো মিষ্টি কথাও বলবেন না এ কঠোরতা যেন পুত্রশোকের চেয়েও দুঃসহ। কেঁদে-কেঁদে শোকের কলসী খালি করল মণি মল্লিক। তখন সহসা তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তেজের সঙ্গে গান ধরলেন ঠাকুর :

জীব সাজো সমরে।
ঐ দ্যাখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহা পুণ্যরথে
ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে,—
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান
ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ করো রে ॥

মণিমোহন স্তব্ধশোক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে পুত্র? কার পুত্র? কার জন্যে এই শোক? সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর বললেন, 'পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? তবে কি জানো? যারা ঈশ্বরকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই ফের সামলে নেয়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলোই একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে, তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় স্টিমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে, মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনোখানা বা উলটেই গেল। আর বড়-বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু-চারবার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি স্থির হলো। দু-চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।'

ঠাকুরের স্বরে বিষাদ গাম্ভীর্য। 'মানুষ সুখের আশায় সংসার করে। বিয়ে করল ছেলে হল, সেই ছেলে আবার বড় হল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটার বিসুখ, এটা মলো ওটা বয়ে গেল, ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত। যত রস মরে তত একেবারে দশ ডাক ছাড়তে থাকে। দেখনি? ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরির চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে, কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ ফুস-ফাস নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।'

'এই জন্যেই তো আপনার কাছে ছুটে এলাম। বুঝলুম, এ জ্বালা শান্ত করবার আর লোক নেই।'

ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে-মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসে। সকলের জিনিস খেতে পারেন না ঠাকুর। বিশেষত ডাক্তার, কবরেজ বা ধাত্রীর। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তারা টাকা নেয় তার জন্যে।

'ভুবন এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।' বলছেন অধর সেনকে। 'আমায় বললে, আপনি একটা আঁব খাবে? আমি বললাম, আমার পেট ভার। আর, সত্যিই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে।' অন্য কথায় গেলেন তখুনি। 'কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল। তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি। ভারি শোক পেয়েছে।'

সেদিন আবার বললেন মাস্টারমশাইকে। 'কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি

দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি।'

৯৭

সমরসজ্জায় সেজে শোক তাড়ালেন ঠাকুর। বীরবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে। পরাস্ত, পরাভূত করে। কিন্তু মা, শ্রীশ্রীমা কি করে তাড়ালেন?

'মাঝি-বউ অনেক দিন আসে না। তার খবর কেউ জানো তোমরা?' মা যখন জয়রামবাটিতে, জিগগেস করলেন একদিন।

কোয়ালপাড়ার মজুরনী। চিনতে পেরেছে সবাই। কিন্তু খবর রাখে না কেউ। সংসারে এত খবর থাকতে কোন মজুরনীর খবর! বলতে-বলতেই মজুরনী এসে হাজির। কোয়ালপাড়ার হাটে মস্ত বাজার করে কে এক ভক্ত তার মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়েছে। তাই বয়ে নিয়ে এসেছে ধুঁকতে-ধুঁকতে। এ কেমন চেহারা! রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছে মজুরনী। ধুলো-মাখা রুখু চুল, গভীর গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে চোখ, কেমন সর্বশূন্য চাউনি। হাঁটু দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, যেন হাতের লাঠি কেউ কেড়ে নিয়েছে জোর করে। 'এ তোমার কী হয়েছে মাঝি-বউ?'

'মা গো, আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।'

'বলো কি মাঝি-বউ?' এক মুহূর্তও স্তব্ধ থাকলেন না শ্রীমা, ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আকুল, অন্ধ আর্তনাদ। উপরে আকাশ, সামনে দিগন্ত পর্যন্ত রেখা টানা সে আর্তনাদের। কখনো লুটিয়ে পড়ছেন মাটিতে, কখনো বা কাঁদছেন বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে। জগতের সমস্ত মৃতপুত্রা জননীর শোক নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ধুয়ে দিচ্ছেন নিরর্গল অশ্রুজলে। মাঝি-বউ তো অবাক। যেন তার ছেলে মরেনি, মা'র ছেলে মরেছে! কোথায় মা তাকে সান্ত্বনা দেবেন, উলটে এখন তাকেই সান্ত্বনা দিতে হয়।

যেমন বুদ্ধদেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন উব্বিরীকে। কোশলের রানি উব্বিরী। অচিরাবতীর তীরে কাঁদছে অঝোরে।

'এখানে বসে কে কাঁদছ?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'এ যে শ্মশান—'

'এই শ্মশানেই আমার মেয়েটিকে ছাই করে দিয়েছি।'

'কোন্ মেয়ে?'

জলভরা চোখে তাকালো একবার উব্বিরী। কোন্ মেয়ে! একটি বই আমার আর মেয়ে কোথায়!

'চুরাশী হাজার মেয়ে এই চিতার ভস্মে ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি চিরন্তনী জননী, তুমি কার জন্যে, তোমার কোন্ মেয়েটির জন্যে কাঁদছ? কত তো কাঁদলে

জন্ম-জন্ম ধরে, কেউ ফিরে এল, চিনতে পারলে কাউকে ? যদি চুরাশী হাজার মেয়ে চিতাশয্যা ছেড়ে জেগে ওঠে চোখের সামনে, চিনতে পারবে মেয়ে বলে ?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল উর্ব্বরী।

'পথিক যেমন চলতে-চলতে তরুতলে আশ্রয় নেয় তেমনি তারা তোমার অঙ্কচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলো। ক্ষণমুগ্ধা, ভেবেছিলে ওদের উপর তোমার বুঝি শাশ্বত অধিকার। কিন্তু চেয়ে দেখ, সবই অচিরস্থায়ী, শ্মশান-নদীর নামটিও অচিরাবতী। সংসারে শুধু এক বস্তু সার জেনো। সে হচ্ছে যাত্রা, অনন্তযাত্রা। তুমিও চলেছ অনন্ত পথে, তোমার মেয়েরাও তেমনি। শুধু এগিয়ে যাওয়া, নিবতে-নিবতে শেষ জ্বলে ওঠা।'

চোখের জল মুছল উর্ব্বরী। কিন্তু শ্রীমা'র কান্নার বিরাম নেই। উর্ব্বরী কেঁদেছিল নিজের কন্যার শোকে। শ্রীমা কাঁদছেন পুত্রহারা মজুরনী মাঝি-বউ হয়ে। শ্রীমাই চিরন্তনী মা। শোকের বেগ কমে এলে নবাসনের বউকে নারকেল তেল আনতে বললেন। তেল এনে ঢেলে দিলেন মাঝি-বউয়ের মাথায়। হাত চাপড়ে-চাপড়ে মাখিয়ে দিলেন ভালো করে। আঁচলে বেঁধে দিলেন মুড়ি-গুড়। যাবার সময় বললেন, 'আবার আসিস মাঝি-বউ।'

মাঝি-বউ মৃদু হাসির ঝিলিক দিল। তার আর শোক নেই। ঠাকুর শোক তাড়িয়ে দেন। আর মা শোক শুষে নেন।

আরেক ভাবে বলি। ঠাকুর দুঃখকে ঠেলে দেন। মা নেন টেনে।

কিন্তু ও আমার কে ? রামলালের বিয়ে, সারদা চলেছে কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ঠাকুর। যতদূর চোখ যায়। ভাবলেন ও আমার কে ! খেতে বসেছেন ঠাকুর। বলরাম কাছে ব'সে। আরো হয়তো কেউ-কেউ।

'আচ্ছা আবার বিয়ে কেন হল বলো দেখি ? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল ? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন ?

বলরাম হাসল একটু মুখ টিপে।

'ও, বুঝেছি।' থালা থেকে এক গ্রাস ভাত তুললেন ঠাকুর। বলরামের দিকে ইশারা করলেন। 'এই, এর জন্যে হয়েছে। নইলে কে আর অমন রেঁধে দিত বলো ! কে আর অমন করে খাওয়াটা দেখত ! ওরা সব আজ চলে গেল—'

কে চলে গেল !

রামলালের খুড়ী গো ! রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব গেল কামারপুকুর। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম। কিছুই মনে হল না। সত্যি বলছি, যেন কে তো কে গেল ! কিন্তু তারপর ভাবনা হল কে এখন রেঁধে দেয়।' আবার বললেন আপন মনে : 'সব রকম খাওয়া তো পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও বোঝে কি রকমটি ঠিক সয়। এটা ওটা করে দেয়। তাই মনে হল, কে করে দেবে !'

অপূর্ব মমতা। সর্বঢালা নির্ভরতা। শিখিয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে : 'গাড়িতে বা নৌকোয় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনো

জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে।' ভাবে আছি বলে বাস্তব ভুলব কেন ?

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে রামলাল আর যোগীন। সকালবেলা। যাচ্ছেন ঘোড়ার গাড়িতে। গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের ফটক পর্যন্ত এসেছে, জিগগেস করলেন যোগীনকে, 'কি রে, নাইবার কাপড়-গামছা এনেছিস তো ?'

'গামছা এনেছি। কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে।' কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল যোগীন। "তা, বলরামবাবুরা আপনার জন্যে একখানা নতুন কাপড় দেখে-শুনে দেবে খন।'

'সে কি কথা ? সবাই বললে কোত্থেকে একটা হাবাতে এসেছে। কে জানে, তাদের কষ্ট হবে, হয়তো আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ি থামিয়ে নেমে নিয়ে আয় গে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যোগীন ছুটল ফের কাপড় আনতে।

'ভালো লোক লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়িতে এলে সব বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাউকে কিছুতে বেগ পেতে হয় না।' বললেন ঠাকুর, 'আর হাবাতে হতচ্ছাড়া-গুলো এলে সব বিষয়ে বেগ পেতে হয়। যেদিন ঘরে কিছু নেই সেদিনই এসে হাজির হয় হতচ্ছাড়ারা।'

ঠাকুরের সঙ্গে হাজরাও মাঝে-মাঝে আসে কলকাতায়। কিন্তু সেবার সেও ফেলে গিয়েছিল গামছা। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে হুঁশ হল।

'কই আমি তো নিজের গামছা বা বটুয়া একবারও ভুলে ফেলে আসি না! ভগবানের নামে কাপড় থাকে না পরনে, কিন্তু ভাবমুখ ছেড়ে বাস্তবমুখে এসে কড়াক্রান্তির ভুলচুক নেই। আর তোর একটু জপ করেই এত ভুল!'

ভক্ত হয়েছিস বলে ভুলো হবি কেন ? বোকা হবি কেন ?

কে কাকে ভক্তি করে!

'ভক্ত আপনাকে আপনি ডাকে।' বললে প্রতাপ হাজরা।

'এ তো খুব উঁচু কথা। আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সবই হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যেই শরীর।' সার্থক উপমা দিলেন ঠাকুর : 'যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ ছাঁচের দরকার। হয়ে গেলে ফেলে দাও মাটির ছাঁচ। ঈশ্বরদর্শন হলে কি হবে আর শরীর দিয়ে ?'

তিনি শুধু অন্তরে নন, অন্তরে-বাহিরে। নয়নের সম্মুখে শুধু নন, নয়নের মাঝখানে।

লক্ষ্মী এসেছে এবার। রামেশ্বরের মেয়ে, রামলালের আপন বোন। এগারো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছে। বিয়ে হয়েছে ধনকৃষ্ণ ঘটকের সঙ্গে। সেবার রামেশ্বরের অস্থি নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে রামলাল, ঠাকুর জিগগেস করলেন, কেমন আছে লক্ষ্মী ? 'তার বিয়ে হয়েছে।' বললে রামলাল।

'বিয়ে হয়েছে ? সে বিধবা হবে।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ঠাকুরের।

হৃদয় কাছে বসেছিল, ফোঁস করে উঠল। 'তাকে আপনি এত ভালোবাসেন, তার বিয়ে হয়েছে শুনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবেন, তা নয়, কি একটা ছাইভস্ম কথা বলে ফেললেন।'

'কি বললাম বল তো!' ঠাকুর তাকালেন শূন্যচোখে।

'কি মাথামুণ্ডু বললেন! শুনে আর কাজ নেই।'

'কি করবো! মা বলালেন যে!' ঠাকুর বললেন গম্ভীর কণ্ঠে: 'লক্ষ্মী মা-শীতলার অংশ। ভারি রোখা দেবী, আর যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে সামান্য জীব। সে পুড়ে যাবে। সামান্য জীবের ভোগে আসতে পারে না লক্ষ্মী।'

ধনকৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোথায় কি কাজের সন্ধানে যাচ্ছে বলে বেরুল আর ফিরল না। বারো বছর কেটে গেল। কুশপুত্তলিকা দাহন করে শ্রাদ্ধশান্তি করে খোলসা হল লক্ষ্মী। শ্বশুরবাড়ির কিছু সম্পত্তি তার ভাগে পড়েছে। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'কোনো সম্পত্তি জোটাসনি, আঁটকুড়ের আবার সম্পত্তি কি!'

সরিকদের নামে লিখে দিল অংশ।

'ধর্মকর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে-তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবিনে। কার পাল্লায় পড়বি কে জানে। আর ঐ খুড়ির সঙ্গে থাকবি। বাইরে বড় ভয়।' বললেন সারদাকে, 'লজ্জাই নারীর ভূষণ। বল্ না লক্ষ্মী সেই পদটি—অবলার অবলায় বুদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি।'

নহবৎখানায় প্রতিষ্ঠা হল সারদার। লজ্জারূপেণ সংস্থিতা। দরমার-বেড়ায় আঙুল-প্রমাণ ছেঁদা হয়েছে একটা। তারই উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে সারদা। পাশ থেকে কখনো বা লক্ষ্মী। মন্দিরের প্রাঙ্গণে এত সব নাম-নৃত্য এত সব ভাব-ভঙ্গি, একটু দেখবে না ওরা? সেই ছেঁদা ক্রমে-ক্রমে একটু বড় হয়েছে বুঝি। ঠাকুর পরিহাস করে বললেন রামলালকে, 'ওরে রামনেলো, তোর খুড়ির পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

নবতকে বলেন খাঁচা। সারদা আর লক্ষ্মীকে, শুকসারী। নিজের ঘরে ফলমূল মিষ্টি নামলে রামলালকে বলেন, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূলে ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

ঠাকুর শুয়ে আছেন খাটের উপর। চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। খাবার রাখতে সারদা ঘরে ঢুকেছে আলগোছে। বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলে উঠলেন, 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।' ভেবেছেন লক্ষ্মী এসেছে বুঝি। 'দিচ্ছি।'

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরোনি।'

দিয়ে যাস? তুই? না, না, তুমি, তুমি। দিয়ে যেও। বন্ধ করে দিয়ে যেও দরজা। সারা রাত ঠাকুরের আর ঘুম হল না। সকালবেলা নবতে এসে হাজির। বললেন অপরাধীর মত, 'দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। কেন অমন রুক্ষু কথা বলে ফেললাম!'

বাপ নেই, মা পাগল, নাম রাধু। শ্রীমা'র ভাইঝি। কি অসুখ করেছে, তাই তার মা শ্রীমাকে গালাগাল দিচ্ছে। 'তুমিই ওষুধ খাইয়ে-খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে।' ক্রমেই গলা চড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে গালাগাল।

শ্রীমা'র অসহ্য মনে হল। বলে উঠলেন পাগলীকে লক্ষ্য করে, 'তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে পাপও নেই পুণ্যও নেই।' পরে বলছেন আপন মনে: 'আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম কখনো আমাকে তুই পর্যন্ত বলেননি। সরুচাকলি আর সুজির পায়েস তৈরি করে একদিন সন্ধের পর গেছি ঠাকুরের ঘরে। রেখে চলে আসছি, লক্ষ্মী মনে করে বলছেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। বললুম, হ্যাঁ, রাখলুম ভেজিয়ে। গলার স্বর টের পেয়ে সংকুচিত হয়ে গেলেন, বললেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো না। পরদিন নবতের সামনে গিয়ে কত অনুনয়। দেখ গো সারা রাত ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে। আর রাধুর মা কিনা আমাকে দিন-রাত গাল দিচ্ছে। কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'

কিন্তু তোর মাথায় যে আমি ফুল দিয়েছি তাতে কি কোনো কণ্টক আছে? কাঁটা না থাকবে তো কাঁদাস কেন অমন করে?

'কেন এত উতলা হন নরেনের জন্যে?' টিপ্পনী কাটে রামলাল।

'ওরে তোর ফেরেনডো যেমন রসিকলাল, নরেনের ফেরেনডো যেমন হাজরা, আমার ফেরেনডো তেমনি নরেন। বলে গেল বুধবার আসবে, ফিরে বুধবার এল তো সে এখনো এল না। তুই একবার গিয়ে খবর নিয়ে আয়, কেমন আছে।'

শেয়ারের গাড়ি না নিয়ে হেঁটেই চলে গেল কলকাতা। পাকড়ালো নরেনকে। বললে, 'কি গো, ঠাকুরকে বলে এলে বুধবারে যাবে, কত বুধবার চলে গেল, তবুও তোমার দেখা নেই।'

'যাব বলে তো ঠিক করি, কিন্তু সংসারের ঝামেলায় হয়ে ওঠে না দাদা—'

'আজই চলো।'

টেরি কেটে ওরই মধ্যে ফিটফাট হয়ে বাবু সাজল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। তার কপালের ধুলো হাত দিয়ে মুছে দিলেন ঠাকুর। মাথার টেরি উসকো-খুসকো করে দিলেন। বললেন, 'তোর আবার এ সব কেন?' পরে তাকালেন মুখের দিকে। 'আজ এখানে থাকবি তো?'

না বলতে যেন কান্না পায়। বললে, 'থাকব।'

'ওরে রামলাল, নরেন আজ থাকবে।' উল্লাসে অধীর হলেন ঠাকুর। 'তোর খুড়িকে খবর দে। ভালো করে খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। হিন্দুস্থানী রুটি আর ছোলার ডাল।'

শুধু এখানেই খাওয়ান না, নিজের হাতে খাবার নিয়ে যান কলকাতায়। একেবারে তার টঙে। তিন বন্ধুতে মিলে পড়ছে। নরেন, দাশরথি আর হরিদাস।

বাইরে হঠাৎ ডাক শোনা গেল : নরেন, ও নরেন !

নরেন ব্যস্ত হয়ে নামতে লাগল। কিন্তু ব্যস্ততর যিনি তিনি উঠে পড়েছেন। বন্ধুরা দেখল, সিঁড়ির মাঝপথে দুজনের সাক্ষাৎকার।

'এত দিন যাসনি কেন ? যাসনি কেন এত দিন ?' অনুযোগ করছেন ঠাকুর, আর গামছায় বাঁধা সন্দেশ বের করে খাইয়ে দিচ্ছেন নিজ হাতে।

'চল কত দিন গান শুনিনি তোর।'

টঙে উঠে তানপুরা নিয়ে বসল নরেন। কান মলে-মলে সুর বাঁধল। তার পর গাইল গলা ছেড়ে :

জাগো মা কুল কুণ্ডলিনী,
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী,
তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। নরেনের বন্ধুরা ভাবল হঠাৎ কোনো অসুখ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন বুঝি। জল নিয়ে এল ছুটে। ছিটে দিতে যাবে, বাধা দিল নরেন। বললে, 'দরকার নেই। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে-শুনতেই প্রকৃতিস্থ হবেন।'

যেমন বলা তেমনি। চঞ্চল গানের নির্ঝরস্রোত। ঠাকুর চলে এলেন সহজাবস্থায়। বললেন, 'যাবি, আমার সঙ্গে যাবি দক্ষিণেশ্বরে ? কত দিন যাসনি। চল না আজ। বেশিক্ষণ না হয় নাই থাকলি। আবার না হয় ফিরে আসবি এখুনি। যাবি ?'

যাব। ঠাকুরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নরেন। পড়ে রইল বই। পড়ে রইল তানপুরা।

৯৮

শিবগুহ-র বাড়ির ছেলে অন্নদা গুহ। অন্নদার কাছে নরেন আজকাল খুব বেশি আনাগোনা করছে। হাজরা নালিশ করল ঠাকুরকে।

'নরেন অন্নদা এক আফিসওয়ালার বাসায় যায়।' বললেন ঠাকুর। 'সেখানে তারা ব্রাহ্মসমাজ করে।'

'বামুনেরা বলে, অন্নদা গুহ লোকটার বড় অহঙ্কার।'

'বামুনদের কথা শুনো না।' ঠাকুর পরিহাস করলেন। 'তাদের তো জানো, না দিলেই খারাপ লোক, দিলেই ভালো। অন্নদাকে আমি জানি, ভালো লোক।'

'শুনলাম বেশ কঠোর করছে আজকাল।' হাজরা বললে। 'সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। ভাত খায় চারদিন অন্তর।'

'বলো কি !' যেন একটু আশ্চর্য হলেন ঠাকুর।

শেষে বললেন আত্মস্থের মত : 'কে জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায় ।'

'অন্নদার বাড়িতে নরেন আগমনী গাইলে ।'

'সত্যি ?' ঠাকুর যেন খুশি হলেন। নিরাকার থেকে সাকারে আসছে নরেন ? জ্ঞানের প্রাখর্য থেকে ভক্তির স্নিগ্ধতায় ? বলতে-বলতেই নরেন এসে হাজির।

'তুই আগমনী গেয়েছিস ? কি রকম গাইলি ? গা না একটিবার—'

নরেনকে নিয়ে বাইরে এলেন ঠাকুর। গোল বারান্দা পেরিয়ে গঙ্গার পোস্তার উপরে এলেন। 'গা—না—'

নরেন গান ধরল :

> কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বলমা তাই।
> কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই ॥
> চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে
> তুই না কি মা তারি সঙ্গে সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই ॥
> কেমনে মা ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে—
> এবার নিতে এলে পরে বলব উমা ঘরে নাই ॥

সেই অন্নদা গুহ একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'তুমি তো নরেনের বন্ধু ?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'জানো তো ওর বাবা মারা গেছে—'

মাথা হেঁট করে রইল অন্নদা।

'ওদের বড় কষ্ট। দিন চলে না। এখন বন্ধুবান্ধবরা যদি কিছু সাহায্য করে তো বেশ হয়।'

'অন্নদা চলে গেলে ঠাকুরকে বকতে লাগল নরেন। সে কি কড়া-কড়া কথা !

'কেন, কেন আপনি ওর কাছে ও সব কথা বলতে গেলেন ?'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে মানে ? আমার দুঃখ-দৈন্যের কথা যার-তার কাছে বলে-বলে বেড়াবেন ? আমার কি একটা মান নেই ? আমি কি ভিখিরি ?'

বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'ওরে তুই ভিখিরি হবি কেন ? আমি ভিখিরি হব। আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করব তোর জন্যে।'

কিন্তু দুঃখ-কষ্টে দেহই যদি না থাকে তবে সবই বৃথা।

'বাঁচবার ইচ্ছে কেন ? কেন দেহের যত্ন করি ? ঈশ্বর নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নাম-গুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী-ভক্ত দেখে-দেখে বেড়াবো।' ত্রৈলোক্য সান্যালকে বলছেন ঠাকুর : 'তাই মাকে বলেছিলাম, মা একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি, এখানে-ওখানে যেতে পারি, সঙ্গ করতে পারি জ্ঞানী-ভক্তদের। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু—'

তাই কোথায় কোন দোরে গিয়ে তোর জন্যে ভিক্ষে করব ?

ঠাকুরের বড় অভিমান হয়েছে মা'র উপর। নরেনের এখনো একটা হিল্লে হল না ! দিন-দিন ম্লান হচ্ছে সেই চারুকান্তি ! তাই বলছেন ত্রৈলোক্যকে : 'এই দেখ না, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়িতে বড় কষ্ট, কোনো উপায় হচ্ছে না। শুধু

দুঃখ ভোগ করছে।' একটু হয়তো থামলেন। বললেন, 'তা কি করা! ঈশ্বর কখনো সুখে রাখেন, কখনো দুঃখে রাখেন—'

'আজ্ঞে, তাঁর দয়া হবে নরেনের উপর।' যেন আশ্বাস দিল ত্রৈলোক্য।

'আর কখন হবে!' অভিমানে কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এল ঠাকুরের: 'তবে কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না! কিন্তু যাই বলো, কারু-কারু সন্ধে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।' নরেন্দ্র কাছেই ছিল, তার দিকে সস্নেহ চোখে তাকালেন ঠাকুর। 'আমি নাস্তিক মত পড়ছি।' নরেন নিস্পৃহের মত বললে।

'দুটোই আছে—অস্তি আর নাস্তি।' বললেন ঠাকুর: 'দুটোই যখন আছে, অস্তিটাই নাও না কেন?'

কী মনে হয় চারদিকে তাকিয়ে? একটা কিছু আছে? না, সমস্তই এলোমেলো, ভাঙাচোরা? ট্রেনে যেতে-যেতে দেখি মাঠের ধারে পোড়ো বাড়ি, ইটের পাঁজা ভেঙে পড়ছে, ফাটলে-ফাটলে বট-পাকুড়ের জড়িপটি। সহজেই বুঝে নিতে পারি, পরিত্যক্ত, জনশূন্য। আবার হঠাৎ কখনো আগ-রাতের দিকে চকিতে একটা আলো-জ্বলা বাড়ি চোখে পড়ে। কাউকে দেখা যায় না বটে, তেরছা আলোয় চোখে পড়ে কোনো আসবাবের টুকরো কিংবা কোনো দেয়ালের পট-পঞ্জী। কিংবা দিনের বেলায় আরেকটা বাড়িতে চোখ পড়ল, ইলেকট্রিকের তার, কিংবা জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে রেলিঙে। সহজেই বুঝে নিতে পারি, লোক আছে। শ্রী আছে, শৃঙ্খলা আছে, স্থিতি-গতি আছে। তেমনি পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে কি মনে হয় এ একটা দেয়ালে-গাছ-গজানো পোড়ো বাড়ি, না, আলো-জ্বলা গানের পরশলাগা আনন্দ-নিকেতন? হয় নীতি, নয় শক্তি, নয় শৃঙ্খলা—একটা তো কিছু আছে। অন্তত একটা ধারাবাহিকতা। অন্তত একটা পুনরাবৃত্তি। থাকাটাই যদি সত্যি হয় তবে তাই, তাই ভগবান।

'কিন্তু ভগবান তো ভক্তকে দেখবেন।' সুরেশ মিত্তির বললে নরেনের পক্ষ হয়ে। নইলে তাঁকে ন্যায়পরায়ণ বলি কি করে?'

সেই তো মায়া। ঈশ্বরের কাজ বুঝি এমন আমাদের সাধ্য কি। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে। পাণ্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পর দেখেন, ভীষ্মদেব কাঁদছেন। কি আশ্চর্য! পাণ্ডবেরা প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে—পিতামহ অষ্টবসুর এক বসু, এঁর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না। ইনিও মৃত্যুর মায়াতে কাঁদছেন? তারই জন্যে কি? জিগগেস করো ভীষ্মকে। জিগগেস করাতে ভীষ্মদেব বললেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরের কাজ কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন সেই পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই। যখনই এই কথা ভাবি তখনই কাঁদি। এই ভেবে কাঁদি ঈশ্বরের কার্য বোঝবার যো নেই।'

'একটু গা না—' বললেন ফের নরেনকে।

'ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।' ঘুরে দাঁড়াল নরেন।

ঠাকুর অভিমানের সুর মিশিয়ে বললেন, 'তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন? যার আছে কানে সোনা তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা,

তার কথা কেউ শোনে না।'

সকলে হেসে উঠল।

'তুমি বাবু গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে। এ কথা বলতুম না—তা তুই কেঁড়েলি করলি কেন?'

নরেন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। শেষে বললে, 'যন্ত্র নেই। শুধু গান—'

'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!'

'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার—' গান ধরল নরেন। ভাবাবেশে তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। দেখে ঠাকুরের মহানন্দ! নরেন কি তবে ধ্যানের পথে? সমাধির পথে? যিনি নাদরহিত, ব্যঞ্জনরহিত, স্বররহিত, উচ্চারণরহিত—নরেন কি সেই ব্রহ্মের সন্ধানে? যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, কাঠের মধ্যে আগুন তেমনি শরীরের মধ্যে আত্মা। সর্বব্যাপী, সর্বস্বরূপ। স্নেহস্বরূপ, স্বাদস্বরূপ, সৌরভস্বরূপ। বাতাস যেমন আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশ্বরও হৃদয়ে ব্যাপ্ত আছেন। হৃদয়ই আকাশ। বাতাস আর ঈশ্বর দুই-ই নিশ্বাসবস্তু। এই হৃদয়াকাশেই ধরতে হবে সেই সমীরণকে। নরেন কি সেই হৃদয়াকাশের অভিযাত্রী?

'লাল জ্যোতি দেখলুম।' ঠাকুর বলছেন তার আশ্চর্য দর্শনের কথা: 'তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। একটু চোখ চাইলে। বুঝলাম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।'

৯৯

দেহত্যাগের আর দেরি নেই। প্রায়োপবেশনেই সমাধি-শয়ন নেব এবার।

ঠাকুর তবে কি করতে আছেন? তাঁর ভালোবাসায় তবে আর লাভ কি? তিনি থাকতে যদি মা-ভাই-বোনকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয় তবে তাঁরই বা থাকবার কী অর্থ!

এটর্নির আফিসে কিছু খাটাখাটনি করল ক'দিন। অনুবাদ করল কখানা বইয়ের। জল গরম করবার মতও রোজগার নয়। শত ঠেলা মেরেও সরানো যাচ্ছে না অভাবের হাতিকে। এবার ঠাকুর এসে হাত মেলান। তাঁর মা'র তো অনেক প্রতাপ। মা'র কাছে তাঁর তো অনেক খাতির। এবার তাঁর মাকে বলে-কয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিন। ছুটল দক্ষিণেশ্বর। একেবারে ঠাকুরের পদপ্রান্তে।

'আপনার মাকে একবারটি বলুন।'

অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কি বলব?'

'মা-ভাই-বোনের কষ্ট আর দেখতে পারি না।' নরেন বললে প্রায় পরাভূতের

মত : 'ওদের কষ্টের যাতে লাঘব হয়, একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি হয় আমার, আপনার মা'র কাছে সুপারিশ করুন একটু—'

ঠাকুর তাকালেন স্নিগ্ধ চোখে। বললেন, 'আমার মা, তোর কে ?'

পুত্তলিকা। প্রস্তরপ্রতিমা।

নরেন মাথা হেঁট করে রইল। বললে, 'আমার কে না কে, তাতে কী আসে-যায় ? আপনার তো সব। আপনার কথা তো ফেলতে পারবে না। একটু বলুন না আমার হয়ে। যাতে টাকাকড়ির একটু মুখ দেখি। মা-ভাই-বোনের শ্লান মুখে একটু হাসি ফোটাই !'

'ওরে ও সব বিষয়-কথা বলতে পারি না—'

'ও সব বাজে কথা ছাড়ুন।' নরেন মরীয়া হয়ে উঠল : 'আপনাকে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না কিছুতেই।'

ঠাকুরের চক্ষু দুটি ছলছল করে উঠল। বললেন, 'ওরে, জানিস না, কতবার বলেছি তোর হয়ে। বলেছি, মা, নরেনের দুঃখ-কষ্ট দূর কর্। নরেনকে টাকা দে—' 'বলেছেন ? বেশ, আজ একবার বলুন।'

'তুই গিয়ে বল। কাছে বসে একবার মা বলে ডাক।'

'আমার ডাক আসে না।'

'তারই জন্যে তো হয় না কিছু সুরাহা।' ঠাকুর তাকালেন তার মুখের দিকে। 'তারই জন্যে তো তোর এত কষ্ট। তুই মাকে মানিস না বলে মা আমার কথাও শোনেন না। শোন,' ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন : 'আজ মঙ্গলবার। রাত্তিরে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মা'র কাছে, মা দিয়ে দেবেন। লুট করেও মা'র ভাণ্ডার শেষ করতে পারবিনে।'

'সত্যি ?'

'তুই দ্যাখই না চেয়ে।'

তবে আর ভয় নেই। আকুল হয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল নরেন। প্রার্থনা করা মাত্রই রাত্রির অবসান হয়ে যাবে। সম্পদে-সৌন্দর্যে ভরে উঠবে ঘর-দুয়ার। ক্লেশভার কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাবে দারিদ্র্য। উচ্ছল দক্ষিণ বাতাসের মত আসবে এবার সচ্ছলতা। কত সহজ সমাধান। শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা। শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ !

উৎকণ্ঠার কণ্টকের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে এল সেই মঙ্গলরাত্রি। ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। ঠাকুর এসে বললেন, 'যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ঢেলে প্রণাম কর। তার পর চা প্রাণ ভ'রে।'

যেন নেশা করেছে নরেন, পা টলতে লাগল। কী না জানি সে দেখবে ! কী না জানি শুনবে মা'র মুখের থেকে! প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। জড়পুত্তলী হয়ে উঠবে সুভাষিণী। মন্দিরে আর কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী। কী দেখল নরেন চোখ চেয়ে ? দেখল অখিল জগতের জননী প্রেম ও প্রসন্নতার নিত্যনির্ঝরিণী হয়ে বিরাজ করছেন। সৌম্যা সুন্দরী আর্তিহারিণী। সহস্র-

নয়নোজ্জ্বলা হয়ে সংসারে সমারূঢ় হয়ে আছেন। কোথাও শোক নেই দুঃখ নেই অভাব-অভিযোগ নেই।

ত্রিলোকমোহিনী মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন কী প্রার্থনা করবে? প্রণাম করে ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে বলে উঠল, 'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!' তন্ময়ের মত ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'কি রে, গিয়েছিলি মা'র কাছে? চেয়েছিলি টাকাকড়ি?' নরেন বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। 'কি আশ্চর্য, সব ভুল হয়ে গেল। এখন কী হবে?' অসহায়ের মত মুখ করলে। 'যা, যা, ফের যা।' ঠাকুর তাকে ঠেলে দিলেন মন্দিরের দিকে। 'গিয়ে ফের প্রার্থনা কর। মনের কথা মাকে না বলবি তো কাকে বলবি? কেন ভুল হবে? মাকে গিয়ে বল, মা আমাকে চাকরি দে, আরাম দে, স্বাচ্ছন্দ্য দে—'

নরেন আবার এসে দাঁড়াল ভবতারিণীর সম্মুখে। সেই কনকোত্তমকান্তিকান্তা দয়ার্দ্রচিত্তা অখিলেশ্বরী। সর্বব্যাপিনী মহতী স্থিতিশক্তি। শক্তিমতী সত্তা। বিদ্যারূপে উদ্ভাসিনী। কী আর ভিক্ষা করব মা'র কাছে? মহীরূপে মৃত্তিকারূপে জগৎসংসারকে মায়ের মতনই বুকে করে আছেন। আমিও তো মা'র কোলে কোমল শিশু।

'মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—'

আবার ফিরে এল ঠাকুরের কাছে।

'কি রে, এবার চেয়েছিলি ঠিক-ঠাক?'

'পারলুন না। এল না মুখ দিয়ে।'

'সে কি কথা? তুই কি আনাড়ি না আকাট?'

'মাকে দেখামাত্রই কি রকম একটা আবেশ আসে।' নরেন বলতে লাগল মুগ্ধের মত। 'যা চাইবো বলে ভেবেছিলুম তা আর মনে করতে পারলুম না।'

'দূর ছোঁড়া! নিজেকে প্রথমে একটু সামলে নিবি।' ঠাকুর যেন তাকে শিখিয়ে দিলেন: 'গোড়াতেই তলিয়ে যাবিনে। সামলে নিয়ে চারদিকে বুঝে-সমঝে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইবি। যা, আরেকবার গিয়ে চেষ্টা কর। এমন সোনার সুযোগ আর আসবে না।' নরেনকে আবার তিনি ঠেলে দিলেন। নরেন আবার এসে পৌঁছুল মন্দিরে।

পরমা মায়া মোক্ষরূপে বসে আছেন সামনে। সুদূরবর্তী আকাশ থেকে সন্নিহিত মৃত্তিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁর আসন। দেহবুদ্ধিরূপে তিনি, আবার মনোরূপে তিনি। সুখদুঃখভোক্তা প্রাণরূপে তিনি, আবার বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি। তিনি সর্বস্বরূপা সর্বেশ্বরী। হীনবুদ্ধির মত তাঁর কাছে কী লাউ-কুমড়ো চাইব! যিনি বরদায়িনী মূর্তিতে অবাধদর্শনা হয়ে আছেন তাঁর কাছে আবার কী ভিক্ষে করব? যিনি সর্ববাধাপ্রশমনী তাঁর সত্তায় বিশ্বাস হোক এবার। তা হলে আর অভাব নেই কাতরতা নেই অন্ধকার নেই।

'আর কিছু চাই না মা, আমাকে জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।' বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল নরেন।

প্রকৃষ্টরূপে অবনত হওয়ার নামই প্রণাম। অহংজ্ঞানকে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করার নামই প্রণিপাত। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। মানুষের দরজায়, বিষয়ের দরজায় মাথা ঠুকব না আর। সহস্রশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননীকে প্রণাম করব।

'কি রে, চাইলি এবার ?' ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চাইতে লজ্জা করল।'

'লজ্জা করল!' আনন্দে হাসতে লাগলেন ঠাকুর। নরেন বসল তাঁর পদচ্ছায়ে। তখন ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোনোদিন।'

ও-সবে আর যেন আগ্রহ নেই নরেনের। বললে, 'আমাকে মা'র গান শিখিয়ে দিন।'

'কোনটা শিখবি ?'

'মা ত্বং হি তারা—সেই গানটা—'

ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন।

'মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অঙ্গপুটে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

সারা রাত গাইলে ঐ গান। ঘুমুতে গেল না। নিশীথরাত্রীর সঙ্গীতময়ী মহতী সত্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে নরেন। তার পাশে বসে আছেন ঠাকুর। যেন পাহারা দিচ্ছেন।

বৈকুণ্ঠ সান্যাল এসেছে।

'ওরে এই ছেলেটিকে চিনিস ? এ বড় ভালো ছেলে, নাম নরেন্দ্র।'

'এখনো ঘুমুচ্ছে যে ?'

'কাল সমস্ত রাত মা'র গান গেয়েছে—মা ত্বং হি তারা। গাইতে-গাইতে রাত কাবার। কাল কী হয়েছিল জানিস নে বুঝি ?'

কৌতূহলী হয়ে তাকাল বৈকুণ্ঠ।

'মাকে আগে মানত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছিল তাই মা'র কাছে গিয়ে

টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম। তা গিয়েছিল চাইতে, কিন্তু পারল না! লজ্জা করল!' বলতে-বলতে আনন্দে উছলে পড়ছেন ঠাকুর: 'বললে, ফুল-ফল চেয়ে কী হবে, মা তোকেই চাই। তাই গান শিখে নিয়ে গাইলে সমস্ত রাত—তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোহরা। কালী মেনেছে নরেন, মা মেনেছে, বেশ হয়েছে—তাই না?'

বৈকুণ্ঠ সায় দিল: 'বেশ হয়েছে।'

হাসতে লাগলেন ঠাকুর: 'নরেন কালী মেনেছে, মা মেনেছে—কী বলো, বেশ হয়েছে। কেমন? তাই না?'

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

১০০

'আত্মজীবনী লেখা মানে কতগুলো মিছে কথার জাল বোনা।' বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'শুধু লোকের কাছে দেখাবার চেষ্টা আমি খুব বাহাদুর—আমার খাওয়া, শোওয়া, ঘুম, স্বপ্ন, চিন্তা সব অসাধারণ। দোষগুলি ঢাকা দিয়ে আমি মস্ত একজন ভগবানের স্পেশ্যাল-মার্কা তৈরি—এই তো বলতে হবে। দম্ভের এর চেয়ে আর কিছু প্রকাশ হতে পারে না। শুধু পালিশ করে নিজেকে দেখানো, আমি কত মহৎ, কত উদার, কত প্রতিভাশালী। আত্মজীবনী মানে নিজের ওকালতি করা।'

'কেউ-কেউ তো আত্মজীবনীতে নিজের দুষ্প্রবৃত্তির কথা বলে থাকেন।' বললেন একজন।

'তাও নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্যে।'

আমার অহঙ্কার ভেঙে ফেল, ধুলো করে দাও। একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দাও মৃত-পত্রের জঞ্জাল, আবার একটি ফুৎকারে বাজিয়ে তোলো স্তম্ভিত সমুদ্রের শঙ্খ। নিজের পুচ্ছের আলোতে জোনাকির মত আত্মসংসার আলোকিত দেখছি, সে সীমার বাইরে আর সবই অস্বীকৃত—এবার দেখাও তোমার স্পর্শপ্রগাঢ় অন্ধকার। যেখানে বিচ্ছিত্তি নেই, বিবিক্ততা নেই, শুধু অনন্ত অন্তর্ব্যাপ্তি। তুমি যদি পুত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্যতর সমস্ত কিছুর থেকে প্রিয়, তবে সুখ-সাধনদ্রব্যে কেন সমাসক্ত রেখেছ? ভেঙে দাও এই মধুপাত্র। ভোগ তো একরকম মনোবিকার। ভেঙে দাও এই মত্ততার স্বপ্ন। কাটিয়ে দাও এই রোগরাত্রি। অহং থেকে আত্মাতে নিয়ে চলো।

'আহা, বসেছেন দেখ না!' বললেন ঠাকুর, 'যেন গোঁফে চাড়া দিয়ে সাইনবোর্ড মেরে বসেছেন!'

কিন্তু গোঁফের তেজ কতদিন! কতদিনই বা সাইনবোর্ডের চাকচিক্য। একজন

এলে আরেকজন যায়। আরেকজন এলে সে-একজন থাকে না। তাদের চিরকালের ঝগড়া। কিছুতেই তারা থাকতে পারে না একসঙ্গে। একজনের প্রকাশে আরেক-জনের পলায়ন। তারা হচ্ছে 'আমি' আর 'তিনি'। অহং আর আত্মা। হয় আমি থাকি নয় তুমি থাকো। আর, তুমি যদি আসো আমি কোথায়!

পাছে অহঙ্কার হয় ব'লে গৌরীচরণ "আমি" বলত না—বলত "ইনি"। আমিও তার দেখাদেখি "ইনি" বলতাম। আমি খেয়েছি না বলে বলতাম ইনি খেয়েছেন। সেজবাবু তাই দেখে একদিন বললে, 'সে কি কথা, তুমি কেন ওসব বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার তো আর অহঙ্কার নেই।'

না, আমারও বুঝি অহঙ্কার হত মাঝে-মাঝে! পূর্বকথা, বেলতলায় তন্ত্রের সাধনার কথা বলতে গিয়ে বললেন ঠাকুর, 'যেদিনই অহঙ্কার করতুম তার পরদিনই অসুখ হত।'

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির সেই মেথরানির কথা মনে নেই? তার যে কি অহঙ্কার! গায়ে দু-একখানা গয়না ছিল। যে পথ দিয়ে আসে গয়নার ঝলস দিয়ে বলে, এই, সরে যা! তার মানে, এই দেখে যা! মেথরানিরই এই, তা অন্য লোকের কথা আর কি বলবো!

একমাত্র নিরহংকার যুধিষ্ঠির। পাঁচ ভাই চলেছে মহাপ্রস্থানে। সর্বপ্রথমে পড়ল সহদেব। ভীম জিগগেস করল, সহদেবের পতনের কারণ কি? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করত তার মত প্রাজ্ঞ আর কেউ নেই—সেই অহঙ্কারে। তার পরে পড়ল নকুল। নকুল পড়ল কেন? নকুল ভাবত তার মত রূপবান আর কেউ নেই—সেই অহংকারে। তার পরে অর্জুন। অর্জুন ভাবত, আমি সর্বাগ্রগণ্য ধনুর্ধর—সেই অভিমানে। তার পরে ভীম। আমি কেন পড়লুম? তুমি অতিরিক্ত ভোজন করতে, অন্যের শক্তি উপেক্ষা করে নিজের শক্তির শ্লাঘা করতে, সেই দর্পে। সশরীরে স্বর্গে এলেন শুধু যুধিষ্ঠির।

তোমার দম্ভ নয়, তোমার দয়া!

নদীতীরে বসে তপস্বী সন্ধ্যা করছিলেন, এক নিরাশ্রয় বৃশ্চিক ভাসতে-ভাসতে সেখানে এসে উপস্থিত। স্থলে আশ্রয় দেবার জন্যে জল থেকে তাকে তুললেন তপস্বী। তুলতে-না-তুলতেই বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। বিষজ্বালায় অস্থির হয়ে জলে তখুনি তাকে ছুঁড়ে ফেললেন। জলে পড়ে বিপন্ন বৃশ্চিক আবার হাবু-ডুবু খেতে লাগল। দেখে আবার দয়া হল তাপসের। আবার তাকে তুললেন হাতে করে। আবার দংশন। আবার নিক্ষেপ। পরে ভাবলেন, বৃশ্চিক তার নিজের ধর্ম বারে-বারে পালন করছে বারে-বারে দংশন করে, কিন্তু আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হচ্ছি? আমার সর্বজীবে দয়া। আমি কেন তাকে জলে ছুঁড়ে ফেলছি? আমার চেয়ে বৃশ্চিক বেশি স্বধর্মাশ্রিত। এই ভেবে আবার তাকে তুললেন জল থেকে। দংশন করলেও এবার আর ফেললেন না। স্থলেই স্থান করে দিলেন।

বার-বার ঘষলেও চন্দন চারুগন্ধ। বার-বার ছিন্ন করলেও ইক্ষুকাণ্ড মধুস্বাদু। বার-বার দগ্ধ করলেও কাঞ্চন কান্তবর্ণ। তেমনি যারা সজ্জন তারা প্রকৃতিবিকৃতি-

শূন্য। তোমার ক্ষোভ নয়, তোমার ক্ষমা। তুমি অতৃণ মাঠ। সেখানে আগুন পড়লেও বা কি। আগুন মাটির স্পর্শে আপনিই শান্ত হয়ে যায়। তপ্ত লৌহকে ছেদন করবার জন্যে তোমার হাতে শীতল লৌহ। ধূলির ধরণীতে তুমিই ধারাধর।

তুমি পিঁপড়েটির পর্যন্ত নিন্দা করো না। বরং তার পায়ের নূপুরগুঞ্জনটি শোনো।

'নগণ্য পিঁপড়ের পর্যন্ত নিন্দে কোরো না।'

এ সংসারে সুখ দুর্লভ, সুখই আবার সুলভ। তাই কেউ যদি আমার নিন্দা করে প্রীতিলাভ করে, সমক্ষেই হোক বা অসাক্ষাতেই হোক, করুক, আনন্দ পাক। নিন্দা করার অধিকার দিয়েই তাকে আমি অভিনন্দিত করছি। ভববল্লী কি ? তৃষ্ণা। দারিদ্র্য কি ? অসন্তোষ। দান কি ? আকাঙ্ক্ষা। ভোগ্য কি ? সহজ সুখ। ত্যাজ্য কি ? অহঙ্কার। নিজের অন্তরঙ্গদের দেখবার জন্যে ব্যাকুল তখন ঠাকুর। রাতে ঘুম নেই। কালীমন্দিরে বসে-বসে কাঁদেন। বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও। মা গো, ওকে এখানে এনে দাও ; যদি সে না আসতে পারে তা হলে আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। আমি দেখে আসি।'

থেকে-থেকে তাই ছুটে আসেন বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই প্রেমের হাট বসিয়েছেন। বলেন, 'জগন্নাথের সেবা আছে বলরামের। খুব শুদ্ধ অন্ন।' এসেই বলরামকে বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এস। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ানো হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে। এদের খাওয়ালে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না।'

বলরাম আবার একটু হাত-টান। ঠাকুরকে একদিন গাড়ি করে দিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে যাবে। ভাড়া ঠিক করেছে বারো আনা। সে কি কথা ! বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর ?

'তা ও অমন হয়।' ঘাড় নেড়ে দিয়ে চলে গেল বলরাম। শেষকালে কেলেঙ্কার। রাস্তার মাঝেই গাড়ি পড়ল ভেঙে। ঘোড়া আর যেতে চায় না। চাবুক চালালো গাড়োয়ান। তখন সেই ভাঙা গাড়ি নিয়েই দে-দৌড়। পড়ি কি মরি তার ঠিক নেই।

যখনই দেখবে বন্দোবস্তটা একটু শিথিল বা কৃপণ, তখনই ঠাকুরের ভাষায় 'বলরামের বন্দোবস্ত।' গাড়ি না করে ঠাকুর যদি নৌকোয় আসেন তবেই যেন বলরাম বেশি খুশি। কড়া-গণ্ডা উশুল করে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাই বললেন একদিন ঠাকুর, 'যখন খ্যাঁট দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে।'

কীর্তনের সময় ঠাকুর যখন নাচেন তখন বলরাম খোল বাজায়। সে আবার আরেক যন্ত্রণা। বলরামের তালবোধ নেই। তার ভাবখানা হচ্ছে এই, আপনারা গাও নাচো আনন্দ করো, আর আমি যেমন-তেমন খোলে চাঁটি মারি।

হাজরা ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার খালি বড়লোকের ছেলের দিকে টান।'

'তাই যদি হবে তবে হরীশ, নেটো, নরেন্দ্র—এদের ভালোবাসি কেন ? ভাত নুন দে খাবার পয়সা জোটে না নরেন্দ্রের।'

বলরাম জিগগেস করল, 'সংসারে পূর্ণজ্ঞান হয় কি করে ?'

'শুধু সেবা করে। মায়ের সেবা করে। জগতের মা-ই সংসারের মা হয়ে এসেছেন।' বললেন ঠাকুর। 'যতক্ষণ নিজের শরীরের খবর আছে ততক্ষণ মা'র খবর নিতে হবে। তাই হাজরারে বলি, নিজের কাশি হলে মিছরি মরিচ করতে হয়। যতক্ষণ এসব করতে হয় মা'র খবরও নিতে হয়। তবে যখন নিজের শরীরের খবর নিতে পাচ্ছি না, তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।'

ঠাকুর ও ভক্তদের খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করে এনেছে বলরাম। বারান্দায় বসে গিয়েছে সার বেঁধে। দাসের মতন দাঁড়িয়ে আছে বলরাম, প্রভুর মত নয়। তাকে দেখলে কে বলবে সে এ বাড়ির কর্তা।

একদিন ভাবদৃষ্টিতে বলরামকে দেখলেন ঠাকুর। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত দেখলেন চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল চলেছে। তার পুরোভাগে বলরাম। কিরূপ ভক্ত এখানে আসবে আগে থেকে তা দেখিয়ে দেয় মহামায়া। বলরাম না এলে চলবে কেন ? নইলে মুড়ি-মিছরি সব দেবে কে ?

প্রথম যেদিন দেখলেন দক্ষিণেশ্বরে, বললেন, 'ওগো মা বলেছেন তুমি যে আপনার জন। তুমি যে মা'র একজন রসদদার। তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে—কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।'

তাই দেয় বলরাম। চাল-ডাল চিনি-মিছরি আটা-সুজি সাগু-বার্লি। বলেন ঠাকুর, 'ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি। মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।'

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির নাম রেখেছেন 'মা কালীর কেল্লা'—প্রথম কেল্লা। দ্বিতীয় কেল্লা হচ্ছে বলরামের বাড়ি। ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রিট। সেই বাড়িতেই ঠাকুরের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের দ্বিতীয় দেখা। প্রথম দেখা এটর্নি দীননাথ বোসের বাড়িতে। বোসপাড়া লেনে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পড়ে প্রথম জানতে পায় পরমহংস-দেবের কথা। এ আবার কেমন পরমহংস ! ব্রাহ্মরা বেশ ভোল বদলাচ্ছে যা হোক। হরি ধরেছে, মা ধরেছে, এবার মনের মত এক পরমহংসও খাড়া করেছে দেখছি। ভেলকি ধরেছে মন্দ নয়। এমনি করে লোক বাগাবার মতলব। যাই একবার দেখে আসি গে। বেজায় ভিড় হয়েছে। ঠাকুরকে ঘিরে বহু ভক্তের সমাগম। ঐ বুঝি কেশব সেন। ঘন-ঘন সমাধিস্থ হচ্ছেন ঠাকুর আবার সমাধিভঙ্গের পর উপদেশ দিচ্ছেন। যারা শুনছে তারা যেন কর্ণ দিয়ে সুধা পান করছে।

সন্ধে হয়েছে। সেজ জেবলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুরের তখনো অর্ধ-বাহ্যদশা। বললেন, 'সন্ধে হয়েছে ?'

ঢং ! গিরিশের মন তেতে উঠল। দিব্যি সেজ জ্বলছে সামনে, আর, বলছে কিনা, সন্ধে হয়েছে ? সন্ধে না হলে আলো কেন ?

সন্ধে হয়েছে ? আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হ্যাঁ, হয়েছে। কে একজন বলে উঠল।

কেউ একজন না বলে দিলে যেন সন্ধে হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না ! চোখের

সম্মুখে আলো জেবলে দিলেও না! বুজরুকি আর কাকে বলে। বিরক্তিতে সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল গিরিশের। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলে পিসেমশাই, সদরালা গোপীনাথ বোস, 'কেমন দেখলে হে?'

একবাক্যে নস্যাৎ করল গিরিশ। 'বুজরুকি।'

১০১

দ্বিতীয় দেখা বলরাম-মন্দিরে। অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছে বলরাম। গিরিশকেও। কিন্তু ও কে? ওকে চেন না? ও বিধু। কীর্তনওয়ালী।

ঠাকুরকে প্রণাম করল বিধু। ঠাকুরও মাটিতে মাথা রেখে দীনভাবে নমস্কার করলেন। কথা বলতে লাগলেন বিধুর সঙ্গে। পরিহাসমধুর সরল আলাপ।

অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ছিলেন সেখানে। তাঁর ভালো লাগল না। গিরিশের সঙ্গে জানাশোনা, তাই তাকেই জানালেন তাঁর বিরক্তি। বললেন, 'চলো হে গিরিশ আর কী দেখবে?

'না, আরো একটু দেখি।'

'এই তো দেখলে—' প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন গিরিশকে।

গিরিশ দেখেও দেখল না, বুঝেও বুঝল না।

চৈতন্যলীলা অভিনয় করছে গিরিশ। দৃশ্যপট আঁকছে যে চিত্রকর তার সঙ্গে কথা কইছে। আঁকিয়ে গৌরভক্ত। ভক্তি না হলে রেখায় ফুটবে কি করে পেলবতা! চোখে জাগবে কি করে সংবেদনের স্বপ্ন!

'তোমার গৌরাঙ্গের মহিমা কিছু বলতে পারো?'

পারি বৈকি। তাঁকে দেওয়া ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ দেখি।

'বলো কি হে—'

'সারাদিন খেটে-খুটে বাড়ি ফিরি। বাড়ি ফিরে স্নান করে নিজের হাতে রাঁধি। গৌরহরিকে ভোগ দিই। আকুল হয়ে ডাকি তাঁকে অন্ধকারে। দেখি তিনি খেয়ে গেছেন। ভোগের রুটিতে তাঁর দাঁতের দাগ।'

অন্তরের প্রেমধ্যানটি চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। অগাধ বিশ্বাসের স্বচ্ছ সরোবরে ভক্তির শ্বেতপদ্ম। এ যেন সেই তনু বিনু পরশ নয়ন বিনু দেখা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসল গিরিশ। কবে নিজের রূপ ভুলে অরূপের রূপ দেখতে পাব? কে দেবে আমাকে সেই আলোকময়ের সংবাদ? চৈতন্যলীলা মূর্ত হল রঙ্গমঞ্চে। নামল জগাই-মাধাই। গগনমণ্ডপ থেকে নামলেন গৌরচন্দ্র। বাজল খোল-করতাল। হরিনামের বান ডেকে এল। সবাই ডুবল সেই নামপ্রেমসাগরে।

'থিয়েটারে গৌর নেমেছে। তীর্থ হয়েছে নাট্যশালা। বসে গিয়েছে ভক্তির চাঁদনি বাজার। চল দেখে আসি—

লোক আসছে দলে-দলে। শহর-গ্রাম ভেঙে। দিশ্মূঢ় হয়ে। কিন্তু হে অমানী-মানদ, দূর্বাদলশ্যামলমূর্তি, তুমি কবে আসবে? হে লাবণ্যমনোরম, কবে দেখব তোমাকে?'

মাধাই বলছে জগাইকে: 'জগা তুই নাচছিস কেন?'

বৈরাগী হব। ব্যাটারা কিন্তু বেড়ে গায়, হরি হে দেখা দাও। মেধো, আমায় তেলক কেটে দিতে পারিস?

'আচ্ছা হরে কে রে শালা, জগা, জানিস?' মাধাই টলছে নেশার ঝোঁকে: 'আমি হলে বলতেম, ধরে লে আও শালাকো! আমার মনে হয় এক শালা মালপোওয়ালা। খিদে পেলেই ডাকে।'

'চিল্লে খিদে বাগিয়ে নেয়। আমার তো চারখানা খেতেই কুপোকাৎ। আর ওরা এক-এক ব্যাটা রাধা বলে আর বিশখানা ওড়ায়।'

'এক শালাকে একদিনও বাগে পেলুম না।' মাধাই আপসোস করল।

জগাই ঠেলা মেরে বললে, 'তুই শালা যে মাতাল হয়ে ভোঁ হয়ে থাকিস—'

'দ্যাখ মাতাল বলিস তো ভালো হবে না। কোন দিন মাতাল দেখেছিস? তুই যেমন ছুটাকে—আমি দুসের খেয়ে সামসা আছি। এখন চলেছিস কোথায়?'

'চল না কেত্তন শোনা যাক গে। ব্যাটারা বেড়ে বাজায়—'

'তুই বড় গান শোননেওয়ালা—' ঠেলা মারল মাধাই।

'ওরে বেশ এক রকম রাধে-রাধে বলে, আমার ভাই রাধী নাপতিনীকে মনে পড়ে।'

'তুই দেখছি বৈরাগী হবি—'

'তোর চৌদ্দ দুগুনে বাহান্ন পুরুষ বৈরাগী হোক।'

আহত অভিমানের সুরে মাধাই বললে, 'ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা?'

কে এরা জগাই-মাধাই? এরা কি দুকড়ি সেন আর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র?

ট্যাঁকে মটর-ভাজা, গিরিশের বাড়িতে এসেছে দুকড়ি। এসেছে মদের পিপাসায়। বাবা, সঙ্গে 'দোগ্ধ মটর' আছে, এখন একটু মদিরা পেলেই দাহ মেটে। মদ নেই। আসবাব-পত্র পালিশ করার জন্যে এক বোতল মেথিলেটেড স্পিরিট আছে। তাই সই। নরেন সেই স্পিরিট ঢেলে দিল গেলাশে। জল না মিশিয়ে অম্লানবদনে তাই টেনে নিল দুকড়ি। অম্লানবদনে দগ্ধ মটর চিবুতে লাগল।

'এ করলে কি?' নরেনকে ধমকে উঠল গিরিশ: 'এ যে সাক্ষাৎ বিষ। লোকটা যে এক্ষুনি মারা যাবে।'

'আরে মশাই, ওতে আমার কি হবে?' অম্লানবদনে বললে দুকড়ি সেন। 'ও আমি নিত্য খাই।'

'বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন বাইশ বোতল বিয়র খেয়েছিলুম।' অতীতের কথা বলছেন গিরিশচন্দ্র। 'মদ খেয়ে দেখেছি কি জানো? জোর করে

মনকে ধরে রাখা—সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দূর করার জন্যে আবার মদ খাও।'

'তামাক?' জিগগেস করলেন কুমুদবন্ধু।

'তামাক! তামাক ঢের দেখেছি। ওর ঝাড়ে-বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক? গাঁজা, আফিং, ভাং—কিছু বাকি রাখিনি।'

'তাই বলে গাঁজা?'

'গাঁজাতে ভীষণ উইল-পাওয়ার বাড়ে। যখন গাঁজা টেনে বুঁদ হয়েছি, তখন সত্যি-সত্যি রোগ সারিয়েছি উইল-পাওয়ারে। কিন্তু যাই বলো, আফিঙের মত ছোটলোক নেশা আর নেই। আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল আফিং। একদিন আঙুর কিনেছি কতগুলি। অবিনাশ, বামুনের ছেলে, সর্বদা আসে এখানে। ওকে চারটে আঙুর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হল চারটে না দিয়ে দুটো দিলেই হত। তখন মনে-মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোটলোক হল কেন? ভেবে-চিন্তে দেখলাম, আফিঙের এই কাজ। তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে আফিং ত্যাগ করলাম—'আর সব?'

'সব ছেড়েছি।'

'ছাড়তে পারলেন?' বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত কুমুদের কণ্ঠস্বর।

'সাধে ছেড়েছি? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে।'

'কোনো নেশা করতে ইচ্ছে হয় না?'

'ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না।' অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল গিরিশের চোখ: 'জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি। কোনো পাপ করতে আমার বাকি নেই। সব রকম হয়েছে। কিন্তু ওই আমার গৌরবের পসরা। ধুলোকাদা মেখেই দাঁড়িয়েছি ঠাকুরের সামনে। শুধু এই আমার গৌরব—আর আমার কিছু নেই—এই আমার পাপ, এই আমার ধুলোকাদা। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা মুছে নাও তো নাও—'

আর আমার কিছু নেই। আমার শুধু শরণাগতি। আমার শুধু সমর্পণের তর্পণ। তুমি যদি আমাকে ফেলে দেবে তো দাও। কিন্তু কোথায় তুমি ফেলবে? যেখানে ফেলবে সেখানেও তোমার কোল মেলা। তোমার কোলের বাইরে তো আর জায়গা নেই। তাই যেখানে রাখবে সেখানেই আমি তোমার কোলে বসে।

শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মরলে মুক্তি মেলে। তাই মৃত্যুকালে কবীর চললেন কাশী ছেড়ে। বললেন, কাশীর বাইরেও যে মুক্তি আছে এটি প্রত্যক্ষ করব।

পরিচ্ছন্ন ও পুণ্যরুচিকে স্থান দেবে এর মধ্যে বাহাদুরি কি! যে কাঠে ঘুণ ধরে তাকে যজ্ঞের সমিধ করতে পারো তবেই বুঝি বাহাদুরি। যে লোহায় মরচে ধরে তাকে করতে পারো স্বর্ণপ্রভ তবেই বুঝি তোমার কৃতিত্ব। আর যে দেহে কামের বাসা তাকে করতে পারো তোমার মোহন মুরলী তবেই বুঝি তুমি কত বড় কারিগর। তোমার দরশ-পরশ যে অমৃতসরস তা বুঝি কি করে? তোমার প্রেম যে শুনি স্পর্শমণি তার প্রমাণ কি? আমার হৃদয় ছাড়া কোথায় আর পরখ হবে?

যদি আমিও হিরণ্ময় হতে পারি তবেই তো বলতে পারি তোমার প্রেম পরমধন পরশমণি। আমি যদি নিরাময় হতে পারি তবেই তো জানবে জগজ্জনে, তুমি অন্নময় অমৃতময় কল্যাণকরুণাময়। তুমি রোগার্তের ভিষক, অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের অক্ষয় কোষাগার। যখন তপ্ত লোহার শলাকা দিয়ে বিন্ধ করে ছিদ্র করেছ তখন বুঝিনি, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছি, কিন্তু এখন হাতে তুলে মুরলী করে বাজাচ্ছ, তখন এই বলে কাঁদছি, শুধু সপ্ত ছিদ্র না করে কেন আমাকে তুমি শতচ্ছিদ্র করোনি ? বাঁশকে যদি বাঁশিই না করবে তবে কেমন তুমি বংশীধর ?

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখে বৈষ্ণব বাবাজীরা ভয়ানক বিগলিত হয়েছে। সব সময়ে ঘিরে আছে গিরিশকে। তার হলঘরে তাদের ঘনঘন আনাগোনা। কেউ বলছে তার মধ্যে নিত্যানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন, কেউ বলছে আপনার উপর মহাপ্রভুর কী কৃপা! গিরিশ দেখল তার কাজকর্মের সমূহ বিপদ। এদের না তাড়ালে রক্ষে নেই। সে দিন হল্-ভর্তি লোক। বাবাজী বৈষ্ণবদেরই ভিড়। কেউ বলছে, কি ভক্তি, কেউ বলছে, কি প্রেম! কেউ বলছে, কি গান! এমন সুধার হরিনাম সাধের পণে কিনবি আয়! বোতল খুলে গেলাশে মদ ঢালল গিরিশ।

'কি খাচ্ছেন ? ওষুধ ?' জিগগেস করল এক বাবাজী।

আরেক জন গদগদ হবার চেষ্টায় বললে, 'ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত ?'

'না, মদ।' গিরিশ একটা বোমা ফেলল ঘরের মধ্যে।

'রামো রামো!' নাকে-কানে কাপড় গুঁজে পালালো বাবাজীরা।

হ্যাঁ, মদের নেশা। পদের নেশা। ঈশ্বরপদের নেশা। নেশা ছাড়তে-ছাড়তে চলেছি। একটার পর আরেকটা। নতুনের পর আরো নতুন নেশা ছাড়া নিশি নেই। সর্বশেষে সর্বনাশের নেশা। শিখর-শিহর।

চৌরাস্তায় রকে বসে আছে গিরিশ। ভক্তপরিবৃত হয়ে সমুখ দিয়ে চলে গেলেন ঠাকুর। চোখের পরে চোখ পড়ল। এক চোখের আকাশ থেকে আলো এসে পড়ল আরেক চোখের উঠোনে। হৃদয়ের ঘুড়িতে যেন কার সুতো বাঁধা। টান পড়েছে ঘুড়িতে। কান্নিক খাচ্ছে। 'আপনাকে ডাকছেন পরমহংসদেব।' একজন ভক্ত এসে খবর দিল।

লাফিয়ে উঠল গিরিশ। 'কোথায় ?'

বলরাম-মন্দিরে। আর কথা নেই, ডাক এসে গেছে। কিন্তু পাব কি ঠিকানা ? ঠিকানা পেলেও কি পারব পৌঁছুতে ?

'বাবু আমি ভালো আছি। বাবু আমি ভালো আছি।' আপন মনে বলছেন ঠাকুর। এ কি গিরিশকে উদ্দেশ্য করে বলা ? বলতে-বলতে ভাবান্তর হল ঠাকুরের। বললেন, 'না, না, এ ঢং নয়। এ ঢং নয়।'

কি করে বুঝলেন আমার মনের কথা ? কে এ সত্যবাক, সত্যজ্ঞানী ? যে রূপে যা নিশ্চিত তাই সত্য। সর্বরূপে নিত্য যে বিরাজিত সেই সত্য। সমস্ত সংশয়খিন্ন বুদ্ধির উপরে সেই সত্যই কি জ্বলছে সূর্যের মত ? সরাসরি আলাপ হল গিরিশের সঙ্গে।

'গুরু কি ?' জিগগেস করল গিরিশ।

'ঐ যে, কুটনি। যে মিলন ঘটিয়ে দেয়। ঘটক।'

সচ্চিদানন্দ গুরুরূপে আসেন। গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে। বিশ্বাস হলেই বিশ্বজয়। একলব্য কি করেছিল ? মাটির দ্রোণ তৈরি করে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণ নয়, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য। তবে বাণসিদ্ধি। যদি সদ্গুরু হয় জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। সেই যে ঢোঁড়া ব্যাঙ ধরেছিল, ছাড়তেও পারে না গিলতেও পারে না। দুয়েরই অশেষ ক্লেশ। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত।

'তা তোমার ভয় নেই। তোমার গুরু হয়ে গেছে।'

হয়ে গেছে ? কে সে ? কোথায় ?

বুঝেও বুঝল না গিরিশ। আবার বলল, 'মন্ত্র কি ?'

'ঈশ্বরের নাম।'

দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম খুশি। যদি একটু রুচি থাকে তবেই বাঁচবার আশা। তাই নামে রুচি। এ সেই 'খেতে-খেতে বেশ লাগছে।' জানো না বুঝি গল্প ? মা'র রান্নাতে অরুচি—আরে, ছি ছি, এ যে মুখে দেওয়া যায় না। তুমি কি বলছ ? এ যে আমি রেঁধেছি। বললে এসে স্ত্রী। তুমি রেঁধেছ ? খেতে-খেতে বেশ লাগছে।

১০২

কেন এত ঈর্ষা ? ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কেন এত পরশ্রীকাতরতা ? ঈশ্বরের শ্রী দেখ। কেন মিথ্যা আত্মস্ফীতি ? সব দুদিনের।

'সব দুদিনের।' বললেন ঠাকুর : 'তালগাছই সত্য, তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দুদিনের।'

রাখালেরও মাঝে-মাঝে হিংসে হয়। সে বালকের হিংসে। ভালোবাসার অভিমান। গাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে যাবে বলে উসখুস করে। যদি আর কাউকে ডেকে নেন ঠাকুর, হিংসেয় জ্বলে যায়। যদি বলেন, যাই, কলকাতায় গিয়ে ছোকরাদের একটু দেখে আসি, রাগে ঝলসে ওঠে, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে যে আপনি যাবেন ?'

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এসেই বা রাখালের কী হচ্ছে ? কই এখনো তো লাগল না কৃপার মলয় হাওয়া। তবে কি আমি পাঁকাটি ? আমি কি অপদার্থ ? আমার মধ্যে কি এতটুকুও সার নেই ? কোথায় তবে সেই চন্দনগন্ধ ? জপে বসেছিল নাটমন্দিরে, বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এত প্রেম এত কৃপা পেয়েও যার কিছু হয়

না, তার মুখ দেখিয়ে কাজ নেই। উঠতেই পড়ে গেল ঠাকুরের সামনে। কি রে, এরই মধ্যে উঠে পড়লি ?'

'আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'কেন, কি হল ?'

রাখাল মাথা হেঁট করে রইল।

'কি রে, মুখখানি অত ম্লান কেন ? বল আমাকে।'

বলতে হল না। বুঝতে পারলেন ঠাকুর। বললেন, 'হাঁ কর।'

হাঁ করতেই জিভ টেনে ধরলেন রাখালের। আঙুল দিয়ে তিনটে রেখা টেনে দিলেন। কি যেন মন্ত্র পড়লেন নিচু গলায়। বললেন, 'যা, এখন বোস গে।'

রাখালের মন হালকা হয়ে গেল। মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

শুধু তাই নয়, ঠাকুর একদিন তাকে টেনে আনলেন ভবতারিণীর সামনে। কপালে কারণের ফোঁটা দিয়ে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শিখিয়ে দিলেন আসন আর মুদ্রা! শিখিয়ে দিলেন ষটচক্র। সোপান-পরম্পরা! আর রাখালকে পায় কে!

কৃপা আর কাকে বলে! মেঘ নেই জল ঝরে পড়ল। হলকর্ষণ নেই শস্য এল মাটি ফুঁড়ে। এমনি করেই আসে দয়ার দক্ষিণ হাওয়া! চাইতে না জানলেও এসে পড়ে। মনের বায়ুমণ্ডলে একটি উত্তপ্ত শূন্যতা সৃষ্টি হলেই বাতাসের আলোড়ন জাগে। কৃপাস্পর্শে সাধনার দীপ্তি ফুটছে চেহারায়। কণ্ঠস্বরে মমতাময় মাধুরী।

'আহা, রাখালের স্বভাবটি আজকাল কেমন হয়েছে! দেখ, দেখ, ঠোঁট নড়ে—' বলছেন ঠাকুর ভক্তদের, 'অন্তরে নামজপ করছে কিনা!' তারপর বললেন, কোথায় আমার সেবা করবে, তা নয়, আমাকেই এখন তাকে জল দিতে হয়।'

'কি করছিস রে বাবুরাম ?' ঠাকুর ডাক দিলেন : 'এদিকে একটু আয় না।'

পান সাজছে বাবুরাম। বললে, 'পান সাজছি।'

'রেখে দে তোর পান সাজা।' বিরক্ত হলেন ঠাকুর। 'শুনে যা।'

শোন্। গুরুসেবাই সাধনাঙ্গ। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 'ভক্তি কি গাছের ফল রে বাবা পেড়ে খাবি ?' বলছেন ঠাকুর : 'সেবা ছাড়া প্রেম নেই। সেবা ছাড়া ভক্তি নেই।'

নিজে-নিজেই পান সাজেন কখনো। ঘর ঝাঁট দেন! মালীর কাজ করেন।

'ওরে, ও মালী, ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে দে তো—' একজন সত্যি-সত্যি সেদিন বললে ঠাকুরকে।

যা কাপড় পরেন! আর যেমন ভাবে পরেন! একটা মালী বলে ভাববে তা আর আশ্চর্য কি। বলামাত্রই ঠাকুর ফুলটি তুলে দিয়ে দিলেন লোকটাকে। খুশি হয়ে চলে গেল। কিছুদিন পরে জানতে পারল সেই মালীই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন লজ্জায়-অনুতাপে মাটির সঙ্গে তার মিশে যেতে শুধু বাকি। দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখা করল ঠাকুরের সঙ্গে। কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'সেদিন আপনাকেই তুলতে বলেছিলাম—'

'তা কী হয়েছে !' অমলিন কণ্ঠে বললেন ঠাকুর, 'কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয় ।'

ঠিক লোককেই তো বলেছিল ফুল তুলতে । মালী ছাড়া আর কি । আগাছার জঙ্গলকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেছেন । প্রার্থীকে ঠিক পৌঁছে দিচ্ছেন রূপার প্রফুল্ল ফুল ।

পঞ্চবটীর উত্তরে লোহার তারের বেড়া । তারই ওপারে ঝাউতলা । ঝাউতলার দিকে যেতে ঠাকুর পড়ে গেলেন বেড়ার উপর । হাতের একখানা হাড় সরে গেল ।

তাই দেখে রাখালের মনোবেদনার অন্ত নেই । যাঁর শরীররক্ষা করার কথা তাঁকেই সে ফেলে দিলে ! সেই তো ফেলে দিয়েছে ! তা ছাড়া আবার কি । যদি সঙ্গেসঙ্গে থাকত, চোখে-চোখে রাখত, ঘটত না এমন অঘটন । তার দোষেই এই দুর্দশা । ধিক্কারে মন ভরে গিয়েছে রাখালের । ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন । বললেন, 'তোর দোষ কি । তুই থাকলেও তোকে তো নিতুম না ঝাউতলা ।'

অপূর্ব মমতায় উথলে উঠলেন । বললেন, 'দেখিস তুই যেন পড়িসনে । যেন ঠকিসনে মান করে ।'

কত লোক আসছে কতদিক থেকে । পাছে ঠাকুরের হাত-ভাঙা দেখে কেউ কিছু ভুল বোঝে তারই জন্যে রাখাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় হাতখানি । ঠাকুরের হাত ভেঙেছে এ যেন তার নিজের কলঙ্ক ।

'কেন অমন ঢাকাঢাকি করিস ?' বিরক্ত হন ঠাকুর । 'মা যে অবস্থায় রেখেছেন সেই অবস্থায় থাকতে দে । লোকে নিন্দে করে তো আমাকে করবে ! বলবে নিজের একখানা হাত সামলাতে পারেন না সে আবার কেমনতরো কি !'

মধু ডাক্তার এসেছে তাকে পর্যন্ত লুকোনো ! আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব বলছে তাকে রাখাল । ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন ঘরের থেকে : 'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙে গেছে ।'

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে একে-ওকে হাত দেখান ঠাকুর । রাখাল শুধু চটে । বলে, 'এ কি বাড়াবাড়ি ! তা হলে এখান থেকে চলে যাই আমি ।'

ওরে স্বভাবের যন্ত্রণায় কাঁদিতে দে আমাকে । যন্ত্রণার মধ্যে কান্নাটাই আনন্দ । আমার কান্না দেখে লোকে যদি একটু কাঁদে সেটুকুও আমার উপশম ।

এখান থেকে যাবি তো যা । পরেই আবার মাকে বলেন, 'কোথায় যাবে, কোথায় যাবে জ্বলতে পুড়তে !'

ভাবনয়নে দেখলেন মা যেন সরিয়ে নিচ্ছেন রাখালকে । অমনি ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন, 'মা, ওকে হৃদের মত সরাসনি । ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না, তাই কখনো-কখনো অভিমান করে—ও চলে গেলে কাকে নিয়ে থাকব !'

আরো একটি ছেলের জন্যে কাঁদেন বসে-বসে । সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, গৌরবর্ণ, নাম নারান । স্কুলে পড়ে । তাকে নিজের হাতে খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল ঠাকুর । তার মাঝেই দেখেন সেই নারায়ণকে ।

'মশায়, আপনার গান হবে না ?'

প্রশ্নের এই তো ছিরি। তবু যেহেতু নারান বলেছে, নারান গান শুনতে চেয়েছে, ঠাকুর গান ধরলেন। 'অহরহ নিশি, দুর্গানামে ভাসি, তবু দুঃখরাশি গেল না—এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবে না—'

বলরামের বাড়িতে নামছেন সিঁড়ি দিয়ে, ভাববিভোর হয়ে, টলতে-টলতে। পাছে পড়ে যান, নারান হাত ধরতে গেল। বিরক্ত হলেন ঠাকুর, নারানের হাত ছুঁড়ে দিলেন। পরে, পাছে ব্যথা পায়, অযতন হয়েছে ভাবে, তাই সস্নেহে বললেন, 'হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে করবে। আমি আপনি-আপনি চলে যাব।

বলরামের বাড়িতে সেদিন এসেছে নারান।

'বোস কাছে এসে বোস। কাল যাস ওখানে। গিয়ে সেখানে খাবি, কেমন?'

কে নারান? তার পুরো নাম বা পদবীও কেউ জানে না। তবু তার প্রতি কি সর্বঢালা স্নেহ! কথামত এসেছে নারান। ছোট খাটটির উপর বসিয়েছেন পাশটিতে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। বললেন, জল খাবি? জল খাওয়াচ্ছেন নিজের হাতে।

এখানে আসে বলে বাড়ির লোকে মারে ছেলেটাকে। তাই কানের কাছে মুখ এনে স্নেহভরা স্বরে বললেন, 'একটা চামড়ার জামা কর, মারলে বেশি লাগবে না।'

কীর্তন শুনছেন ঠাকুর, নারান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস এখানে? অত মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারান। কোথায় তবে যাব? প্রহারের পর কোথায় তবে উপশম। প্রখর রৌদ্রের পর কোথায় তবে পাদপচ্ছায়া! সংসার-রাক্ষস আমাকে হরণ করে রেখেছে, আরামময় রাম এসে আমাকে উম্ধার করবেন বলে! প্রহারেই তো আমি দৃঢ় হব বলিষ্ঠ হব, আমার সমস্ত কলুষ ক্ষয় হয়ে যাবে। প্রহার তো তোমারই উপহার। তুমিই হানো তুমিই টানো তুমিই আনো তোমার কোলের কাছে। তুমি ছাড়া আর কে আছে! সকল আত্মীয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে গেল নারান। বাবুরামকে ঠাকুর বললেন, 'যা, ওকে কিছু খেতে দে।'

কীর্তনে সমাধিস্থ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মন বসল না। হঠাৎ উঠে পড়লেন। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন নারানকে।

'আজ নারানকে দেখলুম!' রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলছেন ঠাকুর। ভাবাবেশে কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বললে মাস্টার, 'চোখ দুটি জলে ভেজা। মুখ দেখে কান্না পায়।'

'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়!' কান্নায় ঠাকুরের গলাও ভিজে উঠল: 'এখানে আসে বলে ওকে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই। কুব্জা তোমায় কু বোঝায়। রাই-পক্ষে বোঝায় এমন কেউ নেই।'

'আপনিই বোঝাবেন।'

'দেখ ওর খুব সত্তা। নইলে কীর্তন শুনতে-শুনতে উঠে যাই! ওর টানে কীর্তন ছেড়ে উঠে যেতে হল ঘরের মধ্যে। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি এমনিটি আর হয়নি কখনো।'

কীর্তনের চেয়েও ক্রন্দন যে তোমাকে বেশি টানে। কীর্তন হচ্ছে গুণকথন, যশোবর্ণন আর ক্রন্দন হচ্ছে বেদন-নিবেদন। তুমি আমাকে কাঁদাচ্ছ এইই তো শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাই ক্রন্দনই শ্রেষ্ঠ কীর্তন।

'কিন্তু ওকে যখন জিগগেস করলাম, কেমন আছিস? ও এক কথায় বললে, আনন্দে আছি।'

তাই তো আর ওর ভয় নেই। প্রহারের প্রত্যক্ষ ভয়কেও উপেক্ষা করতে পেরেছে। জর্জর হয়েও অবসন্ন হয়নি। ধুলোতে শয়ন নিয়েও ভাবছে ঈশ্বরের কোলে মা'র কোলে শুয়ে আছি। আনন্দে থাকা মানে ধুলোকেও ব্রজরেণু মনে করা। নারানের সেই অবস্থা। কিশোর বালক কিন্তু বিশ্বাসের নিষ্কম্প বর্তিকা। বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। যন্ত্রণাকে নিয়ে এগেছে জয়ধ্বনিতে।

মাস্টারকে বললেন, 'তুমি কিছু কিনে-টিনে মাঝে-মাঝে খাইও ওকে। আচ্ছা, ওকে একবার ওর ইস্কুলে দেখতে পাই?'

'কেন, আমার বাসায় না-হয় ওকে ডেকে আনব। সেখানে চলুন।'

'না, না, একটা ভাব আছে। ওকে ওর স্বভাবে দেখতে চাই। তা ছাড়া, দেখে আসতুম আরো কেউ ছোকরা আছে নাকি—' বলেই আবার নারানে ফিরে এলেন। বললেন গদগদ হয়ে, 'আহা, নাউএর ডোলটা ভালো—তানপুরো বেশ বাজবে। আমায় বলে, আপনি সবই!'

এইটিই তো চরম ভালোবাসার কথা। তুমি আমার সব। তারই জন্যে তো তোমাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাই না। দূরে-দূরান্তরে এমন জায়গা নেই যেখানে তুমি নেই। এমন শূন্যতা ভাবা যায় না যা তুমি-ছাড়া। সব হারিয়েও দেখি তোমাকে হারাতে পারিনি।

'ওরে বাবুরাম, একবার নারানের বাড়িতে যা না—' নারানের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ঠাকুর! কিন্তু বাড়িতে যেতে ভয় পাছে ওর বাবা খেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে। 'এক কাজ কর। হাতে করে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে যা। তা হলে তার বাবা আর কিছু বলবে না।'

কিন্তু তার মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া, মার-ঘেঁচড়া, তাকে একবার দেখে আসি নিজের চোখে। পারি তো শুনিয়ে আসি দুটো কঠিন কথা। নিজের পাগলামি নিয়ে আছো থাকো, পরের ছেলেকে পাগল করা কেন? কিন্তু এসেই তার চোখ ডুবে গেল অমৃত-অঞ্জনে। এ কে অপরূপ! একে দেখে আমিই মুগ্ধ হচ্ছি, আমার নারান তো ছেলেমানুষ। যে সরল সে তো ডুবেই যাবে এ সরলতার সমুদ্রে!

'মা, আমার নারানকে বেশি পীড়ন করো না।' বললেন তাকে ঠাকুর,'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, মনটিকে দুমড়ে দিও না।'

ঈশ্বর পুত্রের চেয়েও প্রিয়। সেই মুহূর্তে মনে হল নারানের মা'র। ঈশ্বরকেই সব চেয়ে আমরা বেশি ঠকাই। সংসারে সব চেয়ে যেটা অল্পমূল্য, যা খোয়া গেলে বঞ্চিত মনে হয় না নিজেকে, সেইটিই ঈশ্বরকে নিবেদন করি। কাকে-ঠোকরানো ফলটাই সাজাই এনে পুজোর থালায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নারানের মা'র মনে হল এমন প্রিয়তম যে পুত্র তাও সম্ভব দিয়ে দেওয়া যায় ঈশ্বরকে।

১০৩

'ওরে কী শুনছি, থিয়েটারে সত্যি গৌর এল নাকি রে?' পদরত্নকে জিগগেস করলে তার বাপ। 'যা তো কলকাতায় গিয়ে একবার দেখে আয়।'

বাপ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। পদরত্ন গেল কলকাতা। যা দেখল তা আর যায় না দৃষ্টি থেকে। রঙ্গমঞ্চের পর্দা পড়ল কিন্তু চোখের আর পলক পড়ল না। গিরিশকে আশীর্বাদ করল প্রাণ ভরে, 'গৌর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি থিয়েটার দেখতে যাব।'

সকলে তো অবাক। যেখানে পণ্যস্ত্রীরা অভিনয় করে সেখানে ঠাকুর যাবেন দেখতে? রাম দত্ত বললে, 'অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, যাবো। দেখব চৈতন্যলীলা।'

কে ঠেকায়! গৌর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। থিয়েটারের দরজার সম্মুখে দাঁড়াল পালকি গাড়ি। গৌর নিজে এসেছেন থিয়েটারে। কেন কে জানে গিরিশ নিজে গেল গাড়ির দিকে। তার আগেই নেমে পড়েছেন ঠাকুর। গিরিশকে দেখতে পেয়েই নত হয়ে নমস্কার করলেন। নমস্কার ফিরিয়ে দিল গিরিশ। তখুনি আবার ঠাকুরের নমস্কার। নমস্কারে পারবে ঠাকুরের সঙ্গে? কোনো কিছুতে পারবে? ছেড়ে দিল, হেরে গেল গিরিশ। শেষ নমস্কার ঠাকুরের। যার শেষ নমস্কার তারই শেষ জয়। শুধু গায়ের জোরে নমস্কার নয়। এ একটি বিনয়নমিতা দীনতার নির্ঝরিণী। ধারাবাহিকী দ্রবীভূতো প্রীতিসুধা। উপরে একটি বক্সে জায়গা হল ঠাকুরের। এক পাখাওয়ালা এসে হাওয়া করতে লাগল।

নিমাই বলছে শচীমাকে :

> 'কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননি,
> কেঁদো না নিমাই বলে—
> কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে
> কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।'

সমাধিতে ডুবে গেলেন ঠাকুর। আবার এলেন জীবভূমিতে। আবার খানিকক্ষণ শোনেন। আবার সমাধিস্থ হন।

আচ্ছা, গিরিশকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো? এখনকার দেখা নয়,

যেন বহু আগের দেখা, আগের আলাপ। ঐ সেই দক্ষিণেশ্বরে, প্রথম দিককার সাধনার পরিচ্ছেদে। কালীঘরে বসে আছি, দেখলুম একটি উলঙ্গ বালক নাচতে-নাচতে কাছে এল। কোমরে রুপোর গেঁটে, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড়, অন্য হাতে সুধাপাত্র। কে তুই ? হাঁক দিলুম। বললে, আমি ভৈরব। তা এখানে কেন ? বললে, আপনারই কাজ করব বলে এসেছি। সেই ভৈরবই যে গিরিশ।

ব্রাহ্মসমাজের নাটকে সাধু সেজেছিল নরেন। ঠাকুর দেখতে গিয়েছেন। সাধুবেশে যেই দেখলেন নরেনকে, দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতে লাগলেন আপন মনে, 'এই ঠিক হয়েছে। ঠিক মিলেছে।' তারপর ডাকতে লাগলেন হাতছানি দিয়ে। এ কি অসম্ভব কথা ! সেজে আছে রঙ্গমঞ্চে, সে এখন নেমে আসবে কি ! তখন কেশব বললে, 'উনি যখন বলছেন, এসো না নেমে !' উনি যেন সব নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু, যাই বলো, নেমে আসতেই হল নরেনকে। ঠাকুর তার হাত ধরলেন, আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে বললেন, 'তোকে এই বেশে একদিন দেখিয়েছিল মা। ঠিক এই বেশে। সত্যি, মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক—'

অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। যে এ পার্টে নামে, রোজ গঙ্গাস্নান করে হবিষ্যি করে নামে। সে মেয়ে, অভিনেত্রী। নাম বিনোদিনী। বিনোদিনী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ঠাকুরকে। কল্পতরু ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করলেন 'মা তোর চৈতন্য হোক।'

তোমার চিত্তদর্পণের মার্জনা হোক, ভবদাবাগ্নির নির্বাণ হোক, মঙ্গলজ্যোৎস্নায় ভরে যাক মনোমন্দির। হৃদয়ে সত্য ও শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করো। হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন। হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সম্রাট। হৃদয়ই ব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়স্পর্শে সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও।

রোগ বড় শক্ত, কিন্তু ভয় নেই, রোজাও বড় পোক্ত। রোজার নামেই রোগ পালায়। হলাম গণিকা, তবু তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। হে অখিলরসামৃতমূর্তি, আমি তাতেই ধন্য। আর কিছুই চাই না। গণ্য হয়েই ধন্য হলাম।

একটি স্ত্রীলোক এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ব্রীড়ার সঙ্গে বিষন্নতা মিশে মুখখানি ভারি করুণ। কি চাই ? স্বামী মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, সংসারে পয়সাকড়ি কিছু দেয় না, সব মদ খেয়ে নষ্ট করে। ঠাকুর যদি কিছু একটা ব্যবস্থা দেন। স্বামীর মন যাতে ভালো হয়। ঠাকুর পরিচয় নিয়ে জানলেন শ্যামপুকুরের কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। কালীপদ মানে দানাকালী, গিরিশের বন্ধু। এক গ্লাশের ইয়ার। জন ডিকিন্সনে বড় কাজ করে কিন্তু মাইনে যা পায় তা প্রায় অকাজেই শেষ হয়। ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নহবতখানায়। সতীর দুঃখে সারদা বিচলিত হল। একটি পুজো-করা বেলপাতায় ঠাকুরের নাম লিখলে। বউটিকে দিয়ে বললে, রেখে দিও নিজের কাছে, আর খুব নাম কোরো।

সতী স্ত্রী বারো বছর নাম করেছে। তারপর এক দিন দানাকালী হাজির দক্ষিণেশ্বরে। তাকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'বউটাকে বারো বচ্ছর ভুগিয়ে

তবে এখানে এল !'

কথা শুনে চমকে উঠল দানাকালী। তুমি কি করে জানলে? কিন্তু নিমেষে আবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে তো ভক্তিতে আসেনি, সে এসেছে কৌতূহলে। পাঁচজনে বলাবলি করছে, দেখে আসি কেমনতরো ! সেই অলস উসখুসুনি।

'কি চাই তোমার ? বলো না গো মুখ ফুটে।' ঠাকুর প্রশ্ন করলেন আত্মজনের মত।

দানাকালী এমন ছ্যাঁচড়, বললে, 'একটু মদ দিতে পারেন ?'

'ত প্যারি বৈ কি। তবে এখনকার মদে এমন নেশা, তুমি সইতে পারবে না।'

দানাকালী হাসল। সে আবার সইতে পারবে না ! বললে, 'কি, বিলিতি মদ ?'

'না গো, একদম খাঁটি দিশি কারণ-বারি।' ঠাকুর বললেন মুখে, 'এখানকার মদ পেলে আর বিলিতি মদ ভালো লাগে না। তুমি ঐ মদ ছেড়ে এখানকার মদ ধরতে রাজী আছ ?'

দানাকালী স্তব্ধ হয়ে রইল এক মুহূর্ত। পরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'সেই মদ আমায় দিন যা পেলে আমি সারা জীবন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকব।' এমন কিছু দিন যা পেলে আর আমার কিছু পাবার থাকবে না। এমন প্রাপ্তি দিন যার আর কোনো প্রত্যাশা নেই। এমন আনন্দ দিন যা সুখে-দুঃখে অবিচ্ছিন্ন।

ঠাকুর দানাকালীকে ছুঁয়ে দিলেন। ছোঁয়ামাত্র কাঁদতে লাগল দানকালী। কত লোকে কত বোঝায়, তবু সে কাঁদে। বাড়ি ফিরে এল বটে, মন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। ক'দিন পরে আবার গিয়ে হাজির। ঠাকুর বললেন, 'তুমি এসেছ? আমার একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে।'

'যাবেন ?' দানাকালী উল্লসিত হয়ে উঠল : 'চলুন আমার সঙ্গে। ঘাটে বাঁধা আছে নৌকো।'

সঙ্গে লাটু, ঠাকুর উঠলেন এসে নৌকোয়। মাঝনদীতে এসে বললেন, 'জিব বের করো তো দেখি।'

দানাকালী জিভ বের করল। আঙুলের ডগা দিয়ে কি তাতে লিখে দিলেন ঠাকুর। মৌতাত ধরল বুঝি এতক্ষণে। মনে হল, এমন বোধ হয় কিছু আছে যা পেলে নিজেকে নিঃস্ব জেনেও আনন্দ হয়। চন্দ্রসূর্যহীন অন্ধকার গুহাও আলো হয়ে ওঠে। যার ঘর নেই, পথই তার ঘর হয়ে দাঁড়ায়। যার সবাই পর, পরের মধ্যেই সে আপন জনের মুখ দেখে।

ঘাটে নৌকো লাগল। দানাকালী জিগগেস করল, 'কোথায় যাবেন ?'

'কোথায় আবার ! তোমার সঙ্গে এসেছি, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।'

আনন্দে বিভোর হল দানাকালী। গাড়ি করে ঠাকুরকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। শবরীর কুটিরে শ্রীরামচন্দ্র।

'স্ত্রী যদি সতী-সাধ্বী হয়', বললে লাটু, 'তা হলে সে স্বামীর জন্যে কঠোর করতে পেছপা হয় না। স্ত্রীর জন্যে উদ্ধার হয়ে গেল কালীপদ।'

স্ত্রীর সাধনায় কালীপদ ধ্রুবপদ পেয়ে গেল। বুঝতেও পারেনি স্ত্রীর রূপ

ধরে কৃপা এসেছিল তার সংসারে। আর যা দীনতা আর প্রতীক্ষা, যা নিষ্ঠা আর আঘাতসহতা তাই স্ত্রী। সংসারে দীনা দাসীর বেশে রাজেশ্বরী বিরাজ করছে বুঝতেও পারেনি। বুঝতেও পারেনি পরিধানে যে চীরবাস আছে আড়ালে তা তপস্বিনীর রাজবেশ। বাইরে যা প্রতিবাদ অন্তরে তাই প্রার্থনা।

চিনতে পারল এতদিনে। বারো বছর ধরে যে নিশ্বাসবায়ু রুদ্ধ করে সঞ্চিত করে রেখেছিল তাই এখন কৃপার শীতলবায়ু হয়ে প্রবাহিত হল। এবার নোঙর তোলো, নৌকো ছাড়ো। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সঞ্চিত ধন বেঁধে রেখেছিলে, সঞ্চিত ধন জলে ফেলে দিয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডকে এখন পাল করো। এতদিনে তোমার স্ত্রী একা দাঁড় টেনেছেন, এবার হালে এসে বসেছেন স্বয়ং ভবার্ণবের কাণ্ডারী। আর ভয় নেই।

ঠাকুরের অসুখ কাশীপুরের বাড়িতে, নিরঞ্জন দরজা আগলে রয়েছে, আবান্তর লোক কাউকে ঢুকতে দেবে না। যে-সে ঢুকবে আর ঠাকুরকে প্রণাম করবে, প্রণাম করে ঠাকুরের অসুখ বাড়িয়ে দেবে এ অসম্ভব। খুব কড়া মেজাজের ছেলে নিরঞ্জন। দেখতেও বেশ বলশালী। গয়নার নৌকোয় ফিরছে দক্ষিণেশ্বর, আরোহীরা খুব নিন্দা করছে ঠাকুরের। নিরঞ্জন প্রথম প্রতিবাদ করল, যুক্তিতর্কের রাস্তায় গেল, কিন্তু কেউই নিরস্ত হল না। তখন বললে, গুরুনিন্দা সইতে পারব না, নৌকো ডুবিয়ে দেব। শুধু মুখের কথা নয়, সাঁতারে ওস্তাদ নিরঞ্জন, জলে লাফিয়ে পড়ল, নৌকো ফেলতে গেল উলটিয়ে। তখন সকলে দেখলে মহৎভয় সমুদ্যত। করজোড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল সকলে। করতে লাগল অনেক কাকুতি-মিনতি। তখন ছেড়ে দিলে। জল ছেড়ে ফের উঠল গিয়ে নৌকোয়।

কথাটা কানে উঠল ঠাকুরের। নিরঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কে কি বলে না বলে তোর কী মাথাবাথা পড়েছিল? ক্রোধ চণ্ডাল, তার কি বশীভূত হতে আছে? সৎ লোকের রাগ জলের দাগের মত, হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। তা ছাড়া হীনবুদ্ধি লোক কত কি অন্যায় কথা বলে, তা কি গায়ে মাখতে আছে? তা ছাড়া—' নিরঞ্জন মাথা হেঁট করে রইল।

'তা ছাড়া নৌকো যে ডোবাতে গিয়েছিলি, মাঝিমাল্লারা কি দোষ করেছিল? নিরীহ গরিবের উপর অত্যাচার হয়ে যেত, খেয়াল আছে?'

আত্মগঞ্জনায় বিদ্ধ হল নিরঞ্জন।

তার পর নিরঞ্জন আবার মাতৃভক্ত। ঠাকুরের পথে এসেছে অথচ চাকরি করছে এ কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু চাকরি না করলে মা'র ভরণপোষণ হবে কি করে? আমার মুখের দিকে মা চেয়ে আছেন, আমি ছাড়া তাঁর কেউ নেই। কিন্তু ঠাকুর যদি জানতে পান?

'তোর মুখে যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে।' ধরতে পেরেছেন ঠাকুর, 'আপিসের কাজ করিস কিনা।'

মুখের উপর যেন আরো এক পোঁচ কালি পড়ল।

তার জন্যে মুখ ম্লান করছিস কেন? তুই তো তোর মা'র জন্যে কাজ করছিস,

ওতে কোনো দোষ নেই। ওরে মা যে ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

বীর নিরঞ্জন, ভক্তিতে আর নির্মলতায় বিশ্বজিৎ নিরঞ্জন, সে ঠাকুরের দ্বাররক্ষী হবে না তো কে হবে! অপ্রিয় কর্তব্য সমাধা করবার মত নির্বিকার সামর্থ্য শুধু তারই আছে।

দানাকালী তার এক সাহেব-বন্ধু নিয়ে হাজির। বললে, ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত, অসুখ শুনে দেখতে এসেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিরঞ্জন, তাকাল একবার সাহেবের হ্যাট-কোটের দিকে। খাস ইংরেজ নয় হয়তো, কিন্তু ফিরিঙ্গি বলতে আপত্তি হবে না।

সাহেব আর দানাকালী উঠে এল উপরে। ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে। মাথার থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে সাহেব বললে, 'আমি বিনোদিনী! চৈতন্যলীলার বিনোদিনী।'

বলতে-বলতে সে কেঁদে ফেললে। ঠাকুরের রোগক্লিষ্ট মুখ দেখে তার কান্না আরো উথলে উঠল। মেঝেতে বসে ঠাকুরের পায়ের উপরে মাথা রাখলে।

কিন্তু ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন, 'খুব ফাঁকি দিয়ে এসে পড়েছ তো! মেয়েছেলেকে একেবারে সাহেব সাজিয়ে! হ্যাটকোট পরিয়ে! খুব বাহাদুর তুমি কালীপদ!'

'নইলে ওকে যে আসতে দিত না আপনার ভক্তেরা।' বললে দানাকালী: 'কতদিন থেকে কাঁদছে, বলছে ঠাকুরের এমন অসুখ আমি একবার দেখতে পাই না? আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার নিয়ে চলুন। ঠাকুরকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাই দয়া হল। নিয়ে এলুম আপনার কাছে।'

এতটুকু ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হলেন না ঠাকুর। বরং পরিহাসটুকু পরমরসিকের মত উপভোগ করলেন। তাঁর বীর ভক্তদল প্রতারিত হয়েছে বলে এতটুকু তাঁর জ্বালা নেই, বরং ভক্তি ও ব্যাকুলতাকে কেউ যে রুখতে পারে না তাতেই ভীষণ প্রসন্ন হয়েছেন। বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি!'

'নইলে এমনি এলে ঢুকতেই দিত না যে। সাধারণ লোককেই দেয় না, আর এ তো অভিনেত্রী। বলে কিনা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে।' দানাকালী জোরের সঙ্গে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না। যে পাপের জন্যে এখন অনুতাপ করছে তার স্পর্শে তো এখন শান্তি।'

নিচে খবর পেঁছে গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে, দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছে ঠাকুরের কাছে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে দ্বারীকে কলা দেখিয়েছে। রাগে ফুলতে লাগল ভক্তদল। দানাকালী যতই ঠাকুরের আশ্রিত হোক, গিরিশের অনুগামী হোক, একবার দেখে নেবে তাকে।

কিন্তু কিসের প্রতিশোধ, কার উপর! ঠাকুর যে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভীষণ হাসি-পরিহাস করছেন! যা ঠাকুরকে এত আনন্দিত করছে তা তাঁর ভক্তদের ক্রুদ্ধ করে কি করে? অগত্যা দানাকালী আর বিনোদিনীকে ছেড়ে দিতে হল দরজা।

কিন্তু এবার রাম দত্তকে ঠেকিয়েছে নিরঞ্জন। কিছু মিষ্টি আর মালা উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দিতে বলেছিল লাটুকে। হামাকে কেন, আপুনি নিজে যান না। বললে লাটু। তখন নিরঞ্জন বাধা দিলে। লাটু বললে, 'এঁকে যেতে দাও না! আপনা-আপনির মধ্যে এ সব নিয়ম কি জারি করতে আছে?'

নিরঞ্জন তবু অনড়। অনমনীয়।

তখন লাটু ফোঁস করে উঠল: 'সেবার যখন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তখন তো তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলে, আর আজ এঁর মত লোককে ছাড়তে চাইছ না? এর মানে কি?'

অগত্যা ছেড়ে দিল রাম দত্তকে।

লাটুকে ডাকলেন ঠাকুর। কেউ তাঁর কাছে নালিশ করেনি তবু শুনতে পেয়েছেন অন্তর্যামী। বললেন লাটুকে, 'দ্যাখ কারুর কখনো দোষ দেখবিনি, ভুল দেখবিনি, কেবল গুণ দেখবি, ভালো দেখবি। বুঝলি?'

লাটু চুপ করে রইল। মনকে শাসন করলে ব্যথার চাবুক মেরে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরল। বললে, 'ভাই আমার মত মুখখুরে কথায় দুঃখু করিসনি।'

১০৪

'আরেকদিন দেখাবে?' বালকের মতন জিগগেস করলেন ঠাকুর। নয়নে সানন্দ-কৌতূহল।

বেশ তো যাবেন যে দিন খুশি। দেখে আসবেন।'

'কিন্তু কিছু নিতে হবে।'

কি নেব? টিকিটের দাম? ঠাকুর পয়সা পাবেন কোত্থেকে? কৃপা করে যে আসছেন সেই কি অনেক নিচ্ছি না? না, ঠাকুর পীড়াপীড়ি করছেন, নিতে হবে কিছু। কিছু না দিয়ে তিনিই বা দেখবেন কেন? গ্যালারির সিট আট আনা। গিরিশ হেসে বললে, 'বেশ, আপনি আট আনা দেবেন।'

'বা, আমি গ্যালারিতে বসতে পারব না। সে বড় র‍্যাজলা—'

'না, না, আপনি গ্যালারিতে বসবেন কেন। সে দিন যেখানে বসেছিলেন সেই বক্সেই বসবেন।'

'কিন্তু মোটে আট আনা?' গূঢ় রহস্যভরা হাসি হাসলেন ঠাকুর।

'তা—' গিরিশ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

'আট আনা নয়, ষোলো আনা দেব।'

ষোলো আনা দেব। ফাঁক রাখব না, ছিদ্র রাখব না, নিরবকাশ করে দেব। ভরে দেব সম্পূর্ণ করে। ষোলো কলা একত্র করে দেব তোমাকে পূর্ণচন্দ্র। করুণার পূর্ণচন্দ্র। প্রসাদের পূর্ণঘট। কিন্তু তুমিই শুধু দেবে, আর আমি নেব হাত

পেতে ? আমার এ দারিদ্র্য এ কার্পণ্য আর সহ্য হয় না। শুষ্ক পিপাসা দিয়ে গড়েছি যে শূন্য পেয়ালা তা এবার ভেঙে ফেলব। আমি নিজেকে বুঝেছি এবার মহীয়ান রূপে, ঐশ্বর্যবান দাতারূপে। এবার আমি দেব, তুমি নেবে। তুমি আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবে প্রার্থী হয়ে আর আমি তোমাকে ভিক্ষে দেব। বলো তো, কী দেব ? নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের চন্দন, কণ্ঠের ফুলমালা। না, আংশিক নয়, তোমাকেও আমি দেব ষোলো আনা। আমার আমি-কে দিয়ে দেব তোমার হাতে। ঢেলে দেব, বিকিয়ে দেব, বিলিয়ে দেব। কিছু রাখব না আপনার বলে। তখন আমিই তোমার আপনার। তোমার দান, আমার সমর্পণ। তোমার দয়া, আমার উৎসর্গ। জানি না দাতা হিসাবে কে বড় ? তুমি না আমি ?

প্রথমবার যখন যান থিয়েটারে, লোকজন আলো দেখে ঠাকুর বালকের মতন খুশি। বক্সে বসে বলছেন মাস্টারমশাইকে, 'বাঃ, এখানে এসে বেশ হলো। অনেক লোক এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।'

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি এসেছে। অতিথি চোখ বুজে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করছে, নিমাই ছুটে এসে তাই খেয়ে নিচ্ছে পলকে। গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বসে পুজো করছে ব্রাহ্মণেরা, নিমাই এসে কেড়ে খাচ্ছে নৈবেদ্য। বিষ্ণুপুজোর নৈবিদ্যি কেড়ে নিচ্ছিস, সর্বনাশ হবে তোর—এক ব্রাহ্মণ তেড়ে গেল নিমাইকে। পালিয়ে গেল নিমাই। মেয়েরা ভালোবাসে ছেলেটাকে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। ডাকতে লাগল, নিমাই, ফিরে আয়, নিমাই ফিরে আয়। নিমাই ফিরল না। আমি জানি কি করে ফেরাতে হয় নিমাইকে। আমি জানি সেই মহামন্ত্র। বললে একজন উটকো লোক। বলেই সে বলতে লাগল, হরিবোল, হরিবোল। হরিবোল বলতে-বলতে ফিরে এল নিমাই। ফিরে এল নাচতে-নাচতে।

ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। মুখে বললেন, আহা, আর নয়নে ঝরতে লাগল প্রেমাশ্রু। বাবুরামও সঙ্গে ছিল। তাকে আর মাস্টারমশাইকে বললেন, 'দেখ আমার যদি ভাব কি সমাধি হয়, গোলমাল কোরো না। ঐহিকেরা ঢং বলবে।'

বহুবার, নাটকের বহু জায়গায় ঠাকুরের সমাধি হল, কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ঘর-ভরা দর্শকের দল হায়-হায় করে উঠলেও ঠাকুর বিচলিত হলেন না। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই ঝড়ে-ছেঁড়া বৃক্ষশাখার দিকে।

অভিনয়ের পর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, একজন এসে জিগগেস করলে, কেমন দেখলেন ?

প্রসন্ন-স্বরে ঠাকুর বললেন, 'আসল-নকল এক দেখলাম।'

মহেন্দ্র মুখুজ্জের বাড়ি হয়ে গাড়ি চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর গান ধরেছেন :

'গৌর-নিতাই তোমরা দু ভাই,
পরমদয়াল হে প্রভু—

আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই,
ব্রজে ছিলে কানাই-বলাই, নদে হলে গৌর-নিতাই।
ব্রজের খেলা ছিল দৌড়োদৌড়ি,
এখন নদের খেলা ধুলোয় গড়াগড়ি।
ছিল ব্রজের খেলা উচ্চ রোল,
আজ নদের খেলা কেবল হরিবোল॥
ওহে পরম করুণ, ও কাঙালের ঠাকুর—

মাস্টারমশাইও গাইছেন সঙ্গে-সঙ্গে। মহেন্দ্র মুখুজ্জে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে। বললেন, একবারটি তীর্থে যাব।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু প্রেমের অঙ্কুরটি হতে না হতেই তাকে শুকিয়ে মারবে? কিন্তু যাও যদি, শিগগির এস, দেরি কোরো না।'

তীর্থ কোথায়? তীর্থ তোমার এই অন্তরের নির্জনতায়। সেইখানেই গহন গিরিগুহা, শিহরময় শৈলশিখর, সেইখানেই সঙ্গবিহীন সমুদ্র-তীর! তোমার বাইরের তীর্থ জীর্ণ হয়, পুরোনো হয়, কিন্তু এই অন্তরের দেবালয় রোজ তুমি নিজের হাতে নিত্যনবীন ভাবরসে নির্মিত করো। ধৌত করো অশ্রুজলে। জ্বালো একটি অনাকাঙ্ক্ষার ঘৃতপ্রদীপ। বাইরের তীর্থে কত বিক্ষোভ কত মালিন্য কিন্তু অন্তরতীর্থে অনাহত প্রশান্তি। এই অন্তরতীর্থে আশ্রয় নাও। অন্তরতমকে দেখ। তার সামনে দাঁড়াও করজোড়ে।

গিরিশ ঠাকুরকে একটি ফুল দিল।

নিয়ে তখুনি আবার ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমায় ফুল দিচ্ছ কেন?

ফুল দিয়ে আমি কী করব? ফুলে আমার অধিকার নেই।'

'ফুলে আবার কার অধিকার?'

'দুজনের। এক দেবতার, আর ফুল-বাবুর।'

সকলে হাসতে লাগল।

থিয়েটারে কনসার্টের সময় আরেক কামরায় বসালো ঠাকুরকে। কথায়-কথায় ঠাকুরের ভাবসমাধি হল। মনের আড় যায়নি এখনো গিরিশের। ঠিক ঢং না ভাবলেও ভাবল বোধ হয় বাড়াবাড়ি। যে মুহূর্তে সংশয় ছায়া ফেলল, চোখ চাইলেন। কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্যে উদয় হল দিবাকরের।

'মনে তোমার বাঁক আছে।' বললেন ঠাকুর।

শুধু একটা? অসংখ্য। কত কুটিল আবর্ত। অন্ধ ঘূর্ণিবাত। কত অসরল পন্থা, অস্বচ্ছ লক্ষ্য। বক্রতা আর শীর্ণতা। মালিন্য আর আবিল্য। শুধু বিবৃদ্ধ বাসনা।

'এ বাঁক যায় কিসে?' গিরিশের কণ্ঠে লাগল বুঝি কান্নার রঙ।

'শুধু বিশ্বাসে।'

বিশ্বাসে কী না হতে পারে? যার ঠিক, তার সবতাতে বিশ্বাস। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী। বিশ্বাস একবার হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের বড় আর জিনিস নেই।

বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একজনের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিলে। বললে, সমুদ্রের ওপারে যাবে তো, ভয় নেই, দিব্যি জলের উপর দিয়ে চলে যাও। বিশ্বাস করে চলে যাও। কিন্তু অবিশ্বাস করেছ কি, পড়েছ জলের তলে। বিশ্বাস করে সোজা চলে যাচ্ছে সে লোক, ঢেউয়ের উপর দিয়ে, চোখ সামনে রেখে ঘাড় খাড়া করে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ মনে হল, কাপড়ের খুঁটে কী বাঁধা আছে একবার দেখি। খুলে দেখে, আর কিছু নয়, শুধু একটি রাম নাম লেখা। এই? শুধু একটি রাম নাম? যেই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল, ঢেউ এসে গ্রাস করলে!

সেই কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস। একবার ঈশ্বরের নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি! অনাময় নির্মল হয়ে গিয়েছি আমি। আর আমাকে কে টলায়! বিশ্বাস করে বসেছি। আকাশ নিজে জানে না তার ব্যাপ্তি কতদূরে। তেমনি আমি নিজে জানি না আমার এ অনুভূতির সীমা কোথায়! কিসের ব্যাপ্তি, কিসের অনুভূতি? আর কিছু নয়, আর কিছু নেই শুধু তুমি আছ। তোমার প্রকাশেই আর সকলে অনুভাত। তুমিই ভূতেশ্বর আত্মা। সর্বলোকচক্ষু সূর্য। বিশ্বাস করে ফেলেছি। আর আমাকে কে ফেলে! এবার জলে পড়লেও জলে ডুবব না। আগুনে পুড়লেও পুড়বে না কপাল। ভবমরুপরিখিন্ন হয়ে পথ চলছিলাম, এবার নেমে পড়েছি এক মনোহর সরোবরে। যত ক্লান্তি আর ক্লেদ, যত সন্তাপ আর অতৃপ্তি সব শান্ত হল অবগাহনে। আর কে আমাকে তোলে সেই সরোবর থেকে? সেই আমার তাপতৃষাহর হরিসরোবর।

দেখ, দেখ, তাঁর অঙ্গকান্তি সেই সরোবরের জল, তাঁর করতল ও পদতল পদ্ম হয়ে ফুটে আছে, তাঁর চক্ষু হচ্ছে মীন আর তাঁর বাহুর আন্দোলন হচ্ছে তরঙ্গলীলা। শুধু শান্তি আর শান্তি। অগাধ ভবজলধি ভেবেছিলাম, এখন দেখি সরল-স্বচ্ছ শীতল সরোবর। তোমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। তুমি কত সহজ! আকাশের মত সহজ, প্রাণের মত সহজ, তৃণের মত সহজ। আমার নিশ্বাসের মত সহজ।

তুমি যে আমার নিশ্বাস, এইটিই বিশ্বাস করেছি আজ।

'ও দেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এল।' বলছেন ঠাকুর, 'মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবাই বললাম, রাম কৃষ্ণ ভগবতী। আবার বললাম, হনুমান। আচ্ছা, সব যে বললাম, এর মানে কি? কি জানো, ঐ যখন চাকর বা ঝি বাজারের পয়সা নেয় প্রথমটা আলাদা-আলাদা করে নেয়, এটা আলুর পয়সা, এটা বেগুনের, এ কটা মাছের। সব থাক-থাক হিসেব করে নিয়ে তারপর দে মিশিয়ে।'

একই অনেক হয়ে মিশেছে। অনেক আবার মিশেছে সেই একে। চাই সেই

বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ওখানে জুজু, তা ঠিক জেনে আছে ওখানে জুজু ছাড়া কেউ নেই। মা বলেছে ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। চোখওয়ালা বিশ্বাস নয়, চোখ বন্ধকরা অন্ধবিশ্বাস। বিচারের পরেও আবার বিচার চলে, কথার পরে আরো কথা। কিন্তু বিশ্বাসের পরে আর কিছু নেই। স্তব্ধতার পরে আবার স্তব্ধতা কি!

ভক্তদের জন্যে মা'র কাছে কাঁদছেন ঠাকুর। মা, যারা যারা তোর কাছে আসছে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিস মা। সব ত্যাগ করাসনি! কী নিয়ে থাকবে, খুব কষ্ট হবে যে! সংসারে যদি রাখিস, এক-একবার দেখা দিস! এক-একবার দেখা না দিলে উৎসাহ পাবে কি করে? শেষে যা হয় করিস, একেবারে বিমুখ করিসনে।

রাম দত্তের বাড়িতে আরেকবার দেখা পেয়েছে ঠাকুরের। জিগগেস করছে আকুল হয়ে, 'বলুন, আমার মনের বাঁক যাবে তো?'

থিয়েটারে এসে সেদিন একটা চিরকুট পেল গিরিশ। কে দিয়েছে? কেউ বলতে পারলে না। লেখা কি? লেখা, আজ রাম দত্তের বাড়ি পরমহংসদেব আসবেন। তাতে গিরিশের কি? জোয়ারের জলে কাছিতে হঠাৎ টান পড়ল, গিরিশ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। অনাথবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে থামল গিরিশ। ওই কি নেমন্তন্নের চিঠি? অচেনা লোকের বাড়ি ওই চিরকুটের নেমন্তন্নে যাব? রামবাবুর সঙ্গে আলাপ নেই, তাঁর নেমন্তন্ন কি এমনি উপেক্ষার চেহারা নেবে? দরকার নেই আমার রবাহূতের দল বাড়িয়ে। কিন্তু ফেরে এমন সাধ্য নেই। তবে ও কার নেমন্তন্ন? চিরকুটটা কি উপেক্ষা? না কি অন্তিকতম আন্তরিকতার ডাক?

রামবাবু খোল বাজাচ্ছে আর ঠাকুর নাচছেন। ছন্দের দৃঢ়তার উপর দাঁড়িয়ে ভাব-কোমল নৃত্য। সঙ্গে গান হচ্ছে: 'নদে টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।'

কাকে বলে প্রেম আর কাকে বলে প্রেমের হিল্লোল সমস্ত প্রাণকে দুই চক্ষুর মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখল গিরিশ। আর কাকে বলে টলমল-করা দেখল একবার অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে। আকাশের তারা আর মর্তের মুহূর্ত নাচছে হাত ধরাধরি করে। এখনো চিনতে পারছে না, তার মনে কি এখনো বাঁক আছে? বাঁকাকে দেখে বাঁক কি এখনো সিধে হয়নি? নাচতে-নাচতে ঠাকুর একবার গিরিশের কাছে এসে পড়েছেন। আর সেইখানেই সমাধিস্থ। মাথাকে নত করে দিল, গিরিশ প্রণাম করল ঠাকুরকে। কীর্তনান্তে ঠাকুর যখন পুরোপুরি নামলেন দেহভূমিতে, গিরিশ জিগগেস করল, আমার মনের বাঁক যাবে?

ঠাকুর বললেন, 'যাবে।'

যেন স্বকর্ণে শুনেও বিশ্বাস করা যায় না, এমনি দ্বিধান্বিতভাবে আবার জিগগেস করল গিরিশ, 'সত্যি, যাবে?'

'যাবে।'

তবু, বার-বার তিনবার।

'ঠিক বলছেন, যাবে আমার মনের বাঁক ?'

'সত্যি বলছি, যাবে, যাবে, যাবে ।'

মনোমোহন মিত্তির বসেছিল পাশে। বিরক্তির ঝাঁজ নিয়ে বললে, 'এক কথা একশোবার জিগগেস করছেন কেন ? উনি বলছেন, যাবে, তবু বার-বার ত্যক্ত করা ।'

কি আস্পর্ধা লোকটার, মুখের উপর সমালোচনা করে ! গর্জে উঠতে যাচ্ছিল, মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল গিরিশ। অনুভব করল তার মনের বাঁক কেটে গেছে। ক্রোধের বদলে দীনতা এসেছে। রূঢ়তার বদলে স্নৈগ্ধ্য। কলহ না করে দেখলে আত্মদোষ। সত্যিই তো, ঠাকুরের এক কথাই একশো সত্যের সমান। তবে কেন অসহিষ্ণু হয়েছিলাম ? ঠাকুরকে কেন বসাতে পারিনি এক কথায় একাসনে ?

পরদিন থিয়েটারে যাবার পথে তেজ মিত্তিরে সঙ্গে দেখা।

'ও মশায়, কাল আপনার জন্যে একটি চিরকুট রেখে এসেছিলাম, পেয়েছিলেন ?

'তুমি কোথায় পেলে ?'

'কোথায় আবার পাব ! থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই, তাই নিজের হাতে লিখলুম চিরকুট ।'

'কিন্তু তোমাকে সংবাদ কে দিলে ?'

'কিসের সংবাদ ?'

বিরক্ত হয়ে ঝাঁজিয়ে ওঠবার প্রশ্ন এই। কিন্তু অদ্ভুত নম্র থেকে গিরিশ বললে, 'রাম দত্তের বাড়িতে পরমহংসদেবের আসার সংবাদ !'

'আর কে দেবে ! স্বয়ং প্রভু। আমাকে বললেন থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে একটা খবর দিও ।'

'আমাকে কেন খবর দিতে বললেন বলতে পারো ?'

'তার আমি কি জানি !' তেজ মিত্তির দু'হাতে শূন্যোয়িত ভঙ্গি করলে ! 'মা কেন তার সন্তানকে ডাকবে, এই কৈফিয়ত আমার জানা নেই ।'

তুমি আমাকে ডাক দিয়েছ এ কি আসেনি আমার আমার কর্ণকুহরে ? আমার অন্তরতিমিরে জ্বলেনি কি তোমার ডাকের দীপশিখা ? হৃদয়ের শুষ্ক মঞ্জরীর মর্মদেশে লাগেনি কি ডাকের লাবণ্যবর্ণ ? বিভাবরী ভোর হল, তোমার ডাকটি এল আজ তপস্বিনী ঊষসীর মূর্তিতে। তোমার ডাক শুনে জাগি আজ অম্লান-নির্মল নেত্রে, শ্যামায়মান প্রাণের সমারোহ। বলবান বিশ্বাসের দুর্বারিতায়। নিমেষের কুশাঙ্কুরকে পায়ে দলে চলব নবতর প্রভাতের আবিষ্কারে। মৃত্যুর উদার তীর্থে। সেই পরমা নিবৃত্তির শেষ প্রান্তে।

ভবনাথকে বলছেন ঠাকুর, 'আসবে হে আসবে ! আমি চেয়েছিলুম ষোলো আনা, গিরিশ আমাকে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দিলে। না দিয়ে যাবে কোথা ? আলো যখন উপচে পড়বে, তখন যাবে কোথা, দিতেই হবে। প্রেম যখন উপচে পড়বে তখন ধরবে কি আর প্রাণপাত্রে ? যাবে কোথায়, ঢালতেই হবে সে মধুপ্লাবন !'

সে দানের ক্ষয় নেই। সে গানের শেষ নেই। আর সে প্রাণ অপরিচ্ছেদ্য।

গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। আর গড়িমসি নয় একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। জানু, পদ, হস্ত, বক্ষ, শির, দৃষ্টি, বুদ্ধি ও বাক্য সহযোগে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। দক্ষিণের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসে আছেন ঠাকুর। সামনে আরেকখানি কম্বলে ভবনাথ বসে।

'এসেছিস ? আমি জানি তুই আসবি। জিগগেস কর একে', ভবনাথের দিকে ইশারা করলেন ঠাকুর, 'তোর কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। বোস, পাশে এসে বোস।'

পায়ের কাছে বসে পড়ল গিরিশ। বললে, 'আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী। আমি যেখানে বসি সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।'

'তাই নাকি ?' অভয়মাখা হাসি হাসলেন ভুবনসুন্দর। বললেন, 'তুই এত পাপী যে পতিতপাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম—তাই না ?'

'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করেছি।'

'পাহাড় করেছিস নাকি ?' ক্লান্তিহরণ হাসি হাসলেন আবার। বললেন, 'ও তো তুলোর পাহাড়। একবার মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।'

অকূলে যেন কূল পেল গিরিশ। যেন আর সে ভেসে যাবে না, তলিয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না। বললে, 'এখন থেকে আমি কী করব ?'

'যা করছিস তাই কর।'

কী করছি ? বই লিখছি। ধারণা নেই, লিখে চলেছি অভ্যাসবশে। লোকে বলে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে অমন জিনিস বেরোয় না কলমে। বিশ্বাসের জোর তো ভারি, কখানা নাটক লেখাচ্ছে। লোকশিক্ষা হচ্ছে নাকি ! মস্ত পণ্ডিত আমি, লোক-শিক্ষা দেবার আর লোক নেই দুনিয়ায় ! ঠাকুরের পদাশ্রয়ে এসে এখনো বই লেখা ! তুচ্ছ পুঁথির পুঁতির মালা তৈরি করা।

'হ্যাঁ, বই লেখাটাও কর্ম। কর্ম না করলে কৃপা পাবে কি করে ? জমি পাট করে রুইলেই তো জন্মাবে ফসল।'

সেই দিনানুদৈনিক কাজ, সেই বই লেখা, সেই থিয়েটার করা—এখনো ঠাকুরের এই ব্যবস্থা ?

হ্যাঁ, এই। কর্মে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে যখন তোর ঘর্ম ঝরে পড়বে তখনই তোর আসল ধর্ম। তবে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওটিই হচ্ছে যুক্ত হবার সেতু। লেগে থাকবার আঠা।

'এখন এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল্।' বললেন ঠাকুর, 'তারপর যদি এই দিক ভাঙে তখন যা হয় হবে। তবে, 'ঠাকুরের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল : 'সকালে-বিকালে স্মরণ-মননটা একটু রাখিস, পারবিনে ?'

মুষড়ে পড়ল গিরিশ। এ আবার কী বাঁধাবাঁধি ! সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠে তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও ! স্মরণ-মননের

সময় কই ! শেষকালে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি আর কি ! কিন্তু কত সামান্য কথা। এটুকুও গিরিশ রাখতে পারবে না ? কোনো কঠিন ব্রত-নিয়ম করতে বলছেন না, নয় কোনো আসন-প্রাণায়াম, নিশান্তে ও দিনান্তে একটু শুধু মনে করে ঈশ্বরকে বাধিত করা। এটুকুতেও গিরিশ অসমর্থ ! লোকে বলবে কি ! কিন্তু মনকে চোখ ঠেরে তো লাভ নেই। সরলতার ঠাকুর, তাঁর সামনে কেন ধরব ছদ্মবেশ ? মুখে যাই বলি মনের কথা তিনি ঠিক নখমুকুরে দেখে নেবেন।

'বহু দিনই সকালের সঙ্গে দেখা হয় না, ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই দুপুর। আর বিকেল ?' গিরিশ কুণ্ঠিত মুখে বললে, 'বিকেল যেখানে কাটে সেখানে আরেক রকম মোহনিদ্রা !'

'বেশ, খাবার আগে ?' ঠাকুরের কত দয়া এমনি ভাবে বলছেন কাতর হয়ে : 'না খেয়ে তো আর থাকিস না ? বেশ তো, খেতে বসে একটু নাম করিস মনে-মনে।'

সত্যি, রোজ খাই তো ? এমন এক-একদিন গেছে কাজে-কর্মে খাওয়াই হয়নি। খেতে বসেছি, কিন্তু এত দুশ্চিন্তা, খাচ্ছি বলে হুঁশ নেই। কোনোদিন দশটায়, কোনোদিন বা বিকেল তিনটেয়। কোনোদিন কতগুলি শিঙাড়া-কচুরি খেয়ে দিন কেটেছে থিয়েটারে। আবার আমার খাওয়া ! আসন নেই, বাসন নেই, ফরাসে বসে ঠোঙায় করে খেয়ে নিলাম। আমার আবার স্থির হয়ে বসে নাম করা !

'ও পারব না।' মাথা চুলকোতে লাগল গিরিশ : 'খাওয়ার আমার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তা ছাড়া খিদের সময় খাবার পেলে আর কিছু তখন মনে থাকে না।'

যেন কত বাহাদুরের মত কথা বলছে। সামান্য একটা অনুরোধ, অত্যন্ত সোজা অত্যন্ত হালকা, তবুও সে অপারগ ! সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে !

কিন্তু ঠাকুর দেখুন তার গহন মনের গোপন মুখচ্ছবি। যা সে পারবে না তা সে বলবে করব ? অসত্যের চেয়ে অক্ষমতা অনেক নির্দোষ।

তবু নিরস্ত হন না ঠাকুর। বললেন, কণ্ঠস্বরে সেই মমতাময় মিনতি, 'বেশ তো, শোবার আগে ? শুতে না শুতেই তো ঘুম আসে না অন্তত এক-আধ মিনিট তো অপেক্ষা করতে হয় ! তখন, সেই এক-আধ মিনিট সময়টুকুর মধ্যে একটু নাম করিস !'

ভালো সময়ই বের করেছ বটে ! আমার কি ওটা ঘুম ? আমার ওটা বিস্মরণ। কিংবা বিস্মরণের সমুদ্রে আত্মবিসর্জন। একটি শুচিস্নিগ্ধ শান্তির জন্যে প্রতীক্ষা নয়, জ্বালা-নিবারণের ওষুধ। আর শুই কোথায় ? কোন বিছানায় ? কার বিছানায় ? মাথা হেঁট করল গিরিশ। বললে, 'আমার ঘুম আসে না। আর ঘুম যদি না আসে নামও আসে না।'

ছি-ছি, এমন করে কেউ প্রত্যাখ্যান করেছে ঠাকুরকে ! গন্ধমাদন আনতে বলেননি, গাণ্ডীব তুলতে বলেননি, চাননি দধীচির অস্থি। বলেননি, গুহায় যাও পর্বতে গিয়ে ওঠো বা অরণ্যে প্রবেশ করো। শুধু একটি চিহ্নিত সময়ে মনের

নির্জনে একটু ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এত সংখ্যা জপ করতে হবে, তাও না। কোনো ধরা-বাঁধা মন্ত্র নয় যে মুখস্থ লাগবে বা উচ্চারণে ভুল হবে। একেবারে বেকড়ার, একেবারে বেকসুর। চোখ পর্যন্ত বুজতে হবে না। একটু শুধু ভাবা। মনে দাগ রাখতে হবে বা স্থান দিতে হবে মনের কোণে এমনও কোনো কথা নেই। শুধু সময়ের উড়ন্ত বাতাসে একটি চপল মুহূর্তের ঘ্রাণ নেওয়া। এটুকুও করতে পারবে না, দিতে পারবে না গিরিশ? ছি-ছি, তবে সে জন্মেছিল কেন মানুষ হয়ে? কিন্তু বৃথা বড়াই করে লাভ নেই। গিরিশ নিজেকে তো জানে। কেমন সে বাউণ্ডুলে কেমন সে ছন্নমতি! শেষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারে! আসলে ভগবানের যে নাম করব তাঁর কৃপা না হলে হবে কি করে? এই যন্ত্রে যে তিনি ঝংকার তুলবেন যন্ত্র নিজের হাতে তো তাঁকে বেঁধে নিতে হবে! বাঁধবার সময় ব্যথা লাগবে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই ব্যথাই তো কৃপা। কিন্তু, এ কি, এ কৃপা যে ব্যথাহীন। এ কৃপা যে অহেতুক।

'বেশ, তোকে কিছুই করতে হবে না।' ঠাকুর বললেন প্রসন্নাস্যে : 'আমাকে তুই বকলমা দে।'

তার মানে ?

তার মানে, তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে! তোর হয়ে আমিই নাম করব। তুই শুধু কলম ছুঁয়ে দে, আমি সই করব তোর হয়ে।

আর কি চাই! আমার একেবারে ছুটি, আমি নেচে-গেয়ে আনন্দ করে বেড়াব। যা করবার প্রভু করবেন। আমি নন্দের গোপাল হামা দিয়ে বেড়াব। তিনি ধুলো মুছে কোলে তুলে নেবেন। কিন্তু এ কি গিরিশ ছুটি পেল, না, বাঁধা পড়ল দ্বিগুণ শৃঙ্খলে? বাঁধা পড়ল। গিরিশের আর আমি রইল না। ঠাকুর যখন ভার নিয়েছেন তখন নিজের আর কোনো কর্তৃত্ব নেই, সব তাঁর ইচ্ছাধীন। আমার হয়ে তিনি সত্যি নাম করছেন কিনা এটুকু প্রশ্ন করবারও আর অধিকার নেই। সব তাঁর খুশি, তাঁর এক্তিয়ার। ভার নেওয়া কঠিন হতে পারে, ভার দেওয়াও কম কঠিন নয়। ভার দেওয়া মানে পালিয়ে যাওয়া নয়, ভার দেওয়া মানে কোলের উপর বসা, কাঁধের উপর চড়া। নইলে, ভার যে দিলাম চাপিয়ে, বোঝাব কি করে?

আমার হয়ে সত্যি নাম করছেন কিনা--মাঝে-মাঝে এ চিন্তা আসে। এমনিতে হলে একবার নাম হত, এ চিন্তায় দুবার করে হচ্ছে, প্রথমত, নাম হচ্ছে কিনা—নামই রাম—আর দ্বিতীয়ত, ঠাকুর করছেন কিনা। নামের সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরের মূর্তি মনে ভাসছে। একের জায়গায় দুই হচ্ছে। এ যে অছি বসিয়ে দেওয়া। আর 'আছি' নয়, এবার অছি। আর 'আমি' নয়, এবার তুমি। আমার বলে আর কিছু নেই সংসারে। আমার কলম তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। পা-টি ফেলছি এ আমার জোরে নয়, তোমার জোরে। নিশ্বাসটি ফেলছি এ আমার কেরামতি নয়, তোমার করুণা।

'বকলমা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানত! সময় করে নাম করা

যেত তার একটা অন্ত থাকত। এ যে একেবারে অন্তরের মধ্যে এসে পড়লুম।' গিরিশ বলছে তদ্‌গত হয়ে : 'কোথাও একটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বকলমা দেওয়া মানে গলায় বক্‌লস লাগানো। খাস ছেড়ে দিয়ে দাস বনে যাওয়া!'

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। পুত্র মারা গেল। উপায় নেই, বকলমা দিয়েছে। মনকে প্রবোধ দেয় গিরিশ : 'তুমি কী জানো কিসে তোমার মঙ্গল, ঠাকুর জানেন। তুমি তাঁর উপর তোমার ভার দিয়েছ তিনিও নিয়েছেন সে-ভার। এখন তো বিচার চলবে না, সমালোচনা চলবে না। দলিলে এমন কোনো লেখাপড়া নেই কোন পথ দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবেন। তুমি তোমার জীবনস্বত্ব দান করে দিয়েছ ঈশ্বরকে। এখন তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যা খুশি করুন, মারুন-কাটুন, ফেলুন-ভাঙুন, তোমার কিছু বলবার নেই। তাঁর কুলালচক্রে তুমি এখন এক তাল নরম কাদা হয়ে যাও।'

তাই হোক। তাই হোক। আমাকে তুমি নিযুক্ত করো। আমার বাক্যকে নিযুক্ত করো তোমার গুণকথনে, কর্ণকে নিযুক্ত করো তোমার রসশ্রবণে, হস্তকে নিযুক্ত করো তোমার মঙ্গলকর্মে। মন থাক তোমার পদযুগে, মাথা থাক তোমার জগৎপ্রণামে আর দৃষ্টি থাক দিকে দিকে তোমারই মূর্তিদর্শনে।

'যার যা মনের পাপ আছে, অকপটে জানাও ঈশ্বরকে।' বলছেন ঠাকুর বরদ-মূর্তিতে : 'যিনি বিন্দুকে সিন্ধু করতে পারেন তিনি পারেন পাপকে মার্জনার পারাবারে ডুবিয়ে দিতে।'

'কি করে জানাব!' গিরিশ কেঁদে পড়ল, 'আমি যে দুর্বল।'

'তা কি ঠাকুর জানেন না? খুব জানেন। তাই, একবার তাঁর শরণাগত হও, সব সমাধান হয়ে যাবে। শরণাগতকে শ্রীহরি পরিত্যাগ করে না। দীনের ত্রাণকর্তা তিনি, নিশ্চয়ই তোমাকে ত্রাণ করবেন।'

'আমি কি হরি-টরি কাউকে চিনি? আমি চিনি তোমাকে।' গিরিশ জোড় হাত করল : 'তোমাকে বকলমা দিয়েছি। তুমি নিয়েছ আমার ভার। তুমিই আমার ভারহরণ—'

১০৬

কেদার চাটুজ্জেরও সেই কথা। গোড়ায় ব্রাহ্ম ছিল এখন ভক্তিতে সাকারবাদী হয়েছে। এত দৃষ্টিময় স্বাদময় হয়েছে যে বলছে দক্ষিণেশ্বরে এসে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না, এখানে পেটভরা পেলুম।'

'সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার।' কেদারকে বলছেন ঠাকুর, 'সাধুই ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কেদার বললে, 'যেমন রেলের এঞ্জিন। পেছনে কত গাড়ি বাঁধা

থাকে, টেনে নিয়ে যায়। কিংবা যেমন নদী। কত লোকের পিপাসা মেটায়। তেমনি সব মহাপুরুষ। তেমনি আপনি।'

ঈশ্বরের কথায় চোখ জলে ভেসে যায় কেদারের। সংসারে রুচি নেই। মন যেন পাদপদ্মলোভী মধুকর। কালীঘরে মাকে প্রণাম করে এসেছেন, চাতালে বেরিয়ে এসে ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হয়ে। চেয়ে দেখলেন সামনে কেদার, রাম, মাস্টার আর তারক।

তারক মানে বেলঘরের তারক মুখুজ্জে। প্রথম যখন এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে, চার বছর আগের কথা, তখন তার বয়স মোটে কুড়ি। বিয়ে করেছে। বাপ-মা আসতে দেয় না ঠাকুরের কাছে। কিন্তু ঠাকুর যে বাপ-মা'র চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। সঙ্গে সেবার একটি বন্ধু নিয়ে এসেছে। নাস্তিবাদী বন্ধু। নাকের ডগায় সব সময়ে একটু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, ছোট খাটটিতে বসে আছেন ঠাকুর। তারককে দেখে শিশুর মত খুশি হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গের ওই ল্যাজটি কোত্থেকে জুটিয়ে আনল? বন্ধুটিকে ঠাকুর বললেন, 'একবার মন্দির দেখে এস না।'

বন্ধু উপেক্ষার একটি ভঙ্গি করল। বললে, 'ও সব ঢের দেখা আছে।'

'শোন্', তারককে কাছে ডাকলেন ঠাকুর, 'বিশালাক্ষীর দ, মেয়েমানুষের মায়াতে যেন ডুবিসনি। যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না। তোর অনেক শক্তি, তুই পড়বি কেন? দেখি তোর হাত দেখি।'

ঠাকুর তারকের হাতের ওজন নিচ্ছেন। বললেন, 'একটু আড় যে নেই তা নয়। আছে। কিন্তু, আমি বলছি ওটুকু যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবি আর মাঝে মাঝে আসবি এখানে।'

তারক মাথা নোয়ালো। বললে, 'বাবা-মা আসতে দেয় না।'

'জোর করে আসবি। বাপ-মা শিরোধার্য, কিন্তু ঈশ্বরের চেয়েও কম।'

'এটা কি বললেন মশাই?' সেই বন্ধু ফোড়ন দিল: 'যদি কারু মা দিব্যি দিয়ে বলে ছেলেকে, যাসনি দক্ষিণেশ্বরে, সে যাবে? মা'র অবাধ্য হবে?'

'যে মা ওকথা বলে সে মা নয়, সে অবিদ্যা। সে মা'র অবাধ্য হলে কোনো দোষ হয় না।' বললেন ঠাকুর: 'ঈশ্বরের জন্যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে, কিন্তু মনে রাখিস্ শুধু ঈশ্বরের জন্যে। তা ছাড়া অন্য সব কথা মাথা পেতে শুনতে হবে বাপ-মা'র। নির্বিবাদে, তর্ক-বিচার না করে।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন শাস্ত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে?' বন্ধু আবার চিপটেন কাটলো।

'বহু। ভরত রামের জন্যে শোনেনি কৈকেয়ীর কথা। প্রহ্লাদ কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি হিরণ্যকশিপুর শাসন। বলি শোনেনি গুরু শুক্রাচার্যের কথা, জ্যেষ্ঠ ভাই রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। আর গোপীরা? কৃষ্ণের জন্যে শোনেনি পতিদের নিষেধ। কি বাপু মিলছে শাস্ত্রের সঙ্গে?'

ওরা চলে গেলে পর ঠাকুর শুয়েছেন ছোট খাটটিতে, আর বলছেন মাস্টারকে,

'বলতে পারো, ওর জন্যে আমি এত ব্যাকুল কেন ? সঙ্গে ওটাকে আবার কেন নিয়ে এল ?'

'বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী।' বললে মাস্টার, 'অনেকটা পথ তাই একজনকে সঙ্গে করে এনেছে।'

যদি সঙ্গী কেউ না জোটে ঈশ্বরই তোর সঙ্গী। ঐ নির্জনতাই তোর নিবিড়তা। কেউ সঙ্গে নেই বলেই তো সে চলেছে তোর পাশে-পাশে।

কালীঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে ফের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। তারকের চিবুক ধরে আদর করলেন।

'নরেন রাঙাচক্ষু রুই, কিন্তু তুই হচ্ছিস মৃগেল।'

ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘরের মেঝেতে বসেছেন ঠাকুর। পা দুখানি সামনের দিকে প্রসারিত। রাম আর কেদার নানা জাতের ফুল দিয়ে সে পা দুখানা বন্দনা করছে। ঠাকুরের দুপায়ের দুই বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছে কেদার। বিশ্বাস, স্পর্শে শক্তি সঞ্চার হবে। কিন্তু তাইতেই কি হয় ? যিনি দেবার তিনি যদি না দেন শুধু তাঁর আঙুল ধরলে কিছু হবে না।

'মা, ও আমার আঙুল ধরে কি করতে পারবে ?' ঠাকুর বলছেন অর্ধবাহ্যদশায়। কেদার তো অপ্রস্তুত। মনের কথা কি করে টের পেয়েছেন অন্তর্যামী! তাড়াতাড়ি আঙুল ছেড়ে দিয়ে হাত জোড় করলে।

মনের আরো কথা যেন টের পেয়েছেন। গোপনীয় নিগূঢ় কথা। প্রকাশ্যেই তাই বলছেন ঠাকুর, 'মুখ বললে কি হবে যে মন নেই, কামকাঞ্চনে এখনো তোমার মন টানে! আমি বলি কি এগিয়ে পড়ো। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে কোরো না যে সব হয়ে গেছে। চন্দন গাছের বনের পর আরো আছে, রুপোর খনি, সোনার খনি, হীরে-মাণিক। এখুনি থামলে চলবে কেন ?'

কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে কেদারের। রামের দিকে চেয়ে বলছে ভয়ে-ভয়ে, 'ঠাকুর এ কি বলছেন।'

ঠিকই বলছেন। এমনি তো মনের মুখোমুখি হবে না, খালি পাশ কাটিয়ে যাবে। ঠাকুর মনের সঙ্গে সম্মুখ-সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিলেন। এখন দেখ একবার নিজের নির্ভেজাল রূপটুকু, আর আত্মতৃপ্তির আবরণ টেনে রেখো না। দেখ এখনো কত বিকৃতি, কত বৈচিত্ত্য। কৃপা পেয়েছ বলেই তো পেলে এই আত্ম-দর্শনের সুবিধে। দর্পণ আবার মার্জনা করো। ক্ষালন করো ক্ষতক্লেদ।

'এই কামকাঞ্চনই আবরণ। এত বড়-বড় গোঁফ, তবু তোমরা ওতেই রয়েছ জুজু হয়ে। বলো, ঠিক বলছি কিনা, মনে-মনে দেখ বিবেচনা করে—'

কেদার চুপ করে আছে। ঠিক বলছেন।

'যাকে ভূতে পায় সে জানতে পায় না তাকে ভূতে পেয়েছে। যারা কামকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবাবোড়ে খেলে, তারা অনেক সময় জানে না, কি ঠিক চাল! কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে তারা বুঝতে পারে।'

একদিন কেদারের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ঠাকুরের, পারলেন না। বললেন, 'ভিতরে অংকট-বংকট। ঢুকতে পারলাম না। বললাম তো, আসক্তি থাকলে হবে না। তাই তো ছোকরাদের অত ভালোবাসি। ওদের ভিতর এখনো বিষয়বুদ্ধি ঢোকেনি। অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই টান ঈশ্বরের দিকে। যেন বনের মধ্যে ফোয়ারা বেরিয়ে পড়েছে। জল একেবারে বেরুচ্ছে কলকল করে।'

সেদিন আপিস যাবার পথে কেদার এসে হাজির। সরকারী একাউণ্টেণ্টের কাজ করে, থাকে হালিসহরে। সেখান থেকে কলকাতায় আসে। আসবার পথে কি মনে করে ঢুকেছে আজ দক্ষিণেশ্বরে। আপিসের পোশাক পরনে, চাপকান গায় ঘড়ি আর ঘড়ির চেন। হঠাৎ মন কেমন ব্যাকুল হয়েছে, দেখে যাই একবার ঠাকুরকে। যেই মনে হওয়া, অমনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সটান দক্ষিণেশ্বর।

তাকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবনলীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বলহয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ও রাধিকার ভাবে গেয়ে উঠলেন গদগদ হয়ে: 'সখি, সে বন কতদূরে! যেথায় আমার শ্যামসুন্দর! আর যে চলিতে নারি।'

ঠাকুর দেখলেন কেদারের অন্তরে গোপীর ভাব। তার সেই ব্যাকুলতাটাই কৃষ্ণান্বেষিণী গোপবালা।

ব্রজবন থেকে কৃষ্ণ যখন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন তখন গোপীদের কী দশা? বন হতে বনান্তরে খুঁজতে লাগল পাগলের মত। অশ্বত্থ আর অশোক, কিংশুক আর চম্পক, হে পরার্থজীবিত বৃক্ষ, আমাদের প্রিয়তম কোন পথ দিয়ে চলে গেল তা কি তোমরা দেখেছ? হে তুলসী, যার বুকে থেকেও যার পদযুগল ধ্যান করো, তুমি কি দেখেছ কোথায় পড়েছে তার পদধূলি? মালতী আর যূথিকা, করস্পর্শে তোমাদের শিহরিত করে তিনি কি গেছেন এই পথ দিয়ে? সখীগণ দেখ, দেখ, এই ব্রততী শরীরে পুলক ধারণ করে বিরাজ করছে, তবে কি তিনি একে নখাঘাত করে চলে গেছেন? হে তৃণাঞ্চিত পৃথিবী, কোন পুরুষভূষণের আলিঙ্গনে তোমার এই নবীন রোমাঞ্চ? কৃষ্ণবিরহে আমরা বিগতপ্রাণা, আমাদের পথ বলে দাও। পতি-পুত্র দ্বারা বারিতা হয়েও আমরা নিবৃত্ত হইনি। লোলায়িতকুণ্ডলকর্ণে ছুটে এসেছি এখানে। কেউ গোদোহন ফেলে এসেছি, কেউ বা দুগ্ধাবর্তন; কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিলাম, কেউ বা করছিলাম অন্নপরিবেশন, কেউ বা অঙ্গরাগলেপন—যার যা হাতের কাজ সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটে এসেছি তাঁর বাঁশি শুনে। সেই অরবিন্দনেত্র এতক্ষণ তো ছিলেন আমাদের সামনে, তিনি কোথায় গেলেন? কেন অদৃশ্য হলেন? এই ব্যাকুলতাটিই বাস করছে কেদারের বুকের মধ্যে। এই ব্যাকুলতাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব বিধিবন্ধনের কাঁটাবেড়া।

অধর সেন বললে, 'শিবনাথবাবু সাকার মানেন না।'

'সেটা হয়তো তাঁর বোঝবার ভুল।' বললে বিজয় গোস্বামী। ঠাকুরের দিকে ইশারা করলে: 'ইনি যেমন বলেন, বহুরূপী কখনো এ রঙ কখনো সে রঙ। যার গাছতলায় বাসা সে ঠিক খবর রাখে। আমি ধ্যান করতে-করতে দেখতে পেলাম

চালচিত্র। কত দেবতা, কত কি! আমি বললাম, আমি অত-শত বুঝি না, আমি তাঁর কাছে যাব, তবে বুঝব।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ঠিক-ঠিক দেখা হয়েছে।'

কেদারের মধ্যে তন্ময়তা এল। বললে, 'ভক্তের জন্যে সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন শ্রীহরিকে দর্শন করল, বললে, কুণ্ডল কেন দুলছে না? শ্রীহরি বললেন, তুমি দোলালেই দোলে।'

'সব মানতে হয় গো সব মানতে হয়—নিরাকার সাকার সব। কালীঘরে ধ্যান করতে-করতে দেখলুম, রমণী। বললুম, মা, তুই এরূপেও আছিস? কোন্ রূপে কার সামনে কখন এসে দাঁড়াবেন কেউ জানে না।'

'যাঁর অনন্ত শক্তি', বললে বিজয়, 'তিনি অনন্তরূপে দেখা দিতে পারেন।'

'সেই যে গো চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল।' বললেন ঠাকুর, এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবার এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব। তেমনি একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বা বেদান্ত পড়ে লোকে মনে করে আমি সব বুঝে ফেলেছি।'

নবগোপাল ঘোষ একবার তিন বছর আগে এসেছিল। তারপর ভুলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরের কথা। কিন্তু ঠাকুর ভোলেননি। কি জানি কেন, তিন বছর বাদে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালেন। নবগোপাল তো অবাক। আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি অথচ তুমি আমাকে ভোলোনি। কিংবা এতদিন ভুলিয়ে রেখে শুভক্ষণ দেখে ডেকে পাঠিয়েছ। নবগোপাল পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'কামকাঞ্চনে ডুবে আছি, কি করে আমার ত্রাণ হবে!'

'কোনো চিন্তা নেই।' ঠাকুর বললেন স্নিগ্ধাননে, 'দিনে শুধু একবারটি আমায় মনে কোরো। শুধু একবার।'

গুরু-শিষ্য বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। যিনি ইষ্ট তিনিই গুরুরূপ ধরে আসেন। শব-সাধনের পর যখন ইষ্টদর্শন হয় তখন গুরু এসে শিষ্যকে বলেন তুইই গুরু তুইই ইষ্ট। যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'তাই তো বলে গুরুর মাথা শিষ্যের পা।'

'বোঝো মানে।' বললে নবগোপাল, 'শিষ্যের মাথাটা গুরুর আর গুরুর পা শিষ্যের।'

'না, ও মানে নয়।' বললে গিরিশ, 'বাপের ঘাড়ে ছেলে চড়েছে। শিষ্যের পা এসে ঠেকেছে গুরুর মাথায়।'

'তবে তেমনি কচি ছেলে হতে হয়।' বললে নবগোপাল, 'কচি ছেলে হলেই তবে বাপ তুলবে কাঁধের উপর।'

হতে হবে সরলশুভ্র। হতে হবে লঘুমুদু। হতে হবে মানহীন ভারহীন সহায়-সম্বলহীন। মা তখন ছেলেকে ধুলো থেকে কোলে, কোল থেকে কাঁধে তুলে

নেবেন। চুমু খাবেন পদাম্বুজে।

বেলঘরের তারক মুখুজ্জে অমনি এক খাঁটি ছেলে, কাঁচ ছেলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখলেন, তাঁর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে চলেছে তারকের পিছু-পিছু। তারক অসহায়, তারক আশ্রিত অর্পিতসর্বস্ব। তাই তাকে একা ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তার সঙ্গ নেন, হাত ধরেন, পথ দেখান, শ্রান্ত হলে নেন তাকে কাঁধে করে।

কয়েকদিন পর আবার এসেছে, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে তারকের বুকের উপর পা তুলে দিলেন। তারক আর কি চায়! যমভয়লয়কারী পরম পদ। কারুণ্যকল্পদ্রুমের ধ্রুবচ্ছায়া! এ পদের বাইরে আর কী সম্পদ চাইবার আছে!

'খুব উঁচু ঘর তারকের। তবে শরীর ধারণ করলেই ত গোল। স্খলন হল তো সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই দেহধারণ।' বললেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত বলে উঠল, 'যাঁরা অবতার তাঁদেরও কি বাসনা থাকে?'

সরল ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'কে জানে! তবে আমার দেখছি সব বাসনা যায়নি। এক সাধুর আলোয়ান দেখে ইচ্ছে হয়েছিল অমনি পরি একখানি। সেই ইচ্ছে এখনো আছে। জানি না আবার আসতে হবে কিনা—'

বলরাম বসেছিল পাশে। হেসে উঠল শিশুর মত। বললে, 'আপনার জন্ম হবে কি ঐ আলোয়ানের জন্যে?'

'কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সৎ কামনা রাখতে হয়। ঐ চিন্তা করতে-করতে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে। হয়তো গেল না শ্রীক্ষেত্র। তা হলে জগন্নাথ ভাবতে-ভাবতে শরীর যাবে।'

ঘরের মধ্যে একজন গেরুয়াধারী লোক ঢুকল। ঠাকুরকে প্রণাম করলে।

চিরকাল ঠাকুরকে ভণ্ড বলে এসেছে। তবু প্রণাম করবার ঘটা দেখ।

বলরাম হাসছে। ঠাকুর বলছেন, 'বলুক গে ভণ্ড। হাসিসনি। কে জানে ভেক ধরেই হয়তো ওর ভিক্ষে মিলবে। ভেকেরও আদর করতে হয়। ভেক দেখলেও উদ্দীপন হয়তো সত্যবস্তুর।'

১০৭

মনোমোহন মিত্তিরও ঈশ্বর মানে না। মেসো রায় বাহাদুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বন্ধু বলতে রাম দত্ত, আরেক মেসোর ছেলে। সমপন্থী নাস্তিবাদী। ব্রাহ্মসমাজের আওতায় এসেছে দুজনে। অথচ কেশব সেনই দক্ষিণেশ্বরে কোন এক সাধুর কথা লিখেছে কাগজে। কেশব যখন লিখেছে তখন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চল দেখে আসি। নাস্তিকে-নাস্তিকে মাসতুতো ভাই।

এল দুজন দক্ষিণেশ্বরে। রাম দত্ত তখন ডাক্তার, মেডিকেল কলেজে চাকরি করে, আর মনোমোহন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চল্লিশ টাকার কেরানি। এসে দেখে ঠাকুরের দরজা বন্ধ। অবিশ্বাস নিয়ে এসেছে, বন্ধ তো থাকবেই। শরণাগতি নিয়ে আসত, খোলা পেত। শরণাগতি কি সহজে আসে?

'ওরে হৃদে, মস্ত এক ডাক্তার এসেছে।' ঠাকুর বললেন হৃদয়কে: 'তোর কি ভাগ্যি! নাড়ী দেখাবি তো এবেলা দেখিয়ে নে।'

হৃদয় তখুনি বাড়িয়ে দিল হাত। রাম দত্তও দিব্যি পরীক্ষা করল। কিন্তু হৃদয়ের হাত দেখে কি হবে! ঠাকুর রামকৃষ্ণের পা কই?

ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে মনোমোহন, বিশ্বাসের পর্বত ভেদ করে নির্গত হয়েছে ভক্তির নির্ঝরিণী, ইচ্ছে হল পা দুখানি টেনে নেয় বুকের মধ্যে। কিন্তু, কেন কে জানে, সেদিন পা দুখানি গুটিয়ে নিলেন ঠাকুর। অভিমানে ফুলে উঠল মনোমোহন। বললে, 'বড় যে পা গুটিয়ে নিলেন! শিগগির বার করুন, নইলে কাটারি এনে পা দুখানি কেটে নিয়ে যাব। আমার একার নয় সকল ভক্তের সাধ মেটাব বলে রাখছি।'

প্রার্থনায় না পাই, অভিমান করে নেব। নেব ছল করে জোর করে কৌশল করে। তাড়াতাড়ি পা বার করে দিলেন ঠাকুর।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার উদ্যোগ করছে, মাসি এসে বাধা দিল। বললে, যাস নে ওখানে। মাসির বাড়িতে থাকে তাঁর কথার অমান্য করা যায় না, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে না গিয়েই বা থাকা যায় কি করে। রাম দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেল তাই চুপি-চুপি। গিয়ে দেখে ঠাকুরের মুখ ভার। কি হল?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু মাসি তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় মাসির কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে!'

আরেকদিন দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে, বাধা দিল স্ত্রী। বললে, 'মেয়েটার অসুখ, যেয়ো না বাড়ি ছেড়ে।' কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ডাক যে ত্রৈলোক্যাকর্ষী বংশীর ডাক। স্ত্রীর কথা তাই কানে তুলল না। এবার আর সঙ্গে নিল না রামকে। কৃতকর্মের ফল সে নিজেই বহন করবে বলে একা গেল। গিয়ে দেখে ঠাকুর বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?

'ভক্ত আসতে চায় দক্ষিণেশ্বরে কিন্তু তার স্ত্রী তাকে আসতে দিতে নারাজ। ভয় হয় বউয়ের কথা শুনে সে আসা না বন্ধ করে।'

আসা বন্ধ করল না মনোমোহন। আর, থেকে-থেকে সঙ্গে আছে রাম দত্ত।

দুই নিরীহ গৃহস্থ কিন্তু আসলে বিরাট আবিষ্কর্তা। মনোমোহন আবিষ্কার করল রাখালকে, রাম দত্ত নরেনকে। শুধু সন্ধান দিল না, ধরে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। প্রতীক্ষিত বাবুদের কাছে দুই উড়ন্ত বহ্নিকণা।

মনোমোহন, মহিমাচরণ আর মাস্টার বসে আছেন। মনোমোহনের দিকে চেয়ে বলছেন ঠাকুর, 'সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, কিন্তু আমি দেখছি রামই সব এক-একটি হয়েছেন।'

'তবে আপনি যেমন বলেন, আপো নারায়ণ—জলই নারায়ণ, তেমনি।' বললে মনোমোহন, 'জল কোথাও খাওয়া যায়, কোথাও বা মাত্র মুখে দেওয়া চলে, কোথাও বা শুধু বাসন মাজা।'

'ঠিক তাই। কিন্তু তিনি ছাড়া কিছু নেই। জীব-জগৎ সব তিনি।'

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সব তুমি। মন-বুদ্ধি-অহংকার সব তুমি। পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সব তুমি। তুমিই ভোক্তা-ভোজ্য, আধার-আধেয়। তুমিই অখণ্ড-মণ্ডলাকার।

হাটখোলার সুরেশ দত্ত নাগমশায়ের বন্ধু। ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে দৃঢ়ীভূত। ঠাকুরকে একবার ভোগ দেবে, নতুনবাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে পাঠিয়েছে গাড়ি করে। নিজে চলেছে পায়ে হেঁটে, দইয়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে। গাড়িতে দিলে ঝাঁকুনিতে দই পাছে চলকে যায়, তাই এই ক্লেশসাধন। ভোগের দই, ভ্রষ্ট হতে পারবে না। তেমনি আমিও অভঙ্গ থাকব।

তেইশ নম্বর সিমলে স্ট্রিট মনোমোহনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসেছেন বৈঠকখানায়। বলছেন, 'যে অকিঞ্চন যে দীন তারই ভক্তি ঈশ্বরের সব চেয়ে প্রিয়। খোলমাখানো জাব যেমন গরুর প্রিয়। দুর্যোধনের কত ধন কত ঐশ্বর্য, তার বাড়ি ঠাকুর গেলেন না। গেলেন বিদুরের বাড়ি।'

পরামর্শের জন্যে বিদুরকে ডাকলেন ধৃতরাষ্ট্র। কত কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে, কিছুই সুফল আনল না। জতুগৃহে দগ্ধ হল না। দ্যূতক্রীড়ায় হেরে গেল, দ্রৌপদীর বেশাভিমর্ষ হল, বনবাস-সত্য পালন করে ফিরে এল পাণ্ডবেরা। রাজ্যভাগ দাবি করল কৃষ্ণ। এসেছিল অনুনয় করতে, ফিরিয়ে দেওয়া হল। এখন বিদুরের কি মত ?

বিদুর বললে, 'মহারাজ, কুরুকুলের কুশলের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে দিন তার রাজ্যভার। অশিব দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন।'

আর যায় কোথা ! এ দাসীপুত্রকে কে ডেকে আনল এখানে ? যার অন্নে পুষ্ট তারই সে বিরুদ্ধতা করছে ? শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রেখে একে এখুনি তাড়িয়ে দাও পুরী থেকে। গর্জে উঠল দুর্যোধন।

এও ভগবানেরই লীলা। দ্বারদেশে ধনুর্বাণ রেখে বেরিয়ে পড়ল বিদুর। পরিধানে কম্বল, ধূলিরুক্ষ কেশপাশ, বেরিয়ে পড়ল তীর্থোদ্দেশে। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।' সর্বাবস্থায় যিনি সর্বচিত্তাকর্ষক। এত মধুর নিজের পর্যন্ত মনোহরণ করেন, নিজেকে নিজেই চান আলিঙ্গন করতে।

যে আকাঙ্ক্ষা অভাব থেকে জাগে তা দূষণস্বরূপ। আর যে আকাঙ্ক্ষা স্বভাব থেকে জাগে তা ভূষণস্বরূপ। ঈশ্বরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তের প্রীতিরস-আস্বাদন। যত খান তত চান। কাউকে ছাড়েন না, যার থেকে যতটুকু পান নিংড়ে-নিংড়ে নেন। শ্রেষ্ঠকে পেলেও কনিষ্ঠকে ছাড়েন না, উত্তমকে পেলেও ছাড়েন না অধমকে। তিনি আর কারু বশীভূত নন শুধু ভক্তের বশীভূত। আর কারুতে বৎসল নন শুধু ভক্তে বৎসল।

'বৎসের পিছে যেমন গাভী যায় তেমনি ভক্তের পিছে ভগবান যান।' বললেন ঠাকুর। কথক প্রহ্লাদচরিত বলছে। হিরণ্যকশিপু যেমন নিন্দা করছে হরির, তেমনি নির্যাতন করছে প্রহ্লাদকে। তবু প্রহ্লাদের বিচ্যুতি নেই। হরিকে প্রার্থনা করছে, হে হরি, বাবাকে সুমতি দাও। আর আমাকে? আমাকে দাও অবিসংবাদিনী ভক্তি।

ঠাকুর কাঁদছেন। পাশে বসে বিজয়, মনোমোহন, সুরেন্দ্র। বলছেন বিহ্বল কণ্ঠে, 'আহা, ভক্তিই সার। সর্বদা তাঁর নাম করো, ভক্তি হবে। দেখ না শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে-ফেলা ছানাবড়া!'

পরে আবার যখন এলেন মনোমোহনের বাড়ি, ঈশান মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। ঈশান বলছে, 'সবাই যদি সংসার ত্যাগ করে তা হলে কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ হয় না?'

'সবাই কেন ত্যাগ করবে? যাকে দিয়ে করাবার তাকে দিয়ে করাবেন। জোর করে কি কেউ ত্যাগ করতে পারে? মর্কট বৈরাগ্য কি বৈরাগ্য?' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন। সেই যে বিধবার ছেলে, মা সুতো কেটে খায়, একটু কাজ পেয়েছিল সে কাজ চলে গিয়েছে। বেকার হয়ে বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরল, কাশীবাসী হল। কিছুদিন পরে মাকে চিঠি লিখলে। মা, আমার একটি চাকরি হয়েছে, দশ টাকা মাইনে। ওই মাইনে থেকেই সোনার আংটি কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের বাসনা যাবে কোথায়?

দ্বিতীয়বার, প্রাঙ্গণে বসেছেন। কেশব এসে প্রণাম করল। গৃহস্থ ভক্তেরা চার দিকে ব'সে।

'সংসারে কর্ম বড় কঠিন।' বলছেন ঠাকুর, 'বন্‌বন্‌ করে যদি ঘোরো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই। ঘুরবে কিন্তু পড়বে না। কর্ম করো চুটিয়ে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না।'

'বড় কঠিন!' কে একজন বললে। 'তবে উপায় কি?'

'উপায় অভ্যাসযোগ। ছুতোরের মেয়ে একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, কিন্তু সর্বক্ষণ মন রয়েছে মুষলের দিকে।'

অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। কাঁদতে-কাঁদতে শোক, খেতে-খেতে খিদে। ডাকতে-ডাকতে ভালোবাসা। চলতে-চলতে পথ পাওয়া। প্রদীপ জ্বালতে-জ্বালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠা! হোক কঠিন। কঠিন বলেও যদি নিবৃত্ত না হও তবেই তো কৃপা করবেন। যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারাই তো বীর ভক্ত। মাথায় বিশ মণ বোঝা তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। যখনই ভগবান দেখেন এই বীরত্বের কৃতিত্ব তখনই কৃপাস্পর্শে তাকে তিনি মর্যাদা দেবেন। তাঁর কৃপাস্পর্শে সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

'ভক্তি লাভ করে কর্ম করো।' বলছেন ঠাকুর, 'শুধু কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আটা লাগবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আর আটা লাগবে না।'

নিজে একজন খুব বড় ভক্ত, মনে-মনে ঘোরতর স্পর্ধা মনোমোহনের। এ একরকম ভক্তির অহমিকা। কিন্তু ঠাকুর তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন। একদিন বললেন সকলের সামনে, 'সুরেশের ভক্তিই সকলের চেয়ে বেশি।'

মনোমোহনের অভিমানে ঘা লাগল। ভাবল, তবে আর ঠাকুরের কাছে গিয়ে লাভ কি। ছাড়ল দক্ষিণেশ্বর। রবিবার-রবিবার বৈঠক বসত সেখানে, তারও চৌকাঠ মাড়াল না।

কি হল হে তোমার বন্ধুর ? আর আসে না কেন ? ভালো আছে তো ? রাম দত্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

রাম দত্ত কিছুই জানে না। খোঁজ নিয়ে জানল ভালোই আছে। তবে যাও না কেন ? আমার খুশি।

ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠালেন। মনোমোহন তা গ্রাহ্য করল না। বললে, 'আমাকে তাঁর কি দরকার ! তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন। আমি তাঁর কে !'

অভিমানের কথা ! আমার যখন ভক্তি নেই তখন আমাকে আবার ডাকা কেন !

বারে-বারে লোক পাঠাতে লাগলেন ঠাকুর, আর বারে-বারেই তাদের ফিরিয়ে দিলে। বিরক্ত হয়ে মনোমোহন কোন্নগরে চলে গেল, সেখান থেকেই আফিস করতে লাগল, যাতে ঠাকুরের লোক তাকে ধরতে না পায়। ঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। কোন্নগর পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। একদিন পাঠিয়ে দিলেন খোদ রাখালকে।

রাখালকে ফিরে যেতে দিল না মনোমোহন। সঙ্গের লোকটিকে বলে দিল, 'ঠাকুরকে গিয়ে বোলো, ভক্তিহীনকে ডেকে লাভ কি ! আগে ভক্তি-টক্তি হোক, তারপর যাব একদিন।'

ক্রোধে পুড়তে লাগল মনোমোহন। বিপরীত আচরণ করছে বটে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ঠাকুরকে ভুলতে পারছে না। মন বসছে না আফিসের কাজে, থেকে-থেকেই ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর। যাকে পরিহার করতে চাইছে সর্বক্ষণ তারই উপর অভিনিবেশ।

যেমন কংসের অবস্থা। পান-ভোজন, ভ্রমণ-শয়ন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব সময়েই দেখছে চক্রধারীকে। কেশাকর্ষণ করে উচ্চ মঞ্চ থেকে ফেলছেন নিচে তখনো শ্রীকৃষ্ণকে দেখছে অপলক চোখে। দেখতে-দেখতে তাঁরই দুষ্প্রাপ্য রূপ প্রাপ্ত হচ্ছে।

তেমনি মনোমোহনের সব সময় মনোমোহনদর্শন। বৈমুখ্যের জন্যে সব সময়েই অভিমুখিতা। বৈরূপ্যের জন্যে সব সময়েই সারূপ্য। যাকে সরিয়ে দিতে চাই বারে-বারে তারই কাছটিতে গিয়ে বসা। যাকে এড়িয়ে যেতে চাই তাকেই জড়িয়ে ধরা। অশান্ত মনে দিন কাটছে মনোমোহনের। একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়েছে, দেখল সামনে একখানি নৌকো। তাতে বলরাম বোস বসে। বলরামকে দেখে নমস্কার করল মনোমোহন। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার ! সকালেই ভক্তদর্শন।'

কথার সুরে কি সেই পুরানো অভিমানের ঝাঁজ রয়েছে লুকিয়ে ?

হাসিমুখে বলরাম বললে, 'শুধু ভক্ত নয়, গুজরত খোদ এসেছেন।'

কে, ঠাকুর? কোথায় তিনি? নৌকোর দিকে ফের চোখ পড়ল। কোথায়? ও তো নিরঞ্জন! হ্যাঁ, নিরঞ্জনই তো! নিরঞ্জন বললে, 'আপনি যান না কেন দক্ষিণেশ্বর? আপনি যান না বলে ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে এসেছেন আপনার কাছে।'

এসেছেন? কোথায় তিনি? ঐ যে নিরঞ্জনের পাশটিতে বসে আছেন লুকিয়ে।

ওরে, না এসে কি পারি? তুই যে সর্বক্ষণ আমাকে ডাকছিস। তুই যে আমাকে দূরে রাখছিস ঐ তো তোর আমাকে কাছে ডাকা। ঠেলে দিচ্ছিস বারে-বারে ঐ তো তোর আমাকে কাছে টানা। আমাকে তুই আর বসে থাকতে দিলি কই?

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। জলের মধ্যেই মনোমোহন ছুটল তাঁর দিকে। জলের মধ্যেই প্রায় টলে পড়ে—ধরে ফেলল নিরঞ্জন। টেনে তুলল তাকে নৌকোয়। ঠাকুরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

আমি তোমাকে চাইনি, কিন্তু, আশ্চর্য, তুমি আমাকে চেয়েছ। আমি তোমাকে পিছনে ফেলে পালাতে চেয়েছি, কিন্তু, আশ্চর্য, সামনেই আবার তুমি দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেয়েছি, তুমি নিজেই কখন ধরা দিয়েছ। তোমাকে চাই না, এ কথা বললেও তুমি ছাড়ো না। তোমার কাছে না গেলেও তুমি আস। না ডাকলেও খুঁজে বার করো! বারে-বারে হেরে গিয়ে জয়ী হও। তোমার সঙ্গে পারি এমন সাধ্য কি!

১০৮

রসিকের কথা মনে আছে? সেই রসিক মেথর? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার? পঞ্চবটীর কাছটায় ঝাঁট দিচ্ছে, ঠাকুর যাচ্ছেন ঝাউতলার দিকে। পিছনে গাড়ু হাতে রামলাল। ঠাকুরকে দেখে সরে গেল রসিক। কে জানে যদি অশুচি ধূলির দূষিত স্পর্শ তাঁর গায়ে লাগে। ফেরবার সময় সরল না। কোমরের গামছা-খানি খুলে গলায় জড়ালে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরকে।

ঠাকুর হাসিমুখে শুধোলেন, 'কি রে রসিক, ভালো আছিস তো?'

'বাবা, আমরা হীন জাত, হীন কর্ম করি, আমাদের আবার ভালো কি!' হাত জোড় করে বললে রসিক।

মথুরবাবু ছাড়া আর কেউ বাবা বলতে পায়নি এতদিন। মথুরবাবুর পরে এই আবার রসিক মেথর। তার বাবা-ডাক মেনে নিলেন সস্নেহে। কিন্তু সতেজে বলে উঠলেন, 'হীন জাত কি! তোর ভেতরে যে নারায়ণ আছেন। নিজেকে জানতে পাচ্ছিস না তাই হীন মনে করছিস—'

'কিন্তু কর্ম তো হীন।'

'কি বলিস। কর্ম কি কখনো হীন হয়?' ঠাকুর আবার বললেন তেজী গলায় :

'এইখানে মায়ের দরবার, দ্বাদশ শিবের দরবার, রাধাকান্তের দরবার, কত সাধুসজ্জন আসছে-যাচ্ছে, তাঁদের পায়ের ধুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঝাঁট দিয়ে সেই ধুলো তুই তোর গায়ে মাখছিস! কত পবিত্র কর্ম। কত ভাগ্যে এ সব মেলে বল্ দেখি।'

রসিক যেন আশ্বস্ত হল। বললে, 'বাবা, আমি মুখ্খু, তোমার সঙ্গে তো কথায় পারব না। কে বা পারবে তোমার সঙ্গে? শুধু একটা কথা তোমাকে জিগগেস করি বাবা, আমার গতিমুক্তি হবে তো?'

ঠাকুর চলে যাচ্ছেন, যেতে-যেতে বললেন, 'হবে, হবে। বাড়ির উঠোনে তুলসী-কানন করে সন্ধ্যেবেলায় হরিনাম করবি, কোনো ভয় নেই।'

এ যেন স্থির হয়ে ঠিক বললেন না। কে জানে হয়তো বা স্তোক দিয়ে গেলেন। রসিক পিছু নিল। প্রলুব্ধের মত জিগগেস করলে, 'বাবা, সত্যি আমার গতিমুক্তি হবে?'

এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন ঠাকুর। বললেন, 'হবে হবে হবে। শেষ সময়ে হবে।'

ঠাকুর অপ্রকট হবার পর দু বছর কেটে গেছে। একদিন কাজে রসিক না এসে এসেছে তার স্ত্রী। রামলাল জিগগেস করলে, 'কি রে রসকে এল না কেন?'

'বাবাঠাকুর, তার খুব জ্বর।'

পরদিন আবার রসিকের স্ত্রী এলে রামলাল কুশল-প্রশ্ন করল। রসিকের স্ত্রী বললে, 'ভালো নয়। চার টাকা ভিজিট দিয়ে ভালো ডাক্তার আনা হয়েছিল। কিন্তু এমনি জেদ, ওষুধ কিছুতেই খাবে না। আমাকে বললে ঠাকুরবাড়ি থেকে চন্নামৃত নিয়ে আয়। চন্নামৃতই আমার ওষুধ।'

রামলাল চরণামৃত দিল। কালকে আবার কেমন থাকে না জানি।

মেথরপাড়ার মোড়ল এই বুড়ো রসিক। কাঁচড়াপাড়ার কর্তাভজার দল থেকে দীক্ষা নিয়েছে। তুলসী-মালা জপ করে। ঠাকুরের কথা শুনে বাড়ির আঙিনায় কানন করেছে তুলসীর। মেথরদের সব ছেলে-বুড়ো নিয়ে রোজ সন্ধ্যেবেলা কীর্তন করে। হরিনামের তুফান তোলে।

ভর দুপুরবেলা সেদিন হঠাৎ স্ত্রীকে হুকুমজারি করলে, 'আমাকে তুলসীতলায় নিয়ে চলো।'

সে কি কথা? স্ত্রী তো স্তম্ভিত!

'ছেলেদের ডাকো। আমার এখন শরীর যাবে।'

'তুমি তো এখন দিব্যি ভালো আছ—' স্ত্রী প্রতিবাদ করল।

'যা বলছি তাই শোনো। ছেলেদের ডাকো। তুলসীতলায় মাদুর বিছিয়ে শুইয়ে দাও আমাকে।'

একবার জেদ ধরলে কিছুতেই টলানো যায় না। ছেলেরা জোয়ান, রোজগেরে।

বাপের কথায় ছুটে এল। ধরাধরি করে বের করে শুইয়ে দিল তুলসীতলায়। খাড়া রোদের মধ্যে।

'আমার জপের মালা নিয়ে আয়।' স্বাভাবিক সুস্থ কণ্ঠস্বর।

জপ করতে-করতে হঠাৎ যেন কি দেখতে লাগল তীক্ষ্ন চোখে। সমস্ত রৌদ্রে যিনি ছায়াময় ও সমস্ত ছায়ায় যিনি জ্যোতির্ময় তিনি যেন দাঁড়িয়েছেন সামনে। তৃপ্তির একটি সচেতন লাবণ্য ফুটে উঠল মুখমণ্ডলে। বললে, 'কি বাবা এয়েছ ? তাই বলি, এয়েছ ? আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর! টান-টান শ্বাস কিছু হল না। বলতে-বলতে গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে গান শোনাতে আসে ঠাকুরকে। কী সুস্বন সে গান! যে শোনে সেই মজে।

'আহা, নীলকণ্ঠের গান কী চমৎকার!' বলছেন শ্রীমা: 'ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। কি আনন্দেই তখন ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত। দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।'

তাঁর ঘরে মেঝেতে মাদুরের উপর বসে আছেন ঠাকুর। দীননাথ খাজাঞ্চিও দর্শন করতে এসেছে। পাঁচ-সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকল নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ না সুধাকণ্ঠ।

তাকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'আমি ভালো আছি।'

সেই ভালোটিই তো চাই। নীলকণ্ঠ যুক্তকরে বললে, 'আমায়ও ভালো করুন। এই সংসারে পড়ে রয়েছি।'

'পাঁচজনের জন্যে তিনি রেখেছেন তোমাকে সংসারে।'

পাঁচজনের সেবাতেই তো ঈশ্বরপূজা। তিনি কাজের মধ্য দিয়ে পূজা নিচ্ছেন। কাজ যেমন হোক, পূজা ঠিকই হচ্ছে। বলো এ তাঁর সংসার। যাদের সেবা করছি তারা তাঁরই প্রতিনিধি।

'তুমি যাত্রাটি করেছ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তুমি যদি এখন ছেড়ে দাও তোমার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায় যাবেন ?'

ঠিকই তো। আমাকে দিয়ে কতগুলো লোকের ভরণপোষণ হচ্ছে। এ দিয়েই আমি ঈশ্বরের সাধন-ভজন করছি। যাকে দিয়ে তিনি যা করাবেন তাতেই তাঁর তুষ্টি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

'তোমাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, তাঁর যেমন খুশি। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।' আবার বলছেন রামকৃষ্ণ, 'গৃহিণী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নাইতে যায়। তখন শত ডাকাডাকি করলেও ফেরে না।'

নীলকণ্ঠ বললে, 'আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'যেকালে তাঁর নাম করতে তোমার চোখ জলে ভেসে যায় সেকালে আর তোমার ভাবনা কি ? তাঁর উপরে তোমার যে ভালোবাসা এসেছে।'

শুধু ঐটিই তো মন্ত্র। ভালো হও আর ভালোবাসো। ভালো হতে পারলেই ভালোবাসবে। কিংবা ভালোবাসতে পারলেই ভালো হবে।

'তোমার ও গানটি বেশ। শ্যামাপদে আশানদীর তীরে বাস।' বলছেন ঠাকুর, 'পদে যদি নির্ভর থাকে তা হলেই হল। তাই বলে চুপ করে থাকলে চলবে কি? ডাকতে হবে, কাজ করতে হবে। উকিল সওয়াল শেষ করে শেষে বলে, আমি যা বলবার বললাম, এখন হাকিমের হাত।'

সকালে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে কীর্তন কবে এসেছে নীলকণ্ঠ। সেখানে সেখানে গিয়েছিলেন ঠাকুর। তবু আবার এসেছে বিকেলে। শত কথাবার্তার মধ্যেও এই অনুরাগের অঙ্গীকারটুকু রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। শেষকালে বললেন, 'তুমি সকালে এত গাইলে। আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু "অনারারি"।'

'কি বলেন!' নীলকণ্ঠ অভিভূতের মত বললে, 'আমি এখান থেকে অমূল্য রতন নিয়ে যাব।'

'সে অমূল্য রতন নিজের কাছে। না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান অত মধুর। জানো তো, সাধারণ জীবকে বলে মানুষ, যার চৈতন্য হয়েছে সে মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁসের দলে।'

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হরিবাবু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। সন্ধ্যা সাতটা-আটটা। ছোট খাটটিতে মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। ওরা এসে মেঝের উপর প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর মশারির বাইরে এলেন। বললেন, 'কে বা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি! যাই বলো তিনি ধ্যান করালেই তবে হবে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় করো তোমার সাধ্য কি?

'ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।' হরিবাবুর দিকে ইশারা করল মাস্টার: 'এঁর অনেকদিন পত্নীবিয়োগ হয়েছে, প্রায় এগারো বছর।'

'তুমি কি কর গা?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

হরিবাবুর হয়ে মাস্টারই বললে, 'একরকম কিছুই করেন না। তবে বাপ-মা ভাই-ভগ্নীর সেবা করেন।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে কি গো, তুমি যে সেই কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর হলে। না সংসারী না হরিভক্ত। এ কেমনতরো কথা?'

বাড়িতে একরকম পুরুষ থাকে জানো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে কেবল ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায় আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে কুমড়ো কেটে দেওয়া। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই বড়ঠাকুরকে ডেকে আনায়। বলে কুমড়োটাকে দুখান করে দিন। বড়ঠাকুর তাই করে দেয় খুশি হয়ে। তার ঐ পর্যন্ত পৌরুষ। তাই তার নাম হয়েছে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর।

'আমি বলি তুমি এও কর ওও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ করে যাও।

শুধু কাজ করলে হবে না, কাজের সামনে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন

কাজ করছি, কিসের জন্যে, রাখতে হবে সেই একটি চেতনার উজ্জ্বলতা। ফলের জন্যে লাভের জন্যে জয়ের জন্যে কাজ করছি না, কাজ করছি তিনি কাজে লাগিয়েছেন বলে। আফিসের বড়বাবু তো চাকরি দেননি, চাকরি দিয়েছেন ঈশ্বর। তাই আফিসের বড়বাবুকে ফাঁকি দিয়ে আমার সুখ কই? সেই সর্বতশ্চক্ষু ঈশ্বরকে তো ফাঁকি দিতে পারব না। তাঁর কাজ তিনি বুঝে নেবেন, আমি শুধু করে যাই। যে পার্টে নামিয়েছেন অভিনয় করে যাই নিখুঁত করে। বাহবা পাই না পাই কিছু এসে-যায় না। তাঁর দেওয়া পার্টটি তো করলাম জীবন ভরে—এই আমার সন্তোষ। আমি না হলে তাঁর এই বৃহৎ নাটক যে সম্পূর্ণ হত না, তাই আমার পার্টে তাঁরও তৃপ্তি। কর্ম করতে-করতেই মনের ময়লা কেটে যাবে। আর মনের ময়লা কাটলেই দেহ পরিশুদ্ধ হবে।

ঐ দেখ না, সেদিন শ্রীরাম মল্লিক এসেছিল, তাকে ছুঁতে পারলাম না।

শ্রীরামের সঙ্গে ঠাকুরের খুব ভাব ছিল ছেলেবেলায়। একে-অন্যের অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ত। এত গলায়-গলায় ভাব, লোকে বলত এদের ভিতর একজন মেয়ে হলে এদের বিয়ে হয়ে যেত। তাকে এখন দেখবার জন্যে ঠাকুরের খুব আগ্রহ। কতবার লোক পাঠিয়েছেন তার জন্যে তার ঠিক নেই।

একদিন এসে উপস্থিত শ্রীরাম। ছেলেপিলে হয়নি; একটি ভাইপো মানুষ করেছিল সেটি মরে গেছে। কেঁদে আকুল হল ভাইপোর জন্যে। কিন্তু শোকাগ্নিতে পুড়েও পবিত্র হয়নি দেহ।

'ছুঁতে পারলাম না' বললেন ঠাকুর, 'দেখলাম তাতে আর কিছু নেই।'

সংসারে থাকব না তো যাব কোথায়? যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ-সংসারই রামের অযোধ্যা। গুরুর কাছে জ্ঞানলাভ করবার পর রাম বললে, আমি সংসার ত্যাগ করব। দশরথ তাকে অনেক বোঝালো, রাম নিবৃত্ত হল না। তখন বশিষ্ঠ রামকে বললে, আগে আমার সঙ্গে বিচার করো, তোমার জ্ঞানের বহরটা একবার দেখি, তারপর যেথা ইচ্ছা চলে যাও। রাম বললে, বেশ, বলুন, কিসের বিচার? তখন বশিষ্ঠ বললে, আচ্ছা বলো, সংসার কি ঈশ্বরছাড়া? যদি ঈশ্বরছাড়া হয়, তুমি এ দণ্ডে তা ত্যাগ করো। রাম দেখল, ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়েছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত কিছু সত্য হয়ে রয়েছে। তখন সে নিবৃত্ত হল।

'সংসারেই থাকো আর অরণ্যেই থাকো ঈশ্বর শুধু মনটি দেখেন।'

কলঙ্কসাগরে ভাসো কলঙ্ক না লাগে গায়।

ওরে যোগীন, যা তো, গিরিশের বাড়ি যা। আমার জন্যে একটা বাতি চেয়ে নিয়ে আয়। আমার বাতি ফুরিয়ে গেছে। আর শোন—ঠাকুর পিছু ডাকলেন। আর দেখে আয় সে কেমন আছে।

কে গিরিশ ঘোষ ? ওই যে থিয়েটার করে ! ওই যে মাতালের সর্দার ! বাতি আনতে তার কাছে ? কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার ! কাছে-পিঠে কেউ কি রাখে না মোমবাতি ? কিন্তু উপায় নেই, ঠাকুরের হুকুম।

চলো বাগবাজার। বাড়ি নেই গিরিশ, কোথায় গিয়েছে নেমন্তন্ন খেতে। তবে আর কি, বসে থাকো। এই যে, ফিরেছে, কিন্তু এ কি চেহারা ! টলছে, নেতিয়ে পড়ছে। 'কে হে তুমি ? চাই কি ?'

'আমাকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ঠাকুর ! আহা, ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন !' ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করল গিরিশ।

'পাঠাবেন না ?' না পাঠিয়ে পারেন ? গিরিশের জন্যে যে তাঁর মন পোড়ে।'

'একটা বাতি চেয়েছেন আপনার কাছে—'

'আহা, কি দয়া ! একটা বাতির জন্যে এত দূরে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে ?' দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে গড় করে প্রণাম করল এবার। 'একটা কেন, এক বাণ্ডিল নিয়ে যাও।'

বলে উঠেই গালাগাল ! সে আরেক মূর্তি। তুমি বাতি চাইবার জায়গা পাওনি ? কেন, তোমার বরানগর-আলমবাজারে বাতি মেলে না ? একেবারে আমার বাড়ি ধাওয়া করেছ ! তুমি কোথাকার জমিদার, পেয়াদা পাঠিয়েছ সমন দিয়ে ! আমি কি তোমার বাস্তুবাড়ির প্রজা, না তুমি আমার মহাজন ? বলেই খেউর শুরু করল। মাতালের পাঁচফোড়ন।

বাতি একটা ছুঁড়ে দিল যোগেনের দিকে। নিয়ে যাও। অন্ধকার আছে, একটু আলো জ্বালানো মন্দ নয়। আলোর অভাব বলেই তো এই দুর্দশা !

আবার গালাগাল।

বাতি নিয়ে ছুট দিল যোগেন। কি বদ্ধ মাতাল রে বাবা ! লাফিয়ে পড়ে কামড়ায়নি যে বড়, এই ভাগ্যি।

'কি এক ত্রেপণ্ড মাতালের কাছেই পাঠিয়েছিলেন—'

'কেন, কি হল ?' প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'খালি গালাগালি, খালি খিস্তি-খেউড়।'

'কাকে ?'

'আর কাকে ! আপনাকে।'

এতটুকুও লাগল না ঠাকুরকে। বললেন, 'শুধু গালই দিলে, আর কিছু করলে না ?'

'আপনার কথা বলতে প্রথমে প্রণাম করেছিল, উত্তর দিকে মুখ করে কি-সব বলছিল বিড়-বিড় করে, আর মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করছিল বার-বার—'

'তবে ?' উল্লসিত হলেন ঠাকুর। 'তুই শুধু তার মন্দটা দেখলি, ভালোটা দেখলিনে ? গালাগাল শুনলি, শুনলিনে তার ভক্তির মন্ত্র ? টলে-পড়া দেখলি, দেখলিনে তার নুয়ে পড়া ?'

তাই তো দেখি সর্বক্ষণ। কার কোথায় ত্রুটি, কার কোথায় ন্যূনতা। আমরা ত্বকসর্বস্ব, অন্তঃসারের খবর নিই না। যেমন আমরা লোক তেমনি আমাদের বিচার। আধ-গ্লাশ জল কাছে থাকলে যে দোষদর্শী সে বলে, দেখলে ? জল দিলে তো গ্লাশটা ভরতি করে দিলে না ! আর যে গুণগ্রাহী সে বলে, আহা কি ভালো, অন্তত আধ-গ্লাশ তো দিয়েছে !

কুব্জার মধ্যে কী দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ ? দেখলেন অনবদ্যাঙ্গী গৃহাঙ্গনা। রাজপথ দিয়ে যাচ্ছেন, বক্রদেহা এক যুবতীর সঙ্গে দেখা। হাতে অঙ্গ-বিলেপের পাত্র। শ্রীকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, তোমার নাম কি ? এই বিলেপন কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ ?

কুব্জা বললে, আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের প্রধানা অঙ্গলেপন-দাসী।

'এ লেপন আমাকে দাও।' কৃষ্ণ হাত বাড়ালেন : আমাকে দিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল কুব্জা। এ লেপন কংসের অতি কামনীয়, কিন্তু এ রসিকশেখর পথিকের মত যোগ্যতার অধিকারী আর কে আছে ? শুধু হাতের পাত্রের নয়, যেন প্রাণপাত্রের সমস্ত চন্দনলেপন দিয়ে দিল পথিককে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল ঐ কুব্জা যুবতীকে সরলাঙ্গী করে দিই। যেহেতু প্রাণের সরলতাটি আমায় দিয়েছে তখন আর তো ওর বাঁকা থাকবার কথা নয়। আমি ওকে ঋজু করে দিই।

কুব্জার দু পায়ের উপর নিজের দু পা রাখলেন শ্রীকৃষ্ণ। দু আঙুল দিয়ে তার চিবুক ধরে তার মুখখানি ঠেলে তুললেন উপরের দিকে। মুকুন্দস্পর্শে গরীয়সী কুব্জা মুহূর্তে উন্নতদর্শনা হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করে বললে, 'হে বীর, আমার গৃহে চলো। তুমি আমার চিত্ত মথিত করেছ, তোমাকে কিছুক্ষণ আমার অতিথি হতেই হবে।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে সুভ্রু, আমি লোকদুঃখ মোচন করতে এসেছি। সে ব্রত সাঙ্গ হলে আসব তোমার ঘরে। আমি গৃহশূন্য পথিক, আর তোমার ঘর ঘর-ছাড়াদের আশ্রয়।'

'মা, তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না।' আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন ঠাকুর।

'আমি নিতান্ত পাষণ্ড।' করজোড়ে বলছে গিরিশ, 'কত গালাগাল দিই আপনাকে।'

'বেশ করো। গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো তুমি—তা হোক, ও সব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।' অভয়ানন্দ ঠাকুর বললেন উদারস্বরে, 'উপাধিনাশের সময়ই শব্দ হয়। পোড়বার সময় চড়চড় শব্দ করে কাঠ। পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।' 'কি উপায় হবে আমার?'

'তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে, দিন-দিন উন্নত হবে। লোকে দেখে অবাক মানবে।' বলে মা'র দিকে তাকালেন। 'মা, যে ভালো আছে তাকে ভালো করতে যাওয়ায় বাহাদুরি কি! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া আছে তাকে মারতে পারো তবে তো তোমার মহিমা!'

নরেন এলে প্রণাম করে বসল। বসল মেঝের উপর, মাদুরে।

'হ্যাঁ রে, ভালো আছিস? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের কাছে প্রায়ই যাস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই মাঝে-মাঝে। সব সময় আপনার চিন্তায় মাতোয়ারা। মুখে কেবল আপনার কথা।'

'কিন্তু রশুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। যেন কাকে-ঠোকরানো আম। দেবতাকেও দেওয়া হয় না, নিজেরও সন্দেহ।' বললেন ঠাকুর, 'ওর থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, আবার রামকেও লাভ করবে।'

'কিন্তু আগেকার সব সঙ্গ ছেড়েছে গিরিশ।'

কিন্তু সংস্কার যাওয়া কি সোজা কথা? সেই যে একজায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে, একটি স্ত্রীলোক সেখান দিয়ে চলে গেল। সকলেই ঈশ্বরধ্যান করছে, একজন হঠাৎ আড়চোখে দেখে নিলে। কি করবে, তিনটি ছেলে হবার পর সে সন্ন্যাসী হয়েছিল। সংস্কারের অসীম ক্ষমতা। রাজার ছেলে, পূর্বজন্মে জন্মেছিলো ধোপার ঘরে। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে, সমবয়সীদের বলছে, 'ও সব খেলা থাক, আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস-হুস করে কাপড় কাচ্।'

'বাবুই গাছে কি আম হয়?' বললেন ঠাকুর। 'কে জানে, হতেও পারে। তেমন সিদ্ধাই থাকলে বাবুই গাছেও আম ধরে।'

কামাগ্নিতে অঙ্গার হীরক হয়। কাম প্রেম হয়। শুষ্ক তরুতে ফুল ধরে। তোমার কৃপার বাতাসটুকু যদি গায়ে লাগে, আমি অশত্থ বৃক্ষ, আমিও চন্দনতরু হয়ে যাব।

দৈব না পুরুষাকার? কে জানে, দুই-ই দরকার। শুধু একচাকায় কি রথ চলে, না এক দাঁড়ে নৌকো? শুধু পাল তুললেই তো হয় না, লাগসই হাওয়াটি চাই। মাঠে বীজ পুঁতলেই কি হবে? চাই সলিলসিঞ্চন। কিন্তু এ দৈব কি? একটা নির্বুদ্ধির খামখেয়াল? যারা জড়, অবিবেকী ও ভীরু তারাই দৈব মানে। আমরা পুরুষসিংহ, আমরা পৌরুষ মানি, বিশ্বাস করি প্রযত্নে। আমরা মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাই। যুদ্ধে জিতে ছিনিয়ে আনি রাজমুকুট।

সাধ্য কি শুষ্ক পৌরুষে সিদ্ধি পাই। কত শক্তিমান কৃতী লোক প্রাণপণ প্রযত্ন করছে, কত দুর্নিবার নিষ্ঠা, তবু কিছুতে কিছু হচ্ছে না। বিন্দুমাত্র কুলোচ্ছে না পৌরুষে। আবার কত অধম লোক কত অক্লেশে সফলকাম হচ্ছে। এ রহস্যের মানে কি? এর মানে হচ্ছে দৈব। প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের কর্মের নামই দৈব। তাই দৈব আর কিছুতেই নয়, পূর্বকৃত পুরুষকার। এক কথায় প্রারব্ধ। প্রারব্ধ দিয়ে তৈরি হল আমার ইহজন্মের পরিবেশ। ইহজন্মের পুরুষকার দিয়ে খণ্ডন করব সে পরিমণ্ডল। ব্যর্থ করব সে অদৃষ্টের বিধিলিপি।

যেমন বিশ্বামিত্র করেছিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছিল, উপনীত হল বশিষ্ঠের আশ্রমে। সসৈন্য ক্ষত্রিয়রাজাকে যোগ্য অভ্যর্থনা করতে পারে এমন সামর্থ্য নেই সেই নিঃসম্বল ঋষির—এমনি মনে হল বিশ্বামিত্রের। তবু আতিথ্য নেবার জন্যে বারে-বারে অনুরোধ করতে লাগল বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র রাজী হল, কিন্তু এই বিপুল বাহিনীকে বশিষ্ঠ খাওয়াবে কি? ভাঁড়ে তো মা-ভবানী। বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান করল বশিষ্ঠ। বললে, শবলা, অতিথি-সৎকারের খাদ্য দাও। কামদায়িনী শবলা ভূরি-ভূরি খাদ্য-সৃষ্টি করল। দেখে তো বিশ্বামিত্রের চক্ষু স্থির, যে করে হোক লাভ করতে হবে এই কামদুঘাকে। বললে, 'রত্নে রাজারই অধিকার। অতএব এই রত্ন আমাকে দান করুন। বিনিময়ে যা কিছু চান ধেনু বা ধন দিচ্ছি আপনাকে।'

অসম্ভব! এই শবলা থেকেই আমার হব্য কব্য আমার প্রাণযাত্রা। শত কোটি ধেনু বা রাশীভূত রজত শবলার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কিছুতে রাজী হল না বশিষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্র সবলে টেনে নিয়ে চলল শবলাকে। বশিষ্ঠকে উদ্দেশ করে সরোদনে বললে শবলা, 'আপনি কি আমাকে ত্যাগ করলেন?'

আমি কি করব। এই বলোদ্ধত রাজা তোমাকে স্পর্ধাপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে এর অক্ষৌহিনী সেনা। এর তুলনায় আমি কিছুই নয়। আমি নির্বল, নিস্তেজ।

কে বলে? আপনিই অধিক বলবান। ক্ষত্রবলের চেয়ে ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। 'অনুমতি করুন,' শবলা বললে দৃপ্তস্বরে, 'আমি সৈন্য সৃষ্টি করি। বিধ্বস্ত করি এই দুর্বৃত্তকে।'

তথাস্তু। মুহূর্তে অগণন সৈন্য-সৃষ্টি করল শবলা। বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্জিত ও বিনষ্ট হল। শুধু তাই নয়, শতপুত্র মারা পড়ল একে-একে। এ কী বিপর্যয়! নির্বেগ সমুদ্র, রাহুগ্রস্ত সূর্য ও ভগ্নদন্ত সাপের মত নিষ্প্রভ হল বিশ্বামিত্র। তখনো একটিমাত্র পুত্র বেঁচে আছে, তাকে রাজ্য দিয়ে চলে গেল হিমালয়ে। বসল শিবারাধনায়। কি বর চাও, তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিলেন। দিব্যাস্ত্র দাও, ত্রিজগতে যত অস্ত্র আছে, সব আনো আমার অধিকারে। মহাদেব বর দিলেন।

আর যায় কোথা! মহাবলে ধাবিত হল বিশ্বামিত্র। অস্ত্রানলে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ করতে লাগল। আশ্রমবাসীরা পালাতে লাগল ঊর্ধ্বশ্বাসে। ভয় পেয়ো

না, রৌদ্র যেমন শিশির ধ্বংস করে, তেমনি আমি বিশ্বামিত্রকে শেষ করছি। বলে বশিষ্ঠ তার দণ্ড উত্তোলন করল। তার ব্রহ্মতেজপূর্ণ উদ্দণ্ড দণ্ড। যত অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল বিশ্বামিত্র, ঐন্দ্র আর রৌদ্র, বারুণ আর পাশুপত, সব নিক্ষেপ করল একে-একে। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করল, নির্বাপিত করল সমস্ত কালানল।

ক্ষান্ত হোন, মুনি-ঋষিরা স্তব করতে লাগল বশিষ্ঠকে। বিশ্বামিত্র হতমান হয়েছে, বশীকৃত হয়েছে, স্তব্ধ হয়ে বসেছে অধোমুখে। আপনি আপনার দণ্ড সংবরণ করুন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই বল। তাই এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র পরাজিত হল। এই ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করব তবে আমার নাম।

দুশ্চর তপস্যায় আরূঢ় হল বিশ্বামিত্র। চিত্তমল বিশোধিত হল। কাম ক্রোধ লোভ অনেক উপকরণ আসতে লাগল সামনে। বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ধীরে-ধীরে উপনীত হল ব্রহ্মর্ষি পদবীতে। দেবতারা অভিনন্দন করে বললে, তীব্র তপস্যা দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছ। এস দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করো।

একেই বলে পুরুষকার। প্রারব্ধনির্দিষ্ট গতি বদলে দিল পৌরুষপ্রাবল্যে। দুস্ত্যজ প্রকৃতিকেও অতিক্রম করল তপস্যায়।

'তোমার প্রকৃতিতে তোমার কর্ম করাবে।' বললেন ঠাকুর, 'ভগবান অর্জুনকে বলছেন তুমি ইচ্ছে করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো। আমি চিন্তা করছি আমি ধ্যান করছি, এও কর্ম। আমার দান-যজ্ঞ এও কর্ম। নামগুণকীর্তনও কর্ম। কিন্তু যাই করো, ফল আকাঙ্ক্ষা করে করো না।'

মৃগ না মিলুক তবু ফিরব না মৃগয়া থেকে। মৃগয়ায় যে বেরুতে পেরেছি সেই আমার পরম লাভ।

১১০

দেবেন মজুমদারও নরেনের মত ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে চায়। ঘর ফাঁকা দেখে কখন ঠাকুরের বিছানার নিচে ছোট একটি রুপোর দু-আনি রেখে দিয়েছে। বসতে গিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর। আবার চেষ্টা করলেন বসতে, আবার উঠে পড়লেন।

'এ কি, এমন হচ্ছে কেন?' জিগগেস করলেন ঠিক দেবেন মজুমদারকেই। 'ছুঁতে পাচ্ছি না কেন বিছানা?'

পরীক্ষকই ধরা পড়ে গেল। পাংশুমুখে স্বীকার করলে অপরাধ। কিন্তু ঠাকুরের কোনো গ্লানি নেই। হাসিমুখে বললেন, 'আমায় বিড়ে দেখছ নাকি? তা বেশ, বেশ।'

তবু আরো পরীক্ষা বুঝি বাকি আছে। ঠাকুর নিজেই পাড়লেন সেই কথা। বললেন, 'ওগো, মন বড় কেমন করছে। অনেক দিন দেখিনি তাকে।'

কাকে ? দেবেন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

ঠাকুর তার নাম করলেন। এ কি, এ যে স্ত্রীলোক ! একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ঠাকুরের টান ! দেবেনের মন কালো হয়ে উঠল।

'ওরে রামনেলো, রসগোল্লা নিয়ে আয়। খিদে পেয়েছে।'

অনেকগুলো নিয়ে এল রামলাল। একটি নিজে খেয়ে বাকিগুলো খাওয়ালেন দেবেনকে। বললেন, 'এ সব সে-ই পাঠিয়েছে। এখানকে বড় ভালোবাসে। বড় ভালো লোক।'

মুখের স্বাদে যেন তার মিষ্টতা নেই এমনি মনে হল দেবেনের। এ কেমনধারা আকর্ষণ।

'ওগো, তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।' ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর পাইচারি শুরু করেছেন। সহসা ঝুঁকে পড়ে দেবেনের কানের কাছে মুখ এনে বললেন চুপি-চুপি, 'আমাকে একটি টাকা দেবে ?'

টাকা ? কেন ?

'গাড়ি না হলে যেতেও পারি না, আবার গাড়ি করে গেলে তার ছেলে গাড়িভাড়া দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি। তুমি যদি দাও তবে একবার দেখে আসি।'

তার আর কি ! দেব না-হয় যখন চাইছেন।

দেবেনের ভঙ্গি দেখে হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'কিন্তু বলো আবার লিবে। কি, আবার লিবে তো ?'

তা বেশ মশাই, শোধ যদি দেন তো নেব। টাকা বের করে রামলালের হাতে দিলে। রামলাল কলকাতা যাবার গাড়ি আনতে গেল। মাস্টারমশাই ও লাটুর সঙ্গে দেবেনও উঠল গাড়িতে। যাই ব্যাপারটা দেখে আসি স্বচক্ষে। পথে মন্দির পড়ছে তাকে প্রণাম করছেন ঠাকুর, মসজিদ পড়ছে তাকেও। শুধু তাই নয়, মদের দোকানকেও। কত লোককে এখানেও আনন্দ দিচ্ছেন মহামায়া। মদিরার কথা ভেবে মনে পড়ছে হরিনামের কথা। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে ! যার যাতে নেশা, যার যাতে আনন্দ ! বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের উদ্দেশেও প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন, মা আনন্দময়ী।

দেবেনের গা টিপলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কারু ভাব নষ্ট করি না।'

যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে যেন এ কথা বোলো না, আমার ভাবই সত্য আর সব ভুয়ো। যে ভাবেই হোক, যদি তা আন্তরিক হয় ঠিক পেয়ে যাবে ঠিকানা।

'বারোয়ারিতে নানা মূর্তি করে, নানান মতের লোকের ভিড়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম। যারা বৈষ্ণব তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তাদের সামনে সীতারাম। কিন্তু

যাদের কোনো ঠাকুরের দিকে মন নেই', ঠাকুর হাসলেন : 'তাদের কথা আলাদা। বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটাপেটা করছে এমন মূর্তিও করে বারোয়ারিতে। ও সব লোক তাই দেখছে হাঁ করে। দেখছে আর চেঁচাচ্ছে। বন্ধুদের ডাকছে, ও সব কি দেখছিস, আয়, এদিকে আয়।'

গাড়ি এসে পেঁছিুল বাড়িতে। ঠাকুর একা অন্দরমহলে ঢুকে পড়লেন। সন্দেহ বুঝি আরো উগ্র হল দেবেনের। মাস্টারমশায় তখন গান ধরলেন : আমরা গোড়ার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে। গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, ভাব বুঝতে নারলুম রে—

কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর আবার ফিরে এলেন। অসমাপ্ত গানের অবশিষ্টটুকু গাইতে লাগলেন। তবু সন্দেহ কি যায়। কালিমা কি ঘোচে! ভিতর থেকে চাকর এসে আবার ডেকে নিয়ে গেল ঠাকুরকে। কতক্ষণ পরে আবার এল চাকর। এবার আপনারা আসুন।

ভেতরে গিয়ে কী দেখল দেবেন! দেখল আসনের উপর আলুথালু হয়ে ঠাকুর বসে আছেন, যেন পাঁচ বছরের ভোলানাথ ছেলে আর তাঁর সামনে বসে তাঁকে খাওয়াচ্ছেন এক বৃদ্ধা মহিলা, চোখে জল, মুখভাবে বাৎসল্যের লাবণ্য।

'বাবা চৈতন্যচরিতামৃতে পড়েছিলুম,' বলছে সেই বৃদ্ধা গৃহিণী, 'চৈতন্যদেবের মা চৈতন্যদেবকে খাইয়ে দিতেন নিজের হাতে। আমার মনে হত, আমি যদি শ্রীচৈতন্যের মা হতুম, এমনি করে খাওয়াতুম তাকে। কি আশ্চর্য, আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তুমি এসে উদয় হলে আমার জীবনে!' বলছে আর কাঁদছে অনর্গল।

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা এসেছিলেন শ্রীমতীর কাছে। ধ্যানস্থ ছিলেন শ্রীমতী। যশোদাকে বললেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, কি আর বর দেবে! শুধু এইটুকু করো, আমার গোপালকে আমি যেন প্রাণ ভরে সেবা করতে পারি, খাওয়াতে পারি হৃদয়মথিত স্নেহনবনী।

এই তো সেই যশোমতীর মাতৃপ্রতিমা।

কৃষ্ণ বললে, আমাকে অহৈতুকী ভক্তি দাও, অব্যবহিতা ভক্তি। ফলাভিসন্ধিরহিত অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা। কার জন্যে তোমার কাছে তোমার প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-মন স্ত্রী-পুত্র এত প্রিয়, কার কৃপায়? যার জন্যে যার কৃপায় এই প্রিয়ত্ববোধ, তার চেয়ে প্রিয়তর আর কে আছে? এই কি সেই প্রিয়-প্রীণন নয়?

আত্মাধিক্কারে ভরে গেল দেবেন। এ কে নয়নভুলানো দেখা দিলেন চোখের সামনে! চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না। খাবার থালা কে দিয়ে গিয়েছে সম্মুখে। কিন্তু, না, দাঁড়াও, এই বাৎসল্য-মাধুর্য আস্বাদন করি।

বাগবাজারের এক বড় ঘরের গৃহিণী—কেমন ইচ্ছে হল, যদি একবার যেতে পারতাম দক্ষিণেশ্বরে। এত কথা শুনেছি যাঁর সম্বন্ধে তাঁকে যদি দেখতে পেতাম চোখ ভরে।

কেন প্রাণ উতলা হয় কে বলবে। ঈশ্বরপিপাসা তো কোনো হেতুবাদের উপর

দাঁড়িয়ে নেই, ক্ষুৎপিপাসার মতই এ বৃত্তি স্বাভাবিকী। ভক্তিতে যত আনন্দ বাড়ে তেমন আর কিছুতেই নয়। কেন না ভক্তিতেই আর দেহদুঃখ থাকে না, চিত্ত শান্ত ও অমৎসর হয়, ভোগে অনাসক্তি আসে। যত দুঃখ এই আসক্তি থেকে। আসক্তি চলে গেলেই একটা আশ্চর্য স্থিতিশক্তিতে জীবন দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কে একজন আছে চেনা মহিলা, কয়েকবার যাতায়াত করেছে দক্ষিণেশ্বরে, তার শরণাপন্ন হল। বেশ তো, কালই চলো না। নৌকো করে যাব দুজনে।

পরদিন বিকেলে দুজন এসে উপস্থিত। কিন্তু এ কি ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তারই ভিতর দিয়ে উঁকি মারল দুজনে। দেখল ঠাকুর শুয়ে আছেন, বিশ্রাম করছেন। এখন যাই কোথায়? সারদামণিও নেই, গেছেন বাপের বাড়ি। এ-ওর মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এখন করি কি?

অপেক্ষা করো। সমীপাগত হয়েছ, এখন যদি ধৈর্য না ধরো, তবে যাত্রা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বয়ে যাবে লগ্ন। ক্লেশ-নদী অতিক্রম করে এসেছ, এখন রূপাজলনিধিকে দেখে যাও। নবতের দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে রইল দুজনে।

কিছু পরেই ঠাকুর উঠলেন। উত্তরের দরজা খুলতেই চোখ পড়ল মহিলাদের উপর। ওগো, তোরা এখানে আয়, ডেকে উঠলেন সানন্দে।

ঘরে এসে বসল পাশাপাশি। যে মহিলাটি পরিচিত, তক্তপোশ থেকে নেমে তার কাছটিতে এসে বসলেন ঠাকুর। বসতেই সে মহিলাটি লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। সরে যাবার জন্যে ত্বরিত ভঙ্গি করলে। ঠাকুর বললেন, 'লজ্জা কি গো! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। শোনো, তোরাও যা আমিও তাই।' নিজের দাড়িতে হাত দিলেন: 'তবে এগুলো আছে বলে বুঝি লজ্জা? তাই না?'

কৃষ্ণান্বেষিণীদের আবার লজ্জা কি! শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভক্তি কৃষ্ণকে নিবেদন করো।

অনেক ভগবৎকথা শোনালেন ঠাকুর। সংকোচের আড়ষ্টতা আর থাকল না। হরিপ্রসঙ্গ শেষে সাংসারিক কথাও পাড়লেন। বললেন, 'সপ্তাহে অন্তত একবার করে এসো। প্রথম-প্রথম এখানে আসা-যাওয়াটা বেশি রাখতে হয়। কিন্তু নিত্য অত নৌকো বা গাড়িভাড়া দিতে যাবে কেন? শোনো, আসবার সময় তিন-চারজনে মিলে নৌকো নেবে আর যাবার সময় হেঁটে বরানগর গিয়ে সেখান থেকে শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ি।'

১১১

আহিরিটোলার দিগম্বর ময়রার খাবারের খুব নাম-ডাক। ঠাকুরের জন্যে কিছু কিনে নিলে হয়।

মিহিদানা বাঁধা হচ্ছে। কি হে টাটকা না কি?

'হাতে করে দেখুন না। কত গরম !'

এক সের কিনলে দেবেন মজুমদার। ঘাটে এসে দেখে খেয়ার নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। শুধু একজন যাত্রীর অপেক্ষা। উঠে বসলো এক লাফে। মিষ্টির ঠোঙা কোলে নিয়ে বসলো সন্তর্পণে। এত ভিড়, ছোঁয়া বাঁচানো দুঃসাধ্য। পাশেই এক চাপদাড়িওয়ালা মুসলমান। ভীষণ গোপ্পে, মুখের আর কামাই নেই। ছুঁয়ে তো দিয়েইছে, কে জানে তার মুখামৃতের ছিটে-ফোঁটাও পড়ছে কি না ঠোঙার উপর। বিশীর্ণ হয়ে গেল দেবেন। আর ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না কিছুতেই। সেবার এক ঝুড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছিল রাম দত্ত। পথে একটি ভিখিরি ছেলের সঙ্গে দেখা। তাকে কি ভেবে রাম একখানা জিলিপি দিয়ে দিল। ঠাকুর বললেন, 'সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেবতার উদ্দিষ্ট বস্তুর আগ-ভাগ তুলে কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় !'

একখানা জিলিপি নিয়েছিলেন হাতে করে, গুঁড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন গঙ্গাজলে।

গরুর গাড়িতে গুড়ের নাগরির মতন গায়ে গা ঠেকিয়ে বসা, তার পর এই মৌলবীর বকর-বকরের আর শেষ নেই। দরকার নেই এ মিষ্টি ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে। রামের জিলিপির অবস্থা হবে। তার চেয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে হালকা হয়ে যাই। কিন্তু আহা, মিহিদানাগুলো এখনো গরম !

বাঁচোয়া, ঠাকুর ঘরে নেই। দুরের তাকের এক কোণে দেবেন ঠোঙাটা লুকিয়ে রাখল। সহজে কারু নজর পড়বে না। এ জিনিস ঠাকুরকে দিয়ে কাজ নেই। আরো অনেক আছে এর ভাগীদার। খাবারের ঠোঙাটা যে ঠাকুরের চোখের আড়াল করতে পেরেছে তাইতেই দেবেন নিশ্চিন্ত।

চটি ফট-ফট করতে-করতে ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর ছোট তক্তপোশে। খানিক পরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'এ কি, খিদে পাচ্ছে কেন ?'

কি যেন খুঁজতে লাগলেন ঘরের আনাচে-কানাচে। কি, খাবার ? যাই বলি গে, নিয়ে আসুক কিছু যোগাড় করে। উঠে গেল একজন ভক্ত-যুবক। একটু ধৈর্য ধরুন।

অন্তরে বসে কাঁদতে লাগল দেবেন। তোমার নাম করে খাবার আনলাম অথচ তোমাকে দিতে পারলাম না। খাদ্যকে করতে পারলাম না নৈবেদ্য। নিজের রূপকে করতে পারলাম না অরূপের রূপ।

ভাব-লাগানো ব্যাপার ! ঠিক তাকটি খুঁজে পেয়েছেন ঠাকুর। দেবেনের বুক দুরু-দুরু করে উঠল। কিন্তু, এ কি, ঠাকুর যে আনন্দে তরলতনু হয়ে উঠলেন। আরে, এই যে, মেঠাই ! বাঃ কে আনলে ? এখনো যে হাতে-গরম। বলে, বলা-কওয়া নেই, মুঠো মুঠো খেতে লাগলেন।

অন্তরের যে কান্না সেই তো তোমার সুধা। আমার অশ্রুক্ষরণই তো তোমার মধুক্ষরণ। তাই মিষ্টত্ব মিহিদানার নয়, মিষ্টত্ব ব্যাকুলতায়। দিতে এসেও তোমাকে যে দিতে পারলুম না সেই ব্যর্থতার বিষাদে।

হে প্রণতপ্রিয়, হে দয়াসরিসিন্ধু, তোমাকে কি দেব, কিবা চাইব, কিবা বলব তোমার কাছে। শুধু জীবন ভরে এই জেনে থাকব আমার নিদ্রাহীন হৃদয়ের ব্যথা কিছুই আর তোমার অজানা নেই। ব্যথা হরণ করলেন, নিবারণ করলেন সমস্ত ভয়ভ্রান্তি। শুধু নিজে খেলেন না, সবাইকে প্রসাদ দিতে লাগলেন। খাদ্যকে শুধু নৈবেদ্যে নিয়ে গেলে চলবে না, নৈবেদ্যকে নিয়ে যেতে হবে প্রসাদে।

ভোলা ময়রার দোকানে চমৎকার সর করেছে। ওরে, ঠাকুরের জন্যে একখানা কিনে নিয়ে যাই চল। মেয়ের দল চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। নৌকো করে। একখানা বড় দেখে সর কিনে নিয়েছে। ঠাকুর বড় ভালোবাসেন সর। দেখে কত খুশি হবেন না-জানি!

দক্ষিণেশ্বরে এসে শোনে—কী সর্বনাশ—ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন। সবাই বসে পড়ল। এত সাধ করে এলুম, দেখা হল না! কোথায় গিয়েছেন কলকাতায়? রামলাল বললে, কম্বুলিটোলায়। মাস্টারমশায়ের বাড়িতে। কখন ফিরবেন কে জানে! চল সেখানেই যাই। আমি চিনি সে বাড়ি। আমার বাপের বাড়ির লাগোয়া।

কিন্তু যাবি কি করে? বললে আরেকজন। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিস।

পায়ে হেঁটে যাব।

সরখানি রামলালের হাতে দিয়ে বললে, ঠাকুর এলে দিও। পেটরোগা মানুষ, সবটা তো আর খেতে পারবেন না, একটু যেন খান।

আলমবাজার পার হতে না হতেই, ঠাকুরের কৃপা, ফিরতি গাড়ি জুটে গেল একখানা। চলো শ্যামপুকুর।

বাপের বাড়িই চেনে সে মেয়েটি, কম্বুলিটোলায় মাস্টারের বাড়ি আর বের করতে পারে না। একবার এ-গলি ঢোকে, ঘুরে-ফিরে আরেক বারও এ-গলি। শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির সামনেই দাঁড় করালে। একটা চাকর ডেকে নিলে। বাবা, দেখিয়ে দে কম্বুলিটোলা।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! সামনের ছোট ঘরে তক্তপোশের উপর একলা বসে আছেন। আমরা পর্দার মেয়ে, রাস্তা-ঘাটে বেরোই না কখনো, কিন্তু তোমার জন্যে ছেড়েছি সব লোকলাজ, মানিনি দেয়াল-বেড়া। কার বাড়ি, কে মাস্টার, কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু জানি তুমি যেখানে আছ তাই আমাদের ঘর-দোর। আমাদের তীর্থ-মন্দির। 'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' ঠাকুর উছলে উঠলেন।

প্রণাম করে বললে যা হয়েছে। বসলে মেঝের উপর। দুজন বুড়ি, তিনজন অল্পবয়সী। আনন্দে কথা কইতে লাগলেন ঠাকুর। এমন সময় আসবি তো আয় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন সেই প্রাণকৃষ্ণ মুখুজ্জে এসে উপস্থিত। কি সর্বনাশ, পালাবি কোথায়, পালাবি কি করে? বুড়ি দুজন জবুথবু হয়ে বসে রইল কোনো রকমে, কিন্তু অল্পবয়সীদের উপায় কি? উপায় ঠাকুরই যুগিয়ে দিলেন। ঠাকুরেরই মশার কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন হবার যোগাড় তবু নড়ল না একটিলও।

তক্তপোশের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল তিনজনে। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে

রইল। পুরুষ না নারী এই দেহবুদ্ধি নেই ঠাকুরের। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের আছে। তাই ঠাকুরকে তাদের লজ্জা নেই, প্রাণকৃষ্ণকে লজ্জা।

সেই সরোবরতীরে বসন রেখে স্নান করছে সুরাঙ্গনারা। সংসার ত্যাগ করে চলেছে যুবক শুক, সেই সরোবরের তীর দিয়ে। তাকে দেখে সর্ববিনির্মুক্তা অপ্সরীদের এতটুকু সঙ্কোচ নেই, কেন না যুবক হলেও শুক মায়াহীন, ভগবদ্ভাববিভোর। কিন্তু ছেলের পিছনে ছুটেছেন ব্যাসদেব, তাকে সংসারে ফিরিয়ে আনতে। হলেনই বা বৃদ্ধ, তিনি মায়াধীন, তাকে দেখামাত্রই স্বর্গ-সুন্দরীরা ত্বরান্বিত হয়ে গায়ের উপর টেনে নিল আচ্ছাদন।

মন্দ পরিহাস নয়। ব্যাসদেব দাঁড়ালেন। জিগগেস করলেন, 'এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? আমার যুবক পুত্র শুককে দেখে তোমাদের লজ্জা হল না, আর আমি বুড়া, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা?'

কার সঙ্গে কার তুলনা! শুক নিবৃত্তাশয়, উপশান্তাত্মা। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাই তাকে দেখে আমাদের লজ্জা করবে কেন? আর বুড়ো হলেও তুমি রূপ-পিপাসু, সর্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা রমণীদের কটাক্ষগর্ভ নেত্রপাতের ভিখারী, তোমার কাব্যে-গ্রন্থে কত তুমি বর্ণনা করেছ লাবণ্যবিলাস ও বিভ্রমমণ্ডনের কথা। তোমাকে দেখে লজ্জা হবে না তো কাকে দেখে হবে?

প্রাণকৃষ্ণ কি আর শিগগির যায়! ঠায় এক ঘণ্টা ধরে তার নানা নিবন্ধ। ওরে বাপু, এবার সরে পড়। পারি না আর উবুড় হয়ে পড়ে থাকতে। মশার কামড়ে যে গেলুম!

ঘণ্টাখানেক লাগল, মোটা বাবুনের হাওয়া হতে। চলে গেলেই বেরিয়ে এল মেয়েরা। তখন ঠাকুরের কি হাসি! বাড়ির মেয়েরা অচেনা, কি যায় আসে, ঠাকুর যখন সঙ্গে আছেন তখন চরাচরে আর পরাপর নেই। এরাও তাই ঢুকে পড়ল অনায়াসে। ঠাকুরের সঙ্গে-সঙ্গে এরাও খেল-দেল। রাত ন'টা, ঠাকুর ফিরলেন ঘোড়ার গাড়িতে আর এরা পায়ে হেঁটে।

ঠাকুরের ফিরতে প্রায় সাড়ে-দশটা। খানিক বাদে রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে রামনেলো, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'সে কি, খেয়ে আসেননি?'

'খেয়ে এলে কি হয়, আবার খিদে পেতে পারে না? শিগগির কিছু দে। নিদারুণ খিদে।' সেই সরখানি এনে সামনে ধরল রামলাল। দিব্যি খেয়ে ফেললেন একটু-একটু করে।

পরদিন সকালে আবার এসেছে। সেই মেয়ের দল। তাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওগো রাত্তিরেই তোমার সেই সরখানি সব খেয়ে ফেলেছি। কোনো অসুখ করেনি কিন্তু।'

মেয়েরা সব অবাক। পেটে কিছু সয় না ঠাকুরের, তা ছাড়া রাত্রে দিব্যি খেয়ে এসেছেন মাস্টারের বাড়ি থেকে, তার পরে আবার এই বন্য ক্ষুধা! বন্য ক্ষুধা নয় অন্য ক্ষুধা। এ ক্ষুধা অন্তরমধুরী জন্যে, ভক্তির আস্বাদনের জন্যে। ক্ষুধা কি

বস্তুর, ক্ষুধা ভালোবাসার।

কৃষ্ণের সেই গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ-বন্ধুর কথা মনে করো। একসঙ্গে পড়েছিল পাঠশালায়, সান্দীপনি গুরুর ঘরে। কিন্তু ভাগ্যদোষে আজ সে ভিখারি। মলিন জীবন যাপন করছে ভার্যার সঙ্গে। একদিন স্ত্রী বললে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সখা, তার কাছে গিয়ে কিছু চাও না।

মন্দ কি। কিছু পাই না পাই অন্তত দেখে আসতে তো পারব। মুখে ভাষা না ফোটে চোখে অন্তত থাকবে তো নীরবতা! ভিক্ষে করে জুটেছিল কিছু চিঁড়ের খুদ, তাই ব্রাহ্মণী বেঁধে দিল বস্ত্রখণ্ড। দ্বারকার দিকে যাত্রা করল ব্রাহ্মণ। পুরপ্রবেশ করতে পারবে কিনা তারই বা ঠিক কি। তার পরে অন্তঃপুরে কোন সুগোপন কক্ষে তিনি আছেন তাই বা কে বলবে!

আশ্চর্য, কেউ বাধা দিল না। তোরণ পেরিয়ে ক্রমে-ক্রমে তিনটি কক্ষ অতিক্রম করল। এই শ্রীশালী গৃহই শ্রীকৃষ্ণের। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল দীনভাবে।

প্রিয়ার পর্যঙ্কে শুয়েছিল কৃষ্ণ। ছুটে কাছে এল ব্রাহ্মণের, দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল নিবিড় করে, বসাল পালঙ্কের উপর। নিজের হাতে ধুয়ে দিল পা দুখানি। সেই পাদোদক মাথায় ধরলে। অর্চনা করল নানা উপকরণে। রুক্মিণী ব্যজন করতে বসল। এত সব কাণ্ডের পর কৃষ্ণ বললে, ঘর থেকে আমার জন্যে কি এনেছ দাও।

কোথায় আমি চাইব, তা নয়, তুমিই কি না চেয়ে বসলে!

শ্রীকৃষ্ণ বললে, ভাই আমিও ভিখিরি। আমি ভিখিরি ভালোবাসার। ভালোবাসার সঙ্গে যদি অণুমাত্রও কেউ দেয় তাই আমার কাছে অনেক। হোক তা ছোট্ট একটা ফুল নয়তো তুচ্ছ একটা পাতা, কিংবা এক অঞ্জলি জল।

তবু কি এনেছে বলতে সাহস পেল না ব্রাহ্মণ। কি এনেছ দেখি, কৃষ্ণ নিজেই তখন বস্ত্রখণ্ড খুলে ফেললে। এক মুঠো খুদ তুলে নিয়ে মুখে পুরলে। দ্বিতীয় মুষ্টি তুলতে যাচ্ছে, রুক্মিণী হাত চেপে ধরল। বললে, তোমার সন্তোষ দেখাবার জন্যে এক মুষ্টিই যথেষ্ট, আবার দ্বিতীয় মুষ্টি কেন?

সেই রাত হরি-ঘরেই বাস করল ব্রাহ্মণ। কি যে তার অভাব কি যে তার চাইবার কিছুই মনে করতে পারল না। প্রত্যুষে ফিরে চলল।

কোথায় আমি দরিদ্র পাপী আর কোথায় শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি তাঁর বন্ধু, শুধু এটুকু জেনেই তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি অধন, ধন পেলে মত্ত হয়ে আর তাঁকে স্মরণ করব না, এই ভেবেই করুণাময় ধন দিলেন না আমাকে।

ঘরের কাছাকাছি এসে ব্রাহ্মণ যেন ইন্দ্রজাল দেখল। এ কি, এ উপবন আর সরোবর এল কোত্থেকে, সেই কুঁড়েঘরের পরিবর্তে এ কি চিত্রপুরী! কোথা থেকে এল এত দাসদাসী! আর এই যে চন্দ্রচন্দনভূষাঙ্গী পুরাঙ্গনা এই কি তার সেই মনোরথ-প্রিয়তমা ব্রাহ্মণী?

চাইলাম না, অথচ এত সব হল কি করে? মেঘ তো না চাইতেই জল দেয়। তেমনি তাঁর যা ইচ্ছে তা নেন যত ইচ্ছে তত দেন। নইলে আমার পুঁটলি খুলে

কেন নিলেন সেই তণ্ডুলকণা, আর কেনই বা দিলেন এত ভোগৈশ্বর্য? পাছে পতন ঘটে তাই তো তিনি ধনবৈভব দেন না ভক্তদের। কিন্তু এ তো আমার প্রাপ্তি নয় এ তোমার প্রীতি। এ তোমার ঐশ্বর্য।

ঠাকুর নবতখানায় খবর পাঠালেন ব্যাগ্রহুঙ্কারে: ভীষণ খিদে পেয়েছে। শিগগির খাবার পাঠাও।

কি বুঝলেন শ্রীমা, এক থাদা সুজির পায়েস করে পাঠালেন। একজনের চেয়ে অনেক বেশি, একাধিক দিনের আহার। ভক্ত-মেয়ে সেই অন্নপাত্র নিয়ে কাছে এসে এ কি দেখল! ঠাকুর অস্থির পায়ে পাইচারি করছেন। যেন ঠাকুর নয় কে এক অতিকায়-মূর্তি। ঠাকুর ইশারা করলেন খাবার রাখতে। আসনের কাছে খাবার রেখে ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল হাত জোড় করে।

কি পর্বতপ্রমাণ ক্ষুধা! ঠাকুর খেতে লাগলেন ভীমগ্রাসে।

সেই মেয়ের দিকে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'এ কে খাচ্ছে? আমি না আর কেউ?'

'আর কেউ!'

১১২

শ্রীমা'র কাছে নবতখানায় বসে জপ করছে গোপালের মা। জপ সাঙ্গ করে প্রণাম করে উঠছে, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ফিরছেন পঞ্চবটীর ধার থেকে, দেখা হতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি এখনো এত জপ করো কেন?'

'জপ করব না?' বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল গোপালের মা।' আমার কি সব হয়েছে?'

'বলো কি?' যেন ঠাকুর বললেও বিশ্বাস করা যায় না।

'তোমার নিজের জন্যে সব হয়ে গেছে। তবে, নিজের শরীরের প্রতি ইশারা করলেন:

'তবে যদি এই শরীরটা ভালো থাকবে বলে করতে চাও তো কোরো।'

তবে তাই হোক। আর নিজের জন্যে নয়। যা করব এবার থেকে সব তোমার, তোমার জন্য। থলে-মালা গঙ্গায় ফেলে দিল গোপালের মা। হাতেই জপ করতে লাগল। তারপর কি ভেবে আবার একটা মালা নিলে। নিজের জন্যে নয়, গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই। কিন্তু কই আগের মতন তো গোপাল দর্শন হয় না যখন-তখন। যখন দেখে রামকৃষ্ণমূর্তিই দেখে, কোথায় সেই বালকের বেশ! দু জানু আর এক হাত মাটিতে আরেক হাতে নবনীভিক্ষা। কোথায় সেই দুটি আহ্লাদবিহ্বল দৃষ্টি!

একদিন এসে কেঁদে পড়ল ঠাকুরের কাছে। 'গোপাল, তুমি আমার এ কি করলে? আমার কি অপরাধ হল, কেন আমি আর তোমাকে আগের সেই গোপাল-

মূর্তিতে দেখি না ?'

'সর্বক্ষণ ও রূপ দর্শন করলে কলিতে শরীর থাকে না।'

'আমার শরীর দিয়ে কি হবে ?'

না, তুমি বাৎসল্যরতির উদাহরণ, লোকহিতের জন্যে থাকো তুমি সংসারে। সংসার-বাসিনীরা বুঝুক শিশুসেবার মধ্যেই ঈশ্বরসেবা।

কার মুখখানি মনে পড়ে গা ? সংসারে কাকে বেশি ভালোবাসো ? একটি ভক্ত-মেয়েকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'ছোট একটি ভাইপোকে।'

'আহা, তবে তাকেই গোপাল ভেবে খাওয়াও-পরাও, সেবা করো। তার মধ্যে গোপালরূপী ভগবানকে দেখ। মানুষ ভেবে করবে কেন ? ভগবান ভেবে করবে। যেমন ভাব তেমন লাভ।'

বলরাম বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রথের সময়। বার-বাড়ির দোতলায় চক-মিলান বারান্দায় রথ টানবেন ঠাকুর। কীর্তন করবেন। কিন্তু, কত লোক এসেছে, সে কই ?

'ওগো সেই যে কামারহাটির বামুনের মেয়ে। যার কাছে গোপাল হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন কি দেখে-শুনে প্রেমে উন্মাদ হয়ে আমার কাছে উপস্থিত। খাওয়াতে-দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হল। কত থাকতে বললুম কিছুতে থাকলো না। যাবার সময়ও তেমনি উন্মাদ। গায়ের কাপড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। হুঁশ নেই। ওগো তাকে একবার আনতে পাঠাও না ?'

কামারহাটিতে লোক পাঠালো বলরাম। সন্ধ্যা হয়-হয় ঠাকুরের ভাবাবেশ হল। মরি মরি, বালগোপালের ভাব। হামা দিচ্ছেন দুই জানু আর এক হাতে। অন্য হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছেন ঊর্ধ্বমুখে। মা যশোদা, ননী দে।

স্নেহগলিতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে স্তন্য দিচ্ছে। হঠাৎ শিশু হাই তুলল। পুত্রের মুখবিবরে যশোদা দেখল স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সমগ্র বিশ্ব।

আরেক দিন। বলরাম এসে নালিশ করলে মা'র কাছে। মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। না মা, খাইনি মাটি। বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দেখাচ্ছি তবে হাঁ করে। এ কি স্বপ্ন না দেবমায়া ? মুখবিবরে আবার সেই বিশ্বরূপ।

হোক মায়া, তবু সেই আমার একমাত্র আশ্রয়। যশোদা ভাবল মনে-মনে, এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, এই গোপ-গোপী-গোধন সকল আমার, এ কুমতি যার মায়াবশে হয়েছে সেই আমার পরমগতি, পরমনতি।

ঠাকুরেরও ভাবাবেশ হয়েছে, গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। কে এল ? যার ভক্তির জোরে ঠাকুর এমন মূর্তি ধরলেন, সে—সেই গোপালের মা।

'আমি কিন্তু বাপু ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালোবাসি না।' গোপালের মা যেন অনুযোগ দিল। 'আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়বে—ও মা, এ যেন একেবারে কাঠ ! আমার অমন গোপালে কাজ নেই।' ঠাকুরের গা ঠেলতে লাগল গোপালের মা : 'ও বাবা তুমি অমন হলে কেন ?'

এই মাতৃভাব বা সন্তানভাব—সাধনের শেষ কথা বা সহজ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে। আমি তোমার শরণাগত সন্তান। জীবত্ব বুঝি না, ঈশ্বরত্ব বুঝি না, কাকে বা বলে বন্ধন কাকে বা বলে মুক্তি। জ্ঞান-ভক্তিও বুদ্ধির বাইরে। বুঝি একমাত্র তোমাকে, মাকে। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ মা আর আমি তোমার কোলে সদ্যোজাত নগ্ন শিশু। তোমার কোলে যদি উঠতে পারি, তবে ঈশ্বরত্বও তৃণীকৃত।

তিনদিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নৌকোতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত-বালক। আশ্চর্য, গোপালের মা'র হাতে একটি পুঁটলি! কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বেঁধে দিয়েছে। খান দুই কাপড়, রাঁধবার জন্যে কিছু হাতা-খুন্তি।

পুঁটলি দেখে ঠাকুর মহাবিরক্ত। গোপালের মাকে সরাসরি কিছু বললেন না। বললেন গোলাপ-মাকে কিন্তু গোপালের মাকে ঠেস দিয়ে। 'যে ত্যাগী সেই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শুধু-হাতে চলে আসে, সেই ভগবানের গায়ে বসতে পারে ঠেস দিয়ে।' বলছেন আর বারে-বারে সেই পুঁটলির দিকে কটাক্ষ করছেন।

গোপালের মা'র মনে হ'ল পুঁটলিটা ফেলে দি গঙ্গাজলে। কিন্তু তাই বা কেন, দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে কাউকে বিলিয়ে দেব না হয়।

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছেই সোজা চলে গেল নবতে। শ্রীমাকে বললে, 'ও বৌমা, গোপাল এ সব জিনিসের পুঁটলি দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? এ সব ভাবছি আর নিয়ে যাব না, এইখানে বিলিয়ে দি কাউকে।'

সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোলেন শ্রীমা। বললেন, 'বলুন গে উনি। তুমি শুনো না। তোমায় দেবার তো কেউ নেই! তা তুমি কি করবে মা, দরকার বলেই তো এনেছ।'

বুক জুড়িয়ে গেল কথা শুনে। তবু মনে যখন উঠছে, একখানা কাপড় দান করল। আরো কটি এটা-ওটা। ঠাকুরের জন্যে রাঁধল স্বহস্তে। কি জানি, নেবেন কি না। নেবেন বই কি, হাসিমুখে নেবেন। শ্রীমা ইঙ্গিত করেছেন নবত থেকে। না নিয়ে উপায় কি! গরিব মানুষ, চেয়ে ভিক্ষে করে আনেনি তো! আর যা পেয়েছে তার থেকে দান করে দিয়েছে অপরকে।

নরেনকে ডাকিয়ে এনেছেন ঠাকুর। আর সেই দিনই গোপালের মা'র আবির্ভাব। এবার রগড় হবে মন্দ নয়। একজনের জ্ঞান-অসি আরেকজনের হাতে বিশ্বাসের পাহাড়—কেমন যুদ্ধ হবে না জানি! দুষ্টুমি করে একটা কোঁদল বাধিয়ে দিই দুজনের মধ্যে।

'কেমন তুমি গোপাল দেখ নরেনকে একটু ব'লো তো বুঝিয়ে।'

দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই এমনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। তাই ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল গোপালের মা, 'তাতে কিছু দোষ হবে না তো গোপাল?'

'না, তুমি বলো।'

তুমি বিশ্বাস করো না করো আমি বলি এবার নির্ভয়ে। আমার ভাবের কথা বলব ভালোবাসার কথা বলব, তাতে আমার লজ্জা কি। চাঁদের আলো যে ছড়িয়ে পড়ছে জলে-স্থলে পাহাড়ে-কাননে সে কি চাঁদের লজ্জা? গোপাল আমার কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে এসেছিল সারা পথ। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর। তার রাঙা টুকটুকে পা ঝুলছিল বুকের 'কাছটিতে। এসেই ঢুকে গেল ঠাকুরের শরীরে। আবার বেরিয়ে এল যাবার সময়। শুতে বালিশ না পেয়ে খুঁতখুঁত করছে সারা রাত। কাঠ কুড়িয়ে আনল রাঁধবার সময় আর খেতে বসে কি দস্যিপনা। ভাবে বিভোর হয়ে বলতে লাগল অঘোরমণি। তুমি যদি না মানো তো আমি কি করব! আমি যে দেখছি চোখের সামনে।

এ কি, নরেন কাঁদছে!

বাবা, তোমরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, আমি দুঃখী কাঙালী, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না।' আকুল স্বরে বললে গোপালের মা, 'তোমরা বলো, আমার এ সব তো মিথ্যে নয়?'

'না মা,' নরেন বললে ভক্তবিশ্বাসীর মতো, 'তুমি যা দেখছ সব সত্যি।'

ঝগড়াটা তাহলে লাগল না। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

১১০

অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে বঙ্কিমের দেখা।

'তুমি ডিপুটি।' কথায়-কথায় বললেন একদিন অধরকে। তার শোভাবাজার বেনেটোলার বাড়ির উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। 'কিন্তু জেনো এ পদও ঈশ্বরের দয়ায় হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।' আবার একদিন দক্ষিণেশ্বরে, শিবের সিঁড়িতে বসে। 'দেখ, তুমি এত বিদ্বান আর ডিপুটি। তবু তুমি খাঁদিফাঁদির বশ। আমার কথা শোনো। এগিয়ে পড়ো। চন্দনকাঠের পরেও আরো ভালো জিনিস আছে। রুপোর খনি, সোনার খনি—তার পর হীরে-মানিক! শুধু এগিয়ে পড়ো—'

বয়স আটাশ-ঊনত্রিশ। বৃত্তি পেয়েছে এনট্রান্সে অষ্টম হয়ে। এফ-এতে চতুর্থ। কবিতার বই লিখেছে দুখানা, 'মেনকা' আর 'ললিতাসুন্দরী।' চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম ডেপুটি হয়েই চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বদলি হয়ে যশোর। যশোর থেকে সম্প্রতি কলকাতা। আর কলকাতায় পেঁছই সটান দক্ষিণেশ্বর।

তিনশো টাকা মাইনে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে। বড়-বড় লোকদের করছে অনেক ধরাধরি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবার তুমি যদি বলো একটু তোমার কালীকে।

অধরকে মনে করেন পরমাত্মীয়। মুখে বলেনও তাই অকপটে। তাই একটু সাধলেন কালীকে। বললেন, 'মা, অনেক তোমার কাছে আনাগোনা করছে। যদি

হয় তো হোক না।' বলেই ছি-ছি করে উঠলেন : 'মা, কি হীনবুদ্ধি! জ্ঞান-ভক্তি না চেয়ে চাচ্ছে কিনা টাকা-পয়সা!'

ধিক্কার দিয়ে উঠলেন অধরকে, 'কেন হীনবুদ্ধি লোকগুলোর কাছে অত আনাগোনা করলে? কী হল? সাতকাণ্ড রামায়ণ, সীতা কার ভার্যে! আর বোলো না ঐ মল্লিকের কথা। আমার মাহেশ যাবার কথায় চলতি নৌকো বন্দোবস্ত করেছিল, আর বাড়িতে গেলেই হৃদুকে বলত, হৃদু গাড়ি রেখেছ?'

অধর হাসল। বললে, 'সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে কই? আপনি তো বারণ করেননি!'

কি অবস্থাই গেছে! 'এই অবস্থার পর', ঠাকুর বললেন, 'আমাকে মাইনে সই করাতে ডেকেছিল খাজাঞ্চি। যেমন ডাকে সবাইকে, অন্যান্য কর্মচারীকে। আমি বললাম, তা আমি পারবোনি। তোমার ইচ্ছে হয় আর কারুকে দিয়ে দাও।'

সংসারে থাকো কিন্তু ঈশ্বর-রস-সরসীতে স্নান করো। কিন্তু যদি একবার যাও তলিয়ে আর উঠো না।

'এই অবস্থা যেই হল, রকম-সকম দেখে মাকে বললাম, মা, এইখানেই মোড় ফিরিয়ে দে। সুধামুখীর রান্না, আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না!'

সবাই হেসে উঠল। সংসারসুধামুখীকে সবাই চেনে। বচনে অমৃত, ব্যঞ্জনে বিষ। আপাতরম্য কিন্তু পর্যন্তপরিতাপী। যাকে বলে দেখসিঁদুরে। রূপসুন্দর কিন্তু অসার।

'যার কর্ম করছ তারই করো।' বললেন আবার অধর সেনকে : 'লোকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা মাইনে পায় না, তুমি তিনশো টাকা পাচ্ছ। ডিপুটি কি কম গা? ওদেশে দেখেছিলাম আমি ডিপুটি। নাম ঈশ্বর ঘোষাল। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। বাঘে-গরুতে জল খায় এক ঘাটে। শোনো। যার কর্ম করছ তারই করো। একজনের চাকরি করলেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচজনের!

আমিও একজনের চাকরি করছি। একজনের দাসত্ব। সে মুনিব সে উপরওয়ালার নাম ঈশ্বর।

'শোনো! আবার বলছেন ঠাকুর : 'আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না। তাঁকে লাভ করতে চাইলে তিনিই সব যোগাড় করে দেন, কোনো অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার অনেক লোক এসে জোটে। তবে আপনি হাকিম, কি বলব। যা ভালো বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ—'

আর সবাইকে লক্ষ্য করে হাসিমুখে বললে অধর, 'উনি আমাকে একজামিন করছেন।'

যেমন দেশে বাড়ি কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে, তেমনি সংসারকর্মভূমিতে কাজ করে যাও। আর ঈশ্বরের নাম করো। ঈশ্বরই কীর্তনীয় কথনীয় গণনীয় মননীয়। বর্ণনীয়, বন্দনীয়। ঈশ্বরই সর্বার্থনামচিন্তামণি। শুধু তাঁর নামসাধন করে যাও। পরমামৃতায়মান নামকীর্তন! 'বিদ্যাবধূজীবনং।' চিদ্বৃত্তি বিদ্যারূপ

যে বধূ তার জীবনই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন। নামসাধনে নিশ্চলা স্থিতিই নিষ্ঠা।

'তাঁর নামবীজের খুব শক্তি।' বললেন আবার অধরকে। 'নাশ করে অবিদ্যা। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।'

কণ্ঠপীঠে মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম প্রতিষ্ঠিত করো। 'স্ফুটং রট।' শব্দ করে উচ্চারণ করো। সঙ্কেতে অর্থাৎ পুত্রাদির নামকরণে, পরিহাসে, স্তোত্রে বা নিরর্থক বাক্যে বা নৃত্যগীতে, বা অবহেলাক্রমে যে ভাবেই হোক নাম করলেই হল। ভুলেও যদি অগ্নিকণা গায়ে এসে পড়ে দগ্ধ করবেই। তেমনি হরিনাম যদি একবার উড়ে এসে মনে পড়ে পুড়ে যাবে সর্বপাপ। আসলে হরিনামও বহ্নিময়। দাহ আছে, আবার এমন মজা মধুও আছে। যাকে বলে 'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ।' রাখাও যায় না ফেলাও যায় না।

'এই প্রেমের আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্বণ—
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥'

কিন্তু শুধু নাম করলে কি হবে? অনুরাগ চাই। নামের মধ্যে চাই সেই হৃদয়ের সুর। সেই স্পর্শ-আতুর পথিক হাওয়ার ব্যাকুলতা। শুধু নাম করে যাচ্ছি অথচ বিলাস-লালসে মন রয়েছে অলস হয়ে, তাতে কী হবে?

'হাতিকে নাইয়ে দিলে কি হবে, আবার ধুলোকাদা মেখে যে-কে-সেই। তবে হাতিশালায় ঢোকবার আগে যদি কেউ ধুলো ঝেড়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাহলে আর ভয় নেই, গা তখন থাকবে ঠিক পরিষ্কার।'

সেই যে এক পাপী গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় শুনেছে, বাস, মনের সুখে ডুব দিচ্ছে জলে নেমে। কিন্তু জানে না পাপগুলো নদীর পাড়ে গাছের উপর গিয়ে বসেছে। যেই স্নান সেরে ফিরছে অমনি পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ের উপর। স্নান করে দু পা আসতে-না-আসতেই একটু-আধটু হালকা হতে-না-হতেই আবার সেই গুরুভার। সেই জগদ্দল পাষাণের শ্বাসরোধ।

'তাই বলি নাম করো। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমার উপর যেন ভালোবাসা আসে। আর কিছু না। টাকা নয় মান নয় দেহের সুখ নয়, শুধু ভালোবাসা। এমন কখনো হতে পারে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি আমাকে বাসো না?'

চণ্ডীর গান হয়ে গেল অধরের বাড়িতে। বলরামকে নেমন্তন্ন করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। বলরামের বড় অভিমান, যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে। নালিশের মধ্যে রাগ তত নয় যত দুঃখ। চন্ডীর গান দিল অধর, আমাদের বললে না। তা বলবে কেন, আমরা হলুম আজে-বাজে, হেঁজি-পেঁজি—

কথা কানে উঠল অধরের। ছুটে তক্ষুনি বলরামের বাড়ি গেল। যুক্ত করে অপরাধ স্বীকার করলে। মাপ করুন। ভুল হয়ে গিয়েছিল—

সে কথাই হচ্ছিল ঠাকুরের সঙ্গে।

বলরাম বললে, 'আমি জানতে পেরেছি যে অধরের দোষ নয়। দোষ রাখালের। রাখালের উপর ভার ছিল।'

'রাখালের দোষ ধোরো না।' মমতামাখানো মুখে বললেন ঠাকুর, 'গলা টিপলে ওর দুধ বেরোয়—'

'বলেন কি মশাই!' ঝাঁজিয়ে উঠল বলরাম: 'চন্ডীর গান হল, আর ও নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে—'

'আসলে অধরই জানত না। অধরেরই খেয়াল ছিল না।' ঠাকুর শান্তিজল ঢেলে দিলেন। 'দেখ না সেদিন যদু মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিল আমার সঙ্গে। দেখল সিংহবাহিনী। চলে আসবার সময় জিগগেস করলুম, সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? ও, দিতে হয় না কি—সংকুচিত হয়ে গেল—তা মশাই আমি তো জানি না, আমার তো খেয়াল নেই!' ঠাকুর থামলেন। বলরামকে বিশেষ উদ্দেশ করে বললেন, 'তা তোমাকে যদি না বলেই থাকে, তাতে দোষ কি? যেখানে হরিনাম সেখানে না বললেও যাওয়া যায়। নিমন্ত্রণের দরকার হয় না।'

নিমন্ত্রণ করি কাকে? অভিমানীকে। স্পর্বিতবর্ধিতকে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলেও ত্রুটি ধরে। কিন্তু বিশ্বময় এত যে পত্র লিখে রেখেছেন ঈশ্বর, এ কি নিমন্ত্রণ? এ সরোদন আহ্বান। আয় আয়। তুমি যাবে না ভেবেছ? যেতে পারো না সে আলাদা কথা। তোমার দেহের প্রতিটি রক্তকণা যাই-যাই করে উঠছে।

গাছ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি, পত্রমর্মরে হরিনাম শুনি। নদী কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার তীরে গিয়ে বসি, জলগুঞ্জনে হরিনাম শুনি। আকাশ কি নিমন্ত্রণ করে? তবু তার অন্ধকার নিচে গিয়ে দাঁড়াই। তারায়-তারায় শুনি দীপ্ত হরিনাম। গৃহস্থের ঘরে হরিনাম হচ্ছে। পথচারী পথিক এসে দাঁড়াল বাড়ির আঙিনায়। কে আপনি? আমি রাহুতে। আমাকে গৃহস্বামী ডাকেনি, আমাকে হরিনাম ডেকে এনেছে। যেখানেই হরিকথা সেখানেই আত্মীয়তা। যেখানেই হরিনাম সেখানেই সুখধাম। নামসদৃশ জ্ঞান নেই, নামসদৃশ ব্রত নেই, নামসদৃশ ফল নেই, নামসদৃশ শান্তি নেই, নামসদৃশ আশ্রয় নেই। রসসারজ্ঞা রসনা, মধুরপ্রিয়া, যদি মধুস্বাদই করতে চাও নিরন্তর, নামপীযূষে পান করো।

'প্রথমে একটু খাটুনি!' বললেন আবার অধরকে। 'তার পরেই পেনসান।'

প্রথমে অভ্যাস তারপরেই অনুরাগ। প্রথমে দাগা বুলোনো পরে টেনে লেখা। প্রথমে দাঁড় টানা পরে তামাক খাওয়া। প্রথমে ছুটোছুটি পরে মা'র কোলে ঘুম।

অনেক দিন পর এসেছেন অধরের বাড়িতে। কোনো ঠিক ছিল না হঠাৎ এসে পড়েছেন। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসল এসে অধর। বললে, 'কত দিন আসেননি। আমি আজ খুব ডেকেছিলাম আপনাকে। চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—'

'বলো কি গো—' মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠল।

তাই তো এসেছি। ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেই তো চলে আসি পথ চিনে। বিনা-রেখার পথ ধরে যেমন বাতাস চলে আসে ফুলগন্ধের সংবাদ পেয়ে। শুধু তুমি

আমার জন্যে নয় আমিও তোমার জন্যে ব্যাকুল হই। কাঁদি। ঘুরে বেড়াই। অনেক দিন পর অধর এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। 'কি গো এত দিন আসোনি কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে যেন বেদনার কুয়াশা।

'অনেক কাজে পড়ে গিয়েছিলুম। নানান মিটিং, ইস্কুল, অফিস—'

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু মন রয়েছে আড়াতে। যেখানে তার ডিম রয়েছে সেখানে।'

'অনেক দিন আমাদের বাড়িতে আসেননি।' করজোড় করল অধর। বললে, 'সেই যে গিয়েছিলেন বৈঠকখানা ঘর সুগন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন—এখন সব অন্ধকার।'

ভাবসাগর উথলে উঠল ঠাকুরের। ভাবসাগর মানে প্রেমসাগর। দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত দিয়ে অধর আর মাস্টারের মাথা ছুঁলেন, ছুঁলেন বক্ষদেশ। বললেন, 'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি। তোমরাই আমার আপনার লোক।'

শুধু তাই নয়, সেদিন অধরের জিভ ছুঁলেন ঠাকুর। জিভে কি লিখে দিলেন। সেই কি দীক্ষা হয়ে গেল অজানতে? মুখে বললেন, 'তুমি যে নাম করেছিলে তাই ধ্যান করো।' নামসদৃশ ধ্যান নেই।

সেই অধর সেনের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছে। এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। ঠাকুরের মতই যার মন্ত্র বন্দে মাতরম্।

"এ কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলের শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন—কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ —এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা—" ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

১১৪

'মশায় ইনিই বঙ্কিমবাবু।' অধর সেন পরিচয় করিয়ে দিল। 'ভারি পণ্ডিত, বই-টই লিখেছেন। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

ঠাকুরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট বঙ্কিম। তাকালেন একবার চোখ তুলে। সহাস্যে বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!'

'আর মশায়, জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

তা কেন? আমি তোমাকে চিনেছি। ও কথা বোলো না। তুমি কৃষ্ণপ্রেমে

বঙ্কিম। তুমি কৃষ্ণের ভক্ত। কৃষ্ণের ব্যাখ্যাতা। কৃষ্ণরসবিবেত্তা।

'না গো' প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।' বলে পুরুষ-প্রকৃতির অভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন মধুর করে : 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রীমতী শক্তি। যুগলমূর্তির মানে কি ? মানে হচ্ছে, পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ। একটি বললেই আরেকটি। যেমন অগ্নি আর দাহিকা। অগ্নি ছাড়া দাহিকা নেই দাহিকা ছাড়া অগ্নি নেই। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ শ্রীমতীর, তাই নীলাম্বর পরেছেন, আর অঙ্গ সাজিয়েছেন নীলকান্ত মণি দিয়ে। আর শ্রীমতীর পায়ে নূপুর দেখে নূপুর পরেছেন শ্রীকৃষ্ণ।'

তন্মোহিতের মত শুনছে দুই ডেপুটি। বঙ্কিম আর অধর। নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কি বলাবলি করছে।

'কি গো, আপনারা ইংরিজিতে কি কথাবার্তা করছ ?'

'এই কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা আলোচনা করছিলাম।' বললে অধর।

'সেই যে নাপিতের গল্প করলে ! শোনো তবে। এক নাপিত কামাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। কামাতে-কামাতে কোথায় লাগিয়ে দিয়েছে, আর ভদ্রলোকটি অমনি বলে উঠেছে ড্যাম্। ড্যাম্-এর মানে জানে না নাপিত। ক্ষুর-টুর ফেলে রেখে শীতকাল, তবু জামার আস্তিন গুটালো নাপিত, বললে, ড্যাম-এর মানে কি বলো। ভদ্রলোক বললে, আরে, তুই কামা না। ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে লক্ষ্মী বাবা, একটু সাবধানে কামাস ! নাপিত সে ছাড়বার নয়। বললে চোখ পাকিয়ে, ড্যাম মানে যদি ভালো হয় তবে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয় তবে তুমি ড্যাম, তোমার বাপ ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। শুধু ড্যাম, নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম।'

কি মহানন্দ শিশুর মত বললেন সরল গল্পটা। আর বলবার এন অপূর্ব কৌশল, দুই সহকর্মী হেসে উঠল উচ্চরোলে।

'আচ্ছা মশাই, এমন সুন্দর আপনার কথা, আপনি প্রচার করেন না কেন ?' প্রশ্ন করল বঙ্কিম।

প্রচার ! মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা করব ? না, খোল ঝুলিয়ে বেরুব শোভাযাত্রায় ? না কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখব আত্মজীবনী ?

'প্রচার ! ওগুলো অভিমানের কথা। যিনি চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন, তাঁর প্রচার তিনিই করবেন ! মানুষ ক্ষুদ্র জীব, তার সাধ্য কি সে প্রচার করে !'

'তবে তিনি যদি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ দেন তাহলেই প্রচার সম্ভব। সে আদেশ সে চাপরাশ কজন পেয়েছে ? নইলে, আদেশ হয়নি, তুমি বকে যাচ্ছ। যতক্ষণ বলছ লোকে বলবে আহা ইনি বেশ বলছেন। তুমিও থামলে, তারপর ভেঙে যাবে সভা, কোথাও কিছু নেই। আর বলবেই বা কদিন ? ঐ দুদিন।

দুদিনই লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। ঐ একটা হুজুক আর কি।'

ঈশ্বরের প্রচার ঈশ্বর করবেন, তুমি নিজে প্রকাশিত হও। দেখ না তিনি নিজে কেমন প্রকাশিত হয়েছেন চতুর্দিকে, সূর্যে চন্দ্রে তৃণাঞ্চিত ধরিত্রীতে, তারাঞ্চিত নিশীথিনীতে। তুমিও তেমনি প্রকাশিত হও। সমস্ত কিশলয়ে যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা তোমারও মধ্যে বিকশিত করো। তুমি যে মহৎ তুমি যে বৃহৎ তার প্রমাণ দাও জীবনে। অপরিমাণ রূপে বাঁচো। নিখিলের প্রতি প্রেমে নিখিলের প্রতি করুণায় প্রসারিত হও। কার শক্তিতে তুমি প্রচার করবে? তিনি যদি না দুধের নিচে আগুনের জ্বাল দেন তবে তা কি করে ফুলবে?

'যতক্ষণ দুধের নিচে আগুন জ্বাল রয়েছে ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল টেনে নাও, দুধও যেমন তেমনি। আচ্ছা, আপনি তো পণ্ডিত, কত বই লিখছ,' বঙ্কিমকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। 'আপনি কি বলো, কিছু কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?'

কথাটা উড়িয়ে দিল বঙ্কিম। পরকাল? সে আবার কি?'

'যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ ফিরে আসতেই হবে সংসারে, নিস্তার নেই। জ্ঞানলাভ হলে ঈশ্বরদর্শন হলে তবে মুক্তি। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে কেউ যদি সিদ্ধ হয় তাকে নিয়ে আর খেলা হয় না সৃষ্টির।' বঙ্কিম বললে, 'তা মশাই আগাছাতেও তো গাছের কোনো কাজ হয় না।'

'জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেছে, সে অমৃত-ফল লাভ করেছে, আপনার লাউ-কুমড়ো ফল নয়। তার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেশব সেনকেও বলেছিলাম ঐ কথা। কেশব জিগগেস করলে, মশাই, পরকাল কি আছে? আমি না-এদিক না-ওদিক বললাম। বললাম, কুমোররা হাঁড়ি শুকোতে দেয়, তার ভেতর পাকা হাঁড়িও আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। কখনো গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাড়ি ভেঙে গেলে সেগুলো ঘরে আনে, ঘরে এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে দিয়ে নতুন হাড়ি করে, ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললুম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ছাড়বে না কুমোর। যতক্ষণ পাকা না হবে, জ্ঞান লাভ না হবে, ঈশ্বরদর্শন না হবে, আবার চাকে দেবে। পাক দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে।'

একাগ্রগামিনী নদীর মত চলেছ। বক্রতায়-ঋজুতায়, উচ্চাবচ পথ ভেঙে-ভেঙে, নানা দেশের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমি শরবৎ তন্ময়। আমার লক্ষ্য হচ্ছে সেই জলনিধি, সেই অপার-অগাধ সেই সুদূর-সুন্দর। আমি তো নিশ্চিন্ত হতে চাই না, উদ্বিগ্ন হতে চাই। আমি তো বিশ্রামের নই আমি প্রাণবেগপ্রাবল্যের। আমি তো সুখী হতে আসিনি বড় হতে এসেছি, বেগবিস্তীর্ণ হতে এসেছি। তাই আমি চলব, আমি থামব না। আমি যে অনন্তের সন্ধানী, সেই তো আমার অন্তহীন আনন্দ।

'আচ্ছা, আপনি কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি?

'আজ্ঞে তা যদি বলেন,' বঙ্কিম বললে পরিহাসে করে, 'আহার নিদ্রা আর মৈথুন।' 'এঃ। তুমি বড় ছ্যাঁচড়া,' ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'যা রাতদিন করো তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেঁকুর ওঠে। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেঁকুর ওঠে। কামকাঞ্চনের মধ্যে রয়েছ তাই ঐ কথাই বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। কেবল বিষয়চিন্তা করলে প্যাটোয়ারি স্বভাব হয়, কপট হয় মানুষ। আর ঈশ্বরচিন্তা করলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হলে ও কথা কেউ বলবে না।'

এক সাধুর কাছে এক রাজা এসেছে। সাধুকে প্রণাম করে রাজা বললে, আপনি পরম ত্যাগী। কে বললে? সাধু হাসতে-হাসতে বললে, রাজা আপনিই যথার্থ ত্যাগী। আমি? রাজা তো বাক্যহীন। তা ছাড়া আবার কি! যে সব চেয়ে দামী জিনিস প্রিয় জিনিস ত্যাগ করে সেই তো বড় ত্যাগী। বললে সাধু, আমি তো কতগুলো তুচ্ছ জিনিস ত্যাগ করেছি, কামকাঞ্চন ভোগৈশ্বর্য। কিন্তু সব চেয়ে যা প্রিয় সব চেয়ে যা মূল্যবান সেই পরমাত্মাকে আপনি ত্যাগ করেছেন, আর তা কত অনায়াসে। তাই, সন্দেহ কি, আপনিই বড় ত্যাগী। বলুন, তাই নয়?

শুধু পাণ্ডিত্য হলে কি হবে? যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে। অনেক শাস্ত্র-পুঁথি পড়েছে পণ্ডিত। শোলোক ঝাড়তে পারে অফুরন্ত কিন্তু মেয়েমানুষে আসক্ত, টাকা মান সারবস্তু মনে করছে, সে আবার পণ্ডিত কি? ঈশ্বরে মন না থাকলে আবার পণ্ডিত কি?'

পাণ্ডিত্যে আছে কি? শুধু শুষ্কতা, শুধু দাহ। যেখানে রাজত্ব করার কথা সেখানে এসে দাসত্ব করা। শুধু প্রেমহীন প্রাণহীন মাংসপিণ্ড। ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে এসেছেন আমার কাছে সেখানে কিসের আমার স্পর্ধা, কিসের ঔদ্ধত্য? পরম প্রাপ্তিটিই তো প্রণতিতে।

'কেউ-কেউ মনে করে এরা পাগল, এরা বেহেড, কেবল ঈশ্বর-ঈশ্বর করে। আর আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করছি। কাকও মনে করে আমি বড় স্যায়না, কিন্তু আসলে কি খায়, কেবল উড়ুর-পুড়ুর করে। আবার দেখ এই হাঁস, দুধে-জলে মিশিয়ে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে।'

সুখভোগ? যা বিষ হয়, তাই তো সংক্ষেপে বিষয়। তার মধ্যে আছে সুখের প্রতিশ্রুতি? সুখ যখন সত্যিই চাও বড়ো সুখটাই নাও না কেন, সেই আরো-র সুখ, সুখের চেয়ে অধিকতর যে সুখ। যা পেয়েছি কুড়িয়েছি ও জমিয়েছি তার চেয়েও যা আরো, যা পাইনি হারিয়েছি ও ফেলে দিয়েছি তার চেয়েও। সুখের বাজি জিতিয়ে দেবে বলে কত ঘোড়াই ধরলাম জীবনের ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বিদ্যা আর যশ, পুত্র আর বিত্ত। কেউই পারল না বাজি মারতে, প্রত্যেকেই মার খেল। এবার ধরব এক কালো ঘোড়া, ডার্ক-হর্স। মনের গোপনে গভীর গুঞ্জনে এসে গেছে নতুন খবর। এবার নির্ঘাৎ বাজি মাৎ। সে

তীরবেগে তুরঙ্গমের নামই ঈশ্বর।

'আরো দেখ এই হাঁসের গতি।' বললেন আবার ঠাকুর : 'এক দিকে সোজা চলে যাবে। তেমনি শুদ্ধভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে। তার কাছে বিষয়রস তেতো মনে হয়, হরিপাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভালো লাগে না।' বিশেষ করে তাকালেন আবার বঙ্কিমের দিকে, কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি যেন কিছু মনে কোরো না' সরল সপ্রতিভের মত বঙ্কিম বললে, 'আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসিনি।'

কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শক্তিশালী ওষুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঁজালো, কিন্তু মধুরের মত কাজ করে আত্মগুণে, আরোগ্য এনে দেয়। তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের উচ্চারণও হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু আত্মগুণে কাজ করে, এনে দেয় নৈবুজ্য। তেমনি তিরস্কারের মধ্য দিয়েই আসুক সেই নামের পুরস্কার।

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তাঁর পাদবল্লবই উপহার দেন। হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করে স্বর্গ চাই না। ধ্রুবলোক চাই না! সার্বভৌম রসাধিপত্যও চাই না। চাই না যোগসিদ্ধি। চাই না অপুনর্ভব। ক্ষুধার্ত শিশু বা অজাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মা'র জন্য উৎকণ্ঠিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন প্রবাসগতপতির জন্যে উৎকণ্ঠিত, হে মনোহর-অরবিন্দনেত্র, তোমাকে দেখবার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি।

১১৫

'কামিনী-কাঞ্চনই সংসার।' বঙ্কিমকে লক্ষ্য করে বললেন আবার ঠাকুর : 'এরই নাম মায়া। দেখতে দেয় না ঈশ্বরকে।'

মাথার উপরে ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু-একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চনই ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে সূর্যকে দেখবে কি করে? সংসারী লোক যেন ঘরের বন্দী। আবছায়ার বাসিন্দে! কামিনী কাঞ্চনই মেঘ। সেও দেখতে দেয় না সূর্যকে। যতক্ষণ মায়ার ঘরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে জ্ঞান-সূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। জ্ঞান-সূর্যে নাশ হবে অবিদ্যা। বন্ধ ঘরের অন্ধকার। বন্ধ ঘরের অন্ধকারও যা অহংকারও তাই। হয়ে যাবে শুকনো তৃণের মত।

'ঘরের মধ্যে আনলে আতস কাঁচে কাগজ পোড়ে না।' বললেন ঠাকুর, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি ঠিক কাঁচে পড়ে, তখন পুড়ে যায় কাগজ। আবার মেঘ চলে এলে কাজ হয় না আতস কাঁচে। মেঘটি সরে গেলে তবে হয়।'

সেই একজন এক কুকুর পুষেছে। দিন-রাত থাকে তাকে নিয়ে। কখনো কোলে করে কখনো বা মুখের পরে মুখ দিয়ে বসে থাকে। অত আদর করতে নেই, একজন এসে শাসিয়ে গেল, পশুর জাত, কোনদিন আদর ভুলে ফট করে কামড়ে

দেবে তার ঠিক কি। সত্যিই তো। জোর করে নামিয়ে দিলে কোল থেকে। আর কক্‌খনো কোলে নেব না। কুকুর তা শুনবে কেন? দৌড়ে এসে উঠতে চায় ব্যাকুল হয়ে। নামিয়ে দাও তো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুটে পালাও তো সেও ছোটে। তখন উপায় কি? প্রহার করো। কুকুরের মার আড়াই প্রহর। মার ভুলে গিয়ে আবার কোলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে। অনেক কাল আদর করে কোলে তুলে নিয়েছ এখন তুমি নিরস্ত হলেও সে ছাড়বে কেন? আসতে চায় আসুক, আবার প্রহার করো। জর্জর করো। নির্জিত করো। আর সে আসবে না। পালিয়ে যাবে। কামকেও অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। এবার তাকে উচ্ছিন্ন করো। কি জানিস, তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ ভেঙে জল ছুটতে থাকে উত্তাল হয়ে। ধান খেতের উপর এক বাঁশ-সমান জল দাঁড়িয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চন যদি মন থেকে গেল তবে আর বাকি কি রইল? তখন কেবল ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু তুমি কি কামিনী?

তুমি জননী, তুমি জায়া, তুমি তনয়া, তুমি সহোদরা। তোমাকে ত্যাগ করব কি করে? কামিনীকে ত্যাগ করো, দামিনীকে নয়; ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। অবিদ্যাকে ত্যাগ করো, বিদ্যা-বিনোদিনীকে নয়।

'দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে কইতে হয় শুধু ঈশ্বরের কথা।' বঙ্কিমকে বললেন আবার ঠাকুর: 'তা হলেই দুজনের মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে।'

জগতের মা, সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন। সেই সৃজনী পালনী সংহরণী শক্তিই নেমে এসেছে সংসারে। প্রভাতে গায়ত্রী, অরুণরঞ্জিত আকাশে হংসারূঢ়া কুমারী, সৃষ্টি-উন্মুখী কোরক-আকারা। মধ্যাহ্নে শুক্লবর্ণা স্থিতিরূপিণী যুবতী, পদন্যাসবিলাসলক্ষ্মী। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা প্রলয়শংসনী বৃদ্ধা ঘোরকুটিল-আননা। এই তো সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ক্ষণা ব্রহ্মশক্তি। সমস্ত জগতের আধারশক্তি। এই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তিকেই তো বসিয়েছি সংসারে। শক্তিযুক্ত না হতে পারলে শিব করবে কি? শিব তো সামর্থ্যহীন স্পন্দনহীন। শক্তিযুক্ত হলেই সে পুরুষার্থসম্পন্ন। ঋক কখনো সাম ছাড়া আর সাম কখনো ঋকবিরহিত হয়ে থাকতে পারে না। ঋক স্ত্রী, সাম পুরুষ। ঋক ভূলোকে, সাম স্বর্লোকে।

বিবাহের মন্ত্রে বর বলছে বধূকে: 'আমি অম, লক্ষ্মীশূন্য, তুমি লক্ষ্মী। আমি সামবেদ তুমি ঋকবেদ। আমি স্বর্গ তুমি ধরিত্রী।'

আসল কথা, সংযম করো। সত্তার কনক পদ্মটিকে উন্মোচিত করো। সংসারের ঊর্ধ্বেও যে সংসার আছে তার খোঁজ নাও। দেহমণ্ডে ফোটাও এবার ঈশ্বররোমাঞ্চের ফুল। আনন্দ পেতে এসেছ সংসারে নাও এই নিত্য-নতুনের আনন্দ। বিন্দু-বিন্দু নয়, থেকে-থেকে থেমে-থেমে নয়—অপরিছিন্ন সুখ। একটানা বন্যা। সেই একটানা বন্যার নামই ঈশ্বর।

'আর কাঞ্চন?' বললেন আবার ঠাকুর: 'পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে

টাকা মাটি, মাটি টাকা, বলে ফেলে দিয়েছিলুম জলে।'

'বলেন কি! টাকা মাটি?' বঙ্কিম চমকে উঠল: মশায়, চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া-পরোপকার হবে না?'

'দয়া! পরোপকার!' স্মিতহাস্যে বললেন ঠাকুর: 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কী দয়া করবে! দয়ালুর ভিতর যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। বাবা-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সব তাঁর স্নেহ।'

পরকে দয়া করবার আগে নিজেকে দয়া করো। ভাণ্ডারে বৈভব থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। উড়িয়ে দিচ্ছ ফুরিয়ে ফেলছ নিজেকে। ক্ষয়ে যেতে বয়ে যেতে দিচ্ছ। সর্বাধিকারী হয়েও আছ সর্বহারার মত। নিজেকে কৃপা করো। আত্মকৃপার মত কৃপা নেই। নিজেই নিজের দিকে চেয়ে রয়েছ করুণনেত্রে। নিজের দিকে তাকাও। নিজেকে বাঁচাও। নিজেকে তুলে ধরো।

'ঈশ্বরকে ডাকবার আমার কী দরকার?' অভিমান করে একদিন বলেছিল বিদ্যাসাগর। 'দেখ না চেঙ্গিস খাঁকে। বিস্তর লুটপাট করে রাজ্যের লোককে বন্দী করলে। প্রায় এক লাখ। সেনাপতিরা প্রমাদ গুণল। বললে, মশাই, এদের এখন খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলেও বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ। এই হত্যাকাণ্ডটা তো ঈশ্বর স্বচক্ষে দেখলেন। কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার তাতে দরকার কি। আমার তো কোনো উপকার নেই।'

ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের কার্য কে বোঝে! কেনই বা সৃষ্টি করছেন, কেনই বা সংহার! আমি বলি আমার ও বোঝবার দরকার নেই। বাগানে আম খেতে এসেছি আম খেয়ে যাই। কত গাছ কত ডাল কত পাতা তার হিসেবে আমার কাজ কি। আমি চাই ভক্তি, আমি চাই ভালোবাসা। আমি চাই সুস্বাদুকে আস্বাদ করতে।'

গঙ্গাধর গাঙুলিকে—পরে যিনি অখণ্ডানন্দ—আসন শেখাচ্ছেন ঠাকুর। একেবারে ঝুঁকে বসতে নেই, আবার খুব টান হয়েও বসতে নেই। শেখাতে-শেখাতে এক সময় বলে উঠলেন, 'শোন, তোকে বলে রাখি কানে-কানে, খিদের মুখে বাড়া ভাত পেলে খেয়ে ফেলবি। খিদের মুখে যেমন করেই খাস, পেট ভরবে।'

তাই আসলে হচ্ছে আস্বাদ। আসলে হচ্ছে ভালোবাসা।

বঙ্কিমকে আবার বলছেন ঠাকুর, 'সংসারী লোকের টাকার দরকার। সঞ্চয় দরকার। কেন না তার মাগ-ছেলে আছে, খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কে? কেবল পঞ্ছী অউর দরবেশ। পাখি আর সন্ন্যাসী। তেমনি কামিনীও সন্ন্যাসীর ত্যাজ্য। তার কামিনী গ্রহণ করা মানে থুতু ফেলে সেই থুতু খাওয়া।'

আর তুমি সংসারী? কামিনী সম্বন্ধে তোমার সংযম, কাঞ্চন সম্বন্ধে তোমার অনাসক্তি। তোমার ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপ নয়। তোমার শুধু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া। কামের থেকে প্রেমে চলে আসা। আত্ম থেকে আত্মায়। বদ্ধ দেয়ালের দেশ থেকে উন্মুক্ত সমুদ্রে।

'আচ্ছা, তুমি কি বলো ?' প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমকে। 'আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর ?'

'না, আগে পাঁচটা জানতে হবে বৈকি। এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে ?'

'তোমাদের ঐ এক কথা। আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি। আগে যদু মল্লিক তারপর তার ধন-দৌলত। ১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে অনেক হয়ে যায়। ১-কে মুছে ফেল সব শূন্য। এককে নিয়েই অনেক। এক আগে তারপরে অনেক। আগে ঈশ্বর তারপর জীবজগৎ।' অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে দেখলেন বঙ্কিমকে : 'আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও।'

বঙ্কিম হাসল। 'আম পাই কই ?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো। আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো অন্তত সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন—'

'কে, গুরু ? তাঁর কথা বলবেন না। ভালো আমটি নিজে খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন ? যার যা পেটে সয়। সকলে কি পলুয়া-কালিয়া হজম করতে পারে? যে দুর্বল যার পেটের অসুখ তার পথ্য মাছের ঝোল।'

ত্রৈলোক্য সান্যাল গান ধরল। ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। সবাই ঘিরে ধরল। ভিড় ঠেলে বঙ্কিমও এল এগিয়ে। একদৃষ্টে দেখতে লাগল ঠাকুরকে। অচ্যুতচিন্তায় কখনো কাঁদছেন, কখনো হাসছেন, কখনো নাচছেন, গান করছেন, অলৌকিক কথা বলছেন, কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করছেন, কখনো বা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত তুষ্ণী হয়ে আছেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তের কথা সেই যে পড়েছিল বঙ্কিম, এ যে তারই প্রতিমূর্তি। কে এই পুরুষ ? নাম টাকা মান বৈভব কিছু চায় না, শুধু প্রেমানন্দ চায়, যে প্রেম ঈশ্বর থেকে উৎসারিত প্রেমানন্দই ভূমানন্দ। কিছু চাই না অথচ ভালোবাসি—এর নামই ভূমা। উদ্দেশ্য যা উপায়ও তাই। উদ্দেশ্য ভালোবাসা। ভালোবেসেই বিশ্বকে আপন করা। সেই বিশ্বানন্দই ব্রহ্মানন্দ। অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম। দেখছে ঠাকুরের নৃত্য। কীর্তনকদম্বস্ফূর্তি।

কীর্তনান্তে সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান জ্ঞানী-যোগী সকলের চরণে প্রণাম।'

বিগলিত হল বঙ্কিম। সন্ন্যাসের আসল কি অর্থ তা যেন বুঝল নতুন করে। শুধু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নয়, এই বিশ্বজগৎ আমার আত্মার বিস্তৃতি, সুতরাং আমারই আপনার লোক। তাই যদি হয় তবে এই অনন্ত আত্মীয়ের রাজ্যে শুধু পরিমিত পরিজন নিয়ে সুখী আছি কি করে ? অঙ্গনকে পরিমুক্ত করো, প্রসারিত করো। এই প্রসারণই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সংসারের সঙ্কোচন নয়, সংসারের বিস্তৃতিই সন্ন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বসংসারী, তাই আসল সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগী হয়েও তাই সর্বগ্রাহী। 'ভক্তি কেমন করে হয় ?' জিগগেস করল বঙ্কিম।

'ব্যাকুলতায়। ছেলে যেমন মা'র জন্যে দিশেহারা হয়ে কাঁদে সেই ব্যাকুলতায়। উপরে ভাসলে কী হবে? ডুব দাও কান্নাসাগরে, তবেই পান্না উঠবে। গভীর জলের নিচে রত্ন, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লেই তো রত্ন ভেসে উঠবে না। রত্ন যে ভারি, জলে ভাসে না, তলিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেকেছে। তাই ডোবো। তলিয়ে যাও।'

'কি করি! পেছনে যে শোলা বাঁধা।'

'কাল-পাশ কেটে যাবে, এ তো মাত্র শোলা! তাঁকে মনন করো, তাঁকে ডাকো, তাঁতে নিমজ্জিত হও। ডুব না দিলে কিছু হবে না। একটা গান শোনো।' বলে গান ধরলেন:

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেমরত্নধন।

ঘর ছেড়ে মাঠে এসো। ঘরের মধ্যে এক চিলতে আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে। যে ঘরের মধ্যে আছে তার আলো-জ্ঞান ঐটুকু। যার ঘরের বেড়ায় অনেক ছ্যাঁদা, সে বেশি আলো দেখতে পায়। যে-দরজা জানলা খুলে দিয়েছে সে পায় আরো দেখতে। কিন্তু যে চলে আসতে পেরেছে মাঠে তার আলোয় আলো। আত্মবোধ থেকে চলে এসো বিশ্ববোধে।

'কেউ-কেউ ডুব দিতে চায় না। বলে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষ-কালে কি পাগল হয়ে যাব?' নিবিড় স্নেহে তাকালেন বঙ্কিমের দিকে। 'ঈশ্বর এমন রস যাতে লোকে সুস্থ হয় স্নিগ্ধ হয় সুন্দর হয়। সে অমৃতের সাগরে ডুবলে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে—'

ঠাকুরকে প্রণাম করল বঙ্কিম। বিদায় নিল। বললে, 'আমাকে যত আহাম্মক ঠাওরেছেন আমি হয়তো তত নই।'

ঠাকুর হাসলেন। ঠাকুরের কি বুঝতে বাকি আছে কোন্ উপাদান দিয়ে বঙ্কিম তৈরি! অন্তরগহনে রয়েছে তার ভক্তির উৎস, অন্তঃসলিলা ভক্তির প্রবাহিণী।

আঠারো বছর বেদান্ত রগড়াচ্ছি, তবু বন্ধু—বলছিল এক সাধু—দূরে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংসার থেকে মন উচ্ছিন্ন করা কি সহজ কথা? 'একটি প্রার্থনা আছে।' বঙ্কিম বললে স্নিগ্ধমুখে, 'অনুগ্রহ করে যদি কুটিরে একবার পায়ের ধুলো দেন—'

'তা বেশ তো। ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

কি ভাবছিল বঙ্কিম, ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়েছে আনমনে। যাকে কেউ টানতে পারে না অথচ যে সকলকে টানে তারই আশ্চর্য শক্তির কথাই ভাবছিল হয়তো। গায়ের চাদর ফেলে এসেছে ভুলে। কে একজন কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে তাকে পৌঁছে দিল চাদর। তবু সম্পূর্ণ খেয়াল নেই। দৃষ্টি নেই বেশবাসে।

কদিন পরে গিরিশ আর মাস্টারকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে বঙ্কিম বলে গেল তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন, কই, এল না তো! যাও খোঁজ নিয়ে এস দেখি।'

গিরিশ আর মাস্টার তখুনি রওনা হল। বঙ্কিম কত কথা বললে ঠাকুরের

সম্বন্ধে, দিব্য আনন্দের কথা। যাকে না পেয়ে ও যেখান থেকে ব্যাহত হয়ে বাক্য ও মন যুগপৎ নিবর্তন করে তাই তো আনন্দ-পারাবার। বহু মেধা বা শাস্ত্র দ্বারা লভ্য নন, যাকে বরণ করেন একমাত্র তার দ্বারাই লভ্য। সেই অনির্বচনীয় কথা।

বললে, 'যাব আরেকদিন। ডেকে নিয়ে আসব।'

আর যাওয়া হয়নি বঙ্কিমের। যেতে হয় না, তিনিই আসেন নিজের থেকে। ডাকলে তো আসেনই, না ডাকলেও আসেন।

যেমন এসেছেন অধরের মৃত্যুশয্যার পাশে। মাণিকতলায় ডিস্টিলারি পরিদর্শন করতে গিয়েছিল অধর। গিয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। ফিরতি-পথে শোভাবাজার স্ট্রিটে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। ভেঙে গেল বাঁ হাতের কব্জি। শুধু তাই নয়, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেল। ঠাকুর যখন এলেন, কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অধরের। তবু চিনতে দেরি হল না। সমস্ত যন্ত্রণা আনন্দাশ্রুতে বিধৌত হতে লাগল। ঠাকুর কাছে বসে গায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। মুখখানি ম্লান, চোখ দুটি করুণকোমল।

অধর চলে গেল অধরায়। মাত্র তখন তিরিশ বছর বয়স। একটা যেন তারা খসে পড়ল। ভবতারিণীর দুয়ার ধরে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর। 'মাগো, আমার কেন এত যন্ত্রণা? আমাকে ভক্তি দিয়ে রেখেছিস বলেই তো আমাকে এত সইতে হচ্ছে।'

১১৬

প্রভু, কোন মুখে আমি সুখ চাইব তোমার কাছে, কোন লজ্জায়? যতবার দেহধারণ করে এসেছ একবারও সুখ পাওনি। রামরূপে এলে রাজপুত্র হয়ে, চীরবল্কল ধরে চলে গেলে বনবাসে। চন্দ্রের সঙ্গে চিত্রা-নক্ষত্রের মত সীতাও তোমার অনুগামিনী হল। বনে গিয়ে তোমার কত যন্ত্রণা, কত যুদ্ধ। তারপর সীতাকে যদি-বা উদ্ধার করলে, বসাতে পারলে না সংসারের সিংহাসনে। তাকে পাঠাতে হল নির্বাসনে প্রজানুরঞ্জনের তাগিদে। দগ্ধ হলে দুঃসহ মর্মজ্বালায়। সুখ পেলে না। কৃষ্ণরূপে জন্ম নিলে কারাগৃহে। নিজের মায়ের স্তন্য থেকে বঞ্চিত রইলে। রাজার ছেলে হয়ে মানুষ হলে গোপের ঘরে। সারাজীবন ধরেই যুদ্ধ আর দুষ্টদলন করতে হল, সুখ কাকে বলে শান্তি কাকে বলে জানতে পেলে না। শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলে আপ্রাণ, তবু দায়ী হলে কুরুক্ষেত্রের অশান্তির জন্যে। মাথা পেতে নিলে কত অভিশাপ। চোখের সামনে দেখলে আত্মীয়বৃন্দকে, শেষে অতর্কিত ব্যাধশরে প্রাণ দিলে। আর এখন রামকৃষ্ণরূপে ভুগছ দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কোন লজ্জায় বলব, আমি সুখ চাই, আমাকে সুখ দাও।

ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসেছে দুর্গাচরণ। ওগো বসো বসো আমার গা ঘেঁষে। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হবে। দুর্গাচরণকে

জড়িয়ে ধরলেন ঠাকুর। বললেন, 'ডাক্তার-কবরেজরা সব হার মেনেছে। তুমি জানো কিছু ঝাড়ফুঁক? কিছু করতে পারো উপকার?'

মুহূর্তে একটা উদ্দাম চিন্তা খেলে গেল মনের মধ্যে। বিদ্যুৎঝলকের মত। মুহূর্তেই সঙ্কল্পে দৃঢ়ীভূত হল। বললে, 'পারি। আপনার কৃপায় সব পারি। আপনার কৃপায় রোগ সারাতে পারি আপনার।'

পারো?

অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ নিজের শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি টেনে নিতে চাইছে। সহসা তাকে দুই হাতে ঠেলে দিলেন জোর করে। বললেন, 'তা তুমি পারো, জানি, তুমি পারো রোগ সারাতে। কিন্তু সারিয়ে দরকার নেই। সরে যাও, সরে যাও এখান থেকে।'

প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসে, আসে সুরেশ দত্তর সঙ্গে। শুধু নাম শুনেছে আর বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর? তাও জানো না। উত্তরে যাও। উত্তরে গেলেই উত্তর মিলবে। দেখবে সেখানেই বসে আছেন সুদক্ষিণ। চলছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে। শেষে একজনকে জিগগেস করলে। দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন? সে কি মশাই? দক্ষিণেশ্বর যে ছাড়িয়ে এসেছেন।

দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন দুজন। কাউকে চিনি না, কোথায় থাকেন সেই ত্রিদশকুলেশ, কাকে জিগগেস করি? একজন দাড়িওয়ালা লোকের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। ইনিই বলতে পারবেন হয়তো।

'হ্যাঁ মশাই এখানে একজন সাধু থাকেন?'

দাড়িওলা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। বললে, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

নেই? বসে পড়ল দুজনে। কোথায় গিয়েছেন?

'চন্দননগরে গিয়েছেন। কবে ফিরবেন কে জানে। তোমরা আরেকদিন এস।'

অবসন্ন পায়ে আবার ফিরে চলো কলকাতা। হৃতসর্বস্বের মতো ফিরে চলো। কিন্তু, ওমা, ঐ দেখ ঘরের মধ্য থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে। আর কে! ঐ সেই অনন্তাত্মা মহোদধি। অমানীমানদ লোকস্বামী। প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঢুকল ঠাকুরের ঘরে। ছোট তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন ঠাকুর। বারো বছর ধরে ঠাকুরের ছায়ায় বাস করছে হাজরা, তবু চিনতে পারল না ঠাকুরকে। শুধু সাধারণ সত্য কথাটুকুও বলতে শিখল না। কি করে শিখবে, কি করে চিনবে তিনি যদি না কৃপা করেন! তাঁর হাতেই ফুট-কম্পাস, চেন-দড়ি, তিনি না ছেড়ে দিলে মাপবে কি দিয়ে?

হৃদয়ের সঙ্গে সেই একবার কালীঘাটে গিয়েছিলেন ঠাকুর। দেখলেন পুবের পুকুরপাড়ে কচুবনের মধ্যে কালী কুমারীবেশে আর কতগুলো কুমারীর সঙ্গে ফড়িং-ধরার খেলা করছেন। দেখেই ঠাকুর মা-মা বলে ডেকে উঠলেন আর সমাধিস্থ হলেন। সমাধি-ভঙ্গের পর মন্দিরে এসে দেখলেন যে শাড়ি পরে কুমারীবেশে খেলা

করছিলেন কালী ঠিক সেই শাড়ীখানিই মূর্তির গায়ে জড়ানো। ওরে হৃদে, একেই যে তখন দেখলুম ছুটোছুটি করছে—

সব শুনে হৃদয় ক্ষেপে উঠল। বললে, 'তখন বলোনি কেন? ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতুম মাকে।'

'তা কি হয় রে!' ঠাকুর বললেন, 'তিনি যদি কৃপা করে না ধরা দেন কে তাঁকে ধরে। কে তাঁর দর্শন পায়!

সুরেশ দত্ত প্রণাম করল করজোড়ে। কিন্তু দুর্গাচরণ আরো বেশি যায়। তার উর্জী ভক্তি। প্রসাদের সঙ্গে সে শালপাতার ঠোঙা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে সে গেল ঠাকুরের পাধূলি নিতে। তুমি হলে জ্বলন্ত আগুন, তোমাকে কি পা ছুঁতে দিতে পারি? ঠাকুর পা সরিয়ে নিলেন।

বললেন দুর্গাচরণকে, 'সংসারই তোমার পীঠস্থান। সংসারেই থাকবে। থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি গৃহে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে। থাকো জনকের মত। তোমাকে দেখে লোকে শিখুক কাকে বলে গৃহাশ্রমী।'

যে বিষয়ে যযাতি ভোগী সেই বিষয়েই জনক রাজর্ষি। যে অভিমানে দুর্যোধনের সর্বনাশ সেই অভিমানেই ধ্রুবের সত্যলোকে অধিষ্ঠান।

উপদেশ তো শুনলুম, মানব তা অক্ষরে-অক্ষরে, কিন্তু দুটি হাত ভরে যে পদস্পর্শ নিতে দিলে না এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়? অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদতে লাগল দুর্গাচরণ। শুনেছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি শুনবে না আমার এই বেদনার নিবেদন? আমি আগুন নই, আমি জল, আমি গলিত-স্খলিত অমল প্রেমাশ্রু। একবারটি স্পর্শ করতে দাও তোমাকে। শীতাংশু সুধা-সমুদ্রের দুটি ঢেউ, তোমার দুটি পাদপদ্ম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করত দুর্গাচরণ। একদিন দক্ষিণেশ্বরে চলে এসেছে একা-একা। তাকে দেখে ঠাকুর মহা খুশি। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি ডাক্তারি করো, দেখ দেখি আমার পায়ে কি হয়েছে?'

দুর্গাচরণ বসে পড়ল পায়ের কাছে। তীক্ষ্ম চোখে দেখতে লাগল পা দুখানি। স্পর্শ করা বারণ, চোখ দিয়েই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। বললে কুণ্ঠিতের মত, 'কই, কোথাও তো দেখছি না কিছুই।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ভালো করে দেখ না কি হয়েছে।'

এতক্ষণে বুঝল দুর্গাচরণ। পা দুখানি চেপে ধরল দুহাতে। মাথা লুটিয়ে দিল পায়ের উপর। অন্তর্যামী শুনেছেন অন্তরের ঈপ্সা। আগুনকে অশ্রু করেছেন। কিন্তু, প্রভু, আরো প্রার্থনা আছে। ইচ্ছে করে তোমার সেবা করি। বেশ তো, ঠাকুর তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে তামাক সেজে দে, গামছা আর বটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়। দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া। ডাকলেই হল বললেই হল, যেখান থেকে পারি যেমন করে পারি সম্পন্ন করে দেব। তুমি যদি বলো নিয়ে আসব অকালের আমলকী।

একদিন বললেন হাওয়া করতে। পাখাখানি তুলে দিলেন দুর্গাচরণের হাতে। বললেন, আমি একটু ঘুমুই। জ্যৈষ্ঠ মাস, ফুটি-ফাটা মাঠে কাঠ-ফাটা রোদ। সমানে হাওয়া করছে দুর্গাচরণ। হাত ব্যথা করছে তবু ক্লান্ত হচ্ছে না। পাখা বন্ধ করলেই যদি জেগে ওঠেন। আমার অসামর্থ্যের জন্যে প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে? কখনো না। হাত ভেরে উঠল, তবু ছাড়ছে না পাখা। হাত ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়, তবু না। ওকি, ঠাকুর যে নিজেই হাত ধরে পাখা বন্ধ করে দিলেন। তবে কি ঠাকুর ঘুমুননি?

দুর্গাচরণ বলে, 'ঠাকুরের ঘুম সাধারণ নিদ্রাবস্থা নয়। তিনি সর্বদাই জেগে রয়েছেন। আর সকলে ঘুমোয় কিন্তু ভগবানের চোখে ঘুম নেই।'

একদিন বললেন তাকে ঠাকুর, 'ডাক্তার উকিল মোক্তার দালাল—এদের ঠিক-ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ওষুধে যদি মন পড়ে থাকে তবে আর কি করে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?'

এখন তবে উপায়? উপায় সহজ। দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসার বই ফেলে দিল গঙ্গায়। দ্বিধার কুশাঙ্কুরটিও বিন্ধ করল না।

দেশে ফিরেছে দুর্গাচরণ। উন্মনা, উদাসীন। বাপ দীনদয়াল অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'ডাক্তারি যে ছেড়ে দিলি এখন করবি কি?'

'আমি কে করবার! যা হয় ভগবান করবেন।'

'তোর মুণ্ডু করবেন। বুঝতে আর আমার বাকি নেই।' দীনদয়াল বিরক্তিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি।'

বাবার যখন তাই ইচ্ছে, তবে তাই হোক। পলকে পরনের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুর্গাচরণ। উঠোনের কোণে পড়ে ছিল একটা মরা ব্যাঙ, তাই তুলে এনে মুখে পুরলে। চিবোতে-চিবোতে বললে, 'আপনার দু আদেশই পালন করলাম। এখন কৃপা করে আমার একটি অনুরোধ রাখুন। সংসারের কথা আর ভাববেন না। এখন জপ করুন ইষ্টনাম।'

বাড়ির লাউগাছটির কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোট, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না গরু। ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে, খা, তৃপ্তি করে খা। দড়িটা খুলে দিল দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।' এই বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না দুর্গাচরণ। কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমত। সে গরুই হোক আর পাখিই হোক। অতিথিই হোক বা ভিখিরিই হোক। তুমি প্রীত হও, তৃপ্ত হও। ইষ্ট ছাড়া আমার আর কিছু মিষ্ট নেই। অশ্রু ছাড়া আমার আর নেই কিছু লবণাক্ত।

কলকাতার বাসার আধেকটায় কীর্তিবাস থাকে। চালের ব্যবসা করে। কুঁড়ো জমে থাকে তার আড়তে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজলে মাখিয়ে খায়। বলে, 'যা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালো-মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? শুধু আহার আর তার আস্বাদ নিয়েই থাকব, তবে কখনই বা

ডাকব ভগবানকে, আর কখনই বা তাঁর মনন করব? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হালকা আছি।'

কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে বা কারু উপর রাগ দেখিয়েছে অমনি আত্মপীড়ন শুরু হয়ে গেল। আর নিন্দে করবি? রোষভাষ করবি? রাস্তা থেকে এক টুকুরো পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগল কপালে। বল আর অবাধ্য হবি? মানবিনে শৃঙ্খলা? কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। সে ঘা শুকোতে এক মাস। হবে না? একশোবার হবে। যে যেমন পাজি তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

'অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে তার মাথা ভেঙে দিয়েছেন নাগমশাই।' বলছে গিরিশ ঘোষ। বলেছে, 'নরেনকে আর নাগমশাইকে বাঁধতে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন মহামায়া। নরেনকে যত বাঁধেন ততই বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন। নাগমশাইকে যত বাঁধেন সে ততই সরু হয়। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন পালিয়ে। ধরতে পেলেন না মহামায়া।'

আমি ক্ষুদ্দুর, আমি শুদ্দুর—এই বুলিই নাগমশায়ের মুখে। তোমাদের মুখে ও কিসের কথা? বিষয়প্রসঙ্গ রাখো। রামকৃষ্ণের কথা কও। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।

১১৭

ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না কিন্তু জাত-সাপে কামড়ালে এক ডাক, দু ডাক, তার পরেই মরণ! বললেন গিরিশ ঘোষকে। তোর যা খুশি তাই কর। আমি যখন তোর ভার নিয়েছি তোর জন্মমরণের মরণ হয়ে গিয়েছে।

আমি দেখেছি মা-কালীর গা থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ শিশুর উদ্ভব হল, হাতে সুধা-ভাণ্ড ও পানপাত্র। দেখেছি পান করতে-করতে দিব্যানন্দে বিভোর সেই শিশু। সেই শিশুই এই গিরিশ। ভৈরবের অংশে জন্ম তাই মদ্যপানে অনুরাগ।

কি দয়া! আমার এই অপরাধকে অপরাধ বলেই ধরলেন না। গিরিশ ভাবছে তদ্‌গত হয়ে। যে অপরাধে বাপ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্তুর করে তাও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ।

মঙ্গলমূলমুদ্রা শ্রীসুন্দরীর পুজারী আমি। তাঁর এক হাতে ভোগ আর এক হাতে মোক্ষ। তেমনি আবার বামে রামা দক্ষিণে মদপাত্র, মুখে জপসাধন, মস্তকে শ্রীনাথ। আর হৃদয়ে? আনন্দ হৃদয়াম্বুজে।

ঠাকুরের অসুখ। বসে আছেন বিছানার উপরে। মেঝের উপর মাদুর পাতা। ভক্তেরা রাত জাগে পালা করে। ঠাকুরের প্রায় ঘুম নেই। পাহারাদার ভক্তেরাও বিনিদ্র। লাটু আর মাস্টারের সঙ্গে গিরিশও চলে এল উপরে। মাদুরের উপর বসল। ঘরের কোণের আলোটি গেল আড়াল হয়ে।

ওগো আলোটি কাছে আনো। আমি গিরিশকে একটু দেখি।

মাস্টার আলোটি কাছে এনে ধরল।

'ভালো আছ?' গিরিশকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

ভালো আছি কিনা জানি না কিন্তু তোমার এই দয়াভরা প্রশ্নটিতে ভালো হয়ে গেলাম সর্বাঙ্গে। তোমার করুণা সর্বসাধিনী।

'ওরে এঁকে তামাক খাওয়া। পান দে।' লাটুর প্রতি হুকুমজারি করলেন।

লাটু পান-তামাক নিয়ে এল। তাতে কি তৃপ্তি আছে?

কিছুক্ষণ পরে আবার উঠলেন চঞ্চল হয়ে, 'ওরে কিছু জলখাবার এনে দে।'

'পান-টান দিয়েছি।' লাটু বললে, 'দোকান থেকে আনতে গেছে জলখাবার।'

কে এক ভক্ত ক'গাছা ফুলের মালা নিয়ে এসেছে। গলায় পরলেন সেগুলো একে-একে। পরলেন, না, আর কাউকে পরালেন? আর কাউকে পরালুম। হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরালুম। দুগাছি মালা তুলে নিলেন গলা থেকে। গিরিশকে বললেন, 'এগিয়ে এস।' গিরিশ এগিয়ে আসতেই তার গলায় উপহার দিলেন।

'ওরে জলখাবার কি এল?' আবার উঠলেন অস্থির হয়ে।

অসুখ, ঘুম নেই, এত যন্ত্রণার মধ্যেও এত মমতা! এত করুণা! মানুষ ভগবান নয় তো কে ভগবান!

সেইদিন তাই কথা হচ্ছিল বলরাম-মন্দিরে। ঠাকুর বললেন গিরিশকে, 'তুমি একবার নরেনের সঙ্গে বিচার করে দেখ, সে কি বলে।'

'দেখেছি। সে মানতে চায় না। বলে ঈশ্বর অনন্ত। যে অনন্ত তার আবার অংশ কি! তার অংশ হয় না।'

'হয়।' বললেন, ঠাকুর, 'ঈশ্বর ইচ্ছে করলে তাঁর সারবস্তু পাঠাতে পারেন মানুষের মধ্য দিয়ে। শুধু পারেন না পাঠান। এ তোমাদের উপমা দিয়ে কি বোঝাব? গরুর মধ্যে গরুর শিংটা যদি ছোঁও, গরুকেও ছোঁয়া হল। পা বা লেজ ছুঁলেও তাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। অবতার হচ্ছে গাভীর বাঁট।' থামলেন ঠাকুর। আবার বললেন, 'তেমনি প্রেমভক্তি শেখাবার জন্যে মানুষের দেহ ধারণ করে মাঝে-মাঝে আসেন ঈশ্বর।'

পরশরতন শুনেছ এবার শোনো মানুষরতন। অবতারই হচ্ছে সেই মানুষরতন।

'নরেন বলে,' গিরিশ বললে, 'ঈশ্বরের ধারণা কে করতে পারে? তিনি অন্তহীন।'

'হোন। তাঁকে ধারণা করা কি দরকার? তাঁকে একবার দেখতে পারলেই হল। তাঁর অবতারকে দেখা মানেই তাঁকে দেখা। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে আসে, সে বলে গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না। তোমার পা-টা যদি ছুঁই তোমাকেই ছোঁয়া হল। তাই নয়? আগুন সব জায়গায় আছে তবে কাঠে বেশি।'

'তাই যেখানে আগুন পাবো সেখানে আগুন পোয়াবো।' গিরিশ বললে তৃপ্ত মুখে। 'তেমনি ঈশ্বর যদি খোঁজো, মানুষে খুঁজবে—'

রূপে-রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।

'মানুষেই তেমনি তাঁর বেশি প্রকাশ, বিশেষ প্রকাশ। যে মানুষে দেখবে প্রেমভক্তি উথলে পড়ছে, ঈশ্বরের জন্যে যে পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চয় জেনো তিনি অবতীর্ণ। যিনি তারণ করেন তিনিই অবতার।'

'কিন্তু নরেন্দ্র বলে তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর—'

'মনের গোচর নয় বটে কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর। বুদ্ধির গোচর নয় বটে শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।' বললেন ঠাকুর, 'ঋষিমুনিরা কি তাঁকে দেখেননি ? তাঁরা চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎকার করেছিলেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, নরেন আমার কাছে তর্কে হেরে গেছে।'

হেরে গেছে ? ঠাকুর চমকে উঠলেন। অবতার-তত্ত্ব মানে না, নরেনের হেরে যাওয়াই তো উচিত একশো বার তবু তাঁর নরেন হারবে এ যেন সহ্যের বাইরে।

বললেন, 'না, হারেনি। আমায় এসে বললে, গিরিশ ঘোষের মানুষকে অবতার বলে এত বিশ্বাস, তার আমি কি বলব! অমন বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই। তাই ছেড়ে দিল তর্ক।'

নরেন মানে না, তবু নরেনকে ভালোবাসেন। নরেন তর্কে হেরে যাবে এ অসহনীয় লাগে। আর, এ কেমনধারা তর্ক ? যে তর্কে স্বয়ং ঠাকুরকে বাতিল করে দিচ্ছে। আমি নস্যাৎ হই তো হব তবু নরেন জিতুক। আমাকে হারিয়ে ওর যে জিত সে তো আমারও জিত। একদিন ও ঠিক বুঝবে। এমন অগাধ যার হৃদয় সে বুঝবে না ? বুঝবে আমার অবতারতত্ত্বের মানে কি।

মানে হচ্ছে এই, সকলেই তাঁর অবতার, সকলেই তাঁর প্রতিচ্ছায়া। 'জীবে জীবে চেয়ে দেখ সবই যে তাঁর অবতার। তুই নতুন লীলা কি দেখাবি তাঁর নিত্যলীলা চমৎকার।' আমি নিয়ে এসেছি এই মহতী প্রতিশ্রুতি এই বৃহতী সম্ভাবনা। মানুষকে প্রমাণিত হতে হবে প্রকাশিত হয়ে। প্রকাশিত হবে সে কখন ? যখন সে তার অন্তরের অমৃতময় অমিততেজ পুরুষকে উদ্ঘাটিত করতে পারবে, উন্মোচিত করতে পারবে। সেখানেই সে অবতার, ঈশ্বরসমান।

ঠিক বুঝবে একদিন নরেন। জীবকে শুধু জীবজ্ঞানে সেবা করবে না, জীবকে শিবজ্ঞানে পুজো করবে। সে পুজো ভালোবাসা! সে পুজো দুঃখমোচন, কলঙ্কমোচন। অপমানের অবহেলার উচ্ছেদ। সত্তাসীমার সম্প্রসার। রাষ্ট্র হবে নতুন জীবনবেদ, নবতর সাম্যবাদ। শুধু পঙ্‌ক্তি সমান নয় পাত্র সমান। শুধু ভোগের বস্তু সমান নয়, ভোগ করার ক্ষমতাও সমান। শুধু—পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান।

'ওরে এল জলখাবার ?' আবার চঞ্চল হলেন ঠাকুর।

মাস্টার পাখা করছিলেন, বললেন 'আনতে গেছে। এই এল বলে।'

কে না কে গিরিশ তাকে খাওয়াবার জন্যে ঠাকুরের এত ব্যাকুলতা—গিরিশ

যেন এ করুণার পারাপার দেখছে না! বাঁধা-বরাদ্দ অনেক পেয়েছে সে, এ যে উপরি-পাওনা! উপরি-পাওনার শেষ নেই। এসেছে খাবার। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি আর মিষ্টি। সেই বরানগরে ফাগুর দোকান।

ঠাকুর আগে প্রসাদ করে দিলেন। তারপর খাবারের থালা ধরে দিলেন গিরিশের হাতে। বললেন, 'বেশ কচুরি। খাও।'

ভুখা কি দুহাতে খায়? তবু গিরিশের ইচ্ছে হল ঠাকুরকে খুশি করার জন্যে খায় সে গোগ্রাসে।

খাবার দিয়েছি, এবার জল দিতে হয়। ঐ তো আমার কুঁজো, ওখান থেকে গড়িয়ে দিলেই হবে। উঠে পড়লেন ঠাকুর। রুগ্ন, দুর্বল, পা টলছে, তবু এগিয়ে চললেন কুঁজোর দিকে। রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে রইল ভক্তেরা। গিরিশও স্তম্ভিত। বাধা দেবার কথা ওঠে না, সবাই দিব্যানন্দে বিনিশ্চল। ঠিক জল গড়ালেন কুঁজো থেকে। বোশেখ মাস, গ্লাশ থেকে খানিকটা জল হাতে নিয়ে অনুভব করলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। যতটা ভেবেছিলেন ততটা নয়। কিন্তু কি আর করা যায়! এর চেয়ে ঠাণ্ডা আর পাবেন কোথায়! অগত্যা তাই দিলেন এগিয়ে। খাদ্য খেয়ে পেট ভরে, রসনার তৃপ্তি হয়। জল খেয়ে গলা ভেজে, বুক জুড়োয়। কিন্তু এ যে খাচ্ছে গিরিশ এ কি খাদ্যপানীয়? কোন্ ক্ষুধা কোন্ তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে কে জানে?

খেতে-খেতে বললে গিরিশ, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।'

ঠাকুর যেন খুশি হলেন না। কথা বলতে কষ্ট হয়, তাই আঙুল দিয়ে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে ইশারায় জিগগেস করলেন, 'তার পরিবার-পরিজনের খাওয়া-দাওয়া হবে কি করে? চলবে কি করে সংসার?'

'তা জানি না।'

এ সেই দেবেন মজুমদার। বলে দিয়েছিলেন ঠাকুর, তোমার বাড়ি যাব একদিন। এই ধরো সামনের রবিবার। দেখো, তোমার আয় কম, বেশি লোকজন ডেকো না। আর, বাড়িও তোমার সেই কোথায়! গাড়িভাড়াও দুর্মূল্য।

দেবেন্দ্র হাসল। বললে, হলই বা আয় কম, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—'

কথা শুনে ঠাকুরের কি হাসি! যে করেই হোক আমার ঘি খাওয়া চাই। অন্যে ঠকুক আমি ঠকতে পারব না। খবর যখন পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে চুরি করে আদায়-আস্বাদ করতেই হবে।

নিমু গোস্বামীর লেনে দেবেনের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বাড়ি পৌঁছেই বললেন, 'আমার জন্যে খাবার কিছু কোরো না, অতি সামান্য, শরীর তত ভালো নয়।'

কুল্‌পি-বরফ তৈরি করেছে দেবেন। তাই খেয়ে ঠাকুরের মহানন্দ। গান ধরেছেন ভাবোল্লাসে:

এসেছেন এক ভাবের ফকির—
ও সে হিন্দুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

সকলের সকল। একলার একলা। কারুর ভাব আমি নষ্ট করিনে। যে নষ্ট-ভ্রষ্ট তারও না। শুধু একটু বেঁকিয়ে দিই। শুধু যে পাপী তাকে বলি মায়ের সন্তান বলে নিজেকে ভাবতে। যেথা খুশি সেথা যাও যাহা খুশি তাহা করো, শুধু মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, মাকে সঙ্গে নিয়ে করো। যে মুহূর্তে মা তোমার সঙ্গে সে মুহূর্তে তুমি শুদ্ধ তোমার কর্ম শুদ্ধ তোমার চিন্তা শুদ্ধ। মা তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যা মঙ্গলের ক্ষেত্র, এমন কাজে প্রেরিত করবে যা সৌন্দর্যের কর্ম। পৃথিবীতে সর্বত্র মা-তে ওতপ্রোত হও। ভূ-তে থেকে মা-তে প্রসারণ, তারই নাম ভূমা।

'রামবাবু আপনার কথা লিখেছেন বইয়ে।' কে একজন বললে ঠাকুরকে।

'সে আবার কি!'

'পরমহংসের ভক্তি—এই নিয়ে।'

'তবে আর কি।' ঠাকুর বললেন সহাস্যে, 'এবার রামের খুব নাম হবে।'

গিরিশ টিপ্পনি কাটল। 'সে বলে সে আপনার চেলা।'

'আমার চেলাটেলা কেউ নেই।' ঠাকুর বললেন বিগলিত হয়ে, 'আমি রামের দাসানুদাস।' আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। আমি তৃণের তৃণ, ধূলির ধূলি। 'আমি' খুঁজতে-খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে। তুমি তুমি তুমি।

'খুব কুলপি খেয়েছি।' গাড়িতে উঠে বলছেন মাস্টারকে: 'তুমি নিয়ে যেও আরো গোটা চার-পাঁচ—' বালকের মত আনন্দ করছেন।

ঠাকুরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরল দেবেন। দেখল উঠোনে তক্তপোশের উপর কে একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে ঠাহর করে দেখল পাড়ারই বাসিন্দে। ওঠো, ওঠো, ডাকল তাকে দেবেন। লোকটি উঠে বসে চোখ মুছতে-মুছতে বললে, 'পরমহংসদেব কি এসেছেন?' সবাই হেসে উঠল। এসেছেন কি মশাই, এসে চলে গেছেন। সর্বস্বান্তের মত তাকিয়ে রইল লোকটি। সেই কখন থেকে বসে আছে ঠাকুর দর্শনের আশায়। তখনো আসেননি, বসে থেকে-থেকে তাই একটু শুয়ে পড়েছিল, চৈত্র মাস, হাওয়া দিয়েছিল ঝির-ঝির করে। এখন জেগে উঠে দেখে চলে গেছে সেই রাজকুমার।

মোহনিদ্রায় অস্ত গিয়েছে সে স্বর্ণলগ্ন। এখন কাঁদতে বসল অন্ধকারে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু তোমার চোখে তো ঘুম নেই! তুমি আমাকে জাগালে না কেন? এবার তবে জাগাও, স্নিগ্ধ আলোকে না হোক, রুদ্র আলোকে। আনন্দে না হোক, হাহাকারে। আঁধার রাতের রাজা হয়েই তবে দেখা দাও। আমার ছিন্ন শয়ন ধুলোয় টেনে তোমার জন্যে আঙিনা সাজাবো।

ঠাকুরের কেবল নরেন-নরেন। তাই নিয়ে অভিমান হয়েছে দেবেনের। সেবার স্টার থিয়েটারে বৃষকেতু নাটক দেখবার শেষে জমায়েত হয়েছে সকলে। নরেন, গিরিশ, আরো অনেকে। কিন্তু দেবেন আসেনি।

'দেবেন আসেনি কেন?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'অভিমান করে আসেনি।' বললে গিরিশ। 'বলে, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের

পোর নেই, কলায়ের পোর। আমরা এসে কি করব ?'

জলখাবার দিয়েছে ঠাকুরকে, তাই থেকে আবার নরেনকে দিচ্ছেন।

যতীন দেব কাছে ছিল, ঠাট্টা করে উঠল। 'আমরা শালারা সব ভেসে এসেছি। শুধু নরেন খাও, নরেন খাও। আর কেউ জানে না খেতে।'

যতীনের থুতনি ধরে আদর করলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেখানে, দক্ষিণেশ্বরে যাস। সেখানে গিয়ে খাস।

অবস্থা প্রায় অচল দেবেনের। জমিদারী সেরেস্তায় দিনে যা কাজ করে তাতে কুলোয় না, তাই মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যাশিয়ারির চাকরি নিলে। শুধু ক্যাশিয়ারি নয়, থিয়েটারের এটা-ওটা ফরমাশ খাটো। সময়ে-অসময়ে নটীদের ডেকে আনো তাদের বাড়ি থেকে। ক্রমে-ক্রমে, কাজলের ঘরে কাজ করতে গিয়ে গায়ে দাগ লেগে গেল। অনুতাপে পুড়তে লাগল দেবেন।

নাগমশাই হুঙ্কার দিয়ে উঠল : 'ভয় কি, গুরু আছেন সঙ্গে, ধুয়ে দেবেন।'

সেই কথাই বলছে দেবেন কৃতাঞ্জলি হয়ে। 'জীবনে হীন কাজ করলে ভগবানের পথ থেকে যে জন্মের মত বিচ্যুত হবে এমন কোনো বিধি নেই। কত জঘন্য কাজ যে করেছি তবু করুণাময় ঠাকুর আমাকে ত্যাগ করেননি।'

তাই তো বললেন বিবেকানন্দ, একটানা উন্নতি প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। প্রত্যুতপ্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান তাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

পুরোনো কথায় ফিরে এল গিরিশ। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'আচ্ছা মশাই, কোনটা ঠিক ? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারের কষ্টে তাকে ডাকা ?'

'যারা কষ্টের জন্যে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। আমি তো সংসার ছাড়বার দলে নই। আমি লোকেদের বলি এ-ও করো ও-ও করো। সংসারও করো, ঈশ্বরকেও ডাক। সব ত্যাগ করতে বলি না। কেমন খাচ্ছ কচুরি ?'

'ফাগুর দোকানের কচুরি। চমৎকার !' খেতে-খেতে একমুখ হাসল গিরিশ।

'হ্যাঁ, লুচি থাক, কচুরিই খাও। কচুরি রজোগুণের। কচুরিই খাও।'

খেতে-খেতে গিরিশ বললে, 'আচ্ছা মশাই, মনটা এই বেশ উঁচু আছে, আবার নিচু হয় কেন ?'

'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনো উঁচু কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে কখনো বা পচা ঘায়ে। কিন্তু মৌমাছি করে কি ! মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ফুল ছাড়া আর কিছু তার খাবার নেই।'

দক্ষিণের ছোট ছাদটিতে হাত ধুতে গেল গিরিশ।

মনে পড়ল কতদিন বারাঙ্গনারা কাছে বসে খাইয়েছে। আজ ঠাকুর খাওয়ালেন। 'ওগো অনেকগুলি কচুরি খেয়েছে গিরিশ।' ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'বলে দাও বাড়িতে আজ আর কিছু না খায়।'

শুধু সুখ দেখেন না কল্যাণ দেখেন। দয়াসারসিন্ধু। কারুণ্যকল্পদ্রুম। শুধু খাওয়ান না, হজমের খবর নেন। হাত-মুখ ধুয়ে পান চিবুতে-চিবুতে

গিরিশ আবার বসল ঠাকুরের কাছটিতে। 'ঐ যে বলেছি পাঁকাল মাছের মত থাকো—'

'রাখুন মশায়, অতশত বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে আপনি ভালো করে দিতে পারেন—কেন করবেন না?' গিরিশ রোক করে উঠল। 'মলয়ের হাওয়া বইলে সব কাঠ চন্দন হয়।'

'কে বললে হয়? সার না থাকলে হয় না চন্দন।'

'অত-শত বুঝি না মশাই—' আবার তম্বি করে উঠল গিরিশ।

'আইনেই ও রকম আছে।'

'আপনার সব-বে-আইনী।'

'তবে হ্যাঁ, তেমন ভক্তি যদি হয় আইন নাকচ হয়ে যায়। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক-বাঁশ জল।' বললেন ঠাকুর, 'ভক্তি যদি উন্মাদ হয়, বেদবিধি মানে না। দুর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই নেয়। তুলসী ছেঁড়ে না পড়-পড় করে ডাল ভাঙে।'

আল-বাঁধ, দরজা-চৌকাঠ উঠে যায়। গণ্ডি-চৌহদ্দির চিহ্ন থাকে না!

সেই মধুরভাবিনী পাগলির কথা উঠল। ঠাকুরকে মধুরভাবে ভজনা করে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাঁদছে অঝোরে। কি হল, কাঁদছিস কেন? জিগগেস করলেন ঠাকুর। পাগলি বললে, মাথা ব্যথা করছে—

'সে পাগলি ধন্য।' গিরিশ হুংকার দিয়ে উঠল: 'যে ভাবেই হোক আপনাকে অষ্টপ্রহর সে চিন্তা করছে। আর মশায়, আমি? আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি—'

কী ছিলাম? অহঙ্কারী ছিলাম। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের অভিনয় দেখে ঠাকুরই বলেছিলেন, দেখেছ, শালা যেন অংখারে মট-মট করছে। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েছি, পা পিছলে মরি আর কি। প্রাণভয়ে বলে ফেললাম, ভগবান রক্ষা করো। পরক্ষণেই বলে উঠলাম, থু থু! যদি কখনো প্রেমে ডাকতে পারি ভগবানকে, তবেই ডাকবো, ভয়ে নয়। তাই তো প্রেমের ঠাকুর নেমে এলে। ডাকবার আগে নিজেই ডেকে নিলে।

অলস ছিলাম। এখন সে আলস্য সমর্পণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরূপ প্রেমনির্ভর।

পাপী ছিলাম। এখন রুক্ষ লোহা কান্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। যা ছিল সুরা তাই হয়েছে সুধা। তুচ্ছকে আদর করিনি কোনোদিন। এখন অমানীমানদ হয়েছি। চারদিকে দেখতে পাচ্ছি এক মহারসের প্রকাশ। যা ছিল দণ্ডপলের, তাই এখন অখন্ড কালের। দেখিনি এতদিন। আজ দেখতে পাচ্ছি! এই দেখতে পাওয়াটাই মুক্তি। সৃষ্টির মুক্তি নয়, দৃষ্টির মুক্তি। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

কিন্তু হাজরা একেবারে শুকনো কাঠ। অথচ দালালি জ্ঞান টনটনে! ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, চলে এসেছে সংসার ছেড়ে। আমি ছাড়ব বললেই তো সে ছাড়ে না! তাই ঠাকুরের ঘরের পুবের বারান্দায় বসে মালা ফেরায় বটে কিন্তু মন পড়ে থাকে বাড়িঘরে। হাজার টাকা দেনা, শোধ হবে কি করে? বাড়িতে সামান্য যে জমি তা দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের পেট চলতে পারে কিন্তু নগদ টাকা জুটবে কোথায়? তাই মালা জপে আর মিটির-মিটির করে তাকায় যদি মিলে যায় কোনো শিষ্যচেলা। যদি ভক্তিভরে মুক্ত করে ঋণভার।

এক নম্বরের তার্কিক। ঠাকুর যত বলেন তর্জনগর্জনে হবে না, হাজরা তত তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠে। বলে, 'আমাকে বলছ কি, তুমিও তো ধনীর ছেলে দেখে সুন্দর ছেলে দেখে ভাব করো, ভালোবাসো।'

নরেনের কথা বলছে বুঝি! নরেন আবার হাজরার 'ফেরেণ্ড'। ওরে নরেনের নুন দিয়ে ভাত খাবার পয়সা জোটে না। ওকে দেখলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

সবাইকে কেবল পাটোয়ারি বুদ্ধির মন্ত্র দেবে। সাধন করো তো সকাম সাধন। সব মেহনতের মজুরি আছে, আর সব চেয়ে যে কষ্টের কাজ—এই সব জপ-তপ আসন-শাসন—এর বেলায় ফক্কিকার! চলবে না ফাঁকিবাজি। রোদে পুড়তে-পুড়তে যেতে পারবে না ফাঁকায়-ফাঁকায়।

সুখ ধনে নয় মনে। সে কথা কে শোনে! কেবল অহঙ্কার! এত জপ করলাম! ঠায় বসে এত ডাকলাম রুদ্ধনিশ্বাসে। আমার হবে না তো হবে কার! হবার মধ্যে, বেরিয়ে যেতে হল দক্ষিণেশ্বর থেকে। কথায়ই আছে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? আবার এদিকেই উসখুস।

'হাজরা এখন মানছে।' বললে নরেন। 'তার অহঙ্কার হয়েছিল—'

'ও কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে ফের আসবার জন্যে বলছে অমনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'সে আমি বেশ বুঝেছি।' হাসলেন ঠাকুর। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নরেনের মতে হাজরা খুব ভালো লোক।'

'একশোবার।' নরেন জোর দিয়ে বললে।

'কেন? এই যে এত সব শুনলি। দেখলি—'

'তা হোক গে। দোষ কি একেবারে নেই? আছে, তবে অল্প। গুণই বেশি।'

ঠাকুরকে সায় দিতে হল। 'হ্যাঁ, নিষ্ঠা আছে বটে।'

তবে আর কি। যদি একটা কিছু থাকে, টেনে নাও। যদি অভিমুখী হয়, সাধ্য কি তুমি মুখ ফেরাও। আর কিছু না থাক নিয়তস্থিতি তো আছে। স্থিতি থেকেই প্রীতি আসবে একদিন।

আর কি করা! নরেন যখন বলেছে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে হল হাজরাকে।

'হাজরা একটি কম নয়।' প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন ঠাকুর। 'যদি এখানে বড় দরগা হয় তবে হাজরা ছোট দরগা।'

কিন্তু দোষের মধ্যে, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। আর বড্ড আচারী। তা ছাড়া একটু পেটুক।

নবতের কাছে দেখা। বললেন ঠাকুর, 'শোনো। বেশি নেয়ো না। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। আচার যতটুকু করবার ততটুকু করবে। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'

'আর?'

'কারু নিন্দা করো না, পোকাটিরও না।' অগাধ স্নেহস্বরে বললেন ঠাকুর, 'যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এও বলবে, যেন কারু নিন্দা না করি।'

নিন্দা করে আনন্দ, নিন্দা না করে আনন্দ। কোন্ আনন্দ বেশি? কোন্ আনন্দ অম্লান?

'কিন্তু প্রার্থনা করলে তিনি কি শুনবেন?'

'নির্ঘাত শুনবেন। যদি ডাকটি ঠিক হয়, আন্তরিক হয়। ও দেশে একজনের স্ত্রীর খুব অসুখ হয়েছিল। কে বললে, সারবে না। তাই শুনে লোকটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অজ্ঞান হয় আর কি! এমন কে হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যে?'

কি আশ্চর্য, হাজরা হঠাৎ ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল।

'এ আবার কি!' অত্যন্ত কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর।

'যাঁর ছায়ায় আছি তাঁর পায়ের ধুলো নেব না?'

না, না, তুমি নেবে কেন? আমি নেব। তুমি শুধু ঈশ্বরকে তুষ্ট কর। শাখা-প্রশাখায় জল দিতে হয় না, মূলে জল দিলেই বৃক্ষ তুষ্ট হয়। তেমনি মূলে জল দাও। দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে কৃষ্ণ যেই বললেন তৃপ্ত হয়েছি তখন আর সকলেও তৃপ্ত হল। ঢেউ-ঢেউ উঠল চারদিকে। তার আগে নয়। সুতরাং তাঁকে খুশি করো। তাঁর আনন্দেই আর সকলে আনন্দিত। তাঁর সমর্থনেই আর-সকলের সমর্থন।

'তাই সংসারে যেতে জ্ঞানীর ভয় কি?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'মশাই, জ্ঞান হলে তো?' মহিমাচরণ টিপ্পনী কাটল।

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'হাজরার সবই হয়েছে, তবে একটু সংসারে মন আছে, এই যা। তা কি আর করা, ছেলেরা রয়েছে, জমি-টমি রয়েছে, ধার রয়েছে—উপায় কি!'

'তাহলে আর জ্ঞান হল কোথায়?' মহিমাচরণ আবার ফোড়ন দিল।

'না গো, তুমি জানো না।' সস্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'সব্বাই হাজরার নাম করে। বলে রাসমণির ঠাকুরবাড়িতে হাজরা বলে যে আছে, সেই হচ্ছে একটা লোক। লোকের মত লোক।'

হাজরা মুখ খুলল। বললে, 'তা কেন? আপনি হচ্ছেন নিরুপম, আপনার উপমা নেই, তাই কেউ বুঝতে পারে না আপনাকে।'

'তবেই বুঝতে পারছ নিরুপমকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না।'

'সে কি মশাই?' মহিমাচরণ গর্জে উঠল : 'হাজরা কি জানে? আপনি যেমনি বলবেন তেমনি শুনবে ও।'

'তা কেন? ওকে জিগগেস করে দেখ না! ও আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার লেনাদেনা নেই।'

'তাই নাকি? ভারি তার্কিক তো!'

'শুধু তাই নয়, আমায় আবার শিক্ষা দেয় মাঝে মাঝে।'

সবাই হেসে উঠল। চুপ করে হাজরা বসে আছে এক কোণে।

'কেন দেব না? আমার কি কিছুই বক্তব্য নেই? থাকতে পারে না? বেশ তো, এস, তর্ক করি।'

কিন্তু তর্ক ঠাকুরের পোষায় না। তর্ক করতে গিয়ে গালাগাল দিয়ে বসলেন হাজরাকে। তারপর শুতে গেলেন মশারির মধ্যে। শুয়ে কি শান্তি আছে? তর্কের ঝোঁকে কি কটু কথা বলেছেন, হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে হাজরা, সেই ভেবে অস্বস্তি। তারপর আবার চলে এসেছেন মশারির বাইরে। বাইরে এসে হঠাৎ প্রণাম করে বসলেন হাজরাকে।

তোমাকে না মানি কিন্তু তোমার নিষ্ঠাকে প্রণাম। প্রণাম তোমার বাক্-শক্তিকে। গালাগালিতেও যে তুমি অবিচলিত থাকো, প্রণাম তোমার সেই আঘাত-বিজয়ী প্রতিজ্ঞাকে।

'শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম করে যাই—তবে হয়।'

কিন্তু এততেও হাজরার হল না। ছাড়তে পারল না দালালি। বৈধীভক্তির দেশাচার। কামনাকণ্টকিত ফলাকাঙ্ক্ষা। মায়ের কাছে বসেও মালা জপ করবে। এ কী হীনবুদ্ধি! যে এখানে আসবে তারই চৈতন্য হবে, একেবারে চৈতন্য হবে। তার আবার কিসের মালাজপ! তার শুধু রাগভক্তি। তার শুধু রঞ্জন-অঞ্জন।

গোলোকধাম খেলা হচ্ছে। মাস্টার, কিশোরী, লাটু আর হাজরা। চারজন খেলোয়াড়। হঠাৎ ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন এক পাশে। কী ব্যাপার? কত দূরে? মাস্টার আর কিশোরীর ঘুঁটি উঠে গেল।

'ধন্য তোমরা দু ভাই।' উল্লাস করে উঠলেন ঠাকুর। শুধু তাই? নমস্কার করলেন দু ভাইকে।

কেন করব না? ওরা জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ের মধ্যে যে ঈশ্বরের করুণা।

কাকে না নমস্কার করেছেন। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছে। যেন মূর্তিমান দুর্বাসা। যাকে-তাকে গাল দেয়, শাপ দেয়, মারতে আসে। যখন-তখন, কারণে-অকারণে। ক্রোধে একেবারে নগ্ন-অগ্নি। 'হিঁয়া আগ মিলেগা?' হুংকার দিয়ে উঠল সাধু।

হাত জোড় করে সাধুকে ঠাকুর নমস্কার করলেন। একবার নয় বহুবার। যতক্ষণ সাধু ছিল ততক্ষণই রইলেন করজোড়ে। নীরব বিনতিতে। আগুন নিয়ে

প্রসন্নমনে চলে গেল সাধু। কাউকে শাপমন্যি করলে না। তেড়ে এল না পায়ের খড়ম নিয়ে।

সাধু চলে গেলে ভবনাথ বললে হাসতে-হাসতে : 'আপনার সাধুর উপর কী ভক্তি!'

'ওরে তমোমুখ নারায়ণ। যাদের তমোগুণ তাদের এই রকম করে প্রসন্ন করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর এ তো সাধু।'

খেলা দেখছেন ঠাকুর। ওরে, হাজরার কি হল আবার!

কী হল!

চেয়ে দ্যাখ, হাজরার ঘুঁটি আবার নরকে পড়েছে।

সকলে হেসে উঠল হো-হো করে।

লাটুর কী অবস্থা! সাত-চিৎ ফেলেছে লাটু। এক চালে মুক্তি। এক লাফে উল্লম্ফন। সংসারঘর থেকে একেবারে ব্রহ্মলোক। ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল লাটু।

'এর একটা মানে আছে।' বললেন ঠাকুর, 'অহংকারের উত্থান নেই, আর ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। হাজরার বড় অহংকার হয়েছিল তাই তার পতন আর লেটো হচ্ছে ঠিক লোক, তাই তার ঊর্ধ্বগতি। ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কখনো কোথাও তিনি অপমান করেন না। সর্বত্র জিতিয়ে দেন।'

তবে কি হাজরা ঠিক লোক নয়? নইলে তাকে রাখা গেল না কেন? এমনিতে থাকত নিজের খেয়ালে কিছু এসে যেত না। উলটে ঠাকুরের বিরুদ্ধতা করতে লাগল।

ঠাকুর তখন ভবতারিণীকে বললেন, 'মা, হাজরা যদি মেকি হয়, ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

কদিন পরে সরে গেল হাজরা। কিন্তু নরেন তাকে ছেড়ে দেবে না সহজে। বললে, 'কিন্তু, এক কথা। বলো, মৃত্যুকালে ওর ইষ্টদর্শন হবে।'

ঠাকুর চোখ তুলে তাকালেন নরেনের দিকে।

বন্ধুর জন্যে আবার অনুনয় করল নরেন। 'ও চলে যাচ্ছে যাক, কিন্তু এটুকু অভয় ওকে দিতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকবে ও? ও তাপে লজ্জায় বিমর্ষ। ও কিছু বলতে পারছে না, আমি ওর হয়ে বলছি। বলো ইষ্টদর্শন হবে ওর মৃত্যুকালে। আর কিছু না থাক, নিষ্ঠা ছিল ওর, ও আর কিছু না পাক তোমারও প্রণাম পেয়েছে। বলো, সত্যি নয়? আর, তোমার প্রণাম যে পেয়েছে—বলো, হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'হবে।'

প্রতাপ হাজরাকে আর পায় কে। অনুরক্ত করে না পাক, বিরক্ত করে আদায় করে নিয়েছে। এই তার অসীম প্রতাপ। হৃদয়ের মত সেও ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু তার তো তবু হবে শেষ সময়। হৃদয়ের কি হবে না? তার পক্ষে নরেনের মত মুরুব্বি নেই বলেই কি এই দীন দশা? এত বলবান সেবা, এত সহিষ্ণু সান্নিধ্য, এত অকাতর শুশ্রূষা—এ কি ব্যর্থ হবে? কিছুই কি ব্যর্থ হয়?

'মশাই, আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছেন।' কে একজন লোক বললে এসে ঠাকুরকে।

'আমার সঙ্গে?' ঠাকুর তো অবাক।

'হ্যাঁ, আপনারই নাম করলে।'

'কোথায় সে লোক?'

'যদু মল্লিকের বাগানে এসেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের সামনে।'

এখানে নিয়ে এস, এ কথা বললেন না ঠাকুর। এতদূর যখন এসেছে তখন ফটক ডিঙিয়ে ভিতরে চলে আসতে দোষ কি, তাও বললেন না। যখন ফটকের সামনে এসেই থেমে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই ভিতরে ঢুকতে কোনো বাধা আছে। নইলে এটুকু পথ আর আসবে না কেন? যাই দেখি গে কে এল। হয়তো হৃদে এসেছে। ও বলেই ঢুকছে না এখানে।

পা চালিয়ে পুবমুখো চলে গেলেন ঠাকুর। যা ভেবেছিলেন। হৃদয়ই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। রামসমীপে মহাবীরের মত। ঠাকুরকে দেখেই পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল অঝোরে। পরিত্যক্ত শিশুর মত।

ঠাকুর বললেন, 'ওঠ্। কাঁদিসনি। কান্নার কী হয়েছে!' বলছেন আর নিজে কাঁদছেন। যেন কান্নার কিছুই নেই এমনিভাবে নিজের চোখ মুছছেন গোপনে।

যে যন্ত্রণা দিয়েছে, তারও জন্যে করুণা। যে বিরক্ত করেছে, তারও জন্যে অনুরাগ! শুধু ভক্তের ডাকেই সাড়া দেন না, যে পরিত্যক্ত তারও ডাকে সাড়া দেন। ছুটে আসেন নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে। ধুলোর থেকে তুলে নেন হাত বাড়িয়ে।

'কিরে, এখন যে এলি?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব তার কি সময় অসময় আছে? হৃদয় কাঁদছে তো কাঁদছেই। বললে, 'আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব?'

আমার আর কে আছে? শত ফটক বন্ধ হয়ে গেলেও তুমি আছ আমার ফটিকজল। মেয়াদহীন কয়েদখানার বাইরে মুক্ত প্রান্তরের ডাক। তোমাকে কে আটকাবে? আর সবাই ঠেলুক তুমি ঠেলতে পারবে না।

'তোর আবার কিসের দুঃখ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'তোমার সঙ্গছাড়া হয়ে আছি। সে দুঃখের কি আর শেষ আছে?'

'বা, তখন যে বলে গেলি', ঠাকুর মনে করিয়ে দিলেন, 'তোমার ভাব নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে থাকতে দাও আমার নিজের ভাবে।'

কান্নার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল হৃদয়কে। বললে, 'হ্যাঁ, তখন তো তা বলেছিলাম, কিন্তু আমি তার কি জানি! আমি তার কি বুঝি।'

'তাতে কি হয়েছে! এমনিতর দুঃখকষ্ট আছেই সংসারে।' ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন :

'সংসার করতে গেলেই আছে এমন সুখদুঃখ, এমন ওঠা-নামা। তাতে কি! এমনিতে কেমন আছিস? ধান-টান কেমন হয়েছে এবার?'

'মন্দ নয়।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল হৃদয়।

'আজ এখন তবে আয়। আজ রোববার, অনেক লোকজন এসেছে, তারা বসে আছে সকলে।'

আমিও কি সকলের মধ্যে একলা নই? আমিও কি বসে নেই এক পাশে?

'শোন, আরেকদিন আসিস। তখন বসে কথা কইব তোর সঙ্গে।'

সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করল হৃদয়। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল সমুখ দিয়ে। দুর্দান্ত সেবাও যেমন করেছে, তেমনি যন্ত্রণাও দিয়েছে অফুরন্ত। ছেলেকে যেমন মানুষ করে তেমনি করে নেড়েছে-চেড়েছে ঘষেছে-মেজেছে ঠাকুরকে। রাত-দিন বেহুঁশ হয়ে থাকতেন, নিষ্পলক চোখে পাহারা দিয়েছে। আজ সবাই তোমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছ, হৃদয় থাকলে পায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি? অসুখে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারি না, আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে খাচ্ছে হৃদয়, যদি খেতে আমার রুচি আসে। বলছে, এই দেখ না আমি কেমন খাই। তুমি শুধু তোমার মনের গুণে খেতে পাচ্ছ না। কাটিয়ে ফেল মনের গুণ। কত করেছে আমার জন্যে। গঙ্গায় নেমে তুলে এনেছে এই ডুবন্ত দেহকে। ফুলুই শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে আমার সর্দি-গর্মি হয়, সেই ভয়ে খোলা মাঠে টেনে নিয়ে গেছে। বেলঘরে নিয়ে গেছে কেশবের কাছে। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লাটসাহেবের বাড়ি দেখিয়েছে। তেমনি যন্ত্রণা দিতেও কসুর করেনি। ভেবেছিল ওর 'আণ্ডারে' আছি, যা করাবে তাই করব। বললে, মা'র কাছে ক্ষমতা চাও, ব্যামোর ওষুধ চাও। নইলে আবার মা কি! ওর পরামর্শ শুনতে গিয়ে ঘা খেলুম। শম্ভু মল্লিকের কাছে টাকা চায়, যদি পারে হাতিয়ে নেয় লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারীর সেই থলেটা। দশ হাজারের থলে। কেবল বিত্তবেসাত জমি-গরুর দিকে লালসা। সিদ্ধাই-সিদ্ধাই করে আস্ফালন। জ্বালিয়ে মেরেছে। এমন জ্বলুনি, পোস্তার উপর থেকে জোয়ারের জলে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলুম।

তারই জন্যে, সেই হৃদয়ের জন্যেই, কাঁদছেন ঠাকুর। যে কাঁদায়, কি আশ্চর্য, তারই জন্যে আবার কাঁদেন। যে বিতাড়িত, তারই জন্যে আবার ছুটে আসেন ব্যগ্র হয়ে। যে অযোগ্য, অকমর্ণ্য, তারও জন্যে রেখে দেন আশ্বাসের আতপত্র।

এঁটে ধরে থাক, কিছুতেই ছাড়িসনে, সাধ্য কি তোকে ফেলে রাখে জলের পাশে। পালিয়ে সে কোথায় যাবে, তুই যে তার পা নিয়ে বসে আছিস। ঐ দ্যাখ সে হেসে উঠেছে অন্ধকারে, নিবিড় বনের অন্তরালে ঐ দ্যাখ জেগে উঠেছে শুকতারা।

সামান্য যাত্রাদলের ছোকরা, তার সঙ্গেও ঈশ্বরকথা। দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে যাত্রা হচ্ছে। পালা বিদ্যাসুন্দর। শেষরাত্রি থেকে শুরু হয়েছে, সকালেও শেষ

হয় নি। মন্দিরে মাকে দেখতে এসে ঠাকুর একটু শুনেছেন কান পেতে! যাত্রাশেষে ঠাকুরের ঘরে এসেছে অভিনেতারা।' যে ছোকরা বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয়ে ঠাকুর খুব খুশি। বললেন, 'বেশ করছে তুমি। শোনো, যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে পটু হয়, যে কোনো একটা বিদ্যাতে যদি তার দক্ষতা থাকে, তাহলে চেষ্টা করলে সহজেই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

আমিও তো ভালো য়্যাকটিং করতে পারি। চমকে উঠল ছোকরা। আমার পক্ষেও সম্ভব ঈশ্বরলাভ ?

তা ছাড়া আবার কি। কত অভ্যাস করেই না তবে গাইতে-বাজাতে শিখেছ। কত লাফঝাঁপ করেই না রপ্ত করেছ নাচ। সেই অভ্যাসযোগেই লাভ হবে ঈশ্বর।

'আজ্ঞে, কাম আর কামনার তফাত কি ?' জিগগেস করল ছোকরা।

তুচ্ছ লোকের আবার তত্ত্বজিজ্ঞাসা, এই বলে উড়িয়ে দিলেন না ঠাকুর। বললেন 'কাম যেন গাছের মূল আর কামনা তার ডালপালা। যদি কামনা করতেই হয়, ঈশ্বরে ভক্তি-কামনা করো। যদি মত্ততা করতেই হয় আমি ঈশ্বরের সন্তান এইভাবে মত্ত হও।'

তাকালেন ছোকরার দিকে। শুধোলেন, 'তোমার বিয়ে হয়েছে ?'

ছোকরা ঘাড় কাত করল।

'ছেলেপুলে ?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরেকটি হয়েছে।'

'এর মধ্যে হলো-গেলো ? এই তোমার কম বয়স! বলে, সাঁজসকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত!'

সবাই হেসে উঠল।

'সংসারে সুখ তো দেখলে।' ঠাকুর আবার তাকালেন ছোকরার দিকে। 'যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।'

'কিন্তু সংসার ছাড়ব কি করে ?'

'না, না, ছাড়বে কেন ? সংসার করবে কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে। সেই যে ছুতোরের মেয়ে চাল এলে দেয় অথচ সর্বক্ষণ হুঁশ রাখে ঢেঁকির মুষল যেন হাতে না পড়ে—তেমনি। ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছে, এক ফাঁকে এক হাতে খোলায় ভেজে নিচ্ছে ধান—'

'মনে রাখব আপনার কথাগুলো।'

'মাঝে-মাঝে এখানে এসো। রবিবার কিংবা অন্য ছুটিতে—'

'আজ্ঞে আমাদের তিন মাস রবিবার। শ্রাবণ, ভাদ্র আর পৌষ। বর্ষা আর ধান কাটবার সময়। আপনার কাছে আসব সে আমাদের ভাগ্য।'

'হ্যাঁ, সবাই মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে-শুনতে ভালো। চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে যাত্রা ভেঙে যায়।' সবাই মিলে এক সুর ধরো। এক তরীতে ভাসো। একাকার হয়ে যাও। যাত্রা থেকেই যাত্রা করো।

বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের মধ্যে যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের মেয়েলি ভাব হয়ে যায়। তাই না? তেমনি যারা রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তাদের মধ্যে ঈশ্বর-সত্তার রঙ ধরে। মন ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'

আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? এর মানে কি? দেখলাম, তাল মান গান নিখুঁত! তারপর মা দেখিয়ে দিলেন, নারায়ণই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধরে যাত্রা করছেন।

এই ঠাকুরের অবতারবাদ। সকলেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরের প্রতিধ্বনি। এই ঠাকুরের আত্মদর্শন। সমস্ত মন ঈশ্বরকে না দিলে ঈশ্বরের দর্শন হয় না। তেমনি সমস্ত জনে তাঁকে না দেখলেও হয় না দর্শন। মনে-জনে দেখাই ঠিক দেখা।

১২০

যে মা-মন্ত্র দেবে তাকে মায়ের জন্যে কাঁদতে হবে। শুধু বিশ্বের মায়ের জন্যে নয়, ঘরের মায়ের জন্যে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর জন্যে নয়, সামান্য গর্ভধারিণীর জন্যে। জগৎ ছাড়লেও যাকে ছাড়া যাবে না। সন্ন্যাসী হয়েও যাকে আঁকড়ে থাকতে হবে জপমালার মত। পঞ্চবায়ু, পঞ্চকোষের মত। শুধু তাই নয় নিজেকেও মা হয়ে দেখাতে হবে মাঝে-মাঝে। আরো কঠিন কথা, মা-মন্ত্রের দিতে হবে একটি পর্যাপ্ত মূর্তি, একটি শরীরী তর্জমা, একটি শাশ্বতী প্রতিলিপি। সব পুরোপুরি করে গিয়েছেন ঠাকুর। তাইতো তাঁর মন্ত্র এত প্রাণময়। তার শক্তি এত উজ্জীবনী। তার অর্থ এত গভীরগ।

ঈশ্বরের চেয়েও মায়ের, চন্দ্রমণির মুখখানি বেশি সুন্দর দেখেছেন। মায়ের মুখখানি মনে পড়তেই ছুঁড়ে দিলেন গঙ্গাময়ীর হাত, ছেড়ে এলেন বৃন্দাবন। কিসের শ্রীমতীর সাধন শ্রীমতী মাতার কাছে! 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—' একেবারে নাড়ী ধরে টান মারে। মা মরে যাবার পর এমন কান্না কাঁদলেন, নির্বিকল্প সন্ন্যাসেও কুলোল না। এমন মা। এমনই মহীয়সী জীবিতাশা! তারপর নিজে রূপ ধরে দেখালেন মা কেমন। চুল এলিয়ে বুকভরা স্নেহক্ষীর নিয়ে কোল পেতে বসলেন মাটির উপর। রাখাল দেখল মা বসে আছে। সোজাসুজি কোলের উপর গিয়ে বসল, দুধের ছেলের মত পান করতে লাগল মা'র স্তন্যসুধা। এই তো না-হয় হল যারা স্বগন-স্বজন তাদের জন্যে, কিন্তু আর সকলের কী হবে, তাদের মা কোথায়? শুধু মন্ত্রে, মুখের কথায় কি সাধ মেটে না, বুক ভরে? আমাদের একটি মূর্তি চাই, প্রতিমা চাই। প্রতিমা, প্রস্ফুটা প্রতিমা। মন্ত্রের উজ্জ্বল উচ্চারণ। ঘনীভূতা নিয়তস্থিতি।

ঠিক কথা। এই দেখ সেই মন্ত্রের মূর্তি, সান্দ্রীভূতা স্মিতজ্যোৎস্না। বলে

প্রতিষ্ঠা করলেন সারদামণিকে। চেয়ে দেখ এই মূর্তির দিকে, একে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে কিনা এবং ডাকবার সঙ্গে সংগে মনে এই আশ্বাস আসে কিনা যে সাড়া পাব। দুর্গাদুর্গতিহরা জন্মজলধিতারিণী মা। শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলা সুশুভ্রা। ভবভয়দ্রাবিণী দীনবৎসলা।

রাখালের মত তারকও এসে দেখলে ঠাকুর নয়, মা বসে আছেন। কোথায় পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করবে তা নয়, লাজুক শিশুর মত ঠাকুরের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। কি রে, আমি কে? অমন করলি কেন?

তুমি? তুমি আমার মা। তোমার চাহনিতে সেই নিমন্ত্রণ।

'হ্যাঁ রে, তোকে আগে কোথাও দেখেছি?'

আমি দেখেছিলাম একদিন রামবাবুর বাড়িতে। সিমলেতে তাঁর বাড়ির কাছেই আমার বাসা। গিয়ে দেখি একঘর লোক, বাইরেও উদ্বেল জনতা। কি যেন দেখতে কি যেন শুনতে সবাই উন্মুখ-উৎসুক। ভিড় ঠেলে গেলাম এগিয়ে। গিয়ে দেখলাম আপনাকে। আহা কি মনোহর দর্শন। অমৃতমহোদধি বসে আছেন শান্ত হয়ে। ভাবারূঢ় অবস্থায়। কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য। জগৎগুরু জগন্নাথ। আড়ষ্ট ভাবজড়িত স্বরে বলছেন, আমি কোথায়? কে একজন বললে, রামের বাড়িতে। কোন রাম? ডাক্তার রাম। তখন ফিরে পেলেন সম্বিৎ।

বলতে লাগলেন সমাধির কথা। কাকে বলে সমাধি? সমাধি কয় রকম? কিসে কেমন অনুভূতি। সে এক অপূর্ব বর্ণনা।

সমাধি পাঁচ রকম। পিপীলিকা, মৎস্য, কপি, পক্ষী আর তির্যক। কখনো বায়ু ওঠে পিঁপড়ের মত শিরশির করে। কখনো ভাবসমুদ্রে আত্মা মাছের মতো খেলা করে। আনন্দে সাঁতার কাটে। কখনো বা পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু পাশ থেকে ঠেলতে থাকে, আমোদ করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি, টুঁ শব্দও করি না। কিন্তু নিঃসাড় হয়ে কাঁহাতক থাকা যায়? বানরের মত লম্বা লাফ দিয়ে মহাবায়ু উঠে যায় সহস্রারে। তাই তো, দেখ না, মাঝে-মাঝে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। তারপর আবার পাখি হয় মহাবায়ু। এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডালে উড়তে থাকে। যেখানটায় বসে সেখানে যেন আগুন জ্বলে। মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এমনি উড়ে-উড়ে বেড়ায়। শেষে এসে মাথায় আশ্রয় নেয়। তির্যকও প্রায় তাই। লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে না, এঁকে-বেঁকে চলে। তারও শেষ লক্ষ্য ঐ মাথা। ঐ কুলকুণ্ডলিনী। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। ঐ কুলকুণ্ডলিনী জাগলেই শেষ সমাধি।

আমরা কি অত সব পারব? মহাবায়ুর সঙ্গে কি আমাদের মহাসাক্ষাৎকার হবে? নিয়ে যাবে সেই প্রস্ফুটিত শতদলের মর্মকোষে?

কেন হবে না? শুধু পুঁথি পড়লেই হবে না। শুধু শুকনো চর্বিতচর্বণে হবে না। তাঁকে ডাকলে হবে। তাঁর জন্যে কাঁদলে হবে। তাঁকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হলে হবে। কান্না কখনো পুরোনো হয় না। এর কান্নার সঙ্গে মেলে না ওর কান্না। প্রত্যেকটি কান্না মৌলিক। নিত্যনতুন।

বিষয়চিন্তাই মনকে দেয় না সমাধিস্থ হতে। আবার বলতে লাগলেন ঠাকুর, সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। কিন্তু মেঘে যদি সূর্য ঢাকা পড়ে তা হলে আর পদ্ম তার দল মেলে না। তেমনি বিষয়মেঘে জ্ঞানসূর্য ঢাকা পড়লে ফোটে না আর ভক্তিকমল। আরেকরকম সমাধি আছে। যাকে বলে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। এ কি যে-সে কথা ? মানুষের মন সরষের পুঁটলি। পুঁটলি খুলে সরষে ছড়িয়ে পড়লে ওদের কুড়িয়ে এনে ফের পুঁটলি বাঁধা কি সোজা কথা ? একটু মন হয়তো গুটিয়ে এনেছে অমনি কোত্থেকে বিষয়চিন্তা এসে উদয় হল, দিল সব ছত্রখান করে।

সেই নেউলের গল্প জানো না ? ন্যাজে ইঁট-বাঁধা নেউল ? দেয়ালের গর্তে, তার নিভৃত সমাধির কোটরে আছে দিব্যি আরামে, ঐ ইঁটের টানে বারে-বারে বেরিয়ে পড়ে গর্ত থেকে। যতবারই গর্তের মধ্যে স্বস্থানে বসতে যায় আরামে, ইঁটের জোরে ততবারই এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তাও অমনি। যতই মন ঈশ্বরের পাশটিতে এসে বসতে চায় ততই বিষয়চিন্তা টেনে বের করে দেয়। ঘটায় যোগভ্রংশ।

উন্মনা-সমাধি কেমন জানো ? সেই থিয়েটারের ড্রপ উঠে যাওয়া। দর্শকেরা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, অমনি থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল। তখন সকলের মন সহসা অভিনিবিষ্ট হল অভিনয়ে। আর নেই তখন বাহ্যদৃষ্টি, বাহ্যচেতনা। যেন উঠে পড়ল মায়ার পর্দা। জেগে উঠল যোগচক্ষু। আবার খানিকক্ষণ পর যখন নেমে এল মায়ার পর্দা, মন আবার বহির্মুখ হয়ে গেল। আবার শুরু হল গালগল্প, বিষয়কথা। যে-কে-সে। তাই বা মন্দ কি। সংসারী লোকের পক্ষে যত বেশি উন্মনা হওয়া যায়! যত বেশি ঘরে থেকে নিজেকে অনুভব করা যায় বনবাসীর মত! উন্মনা হতে-হতেই স্থিত-সমাধি হয়ে যাবে। একেবারে বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলেই স্থিত-সমাধি। সর্বক্ষণই বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রাম-লক্ষ্মণ পম্পাসরোবরে গিয়েছেন! লক্ষ্মণ দেখলেন, জলের ধারে বসে আছে একটা কাক। পিপাসার্ত তবু খাচ্ছে না জল। কেন, কি হল ? রামকে জিগগেস করলেন লক্ষ্মণ। রাম বললেন, ভাই এ কাক পরমভক্ত। অহর্নিশ রামনাম করছে। ভাবছে জল খেতে গেলে পাছে রামনাম জপ ফাঁক হয়ে যায় তাই ঠোঁট দিয়ে জলস্পর্শ করছে না। নামসুধাই হরণ করেছে তার দেহপিপাসা। সংসারী-লোকের সেই একমাত্র উপায়—নামজীবিকা। হরিনামরূপা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী। শুধু তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকো। তাঁর নাম করো। তাতেই জাগবে কুলকুণ্ডলিনী। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী। ঐ কুণ্ডলায়িত সাপ ফণা না তুললে কিছুই হবে না। ও জাগলেই চৈতন্য, ও জাগলেই ঈশ্বরদর্শন।

ন্যাংটা বলতো গভীর রাতে অনাহত শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ আবার শোনবার জন্যে তপস্যা। ওই প্রণবের ধ্বনি। ঐ ধ্বনি উঠছে ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম

থেকে, প্রতিধ্বনি জাগছে নাভিমূলে। অনাহতে শব্দ ধরে এগুলেই পৌঁছানো যায় ব্রহ্মের কাছে, যেমন কল্লোল শুনে পৌঁছানো যায় সমুদ্রে। কিন্তু যতক্ষণ দেহের মধ্যে আমি-আমি রব উঠছে ততক্ষণ শোনা যাবে না সেই শব্দ, দেখা যাবে না সেই শেষশায়ীকে।

মুগ্ধের মত শুনছিল সব তারক আর ভাবছিল এমন ভাগ্য কি হবে যে এই মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের কৃপা আমি পাব?

শুধু কৃপা নয়, কোল দেব তোকে।

রামবাবু বললেন কাঁধে হাত রেখে, 'এখানে খেয়ে যাবেন চারটি।'

'বাড়িতে বলে আসিনি।'

'তাতে কি?' উড়িয়ে দিলেন রামবাবু।

যেন একটা অতি তুচ্ছ কথা, কিছু নয়। সত্যের ছোট-বড় নেই, তুচ্ছ-উচ্চ নেই, সত্য সব সময়েই সত্য, সর্বাবস্থায় জগৎপ্রদীপ সূর্যের মতো বৃহত্তেজা।

খুঁজতে-খুঁজতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরে তারকের এক বন্ধুর বাড়ি, সেই তাকে নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। বড়বাজার থেকে চলতি নৌকোয় চলে এসেছে শনিবার, আফিসের ছুটির পর। বন্ধুর বাড়ি হয়ে ঠাকুরের কাছে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যে। প্রথমেই টেনে নিলেন কোলে। দুঃখ-দারিদ্র্যনাশিনী সর্ববান্ধবরূপিণী মায়ের মত। আরতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন তারককে, 'তুমি সাকার মানো না নিরাকার?'

'নিরাকারই আমার ভালো লাগে।'

'না রে, শক্তিও মানতে হয়।' বলে, ঠাকুর উঠলেন। টলতে-টলতে এগুতে লাগলেন কালীমন্দিরের দিকে। কেন কে বলবে তারকও তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগল।

প্রতিমা প্রস্তর ছাড়া কিছু নয়, ব্রাহ্মসমাজে ঘুরে-ঘুরে এই শিক্ষাই পেয়েছিল তারক। অথচ, কি আশ্চর্য, এই পাষাণাকারা প্রতিমার কাছে ভাববিভোর হয়ে প্রণাম করছেন ঠাকুর। শুধু শুকনো মাথা নোয়ানো নয়, হৃদয়কে জল করে প্রতিমার পায়ের উপর নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল তারক।

সহসা কে যেন বলে উঠল তার মর্মের কানে-কানেঃ 'অত গোঁড়ামি কেন? এত সঙ্কীর্ণতা কিসের? ব্রহ্ম তো ভূমা, সর্বব্যাপী। তাই যদি হয় এই প্রতিমার মধ্যেও তিনি আছেন। সেই বিভুকে প্রস্তরমূর্তিতে প্রণাম করতে দোষ কি?

মাথা নত হয়ে এল তারকের। নীলঘনশ্যাম ভবতারিণীর সামনে সে রাখল তার প্রণিপাত।

ঠাকুর বললেন, 'আজ রাত্রে এখানেই থেকে যাও না।'

কত বড় প্রলোভনের কথা। কিন্তু তারক বললে সহজ সুরে, 'বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। উঠেছি তার ওখানে। কথা দিয়ে এসেছি ওখানেই থাকব রাত্রে।'

'কথা দিয়ে এসেছ?' ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এর উপরে আর কথা

নেই। ঐ সামান্য একটু কথা রাখাই হচ্ছে তপস্যা। সত্য কথার মত বড় তপস্যা আর নেই কলিতে।'

সব মাকে দিয়েছিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।

মাড়োয়ারী ভক্তরা আসে ঠাকুরের কাছে। খালি হাতে নয়, নানারকম ফল-মিষ্টান্ন নিয়ে। থালা সাজিয়ে। গোলাপজলের গন্ধ ছিটিয়ে। আমি ওসব কিছু নিতে পারি না। বলছেন ঠাকুর। ওদের অনেক মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। গোলাপজলের গন্ধে কি সেই অপলাপের গন্ধ ঢাকা পড়বে?

সরলভাবেই বলছেন সব মাড়োয়ারীদের, বোঝাচ্ছেন। 'দেখ ব্যবসা করতে গেলে সত্যকথার আঁট থাকে না। ব্যবসায়ে তেজী-মন্দি আছে, তখন মিথ্যে চালাতে হয়। মিথ্যে উপায়ে রোজগার করা জিনিস সাধুদের দিতে নেই। শুদ্ধ জিনিস সত্য জিনিস সাধুদের দেবে। সত্যপথেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার।'

তুমি কি করেছ তপস্যা? কিছু করিনি। শুধু মৌনাবলম্বন করেছি।

তাতেই তোমার সিদ্ধি হয়েছে।

তাতেই?

হ্যাঁ, তার মানে মৌনাবলম্বন করে ছিলে, ফলে তুমি মিথ্যে বলোনি। মিথ্যা না বলাটাও এক হিসেবে সত্য বলা।

সকলসুন্দরসন্নিবেশ ঠাকুর তাকালেন তারকের দিকে। বললেন, 'বেশ কাল এসো।' সত্যমেব জয়তে, নানৃতম।

১২১

কিন্তু কাল কি আর আসবে ইহকালে? ঠিক আসবে যদি তিনি কৃপা করেন। যিনি কোল দিয়েছেন তিনি কি করেননি কৃপা?

পরদিন সন্ধ্যের আগে ঠিক এসে হাজির।

ওরে এসেছিস? তোর জন্যে মা-কালীর প্রসাদী লুচি-তরকারি রেখে দিয়েছি। কি রে, আজ রাত্রে থাকবি তো এখানে? সামনের ঐ দক্ষিণের বারান্দায় শুবি, কেমন? আজ রাতে কেউ এখানে থাকবে না। শুধু তুই আর আমি।

যেন কতকালের চেনা। কত দেশ ঘুরেছেন ওকে সঙ্গে করে। তোর নাম কি, তোর বাপের নাম কি, কোথায় তোর বাড়ি, কিছুর খোঁজখবরে দরকার নেই। শুধু তুই এলি আর আমি নিলুম। তুই আর আমি এ দুয়ের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডলীলা। শুধু শিলা নয় রে, লীলা। শুধু কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নয়, রাধাকৃষ্ণ।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এরা কৃষ্ণ মানে, কিন্তু রাধা-বিহীন কৃষ্ণ। এদের মতে রাধা বলে কিছু নেই। খাজাঞ্চির ঘরের কাছে আছে কিন্তু কোনো দেবমন্দিরেই প্রণাম করতে আসে না। মায়ের মন্দিরে শিবের মন্দিরে তো নয়ই, রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও নয়।

সাধুর ইচ্ছে ঠাকুরের ভক্তেরা ওর কাছে এসে সমবেত হয়, শোনে ওর কথাবার্তা। এমনিতে বেশ খাঁটি সাধু, কিন্তু দোষের মধ্যে, শুকনো।

সকলে তাকায় ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বললেন, 'হতে পারে ওর ভালো মত, কিন্তু আমার প্রাণের মতো নয়। ভগবানের লীলা চাই।'

লীলা ভুবনপাবনী। মা আর ছেলে। বর আর বধূ। প্রভু আর দাস। বন্ধু আর সখা। নারদ দ্বারকায় এসে হাজির। ষোলো হাজার স্ত্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বাস করছেন তা একবার দেখে যেতে হবে স্বচক্ষে। বিশ্বকর্মার নির্মাণ-কৌশলের পরাকাষ্ঠা, কী সুন্দর-সুমহান রাজপুর! নির্ভয়ে প্রবেশ করল নারদ, একেবারে নিভৃত অন্তপুরে। গিয়ে দেখল রুক্মিণী রত্নখচিত চামর দিয়ে ব্যজন করছে শ্রীকৃষ্ণকে। নারদকে দেখে উঠে পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ, বসবার জন্যে মহার্ঘ আসন দিলেন, নিজের হাতে ধুয়ে দিলেন তাঁর পদযুগল। শুধু তাই নয়, সেই পা-ধোয়া জল রাখলেন নিজের মাথার উপর। বললেন, 'প্রভু আপনার কোন কাজ সাধন করব বলুন।'

নারদ বললে, 'আর কিছু নয়, যেন আপনার চরণদ্বয়ের ধ্যানে আমার স্মৃতি সতত স্থির থাকে।'

নারদ নিষ্ক্রান্ত হয়ে আরেক মহিষীর ঘরে প্রবেশ করল। গিয়ে দেখল সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। নারদকে দেখে তেমনি পদবন্দনা করে জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ, 'প্রভু, আপনার কী প্রিয় সাধন করব?'

তেমনি এক-এক ঘরে যাচ্ছে নারদ, আর এক-এক অভিনব দৃশ্য দেখছে। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালন করছেন, কোথাও হোম বা সান্ধ্যবন্দনা করছেন, কোথাও অস্ত্রবিদ্যা শিখছেন, কোথাও অশ্ব হস্তী বা রথপৃষ্ঠে বিচরণ করছেন। কোথাও বা শুয়ে রয়েছেন পর্যঙ্কে, কোথাও বা মন্ত্রীদের সঙ্গে বসেছেন মন্ত্রণায়, কোথাও বা গোদান করছেন ব্রাহ্মণদের। কোথাও স্নান করতে চলেছেন, হাস্যালাপ করছেন প্রিয়ার সঙ্গে, কোথাও বা পুত্রকন্যার বিয়ের আয়োজন করছেন। নানা ভাবে অবস্থিত। নানা লীলায় উদ্ভিন্ন।

তখন নারদ বললে করজোড়ে, 'হে যোগেশ্বর, আজ দেখলাম আপনার যোগমায়ার প্রভাব। এবার আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকল লোকে আপনার ভুবনপাবনী লীলাগান গেয়ে বেড়াই।'

'পুত্র, তুমি মোহগ্রস্ত হয়ো না।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'লোকশিক্ষার জন্যে আমি এরূপ করে থাকি।'

আবার দেখ, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ছেড়ে জলস্পর্শ করে পরমাত্মার ধ্যান করি। অন্ধকারের পরপারে যাঁর বাসা সেই পরমাত্মা। সেই এক স্বয়ংজ্যোতি, অনন্য, অব্যয়, নিরস্তকল্মষ ব্রহ্মনামা পুরুষ। উদ্ভব আর বিনাশের মধ্যে যে শক্তি সেই শক্তিতেই যাঁর সত্তা ও আনন্দস্বরূপত্বের উপলব্ধি।

আবার যেমন ধরো নিত্যগোপাল। এত বড় ভক্ত, ঠাকুরের মতে পরমহংস অবস্থা পেয়েছে, তার সঙ্গে মিশতে বারণ করছেন তারককে। বলছেন, 'দ্যাখ তারক,

নিত্য-গোপালের সঙ্গে বেশি মিশিসনে! ওর আলাদা ভাব। ও এখানকার লোক নয়।'

তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলে এই নিত্যগোপাল। বিয়ে-থা করেনি। বালক-স্বভাব। নিয়ত বাস করে ভাবরাজ্যে। ডিমে তা দেওয়া পাখির দৃষ্টির মতো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলেন, পরমহংস অবস্থা। তাই দেখেন গোপালের মত। গিরিশের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বসতে গিয়ে দেখেন আসনের কাছে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। যত বিষয়ব্যাপারের কথা, পরনিন্দা আর পরচর্চা। ইশারায় বললেন কাগজখানা সরিয়ে নিতে। কাগজ সরাবার পর বসলেন আসনে!

সেখানে নিত্যগোপাল এসেছে।

'কি রে, কেমন আছিস?'

'ভালো নেই।' বললে নিত্যগোপাল। 'শরীর খারাপ। ব্যথা।'

'দু-এক গ্রাম নিচে থাকিস।'

'লোক ভালো লাগে না। কত কি বলে, ভয় হয়। আবার জোর করে ভয় কাটিয়ে উঠি।'

'ওই তো হবে। তোর আছে কে?'

'এক তারক আছে। সর্বদা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। কিন্তু সময়ে-সময়ে ওকেও ভালো লাগে না।'

এত উচ্চভূমিতে আছে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে সঙ্কেতে কথা হয় ঠাকুরের। 'তুই এসেছিস?' অমনি আবার উত্তর দেন নিগূঢ় স্বরে, 'আমিও এসেছি।'

ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের বুক রক্তবর্ণ। কিন্তু ভাব প্রকৃতিভাব। বলরামের বাড়িতে ভাবাবস্থায় নিত্যগোপালের কোলের উপর পা ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুর। ঠাকুর সমাধিস্থ, আর নিত্যগোপাল কাঁদতে লাগল অঝোরে।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'নিত্য থেকে লীলা, লীলা, থেকে নিত্য, তোর কোনটা ভালো?'

'দুইই ভালো।' বললে নিত্যগোপাল।

'তাই তো বলি, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?'

সেদিন যেই নরেন গান ধরল—সমাধিমন্দিরে মা কে তুমি গো একা বসি, অমনি ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরকে বসানো হল আসনে, সামনে ভাতের থালা। সমাধির আবেশ এখনো কাটেনি সম্পূর্ণ, দুই হাতেই ভাত খেতে শুরু করে দিলেন। শেষে খেয়াল হলে বললেন ভবনাথকে, তুই খাইয়ে দে। ভবনাথ খাওয়াতে লাগল। ঠিকমত খাওয়া হল না আজ, বেশির ভাগই পড়ে রইল।

বলরাম বললে, 'নিত্যগোপাল কি পাতে খাবে?'

'পাতে? পাতে কেন?' ঠাকুর প্রায় ধমকে উঠলেন।

'সে কি, আপনার পাতে খাবে না?'

নিত্যগোপালও ভাবাবিষ্ট। ঠাকুর এসে বসলেন তার পাশটিতে। যে পাতেই

তোকে দিক, তোকে আমি খাইয়ে দি নিজের হাতে। তুই আমার গোপাল।

সেই গোপাল সেন। অনেক দিন হল সেই যে একটি ছোট্ট ছেলে আসত এখানে, এর ভেতর যিনি আছেন সেই মা তাঁর বুকে পা রাখলে, মনে নেই? বললে, তোমার এখনো দেরি আছে, আমি পারছি না থাকতে ঐহিকদের মধ্যে। এই বলে যাই বলে বাড়ি চলে গেল। আহা, আর ফিরে এল না। তারপর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই গোপালই নিত্যগোপাল। এমন যে নিত্যগোপাল তার সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তারককে।

'ওরে সেখানে তুই যাস?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

বালকের মতো সরল মুখে বললে নিত্যগোপাল। 'যাই। নিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।' সে একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক। অপার ভক্তিমতী, ঠাকুরে দত্তচিত্ত। নিত্যগোপালের অপূর্ব ভাবাবস্থা দেখে বড় আকৃষ্ট হয়েছে, তাকে সন্তানরূপে স্নেহ করে, কখনো-কখনো নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।

'ওরে, সাধু সাবধান।' শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। 'বেশি যাসনে, পড়ে যাবি। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় সাধুকে। এখানে সকলে ডুবে যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুও ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে সেখানে।'

নিত্যগোপালের পরমহংস অবস্থা আর স্ত্রীলোকটিও অশেষ ভক্তিসম্পন্না। তবুও কি অমোঘ শাসন। শাসনবেশে কি করুণা! সাধু সাবধান! কে জানে লৌহগৃহের কোন অসতর্ক ছিদ্রপথে সাপ ঢুকবে! পরমহংস হয়েছ বলেই মনেই কোরো না তোমার আর পতন হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, সাধু সাবধান!

সেই নিত্যগোপাল অবধূত হয়েছে। জ্ঞানানন্দ অবধূত। চিতাভস্মভূষোজ্জ্বল দ্বিতীয় মহেশ। পরনে রক্তবাস হাতে ত্রিশূল গলায় নাগসূত্র। করে পানপাত্র মুখে মন্ত্রজাল বনে-গৃহে সমানুরাগ সন্ন্যাসী। ঠাকুর তাই ঠিকই বলেছিলেন, ওর ভাব আলাদা। ও এখানকার নয়।

ওরা একডেলে গাছ, আমি পাঁচডেলে। আমার পাঁচফুলের সাজি।

মনের আনন্দে সে রাতে আর ঘুম এল না তারকের। একটি মৃদুমিঠে সুগন্ধের মতো উপভোগ করতে লাগল সেই অনিদ্রাটুকুকে।

মাঝরাতে চেয়ে দেখল ঠাকুর দিগম্বর হয়ে ভাবের ঘোরে ঘুরছেন ঘরের মধ্যে আর কি সব বলছেন নিজের মনে। খানিক পরে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়। বলছেন জড়িতস্বরে, 'ওগো, ঘুমিয়েছ?'

ধড়মড় করে উঠে বসল তারক। বললে, 'না তো, ঘুমুইনি।'

'ঘুমোওনি? তবে আমাকে একটু রামনাম শোনাও তো।'

কি ভাগ্য, তারক উঠে বসে রামনাম শোনাতে লাগল।

রাত তিনটে বাজলেই আর ঘুমুতে পারেন না ঠাকুর। এমনিতে ঘুম দু-এক ঘণ্টার বেশি নয়, বাকি সময় যতক্ষণ জীবভূমিতে থাকেন, নাম করেন। যারা থাকে তাঁর কাছাকাছি সকলকে ডেকে তোলেন। ওরে ওঠ, আর কত ঘুমুবি? উঠে একবার ভগবানের নাম কর।

এক-এক দিন খোল করতাল নিয়ে এসে বাজনা শুরু করে দেন। কীর্তনের ধুম লাগান। তারপর নাচেন ভাবের আনন্দে ভরপুর হয়ে। ওরে তোরাও নাচ। লজ্জা কিসের? হরিনামে নৃত্য করবি তাতে আর লজ্জা কি! লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। যে হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্য করতে পারে না তার জন্ম বৃথা! নাচছেন আর দরদরধারে অশ্রু ঝরছে।

বাক্যে যা বলবে মনে যা ভাববে বুদ্ধি দিয়ে যা নিশ্চয় করবে সবই অর্পণ করবে ঈশ্বরকে। সংকল্পবিকল্পবিকারী মনকে নিরোধ করে ভক্তিভরে ভজনা করলেই মিলবে অভয়। সুতরাং স্বীয় প্রিয়ের নাম করো। লজ্জা ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করো সংসারে। অনুরাগ উদিত হলেই চিত্ত বিগলিত হবে, কখনো হাসবে কখনো কাঁদবে কখনো রোদন-চীৎকার করবে কখনো বা উন্মাদের মত নৃত্য করবে। বায়ু অগ্নি সরিৎ সমুদ্র দিক দ্রুম আকাশ নক্ষত্র সমস্ত কিছুকে শ্রীহরির শরীর জেনে অনন্যমনে প্রণাম করবে। যে ভোজন করে তার যেমন প্রতি গ্রাসেই একসঙ্গে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তেমনি যে ভজনা করে তারও নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরের অনুভব ও বৈরাগ্য এসে পড়ে। 'ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।' এই ভজনাতেই পরা শান্তি, আর কিছুতে নয়।

১২২

শিখে রাখ, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। সামনে মাতাল, তাকে ধর্মকথা বলতে গেলে হয়তো কামড়ে দেবে। বরং তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতা, খুড়ো বলে ডাক, হয়তো তোকে আদর করে বসবে। দেখবি, শুনবি, বলবি নে। অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করার চেয়ে সহ্য করা ভালো। তুই কি কারুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যে তোর শাসনে শোধন হবে? যিনি শাসন করবার ঠিক করবেন। তুই বিচারের ভালো-মন্দ কী বুঝিস? আর শোন, তৈরি অন্ন ছাড়বিনে কখনো। যদি ডাল-ভাত জুটে থাকে তাই খেয়ে নে, পোলাওয়ের আশা করবি নে। কাঠের মালা আর ঘেঁটু ফুল পেয়েছিস তাই দিয়ে সেরে নে শিবপুজো। কবে জবাফুল আর স্ফটিকের মালা পাবি তারই জন্যে বসে থাকবি পথ চেয়ে?

ভক্ত হবি, তাই বলে বোকা হবি? তোর হক ছাড়বি, স্বত্ব খোয়াবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিল কিনা দেখে নিবি যাচাই করে। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায় সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবিনি। মোট কথা, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তাই বলে বোকা বাঁদর হবি না। কাছাখোলা, আলাভোলা নেল্যাখেপা হবি না।

'অনেক তপস্যা, অনেক সাধনার ফলে লোকে সরল হয়, উদার হয়। সরল না হলে পাওয়া যায় না ঈশ্বরকে। সরল বিশ্বাসীর কাছেই তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন।' বললেন ঠাকুর।

আর শোন, কান্না পেলেই কাঁদবি।

বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে বালকের মত রামলালের কাছে বসে কাঁদছেন ঠাকুর: 'আমি একটু খাঁটি দুধ খাব। কালীবাড়িতে যে দুধ খাই তাতে স্বাদগন্ধ নেই। বড় সাধ শাদা-শাদা ধোবো-ধোবো মেটো-মেটো গন্ধ এমন একটু খাঁটি দুধ খাই। একটু খাওয়াতে পারিস রামনেলো? বাজারে কি গয়লাবাড়িতে গিয়ে দেখ দেখি মেলে কিনা!' ঘুরে এল রামলাল। হাত খালি। দুধের বিন্দুবিসর্গও কোথাও নেই।

তবে কি হবে? পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন ঠাকুর।

এদিকে বলরামের স্ত্রী তার গৃহে বসে দুধ জ্বাল দিচ্ছে আর কাঁদছে। যোগেন-মা কাছে বসে, তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'দেখ দিদি, এমন দুধ, প্রাণভরে ভগবানকে খাওয়াতে পারলুম না। এ দিয়ে কেবল বাড়ির লোকের পেটপুজো হবে। এক কাজ করবি দিদি? যাবি দক্ষিণেশ্বর?'

যোগেন-মা তো স্তম্ভিত।

'রাত হয়ে এসেছে কেউ টের পাবে না। চল খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়ি। প্রাণ বড় উচাটন হয়েছে, ঠাকুরকে একটু খাইয়ে আসি খাঁটি দুধ। তুই যদি সঙ্গে যাস—যাবি?'

'যাব।'

আধসেরটাক দুধ নিলে একটা ঘটিতে করে। বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ালে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বর। সেই একরাজ্যের পথ। তাও কিনা পায়ে হেঁটে। সমস্ত বন্ধনবেষ্টনী লঙ্ঘন করে এ সেই ডাক। এ ডাক নিরবধি, এ ডাক পৃথিবী ছাড়িয়ে। ঠাকুরের ঘরে ঢুকল এসে দুজন। হাতে গামছা-বাঁধা ঘটি।

পুলকিত হলেন ঠাকুর। শুধোলেন, 'দুধ এনেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিকেল থেকেই মনে হচ্ছে একটু ধোবো-ধোবো মেটো-মেটো খাঁটি দুধ খাই। তাই নিয়ে এসেছ তোমরা—'

যেন নন্দরানীর সামনে গোপাল, তেমনি ভাবে দুধ খেলেন ঠাকুর। পরে পরিহাস করে বললেন, 'তোমরা কুলের কুলবধূ, এত রাতে যে আমার কাছকে এলে তা তোমরা আমার হাতে দড়ি দেবে নাকি?' বলে হাসতে লাগলেন।

রামলালকে বললেন একটা গাড়ি নিয়ে আসতে। গাড়ি এলে বললেন, 'বলরামকে চুপিচুপি বলবি এরা আমার কাছকে এসেছিল যেন রাগ না করে।'

কিন্তু রাগ করছে হরিবল্লভ। বলরামের খুড়তুতো ভাই, কটকের সরকারী উকিল। অধিকন্তু রায় বাহাদুর। নানা কথা কানে ঢুকেছে। নানা বিরুদ্ধ কথা। তুমি যাচ্ছ তো যাও, তুমি মাতামাতি করছ তো করো, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের

ওখানে পাঠাও কেন? ওদের কি মাথাব্যথা? বলরামের এক উত্তর। 'তুমি ভাই একবার তাঁকে দেখে যাও স্বচক্ষে।'

তাই এসেছে হরিবল্লভ। তাকে দেখি আর না দেখি তোমাকে এবার কটকে টেনে নিয়ে যাব। এই মত্ততার প্রভাব থেকে মুক্ত করব তোমাকে।

বলরামের বাড়ি ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লা।' বলরামের অন্নই ঠাকুরের শুদ্ধান্ন। বলরামের সমস্ত পরিবার এক সুরে বাঁধা। এক মন্ত্রে উদ্দীপিত। স্বামী-স্ত্রী থেকে শুরু করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ঠাকুরে প্রেরিত, ঠাকুরে ভাবিত, ঠাকুরে নিমজ্জিত। স্বভাবে কৃপণ কিন্তু সাধুসেবায় বদান্য। বলেন, সাধুসেবা ছাড়া আত্মীয়পোষণ মানে ভূতভোজন। আত্মীয়স্বজনের পাল্লায় পড়ে ছোট মেয়ে কৃষ্ণময়ীর বিয়েতে অনেক খরচ করে ফেলেছেন তাই সারাদিন আছেন ভারি বিমর্ষ হয়ে। একটা সাধুভোজন হল না অথচ এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল জলের মত। অকারণে এল অপচয়!

এমন সময়ে দৈবযোগে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত যোগীন এসে উপস্থিত।

বলরামের আনন্দ তখন দেখে কে। ব্যাকুল হয়ে তার দুহাত চেপে ধরল বলরাম। বললে, 'গৃহীর বিবাহে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ খাওয়া বারণ। জানি। তবু ভাই তুমি যদি দয়া করে অন্তত একটা মিষ্টি খাও আমার সব সার্থক হবে। তখন এত ব্যয় আর অপব্যয় বলে মনে হবে না।'

তা কি করে হয়! যোগীন মুখ ফেরাল। কান্নার কাছে কার নিস্তার আছে! বাপই গলবেন, আর এ তো তাঁর সন্তান। বলরামের কাতরতায় নরম হল যোগীন। নিল একটা মিষ্টি। মুখে দিল। অমনি সমস্ত মধুর হয়ে গেল বলরামের। যা মনে হয়েছিল ক্ষয় তাই মনে হল আনন্দ। যা মনে হয়েছিল অপব্যয় তাই ঐশ্বর্য-উদ্ভাস।

কৃষ্ণময়ীর খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্বশুরঘর করতে যাবার সময় গাড়িতে উঠেছে গয়নার বাক্স সঙ্গে নিয়ে নয়, ঠাকুরপুজোর বাক্সটি কাঁখে করে। ঠাকুরের নিত্যপূজার ছবিখানি আর জপের মালাগাছি রয়েছে সে বাক্সটিতে। সেই তার ইহজীবনের পাথেয়, পরজীবনের ভাণ্ডার।

ঠাকুর বললেন, আহা দেখেছো, কৃষ্ণময়ীর চোখ দুটি ঠিক ভগবতীর চোখের মত।

বলরামের শাশুড়িও কম যায় না। ঠাকুর প্রণাম করে-করে কপালে কড়া পড়িয়ে ছেড়েছে। পুত্র বাবুরামকে অর্পণ করে দিয়েছে ঠাকুরের পদসেবায়। পরিপূর্ণ-চিত্তে।

'যমে নিলে যতটা শোক না হয় তার চেয়ে বেশি হয় ছেলে সংসারবিরাগী হলে।' বললেন ঠাকুর।

কিন্তু বাবুরামের মা মূর্তিমতী প্রশান্তি। বলরামের অসুখ করেছে, তার গায়ে হাত বুলোচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'রুগীকে আমি ছুঁতে পারি না, রোগের যাতনায় ভগবানকে ভুলে থাকে বলে। কিন্তু বলরামের কথা আলাদা। রোগের

মধ্যেও ওর মন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন।'

ভাইয়েদের উপর জমিদারির ভার তুলে দিয়েছে। বাঁধাবরাদ্দ মাসোয়ারা নিয়েই সে খুশি। কিন্তু সে টাকায় যেন ইদানীং সঙ্কুলান হচ্ছে না তা নিয়ে একদিন আক্ষেপ করল বলরাম। নরেন কাছে ছিল, বলে উঠল, 'নিজের বিষয় নিজে দেখলেই তো হত। বেশ থাকতে পারতেন স্বচ্ছন্দে।'

কথাটা যেন মর্মে লাগল এসে বলরামের। বললে, 'নরেনবাবু, গড অলমাইটি। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। প্রভু আর তাঁর সন্তানদের সেবা করছি আমি। আমি কি করে বিষয়ী হব?'

সেই বলরামকে ফেরাতে এসেছে হরিবল্লভ। শ্যামপুকুরে ঠাকুর তখন অসুস্থ, একদিন এসেছে বলরাম। মুখখানি চিন্তাম্লান। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কি হয়েছে? কিসের এত ভাবনা?'

বলরাম বললে যা বলবার।

'কি রকম লোক তোমার এই ভাইটি?'

'এমনিতে ভালো। ঈশ্বরবিশ্বাসী। দোষের মধ্যে এই, শুধু ঈশ্বর নয়, যা শোনে তাই বিশ্বাস করে বসে।'

'তা করুক। একদিন এখানে আনতে পারো?'

'জানি না আসবে কিনা। এত সব বাজে কথা শুনেছে আপনার সম্বন্ধে, বোধহয় চাইবে না আসতে।'

'তা হলে এক কাজ করো। গিরিশকে ডাকো।'

এল গিরিশ। কি ব্যাপার? হরিবল্লভ? হরিবল্লভ বোস? বা, ও আর আমি যে একসঙ্গে পড়েছি। আমি ঠিক ওকে নিয়ে আসতে পারব। পরদিনই টেনে নিয়ে এল গিরিশ।

'ঐ দেখ আমি বলেছিলাম না, কেমন শিশুর মতো সরল দেখতে।' হরিবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভাবাকুলস্বরে বলতে লাগলেন ঠাকুর: 'যার হৃদয় ভক্তিতে ভরপুর নয় তার কি অমন চোখ হতে পারে?' তারপরে হরিবল্লভকে সবিশেষ লক্ষ্য করলেন। 'ভেবেছিলুম কটকের সরকারী উকিল কত না জানি তোমার চোটপাট, কিন্তু এখন দেখছি বিনম্র, অকিঞ্চন—'

ঠাকুরকে অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করল হরিবল্লভ। এ কার সম্বন্ধে শুনেছিল সে? এ কে পীযূষপুঞ্জদৃষ্টি কোমলগাত্রপবিত্র মধুমঙ্গলপ্রিয়।

'শুধু তাই নয়, আমার আত্মীয় আপনি। বলরাম যেমন আত্মীয়। কি বলেন?'

ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিল হরিবল্লভ। বললে, 'আপনার দয়া।'

গলে গেল সমস্ত কাঠিন্য। উড়ে গেল সমস্ত বিমুখতা। এই করুণাঘনের কাছে বসতে ইচ্ছা হল ঘন হয়ে।

'মেয়েরাও পায়ের ধুলো নেয়। তা ভাবি, তিনিই একরূপে আছেন ভিতরে—এ প্রণাম তাঁর, আর কারু নয়।'

'বা, আপনি তো সাধু।' বললে হরিবল্লভ, 'আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি।'

হরিবল্লভের দোষদৃষ্টি ঘুচে গেল মুহূর্তে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি কি! সে ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ কপিল কেউ এলে হত। আমি রেণুর রেণু।' তাকালেন হরিবল্লভের দিকে। 'আপনি আবার আসবেন।'

'আপনি বলছেন কেন?'

'বেশ, আবার এসো।'

'বলতে হবে কেন, নিজের টানেই আসব।'

'বলরাম অনেক দুঃখ করে। মনে হল একদিন যাই, গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে বলো, একে কে আনলে?'

বড় লজ্জিত হল হরিবল্লভ। যেন ধরা পড়ে গেছে। পাশ কাটাবার চেষ্টায় বলল, 'ও সব কথা কে বলেছে? আপনি কিছু ভাববেন না।'

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপায় নেই, পথও নেই। একেবারে ঢেলে দিতে হবে পায়ের উপর। নৈবেদ্য করে দিতে হবে দেহ-মন! বড়লোক বলেই তো এটুকু অহংকার! ঈশ্বরকৃপা না থাকলে খুব বড়লোকও অপদার্থ হয়ে যায়। যদু বংশ ধ্বংসের পর অর্জুন আর পারল না গাণ্ডীব তুলতে। যাবার আগে ঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে গেল হরিবল্লভ। ঠাকুর পা গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়বার পাত্র নয়। আর সে ছাড়বে না এ প্রাণজীবনকে। জোর করে টেনে নিল দু পা। ধুলো নিল ললাটে। নীরোগনির্মল হয়ে গেল। জীবনের চক্রাবর্তের মধ্যে খুঁজে পেল ধ্রুব বিন্দু। এসেছিল বলরামকে নিয়ে যেতে, নিজেই বাঁধা পড়ল। ঐ যে বাপ বলেছিল নেশাখোর ছেলেকে, কি মধু যে পাস ঐ মদে কে জানে। ছেলে বলেছিল, একটু খেয়েই দেখ না। বাপ খেল, দেখি কি ব্যাপার। খেয়ে উঠে ছেলেকে বললে, ও তুমি ছাড় বাপু, আমি আর ছাড়ছিনে। সেই অবস্থা!

হরিবল্লভ চলে গেলে পর বললেন ঠাকুর, 'কেমন ভক্তি দেখেছ! নইলে জোর করে পায়ের ধুলো নেয়।'

পরে মাস্টারকে বললেন চুপিচুপি, 'সেই যে তোমায় বলেছিলাম না ভাবে দেখলাম দুজন লোক। একজন ডাক্তার, মহেন্দ্র ডাক্তার, আর, আরেকজন এই লোক, এই হরিবল্লভ। তাই দেখ এসেছে।'

আবার এসেছে। এবার নিচে মাটির উপর বসে ঠাকুরকে পাখা করছে হরিবল্লভ।

কিন্তু হরীশের সর্ববিসর্জন। সব ছেড়েছুড়ে ডেরা নিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। বলে, 'উপায় নেই, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে। নইলে টাকা দেবে না ব্যাংক।'

মহিমাচরণ বেদান্তচর্চা জ্ঞানচর্চা করে, হরীশ রাগভক্তির আখড়াধারী।

'জ্ঞান কি জানিস?' ঠাকুর বোঝাচ্ছেন হরীশকে। 'স্বস্বরূপকে জানা। মায়াই দেয় না জানতে। যেন সোনার উপর ঝোড়াকতক মাটি পড়েছে সেই মাটিটা ফেলে

দেওয়া। ঐ মাটিটাই মায়া।'

'আর রাগভক্তি ?'

'যেমন একটা পোড়োবাড়ির বনজঙ্গল কাটতে-কাটতে নলবসানো ফোয়ারা পেয়ে যাওয়া। মাটি সুরকি ঢাকা ছিল, যাই ঢাকা সরে গেল ফরফর করে জল উঠতে শুরু করল।'

প্রকৃতিভাব হরীশের, মেয়ের কাপড় পরে শোয়। অথচ নিজের স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে এসেছে। ঠাকুর তাকে বলছেন, 'ওরে যা না একবার বাড়ি। তোর বউ খায় না, ঘুমোয় না, খালি কাঁদে। একবারটি তাকে দেখা দিয়ে এলে কি হয় ?'

মুখ গোঁজ করে বসে থাকে হরীশ ঃ কানে আঙুল দেয় মনে-মনে।

'কাঁচ মেয়েটাকে একটু দয়া করতে পারিসনে ? দয়া কি সাধুর গুণ নয় ? ওরে তাকে যদি একটু বোঝাস সে ঠিক বুঝবে।'

দয়া দেখাতে গিয়ে দায়ে পড়ে যাই আর কি। চোখের জল দেখে ফের ব্যাধের জালে জড়িয়ে পড়ি। ঠাকুর কি আমাকে পরীক্ষা করছেন ?

১২৩

'ভয় কি রে ? আমি আছি। তারককেও তাই বলছেন ঠাকুর। 'স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। একটু ধৈর্য ধর, মা সব ঠিক করে দেবেন। মাঝে-মাঝে যাবি বাড়িতে, যেমন-যেমন বলে দেব তেমন-তেমনটি করবি। দেখবি স্ত্রী সঙ্গে থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

রাখালকেও পাঠিয়েছি অমনি তার স্ত্রীর কাছে। ভয় কিসের ? আমি আছি। দুস্তর সমুদ্রে আমিই দীপস্তম্ভ। বিপথ-বিপদের অন্ধকারে আমিই অরুণোদয়। নিদারুণ নৈষ্ফল্যের মধ্যে আমিই মঙ্গলস্বরূপ। যদি কিছু থাকে এ বিশ্বলোকে, যদি কোনো শ্রী—সমস্ত বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোনো শৃঙ্খলা—তবে আমি আছি।

আফিসে কাজ করত তারক, ছেড়ে দিল। আর যখন রাখালের বেলায় কথা উঠল তাকে চাকরিতে বসিয়ে আবদ্ধ করবে তখন ঠাকুরকে এসে জানাতেই ঠাকুর বললেন, 'খবরদার, ঈশ্বরের জন্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস এ বরং শুনব তবু কারুর দাসত্ব করছিস চাকরি করছিস এ কথা যেন না শুনি।'

কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় অন্য কথা। কেন হবে না ? সেও চাকরি করছে বটে, কিন্তু মা'র ভরণপোষণের জন্যে।

'মা'র জন্যে কর্ম করে, তাতে দোষ নেই।' বলছেন ঠাকুর। 'আহা মা ! মা ব্রহ্মময়ীস্বরূপা !'

মা নেমে আয়, নেমে আয়। একদিন হঠাৎ তারকের বুকে পা রাখলেন ঠাকুর। মাথায় হাত বুলুতে-বুলুতে বলতে লাগলেন, নেমে আয় মা, নেমে আয়। যেমন

রাখালের জিভ টেনে ধরে সাঙ্কেতিক মন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন তেমনি তারকের জিভে নখাগ্র দিয়ে লিখে দিলেন বীজমন্ত্র। কুণ্ডলীপাকানো সাপ হেলে-দুলে উঠল। করল ফণাবিস্তার।

কেমন ভাবে শুবি ? ভক্ত সন্তানদের শেখাচ্ছেন ঠাকুর : 'প্রথমটা চিত হয়ে শুবি। ভাববি মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন বুকের উপর। এই ভাবে মায়ের ধ্যান করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়বি। দেখবি সুস্বপ্ন হবে।'

রাত দুপুরে উঠে পড়েছেন কখন। ওরে তারক, আমাকে একটু গোপালনাম শোনা তো ! নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

যদি কাউকে না পান, দারোয়ানকে ডাকিয়ে আনেন। আমাকে একটু রামনাম শোনাও দারোয়ানজী। শুধু নাম। সীতারাম। জীবনের সমস্ত শীতে যে আরাম সেই সীতারাম।

তারকের সময়-সময় ইচ্ছে হয় ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদে। কেন কাঁদবে ? তা জানে না। দুঃখে না আনন্দে, তাও না। দুঃখের আনন্দে না আনন্দের দুঃখে, তা বা কে বলবে ? এমনি অহেতুক কাঁদব। সব চেয়ে বড় কথা, কাঁদতে ভালো লাগবে। একদিন সত্যি-সত্যি বকুলতলার কাছে পোস্তার উপর বসে খুব খানিকটা কাঁদল তারক।

'ওরে ওরে দ্যাখ তো, তারক কোথায় গেল ?' ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কান্না ঠিক তাঁর কানে গেছে। আর অমনি চঞ্চল হয়েছেন। ডাকিয়ে আনলেন তারককে। কাছে বসালেন। বললেন, 'কাঁদছিস ? খুব ভালো কথা। ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।'

কাঁদতে-কাঁদতে ধ্যান, তন্ময়তা। কান্নাতেই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। ধ্যান হত গিয়ে এঁড়েদার বিষ্ণুর। ধ্যানে কাঠ মেরে যেত। সবাই ধাক্কা মারছে, তবু নিঃসাড়। কত ডাকাডাকি, বিষ্টু, ও বিষ্টু কোথায় কে। নাকের নিচে হাত রাখো, নিশ্বাসের রেখা নেই। তখন সবাই খবর দিতে ছুটল ঠাকুরকে। ঠাকুর এসে ছুঁয়েছেন কি, বিষ্ণু চোখ মেলেছে। সূর্যের স্পর্শে জেগেছে অরবিন্দ। ছোকরা বয়েস, ইস্কুলে পড়ে। এরই মধ্যে এত !

ঠাকুর বললেন, 'পূর্বজন্মের সংস্কার। গভীর বনে ভগবতীর আরাধনা করছে একজন। আরাধনা করছে শবের উপর বসে। কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নানারকম বিভীষিকা দেখছে। শেষকালে মূর্তিমান বিভীষিকা বাঘ তাকে ধরে নিয়ে গেল। আরেকজন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে বসেছিল। সে ভাবলে এই ফাঁকে একটু শবসাধন করে নি। পুজোর সমস্ত উপকরণ তৈরি, আচমন করে একটু বসে পড়ি শবের উপর। যেই ওকথা মনে এল তরতর করে নেমে এল গাছ থেকে। আচমন করে শবের উপর বসে জপ করতে লাগল। একটু জপ করতে না করতেই ভগবতী আবির্ভূত হলেন। বললেন, প্রসন্ন হয়েছি, বর নাও। তখন সে লোক বললে, মা, এ কী কাণ্ড। ঐ লোকটা অত খেটেপিটে অত আয়োজন করে তোমার সাধন করছিল, তোমার দয়া হল না, আর আমি ওর ছাড়া-আসনে বসে কি একটু

জপ করলুম আর অমনি আমাকে দর্শন দিলে! ভগবতী তখন হাসিমুখে বললেন, বাছা, তুমি কি জন্মান্তরের কথা কিছু জানো? তুমি কত জন্ম আমার জন্যে তপস্যা করেছ তা কি তোমার মনে আছে? এই একটু শুধু বাকি ছিল, আজ এই দণ্ডে তা পূরণ হয়ে যেতেই আমার দর্শন পেলে। এখন বলো কি বর পছন্দ?'

সেই বিষ্ণু গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শুনে অবধি ঠাকুরের মন খুব বিষণ্ণ। বললেন, 'অনেক দিনই বলত আমাকে—সংসার ভালো লাগে না। পশ্চিমে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল, সারা দিন এখানে-সেখানে মাঠে-নির্জনে পাহাড়ে-বনে বসে শুধু ধ্যান করত। আমাকে বলত কত ঈশ্বরীয় রূপ সে দর্শন করে। বোধহয় এই শেষ জন্ম। পূর্বজন্মে অনেক করা ছিল, বাকিটুকু সেরে নিল এ জন্মে, এই কটি অল্প বছরের মধ্যে।'

'কিন্তু আত্মহত্যা শুনে ভয় হয়।' বললে একজন ভক্ত।

'আত্মহত্যা মহাপাপ। ফিরে-ফিরে আসতে হবে সংসারে আর জ্বলতে হবে দাবাগ্নিতে। তবে কেউ ঈশ্বরদর্শন করে দেহত্যাগ করে স্বেচ্ছায়, তবে তাতে আর দোষ নেই। তাকে বলে না আত্মহত্যা। যখন একবার সোনার প্রতিমা ঢালাই হয়ে যায় মাটির ছাঁচে, তখন মাটির ছাঁচ ভেঙে ফেললে আর দোষ কি।'

আত্মহত্যা কি রকম জানো? জেল থেকে কয়েদী পালানো। জেল থেকে পালিয়ে কয়েদীর রেহাই নেই, এক সময় না এক সময়ে সে ধরা পড়বেই। তখন তার দ্বিগুণ খাটনি। প্রথম, তার প্রথম মেয়াদের বাকি অংশ; দ্বিতীয়, জেল-পালানোর জন্যে অতিরিক্ত দণ্ড। তাই আত্মহত্যা অর্থে দ্বিগুণ কারাবাস।

ওরে এবার তোরা ভিক্ষেয় বেরো। ঠাকুর ডাকছেন তাঁর ভক্ত-সন্তানদের। ওরে কাঁধে ঝুলি নে, নগ্ন পায়ে ফের গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে। নীরবে নম্রমুখে গিয়ে দাঁড়া। যাতে তোকে দেখলেই বুঝতে পারে তুই দীনহীন, তুই ভিক্ষুক—

ভিক্ষেয় বেরুব?

হ্যাঁ, অভিমান নাশ করতে হবে, নির্মূল করতে হবে। নত হতে হবে প্রত্যেকের সামনে। পায়ের নিচে মাটির ঢেলার মতো অহংকারকে ধুলো করে দিতে হবে। দ্বারে-দ্বারে নিষেধ দ্বারে-দ্বারে প্রত্যাখ্যান তবু অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে চিত্তের প্রসন্নতা। চতুর্দিকে নৈরাশ্য, তবু তার ঊর্ধ্বে জাগ্রত রাখতে হবে নিষ্ঠার জয়-নিশানা। ওরে ভিক্ষেয় বেরো। অহমিকাকে কুহেলিকার মত উড়িয়ে দে। জীবনের দৈন্যের গহ্বরকে গভীর করে তোল। ভিক্ষার সুধায় ভরে তোল সেই বিরহের পাত্র। সবচেয়ে সহজ কে? ঈশ্বর। দুঃখ কি? অসন্তোষ। সুখ কি? আত্মবোধের যে শান্তি। শত্রু কে? গুরুবাক্যে সংশয়। প্রেয়সী কে? দীনে করুণা ও সজ্জনে মৈত্রী। শোভা কি? নিস্পৃহতা। তৃপ্তি কি? সর্বসঙ্গবিরতি। কামধেনু কি? অনঘা শ্রদ্ধা।

বলরামের সঙ্গে রাখাল বৃন্দাবনে গিয়েছে। শরীর টিকছে না কলকাতায়। যদি বৃন্দাবনে গিয়ে ভালো হয়, আনন্দে থাকে। ওমা, সেই বৃন্দাবনে গিয়ে ফের রাখালের অসুখ করেছে।

'কি হবে !' ঝরঝর করে বালকের মতো কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। 'ওরে ও যে সত্যিই ব্রজের রাখাল। যদি ওর নিজের জায়গা পেয়ে আর ফিরে না আসে ! যদি স্বস্থানে শরীর রাখে !'

রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠানো হলো কিন্তু উত্তর নেই। মা'র কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। পরিত্রাণপরায়ণা ভক্তাভীষ্টকরী বিশ্বেশ্বরীর কাছে। মা, আমার রাখালকে ফিরিয়ে দে। ও আমার গোপাল, ও আমার নিত্যসঙ্গী। আমার হাড়ের হাড়। আমার নয়নের নয়ন !

রাখালের চিঠি এসেছে। লিখেছে মাস্টারকে। লিখেছে এ বড় ভালো জায়গা। এখানে ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করছে—

শুনে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে। তার জন্যে চণ্ডীর কাছে মানসিক করেছিলুম। সে যে বাড়িঘর ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল। তাকে আমিই তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের যে তখনো বাকি ছিল ! আহা, কি লিখেছে দেখ ! ময়ূর-ময়ূরী নৃত্যে করছে। লিখবেই তো ! ওর যে সাকারের ঘর। বৃন্দাবন থেকে ফিরে পিতৃগৃহে উঠেছে রাখাল। ঠাকুরের অভিমান নেই। বললেন, 'রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে।'

'আপনার সামনে একটি ব্রহ্মচক্র রচনা করে সাধনা করি এ আমার ইচ্ছে।' একদিন বললে মহিমাচরণ।

বেশ তো ! রাজী হলেন ঠাকুর। কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে রচিত হল সেই ব্রহ্মচক্র। মাস্টার, কিশোরী আর রাখাল বসেছে সেই চক্রে। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু গঙ্গার ছলছলানি যা একটু শোনা যাচ্ছে। আর ঝিল্লির অস্ফগুঞ্জন। মহিমাচরণ সবাইকে বললে ধ্যানস্থ হতে। ছোট খাটটিতে বসে একদৃষ্টে দেখছেন ঠাকুর। ধ্যান শুরু হতে না হতেই রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত। ঠাকুর নেমে এসে রাখালের বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন মা'র নাম। ব্রহ্মচক্রে বসে রাখালই ব্রহ্মানন্দ।

'রাখালকে দিয়ে মা কত কি দেখালেন। ওরে সব কথা বলতে নেই, বলতে বারণ।' তোমাকে জানি আমার সাধ্য কি ! আনন্দে যে তুমি আমার কাছে একটু ধরা দিয়েছ এতেই আমি তোমার আপন হয়ে গেছি। আমার শরীরে এই যে বহমানা প্রাণধারা এ তো তোমারই নামজপমালা।

৯২৪

একটা চিল একটা মাছ মুখে করে উড়ে যাচ্ছে, আর-সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল।' বলছেন ঠাকুর। 'মহাযন্ত্রণা। তখন চিল করলে কি ! মাছটা ফেলে দিলে মুখ থেকে। ব্যস নিশ্চিন্দি। তখন তার মহানিস্তার।'

'অতএব চিল তোমার গুরু। তার থেকে শিখলে অপরিগ্রহ। শিখলে

অকিঞ্চনতা গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়।' বললেন ঠাকুর। 'বাণলিঙ্গ শিব খুঁজছিল একজন। কোথায় পাবে কে জানে। তখন একজন বলে দিল, অমুক নদীর ধারে যাও, অমুক গাছ দেখতে পাবে সেখানে সেই গাছের কাছে দেখতে পাবে ঘুরনি-জল। সেই জলে গিয়ে ডুব দাও, পাবে বাণলিঙ্গ। তাই বলি সন্ধান নিয়ে ডোবো।'

প্রথম গুরু পৃথিবী। কি শিখলে পৃথিবীর কাছ থেকে? আপন ব্রতে অচল থাকবার বুদ্ধি। কত উৎপাতে আক্রান্ত হচ্ছে তবু অবিচল। আর শিখবে ক্ষমা। সহিষ্ণুতা। দ্বিতীয় গুরু বৃক্ষ।

কি শিখলে বৃক্ষের কাছ থেকে? পরার্থে জীবনধারণ। কেটে ফেললেও কিছু বলে না, রৌদ্রে শীর্ণশুষ্ক হয়ে গেলেও জল চায় না। 'তবু যেন কাটিলেও কিছু না বোলায়। শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয়।' অস্নেহে-অসেবায়ও ফলধারণ করে, আর যারা স্নেহ-সেবা করেনি তাদেরই জন্যে করে সেই ফলোৎসর্গ।

তৃতীয় গুরু বায়ু। গন্ধবহন করে কিন্তু লিপ্ত হয় না। তেমনি বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়েও বাক্য ও বুদ্ধিকে আবিকৃত রাখব। শিখব অনাশক্তি। চতুর্থ আকাশ। অনন্ত হয়েও সামান্য ঘটের মধ্যে এসে ঢুকেছে। ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘলোকে অথচ মেঘ তাকে ছুঁতে পাচ্ছে না। তেমনি আত্মা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও অস্পৃষ্ট। তেমনি আকাশের মত অসঙ্গ হও। তারপর জল।

কি শিখবে জলের থেকে? স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা, মধুরতা। জল যেমন নির্মল করে তুমিও তেমনি দর্শন ও কীর্তন দ্বারা বিশ্বভুবন পবিত্র করো। ষষ্ঠ গুরু, অগ্নি। কাঠের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত, নিগূঢ়। প্রতি কণা কাঠে প্রতি কণা অগ্নি। তেমনি সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বর গুপ্তরূপে অনুস্যূত। প্রদীপ্ত হলেই অগ্নি সমস্ত মালিন্য দগ্ধ করে অথচ সেই মালিন্যস্পর্শে নিজে কলুষিত হয় না। তেমনি তুমিও তেজে ও তপস্যায় প্রদীপ্ত হও, যারই সেবা পাও না কেন, পাপমলে লিপ্ত হয়ো না। আগুনের নিজের কোনো উৎপত্তিবিনাশ নেই। উৎপত্তিবিনাশ শিখার, আগুনের নয়। পরের গুরু, চন্দ্র। হ্রাসবৃদ্ধি হয় কার? চন্দ্রকলার, চন্দ্রের নয়। তেমনি জেনে রাখো যা কিছু জন্মমৃত্যু সব দেহের, আত্মার নয়। চন্দ্র গুরু হলে সূর্যও গুরু।

কী শিখবে সূর্যের থেকে? আত্মা যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেই তত্ত্ব। পাত্রে জল আছে তার উপরে পড়েছে সূর্যকিরণ। জলপাত্রের আকারভেদে সূর্যকিরণকে ভিন্ন-ভিন্ন সূর্যরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে সূর্য এক, অনন্য। তেমনি উপাধিভেদে আত্মাকে ভিন্ন-ভিন্ন আত্মা মনে হয়। আসলে আত্মা এক, দ্বিতীয়রহিত। আরো কিছু শেখবার আছে সূর্যের কাছে। সূর্য পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে আবার পৃথিবীকেই প্রত্যর্পণ করে। তুমিও তেমনি বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে অর্থীদের বিতরণ করো। নবম গুরু, কপোত। কপোতের কাছ থেকে শিখবে অতিস্নেহ বা আসক্তিবর্জন। কি হয়েছিল শোনো। এক কপোত কপোতীর প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে বাসা বাঁধল বৃক্ষচূড়ে। স্বাধীন বিচরণের আনন্দ

আর রইল না। কালক্রমে সন্তান হল কতগুলি। সংসারবাসের এই বা কম আনন্দ কি! এই সুখস্পর্শ মধুর কূজন, এই অঙ্গচেষ্টা। একদিন আহারের খোঁজে গিয়েছে দুজনে, শাবকগুলি মাটির উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় এক দুরন্ত ব্যাধ এসে উপস্থিত। জাল ফেলে সহজেই ধরে ফেলল বাচ্চাগুলোকে। মা মায়ামুগ্ধা কপোতী, এসে দেখে সর্বনাশ। রোদন করতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে নিজেও সেই জালের মধ্যে আটকা পড়ল। কপোত এসে দেখল, স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই চলে যাচ্ছে তাকে ফেলে। এ সব স্নেহপুত্তলীদের ছেড়ে কি করে থাকব বৃক্ষনীড়ে, আর কেনই বা থাকব? এই বিবেচনা করে সে নিজের থেকেই ঢুকল গিয়ে জালের মধ্যে। ব্যাধ তো সিদ্ধকাম। এক জালে এতগুলো পাখি ধরতে পারবে এ তার কল্পনার অতীত। অত্যাসক্তির জন্যেই কপোত-কপোতীর এই ছিন্নদশা। সুতরাং স্নেহপ্রসঙ্গে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। তারপর অজগর। অজগর কী করে? যথালব্ধ দ্রব্যদ্বারা শরীরমাত্র নির্বাহ করে। যদি কিছু নাও জোটে, নিশ্চেষ্ট হয়ে ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে। তেমনি অজগরকে দেখে সর্বারম্ভপরিত্যাগী হও।

তারপর চেয়ে দেখ সমুদ্রের দিকে। প্রসন্ন, গম্ভীর, দুর্বিগ্রাহ্য ও দুরত্যয়। তেমনি হবে সমুদ্রের মত। আর কী? বর্ষায় জলাগমে স্ফীত হয় না, গ্রীষ্মে জলাভাবে শুষ্ক হয় না। তেমনি নিরভিমান তেমনি নিত্যরস চিরপরিপূর্ণ থেকো।

দ্বাদশ গুরু পতঙ্গ। কামমূঢ় হয়ো না। আগুনে মুগ্ধ হয়ে পুড়ে মরে পতঙ্গ তেমনি বস্ত্রাভরণসজ্জিত নারী দেখে উড়ে পড়ো না। বিরত থাকো। দৃঢ়ব্রত হও। ত্রয়োদশ, মধুকর। ছোট-বড় নামী-অনামী সকল ফুল থেকেই ভ্রমর মধু আহরণ করে। তেমনি ছোট-বড় মানী-অমানী সকলের কাছ থেকেই সারসংগ্রহ করবে। আর কী শিখবে? শিখবে সঞ্চয়নিবৃত্তি। মৌমাছি যে মধু সঞ্চয় করে, অন্যে এসে কেড়ে-ধরে নিয়ে যায়। তেমনি কৃপণের ধন যায় সেয়ানের পেটে।

আরেক গুরু, হাতি। করিণীর অঙ্গসঙ্গ লাভের জন্যে গর্তে পড়ে বাঁধা পড়ে। সুতরাং যে সন্ন্যাসী সে দারুময়ী যুবতিমূর্তিকেও ছোঁবে না পা দিয়ে।

পরের গুরু, হরিণ। হরিণ ধরা পড়ে ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হয়ে। ঋষ্যশৃঙ্গও নারীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিল সংসারে। সুতরাং নৃত্যগীত সেবা করবে না। তারপরে মৎস্য। রসে জিতে সর্বং জিতং। রসনা জয় করতে পারলেই সর্বজয়ী হলে। আমিষযুক্ত বড়িশ দিয়েই মাছ ধরে। সুতরাং সর্ব অর্থে রসনাকে সংযত করো।

আরেক গুরু পিঙ্গলা।

বিদেহনগরের গণিকা এই পিঙ্গলা। একদিন বেশভূষা করে প্রণয়ীর আশায় অপেক্ষা করছে গৃহদ্বারে। এ এল না, ও নিশ্চয়ই আসবে এমনি ভাবছে পথচারীদের লক্ষ্য করে। একবার ঘরে ঢোকে, আবার দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। আশা নিরাশায় দুলছে এমনি সারাক্ষণ। প্রায় মধ্যরাতও বুঝি কেটে যায়। তখন মনে মনে নির্বেদ এল পিঙ্গলার। ছি-ছি, নিজ দেহ বিক্রয় করে অন্য দেহ থেকে

রতি আর বিত্ত আশা করছি। যিনি সর্বদা সমীপস্থ, যিনি রতিপ্রদ বিত্তপ্রদ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দুঃখভয়-শোকমোহের আকর তুচ্ছ দেহকে ভজনা করছি। না, এ অপমান সহনাতীত। সর্বদেহীর যিনি সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ আর আত্মা, তাঁর নিকট দেহ বিক্রয় করে লক্ষ্মীর মত তাঁর সঙ্গেই আমি রমণ করব। এখন যেহেতু কামনাভঙ্গজনিত নৈরাশ্য আমার মনে এসেছে ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হয়েছেন। অতএব বিষয়সঙ্গহেতু যে দুরাশা তা ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নিলাম। শান্তি পেল পিঙ্গলা। শয্যায় গিয়ে সুখে ঘুমিয়ে পড়ল। আশাই দুঃখের কারণ, আশাত্যাগই পরম সুখ।

অষ্টাদশ গুরু, বালক। অজ্ঞ বালক। মান নেই অপমান নেই চিন্তা নেই ভাবনা নেই লজ্জা ঘৃণা ভয় কিছু নেই। বালকের থেকে শেখ আত্মক্রীড়তা। আত্মক্রীড় হয়ে সংসারে অবস্থান করো।

অন্য গুরু, কুমারী। হাতে কয়েক গাছি কঙ্কণ, ঘরে বসে ধান কুটছে কুমারী। মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে কঙ্কণের। বাইরে উৎকর্ণ পথিক দাঁড়িয়ে পড়েছে কঙ্কণের শব্দে। নিশ্চয়ই এ কোনো কুমারীর গৃহকাজ, তারই হাত দুটির নড়াচড়া। কঙ্কণনিক্কণে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে ফেলেছে। তখন কী করে কুমারী! দুগাছি রেখে বাকি কঙ্কণ খুলে নিল হাত থেকে। সে কি, এখনো একটু-একটু শব্দ হচ্ছে যে। দেয়ালের বাইরে এখনো লোকে কান খাড়া করে আছে। তখন আরো একগাছি খুলে ফেলল। মোটে একগাছি রাখল তার মণিবন্ধে। আর শব্দ নেই। সেই এককঙ্কণন্যায় একাকী থাকো। কুমারীর থেকে শেখ সঙ্গরাহিত্য।

পরের গুরু, শরনির্মাতা। শরনির্মাতা যখন একমনে শর সরল করে তখন সমুখ দিয়ে ভেরীঘোষসহ রাজাও যদি চলে যায় টের পাবে না। তেমনি মনকে এক বস্তুতে, সার বস্তুতে যুক্ত করো। তারপর, সর্প। পরকৃত গর্তে বাস করে সাপ। একা ঘুরে বেড়ায়। সাপের থেকে শেখ অনিকেতনতা। ঊর্ণনাভ আরেক গুরু। কী করে মাকড়সা? নিজের হৃদয় থেকে মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে। সেই জালের মধ্যেই বাস করে বিহার করে। আবার শেষকালে নিজেই গ্রাস করে সেই জাল। তবে এই শেখ মাকড়সা থেকে যে ঈশ্বরই সৃষ্টি করছেন স্থিতি করছেন আবার সংহারও করছেন। আরেক গুরু, কীট। এমন কীট আছে যে অন্য কীট কর্তৃক ধৃত হয়ে নীত হয় তার বিবরে। তখন ভয়ে-ভয়ে সে আততায়ী কীটের ধ্যান করতে করতে তারই আকারপ্রাপ্ত হয়। তেমনি তন্ময় হয়ে ভগবানের ধ্যান করো। তাঁর সারূপ্যলাভ হয়ে যাবে।

শেষ গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু তোমার নিজের দেহ।

নিজের দেহ? হ্যাঁ, এর সাহায্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করছ। বড় বিচিত্রচরিত্র এই গুরু। একে একটু বেশি সেবা করলেই নিয়ে যায় অধঃপাতে। একে শুধু প্রাণ-মাত্রধারণের উপযোগী ভোগ দাও, তোমাকে জ্ঞানবৈরাগ্য দেবে। আর কী দেখছ? দেখছ পরিবার বিস্তার করছে দেহ, সে পরিবারপালনের জন্যে কত ক্লেশকষ্ট, শেষে বৃক্ষের মতো দেহান্তরে বীজ সৃষ্টি করে নিজেকে নাশ করছে।

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানছে তেমনি মনকে টানছে নানা শক্তি, নানা ইন্দ্রিয়। সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করে সমচিত্ত হও।

শুধু একজনের কাছ থেকে নয়, বহুজনের কাছ থেকে, যার কাছ থেকে যেটুকু পারো, জ্ঞানকণা কুড়িয়ে নাও। তদ্‌গতান্তরাত্মা হও। যাকে ঠাকুর বলেন, 'ডাইলিউট হয়ে যাও।'

নাটমন্দিরে এক-একা পাইচারি করছেন ঠাকুর। যেমন সিংহ অরণ্যে একা থাকতে ভালোবাসে তেমনি। নিঃসঙ্গানন্দ।

শশধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখলে, ডাইলিউট হয়ে গেছে। কেমন বিনয়ী। আর সব কথা লয়।'

যে আসল পণ্ডিত সে সব কথাই নেবে। যখন যেটুকু পায়, যেখান থেকেই পাক। কোনো গোঁড়ামি নেই, বাঁধা-ধরা নেই, এক পাত্র ধরে আছি যেখান থেকে পারো দাও আমাকে স্নিগ্ধ হবার শরণাগত হবার মন্ত্র।

কিন্তু যাই বলো, শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে? কিছু তপস্যার দরকার। কিছু সাধ্যসাধনার। তবে জ্ঞান হলে কী হয়? ঠাকুর বললেন শশধরকে দেখে, 'প্রথম চিহ্ন, শান্ত। দ্বিতীয়, অভিমানশূন্য। দেখ না শশধরের দুই চিহ্নই আছে।' দেরি করে এসেছে বলে ঠাকুর রসিকতা করছেন, 'আমরা সকলে বাসরশয্যা জেগে বসে আছি। বর কখন আসবে।'

ঠাকুরকে প্রণাম করে বসল শশধর। জিগগেস করল, 'আর কি লক্ষণ জ্ঞানীর?'

'আরো লক্ষণ আছে।' বলছেন ঠাকুর। 'সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে, যেমন লেকচার দেবার সময় সিংহতুল্য। আবার স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসিকশেখর।' সবাই হেসে উঠল।

শশধর জিগগেস করলে, 'কিরূপ ভক্তিতে তাঁকে পাওয়া যায়?'

'আমার বাপু জ্বলন্ত ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভক্তি তো তিনরকম। সাত্ত্বিক ভক্তি, সব সময়ে গোপনে রাখে নিজেকে। হয়তো মশারির মধ্যে বসে ধ্যান করে কেউ টেরও পায় না। আর রাজসিক ভক্তি—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। ষোড়শ উপচারে পূজা করে, গরদ পরে বসে গিয়ে ঠাকুরঘরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মালায় মুক্তো, মাঝে-মাঝে আবার একটি করে সোনার রুদ্রাক্ষ।'

'আর তামসিক?'

'যাকে বলে ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি।' বলতে-বলতে ঠাকুরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগায় ভয় নেই, মুখে কেবল মারো, কাটো, লোটো। উন্মত্ত হুঙ্কার, হর হর ব্যোম ব্যোম। মনে খুব জোর। খুব বিশ্বাস। একবার নাম করেছি, আমার আবার পাপ!'

এই তমোগুণেই ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরের কাছে জোর করো। রোক করো। তিনি তো পর নন, আপনার লোক, আমার সব কিছু। তাঁর কাছে আবার ঢাকব কি, লুকোবো কি? তিনিই তো আমাকে ভক্ত করে দীপ্ত করলেন। আমার লজ্জাহরণ করলেন। তাই নির্লজ্জের মত ধরব এবার আঁকড়ে। আর ছাড়ানছোড়ন নেই।

দেখ আবার সেই তমোগুণই পরের ভালোর জন্যে প্রয়োগ করা যায়। যে বৈদ্য শুধু রোগীর নাড়ী টিপে 'ওষুধ খেয়ো হে', বলে চলে যায়, রুগী খেল কিনা খোঁজ নেয় না, সে অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য রুগীকে ওষুধ খেতে বোঝায় অনেক করে, মিষ্টি কথায় বলে, 'ওষুধ না খেলে কেমন করে ভালো হবে, লক্ষ্মীটি খাও, এই দেখ আমি ওষুধ মেড়ে দিচ্ছি,' সে মধ্যম বৈদ্য। আর উত্তম বৈদ্য কে? রুগী কোনোমতেই খেল না দেখে সে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। কি, খাবে না কি, জোর করে জবরদস্তি করে খাইয়ে দেব। এটা হল বৈদ্যের তমোগুণ। এতে রুগীর মঙ্গল, বৈদ্যেরও সাফল্য।

'তেমনি ভক্তির তমঃ। যেন ডাকাতপড়া ভাব। তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! আমি যেমনই ছেলে হই তুমি আমার আপন মা, তোমাকে দেনা দিতেই হবে।' বলে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন ঠাকুর:

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শংকরী।
নাশি গোব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপানাদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
ওমা, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর গাইছেন আর তাই শুনে কাঁদছে শশধর। পাণ্ডিত্যের তুষারপিণ্ড গলে গিয়েছে। ডাইলিউট হয়ে গিয়েছে।

১২৫

তবে এক গল্প শোনো: এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে সুন্দর একটি বাগান করেছে। নানারকমের গাছ, ফুলে-ফলে ভরা। সেদিন হল কি, একটা কার গরু ঢুকে পড়েছে বাগানে। ঢুকে পড়েই, বলা-কওয়া নেই, খেতে শুরু করে দিয়েছে গাছ-গাছালি। দেখতে পেয়ে বামুন তো রেগে টং। হাতের কাছে ছিল এক আস্ত-মস্ত লাঠি, তাই দিয়ে গরুর মাথায় মারলে এক ঘা। সেই ঘা এত প্রচণ্ড হল যে গরুটা মরে গেল তক্ষুনি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বামুন। গোহত্যা করে ফেললুম। হিন্দু হয়ে? এ পাপের কি আর চারা আছে? তখন তার মনে পড়ল বেদান্তে আছে, চোখের কর্তা সূর্য, কানের কর্তা পবন, হাতের কর্তা ইন্দ্র। ঠিকই তো, বামুন লাফিয়ে উঠল, এ গোহত্যা আমি করিনি, ইন্দ্র করেছে। যেহেতু ইন্দ্রের শক্তিতে হাত চালিত হয়েছে এ গোহত্যার জন্যে দায়ী ইন্দ্র। মন খাঁটি করলে বামুন। ফলে গোহত্যার পাপ তার শরীরে ঢুকতে পেল না, মনের দরজায় ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মন বললে, এ আমার নয়, ইন্দ্রের। আমাকে কেন, তাকে

গিয়ে ধরো। পাপ তখুনি ছুটল ইন্দ্রকে ধরতে। ব্যাপার শুনে ইন্দ্র তো অবাক। বললে, রোসো, আগে বামুনের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আসি। মানুষের রূপ ধরে ইন্দ্র তখন এল সেই বাগানে। ফুল-ফল লতাপাতা দেখে মন খুলে খুব প্রশংসা করতে লাগল। বামুনকে শুনিয়ে-শুনিয়ে। মশাই, বলতে পারেন এ বাগানখানি কার? জিগগেস করল বামুনকে। আজ্ঞে, এটি আমার করা। এ সব গাছপালা আমি পুঁতেছি। আসুন না, ভালো করে দেখুন না ঘুরে-টুরে। ইন্দ্র ঢুকল বাগানের মধ্যে। যেন কতই সব দেখছে এমনি ভাব করতে-করতে অন্যমনস্কের মত সে জায়গাটায় এসে উপস্থিত হল যেখানে সদ্যমৃত গরুটা পড়ে আছে। রাম, রাম, এ কি, এখানে গোহত্যা করলে কে! বামুন মহা ফাঁপরে পড়ল। এতক্ষণ সব আমি করেছি, সব আমার করা, বলে খুব বরফট্টাই করছিল, এখন মাথা চুলকোতে লাগল। তখন ইন্দ্র নিজরূপ ধরলে। বললে, তবে রে ভণ্ড, বাগানের যা কিছু ভালো সব তুমি করেছ আর গোহত্যাটিই কেবল আমি করেছি! বটে? নে তোর গোহত্যার পাপ। আর যায় কোথায়, পাপ এসে ঢুকে পড়ল ব্রাহ্মণের শরীরে। তাই বলি, যা করেন সব তিনি এই বলে নিজেকে ঠকিও না। নিজের বেলায় ভালোটি আর মন্দটি ভগবানের ঘাড়ে। ওটি চলবে না। ভালোমন্দ সব তাঁকে অর্পণ করে ভালোমন্দের ওপারে চলে যাও।

জ্ঞেয় বস্তু কি? সুখদুঃখরহিত ঈশ্বরই জ্ঞেয়। সুখদুঃখরহিত কোনো বস্তু আছে, থাকতে পারে? পারে। শীত আর গ্রীষ্মের সন্ধিস্থলে কি আছে? এমন একটি অনির্বচনীয় অবস্থা, যা শীতলও নয় উষ্ণ নয়। যদি শৈত্যোষ্ণতাজ্ঞানহীন বস্তু থাকা সম্ভব তাহলে সুখদুঃখবিহীন বস্তুর অস্তিত্বও মানতে হবে।

অমৃত সরকার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের ছেলে। সে অবতার মানে না।

'তাতে দোষ কি?' ঠাকুর বললেন স্নেহহাস্যে। 'ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সে দুটির একটি হচ্ছে বিশ্বাস, আর একটি শরণাগতি। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসেছেন এ বিশ্বাস কি করা সোজা? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরতে পারে? তাই কথা হচ্ছে যে পথে যাও যদি আন্তরিক হও ঠিক-ঠিক মিলে যাবে অমৃতে। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও সমান মিষ্টি।'

আবার, সাকারবাদীদের মতে একটি-দুটি দেবতা নয়, তেত্রিশ কোটি। হলই বা। কলকাতা শহরে হাজার-হাজার ডাকবাক্স। বড় পোস্টাফিসেই ফেল আর ছোট ঐ ডাকবাক্সেই ফেল, ঠিকানা যদি ঠিক-ঠিক লেখা থাকে, যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। একটি ডাক পাঠাও তাঁকে, তোমার পায়ে পড়ি। পাঠিয়ে একবারটি দেখ ঠিক পৌঁছয় কিনা।

'তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।' ডাক্তারকে বললেন ঠাকুর।

'সে তো আপনার চেলা।'

'আমার কোনো শালা চেলা নেই।' ঠাকুর হাসলেন। 'আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস। আমিই ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস।

চাঁদা মামা সকলের মামা।'

একটি যুবক ঠাকুরকে এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা এসে পড়ে।'

'আসুক না।' ঠাকুর নিশ্চিন্তের মত বললেন। 'কেন এল তাই বসে-বসে ভাবতে যাওয়া কেন? শরীরের ধর্মে আসে, আসবে। তাই বলে মাথা ঘামাবিনে। মাথা না ঘামালেই মাথা তুলতে পারবে না কাম। তা ছাড়া তোকে বলে দি কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'কিন্তু মনের ও ভাবটা যাবে কি করে?'

'হরিনামে। হরিনামের বন্যায় ভেসে যাবে সব আবর্জনা।'

যোগীনেরও সেই জিজ্ঞাসা। কাম যায় কিসে? শুধু হরিনামে যাবে এ সে মানতে রাজী নয়। কত লোকই তো হরি-হরি করছে, কারুরই তো যাওয়ার নমুনা দেখছি না। পঞ্চবটীতে এক হঠযোগী এসেছে, তার সঙ্গ করল। যদি কিছু আসন-প্রাণায়ামের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দিয়ে দমন করা যায় শত্রুকে। ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন নিজের ঘরের দিকে। 'তুমি আমার দিকে না গিয়ে এদিকে এসেছ, তাই না? তোকে, শোন্, বলি, ওদিকে যাসনি। ও সব হঠযোগ শিখলে ও করলে মন শরীরের উপরই পড়ে থাকবে সর্বক্ষণ, যাবে না ঈশ্বরের দিকে। আমি তোকে যা বলেছি সেই পথই ঠিক পথ। হরিনামের পথ। হরিনামের শব্দেই উড়ে যাবে পাপ-পাখি।'

নিজেকেই তবু বেশি বুদ্ধিমান বলে যোগীনের ধারণা। ভাবলে এসব ঠাকুরের অভিমানের কথা। পাছে তাঁকে ছেড়ে আর কারু কাছে যাই সেই ভয়েই অমনি একটা ফাঁকা উপদেশ দিয়েছেন। শেষকালে মনে কি ভাব এল, ঠাকুরের কথামতই দেখি না করে। লেগে গেল হরিনামের মহোৎসবে। ঠাকুরের কী অশেষ কৃপা, কয়েকদিনের মধ্যে ফল পেল প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কামক্রোধ ঈশ্বর দিয়েছেন কিসের জন্যে?

'মহৎ লোক তৈরি করবেন বলে।' বললেন ঠাকুর। 'মন্দ না থাকলে ভালোর মাহাত্ম্য কি! অন্ধকার না থাকলে আলোর দাম কে দেয়। সীতা বললেন, রাম, অযোধ্যায় সব যদি সুন্দর অট্টালিকা হত তো বেশ হত। অনেক বাড়ি দেখছি ভাঙা আর পুরানো। রাম বললেন, সব বাড়িই যদি সুন্দর হয়, নিখুঁত হয়, তো মিস্ত্রিরা করবে কি।'

থাক মন্দ থাক পাপ, থাক কামক্রোধ। শুধু সংযম করো, সাবধান হও। কত রোগের থেকে সাবধান হচ্ছ, সম্ভোগের জন্যেই কত অভ্যাস করছ সংযম। এও তেমনি। আর ঈশ্বরের চেয়ে বড় সম্ভোগ আর কি আছে!

'দেখ না এই হনুমানের দিকে চেয়ে। ক্রোধ করে লঙ্কা পোড়ালো, শেষে মনে পড়ল, এই রে, অশোকবনে যে সীতা আছেন। তখন ছটফট করতে লাগল।'

তাই তো বলি রাশ টানো। মদনকে দগ্ধ করলে শিব। মুগ্ধ করলে কৃষ্ণ। শিব মদনদহন। আর কৃষ্ণ মদনমোহন। দাক্ষিণাত্য বেড়াবার সময় রামচন্দ্র ঠিক

করলেন চাতুর্মাস্য করবেন। চাতুর্মাস্য কাটাবার জন্যে একটি পাহাড় মনোনীত করলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি শিবমন্দির। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, মন্দিরে যাও। শিবের অনুমতি নিয়ে এস। মন্দিরে গিয়ে শিবকে লক্ষ্মণ জানাল তাদের প্রার্থনা। শিব কিছুই বললেন না, শুধু অনামূর্তি ধারণ করলেন। অনামূর্তি মানে অদ্ভুত এক নৃত্যমূর্তি। নিজ লিঙ্গ নিজের মুখে পুরে নৃত্য করছেন। লক্ষ্মণ ফিরে এল রামের কাছে। তাঁকে বললে সব আগাগোড়া। শুনে রাম উৎফুল্ল হলেন। লক্ষ্মণ বললে, বুঝলুম না কিছু। রাম বললেন শিব অনুমতি দিয়েছেন। তিনি ঐ মূর্তির মাধ্যমে বলছেন, লিঙ্গ আর জিহ্বা সংযম করে যেখানে খুশি সেখানে থাকো। রসনা আর বাসনাকে যদি একসঙ্গে বন্দী করতে পারো তা হলেই অভয়লাভ।

চৈত্রমাসের প্রচণ্ড রোদে ঠাকুর এসেছেন বলরাম-মন্দিরে। বললেন, 'বলেছি তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু বড় ধুপ।'

ভক্তেরা হাওয়া করতে লাগল ঠাকুরকে। সেবা করবে না সুধাদ্রব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে বুঝতে পারছে না। পাখার ছন্দ ভুল হয়ে যাচ্ছে।

'ছোট-নরেন আর বাবুরামের জন্যে এলাম।' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর: 'পূর্ণকে কেন আনলে না ?'

'সভায় আসতে ভয় পায়।' বললে মাস্টার।

'ভয় ?'

'হ্যাঁ, পাছে আপনি পাঁচজনের সামনে সুখ্যাত করে বসেন, সব লোক-জানাজানি হয়—'

'বা, এ তো বেশ কথা।' ঠাকুর বললেন অন্যমনস্কের মত : 'কে জানে কখন কি বলে ফেলি। যদি বলে ফেলি তো আর বলব না। আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছ ? ভাব-টাব হয় ?'

'কই বাইরে তো কিছু দেখতে পাই না।'

'কি করে পাবে ? তার আকর আলাদা। বাইরে তো আর ফুটবে না ভাব।'

'হ্যাঁ, আমিও তাকে সেদিন বলছিলুম আপনার সেই কথাটা।' মাস্টার বললে প্রফুল্লমুখে।

'কোন কথাটা ?'

'সেই যে বলেছিলেন, সায়র দীঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবায় নামলে তোলপাড় হয়ে যায়।'

'শুধু তাই নয়, পাড়ের উপর জল উপচে পড়ে।' ঠাকুর জুড়ে দিলেন আরেকটু।

'কিন্তু তা ছাড়া, দেখেছ ? ছেলেটার আর সব লক্ষণ ভালো।'

'হ্যাঁ,' মাস্টার সায় দিল : 'চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে সমুখে।'

'চোখ শুধু উজ্জ্বল হলেই হয় না। এ অন্য জাতের চোখ। আচ্ছা,' ঠাকুর

আরেকটু অন্তরঙ্গ হলেন : 'তোমায় কিছু বলেছে ?'

'কি বিষয় ?'

'এই এখানকার সঙ্গে দেখা হবার পর কিছু-হয়েছে তার ?'

'হ্যাঁ, বলেছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে গেলে, আপনার নাম করতে গেলে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, গায়ে রোমাঞ্চ হয়।'

'বা, তবে আর কি।' যেন মুক্ত হাওয়ার শান্তি পেলেন ঠাকুর।

কতক্ষণ পরে মাস্টার আবার বললে, 'সে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে—'

'কে ? কে দাঁড়িয়ে আছে ?' চমকে উঠলেন ঠাকুর।

'পূর্ণ।'

'কোথায় ?'

দরজার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালেন ঠাকুর। উঠি-উঠি করতে লাগলেন।

'এখানে নয়, হয়তো তার বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।' বললে মাস্টার।

'আমাদের কাউকে যদি যেতে দেখে রাস্তা দিয়ে অমনি ছুটে আসবে, প্রণাম করে পালাবে।'

'আহা, আহা—' ভাবে তন্ময় হলেন ঠাকুর। 'ও একটা বিরাট আধার। তা না হলে ওর জন্যে জপ করিয়ে নিলে গা ?'

সবাই কৌতূহলী হয়ে তাকাল। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ গো, পূর্ণর জন্যে বীজমন্ত্র জপ করেছি।'

বিরাট আধার, কিন্তু পূর্ণর বয়েস মোটে তেরো। বিদ্যাসাগর-ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ঠাকুরের কাছে যে আসে বাড়ির লোক পছন্দ করে না একদম। তাই লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে এক-আধটু, মাস্টারমশায়ের ছায়ায়-ছায়ায়। সবাই সন্ত্রস্ত, কে কখন টের পায়। সকলের চেয়ে ভয় বেশি মাস্টারমশায়ের, কেননা বাড়ির লোক জানতে পেলে তাকেই দায়ী করবে সর্বাগ্রে। পূর্ণর আসা কোনো ভক্তের আসা নয় এমনি কোনো এক পথভোলা পথের ছেলে ঢুকে পড়া। সব সময়ে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা।

এতই যখন ভয় তখন ও-ছেলেকে পথ দেখানোর কি দরকার !

আমি পথ দেখাব ? ও নিজেই পথের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। কে ওকে বলেছে ঠিকানা কে বলবে !

কানের কাছে মুখ এনে ঠাকুরও বলছেন চুপি-চুপি, 'সে সব করো ? যা সেদিন বলে দিয়েছিলাম—'

পূর্ণ ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ, করি।

স্বপনে কিছু দেখ ? আগুন, মশালের আলো, সধবা মেয়ে, শ্মশানমশান ? এ সব দেখা বড় ভালো। দেখ ?

পূর্ণ হাসল এক মুখ। বললে, 'আপনাকে দেখি।'

'তা হলেই হল।'

দেখাও দরকার নেই। শুধু টানটুকু থাকলেই হল। তুমি তো আয়-আয় করছই, আমিও শুধু যাই-যাই করছি না। তুমি যদি কারণরূপে আছ, এবার তারণরূপে এস। তোমার রূপ সর্বপ্রত্যক্ষভূত হোক। তোমার চরণতরী আশ্রয় করতে দাও। তোমার চরণতরী আশ্রয় করে ভবাব্ধিকে যেন গোষ্পদ জ্ঞান করতে পারি।

'তোমার উন্নতি হবে।' পূর্ণকে বললেন শেষ কথা : 'আমার উপর তোমার টান তো আছে।'

কাছি দিয়ে নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। তুমি জোয়ারের জল হয়ে সেই কাছিতে টান দাও। আমি যেন তোমার দিকে মুখ ফেরাতে পারি। আমার হাল না থাক পাল না থাক, তবু তুমি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো। তুমি হও আমার স্রোতের টান। সব-ভাসানো সব-ডুবানোর টান।

ঠাকুরের তখন অসুখ। পূর্ণ চিঠি লিখেছে ঠাকুরকে। কি লিখেছে পড়ো তো।

'আমার খুব আনন্দ হয়।' কে একজন পড়ে শোনাল পূর্ণর চিঠি : 'এত আনন্দ যে মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুম হয় না।'

'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে।' অসুখের কষ্টকে নিমেষে উড়িয়ে দিলেন : 'আহা, দেখি দেখি চিঠিখানা।'

চিঠিখানা নিলেন হাতে করে। মুড়ে টিপে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না। কিন্তু এর চিঠি বেশ ভালো চিঠি। ধরতে পারি হাতের মধ্যে। ধরতে পারি বুকের উপর।'

তোমার এই আকাশব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপিটি কবে ধরতে পারব হাতের মুঠোয়। কবে বা ধরতে পারব বুকের উপর।

১২৬

'ভক্ত্যা সর্বং ভবিষ্যতি।' ভক্তি দ্বারাই সব কিছু হবে। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী। স্ফটিকমণির ঘরে যে প্রদীপ জ্বলে তার প্রকাশ তীব্র। সেই প্রদীপই যদি জ্বলে আবার পদ্মরাগমণির ঘরে তার প্রকাশ মধুর। তেমনি একই নিখিলপ্রদীপে ভগবানের দুরকম প্রকাশ—তীব্র আর মধুর। তীব্র প্রকাশের নাম ঐশ্বর্য, মধুর প্রকাশের নাম মাধুর্য।

আমার এমন কোনো সাধ্য নেই, নেই আমার আধারে এত আয়তন যে তোমার ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করি। কিন্তু ভালোবাসতে কে না পারে বলো? বনের পশু পাখিও পারে।

তেমনি যদি একবার ভালোবাসতে পারি তোমাকে দেখাতে পারি মধুর হওয়া কাকে বলে। তুমি তো মধুলুব্ধ মধুসূদন। তাই আমার মধুর হওয়ার কারণই হচ্ছে তুমি আছ। ভক্তই ভগবদস্তিত্বের প্রমাণ। তেমনি আমিও যেন তোমার

পরিচয়টি বহন করি। পাত্র না পেলে তুমি তোমার কৃপা ঢালবে কি করে? আমাকে সে শূন্য-শান্ত পাত্রটি হতে দাও। অমলা ভক্তি। নিশ্চলা ভক্তি। বিশুদ্ধা ভক্তি। বিমুক্তা ভক্তি।

স্বীয় প্রিয়ের নামকীর্তন করবে, লজ্জা কি। কণ্ঠস্বরটি গাঢ় করো, তীক্ষ্ণ করো। কখনো উচ্চহাস্য, কখনো রোদন কখনো আর্তনাদ কখনো গান কখনো উন্মাদনৃত্য। জড় জীব জ্যোতিষ্ক—যা কিছু আছে স্থূলে-অস্থূলে, সমস্তই হরির শরীর বলে জেনো। অনন্যমনে প্রণাম করো। যে ভোজন করে তার এক-সঙ্গেই তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তেমনি যে হরিকে ভালোবাসে বা ভজনা করে সে একসঙ্গেই ভক্তি, ঈশ্বরানুভূতি ও বৈরাগ্য লাভ করে। বৈদ্যের মতো ভক্তও তিনরকম। যে সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অর্থাৎ যে সর্ব ভূতে ঈশ্বরকে দেখে সে উত্তম ভক্ত। যার ঈশ্বরে প্রেম, জীবে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা, বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা সে মধ্যম ভক্ত। আর, অধম বা প্রাকৃত ভক্ত কে? যে শুধু বিগ্রহে-প্রতিমায় হরির পুজো করে, হরিভক্ত বা আর কাউকে নয়, সে অধম বা প্রকৃত ভক্ত। সন্দেহ কি, উত্তম ভক্তই ভাগবতপ্রধান। বাসনা নয়, বাসুদেবই তার একমাত্র আশ্রয়। অবশে অভিহিত হলেও যে হরিনাম পাপহরণ করে, সেই হরির পাদপদ্ম সে প্রেমরজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছে হৃদয়ের মধ্যে। সাধ্য নেই হরি ত্যাগ করে সেই সুধানিবাস।

'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' বললেন ঠাকুর।

নারদ মানে কি? যে নার অর্থাৎ জল দেয়। জল মানে কি? জল মানে পরমার্থবিষয়ক জ্ঞান। নারদ কী করে? শ্বাসে-গ্রাসে হরিনাম করে। বীণাহস্তে সুখাসীন, নারদ একদিন জিগগেস করলে ব্যাসকে, তোমাকে ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? এমন মহাভারত রচনা করেছ, ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছ, তোমার আর কী চাই?

এত বই লিখেও তৃপ্তি হল না। ব্যাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন আমার এই অতৃপ্তি আপনিই বলুন বিচার করে।

আমি জানি। বললে নারদ, তুমি ভগবানের অমল চরিতকথা বলোনি বিশদ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিপূর্ণ না হলে প্রীতিপ্রদ হয় না। ভক্তিতেই তৃপ্তি। ভালোবাসাতেই গৌরব। অশ্রুতেই আনন্দ। সুতরাং ঈশ্বরের লীলাকথা বর্ণনা করো। রসের আকার হচ্ছে রাস। বর্ণনা করো সেই রাসলীলা।

ব্যাস রচনা করল ভাগবত। পরমবেদ্যকে শুধু জানা নয়, তাকে ভালোবাসতে জানাই আসল বিদ্যা। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি।'

'হাবাতে কাঠ নিজে একরকম করে ভেসে যায়। কিন্তু একটা পাখি এসে বসলেই ডুবে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'কিন্তু নারদাদি বাহাদুরী কাঠ। নিজে তো ভাসেই, আবার কত মানুষ গরু হাতি পর্যন্ত নিয়ে যায় সঙ্গে করে। যেমন স্টিম-বোট। আপনিও পারে যায়, আবার কত লোককে পার করে।'

ঠাকুরের কাশি হয়েছে। মহেন্দ্র ডাক্তার বললে, 'আবার কাশি হয়েছে? তা কাশিতে যাওয়া তো ভালো।' হাসল ডাক্তার।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না

ভক্তি চাই।'

মুক্তি হলে তো সব ফুরিয়ে গেল। সব শূন্যোকার! আমার স্পৃহা আস্বাদনে। ভক্তিগ্রহণে। ভাবের কি শেষ আছে? ভালোবাসার কি অন্ত হয়? তবে আমিই বা কেন অন্ত হব? আমি অব্যর্থকালত্ব চাই। হে ঈশ্বর তোমাকে ছেড়ে যেটুকু সময় যায় সেইটুকুই ব্যর্থ। এমন করো যেন সব সময়ই তোমাতে লেগে থাকি, মগ্ন থাকি, এতটুকু ক্ষণকণা যেন বিফল না হয়। আর দাও তোমার বসতিপ্রীতি। তোমার যেখানে বসতি সেখানেই আমার অনুরাগ। তোমার বাস তো শুধু তীর্থে নয়, অখিলসংসারে। অণুতে-রেণুতে। তোমার সর্বব্যাপিত্ববোধে আমার সমস্ত স্থান তীর্থান্বিত করো। বিশ্বময় প্রীতিতে বিস্তৃত হই। স্থানে আর সময়ে এক তিল পরিমাণ তোমার বিরহব্যবধান না থাকে।

'লাখজন্ম হলেই বা ভয় কি।' বললে নরেন, 'বারে-বারে আসব, ছুঁয়ে যাব ঝরা-মরাকে, ধুয়ে যাব কটি ধূলিকণা, তুলে দিয়ে যাব কটি কাঁটার ক্লেশকণ্ট।'

আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বললে বিবেকানন্দ। আকাশবাসী একটি ছোট্ট বারিকণা। কিন্তু আকাশেই থাকব না। ঝরে পড়ব।

ঝরে পড়ব কোথায়? জিগগেস করলে স্বামীজী।

শিকাগোতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সেই ফরাসিনী গায়িকা। মাদাম কালভে। তাকেই এই প্রশ্ন। নীরবে গাঢ়নম্র চোখে চেয়ে আছে মাদাম।

ঝরে পড়ব, কিন্তু সমুদ্রে নয়। সমুদ্রে পড়ে মিশে যাব সেই সমুদ্রের সঙ্গে এই কল্পনা আমার কাছে অসহ্য লাগে। কিছুতেই না, উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল বিবেকানন্দ, আমি মোক্ষ চাই না, নির্বাণ চাই না, বিলুপ্তি চাই না। বারে-বারে আমি আমার এই ব্যক্তিত্বের চেতনা নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি চাই লক্ষ-লক্ষ পুনর্জন্ম।

ঠাকুরের অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি।

জানো না বুঝি? একদিন এক সমুদ্রে ছোট্ট একটি বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ল। মাদাম কালভের দিকে চেয়ে বলল আবার স্বামীজী। সমুদ্রে পড়েই কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু।

কাঁদতে লাগল? কেন? তন্ময়ের মতো জিগগেস করলে মাদাম।

ভয়ে। দুঃখে মিশে যাবে মিলিয়ে যাবে এই বেদনায়। সমুদ্র বললে, ভয় কি, দুঃখ কি, কত শত বৃষ্টিবিন্দু, কত শত তোমার ভাইবোন এমনি করে পড়েছে আমার মধ্যে। জল হয়ে মিশে গিয়েছে জলাশয়ে। তোমাদের এই বিন্দু-বিন্দু জলবিম্ব দিয়েই তো আমি তৈরি। বিন্দু ছাড়া কি সিন্ধু আছে?

তবু কাঁদতে লাগল বৃষ্টিবিন্দু। আমি লুপ্ত হতে চাই না, আমি লিপ্ত হতে চাই। সমুদ্র বললে, বেশ তবে সূর্যকে বলো তোমাকে মেঘলোকে নিয়ে যাক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ো আরেকবার।

খুশির রঙে টলমল করে উঠল সেই বৃষ্টিবিন্দু। চলে গেল মেঘলোকে। আবার ঝরে পড়ল। এবার জলে পড়ল না, মাটিতে পড়ল। তৃষ্ণার্ত, মলিন

মাটিতে। মুছে দিল এক কণা ধূলি। মুছে দিল এক কণা পিপাসা।

মাদাম কালভের দুই চোখে মন্ত্রের সম্মোহন। মন্ত্রের সঞ্জীবনী।

হ্যাঁ, বারে-বারে জন্মাব। শঙ্খনাদ-উদার কণ্ঠে বললে বিবেকানন্দ, যতবার যেটুকু পারি কাঁটা তুলে দিয়ে যাব পৃথিবীর। যেটুকু পারি দেয়াল ভেঙে ফেলব ব্যবধানের। যেটুকু পারি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাব সর্বসুখদাতা ঈশ্বরের দিকে। আমি চাই না আমার এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ, এই আত্মচেতনার বিলুপ্তি। আমিই সেই মহান অজানা। সেই অখিল-অলৌকিক। বারে বারে এই লোকসংসারে ফিরে-ফিরে এসে জানাব নিজেকে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে,বৃহত্তর অধ্যায়ে,—দুই চোখ জ্বলে উঠল স্বামীজীর।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে নরেন, আর পড়বি না ?'

নরেন বললে, 'একটা ওষুধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।' শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে ? আর কতই বা পড়বে জিগগেস করি ? হাটের বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে একটা হো-হো শব্দ শোনা যায়, হাটের মধ্যে ঢুকলে তখন অন্যরকম। তখন সব দেখছ-শুনছ কোথায় কি বেপারবেসাতি, কোথায় কি দরদাম ! সমুদ্রও দূরে থেকে হো-হো শব্দ করছে। কী হবে শুধু শব্দ শুনে ? কাছে এগোও, দেখবে কত জাহাজ কত পাখি কত ঢেউ। তারপরে স্নান করে তার স্বাদ নাও। সার কথা, হাটের মধ্যে প্রবেশ করা, অবগাহন করা সমুদ্রে।

গুরুর জন্যে শাস্ত্রপাঠ ? পথনির্দেশের জন্যে ? গুরু না থাকে, না জোটে, শুধু ব্যাকুল হয়ে কাঁদো, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করো। তিনি দেবেন সব বলে-কয়ে, জানিয়ে বুঝিয়ে।

সমুৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হও। আসন জমিয়ে বসলাম তোমার এই দুয়ারে। প্রস্তুত হয়ে এসেছি, মরবার জন্যে প্রস্তুত। যাকে ইচ্ছে সরিয়ে দাও তুলে নাও, আমাকে পারবে না হটাতে। কিছু একটা করে তবে উঠব। হয় ধরে নয় মরে। হয় তোমার ঘরে মিলন নয় তোমার দুয়ারে মৃত্যু। ঘর-দুয়ার এক করে ছাড়ব।

'নরেন বেশি আসে না।' ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। নিজেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন নিজেকে। 'তা ভালোই করে। ও বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

কাউকে কেয়ার করে না নরেন। এইটেই যেন কত বড় তার গুণের কথা। 'বলব কি, আমাকেই কেয়ার করে না।' স্নেহদ্রবস্বরে বলছেন ঠাকুর, 'সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে। ভালো জায়গায় তাকে কত বসতে বলল কাপ্তেন। তা সে চেয়েও দেখল না। সেদিন হাজরার সঙ্গে কত-কি কথা কইছে। জিগগেস করলুম, কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের ? উড়িয়ে দিল আমাকে, বললে, লম্বা-লম্বা কথা। দেখেছ তো কত বিদ্বান আমার নরেন, তবু আমার কাছে কিছু প্রকাশ করে না, পাছে লোকের কাছে বলে বেড়াই। মায়ামোহ নেই, বন্ধনপীড়ন নেই, একেবারে খাপখোলা তরোয়াল।'

প্রথমে ধূমায়িত পরে জ্বলিত, পরে দীপ্ত, পরে উদ্দীপ্ত এই অগ্নি।

সন্ধ্যের পর ঠাকুরের কলকাতা যাবার কথা। পাইচারি করছেন এদিক-ওদিক

আর মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, 'তাই তো হে কার গাড়িতে যাই—'

এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত। এসেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

'এসেছ ? তুমি এসেছ ?' যেন গুমোট করে ছিল চারদিক, এক ঝলক বসন্তবাতাস ছুটে এল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে তেমনি ভাবে নরেনের মুখে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। ভাবখানা এই, আমাকে ছেড়ে যাবি কোথায় ? কতদিন থাকবি তোর ও-সব জ্ঞানতর্কের পাথরের দেশে ? আমি তোকে গলিয়ে দেব, ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, আদর করে-করে, তোর চোখের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে। জ্ঞান-তর্কে পারব না তোর সঙ্গে, কিন্তু তোকে ভালোবাসায় জিতে নেব। আমি যদি তোকে ভালোবাসি তবে সাধ্য কি তুই আমাকে ফেলে যাস, আমাকে ছেড়ে থাকিস ?

মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কি হে, আর যাওয়া যায় ?'

আনন্দভরা চোখে মাস্টারও হাসতে লাগল।

'জানো, লোক দিয়ে নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও এসেছে। বলো, আর কি যাওয়া যায় ?'

'যে আজ্ঞে। আজ তবে থাক।'

ঠাকুরও যেন পরম স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কাল যাব। গাড়ি না হয় নৌকোয় যাব। কি বলো ? আজ নরেন এসেছে। লোক পাঠিয়েছিলুমই বা। ওর কী দায় ছিল আসতে ? তবু ও এসেছে। আজ আর যাওয়া যায় না।' আর-সব ভক্তবৃন্দ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা আজ এস। অনেক রাত হল।' একে-একে প্রণাম করে বিদায় হল ভক্তেরা। নরেনের বেলায় না-রাত না-দিন।

হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। শুধু একবেলার ক্ষণিক মিলন নয়, চাই চিরজীবনধনের সঙ্গে চিরজীবনক্ষণের মিলন।

আমি একতাল সোনা, আমাকে তুমি আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে নাও। কি, বিশ্বাস হয় না ? জ্বালো তোমার আগুন, আজই হাতে-হাতে নাও পরখ করে। তোমার যেমন খুশি সকল নাচে নাচিয়ে নাও আমাকে, বাজিয়ে নাও সকল রাগিণীতে। সব ছেঁকে নাও, বেছে নাও, পিষে নাও। তোমার যা পছন্দ তাতেই আমি রাজী। তুমি যাতে নিশ্চিত তাতেই আমি নিশ্চিন্ত। তাই যদি হয় তবে আমার সুখও বাহবা দুঃখও বাহবা।

রাম দত্তর সঙ্গে তর্ক করছে নরেন। তুমুল তর্ক।

মাস্টার এক পাশে বসে। ঠাকুরও দেখছেন চুপ করে। শেষকালে বললেন মাস্টারকে লক্ষ্য করে, 'আমার এসব বিচার ভালো লাগে না।' ধমক দিলেন রামকে। 'থামো।' না থামো তো, আস্তে-আস্তে। কে কার কথা শোনে। রাম থামলেও নরেন থামবে না। কিন্তু তাকে কে ধমক দেবে ?

অসহায়ের মত তাকালেন আবার মাস্টারের দিকে। বললেন, 'আমি এসব

বাকবিতণ্ডা জানিও না, বুঝিও না। আমি অবোধ ছেলের মত শুধু কাঁদতুম আর বলতুম, মা, এ বলছে এই, ও বলছে ঐ। কোনটা সত্য তুই আমাকে বুঝিয়ে দে।'

এই আত্মনিবেদন। এই ভক্তি পরমপ্রেমরূপা। ভালোবাসার করস্পর্শে লৌহদুর্গের দ্বার খোলা। কিছু জানি না কিছু বুঝি না। তবু তোমাকে ভালোবাসি।

১২৭

যদি আর কিছ না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু একবার আমাকে মনে কোরো।

নবগোপাল ঘোষ প্রথম দিন তো একেবারে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই যে ডুব মারল, তিন-তিন বছর আর দেখা নেই।

'হ্যাঁ রে, কি হল বল দেখি নবগোপালের? তাকে একটু খবর দে।' তিন-তিন বছর পর একদিন খোঁজ করলেন ঠাকুর।

খবর গেল নবগোপালের কাছে। সে তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম তিন বছর আগে, সেই কথা আজও পর্যন্ত মনে করে রেখেছেন! ভুলে যাননি! দিনে-রাত্রে কত লোক আসছে তাঁর কাছে, তার মধ্যে কে-না-কে নব-গোপাল ঘোষ, তাকেও হারিয়ে যেতে দেননি। স্মৃতির কৌটোর এক পাশে কুড়িয়ে রেখেছেন।

কিছুই তিনি হারান না। ফেলে দেন না ভোলেন না এতটুকু। আমরাই ভুলি। ফিরে যাই। পথ হারিয়ে পথ খুঁজি। সময় হলে তিনিই আবার পথ দেখান। ডাক দেন।

নবগোপাল পড়ল আবার পায়ে এসে। তুমি ভোলো না। চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপিতে প্রতি রাত্রে তুমি লিখে পাঠাও, আমি ভুলিনি। বিনম্রকোমল শ্যামলশীতল তৃণদলেও সেই ভাষাই লিখে রেখেছ, ভুলিনি তোমাকে। বললে, 'আমার সাধনভজন কি করে কী হবে?'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'মাঝে-মাঝে শুধু দক্ষিণেশ্বরে এসো।'

শুধু এইটুকু? এই বা কি কম কঠিন? দেখ না, কত বাধা এসে পড়বে যাবার মুখে। মন ঠিক করতেই এক যুগ। তারপর মন যদি ঠিক হল তো শরীর বললে ঠিক নেই। মন-শরীর দুই-ই ঠিক, হঠাৎ দেখা দিল সর্বসঙ্কল্পনাশন অকাজের তাড়না। হাতের কাছে দক্ষিণেশ্বর, সেই হাত খুঁজতেই রাত ফুরোয়।

একদিন ভাবসমাধি হয়েছে ঠাকুরের, নবগোপাল এসে হাজির। রাম দত্ত ছিল, নবগোপালকে বললে, 'এইবেলা ঠাকুরের কাছ থেকে কিছু বর চেয়ে নিন।'

নবগোপাল সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ের কাছে। বললে, 'বিষয়চিন্তায় ডুবে আছি। কি করে যাবে এই বিষজ্বালা আমাকে বলে দিন।'

'কোনো চিন্তা নেই।' আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'যদি আর কিছু না পারো সারা দিনমানে একবার, শুধু আমাকে স্মরণ কোরো।'

শুধু এইটুকু ? হ্যাঁ, এইটুকু। অঙ্কুরটি ছোট, কিন্তু ওর মধ্যে অব্যক্ত আছে বনস্পতির আয়তন। বেশ তো, দেখ না, সারা দিনে-রাতে শুধু একবার আমাকে স্মরণ করে দেখ না কি হয়। একবার স্মরণ করলেই কতবার সাধ যায় স্মরণ করতে। স্মরণ করতে-করতেই অনন্যাশরণ।

একদিকে তুমি কত সহজ, আমার দুর্বল দুই বাহুর বন্ধনে বন্দী, আবার আরেকদিকে তুমি অপরিসীম, সমস্ত আয়ত্তের অতীত, সমস্ত বন্দন-ক্রন্দনের বাইরে। একদিকে তুমি কঠোর কাজের মানুষ, আরেকদিকে তুমি অকাজের রাজা। বৃত্তিরূপে থেকে আবার নিবৃত্তিরূপে বিরাজিত। একবার দেখি অমোঘ নিয়মে বেঁধে রেখেছ আমাকে, আবার দেখি তোমার অশাসনের অঙ্গনে বাজিয়ে দিয়েছ আমার ছুটির ঘণ্টা। একদিকে তুমি সুদুর্গম সুগম্ভীর, আবার, কি আশ্চর্য, তুমি একেবারে হিসাবকিতাবছাড়া উদ্ভ্রান্ত ভোলানাথ। সেইখানেই তো আমার ভরসা। আমি কি পারব তোমাকে গৌরীশঙ্করের চূড়ায় গিয়ে ধরতে ? আমি ধরব তোমাকে বিধি-বাধা-না-মানা ঝড়ের ঘূর্ণবেগে। আর সকলের কাছে তুমি দস্তুরসঙ্গত, আমার কাছে তুমি খাপছাড়া, অগোছালো। আমার যে ভালোবাসার বেসাতি। অনাবশ্যকের ঐশ্বর্য।

নবাই চৈতন্যেরও সেই কথা।

পানিহাটির উৎসবে এসেছেন ঠাকুর। নৌকোয় উঠেছেন ফিরে যাবার মুখে, ছুটতে-ছুটতে নবাই এসে হাজির। বাড়ি কোন্নগর, মনোমোহনের খুড়ো। শুনেছে ঠাকুর এসেছেন উৎসবে, তাই দেখতে এসেছে। এতক্ষণ খুঁজেছে ভিড়ের মধ্যে, দলের মধ্যে সেই শতদল কোথায়, ভিড়ের মধ্যে কোথায় সেই অপরূপ। এত দেরি করে এলে কেন ? ঐ যে তিনি নৌকোয় উঠছেন। সত্যি ? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল নবাই। ছেড়ো না, ছেড়ো না নৌকো। আর কি ছাড়ে। যে মুহূর্তে দেখতে পেলেন ব্যথিতের ব্যাকুলতা, পারায়ণ-স্তব্ধ হলেন।

পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল নবাই। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। একেই বলে দেখা আর প্রেমে পড়া। কিম্বা প্রেমে পড়ে দেখা। খুঁজেছে, ছুটেছে, লুটিয়ে পড়েছে। প্রশ্ন করেনি, তর্ক করেনি, বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে জাগতে দেয়নি দ্বিধার কুশাঙ্কুর। শুধু বিশ্বাস নয়, উন্মত্ত ব্যাকুলতা। একেবারে সর্বসমর্পণ।

ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন। পাগলের মত নাচতে লাগল নবাই। নাচে, নাচে, আবার থেকে-থেকে প্রণাম করে ঠাকুরকে।

আরেক রকম স্পর্শে তাকে ফের প্রকৃতিস্থ করলেন ঠাকুর। সবাই ভাবলে শান্ত হয়ে গেল বুঝি নবাই। দেখল ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে নবাই গঙ্গাতীরে কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল নির্জনে। সঙ্গের সাথী তিনজন। ধ্যান

কীর্তন আর উপাসনা।

'ধ্যান চক্ষু বুজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' বললেন ঠাকুর। 'ধ্যান যে ঠিক হচ্ছে তার লক্ষণ আছে। মাথায় পাখি বসবে জড় মনে করে। আমি দীপশিখা নিয়ে আরোপ করতুম। শিখার যেটা লালচে রঙ সেটাকে বলতুম স্থূল, আর শাদা অংশটাকে বলতুম সূক্ষ্ম। মধ্যখানে একটা কালো খড়কের মত রেখা আছে। সেটাকে বলতুম কারণশরীর।'

গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন আর বহির্মুখ থাকে না, যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়ল। দয়ানন্দ বললে, অন্দরে এসো কপাট বন্ধ করে। বাড়িতে কি যে-সে আসতে পারে?

'ধ্যান হবে তৈলধারার মত।' বললেন আবার ঠাকুর। 'ভিতরে আর ফাঁক নেই। অনর্গল প্রবাহ। তেমনি মনেরও অনর্গল মগ্নতা। একটা ইটকে বা পাথরকেও যদি ঈশ্বর বলে ভক্তিভাবে পুজো করো, তাতেও তাঁর কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হবে।'

আর কীর্তন?

কীর্তন হবে হিল্লোল-কল্লোল। ক্রন্দনের সঙ্গে নর্তন মিশলেই কীর্তনের জন্ম। নরোত্তম কীর্তনীয়াকে বললেন ঠাকুর, 'তোমাদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে নাচবে সকলে।' বলেই গান ধরলেন নিজে: 'নদে টলমল টলমল করে। গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। তারপর এবার আখর দাও, আর নাচো—'

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে॥
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে॥

সবাই এসেছে। এসেই উচ্চতালে কীর্তন শুরু করে দিল। বাইয়ে দিল সুরের গঙ্গা। আসন ছেড়ে উঠে ঠাকুর নাচতে লাগলেন। কাছে ছিল মহিমাচরণ, জ্ঞানপথে যার চর্চা-চিন্তা, সেও মেতে উঠল নৃত্যে।

গাইতে-গাইতে বড় টলছেন ঠাকুর। নিরঞ্জন ভাবলে, পড়ে যাবেন বুঝি। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। মৃদুস্বরে ধমকে উঠলেন: 'এই শালা ছুঁসনে।' মাস্টার ছিল সামনে তার হাত ধরে টান মারলেন। 'এই, শালা, নাচ।'

একেই বলে ঊর্জিতা ভক্তি। ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। ভক্তি যেন উথলে পড়ছে। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে দেখবে ঊর্জিতা ভক্তি, সেইখানেই জানবে আমি আছি।

'হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে ?' সবাইকে উদ্দেশ করে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বললেন, 'আমার আরো বেশি আনন্দ। কেন বলো তো ? মহিমাচরণ আসছে এদিকে, জ্ঞান পেরিয়ে ভক্তির দিকে। জ্ঞান হচ্ছে একটানা স্রোত আর ভক্তি হচ্ছে জোয়ার-ভাটা। আর দেখ না জ্ঞানীর মুখ-চেহারা শুকনো আর ভক্তের মুখ-চেহারা স্নিগ্ধ।' তারপর তৃতীয় সাথী প্রার্থনা।

কী প্রার্থনা করবে ? শুধু বলবে, ঈশ্বর, যেন ভোগাসক্তি যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। কাতর হয়ে প্রার্থনা করলেই চোখে জল আসবে। ঈশ্বর তৃষ্ণার্ত। চোখের জল না পেলে তাঁর পিপাসা নিবারণ হয় না। চাতক যেমন বৃষ্টির জলের জন্যে চেয়ে থাকে ঈশ্বরও তেমনি চোখের জলের জন্যে চেয়ে আছেন। শিশির না ঝরলে ফুলটি ফোটে না, আর ফুলটি না ফুটলে উড়ে আসে না মধুকর। তেমনি অশ্রু না ঝরলে ফোটে না হৃৎকমল, আর হৃৎকমল না ফুটলে ছুটে আসেন না ভগবান। তাই কাঁদবার জন্যেই প্রার্থনা।

না কাঁদলে ধুয়ে যাবে না আসক্তির ধুলোবালি। বাইরে শুকনো জ্ঞানের কথা, অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগতৃষ্ণা—কিছু হবে না। হাতির যেমন বাইরের দাঁত আছে তেমনি আবার ভিতরের দাঁত। বাইরের দাঁতে শোভা, ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি বাইরে লেকচার উপাসনা ভক্তির আড়ম্বর, ভিতরে কামকাঞ্চনে স্পৃহা। লুকিয়ে-লুকিয়ে লেহনচর্বণ। সমস্তই অনর্থক। যত জলই ঢালো গাছ অফলা।

তাই কেঁদে-কেঁদে মা'র কাছে শুধু এই প্রার্থনা :

মা, তোর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দে। আর যা কিছু চাইছি, কী যে সত্যি চাইবার তা না জেনেই চাইছি। সন্তান যদি একবার মাকে পায় সে কি আর রাঙন খেলনার জন্যে কাঁদে ?

প্রথমে অভ্যাস পরে অনুরাগ। ঠাকুর বললেন, প্রথমে বানান করে লেখ, তারপর টেনে যাও।'

অন্তরের টানেই তখন টেনে যাবে। এই অভ্যাসটি কেন ? যাতে শরীর যাবার সময় ঈশ্বরকেই মনে পড়ে। নাম শুধু মুখে বললেই হবে না, মনে ধরতে হবে। মনে-মনে এক হতে হবে। শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। তাই ভোগাসক্ত মনে ফুটবে না নামমূর্তি। কাঁচের পিঠে কালি মাখিয়ে ছবি ধরো। তেমনি মনে মাখাও ভক্তি আর বৈরাগ্যের রঙ, ফুটে উঠবে নামের প্রতিচ্ছায়া।

হেম ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবে বলেছিল। তা আর হল না। শেষে বললে, 'আমি খোল-করতাল নিলে লোকে কি বলবে !' ভয় পেয়ে গেল পাছে লোকে পাগল বলে। আর, এই সুখের আশায় ছন্নছাড়ার মত উদ্দাম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এতে সবাই তাকে সুস্থমস্তিষ্ক বলছে। আর যা অক্ষয় আনন্দের আকর তার জন্যে ক্রন্দন-কীর্তনই পাগলামি !

কোথা থেকে কি ছদ্মবেশে যে আসক্তি আসে তার ঠিক নেই। হরিপদকে চেনো তো ? সে ঘোষপাড়ায় এক মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে। বলে, তার নাকি গোপাল ভাব। কোলে বসিয়ে খাওয়ায়। বলে, বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর পরিহাস

করে বললেন, 'ঐ বাৎসল্য থেকে তাচ্ছল্য।'

সাবধান করে দিলেন হরিপদকে। ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ভাবে, বোধহয় 'রাগকৃষ্ণ' হয়েছে। জানো না বুঝি? ঐ মেয়েছেলেটি যে পথের পন্থী তাদের মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিগগেস করে, রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস। উত্তর চাই, হ্যাঁ, পেয়েছি।

তাই ধরেছে হরিপদকে। এমন সুন্দর ছেলেটা না মেছমার হয়ে যায়। সুন্দর কথকতা জানে। সব না মাটি হয়। গলায় এমন মিঠে সুর, তা না উড়ে পালায়।

সেদিন তার চোখ দুটি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর। যেন চড়ে রয়েছে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই খুব ধ্যান করিস?'

মাথা হেঁট করে রইল হরিপদ।

'শোন, অত নয়।'

পদসেবার ভার দিয়েছেন হরিপদকে। হাত-ভরা কোমল ভক্তি, স্নেহসিক্ত পবিত্রতা। হায়, আসক্তির ছোঁয়া লেগে হাত দুটি না তার শূন্য-শুষ্ক হয়ে যায়।

মনে শান্তি পাচ্ছেন না ঠাকুর। সে মেয়েছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন মিনতি করে, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন করছ করো, কিন্তু দেখো, অন্যায় ভাব যেন এনো না।' হরিপদর যম-দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, এই যে ছেলেরা সব আসছে এখানে, বাধা-বারণ মানছে না, এর মানে কি?' ঠাকুর বলছেন আত্মভোলার মত: 'এই খোলটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে টান হয় কি করে? কেন আকর্ষণ হয়? বলা নেই কওয়া নেই দলে-দলে লোক এমনি এলেই হল? কোনো মানে নেই ওর?'

সকলেই তো আসবে। তোমার ওখানেই যে সকলের সকল পথ সমাপ্ত হয়েছে। তুমি যে সর্বসমন্বয়ের সমুদ্র।

'কেন একঘেয়ে হব? কেন হব একরোখা?' বলছেন ঠাকুর উদার সারল্যে: 'অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না, এ ভাবনা আমার নয়। কেউ আসুক আর নাই আসুক, আমার বয়ে গেছে। লোকে কিসে হাতে থাকবে, কিসে দল বাড়বে এ সব আমার মনে নেই। অধর সেন বড় কাজের জন্যে বলতে বলছিল মাকে, তা ওর সে কাজ হল না। তাতে যদি ও কিছু মনে করে আমার বয়ে গেল।'

১২৮

চিৎপুর রোড দিয়ে গড়ের মাঠের দিকে চলেছেন ঠাকুর। চলেছেন গাড়ি করে। উইলসনের সার্কাস দেখতে। সঙ্গে রাখাল, মাস্টারমশাই, আরো দু-একজন। একজনের হাতে ঠাকুরের বটুয়া। তাতে মশলা, কাবাবচিনি। ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাত। কার্তিকে নতুন শীত পড়েছে। একবার এধার একবার ওধার ঘন-

ঘন মুখ বাড়াচ্ছেন গাড়ি থেকে। লোক দেখছেন। আপনমনে কথা কইছেন তাদের সঙ্গে। মাস্টারকে বলছেন, 'দেখছ সবার কেমন নিম্নদৃষ্টি! সব পেটের জন্যে চলেছে। কারুর ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নেই।'

মাঠে তাঁবু পড়েছে সার্কাসের। গ্যালারির টিকিট আট আনা। তাই কেনা হল ঠাকুরের জন্যে। শুধু ঠাকুরের জন্যে কেন, সকলের জন্যে। সব চেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে সবাই বসল। ঠাকুরের মহাস্ফূর্তি। বালকের মত আনন্দ করে বললেন, 'বাঃ, এখান থেকে তো বেশ দেখা যায়।'

সার্কাসের মেয়ে ঘোড়ার পিঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে। বড়-বড় লোহার রিঙ-এর মধ্যে দিয়ে ছুটছে ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে উঠে আবার ঘোড়ার পিঠে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পায়ে, মাঝখানে ডিঙিয়ে গিয়েছে সেই লোহার রিঙ। খুব কায়দায় কসরত। বিস্ময়-আয়ত চোখে তাই দেখছেন ঠাকুর।

সার্কাসের শেষে বলছেন মাস্টারকে, 'দেখলে বিবি কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার উপর, আর ঘোড়া কেমন ছুটছে বনবন করে। ভাবো দিকিন, কত অভ্যেস করেছে তবে না হয়েছে। কত মনোযোগ, কত একাগ্রতা! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, হয়তো বা অবধারিত মৃত্যু। অভ্যাসযোগে সব এখন জলভাত। সংসার করাও কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করেই তবেই না ঈশ্বরকৃপা! সাধন আর ভজন, অভ্যাস আর অনুরাগ।'

অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুর সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। সেই অভ্যাস করে যাও। মৃত্যুর সময়ের জন্যে প্রস্তুত রাখো নিজেকে।

'সাধনের সময়', ঠাকুর বললেন, এই সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু জ্ঞানলাভ হবার পর তাঁকে দর্শনের পর এই সংসারই আবার মজার কুটি।'

শুধু অভ্যাস। মন যায় না তবু কষ্টকাঠিন্য করে একটু বোসো। এইটুকুই সাধন। প্রথমে তেতো লাগে, এই তেতোটুকুই খাও। খেতে-খেতেই মধু, খেতে-খেতেই নেশা। ছেলের পড়ার মন নেই, বাপ-মা জোর করে বসাচ্ছে তাকে বইয়ের সামনে। এই জোরটুকুই কৃচ্ছ্র। পড়তে-পড়তে ছেলের কখন অনুরাগ এসে গিয়েছে, তখন বই আর নামায় না মুখ থেকে। বাপ-মা বারণ করলেও না। অভ্যাস করাই এই অনুরাগের নাগাল পাবার জন্যে। মরা জল ঠেলে-ঠেলে স্রোতের জলে চলে আসার জন্যে। ঘষো তোমার শুকনো কাঠ। মরা কাঠেই জ্বলবে একদিন আগুনের অনুরাগ। চেঁচিয়ে গলা সাধো, একদিন হঠাৎ এসে যাবে সুরবাগের ঢেউ। রুদ্ধ দরজার পাশে বসে ডাক-নামটি ধরে ডাকো একমনে। কখন দরজা খুলে গিয়ে জেগে উঠবে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি।

হাতে দাঁড় পড়েছে, দাঁড় টেনে যাও, ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে টেরও পাবে না। দুপুরবেলা ইস্কুল পালিয়ে চলে এসেছে মাস্টার। শুনেছে বলরামমন্দিরে এসেছেন ঠাকুর, আর কে রোখে! শুধু ছাত্রই ইস্কুল পালায় না, মাস্টারও ইস্কুল পালায়।

'কি গো, তুমি? এখন? ইস্কুল নেই?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

কে একজন ভক্ত ছিল সামনে, বলে উঠল, 'না মশাই, উনি ইস্কুল পালিয়ে এসেছেন।' সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মাস্টার জানে কে যেন তাকে টেনে আনলে! এমন টান যার ব্যাখ্যা হয় না। পায়ে কুশকণ্টকের বোধ নেই, পথ মনে হয় একটানা বাঁশি।

মাস্টারকে সেবা শেখাতে লাগলেন ঠাকুর। আমার গামছাটা নিংড়ে দাও তো। জামাটা শুকোতে দাও। পা-টা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারো?

সাহ্লাদে সেবা করছে মাস্টার।

সমুদ্রের দিকে চলেছে নদী। নদীতে উচ্ছ্বাস উঠেছে। নদী ভাবছে এ উচ্ছ্বাস কার, আমার না সমুদ্রের? ওগো সমুদ্র, বলে দাও, -এ আবেগ-আবর্ত কার? আমার, না, তোমার? কিন্তু এ জিজ্ঞাসা কতক্ষণ? যতক্ষণ না ঐকান্তিক সমর্পণ হচ্ছে সমুদ্রে। সমুদ্রে একবার মিশে গেলে, পূর্ণ সমর্পণ হয়ে গেলে, তখন কি আর থাকবে এ জিজ্ঞাসা? তখন কি আর থাকবে আমি-তুমি?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আমরা সব হলহল করে কথা কই। কিন্তু মাস্টার ঠোঁট চেপে বসে আছে। কি ভাবে কে জানে।'

ঠাকুর বললেন, 'ইনি গম্ভীরাত্মা।'

তাই বলে একটা গান গাইবে না? সবাই গাইছে, ও কেন মুখ বুজে থাকবে? ঠাকুরের কাছে নালিশ করল গিরিশ। 'কিছুতেই গাইছে না মাস্টার।'

ঠাকুর বললেন, 'ও স্কুলে দাঁত বার করবে। যত লজ্জা গান গাইতে!' মাস্টারের দিকে তাকালেন। 'ঈশ্বরের নামগুণকীর্তনে লজ্জা করতে নেই। নামগুণকীর্তন অভ্যাস করতে-করতেই ভক্তি আসে।'

ভক্তিতেই সর্বসিদ্ধি এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান।

'তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ওদেশে ধান মাপে, পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয় আরেকজন। দয়ায় মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন। আর দয়া আকর্ষণ করবে কি করে? শুধু ভক্তিতে, ভালোবাসায়। ভালোবাসাতে কান্না আর কান্নাতেই দয়া।' আমার কী ছিল? কান্না ছাড়া আর ছিল না কিছু পুঁজিপাটা। কেঁদে-কেঁদে বলতুম তাই মাকে, বেদ-বেদান্তে কি আছে জানিয়ে দাও, কি আছে বা পুরাণ-তন্ত্রে। সব জানিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন। শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দসাগর।

'একদিন দেখলুম কি জানো? চতুর্দিকে শিবশক্তি। মানুষ পশুপাখি তরুলতা সকলের মধ্যেই এই পুরুষ আর প্রকৃতি। আরেকদিন দেখলুম নরমুণ্ডের পাহাড়। আমি তার মধ্যে একলা বসে। সেদিন দেখলুম মহাসমুদ্র। নুনের পুতুল হয়ে সমুদ্র মাপতে চলেছি। গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। কোত্থেকে একটা জাহাজ চলে এল। তাতে উঠে পড়লুম। দেখলুম গুরুকর্ণধার। তারপরে আবার দেখলুম ছোট্ট একটি মাছ হয়ে খেলা করছি সাগরে। সচ্চিদানন্দসাগরে প্রফুল্ল মৎস্য। কি হবে বুদ্ধিবিচারে? কি বুঝবে তুমি তিনি না বোঝালে? এইটিই সকল বোঝার সার করো, যে, তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখনই সব বোঝা

যায়। তার আগে নয়।'

মাস্টারকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি পাঠিয়েছেন তাকে পুজো দেবার জন্যে। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরী। স্নান করে খালি পায়ে গিয়েছে মন্দিরে আবার খালি পায়ে ফিরে এসেছে প্রসাদ নিয়ে। ডাব চিনি আর সন্দেশ।' ঠাকুর তখন শ্যামপুকুরে। দক্ষিণের ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন মাস্টারের প্রতীক্ষায়। পরনে শুদ্ধ বস্ত্র কপালে চন্দনের ফোঁটা।

পায়ের চটিজুতো খুলে রেখে প্রসাদ ধরলেন ঠাকুর। খানিকটা মুখে দিয়ে বললেন, 'বেশ প্রসাদ।'

তারপর চমকে উঠে বললেন, 'আমার বই এনেছ ?'

'এনেছি।'

রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই। ঠাকুর বললেন, 'বেশ, এখন এইসব গান ডাক্তারের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।'

বলতে-বলতেই ডাক্তার এসে হাজির। 'এই যে গো তোমার জন্যে বই এসেছে।' সোল্লাসে বলে উঠলেন ঠাকুর।

বই দুখানি হাতে নিলেন ডাক্তার। বললেন, 'গান পড়ে সুখ কি, গান শুনে সুখ।' 'তবে শোনাও হে মাস্টার—'

এবার আর ঠাকুরের কথা ঠেলতে পারল না। গলা ছেড়ে গান ধরল মাস্টার।

'মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে,
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

তারপর নাচিয়ে পর্যন্ত ছেড়েছেন। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে এ-ভাব ত্যাগ করো। লজ্জা, অভিমান, গোপন ইচ্ছা—এ সব পাশ। এ ছুঁড়ে ফেলে দিতে না পারলে স্ফূর্তি কই, সারল্য কই ? গড় হয়ে দেবতার দুয়ারে প্রণাম করতে গেলে দামী শালে ধুলো লাগবে সুতরাং মনে মনে প্রণাম করে দায় স্যারি এ হচ্ছে অহংকারের কথা। কিন্তু শাল গায়ে দিয়ে ঐ ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়াই আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ হলে, গায়ের শাল আর পথের ধুলোয় ভেদ থাকে না। সত্যিকার বন্যা এলে বালির বাঁধে কি করবে ? কালীপদসুধাহ্রদে একবার যদি ডুবতে পারো, সব হিসেব পচে যাবে, পুজো হোম জপ বলি কিছুরই আর ধার ধারতে হবে না। কিন্তু শিবনাথের উলটো কথা। সে বলে, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়।

'শোনো কথা!' বললেন ঠাকুর, জগৎচৈতন্যকে চিন্তা করে অচৈতন্য। যিনি বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎকে জগৎ বলে বোধ হয় তাঁকে চিন্তা করা মানে অবোধ হওয়া ?'

'ভাবতে গেলে সব কিন্তু ছায়া।' বললে প্রতাপ মজুমদার।

'তা কেন ?' আপত্তি করল ডাক্তার। 'বস্তুরই তো ছায়া। ঈশ্বর যদি বস্তু হন তা হলে তাঁর ছায়াও বস্তু। এদিকে ঈশ্বর সত্য অথচ তাঁর সৃষ্টি মিথ্যে এ মানতে রাজী নই। তাঁর সৃষ্টিও সত্য।'

সেকথা বৈকুণ্ঠ সেনও বলেছিল। ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই সংসার কি মিথ্যে ?'

এক কথায় জল করে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যে ততক্ষণ মায়া। তখন আমার-আমার। এদিকে চোখ বুজলে কিছু নেই অথচ আমার হাবুর কি হবে! নাতির জন্যে কাশী যাওয়া হয় না! এ সংসার মিথ্যে একশোবার মিথ্যে।'

'কিন্তু সংসারে থেকে তাঁকে জানব কি করে ?'

'এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখো আরেক হাতে সংসারের কাজ করো। ছেলেদের গোপাল বলে খাওয়াও। বাপ-মাকে দেব-দেবী বলে সেবা করো। স্ত্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে থাকো, ভোগাসনে না বসে বোসো যোগাসনে।

'কেন মশাই, এক হাত ঈশ্বরে আরেক হাত সংসারে রাখব কেন ?' কে একজন ফোড়ন দিল: 'সংসার যে কালে অনিত্য তখন এক হাতই বা সংসারে রাখব কেন ?'

সদানন্দ ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে সংসার অনিত্য নয়।' সেদিন সদরালাও জিগগেস করেছিল এই কথা। 'কতদিন খাটনি খাটব সংসারের ?'

'যতদিন তিনি খাটান। তিনি যা কাজ করতে দিয়েছেন তাই নির্বাহ করো। যদি মনে করো তাঁর দেওয়া কাজ তবে আর শুকনো কর্তব্য নয়, তবে তা পুজো।'

'এ সব কর্তব্যের জন্যে সংসার করা ?'

'নিশ্চয়। সংসার করা মানেই কর্তব্যসাধন। ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর ভরণপোষণ যোগাড় রাখা। তা যদি না করো তুমি নির্দয়। যার দয়া নেই সে মানুষই নয়।'

'কিন্তু সন্তানপালন কতদিন ?'

'যদ্দিন না সাবালক হয়। পাখি উড়তে শিখলে তখন কি আর ঠোঁটে করে খাওয়ায় তার মা ? কাছে এলে ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না।'

'কিন্তু যদি জ্ঞানোন্মাদ হয় ?'

'জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য নেই। তখন কালকের কথা আর তুমি ভাববে না, ঈশ্বর ভাববেন। জমিদার তো মরে গেল নাবালক ছেলে রেখে। নাবালকের কি হবে ? তখন তার অছি এসে জোটে। অছি এসে ভার নেয়।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন সদরালার দিকে। 'এ সব তো আইনের কথা। তুমি তো সব জানো। আর এ তো তুমি মন্দ লোকের উপর ভার দিচ্ছ না, স্বয়ং ঈশ্বরের উপর দিচ্ছ।'

'আহা কি অপরূপ কথা!' পাশে বসে ছিলেন বিজয় গোস্বামী, বলে উঠলেন

মধুভাষে : 'নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে। আহা। কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয় তারা কি ভাগ্যবান!'

আমি হাল ছেড়ে দিলেই তুমি এসে হাল ধরবে। আমি শুধু অভয়মনে ছেড়ে দেব আমার নৌকা। হোক আমার পাল ছেঁড়া হাল ভাঙা, তবু ঝড়ের রাতে মত্ত সাগরকে আমার ভয় নেই। আমি জানি তুমি বসে আছ হালের কাছে। লক্ষ করছ হাল কতক্ষণে ছেড়ে দিই তোমার হাতে। ছেড়ে দিয়েছি এবার। দেখি তুমি এখন কি করে ছাড়ো!

১২৯

অন্ধ বিশ্বাস? কেন নয়? প্রতিমুহূর্তে করছ না এই অন্ধ বিশ্বাস? অন্ধকারে কেউ নেই এ বিশ্বাসও তো অন্ধ বিশ্বাস। রোগ দেখে ডাক্তার দিয়ে গেল ব্যবস্থাপত্র। পাঠালাম ডিসপেনসারিতে। অন্ধ বিশ্বাস, কম্পাউন্ডার ঠিক-ঠিক ওষুধ দেবে, বিষ দেবে না। নাপিতের খোলা ক্ষুরের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি কামাবার জন্যে, অন্ধ বিশ্বাস গলার শিরাটি কাটবে না নাপিত। ট্যাক্সি চেপেছি, অন্ধ বিশ্বাস নিরাপদে নিয়ে যাবে পথ কাটিয়ে। সাহেব এসে বললে, উঠেছিলাম গৌরীশঙ্করে, প্রত্যক্ষ নেই অনুমানও নেই, অনায়াসে সত্য বলে মেনে নিলাম। অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কি। আর-পাঁচজনকে দেখে, পাঁচটা কার্যকারণের ফল থেকেই এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম। তেমনি দেখি না পাঁচজন কি বলে ঈশ্বর সম্বন্ধে। পাঁচ দেশের পাঁচজন। পাঁচ যুগের পাঁচজন। তারা যদি বলে, হ্যাঁ, আছেন, তাঁকে দেখেছি, তবে মেনে নিতে আপত্তি কি। একটা সাহেবকে সত্যবাদী বলে মানতে পারি, একজন সাধুকে মানতে পারব না? বেশ তো, সাহেবের মধ্যে তো সাধু আছে দেখ না তাদের জিগগেস করে।

বাপ ছেলেকে বর্ণপরিচয় শেখাচ্ছে। বলছে, 'পড়ো অ—'

ছেলে বলে, 'কেন অ বলব কেন? বলব, হ—'

'না, অ-ই বলতে হয়। বলো, অ—'

'বা, বুঝিয়ে দাও কেন অ বলব? আমি বলব, দ—'

বলো, কী যুক্তি আছে বাপের? কেন ছেলে অ বলবে? কেন সে হ বা দ বলবে না? তখন অনন্যোপায় হয়ে বাপ বললেন, 'সকলে অ বলেছে, তুমিও অমনি অ বলো—' যুক্তির সেরা যুক্তি। সকলে বলেছে। সুতরাং তুমিও বলো। তুমিও মানো। বর্ণপরিচয় যেমন অ থেকে শুরু তেমনি জগৎপরিচয়ের আদিতে ঈশ্বর। অ বলো। বলো আদ্যবর্ণ। তেমনি ঈশ্বর বলো। বলো আদিভূত। কেন অবিশ্বাস করি? নিজেকে অহঙ্কারী ভাবি বলে। নিজে না দেখলে মানব কেন এই অভিমান থেকেই অবিশ্বাস। যেন চোখ সবই ঠিক দেখে। সিনেমা দেখে যে চোখের জল ফেলি সেও চোখ ঠিক-ঠিক দেখেছিল বলেই। তাই না? হায় রে অহঙ্কার!

কোনো বিষয়ে জানতে হলেই নিজেকে প্রথম জানতে হবে অজ্ঞ বলে। নিজের যদি এই অজ্ঞতাবোধ না থাকে তবে বিজ্ঞজনের সান্নিধ্য পাব কি করে? আমি জানি না উনি জানেন এই বিনয় এই অভিমানহীনতা না থাকলে কি করে জানতে পারব? ছেলে যদি মনে করে আমি বাপের চেয়ে বড় পণ্ডিত তবে অ-এর বদলে তাকে হ শিখে ফিরতে হয়। পড়তে হয় বিশালাক্ষীর দ-য়ে। কিন্তু কোনোক্রমে যদি একবার বিশ্বাস হয় তবে কাটান-ছোড়ান নেই। নিশ্চয়-নিষ্পত্তি করে যেতে হবে যোলো আনা। 'তুই হাসপাতালে এলি কেন?' বললেন ঠাকুর: 'বাড়িতে বসে চিকিৎসা করলেই পারতিস। কে তোকে ঢুকতে বলেছিল হাসপাতালে? যখন একবার ঢুকেছিস সম্পূর্ণ রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বড় ডাক্তার সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।'

যখন একবার এসে পড়েছি বিশ্বাসের বন্দরে তখন আর ফিরে যাওয়া নয়। ব্যাকুলতার হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ভক্তির স্রোতে চলে যাব ভাসতে ভাসতে। ভক্তি? ভক্তি কি যে-সে কথা? না হোক, তবু তোমার মমতা তো আছে, স্নেহপ্রীতি তো আছে। এ তোমার সহজাত। নিজের প্রতি মমতা। সন্তানের প্রতি স্নেহ। পত্নীর প্রতি প্রীতি। এ সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিম্নগামী। বাঁধ দিয়ে এ নিম্নগামী স্রোতকে ভিন্নগামী করে দাও। ঊর্ধ্বগামী করে দাও। প্রীতিও তরলতা ভক্তিও তরলতা। বাঁধের কাছটায় বাঁক ঘুরে প্রবলতর বেগে বয়ে যাবে জলস্রোত। প্রীতি ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হবে।

গাছের মূলটি ঊর্ধ্বমুখে। শাখাগুলি নতমুখ। তোমার ভালোবাসার অঙ্কুরটি ঊর্ধ্বমুখ করে দাও। পরে বিতত শাখায় নত হয়ে জগজ্জনকে সে ছায়া দেবে, শান্তি দেবে।

'তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থাকো।' ঠাকুর বললেন অশ্বিনী দত্তকে: 'কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না যে ন্যাংটো-ভ্যাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।'

দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অশ্বিনী। সাধ পরমহংসকে দেখবে। কিন্তু কে পরমহংস?

'আহা, দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন।' কে একজন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে।

ঐ তাকিয়ায় ঠেস দেবার নমুনা নাকি? তাকিয়ায় কি করে ঠেস দিয়ে বসতে হয় আমিরি চালে তাই জানে না। তবে নিশ্চয় উনিই পরমহংস হবেন। একখানা কালোপেড়ে ধুতি পরনে, বসে আছেন পা দুখানি উঁচু করে, তাও দুহাত দিয়ে জড়িয়ে, আধা-চিত অবস্থায়। কেশব সেন তখন বেঁচে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে ঠাকুরও তেমনি প্রণাম করলেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অশ্বিনী ভাবল এ আবার কোন ঢঙ!

সমাধিভঙ্গের পর কেশবকে বলছেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ হে কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি বলে ঈশ্বর নেই? সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন বাবু, এক পা

ফেলে আরেক পা ফেলতেই—উঃ, কি হল, বলে অজ্ঞান। ধরো ধরো, ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার আসবার আগেই হয়ে গেছে! এই তো বীরত্ব! এঁরা বলেন ঈশ্বর নেই।'

ভক্তি-নদীতে ডুব দিয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ব—যাকে বলে সন্তরণে সিন্ধুগমন—এ কি গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়? কি করে হবে! একবার ডুববে একবার উঠবে, একেবারে ডুবে যাবে কি করে! ঐ যা বলেছি গোলাপী নেশার বেশি হবে না। 'কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

'আহা, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্র--' দেবেন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করলেন ঠাকুর। বললেন, 'তবে কি জানো, এক গৃহস্থের বাড়ি দুর্গোৎসব হত, পাঁঠাবলি হত উদয়াস্ত। কয়েক বছর ধরে বলির আর সে ধুমধাম নেই। কি ব্যাপার? একজন এসে জিগগেস করলে, আজকাল আর বলি নেই কেন? আর বলি! গৃহস্থ বললে, এখন দাঁত পড়ে গেছে যে। দেবেন্দ্রও এখন তাই ধ্যান-ধারণা করছে, তা করবেই তো! তা কিন্তু খুব মানুষ দেবেন্দ্র!'

কীর্তন আরম্ভ হল। এবং তারপর যা ঘটল, অশ্বিনী তা কোনোদিন কল্পনায়ও আনেনি। ঠাকুর নাচতে শুরু করলেন। সঙ্গে কেশব। আর যারা-যারা ছিল সকলে। মহাকাশে নক্ষত্রনর্তন। সূর্যও নাচছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহতারকারাও নাচছে। নিজে নেচে আর সকলকেও নাচান, অশ্বিনীর সন্দেহ রইল না, এই পরমহংস। কে এই আত্মদ যাঁর সত্তাতে সকলে সত্তাবান, যাঁর বলে সকলে বলী, যাঁর ছন্দে সকলে প্রাণনৃত্যময়! বিনয়পূর্ণ প্রার্থনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল মনের মধ্যে। অভিমান বিগলিত করো। প্রাণের মধ্যে পরমনৃত্যের ছন্দে-ছন্দে অহঙ্কারের শৃঙ্খল চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাক।

আরেক দিন গিয়েছে অশ্বিনী। সঙ্গে কটি যুবক-বন্ধু।

তাদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, 'এঁরা এসেছেন কেন?'

'আপনাকে দেখতে।' বললে অশ্বিনী।

'আমাকে দেখবে কি গো! ঘুরে-ঘুরে বরং বিল্ডিং-টিল্ডিং দেখুন।'

অশ্বিনী হাসল। 'সে কি কথা! আপনাকে দেখতে এসেছে, ইট-বালি-চুন দেখবে কি!'

'তবে বলতে চাও এরা চকমকির পাথর? ঠুকলে আগুন বেরুবে? হাজার বছর জলে ফেলে রাখলেও আগুন-ছাড়া হবে না? হায়, আমাদের ঠুকলে আগুন বেরোয় কই?'

আবার হাসল অশ্বিনী। আপনি কি আচ্ছাদিত আগুন? আপনি দীপিত আগুন। যে ভাস্করের কাছে আরোগ্য আপনি সেই ভাস্কর। যে হুতাশনের কাছে ধন আপনি সেই হুতাশন। পরম-আয়ু, পরম-ধন-প্রদাতা।

আরো একদিন গিয়েছে। বালকভাবে বললেন ঠাকুর, 'ওগো সেই যে কাক খুললে ভস-ভস করে ওঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?'

অশ্বিনী বললে, 'লেমোনেড ? খাবেন ?

আবদেরে গলায় বললেন, 'আনো না একটা।'

একটা এনে দিল অশ্বিনী। ঠাকুর খেলেন আনন্দ করে।

অশ্বিনী জিগগেস করল, 'আচ্ছা, আপনার জাতিভেদ আছে ?'

'কই আর আছে! কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি।'

'আচ্ছা, কেশববাবু কেমন লোক ?'

'ওগো সে যে দৈবী মানুষ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি!' তারপর আবার একটু থামলেন। বললেন, 'কিন্তু জাতিভেদ জোর করে টেনে ছিঁড়তে চেয়ো না। ও আপনিই খসে যায়। যেমন নারকোল গাছের বালতো আপনি খসে পড়ে তেমনি। এই দেখ না, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওলা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালোবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। আবার একটু পরে আরেকজন বরফ নিয়ে এল, ক্যাচড়ম্যাচড় করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে।'

'আর ত্রৈলোক্যবাবু কেমন লোক ?' আবার জিগগেস করল অশ্বিনী।

'ত্রৈলোক্য ? আহা, বেশ লোক, বেড়ে গায়।'

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য এসেছে ঠাকুরকে গান শোনাতে। মা'র গান ধরেছে ত্রৈলোক্য। 'মা, তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বুকে করে রাখো।'

প্রেমে কাঁদছেন ঠাকুর। বলছেন, 'আহা, কি ভাব।'

ত্রৈলোক্য আবার গাইল :

হরি আপনি নাচো আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে-তালে,
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল
মিছে আমার-আমার বলে ॥

ঠাকুর বললেন গদ্‌গদ্‌ হয়ে : 'আহা, তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক-ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছে সেই দেখতে পারে সমুদ্রের জল।'

গানশেষে ত্রৈলোক্য বললে, 'আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সুন্দর!'

'দপ করে দেখিয়ে দেয়। হিসেব করে সুন্দরের বোধ আসে না।' বললেন ঠাকুর, 'সেই সেদিন শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বসৃষ্টি এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পুজো বন্ধ হল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফুলের গাছগুলিই একেকটি ফুলের তোড়া। সেই থেকে বন্ধ হল ফুল তোলা। মানুষকেও ঠিক সেইরকম দেখি। তিনিই যেন মানুষের শরীরটাকে নিয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন—যেন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে-চড়ছে, উঠছে-পড়ছে—'

আগের কথার জের টানল অশ্বিনী। প্রশ্ন করল : 'আর শিবনাথবাবু কেমন লোক ?'

'বেশ লোক, তবে তর্ক করে যে।' একটু থেমে বললেন : 'শিবনাথকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোরকে দেখে ভারি খুশি। হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে বসে।'

শিবনাথকেও সেদিন তাই বলেছিলেন মুখের উপর : 'তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। শুদ্ধাত্মাদের না দেখলে কি নিয়ে থাকব ? শুদ্ধাত্মাদের বোধ হয় যেন পূর্বজন্মের বন্ধু।'

আলিপুরের চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছিলেন ঠাকুর। সে কথা বলছেন শিবনাথকে। শিবনাথ জিগগেস করল, 'কি দেখলেন সেখানে ?'

'আর কি দেখব ! মায়ের বাহন দেখলাম।'

কেন শিবনাথকে চাই ? নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঠাকুর, 'যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে তার মধ্যে সার আছে। তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভালো গায় ভালো বাজায় তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি। এমন কি যে সুন্দর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার।'

ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র, তাই যার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্মসাফল্য।

অচলানন্দের কথা উঠল। বরিশালে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অশ্বিনীর।

'কেমন লাগল তাকে ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'চমৎকার।'

'আচ্ছা বলো তো সে ভালো না আমি ভালো ?'

কী সরল প্রশ্ন ! অশ্বিনী বললে, 'কার সঙ্গে কার তুলনা ! সে হল গিয়ে পণ্ডিত, আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। তার কাছে শুধু বচন, আপনার কাছে শুধু মজা। হরেক রকম মজা, অফুরন্ত মজা—'

কথাটি পেয়ে খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বেশ, বলেছ ঠিক বলেছ।'

মজার লোক। তুমি সর্বসুখনিলয়। তুমি আছ হাসে আর রাসে, আনন্দে আর বিনোদে। প্রশান্তবাহিতা তোমার স্থিতি। তুমি প্রাপ্তসমস্তভোগ। আপ্তসমস্তকাম। সুখ কি ? আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। বিষয়ভোগে যে সুখ, সে সুখ কি বিষয়ে ? না। সে সুখ সুখময় আত্মায়। তিনি সুখ দিলেন বলে সুখের উপলব্ধি হল। ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে চিত্তবৃত্তি আত্মাভিমুখী হয়েছিল, ক্ষণকালের জন্যে মরণযন্ত্রণা বা পরিবর্তন-যন্ত্রণা ছিল না—সেই হেতু। সুখের বিষয় বিষয় নয়, সুখের বিষয় আত্মা। তাই খণ্ড সুখ ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে কি হবে ? যে সুখ বারে-বারে মরে যায় সেই সুখের মূল্য কি। চাই অপরিচ্ছিন্ন সুখ। সেই অপরিচ্ছিন্ন সুখই তুমি।

'তাঁকে পাব কি করে ?' সরাসরি প্রশ্ন করল অশ্বিনী।

'কাঁদতে-কাঁদতে কাদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে, তখন পাবে।' বললেন ঠাকুর, 'চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানে। কিন্তু লোহার গায়ে যে কাদা মাখা। কাদা লেগে

থাকতে কি করে লাগে চুম্বকের সঙ্গে ! তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে।'

ঠাকুর তক্তপোশের উপর উঠে এলেন। শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'হাওয়া কর দেখি।' অশ্বিনী পাখা করতে লাগল।

'বড্ড গরম গো। পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও না—'

পরিহাস করল অশ্বিনী। 'আপনারও শখ আছে দেখছি।'

'কেন থাকবে না, কেন থাকবে না জিগগেস করি ?'

'না, না, থাক, একশোবার থাক।'

কতক্ষণ পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেনো ?'

'কোন গিরিশ ঘোষ ? থিয়েটার করে যে ? দেখিনি কখনো। নাম শুনেছি।'

'আলাপ কোরো তার সঙ্গে। খুব ভালো লোক।'

'শুনি মদ খায় নাকি ?'

উদার শান্তিতে বললেন ঠাকুর, 'তা খাক না, খাক না, কতদিন খাবে ?'

'এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই তার এক কণা যদি মদ-ভাঙ-গাঁজায় থাকত !' নিজের কথা বলছে সবাইকে গিরিশ : 'আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম তিনি কিছুতেই বিরক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম, বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না, তখনো ঠাকুরের কাছে আশ্রয় পেতাম। সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন। লাটুকে বলতেন, ওরে দ্যাখ গাড়িতে কিছু আছে কিনা। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব ? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি শাদা করে দিতেন। শেষে আপশোষ করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে !'

আবার বলছে গিরিশ, 'সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিগগেস করতেন, আমাকে কখনো করেননি। একবার করলে হয় ! সব মহাভারত তাঁকে বলে দিই। বললে সব তিনি নিশ্চয়ই শোনেন বসে-বসে। মানা করেন না কিছুতেই। সাধে কি আর ওঁকে এত মানি ?'

'আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু।' একদিন গিরিশ ঠাকুরকে বললে মুখের উপর। 'এমন কি ফিচকেমিতেও।'

ঠাকুর বললেন, 'না গো তা নয়। এখানে সংস্কার নেই। করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার ভেতর ঢের তফাত। করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখে-শুনে জানতে সেটা হয় না।'

এক রাজার এক গল্প আছে। ভারি স্ত্রৈণ সেই রাজা। একদিন রাজার এক বন্ধু তাকে এই নিয়ে খুব শ্লেষ করল। রাজা ভেবে দেখলেন, সত্যি, এবার থেকে চলতে হবে সামলে। অন্তঃপুরে এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন, নিতান্ত দু-একটা দরকারি কথা ছাড়া কথাই কন না রানির সঙ্গে। খেতে বসেছেন রাজা, রানির পোষা বেড়াল রাজার পাতের কাছে ঘুরঘুর করছে। রাজা তাকে তাড়াতে চেষ্টা করছেন কিন্তু সে বারে-বারেই ফিরে আসছে। তখন রানি বলছে, 'আগে ওকে অনেক আস্কারা দিয়েছ, এখন কি আর তাড়ানো সম্ভব ?'

আগে অনেক আস্কারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। তাই রাশ রাখো নিজের কাছে। বারাঙ্গনা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু তোমার বাসনার নটীকে কি করে ত্যাগ করবে? তবে উপায়? আন্তরিক হও। অন্তরের নির্জনে বসে কাঁদো। অন্তরকে প্রক্ষালিত করো। অন্তরের থেকে চাও ঈশ্বরকে।

'ধ্যান করো।' বলছেন ঠাকুর, 'একাগ্র হও। ধ্যানে কত কি হয়তো দেখবে, কুকুর বেড়াল বাঁদর বেশ্যা লোচ্চা জুয়াচোর রাক্ষস পিশাচ দৈত্য দানব। ভয় পেয়ো না। ভেঙে দিও না ধ্যান। বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখছ মনে করে স্থির থেকো। কিন্তু যদি কোনো বাসনা এসে হাজির হয়, তখুনি বুঝবে মহা বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। তখন ধ্যান ভেঙে কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ কোরো না।'

তুমিই শুধু পূর্ণ হয়ে বিরাজ করো। তারপর বলি তোদের এক চরম কথা। অশেষ আশ্বাস দিলেন ঠাকুর। 'শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

১৩০

ঈশ্বরই মরণাতীত সত্য। ঈশ্বরকে মাথায় নিলে মানুষ কি ছোট হয়ে যায় না, বড়ো হয়ে ওঠে। সবই তাঁর ইচ্ছা এই ভেবে কি মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, না, তাঁর ইচ্ছা প্রস্ফুটিত করি আমার জীবনে, আসে এই দুর্দম প্রেরণা? কাকে ধরে শোকে-দুঃখে নির্বিচল থাকি, বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করি, বৈমুখ্যে-বৈফল্যে সংগ্রহ করি নবতর সংগ্রামের তেজ! কে হতাশের আশা, নিঃস্বের সম্বল, চিরোৎকণ্ঠিতের শান্তি! কে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা! সমস্ত অন্যায়ের সংশোধন!

কোথায় যাবে মানুষ? মায়ামূঢ় দিঙমূঢ় মানুষ! পথ চলতে-চলতে বিশ্রাম চায়। কোথায় সেই বিশ্রামায়তন! নিজের ঘরের চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছেড়ে বনে-বনে ঘোরে। সন্ন্যাসী হয়েও বিশ্রাম চায়। কুটির বাঁধে, মঠ তোলে। নিজের বৃত্তি ছেড়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। নিজের পুত্র ছেড়ে এসে চেলা বানায়। এক মায়া ছেড়ে আর এক মায়ার বশে আসে। যা চায় কোথাও তাকে পায় না খুঁজে-খুঁজে। সে মোহন মানুষ মনের মানুষ হয়ে মনের মধ্যেই বসবাস করছে। তাকে সেইখানেই খোঁজো, বোঝো, সেইখানেই ধরো। যে প্রশান্তসাগর খুঁজছ সে তোমার মনের ভূমণ্ডলে।

ঠাকুর বললেন, 'গৃহীর অভিমান কুঁচ গাছের শিকড়, উপড়ে তোলা যায় সহজে। কিন্তু সন্ন্যাস অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোনোক্রমে উৎপাটিত হয় না।'

প্রেমানন্দ স্বামী লিখছেন: 'সাধুর এ-দোর ও-দোর ঘোরা কি কম লাঞ্ছনা? সাধুগিরি হ্যাক-থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোঁকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর, ধোঁকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু, অনেক হয়েছে। সাধু হয়ে আবার ঘর-বাড়ি করে থাকা ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার বিষম প্যাঁচ—'

যেখানেই আছ সেখানেই থাকো। দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া ও বিষয়কে রাস্তা করো। আর জেনো আত্মা হচ্ছে সেই রথের রথী।

জব্বলপুর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে। এম-এ পাশ পণ্ডিত। কাজেকাজেই ঘোরতর নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। জীবনে অনেক অশান্তি, অনেক আঘাত, তবু মানবে না ঈশ্বরকে। ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ কি।

'তোমার কাছে প্রমাণ বলে যখন কিছু নেই, তখন নেই। কি আর করা! কিন্তু সামান্য তুমি একটু দয়া করতে পারো?' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'কি, বলুন।'

'এইটুকু অনুমান করতে পারো যে, যদি কেউ থাকে? কত কিছু রয়েছে তোমার চোখের বাইরে, তোমার জ্ঞান-প্রমাণের বাইরে, তেমনি যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে, এইটুকু মেনে নিতে পারো?'

'যদি কেউ থাকে?' ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। বললে, 'বেশ, এইটুকু আনতে পারি অনুমানে। তারপরে কী হবে?

'তারপরে তার কাছে প্রার্থনা করো।' ঠাকুর শিখিয়ে দিলেন, 'এইভাবে বলো, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকো তো আমার কথা শোনো। আমার অশান্তি-আঘাত দূর করে দাও। তুমি যখন বলছ নেই তখন নেই। কিন্তু যদি কেউ থাকো, এইটুকু বলতে আপত্তি কি—'

ভদ্রলোক বললে, 'না' এতে আর আপত্তি কি! আমি জানি ঘরে কেউ নেই! তবু ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে থাকো, আমার কথা শোনো।'

'হ্যাঁ, এমনি করেই করো প্রার্থনা। কদিন পর আবার এস আমার কাছে।'

কদিন পর এল সেই ভদ্রলোক। ঠাকুরের পা ধরে কাঁদতে লাগল। বলল, 'ঠাকুর, "যদি" আর নেই। "কেউ"-ও আর নেই। একমাত্র "আছেন," তিনি আছেন, একজনই আছেন।'

'লোকে ঈশ্বর মানবে না!' বলছেন ঠাকুর, 'যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজুরগাছকে প্রণাম করে, তার আবার বড়াই, ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না!' কাপ্তেনকে তাই বললেন ঠাকুর, 'তুমি পড়েই সব খারাপ করেছ। আর পোড়ো না।' শব্দজাল না মহারণ্য। অনেক বাক্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। জনককে বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। ওতে লাভ আর কিছুই নেই, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি। আর নারদ কি বলছে? বলছে কত তো পড়লাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ। ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত। দৈব্যবিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র। নিরুক্ত কল্প ছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র। ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পজ্ঞান। কিন্তু কই, শান্তি কোথায়, সত্য কোথায়? শুধু কতগুলো শব্দের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।

সনৎকুমার উত্তর দিলেন: 'যা কিছু অধ্যয়ন করেছ সব কতগুলি বুলি মাত্র।'

'শাস্ত্রের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?' বললেন ঠাকুর, 'শাস্ত্র পড়ে "অস্তি" মাত্র বোঝা যায়। পাওয়া যায় একটু আভাসলেশ। বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না। পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে ভালো হচ্ছে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা ভালো, কাশী দেখা—অনেক অনেক তফাত। তাই বলি দেখবার জন্যে ডুব দাও। ডুব দেবার পর মনের অতলতলে তাঁকে দেখতে পাবে।'

চিঠির কথা আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা—অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা আর ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে মুখের কথা। বললেন ঠাকুর, 'আমি মা'র মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে জানবার জন্যে হত্যে দিয়ে মাকে বলেছিলুম, আমি মুখ্খু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে। গীতার সার গীতা দশবার উচ্চারণ করলে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী, ত্যাগী। যদি একবার ঈশ্বরের মুখের কথাটি শুনতে পাও দেখবে শাস্ত্র কোথায় কত নিচে তলিয়ে গেছে।'

তেমন-তেমন একটি মন্ত্র পেলে কি হবে শাস্ত্র দিয়ে?

'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।'

শাস্ত্রপাঠ হয়নি কিন্তু সাধুসঙ্গ আছে। শুধু সাধুসঙ্গেই সর্বসিদ্ধি। আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছে করো আর নাই করো আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। একটা জীবন থেকে আরেকটা জীবনে তেমনি ভাবসংক্রমণ হবে, এক স্ফুলিঙ্গ থেকে আরেক বহ্নিকণা।

দ্বিজ প্রায়ই মাস্টারের সঙ্গে আসে। বয়স পনেরো-ষোলো। বাবা দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে, ছেলেকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে দিতে নারাজ। আরো দুটি ভাই আছে দ্বিজর। ঠাকুর জিগগেস করলেন, তোর ভায়েরাও আমাকে অবজ্ঞা করে?'

দ্বিজ চুপ করে রইল। মাস্টার বললে, 'সংসারে আর দু-চার ঠোক্কর খেলেই যাদের একটু-আধটু যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।'

'বিমাতা তো আছে। ঘা তো খাচ্ছে মন্দ নয়।' ঠাকুর একদৃষ্টে দেখছেন দ্বিজকে। বললেন, 'এই ছোকরাই বা আসে কেন? অবশ্য আগেকার কিছু সংস্কার ছিল। তবে কি জানো? তাঁর ইচ্ছে। তাঁর হাঁতে জগতের সব হচ্ছে, তাঁর না-তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই কেন?'

'মানুষের আশীর্বাদ করতে নেই?'

'না। কেননা মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। তাঁর ইচ্ছাতেই হয়-লয়।'

আবার দেখছেন দ্বিজকে। বলছেন, 'যার জ্ঞান হয়েছে তার আবার নিন্দার ভয় কি!

কামারের নেহাই, হাতুড়ির ঘা পড়ছে কত, কিছুতেই কিছু হয় না।'

দ্বিজ চলে গেলে আবার বলছেন তার কথা।

'কি অবস্থা ছেলেটার। কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে। এ কি কম ? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল তা হলে তো সবই হল।'

সেদিন দ্বিজর সঙ্গে দ্বিজর বাপ এসেছে। আর ভাইয়েরাও। দ্বিজর বাপ হাইকোর্টের ওকালতি পাশ করে সদাগরী আফিসের ম্যানেজারি করছে।

'আপনার ছেলে এখানে আসে, তাতে কিছু মনে কোরো না। আমি শুধু এইটুকু বলি চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখন তুলে জলের উপর রাখো, আর কোনো গোল নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' দ্বিজর বাপ সায় দিল।

'তুমি যে ছেলেকে বকো, তার মানে আমি বুঝেছি। তুমি ভয় দেখাও। তুমি ফোঁস করো। সেই ব্রহ্মচারী আর সাপের গল্প। জানো না ?' ঠাকুর গল্প ফাঁদলেন।

রাখালেরা মাঠে গরু চরাচ্ছে। সেই মাঠে বিষধর এক সাপের বাসা। এক ব্রহ্মচারী একদিন যাচ্ছে ঐ মাঠ দিয়ে। রাখালেরা বললে, ঠাকুরমশাই যাবেন না ওদিকে। ওদিকে এক সর্বনেশে সাপ আছে ফণা তুলে। আমার ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি, বললে ব্রহ্মচারী। বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই ফণামেলা সাপ তেড়ে এল ব্রহ্মচারীর দিকে। ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়ল। মন্ত্র পড়তেই কেঁচো হয়ে গেল সাপ। তুই কেন পরের হিংসে করে বেড়াস ? ব্রহ্মচারী শাসালেন সাপকে। বললেন, আয় তোকে মন্ত্র দি। এই মন্ত্র জপ করলে তোর আর হিংসে থাকবে না। বলে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সাপ মন্ত্র জপতে লাগল। তখন রাখালেরা দেখলে, এ তো ভারি মজা, ঢেলা মারলেও সাপটা রাগে না। তখন একদিন একজন সাপটার ল্যাজ ধরে তাকে অনেক ঘুরপাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে দিলে মাটির উপর। অচেতন হয়ে পড়ে রইল সাপ। রাখালেরা ভাবলে মরে গেছে। তাই মনে করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সাপ ঢুকল গিয়ে তার গর্তে। মার খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে হিংসে করা বারণ, গর্তের বাইরে এসে খাবারের সন্ধান করে সাপ। কি আর খাবে মাটিতে-পড়া-ফল আর পাতা ছাড়া তার আর খাদ্য নেই। কিন্তু এ দিয়ে কি জীবনধারণ সম্ভব ? একদিন এ মাঠ দিয়ে যাচ্ছে ফের ব্রহ্মচারী, ডাকলে সাপকে। ভক্তিভরে প্রণাম করে সাপ কাছে এল। কি রে কেমন আছিস ? যেমন রেখেছেন। সে কিরে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন ? লতা-পাতা খেয়ে কি করে আর মোটা হই ? শুধু এইজন্যে ? নিরামিস খেলে কি রোগা হয় ? দ্যাখ দেখি ভেবে আর কোনো কারণ আছে কিনা। আছে। সাপ তখন বললে রাখাল ছেলেদের সেই আছড়ে মারার কথা। আমি যে অহিংসার মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে যে কামড়াব না তা তারা কেমন করে জানবে ? তুই কী অসম্ভব বোকা ! ব্রহ্মচারী ধমকে উঠল। নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না ? আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস করতে বারণ করিনি। তুই ফোঁস করে ওদের ভয় দেখালিনে কেন ?

'তুমিও তেমনি শুধু ফোঁস করো ছেলেকে, কামড়াও না নিশ্চয়ই।'

দ্বিজর বাপ হাসছে।

'শোনো ভালো ছেলে হওয়া বাপের পুণ্যের চিহ্ন।' বললেন ঠাকুর, 'যদি পুকুরে ভালো জল হয় সেটি পুকুরের মালিকের পুণ্যের চিহ্ন, তাই না?'

হুঁ দিয়ে যাচ্ছে দ্বিজর বাপ।

'শোনো, এখানে এলে-গেলেই ছেলেরা জানতে পারবে বাপ আসলে কত বড় বস্তু। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।' পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল ঠাকুরের: 'আমি মা'র কথা ভেবে থাকতে পারলাম না বৃন্দাবনে। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অমনি মন হু-হু করে উঠল। বৃন্দাবন অন্ধকার দেখলাম। আমি বলি সংসারও করো আবার ভগবানে মন রাখো। সংসার ছাড়তে বলি না। এও করো ওও করো।'

দ্বিজর বাপ এতক্ষণে মুখ খুলল। বললে, আমি বলি পড়াশোনা তো চাই। ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটায়। এখানে আসতে কি আর আমি বারণ করি?'

'আর জোর করেই কি তুমি বারণ করতে পারবে? যার যা আছে তাই হবে।'

আবার হুঁ দিল দ্বিজর বাপ। মাদুরের উপর বসেছেন সবাই। কথা বলছেন আর মাঝে-মাঝে দ্বিজর বাপের গায়ে হাত দিচ্ছেন ঠাকুর। দ্বিজর বাপের গরম লাগছে। নিজে হাতে করে তাকে পাখা করছেন ঠাকুর।

দ্বিজর দিদিমা ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন অসুখ শুনে।

'ইনি কে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'যিনি মানুষ করেছেন দ্বিজকে? আচ্ছা, দ্বিজ নাকি একতারা কিনেছে? সে আবার কেন?'

মাস্টার বললে, 'ঠিক একতারা নয়, ওতে দুই তার আছে।'

'কেন, কি দরকার? একে তো তার বাপ বিরুদ্ধ, তায় ফের জানাজানি করে লাভ কি? ওর পক্ষে গোপনে ডাকাই ভালো।'

গোপনে-গোপনে শয়নে-স্বপনে যে তোমাকে ডাকছি জানতে দেব না কাউকে। হৃদয়ে তুমি যে তোমার রাঙা রাখীর ডোরটি বেঁধে দিয়েছ বাইরে থেকে কেউ তা জানতে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমার প্রেম সংসার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সংসারকে ফাঁকি দেব, সিদ্ধ হব এই নিষিদ্ধ প্রেমে। তখন এই সংসারই হবে আমাদের মিলনমালঞ্চ। জলেস্থলে এত যে শোভা-সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছ এ আমাদেরই প্রেমের মুগ্ধ দৃষ্টি। ভুবনচরাচর আমাদেরই মহোৎসব-সভা। অগাধ-জলসঞ্চারী রোহিত হও, গণ্ডূষজলে সফরী হয়ো না। সেই রাজকুমারীর গল্পটি শোনো:

ভক্তিমতী রাজবালা, রামময়জীবিতা, কিন্তু তার রাজকুমার স্বামী ভুলেও রাম-নাম উচ্চারণ করবে না। তাতে রাজকুমারীর বড় দুঃখ। কত অনুরোধ স্বামীকে, একবার রাম-নাম বলো, স্বামী নিরুত্তর। স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় রাজকুমারী। স্বামীকে সুমতি দাও, তাঁর জিভে একবার তোমার নামময়

প্রদীপটি জেবলে দাও। এমনিতে মলিন মুখ রাজকুমারীর, হঠাৎ সেদিন, বলা-কওয়া নেই, সকাল হতেই রাজকুমারী উৎফুল্ল। দেওয়ানকে খবর দিল, আজ নগরময় আনন্দোৎসব হবে, অগণন ব্রাহ্মণভোজন, অগণন ভিখারী-বিদায়। সত্বর সব ব্যবস্থা করুন। কারণ কি জানতে পাই? মিনতি করল দেওয়ান। আমার হুকুম। গম্ভীর হল রাজকুমারী। রাজকুমার বললে, এ কি সমারোহ। এত ঘটা-ছটা কিসের জন্যে? প্রথমে রাজকুমারী বলতে চায় না, শেষে অনেক সাধাসাধনার পর বললে, জানো আজ আমার কত বড় শুভদিন। কাল রাত্রে স্বপ্নে তুমি একবার রাম-নাম করে ফেলেছ। এতদিন যে নাম শত অনুরোধেও উচ্চারণ করোনি, ঘুমঘোরে সে নাম তোমার মুখ থেকে স্খলিত হয়েছে। তাই এই উৎসবের আয়োজন। বিমূঢ়ের মত, হৃতসর্বস্বের মত তাকিয়ে রইল রাজকুমার। বেদনার্ত কণ্ঠে বললে, কি নাম? রাম-নাম। বলে ফেলেছি? মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে? রাজকুমার আর্তনাদ করে উঠল, যে ধন হৃদয়ের মধ্যে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম তা বেরিয়ে গিয়েছে? বলতে-বলতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রাজকুমারী দেখল, নাম-পাখি উড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীর দেহপিঞ্জর শূন্য। তাই যত্ন করে লুকিয়ে রাখো। শুধু সে দেখে আর তুমি দেখো। আমার সকল জল্পনা তোমার নামজপ, আমার সকল শিল্পকর্ম তোমারই মুদ্রারচনা। আমার ভ্রমণ তোমাকে প্রদক্ষিণ, আমার ভোজন তোমাকে আহুতিদান। আমার শয়ন তোমাকে প্রণাম, তোমাকে আত্মসমর্পণই আমার অখিলসুখ। আমার সকল চেষ্টা আমারই পূজাবিধি।

আমি স্বভাবতই কামাসক্ত, আমাকে আর প্রলুব্ধ কোরো না বর দিয়ে। কামাসক্তির ভয়েই তো তোমার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আমার মধ্যে সত্যিকার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই তুমি আমাকে কামপ্রবৃত্ত করছ। নতুবা হে অখিলগুরু, তুমি করুণাময়, তোমার কেন এই কঠোরতা? যে তোমার কাছে বর চায় সে ভৃত্য নয়, সে বণিক। এই বাণিজ্যবুদ্ধি থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমি তোমার অকামসেবক তুমি আমার নিরভিপ্রায় প্রভু। হে সর্বকামদ, যদি নিতান্তই আমাকে বর দেবে তবে এই বর দাও যাতে কাম না অঙ্কুরিত হয় হৃদয়ে। তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। সন্তপ্তজনের প্রাণদাতা। সর্বপাপনাশী। শ্রবণমঙ্গল। সর্বশ্রীবর্ধক। যাঁরা তোমার নাম কীর্তন করেন তাঁরা বহুদাতা। তুমি বিশ্বমঙ্গল মহৌষধি।

১৩১

ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ব্যথা।

'বড় গরম পড়েছে।' বললেন মাস্টারকে: 'একটু-একটু বরফ খেয়ো।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'গরমে আমারো বাপু, বড় কষ্ট হচ্ছে। তা বরফ খেয়েই বা বিশেষ লাভ কি। এই দেখ না, কুলপি বরফ বেশি একটু খাওয়া হয়েছিল, গলায় এখন বিচি হয়েছে।'

এই প্রথম সূত্রপাত অসুখের।

'মাকে বলেছি, মা, ব্যথা ভালো করে দাও, আর কুলপি খাব না।'

'শুধু কুলপি?'

'না। আবার বলেছি, মা বরফও খাব না আর। যেকালে বলেছি একবার মাকে, আর খাব না কোনোদিন। কিন্তু জানো', সরলস্বভাব বালকের মত বললেন, মাঝে-মাঝে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। সেদিন বলেছিলাম মাছ খাব না রোববার, কিন্তু, জানো, ভুলে খেয়ে ফেলেছি।'

মৃদু-মৃদু হাসল মাস্টার।

'কিন্তু জানো', গম্ভীর হলেন ঠাকুর: 'জেনে-শুনে হবার যো নেই।'

কলকাতা থেকে হঠাৎ একজন ভক্ত এসে উপস্থিত। সঙ্গে বরফ নিয়ে এসেছে ঠাকুরের জন্যে। কৌতূহলী হয়ে তাকালেন মাস্টারের দিকে। ছেলেমানুষ যেমন করে তাকায় লোভালু চোখে। জিগগেস করলেন, হ্যাঁগা, খাব কি?'

মাস্টার চুপ করে রইল।

'হ্যাঁগা, বল না, খাব কি?' আবার জিগগেস করলেন বালকের মত।

'আজ্ঞে', মাস্টার বললে কুণ্ঠিত হয়ে, 'মাকে জিগগেস করে নিন। যদি তিনি না করেন খাবেন না।'

খেলেন না ঠাকুর। এমনি বালকস্বভাব। এমনি সর্ববন্ধনহীন সর্বানন্দ।

স্টারে দক্ষযজ্ঞ দেখতে গিয়েছেন। সঙ্গে রামলাল। কিছু খেয়াল নেই, যে পথে মেয়েরা ঢোকে সেই পথে এসে পড়েছেন। এতটুকু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা নেই। যে মেয়েটিকে কাছে পেলেন তাকেই ডেকে জিগগেস করলেন, 'ওগো গিরিশকে একবার ডেকে দাও না।'

গিরিশের নিমন্ত্রণেই এসেছেন। চৈতন্যলীলার পর এবার দক্ষযজ্ঞ। কৃষ্ণ-কীর্তনের পর শিববন্দনা। নবীননীরদশ্যামল কৃষ্ণ আর শুদ্ধস্ফটিকসংকাশ শিব। কে এসে পড়েছেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে জানে না হয়তো মেয়েটি, একচক্ষে তাকিয়ে রইল। পর্বতের মধ্যে মহামেরু নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, কে তুমি।

'বলো গে দক্ষিণেশ্বর হতে সব এসেছে।'

পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে গিরিশ। ছুটে এসেই লুটিয়ে পড়ল পায়ের উপর।

'ওঠো গো ওঠো। জামায় যে ময়লা লাগল।'

ময়লা লাগল, না, ময়লা গেল?' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললে উদ্দীপ্ত হয়ে, 'সবাইকে ডাক্। পায়ে লুটিয়ে পড়্, লুটিয়ে পড়্। মহা ভাগ্য তোদের, তিনি পথ ভুলে এসে পড়েছেন, ওরে এমন সুযোগ আর পাবিনে—'

কে কোথায় সাজগোজ করছিল, সব ফেলে রেখে ছুটে এল। প্রণাম করতে

লাগল একে-একে। এ কি সেই ভুবনভয়ভঙ্গ চতুর্বর্গবদান্য শিব নয়?

'ওঠো ওঠো মায়েরা, আনন্দময়ীরা।' মুক্তহস্তে ঠাকুর কৃপাবর্ষণ করতে লাগলেন, 'নেচে গেয়ে অভিনয় করে সর্বজীবকে আনন্দ দিচ্ছ, নিত্য বসতি করো এই আনন্দে। যাও, এইবার সাজগোজ সেরে নামো গে—'

দক্ষ সেজেছে গিরিশ। হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়ল স্টেজে। বীরদর্পে ঘোষণা করল: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

বালকের বিস্ময়বিহ্বল চোখে দেখছেন সব ঠাকুর। গিরিশের কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'ওরে রামলাল, এ শালা আবার বলে কি রে—' বলে কিনা শিবনাম ঘোচাবে! এত দিন ধরে তবে ওকে শেখালাম কি!

'ও কথা গিরিশ বলছে না, দক্ষ বলছে।'

'গিরিশ বলছে না?' যেন অবাক হলেন ঠাকুর।

'না, ওটা দক্ষের কথা।'

গিরিশ আর দক্ষ যে আলাদা এ ভেদ ভুলে গিয়েছেন। যে পোশাকেই এসে দাঁড়াক, যে অবস্থাতেই, গিরিশ সব সময়েই গিরিশ। এই বালকস্বভাব। রাজার পার্টে বাপ অভিনয় করছে, মা'র কোলে বসে দেখছে তার ছোট ছেলে। মা, বাবা আবার কখন আসবে, কোন দৃশ্যে, এই শুধু তার জিজ্ঞাসা। রাজার আবির্ভাবের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নাটকে আছে বিদ্রোহী সেনাপতি রাজাকে হঠাৎ অস্ত্রাঘাত করে বসবে। সেই দৃশ্যে যেমনি সেনাপতি রাজাকে তলোয়ারের ঘা দিল ছোট ছেলে মা'র কোলে বসে কেঁদে উঠল, মা, বাবাকে মারলে! ওটা যে রাজার উপর আঘাত তা কে বোঝায় সেই ছেলেকে! তার চোখে রাজা নেই শুধু তার বাবা। তেমনি ঠাকুরের কাছে দক্ষ নেই, শুধু গিরিশ। যে গিরিশ ভক্তভৈরব, সে শিবনাম উচ্চারণ করবে না?

'ভয় নেই, দক্ষ মানে গিরিশ আবার বলবে শিবনাম।'

বলবে তো? দেখিস। যেন আশ্বস্ত হলেন। দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, বসলেন আবার চেয়ারে।

সেবার গিয়েছিলেন 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখতে। গিরিশকে বললেন, 'বা, তুমি বেশ লিখেছ।'

'লিখেছি মাত্র।' গিরিশ বললে বিনীত ভাবে, 'কিন্তু ধারণা কই?'

'ধারণা না হলে কি এত সব লেখা যায়? ভিতরে ভক্তি না থাকলে আঁকা যায় কি চালচিত্র?'

প্রহ্লাদ পড়তে এসেছে পাঠশালায়। তাকে দেখে ঠাকুরের আহ্লাদ আর ধরে না। সস্নেহে তাকে ডেকে উঠলেন প্রহ্লাদ বলে। বলতে-বলতে সমাধিস্থ। হাতির পায়ের নিচে ফেলেছে প্রহ্লাদকে। ঠাকুর কাঁদতে শুরু করলেন। ফেলেছে অগ্নিকুণ্ডে। আবার কান্না। লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন প্রহ্লাদের প্রতীক্ষায়। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

অসুরদের পুরোহিত শুক্রাচার্য। তার দুই ছেলে, ষণ্ড আর অমর্ক। প্রহ্লাদের

দুই মাস্টার। অসুররাজ বিষ্ণুশত্রু হিরণ্যকশিপু ছেলের পড়াশোনা নিয়ে আর ভাবে না, যোগ্য হাতেই তাকে সমর্পণ করা হয়েছে। একদিন গৃহাগত ছেলেকে কোলে নিয়ে হিরণ্যকশিপু জিগগেস করলে, যা যা এত দিন শিখলে তার মধ্যে তোমার সবচেয়ে কী ভালো মনে হল ? প্রহ্লাদ বললে, বাবা, এই অন্ধকূপ সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করার কথাটিই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুখময় মনে হয়েছে।

কোল থেকে নামিয়ে দিল ছেলেকে। গুরুরা টেনে নিয়ে গেল। জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ, এ তুমি নিজের থেকে বললে, না, আর কেউ তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে ? আর কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। স্মিতহাস্যে বললে প্রহ্লাদ। যিনি শিখিয়ে দিয়েছেন, যাঁর আকর্ষণে আমার এই মতি হয়েছে, তিনিই শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু। তর্জন-গর্জন দণ্ডবেত্র বহু শাসন-পীড়ন শুরু করল মাস্টাররা। নতুন করে শেখাল সব জাগতিক কর্মকাণ্ডের কথা। আবার নিয়ে এল বাপের কাছে। এইবার বলো সর্বোত্তম কী তুমি শিখে এলে ? পিতাকে বন্দনা করে প্রহ্লাদ বললে, নবলক্ষণা শিখে এসেছি। নবলক্ষণা ? হ্যাঁ, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন। এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুকে অর্পণ করাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

এবার দৈত্যরাজ ক্ষেপে গেল মাস্টারদের উপর। এই মারে তো সেই মারে। ষণ্ড-অমর্ক বলে, প্রভু এই শিক্ষা আমরা দিইনি। আর কেউও দেয়নি। এ বুদ্ধি ওর স্বভাবজ। প্রহ্লাদও সায় দিল, বললে, বাবা, সাধ্য নেই বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মায়। এ মতির দাতা তিনিই। মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ছেলেকে। সবলে লাথি মারল হিরণ্যকশিপু। অসুরদের বললে, শিগগির একে বধ করো। মাত্র পাঁচ বছরের শিশু, এ কিনা আমার পরমশত্রু বিষ্ণুর সেবক। দুষ্ট অঙ্গের মতন এ পরিত্যাজ্য। তীক্ষ্ন শূলে প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করল অসুরেরা। উপবাস করিয়ে রাখো। সাপ দিয়ে দংশন করাও। হাতির পায়ের নিচে ফেল। ফেল তপ্ত কটাহে। পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করো। পরব্রহ্মে-সমাহিত প্রহ্লাদকে কে স্পর্শ করে। সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। মহা ভাবনায় পড়ল হিরণ্যকশিপু।

প্রভু, আপনি ত্রিজগৎবিজয়ী, বললে ষণ্ড-অমর্ক, ছোট একটা ছেলের জন্যে কেন ভাবছেন ? পিতা শুক্রাচার্য শিগগিরই ফিরে আসছেন, যতদিন না আসেন ততদিন আমাদের কাছে ওকে পাশবদ্ধ করে রেখে যান, দেখি আরেকবার চেষ্টা করে। দেখ। যারা খেলা করে বেড়ায় সে সব ছেলেদের দলে ভিড়িয়ে দাও।

আবার শুরু হল নতুন প্রয়াসের পরিচ্ছেদ। পড়াশোনা যখন বন্ধ থাকে তখন দল পাকিয়ে আসে সব সমবয়সীরা। হেলাফেলার খেলায় ডাক দেয়।

প্রহ্লাদ বললে, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্যজন্মেই পুরুষার্থসাধন। কিন্তু মনুষ্যজন্মও নশ্বর, অধ্রুব। সুতরাং বাল্যেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করবে।

এ আবার কেমনতরো কথা।

হ্যাঁ, বিষ্ণুই সর্বভূতের আশ্রয়, সকলের প্রিয়, সকলের বান্ধবস্বরূপ। আয়ু

বড়জোর একশো বছর। তার আধেক যাচ্ছে ঘুমে। কুড়ি বচ্ছর অনর্থক ক্রীড়ায়। কুড়ি বচ্ছর জরাজনিত অক্ষমতায়। বাকি সময় যাচ্ছে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ভোগের আসক্তিতে। ত্রিতাপে জর্জরিত হয়ে। কেশকার কীট যেমন নিজের জালে বন্ধ তেমনি। কামিনীর ক্রীড়ামৃগ, সন্তানের শৃঙ্খলরজ্জু। হে দৈত্যবালকগণ, মুকুন্দশরণাগতি ও তার পদসেবাই এই ক্লেশক্লেদ থেকে মুক্তি আর মঙ্গলের উপায়।

প্রহ্লাদ এত কথা জানলে কি করে? বলাবলি করতে লাগল ছেলেরা।

যতদিন মাতৃগর্ভে ছিলাম নারদ আমাকে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন। সেই স্মৃতি ত্যাগ করেনি আমাকে। হে বয়স্যগণ, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করো, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মাতে পারে। বয়স বা বিকার দেহের, আত্মার নয়। খনি খুঁড়ে যেমন সোনা, তেমনি এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মস্বলাভ।

'প্রহ্লাদচরিত্র' শেষ হবার পর 'বিবাহবিভ্রাট' হবে। গিরিশ ঠাকুরকে বলছে শুনে যেতে।

'না, প্রহ্লাদের পর আবার ওসব কি! গোপাল উড়ের দলকে তাই বলেছিলাম, শেষে কিছু ঈশ্বরীয় কথা বোলো। বেশ ভগবানের কথা হচ্ছিল, শেষে কিনা বিবাহবিভ্রাট, সংসারের কথা। কি লাভ হল? যা ছিলুম তাই হলুম।'

'থাক তবে। কিন্তু কেমন দেখলেন প্রহ্লাদচরিত্র?'

'দেখলাম তিনিই সব হয়েছেন। মেয়েরা আনন্দময়ী মা, এমনকি গোলোকে যারা রাখাল সেজেছে তারাও সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ কি? একটি লক্ষণ আনন্দ। নিঃসংকোচ আনন্দ। যেমন সমুদ্র। উপরে হিল্লোলকল্লোল, নিচে স্থির জল গভীর জল। কখনো বালকের ভাব। আঁট নেই, যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়। কখনো পৌগণ্ড ভাব, ফষ্টিনষ্টি করে। কখনো যুবার ভাব, যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয় তখন সিংহতুল্য।'

ঈশ্বর নিজেই যে বালক। তাই তো বালক ভাবটি এত মধুর! এত আত্মীয়!

ছোট তক্তপোশের উপর মুখখানি চুন করে বসে আছেন! ব্যথা বেড়েছে। গলায় কে ডাক্তারি প্রলেপের পোঁচ দিয়েছে। চারদিকে ভক্তদের কড়া নিষেধ। যেন মুক্ত হরিণকে বেঁধেছে দড়ি দিয়ে। রুগ্ন ছেলেটির মুখের মতই মুখখানি করুণ।

সব চেয়ে কঠিন কথা, কথা বলা যাবে না।

'কথা একেবারে বন্ধ করলে চলে কি করে?' প্রতিবাদ করছেন ঠাকুর: 'কত লোক কত দূর থেকে আসছে, একটা কথাও শুনে যাবে না?'

'কি দরকার! আপনাকে দেখলেই আনন্দ।' কে একজন ভক্ত বললে।

'তুই বললেই হল? দেখেই সব, কথায় কিছু নেই? তোর তো দেখে আনন্দ কিন্তু আমার আনন্দ যে বলে।'

মাগো, যত সব এঁদো, রোথো লোক আনবি, এক সের দুধে পাঁচ সের জল, আমি কত আর ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলব? আমার চোখ গেল, হাড়-মাস মাটি হল, আমাকে হোই দে। অত আমি করতে পারব না। আমার কী দায় পড়েছে! তোর

শখ থাকে তুই করগে যা। বেছে-বেছে সব ভালো লোক আনতে পারিস না, যাদের দু-এক কথা বললেই হবে। এ যে একেবারে বাজে লোকের ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস। লোকের ভিড়ে আমার নাইবার-খাবার সময় নেই। এই তো একটা মাত্র ফুটো ঢাক, রাতদিন বাজালে কদিন আর টিকবে বল?

গলা দিয়ে রক্ত বেরুল ঠাকুরের।

একটি ভক্ত মেয়ে চলেছে ঠাকুরের কাছে। ওগো, তোর হাত দিয়ে যদি একটু দুধ পাঠাই নিয়ে যাবি ঠাকুরের জন্যে? শুধোলে তাকে তার প্রতিবেশিনী। দক্ষিণেশ্বরে আবার দুধের অভাব! ঠাকুরের জন্যে কত বরাদ্দ দুধ, কত-বা নৈবেদ্য-নিবেদন। নিতে রাজী হয় না ভক্ত মেয়ে।

শুধু এক ঘটি দুধ! নিয়ে যা।। ঠাকুরকে খাইয়ে আয়।

হাতে করে ঘটি বয়ে যেতে পারব না বাপু। অনেকটা রাস্তা।

অনুনয় শুনল না। খালি হাতেই গেল দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শুনল দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে উঠছে না ঠাকুরের। আর, এমন দুর্দৈব, আজ এক ফোঁটাও দুধ যোগাড় নেই কালীঘরে। শ্রীমা চোখে আঁধার দেখছেন, খাওয়াবেন কী ঠাকুরকে! ছি, ছি, কেন আমি সেই সাধা দুধ ফেলে এলাম? আমার মত আছে কি কেউ অভাগিনী? মনের মধ্যে ভক্ত-মেয়ে হাহাকার করতে লাগল। এখন আমি কোথায় যাই, কে আমাকে দুধ দেয়!

পাঁড়ে গিন্নির নাম করলে কেউ-কেউ। কাছেই থাকে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে, গরু আছে বাড়িতে, দুধ বেচে। কিন্তু বেচবার মত নেই কিছু আজ উদ্বৃত্ত। দেড় পোয়াটাক ছিল, তা এই দেখ জ্বাল দিয়ে রেখেছি। ঐ জ্বাল-দেওয়া দুধই আমাকে দাও। আমার দারুণ দায়। আমার ঠাকুর না খেয়ে রয়েছেন। বলো কত দাম নেবে? যা চাও তাই নাও। অনেক সাধ্যসাধনা করে কিনে আনল দুধ। ভাত চটকে সেই দুধটুকুই খেলেন ঠাকুর। কত বড় তৃপ্তির সাগর উথলাচ্ছে সেই ভক্ত-মেয়ের বুকের মধ্যে। আঁচাবার সময় জল ঢেলে দিল ঠাকুরের হাতে।

কানের কাছে মুখ এনে সহসা ঠাকুর বললেন, 'ওগো তোমার সেই মন্ত্রটি আমাকে দেবে?'

কোন মন্ত্র? চমকে উঠল সেই ভক্ত-মেয়ে।

'সেই যে সিদ্ধিমন্ত্র পেয়েছিলে কর্তাভজাদের এক মেয়ের কাছ থেকে সেইটি।' কণ্ঠস্বরে ব্যথা ঝরে পড়ল: 'ওগো গলায় বড় বেদনা। তোমার ঐ মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গলায় একবার হাত বুলিয়ে দেবে?'

আশ্চর্য, ঠাকুর কি করে জানলেন! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মেয়ের। কোন কালে কী সকাম সাধনায় ঐ মন্ত্র সে শিখেছিল গোপনে তা তো তাঁর জানবার কথা নয়! ঠাকুরের পায়ে শরণ নিয়ে জীবনের সকল কথাই তাঁকে সে খুলে বলেছে, শুধু এই মন্ত্র নেওয়ার কথাটিই বলেনি। কামনাসিদ্ধির জন্যে মন্ত্র নেওয়া, এ শুনলে ঠাকুর যদি অসন্তুষ্ট হন তারই জন্যে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে লুকোবার নেই?

লজ্জায় অবনতমুখে গেল সে শ্রীমা'র দুয়ারে। বললে তার ধরাপড়ার কথা।

মা বললেন, 'কোন ভয় নেই। এখন তো সে মন্ত্র ফেলে দিয়েছ, নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাই যে কর্তব্য, বুঝেছ এই সার কথা। জানো এঁর কাছে আসার আগে আমিও ঐ মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম। কত লোকে কত কথা বলে ছ, ঐ মন্ত্রও ওদের পরামর্শেই নেওয়া। একদিন ঠাকুরকে বললুম সব খোলাখুলি। একটুও রাগ করলেন না। শুধু বললেন, মন্ত্র নিয়েছ তাতে কি? এখন তা ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করে দাও।'

ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি সকাম-নিষ্কাম সব বিসর্জন দাও তাঁর পদপ্রান্তে। তিনি আর কিছু চান না, শুধু চান মন-মুখের সমতা। নিজলাভতুষ্ট স্বশান্তরূপ আশুতোষকে দেখ। সামান্য মৃত্তিকায় তার মূর্তি। একটু গঙ্গাজল আর দুটো বেলপাতাই তার উপকরণ। তুচ্ছ গালবাদ্যেই তার পরিতোষ। আর কিছু না থাকে দাও তাঁকে অন্তরের সারল্য। সরল হওয়া মানেই নির্মল হওয়া। তিনি যে নির্মলচক্ষু। কী তাঁর থেকে গোপন করবে? কোন গুহায় গিয়ে মুখ ঢাকবে? তিনি যে আরো গভীরে। কী আচ্ছাদন আছে তোমার আবৃত করবার? তিনি অনিরুদ্ধ।

ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্যে। প্রথমে উঠলেন দুর্গাচরণ মুখুজ্জে স্ট্রিটের ছোট বাড়িতে। ছাদ থেকে গঙ্গা দেখা যাবে এইটুকুই সেখানে প্রশান্তিস্পর্শ।

ছাই। ওটুকু গঙ্গায় আমার কী হবে? রাত্রিদিন নিত্য আমি ছিলাম প্রশস্তবাহিনী গঙ্গার কাছটিতে, আমার বিস্তীর্ণ দক্ষিণেশ্বরের বাগানে, মুক্ত বাতাসের উদারতায়। এ আমাকে কোথায় এনে বন্দী করলি? একদিন হেঁটে চলে গেলেন বলরামের বাড়ি। তবু এখানে কিছুটা খোলা-মেলা আছে। আছে অন্তত শুভাবহা ভক্তির বিশুদ্ধতা। আসতে লাগল কবিরাজের দল। গঙ্গাপ্রসাদ গোপীমোহন নবগোপাল দ্বারিকানাথ। ডাক্তাররা যাকে বলে ক্যান্সার, কবিরাজের ভাষায় রোহিণী। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন ভক্তদের, 'শাস্ত্রে আছে বটে চিকিৎসার বিধান কিন্তু অসাধ্যআরোগ্য।'

কবিরাজদের কোনো ওষুধই লাগল না। শেষে ঠিক হল হোমিওপ্যাথি করানো যাক। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে নেওয়া হল বাড়িভাড়া। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে। অসহ্য ক্লেশভোগ করছেন। অথচ অবিচাল্য। পর্বতচূড়ারও বোধকরি ধৈর্যের সীমা আছে। বজ্র পড়লে তাও ভেঙে পড়ে। কিন্তু এঁর ধৈর্যের বুঝি সীমা নেই। বজ্রের বহ্নিজ্বালাও বুঝি ঐ শান্তশীতল বক্ষের স্পর্শে নিভে গেছে। তাই অপার বিশ্বাসই তোমার দুর্গ হোক। তপস্যা আর আত্মসংযম হোক অর্গল। ধৈর্য হোক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তারপর তোমার ধনু উত্তোলন করো। ধর্মই তোমার ধনু, নিষ্ঠা তার জ্যা, শান্তি তার অটনি। সত্যসহায়ে তোলো তোমার ধনু। প্রেমরূপ শর যোজনা করো। ভেদ করো তোমার কর্মরূপ বর্ম। সর্বসংগ্রামে জয়ী হও।

শাঁখারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ি এসেছে মাস্টারমশায়। নিয়ে যাবে তাকে শ্যামপুকুর। ডাক্তার তার গাড়িতে তুলে নিল মাস্টারকে। বহু জায়গায় ডাক, ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল ঘরে-ঘরে। প্রথমে চোরবাগান, পরে মাথাঘষার গলি, শেষে পাথুরিঘাটা। বড়বাজার হয়ে সর্বশেষে শ্যামপুকুর। সমস্ত জ্ঞান-তর্ক পেরিয়ে সর্বশেষে শরণাগতি।

ঠাকুরের সেবার কথা উঠেছে। 'তোমাদের কি ইচ্ছে ওঁকে আবার দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো?' ডাক্তার জিগগেস করল মাস্টারকে।

'না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধে। কলকাতায় থাকলে সব সময় যাওয়া-আসা যায়, দেখতে পাওয়া যায় সর্বদা।'

'কিন্তু এতে তো অনেক খরচ।'

'তা হোক। ভক্তদের তার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট নেই। যাতে তাঁর পরিপূর্ণ সেবা করতে পারে তাই তাদের একমাত্র চেষ্টা।' মাস্টার বললে গাঢ়স্বরে, 'একমাত্র আরাধনা। খরচ এখানেও, সেখানেও। খরচের কথা কেউ ভাবে না। তবু যে সর্বক্ষণ দেখতে পাচ্ছি চোখের উপর এই একমাত্র সান্ত্বনা।'

সব ভক্তকে মেলাবার জন্যেই তো ঠাকুরের অসুখ। এক সুতোয় গাঁথবার জন্যে। এক মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্যে। সে মন্ত্রটি কি? সে মন্ত্র সেবা।

ওরে শুধু আমার সেবা নয়, সমস্ত মানুষের সেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ওরে মানুষের মৈত্রী, মানুষের কল্যাণ। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। মহাভারতে ভীষ্মের কথা মনে কর, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

হরি, আমাকে বিনামূল্যে পার করে দাও। এই বিনামূল্যটিই প্রেম। আর, পার হতে চাওয়া অর্থ সমস্ত অহংকারের বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের মৈত্রীতে প্রসারিত হওয়া।

ওরে মানুষের মধ্যেই এই ঠাকুর। পরমপুরুষ ব্রহ্মবিদ। প্রেমই ব্রহ্মবিহার। তুই ধর্ম দিতে যাস নেবে না, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত হবে। কিন্তু মৈত্রী দিতে যাস নেবে পাত্র পরিপূর্ণ করে। মিত্রের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলকে দেখ, সকলেও সেই সাহ্লাদদৃষ্টির প্রত্যর্পণ করবে।

আমরা ভদ্র শুনব, ভদ্র দেখব, ভদ্রে প্রেরিত হব। আমাদের চিন্তা কল্যাণ, দর্শন কল্যাণ, কর্মও কল্যাণ। মানবসেবাই মাধবসেবা।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

"তুমি এ রকম ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। পনেরো মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? তোমার ভিতরে যেন জোর নেই। শক্তি নেই। চিড়ের ফলার, আঁট নেই, ভ্যাদ-ভ্যাদ করছে! উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব—ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনই পাব—মনে এই রকম জোর রাখতে হয় বিশ্বাস রাখতে হয়। ও দেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে, ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভালো নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেওয়া মাত্র তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে। সেইগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে নেয়। ম্যাদাটে ভাব ভালো নয়। জোর নিয়ে এসে বিশ্বাস করে বলো, তাঁকে পাবই পাব, এখনই পাব—তবে তো হবে!"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

ভূমিকা

তুমি কি সুন্দর, আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি। মাত্র এইটুকু তো বিষয়। তা নিয়েই জগৎসংসার তোলপাড়। তা নিয়েই যত সাহিত্য কাব্য ধর্ম আর দর্শন। এত কথা বলা হল তবু কিছুই বলা হল না। কত কালে কত দেশে আরো কত কথা বলা হবে, তবু ঘুরে-ফিরে সেই এক কথাই বলা: তুমি কি সুন্দর, আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সৌন্দর্যও ফুরোয় না আমার আনন্দও ফুরোয় না।

ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বিজ্ঞানের জয় হোক। যেন শেষ পর্যন্ত মানুষ বলতে পারে ঈশ্বরই মহত্তম বিজ্ঞান। উদ্ভিদবিদ্যায় পারঙ্গত হয়ে সমস্ত তত্ত্বতথ্য বিশ্লেষণ করার শেষে যেন বলতে পারি, ফুল, তুমি সুন্দর, আর, তোমার গন্ধে আমি আনন্দিত। আমার চোখে তুমি সুন্দর এ আমি বোঝাই কি করে? আর, এত সব বস্তুনিষ্ঠার পরেও কি জানতে পারলাম কোথায় লুকোনো তোমার গন্ধটুকু? ঈশ্বর আমাদের ফাউ, সমস্ত বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি-পাওনা। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি তার উপরি-পাওনা ছাড়ে? কলকাতায় এলে গড়ের মাঠটা কোন না একবার দেখে যায়। ময়রার দোকানে জিলিপি খাচ্ছ তো খাও, রাজভোগটাও আস্বাদ করো। তোমার সমস্ত জৈব রোমাঞ্চের ঊর্ধ্বে এ আরেক রোমাঞ্চ। এ কে ছেড়ে যাবে? আমরা তো ছাড়তে আসিনি, ঠকতে আসিনি। ষোলো আনা পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেব। ঈশ্বরকে ডাকলে কি হয়? মাথায় শিঙ বেরোয় না লেজ গজায়? কিছু হয় না। বুকটা মাঠ হয়ে যায়। অনুভূতির ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়। নিখিলের প্রতি অপার প্রেমে অপার করুণায় প্রসারিত হতে পারি। যাকে বলো মানবতাবাদ তাই ঈশ্বরত্ব।

রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও উপনিষৎ থেকে অনেক কাহিনী এই বইয়ে তুলে ধরেছি ঈশ্বরপ্রসঙ্গকে রমণীয় করবার জন্যে। কিন্তু এ আমি কার স্তবরচনা করব, কার ব্যাখ্যাবর্ণনা? এ আর কিছু নয়, নিজের বাকশুদ্ধি, লেখনশুদ্ধি, মননশুদ্ধির আয়োজন। এক দুই গুনে কি আর অন্ত পাব? তাই রূপে গুণে রসে প্রেমে শুধু মধুরের আরতি করে যাই।

> "এক দুই গনইতে অন্ত নাহি পাই,
> রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥"

অচিন্ত্যকুমার

চতুর্থ খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি।

স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
উদ্বোধন-প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা
শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত সারদা-রামকৃষ্ণ
স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত শ্রীমা সারদা দেবী
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা
শ্রীকমলকৃষ্ণমিত্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ
শ্রীপ্রমথনাথ বসু রচিত স্বামী বিবেকানন্দ
বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্তকৃত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী
শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ
স্বামী বাসুদেবানন্দকৃত দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি
স্বামী কৃষ্ণানন্দসম্পাদিত ধর্মপ্রচারক

'যে অসুখ হয়েছে, কারু সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না।' মুখ গম্ভীর করে বললে ডাক্তার সরকার। তার পর মুখে একটু হাসি টানলে : 'তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবেন।'

শুনতে মধুময় লাগে। কথা তো নতুন নয়, বলাটি নতুন। সেই একের কথাই অনেক ভাবে বলা। একটুও লাগে না একঘেয়ে।

আপনিও এ-সব কথা শোনেন? আপনি তো ঘোরতর বৈজ্ঞানিক। যুক্তিবাদী। বাস্তবপন্থী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের এম-ডি, নাম-ডাক-ওয়ালা ডাক্তার, হঠাৎ হোমিয়োপ্যাথির দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু যার মধ্যে সত্য আছে একবার বুঝেছে তাকে শত অসুবিধা সত্ত্বেও ছাড়তে কখনো রাজী নয়। শুধু অসুবিধে? দস্তুরমত উৎপীড়ন। তার সহযোগী য়্যালোপ্যাথ ডাক্তারেরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। নানা উপায়ে লাগল তার বিরুদ্ধতা করতে। দুর্নাম রটাতে। কিন্তু দমবার পাত্র নয় সরকার। মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। বক্তা মহেন্দ্র সরকার। মুক্তকণ্ঠে হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন করছে। সহগামী ডাক্তাররা তো সব হতভম্ব। বিজ্ঞানের মানইজ্জৎ সব যে ধূলিসাৎ করে দিল। অসম্ভব। বক্তৃতা বন্ধ করো। বিজ্ঞানের অপমান সইতে পারব না আমরা। ও নিজে না বন্ধ করে, মুখ চেপে ধরো কেউ। 'চুপ করো।' গর্জে উঠল য়্যালোপ্যাথের দল। 'নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব হল্ থেকে।'

এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে সভার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার সরকার। দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে বললে, 'যদি কেউ বার করে দিতে চায় তো দিক কিন্তু আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাব।'

সত্যকে প্রকাশ করে যাব। যা বুঝেছি যা জেনেছি তা বলতে পেছপা হব না। শুধু বলে যাব না, করে যাব। দেখিয়ে যাব। নিজেও প্রকাশিত হব।

কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে এত মজা কিসের?

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন। এ কেমন কথা! আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' গভীর নিশ্বাস ফেললে সরকার। 'যে পরমহংসে হয়েছে আমার সব গেল!'

সকলে হেসে উঠল।

আমার সব গেল! দড়ি গেল, দড়া গেল, হাল গেল, পাল গেল, এবার ভেসে পড়লাম নদীতে।

ঠাকুর বললেন, 'এ নদীর নাম কর্মনাশা। এ নদীতে ডুব দিলে মহা বিপদ।

কর্মনাশ হয়ে যায়। সে ব্যক্তি আর কোনো কর্ম করতে পারে না।'

তবে ডাক্তার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? শুধু কারণ-পরম্পরাই দেখে না, জগৎ-কারণকেও খোঁজ করে? প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তের বাইরে আছে কি কোনো অপ্রমেয়? ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো মূল শক্তি?

শিবনাথের বন্ধু বিয়ে করেছে এক বিধবাকে। বউটির ভারি অসুখ। সংস্থান নেই যে ভালো চিকিৎসা করে। ওহে শিবনাথ, একটা কিছু সুরাহা হয়?

দীনতারণ বিদ্যাসাগর। শিবনাথের হাতে চিঠি দিল সরকারকে, যদি দয়া করে দেখ একবার বিনা পয়সায়। আদর্শ পালনের জন্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে-যুঝে নিয়েছে শেষ রোগশয্যা। একবার নয় বার-বার যেতে লাগল সরকার। কিন্তু কই, ভালো হচ্ছে কই মেয়েটি? রোজ সকাল-বিকাল শিবনাথ আসছে ডাক্তারের কাছে। রুগীর অবস্থা বলছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে। চলো আরেক বার দেখি। আরেক বার ওষুধ পালটাই। কিন্তু কই, এত চেষ্টা, এত আয়াস, সুফল ফলছে কই? হায়, সে সুফলবৃক্ষের নাম কি?

বউটির মৃত্যুর একদিন আগে শিবনাথ গিয়েছে ডাক্তারের কাছে। রাত প্রায় দশটা। অবস্থা খারাপ, তড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়েছে। নতুন একটা কিছু ওষুধ দিন। বড্ড ছটফট করছে।

দেব। কিন্তু ওষুধের জন্যে শিশি এনেছ?

শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে শিবনাথ। কোন দিন ভুল হয় না, কি সর্বনাশ, আজই এই সঙ্গিন মুহূর্তে এমন একটা ভুল হয়ে গেল?

ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলে। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেল না একটাও। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেল। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পায়। রাত অনেক হল। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না?

শিশি নিয়ে ফিরল যখন শিবনাথ, অনেক-অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয় হয়ে গেছে। ডাক্তার ক্লান্ত সুরে বললে, 'এরই জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হত, তোমার শিশি আনতে ভুল হয় কেন? আর আমার ঘরেই বা পাওয়া যায় না কেন একটা?'

'কিন্তু এই তো এনেছি যোগাড় করে।'

'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন? কোন ওজরে? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পারলুম না বাঁচাতে।'

ম্লান হয়ে গেল শিবনাথ। বললে, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন আমরা যাই কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠল। 'কেন, কি বললুম আমি?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক। আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির উপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কি?'

'অনেক দিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেল। কিন্তু প্রতিনিয়তই

এই সত্যটাকেই উপলব্ধি করছি, আরেকটা কোনো শক্তি সমস্ত প্রাণিজীবনকে চালনা করছে। যতই ওষুধ-বিষুধ দিই ছুরি-কাঁচি চালাই আমরা কিছু নয়, শুধু ঢিল ছুঁড়ছি অন্ধকারে। যার মৃত্যু নিশ্চিত কোন ডাক্তার তাকে রক্ষা করে?'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবনাথ। সবাইকে বলুন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাক শান্ত হয়ে।'

'তা কেন? অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশি করে হাতড়াতে হবে, বেশি করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল থাক আরেকজনের হাতে, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাব। সত্য খুঁজতে-খুঁজতে ধরে ফেলব সেই সত্যস্বরূপকে।'

ঠাকুর বললেন অনুনয় করে, 'এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নাম-গুণগান করতে পাই না।'

নারদ বললেন, 'আহা, তোমরা কী সুনির্মল, যেহেতু হরিনাম কীর্তনে তোমাদের অনুরাগ। আগে তিমিরহনন করেই সূর্যের উদয় তেমনি তোমাদের মনের অন্ধকার নাশ করে নামতপন তোমাদের রসনার আকাশে উদিত হয়েছেন।

যদি অন্তর্বাহিকে সমুজ্জ্বল করতে চাও তবে তোমার জিহ্বাদ্বারে রামনাম-মণিরূপ দীপ স্থাপন করো। বায়ুর সাধ্য নেই সে দীপকে বাধা দেয়, সে দীপকে নেবায়। বায়ু মানে সংসারঝটিকা।

প্রহ্লাদ বললে, হে নৃসিংহ, যে সকল সাধু আনন্দান্বিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে তোমার নাম গান করছে তারাই সর্বজীবের অকৈতব বন্ধু। নিরুপাধিক বান্ধব।

মন্ত্রে-তন্ত্রে কত স্খলন-পতন ঘটছে। মন্ত্রে স্বরভ্রংশ হচ্ছে, উচ্চারণে ভুল হচ্ছে। তন্ত্রে হচ্ছে আচারভ্রংশ, নিয়মের ব্যতিক্রম। সমস্ত ছিদ্র ও ন্যূনতা নামকীর্তনই পূরণমোচন করে। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব কিছুই পড়ে দরকার নেই তোমার, তুমি শুধু হরিনাম করো। সর্বার্থসাধক সর্বতীর্থাধিক হরিনাম। আর বিষ্ণুদূতেরা বললে যমদূতদের, 'হে কৃতান্তকিংকরগণ! এই অজামিল কোটি-কোটি পাপ করেছিল বটে কিন্তু যে মুহূর্তে হরিনাম উচ্চারণ করেছে তখন আর সে পাপী নয়। হরিনামই পরম স্বস্ত্যয়ন। পরম মোক্ষপদ।'

কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ এই অজামিল। দাসীসংসর্গে কুলভ্রষ্ট হয়েছে। হেন পাপ নেই যা করেনি। ধর্মপত্নীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। দাসীগর্ভে অনেকগুলি পুত্র হয়েছে; কোন খেয়ালে কে জানে, সর্বকনিষ্ঠের নাম রেখেছে নারায়ণ। বড় ভালোবাসে ছেলেটাকে। নাওয়ায়-খাওয়ায়, কোলে-পিঠে করে খেলা দেয়। ছেলের অস্ফুট মধুর কণ্ঠ নকল করে নারায়ণ-নারায়ণ বলে ডাকে।

বুড়ো বয়সে অজামিলকে কাল গ্রাস করতে এসেছে। বাচিক মানসিক ও কায়িক—তিন রকম পাপেই পাপী ছিল বলে তিন-তিনটে যমদূত এসে হাজির। ঊর্ধ্বরোম বক্রানন বিকটমূর্তি পুরুষ তিনজন। পাশ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে, ভীতত্রস্ত হয়ে অজামিল তাকাতে লাগল চারদিকে। অদূরে খেলছিল নারায়ণ, তারই নাম ধরে ডেকে উঠল অজামিল। নারায়ণ, নারায়ণ!

আর যায় কোথা! চোখের পলকে চারজন বিষ্ণুদূত এসে উপস্থিত।

চতুরক্ষক নারায়ণ, তাই বিষ্ণুদূত চারজন। এসেই হাঁক দিল, 'কোথায় নিয়ে যাও একে? যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে, ছেড়ে দাও অজামিলকে। পথ দেখ।'

'কে তোমরা?' হুমকে উঠল যমদূতেরা। 'ধর্মরাজের শাসনে বাধা দাও, কী স্পর্ধা তোমাদের? তোমরা দেখতে তো মনোহর, অভিনববয়স, চতুর্ভুজ। পদ্মপলাশনেত্র, কিরীটকুণ্ডলধারী। তোমাদের আকৃতি দেখে তো সুশীলশিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু এ তোমাদের কি দৌরাত্ম্য? দুরাচার পাপীকে যমালয়ে নিয়ে যেতে দেবে না? তোমরা কে? কার লোক? তোমাদের তো কই দেখিনি।'

দণ্ডাদণ্ড্য জ্ঞান নেই কারা এই হীনমতি? বিষ্ণুদূতেরা বললে, 'যদি তোমরা ধর্মরাজের আজ্ঞাবহ, ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি তা আমাদের বলো।'

'যা বেদবিহিত তাই ধর্ম। যা বেদনিষিদ্ধ তাই অধর্ম। জানো এই পাপাত্মাকে?' যমদূতেরা নির্দেশ করল অজামিলকে। 'পরিণীতা পবিত্রা ভার্যাকে এ ত্যাগ করেছে। পিতামাতাকে ত্যাগ করেছে। দাসীর প্রতি কামাসক্ত হয়েছে। চিরজীবন উল্লঘন করেছে শাস্ত্রবিধি। অধর্মার্জিত অর্থে পোষণ করেছে পরিবার। আত্মকৃত পাপের নিষ্কৃতির জন্যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেনি। তাই একে দণ্ডপাণির কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। সেই ধর্মাধিকরণে জীব দণ্ড দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।'

'অহো কি দুঃখ! ধর্মদর্শীদের সমাজে প্রবেশ করেছে অধর্ম।' বিষ্ণুদূতেরা বললে, 'অজামিল শত-শত পাপ করেছে সত্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করেনি এ সত্য নয়।'

'নয়?'

'না। অন্তিম কালে, হোক তা বিবশ অবস্থা, পরমস্বস্তিপ্রদ শ্রীহরির নাম করেছে। ব্রতযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত পাপের ক্ষয় করে মাত্র, কিন্তু শ্রীহরির নাম পাপ প্রবৃত্তির মূল উৎপাটন করে। তার চেয়েও আরো বেশি করে। অন্তরে শ্রীহরির গুণরাশি উপলব্ধি করিয়ে দেয়। যেমনি অজামিল মৃত্যুকালে প্লুতস্বরে শ্রীহরির নাম নিয়েছে, বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে সমস্ত পাপ। সুতরাং একে ছাড়ো, একে আর নিয়ে যেতে পারবে না যমালয়ে।'

"নাম্নোহস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎকর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জন॥"

পাপহরণ বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, পাতকীজনের সাধ্য নেই সে পরিমাণ পাপ করে।

"একবার হরিনাম যত পাপ হরে,
পাপীদের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

যমদূতেরা ছেড়ে দিল অজামিলকে। মৃত্যুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল। পূর্বদুষ্কৃত স্মরণ করে ঘোর অনুতাপ হল অজামিলের। আমাকে শত ধিক, কি দুষ্পরাজয় পাপই না আমি করেছি! কিন্তু কি আশ্চর্য, পাপবদ্ধ অবস্থায় যেই নারায়ণকে ডাকলাম শোভনদর্শন দেবদূতরা এসে আমাকে মুক্ত করে দিল।

কোথায় গেল তারা, আর কি তাদের দেখতে পাব না ? এবার থেকে যত চিত্তেন্দ্রিয় হয়ে থাকব। অবিদ্যাবন্ধন ছিন্ন করে আত্মবান ও সর্বপ্রাণীর সুহৃদ হব। অহং-মম বোধ আর রাখব না মিথ্যাপদার্থে। ভগবানের কীর্তন দ্বারা দেহ-মন বিশুদ্ধ করে অর্পিতচিত্ত হব, সমাহিত হব। ইন্দ্রিয়দের বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত করে মন যুক্ত করব অক্ষয়, শ্রীহরির পাদপদ্মে।

বিষ্ণুদূতেরা দেখা দিল আবার। এবার স্বর্ণবিমান নিয়ে এসেছে। অজামিলকে তুলে নিয়ে গেল শ্রীপতির সুখধামে।

'জপ করা মানে নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা।' সেদিন ঠাকুর বলছিলেন দেবেনকে। 'একমনে নাম করতে-করতে, জপ করতে-করতে তাঁর দেখা মেলে। শেকলেবাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডোবানো আছে, আরেক দিন তীরে বাঁধা। শিকলের একেকটি পাব ধরে-ধরে এগিয়ে গিয়ে শেষে ডুব মেরে শিকল ধরে-ধরে যেতে-যেতে পৌঁছুনো যায় কড়িকাঠে। তেমনি জপ করতে-করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'

আসল কথা হচ্ছে, ডোবো।

'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল খুঁজলে পাতাল পাবি রে প্রেমরত্ন ধন।'

তাই সরবে নাম করতে পারছেন না বলে ঠাকুরের দুঃখ। ওগো অসুখটি ভালো করে দাও।

'নাম করতে না পারলে কি হয় ?' বললে ডাক্তার, 'ধ্যান করলেই হল।'

'সে কি কথা! ঠাকুর আপত্তি করলেন। আমি একঘেয়ে কেন হব ? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো ভাজায়। আমার কখনো পূজা, কখনো জপ, কখনো ধ্যান, কখনো নামগুণগান। কখনো বা নৃত্য।'

'আমিও একঘেয়ে নই।' বললে ডাক্তার।

আমার অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু তিনিও তো বহুবিচিত্র।

কিন্তু এ আমার কি হল ? রাত তিনটে থেকে ঘুম নেই, শুধু পরমহংসের ভাবনা। সকালে উঠেও সেই পরমহংস। বলছে মাস্টারকে, 'তোমরা জানো না, আমার ‌য়্যাকচুয়েল লস্‌ হচ্ছে। রোজ দু-তিনটে কল-এ যাওয়াই হচ্ছে না। তারপর নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই। আপনি গেলে আর ফি নেই। বলো, আপনি গিয়ে কি ফি নেওয়া যায় ?'

১৩৩

ডাক্তার তো জুটেছে কিন্তু সেবা করবার লোক কোথায় ?

কেন, আমরা আছি। ভক্তের দল এগিয়ে এল। দিনের পর দিন রাত জাগল। যখন যা করবার তাই করব প্রাণ ঢেলে। বুকের রক্ত দিতে হয় তাতেও পেছপা নই।

কিন্তু রুগীর পথ্য তৈরি করবে কে? কে তাতে মেশাবে তার মমতার কোমলতা? অনুরাগের স্বাদগন্ধ? আরোগ্য প্রার্থনার মাধুর্য?

'ও গোপাল, ভালো করে খাও। ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে, ওটি আগে মুখে দাও।' দক্ষিণেশ্বরে অঘোরমণি কত দিন এসে খাইয়েছে ঠাকুরকে। 'বড়ি দিয়ে ঝোল আরেকটু দেবে?'

'কে রেঁধেছ বলো তো?' ঠাকুর জিগগেস করেন খেতে-খেতে।

'স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন।'

কে লক্ষ্মী যেন চেনেন না ঠাকুর।

'বৌমা গো বৌমা।'

'সবই যদি বৌমার রান্না, তুমি তবে খাওয়াবে কবে?'

'কার সঙ্গে কার তুলনা।' অঘোরমণি বিহ্বল গলায় বললে, 'আমার বৌমার হাতধোয়ানি জলেই অমৃততুল্য রান্না হয়।'

কে এই অঘোরমণি? বলরাম বোসের বাড়িতে একদিন বলছেন ঠাকুর:

'কামারহাটির বামনি কত কি দেখে! গঙ্গার ধারে একলাটি এক বাগানে নির্জন ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপালের কাছে শোয়। বলতে-বলতে চমকে উঠছেন: 'কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ। দেখলে গোপালের হাতে রাঙা। সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়। নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।'

আমার গোপাল ধন-দৌলত চায় না, ভোগ-বিলাস চায় না, সামান্য একটু ক্ষীরসর পেলেই সে খুশি। বড়জোর মাথার একটা বালিশ। কটা নেহাত জংলি ফুল। অসুখ শুনে একটি ভক্ত-মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শরৎ মহারাজ। কামার-হাটির বাগানে একা-একা থাকেন, একটু গিয়ে তাঁর দেখাশোনা করো। তার পর শুনতে পাচ্ছি সে বাড়িতে নাকি নানারকম শব্দ, ছাদের উপর, দরজা-জানলায়। রুগ্ন একা মানুষ, ভয় না পান শেষকালে!

সাহসিকা মেয়ে পিছু হটল না। কিন্তু হাত দেখে আপত্তি করল অঘোরমণি। 'এখানে কেন এলি? ভীষণ কষ্ট পাবি যে। আমার ভয়ই বা কি, ভাবনাই বা কি। আমার তো গোপালই আছে। শোন বাপু, এখানে যখন এসেছিস, এখানে কিন্তু নানান রকম আছে। শব্দ-টব্দ শুনলেই কিন্তু জপে বসে যাবি, আসন ছাড়বিনে—জপ আর আসন। একটু নিষ্ঠা আর অভিনিবেশ। একটু সংকল্প আর উন্মুখতা।

বাগবাজার বৃন্দাবন পালের গলি থেকে দুটি মেয়ে এসেছে অঘোরমণির কাছ থেকে দীক্ষা নিতে।

ওরে আর লোক পেলিনে? আমার কাছ থেকে দীক্ষা?

স্বামীজি এলেন এগিয়ে। বললেন, 'তা জানি না। ওদেরকে তোমার কাছে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। তুমি গোপালের মা।'

'বাবা, আমি কাঙাল ফকির—কিছুই জানি না। আমি কি দেব? বউমা—বউমাও তো নেই এখন এখানে। তবে কী হবে?

'তুমি কি যে-সে ?' বললেন স্বামীজি, তুমি জপে সিদ্ধ। তুমি পারবে না তো কে পারবে ? বলি, কিছু না পারো তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও। তোমার তো সব হয়ে গেছে। তোমার আর ও মন্ত্রে কি দরকার।'

তথাস্তু। মেয়ে দুটির কানে নাম দিয়ে দিল অঘোরমণি।

এবার তবে গুরুদক্ষিণা দাও।

ষোলো আনা পূর্ণ করে দুটি টাকা দিতে গেল মেয়ে দুটি। গোপালের মা বলে উঠল, 'ওগো মনপ্রাণ যে দেবার কথা।' শেষে বলল গম্ভীর হয়ে, 'শোনো, নাম নেওয়া হেলাফেলার জিনিস নয়। অন্তত দশ হাজার যপের পর আসন ছাড়বে। হলেও বেরুবে না, মলেও বেরুবে না।' মানে সংসারে কেউ জন্মালে বা মরলে খেয়াল করবে না। নাম করে যাবে।

এই দেখ না গোপাল-মাকে। ওর পুজো-আচ্চা নেই। সটান বসে গেল জপের সামনে আর কে ওকে টলায়। কে আর ওকে সবায় ওর আনন্দকেন্দ্র থেকে।

পবিত্রতাই আসন। আর ব্যাকুলতাই নাম।

ঠাকুর বললেন, 'নামের মাহাত্ম্য খুব আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কিছু হবার নয়। ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া চাই। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু মন রয়েছে কামকাঞ্চনে তাতে কিছু হবে না। তাই নাম করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন অনুরাগ হয়, যেন দেহসুখ মানযশের প্রতি টান কমে যায়।'

ছোট্ট ঘরটি গঙ্গার জলে ধুয়ে-মুছে খটখটে করে রাখে অঘোরমণি। নিজের হাতে-পায়ে খাটা-খাটুনি করে। একটি সিকেতে মুড়ি বাতাসা নারকেল নাড়ু রাখে, কখন গোপালের খিদে পাবে কে জানে! ডালাকুলো, শিল-নোড়া কোন জিনিসটা না লাগে শুনি। দাঁত মাজবার গুল, খাবার পর দুটি মশলা, জোয়ান বা ধনের চাল, ছেঁচা একটু পান পেলে খাই গোপালকে ভোগ দিয়ে। শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করে বলে উঠল একদিন : 'বলি হ্যাঁ শরৎ, লোকে বলে সংসার ত্যাগ করব! তারা কি পাগল? এই শরীরটাই তো একটা প্রকাণ্ড সংসার। বঁটি কাটারি হাতা-খুন্তি, মেথি পাতা কালো জিরে, কি না হলে চলে বলো দেখি? সব গোপালের সংসার।'

অসুখে ভুগছে, নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলছে, 'গোপাল বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

সারাদিনই এই গোপালের সঙ্গে স্নেহালাপ, কখনো বা শাসন গর্জন। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় নেমে হুলুস্থুল শুরু করেছে। উঠে আয় উঠে আয় বলছি—শাসনের সুরে চেঁচাচ্ছে অঘোরমণি। রাত পোহায়নি এখনো, কেউ এখন জলে নামে? অবাধ্য ছেলে কথা না শুনলে মা তখন আর করে কি। কাঁদতে বসে। ওরে লক্ষ্মীধন আমার, উঠে আয়। কাক কোকিল ডাকুক, চারদিক ফরসা হোক, তখন নাইয়ে দেব। ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপাই ঝুড়লে যে তোর অসুখ করবে।

এক-একদিন ভাত ঢাকা পড়ে থাকে, খেতে বসে না অঘোরমণি। বিকেল হয়ে

আসে, তবুও না। সে কি, গোপালের আজ কি হল? বেলা পড়ে গেল, খাবে না, খিদে পায়নি? কোথায় দুষ্টুমি করছে কে জানে, অঘোরমণি বলে উদাসীনের মত। এ কি খেয়াল, এ কি দুরন্তপনা। আপনি আসনে বসে তাকে একবার ডাকুন। বলে সেই সেবিকা মেয়ে। খেলা ভুলে ছুটে আসবে দুষ্টু গোপাল। আসনে বসল অঘোরমণি। চোখ বুজল। বললে, গোপাল বলছে আজ আর সে নিজের হাতে খাবে না, তাকে খাইয়ে দিতে হবে।

গরাস পাকিয়ে-পাকিয়ে অঘোরমণিকে খাইয়ে দিল সেবিকা।

তেমনি কে আমাকে খাইয়ে দেবে?

ভক্তরা ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে আসি এখানে।

'কিন্তু সে কি এখানে এসে থাকতে পারবে?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

পুরুষদের বাসা, চারদিকে পুরুষের ভিড়, সেখানে সেই লজ্জাপটাবৃতা বাস করতে পারবে সর্বক্ষণ?

সেই নহবতখানায় রাত তিনটের সময় ওঠেন। স্নান সেরে নেন। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জপে বসেন। সেদিন হয়েছে কি, যথারীতি উঠেছেন শেষ রাত্রে। সঙ্গে গৌরীমাকে নিয়েছেন। কখনো মেয়ে, কখনো সঙ্গী, কখনো পরিহাসসরসা সখী। জলের কাছে সিঁড়িতে কালো মতন ঢিপি কি-একটা পড়ে আছে তার উপরে মা পা রেখেছেন অলক্ষ্যে। পা রেখেই চমকে উঠেছেন, ভয় পেয়ে উঠে পড়েছেন দু সিঁড়ি। তাঁকে জড়িয়ে ধরল গৌরীমা। কি, কি হল?

'কুমীর গা!'

'কে বললে কুমীর?' গৌরীমা বললে রঙ্গ করে, 'ও শিব। তোমার চরণ পরশ পাবার জন্যে শব হয়ে পড়ে আছে।'

'রাখ তোর রঙ্গ। আমি বলে ভয়ে মরি। কি সর্বনাশ, একেবারে কুমীরের উপর গিয়ে পড়েছিলুম।'

'তোমার আবার ভয় কি। তুমি অভয়া—তুমি শুভাবহা, অমিয়মী লাবণ্য প্রতিমা।'

'তাঁকে গিয়ে সব বলো।' ভক্তদের বললেন ঠাকুর। 'সব কথা জেনে-শুনে সব দিক বুঝে-সুঝে সে যদি আসতে চায় তো আসুক।'

আসতে চায় তো আসুক। অন্তরের অনুচ্চারিত সুরটুকু ঠিক শুনলেন শ্রীমা। মনে আছে, পানিহাটির উৎসবে শ্রীমা যাবেন কিনা ঠাকুরের সঙ্গে একটি ভক্ত-মেয়ে জিগগেস করতে এসেছিল ঠাকুরকে, আর ঠাকুর বলেছিলেন, ওর ইচ্ছে হয় তো চলুন। যাননি শ্রীমা। বুঝেছিলেন যদিও যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরের সমর্থনের স্পর্শটুকু যেন এসে লাগছে না ঠিক-ঠিক। যেন অশ্রুত একটি সুর বলছে তাঁর কানে-কানে, কি হবে গিয়ে ঐ ভিড়ের মধ্যে, চাই না যে তুমি যাও, তুমি যেয়ো না। কিন্তু এবার? এবারও ভিড়, ভক্ত পুরুষদের অবিরাম আনাগোনা। এবারও আসবেন কি না-আসবেন শ্রীমা'র উপরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু সেই না-শোনা সুরটি কী

বলছে তাঁর কানে-কানে? বলছে, তুমি এস, তুমি এস। কে কষ্টহারিণী, হে আরোগ্যদাত্রী, তুমি এস আমার রোগশয্যার শিয়রে।

চলে এলেন মা।

ঠাকুর বললেন, 'ও খুব বুদ্ধিমতী।'

যখন যাননি পানিহাটিতে তখনো। যখন চলে এলেন শ্যামপুকুরে তখনো।

তুমি বুদ্ধি ও বিদ্যা। তুমি উজ্জ্বলতা ও নির্মলতা। তুমি অম্লানলক্ষ্মী। পীযূষবাদিনী।

সেই একটি মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। তুমি অসাধ্যসাধক আমার একটি উপকার করো। ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। আমার স্বামীকে অলক্ষ্মীতে ধরেছে, তাকে যাতে বশে আনতে পারি তাই করে দাও।

'মা গো, এ বিদ্যে আমার জানা নেই। ঐখানে যে সাধুমায়ী থাকেন তাঁর কাছে যাও।' ঠাকুর নহবতখানার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'তিনি ইচ্ছে করলেই দুঃখ দূর করতে পারেন তোমার।'

ঠাকুর বলেছেন, আর কি। মেয়েটি গিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।'

কী হয়েছে?

মেয়েটি বললে যা বলবার। আপনিই বুঝবেন নারীর প্রাণের কঠিন যন্ত্রণা। শুধু বিচ্ছেদের কষ্ট নয়, অপমানের কষ্ট। আপনিই এর বিহিত করুন। ত্রাণ করুন আমাকে। আমার স্বামীকে।

'আমি সামান্য নারী, আমি কি জানি।' বললেন শ্রীমা।

ছলনা কোরো না মা, ঠাকুর বলে দিলেন তুমিই সর্বব্যথাপ্রশমনী। সংসার-দাবদাহে তুমি অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারা। নইলে কি ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন তোমার দুয়ারে। তুমি পদ্মদলায়তলোচনা দয়াঘনা, মা হয়ে তুমি যদি মেয়ের মুখের দিকে না চাইবে তো কোথায় যাব? কোন দুয়ারে মাথা ঠুকব?

'তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন তুমি তাঁর কাছেই ফিরে যাও।' বললেন শ্রীমা, 'দৈবশক্তি তাঁরই করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সব মঙ্গল হয়। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো।'

মেয়েটি আবার এসে দাঁড়াল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'সাধুমায়ী ফিরিয়ে দিলেন আমাকে বললেন যা ওষুধবিষুধ সব তোমার হাতে। তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই পারেন না। তুমি ইচ্ছে করলেই সব দিতে পারো। যে হারিয়ে গেছে তাকে আনতে পারো ফিরিয়ে।'

মৃদু-মৃদু হাসলেন ঠাকুর। চাপাগলায় বললেন, 'শোনো, সাধুমায়ী ভারি চাপা। কাউকে সহজে ধরা দিতে চান না। তুমি তাঁর কাছে গিয়েই শরণাগত হও। তাঁকে সামান্য ভেবো না, তিনি সকলের চাইতে বড়।'

মূঢ় চোখে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। তুমি তাঁকে গিয়েই ধরো। তাঁর কৃপা হলেই

আশা পূর্ণ হবে তোমার। দুঃখের রাত ভোর হবে।'

একবার এখানে আরেকবার ওখানে। এ কেমনতরো কথা। তার মানে আমি হতভাগিনী, কোথাও আমার ঠাঁই নেই। যার ঠাঁই নেই সে যাবে কোন দুয়ারে। আর কোন দুয়ারে! যার কেউ নেই তারও যে একজন আছে তার কাছে।

তার কাছেই গেল শেষ পর্যন্ত। বললে, 'মা আমায় ফিরিয়ে দিও না। ঠাকুর কি কখনো ভুল বলতে পারেন? তিনি বললেন, তুমি তাঁর চেয়েও বড়। ফাঁকি দিও না মা। তুমি দয়া করলেই মনের সাধটি মিটে যায়।'

মেয়ের কান্নার কাছে হেরে গেলেন মা। প্রসাদী ফুল-বেলপাতা দিলেন তাকে। বললেন, 'এ নির্মাল্যে সমস্ত কিছু নির্মল হোক। তুমি শান্তি পাও।'

১০৪

'মশায়, কি হলে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়?' একজন ভক্ত জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'মন সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করো এক জায়গায়, এক লক্ষ্যে।' বললেন ঠাকুর, 'শুকদেবের কথা আছে, পথে যাচ্ছে যেন সঙিন চড়ানো। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এরই নাম যোগ।'

মনের প্রত্যক্ষের বিষয় ঈশ্বর।

'কিন্তু সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের।' বললেন ঠাকুর।

শুদ্ধ মন কাকে বলে?

যে মনে বিষয়াসক্তির লেশমাত্র নেই। নেই কামকাঞ্চনের কুয়াশা।

'প্রত্যক্ষ করতে হলে দূরবীণ চাই।' বললে মাস্টার। 'ঐ দূরবীণের নামই যোগ।'

'কর্মযোগ আর মনোযোগ। যোগ মোটামুটি এই রকম। বললেন ঠাকুর, 'তুমি চাষ করবার জন্যে নালা কেটে খেতে জল আনছ কিন্তু আলের গর্ত দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা তবে বৃথা। সব শ্রম পণ্ডশ্রম।'

নালা কেটে জল আনাটি কর্মযোগ আর আলের গর্ত দিয়ে জল যাতে না বেরিয়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখাটি মনোযোগ।

'চিত্তশুদ্ধি হলে বিষয়াসক্তি গেলেই ব্যাকুলতা আসবে। তোমার অন্তরের প্রার্থনা পৌঁছুবে ঈশ্বরের কাছে। টেলিগ্রাফের তারে অন্য জিনিস মিশেল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌঁছুবে না।'

যোগ কি? চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। নদীর এক দিকে চর পড়লে অন্য দিকে ভাঙন ধরে। বিষয়-বাসনার স্রোত রুদ্ধ হলেই অমৃতবাসনার স্রোত বাড়তে থাকে। সংসারাভিমুখিতা রুদ্ধ হলেই দেখা দেবে ঈশ্বরাভিমুখিতা। বাহ্যগতি রুদ্ধ হলেই শুরু হবে অন্তর্গতি। তেমনি নিরোধ হলেই যোগ।

আরশুলাকে নিজ বিবরে নিয়ে গিয়ে তাকে মৃদু-মৃদু দংশন করে ভ্রমর, মৃদু-মৃদু গুঞ্জরব শোনায়। ভ্রমরের ভয়ে আরশুলা সারাক্ষণ ভ্রমরের ধ্যান করে। ধ্যান করতে-করতে তার চিত্তবৃত্তি ভ্রমরাকারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তৎস্বরূপত্ব পেয়ে বসে। তেমনি যোগীরাও নিরুদ্ধাবস্থায় এসে ব্রহ্মে লীন হয়। ঐ লয়ই যোগ। 'তুমি কে? কি চাও? একই পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। উজ্জ্বল ও আকুলতাভরা দুটি চোখ তুলে ছেলেটি বললে, 'আমার যোগসাধন করবার ইচ্ছে হয়েছে। আপনি আমাকে শেখাবেন?'

সানন্দ বিস্ময়ে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি এখানকার খবর পেলে কোথায়? তোমার নাম কি? কোত্থেকে আসছ?'

আমার নাম কালীপ্রসাদ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির মাস্টার রসিকলাল চন্দ্রের আমি দ্বিতীয় ছেলে। আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে আমাদের বাড়ি। স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের সভা হচ্ছে। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা দিচ্ছেন শশধর তর্কচূড়ামণি। বক্তৃতার বিষয় হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কদিন ধরেই হচ্ছে। রোজ শুনছি। সাংখ্য-দর্শনের পর শুরু হল পাতঞ্জলির যোগসূত্র। শুনছি আর মন মেতে উঠছে। সাধ হয়েছে যোগাভ্যাস করব। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে একখানা যোগসূত্র কিনলাম। কিবা সংস্কৃত জানি, কতটুকু বা বুঝি ওর অর্থ-মর্ম। তাই একদিন সাহস করে গেলাম চূড়ামণি মশায়ের বাড়ি। আমাকে পাতঞ্জলদর্শন পড়াবেন? চূড়ামণি মশায় তো অবাক। বললেন, বাবা, আমার সময় কোথায়? তুমি কালীবর বেদান্তবাগীশের কাছে যাও। বোলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। গেলাম বেদান্ত-বাগীশের বাড়ি। বেদান্তবাগীশ বললেন, স্নানের আগে চাকর যখন আমার গায়ে তেল মাখাবে তখন যদি উপস্থিত থাকতে পারো একটু-আধটু শেখাতে পারি মুখে-মুখে। তাই সই। সকালে রোজ তাঁর তেল মাখার সময় গিয়ে হাজির হই। মুখে-মুখে মোটামুটি জেনে নিই। যোগসূত্রের পর শিবসংহিতা। যত পড়ি ততই মন ব্যাকুল হয়। কিন্তু সব শাস্ত্রেই ঐ এক কথা, যোগসিদ্ধ গুরু না পেলে একা-একা সাধন করতে গেলেই সর্বনাশ। তখন মন বড় দমে যায়, পড়াশোনা বিস্বাদ লাগে। কোথায় পাব সেই যোগগুরু? বাগবাজারের যজ্ঞেশ্বর আমার বন্ধু। তাকে বললাম আমার মনের যন্ত্রণা। সে বললে, দক্ষিণেশ্বরে যাও। সেইখানেই মিলবে এক মহাযোগী।

তন্ময়ের মত শুনছেন ঠাকুর।

দক্ষিণেশ্বর কোথায়, তাই কি আমি জানি? বাড়ির সবাইকে জিগগেস করলুম কেউ হদিস দিতে পারলেন না। যজ্ঞেশ্বরেরও ঠিকানা জানা নেই যে সেখানে গিয়ে খোঁজ করব। যা থাকে অদৃষ্টে, বেরিয়ে পড়লুম, যেমন গিরিগুহে থেকে নির্ঝরিণী বেরোয়। উত্তরে কোথাও হবে আচমকা একটা আন্দাজ করে চিৎপুরের খাল পেরোলুম। কিসের টানে এগিয়েই চলেছি, সকাল প্রায় দুপুরে গড়িয়ে পড়ল। পথচারী একজনকে হঠাৎ জিগগেস করলুম, দক্ষিণেশ্বর কোথায়

বলতে পারো ? সে কি কথা ! রাজ্যের পথ এগিয়ে এসেছেন, ফিরে যান। আবার ফিরে চললুম। ঘুরতে-ঘুরতে পেলুম ঠিক দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম আপনি কলকাতায় গিয়েছেন, এ বেলা আর ফিরবেন না।

তখন কি আর করি, আপনারই ঘরের উত্তরের বারান্দায় বসে পড়লুম হতাশ হয়ে। হাঁটতে-হাঁটতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, পকেটে একটি আধলাও নেই, বাড়ির লোকদের না বলে-কয়ে এসেছি, তারা না জানি কত উতলা হয়েছে এই সব ভেবে দেহ-মন নেতিয়ে পড়ল। এমন সময় দেখি, কে একটি ছেলে ছাতা-হাতে আসছে এদিকে। আপনজনের মত একেবারে আমার পাশে এসে বসল, নাম শুনলুম শশিভূষণ। এস দুজনে মিলে গঙ্গাস্নান করি, কালীবাড়ির কর্মচারীদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদের বলে কিছু প্রসাদ সংগ্রহ করি দুজনে, তার পর স্থির হয়ে বসে একমনে শুধু ঠাকুরের কথা কই।

ক্রমে-ক্রমে সন্ধ্যে হল, বেজে উঠল আরতির বাজনা। আরতির পর রামলাল-দাদা শীতলভোগের প্রসাদ এনে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে দু বন্ধু শুয়ে পড়লুম বারান্দায়। রাত প্রায় নটা, ঘোড়ার গাড়ির চাকার আওয়াজ হল। ঐ আসছেন ঐ আসছেন ঠাকুর।

কালী, কালী, কালী—গাঢ়গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করতে-করতে ঠাকুর ঢুকলেন তাঁর ঘরটিতে উত্তরের বারান্দা পেরিয়ে। পিছনে গামছা আর বটুয়া হাতে লাটু। শশী গিয়ে বললে কালীপ্রসাদের কথা। ডাকো ডাকো, তাকে দেখিনি কখনো। রামলালকে দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। গড় হয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই জিগগেস করলেন, 'তুমি কে ?'

নবাগত তরুণ সুদীপ্ত চোখে বললে, 'আমি কালীপ্রসাদ।'

উত্তরকালে স্বামী অভেদানন্দ।

'কি চাই তোমার ?'

নির্ভীক অথচ আকুলকণ্ঠে বললে কালীপ্রসাদ, 'আপনার কাছে যোগ শিখতে চাই।'

আশ্চর্য, একবাক্যে রাজী হয়ে গেলেন ঠাকুর। সকলেই তো ভোগ চায়, যোগ চায় কজন ! কে চায় প্রশান্তবাহিতা স্থিতি, কে চায় সুধা-পণ্য !

বললেন, 'তোমার এই কচি বয়েস, তোমার যোগশিক্ষার ইচ্ছে হয়েছে এ তো খুব ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে প্রকাণ্ড যোগী ছিলে, একটুখানি এখনো বাকি আছে, এই তোমার শেষ জন্ম। দেব আমি তোমাকে যোগশিক্ষা। আজ রাত যাক, কাল ভোরবেলা এস।'

রাত কি আর কাটে। বারে-বারে উঠে বসে কালীপ্রসাদ, কতক্ষণে না জানি নব প্রভাতের অরুণরঞ্জন দেখা দেবে। ঠিক সময়ে রামলালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। নিয়ে গেলেন উত্তরের বারান্দায়। একখানি তক্তপোশ পাতা ছিল, বললেন, 'বসো, যোগাসন করে বসো।'

বসল কালীপ্রসাদ।

জিভ দেখি। কালীপ্রসাদ জিভ বের করল। ডান হাতের মাধ্যম দিয়ে ঠাকুর তার জিভে মূলমন্ত্র লিখে দিলেন। নিচে থেকে উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন বুকে, ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন শক্তি। বললেন, তুমি যাঁর প্রসাদ সেই মা-কালীর ধ্যান করো। মুহূর্তে কাষ্ঠবৎ সমাহিত হয়ে গেল কালীপ্রসাদ।

নিষ্কল নির্মল নিরাময় শান্ত ও সর্বাতীত। বর্ণমালা অভ্যাস করেই সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্তে আনা যায়, তেমনি যোগাভ্যাস করেই পাওয়া যায় তত্ত্বজ্ঞান। বিচ্ছিন্ন বর্ণ কোনো পদবিন্যাস করতে পারে না, কিন্তু একত্র গ্রথিত করলেই কেমন বাক্য-পদ-ছন্দের আকৃতি ধরে। তেমনি সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে একটি কেন্দ্রে সংলগ্ন করা একটি অর্থে আরূঢ় করার নামই যোগ।

নীরদনীল সমুদ্র সামনে পড়ে আছে, তার জল খেয়ে কী পিপাসা মিটবে? মিটবে না। বরং সেই লোনা জল যত খাবে ততই আরো বাড়বে পিপাসা। তবে উপায়? উপায় সূর্য। সূর্য সেই লোনা জল টেনে নেবে স্বতেজে, তার পর ধরাধর রূপ ধরে ধারাবর্ষণ করবে। সেই মেঘপতিত বৃষ্টির জলেই তোমার তৃষ্ণার তৃপ্তি, তোমার দাহের নিবারণ।

এই সমুদ্র হচ্ছে শাস্ত্র। তুমি নিজে থেকে এর জলপান করো তৃষ্ণানিবৃত্তি হবে না। সহস্রবর্ষ পরমায়ু পেলেও পার হতে পারবে না এই মহাসাগর। সুতরাং গুরুরূপী সূর্যকে ডাকো। সূর্যের শরণ নাও। লবণাক্ত জল টেনে নিয়ে সূর্য তোমাকে পরিচ্ছন্ন জল দেবে, তোমার তৃষ্ণাবারক মন্ত্র তোমার সিন্ধুপারক সাধন প্রণালী। সুতরাং গুরুর পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।

উপর থেকে নিচে কালীপ্রসাদের বুকে আবার হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর। কেটে গেল সমাধি। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান।

'জলে জল, অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ।' বললেন ঠাকুর, 'জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে দেখবে এই সত্যকে।' আবার বললেন, 'অনন্ত আকাশ তাতে পাখি উড়ছে পাখা মেলে। চৈতন্য আকাশ, আত্মা পাখি খাঁচায় নেই, চিদাকাশে উড়ছে। আনন্দ আর ধরে না।'

যখন নিজ দেহের অন্তঃপুরে একাকী বসে তোমাকে ডাকি, তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। আমার সামনে এসে দাঁড়ালে তোমাকে আর ডাকতে হয় না, তোমার সেই ডাক-নাম—নাম-জপও আমি ভুলে যাই। তুমিই বা তখন কোথায়! শুধু দেখি তোমার রূপ, রূপের তরঙ্গ, মাধুর্যসমুদ্রের প্রশান্তি। ডুবে যাই লীন হয়ে যাই। আমার আমি তোমার আমিতে বিভোর হয়ে যায়। শিবমূর্তির মূল ধ্যান আর থাকে না, কল্যাণস্পদ শিবতত্ত্বে নিমগ্ন হই।

'মহীনবাবু, কি টাকা-টাকা করছ!' ঠাকুর বললেন ডাক্তার সরকারকে। 'মাগ, মাগ—মান, মান। ও সব এখন ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। একচিত্ত হও। ঈশ্বরআনন্দ ভোগ করো।' বলতে-বলতেই ভাবাবিষ্ট হলেন ঠাকুর।

ডাক্তার বললে, 'কথা আর ভাব এখন ভালো নয়।'

কে শোনে সে কথা। ঠাকুর তাকালেন ডাক্তারের দিকে। বললেন, 'জানো,

কাল ভাবাবস্থায় তোমাকে দেখলাম। দেখলাম জ্ঞানের আকর কিন্তু মগজ একেবারে শুকনো। আনন্দরসের ছিটেও লাগেনি। কিন্তু যদি একবার পাও সেই রসের সন্ধান, অধঃ-ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, হ্যাক-ম্যাক লাঠিমারা কথাগুলো আর বেরুবে না মুখ দিয়ে।'

ডাক্তার হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু। বললে, 'একেবারে শুকনো।'

'তুমি এ সব বিশ্বাস করো না,' ঠাকুর বললেন, 'ডাক্তার ভাদুড়ী বলছিল মন্বন্তরের পর তোমার একেবারে ইট-পাটকেল থেকে শুরু করতে হবে।'

হেসে উঠল ডাক্তার। বললে, 'তাতে ক্ষতি কি। যদি ইট-পাটকেল থেকে শুরু করে অনেক জন্মের পর মানুষ হই আর এখানে আসি তাহলে আবার সেই ইট-পাটকেল থেকে শুরু।'

হেসে উঠল সকলে।

১৩৫

মেডিকেল কলেজের ইংরেজ ডাক্তার কোটস এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। যদিও হোমিওপ্যাথি চলছে, একবার দেখে যেতে ক্ষতি কি। যে প্রণালীতে সাহেবি পরীক্ষার বিধি তা এক কথায় বলা যায় আসুরিক। সরাসরি ঠাকুরের গলা টিপে ধরলেন। যন্ত্রণায় শিউরে উঠলেন ঠাকুর। বুঝলেন ব্যাধির চেয়ে চিকিৎসাই মর্মান্তিক। তখন কি আর করা! স্বভাবজ সমাধিতে ডুবে গেলেন। এখন দেখ তোমার যত খুশি। যত খুশি কসরত করো।

সাহেবের চক্ষু স্থির! এ কি অদ্ভুত রোগী! ভূতলে অতুল শোভা এ কি নির্মলকান্তি! রোগ দেখবে না রোগী দেখবে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সাহেব।

কেমন দেখলে?

রোগ তো ক্যানসার, বলতে পারি সহজে। কিন্তু এ রোগী কে? সর্বলোক-সুখাবহ সর্বচক্ষুস্নেহপ্রদ। এমনটি তো আর দেখিনি কোথাও। বাইবেলে পড়েছি যীশুর এমন ভাবসমাধি হত। আজ দেখলাম স্বচক্ষে। দেহবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। শরীরে যে এত কষ্ট আননমণ্ডলে যেন তার চিহ্নমাত্র নেই। কণ্টক-কষ্ট উত্তীর্ণ হয়েও যেন ফুটে আছে আনন্দপদ্ম। যিনি মহাচিন্ময় হয়েও বৃহৎ পাষাণবৎ স্থিত, যিনি জড়ের অন্তঃস্বরূপ চৈতন্য—সাহেব যেন সেই পরমাত্মার রূপ দেখলে। ছদ্মবেশধারী রাজাকে।

চিকিৎসার ভার নিল না সাহেব। তা না নাও, তোমার প্রাপ্য ফি-টা নিয়ে যাও। হাত গুটোল সাহেব। বললে, টাকা ছুঁয়ে হাত ও মন অশুচি করতে পারব না। এ টাকাটা ওঁরই সেবায় ব্যয় হোক।

তারপর এল ডাক্তার নবীন পাল। মহেন্দ্র সরকার রোজ আসতে পারে না এত দূর, তাই হাতের কাছে একজনকে মজুত রাখো। নবীন পাল ডাক্তার হয়েও

কবরেজি করে! মন্দ কি, তার চিকিৎসাই কদিন করা যাক না। কিন্তু সুবিধে হল না। তার বিধিব্যবস্থাও ক্লেশদায়ক। হোমিওপ্যাথিই ভালো। তবে এবার একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্তকে নিয়ে এস।

কিন্তু রাজেন্দ্র শুধু ডাক্তার হয়েই আসে না, ভক্তমূর্তিতে আসে। কখনো হাতে একটি সুগন্ধি ফুল নয়তো সুমধুর একটি ফল। কি পথ্য খেতে ইচ্ছে করে তোমার—কখনো বা সেই পথ্য। বিদ্যুম্মালামণ্ডিত এ কে মহামেঘ! গ্রীষ্মক্লিষ্ট ধরিত্রীকে কৃপাবারিসিঞ্চনে তুষ্টপুষ্ট করছেন। আমার তো চিকিৎসা নয়, আমার এ ব্রত, হরিতোষণ ব্রত। আহা, দুর্বল শরীরে ঐ চটিজুতোর ভার, তুমি বইতে পারছ না—মখমলের নরম চটি হলে ভালো হয়। রাজেন দত্ত মখমলের চটি নিয়ে এল। নিজ হাতে পরিয়ে দিল শ্রীপদে। নিত্যসিদ্ধ আগুন যেমন কাঠে আবির্ভূত হয় তেমনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর মহাভূতরূপে জন্ম নেয়। কিন্তু কে তাকে চেনে? সমুদ্রস্থ চন্দ্রকে মাছ কমনীয় জলচর মনে করে, চিনতে পারে না অমৃতপিণ্ড বলে। কৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বাস করেও যদুবংশীয়েরা চিনতে পারেনি হরিকে। শীতোষ্ণবাতবর্ষে অভিভূত আমরা, সংশয়খিন্ন বুদ্ধি আমাদের, চিনতে পারব কি তোমাকে? হে তমঃসংহর্তা বিজ্ঞানাত্মা, তোমার সর্ব প্রকাশক প্রভাতের আলোটি কি আমাদের চোখে এসে পড়বে?

ডাক্তার সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ওষুধ দিল রাজেন্দ্র। একটু যেন ফল হল। ব্যথার যেন উপশম হল খানিকটা। কিন্তু সেই ফল কি চিকিৎসার, না, ভক্তির? ভক্তিই একমাত্র বলবিধায়িনী ওষধি।

কদিন পরেই আবার যে-কে-সে। ডাকো মহেন্দ্র সরকারকে।

কিন্তু অসুখের কথা কই? কেবল ঈশ্বরের কথা। সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন, সেই কথা।

'কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন', বললেন ঠাকুর, 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছ—কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এস। অর্জুন গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখছ? অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ। কি গাছ? জাম গাছ। কি ফলে আছে? অর্জুন বললেন, কালো জাম থোলো-থোলো হয়ে ঝুলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কালো জাম নয়। দেখ ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখ। তখন অর্জুন দেখলেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখলে তো? আমার মত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।'

ডাক্তার সরকার বললে, 'এসব বেশ কথা।'

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেমন কথা?'

'বেশ।'

'তবে একটা থ্যাঙ্ক-ইউ দাও।' লোকার্তিহর হাসি হাসলেন ঠাকুর।

পরিহাসের স্বচ্ছ জলের উপর ফোটাচ্ছেন বর্ণাঢ্য ভাবপদ্ম। ঈশ্বরকথার চন্দনে স্নিগ্ধ করছেন রোগযন্ত্রণা।

কিন্তু, জানো ডাক্তার, ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছ।' ডাক্তার সরকার শাসিয়ে উঠল।

সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর যবের মণ্ড—এই তো পথ্য সারা দিনের। তার মধ্যে আবার অনিয়ম কি?

'কি, কুপথ্য করেছ, তাই—'

ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই না তো!'

'আচ্ছা, আজ কোন-কোন আনাজ দিয়ে ঝোল রান্না হয়েছিল?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'আলু কাঁচকলা বেগুন—' ঠাকুর আবার মাথা চুলকালেন: 'দু-এক টুকরো ফুলকপিও ছিল—'

'এ্যাঁ! ফুলকপি? ফুলকপি দিয়েছ? এই তো খাবার অত্যাচার হয়েছে।' তড়পাতে লাগল ডাক্তার: 'ক-টুকরো খেয়েছ?'

'না গো এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মত: 'তবে ঝোলে ছিল দেখেছি।'

'দেখেছ? তবেই হয়েছে। না খেলে কী হয়?'

'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার ভাব করলেন।

'কপি না খাও ঝোল তো খেয়েছ। ঝোলে কপির গুণ ছিল। তারই জন্যে তোমার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছে।'

'সে কি গো!' ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিল তাইতেই অসুখ বাড়ল? এ কিছুতেই মানতে প্যরব না।'

'মানতে পারবে না কেন?' ডাক্তার বসল গ্যাঁট হয়ে: 'আমার বেলায় কি হয়েছিল তবে শোনো! হোমিওপ্যাথি করি, ছোট একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। তুমিই তো বলো, ছোট-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি। সেবার আমার দারুণ সর্দি হল। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস। কিছুতেই সারে না। কেন যে অসুখটা লেগে থাকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'দেখি চাকর গরুকে মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সে গরুটাকে। কি ব্যাপার? চাকর বললে, কোত্থেকে কতগুলো মাষকড়াই জুটেছে, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে-ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম যেদিন থেকে মাষকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কি করলে?'

'গরুর মাষকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও সেরে গেল।'

সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

'কিসে কি হয় কিছু বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়ল ডাক্তার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরি কাশি, হুপিং

কাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল।'

'গাধা ভিজেছিল কি গো!'

'যে গাধার দুধ খেত মেয়েটি সেই গাধা ভিজেছিল বৃষ্টিতে।'

'কি বলে গো!' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন: 'সেই যে বলে তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছে!'

পড়ল আবার হাসির রোল।

'জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল।' ফোড়ন দিল ডাক্তার: 'তা ডাক্তারের পরামর্শ করে জাহাজের সারা গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলে।'

কিন্তু ঠাকুরের অসুখ নরম পড়ে না কিছুতেই।

শশধর তর্কচূড়ামণির অন্য কথা। নিজের চিকিৎসা নিজে করো। কি ছাই পরের কাছে ব্যবস্থা চাও, নিজেই নিজের ব্যবস্থা করো। তুমি নিজের ভবরোগ-বৈদ্য হয়ে কি করতে অন্য ডাক্তারের শরণ নিচ্ছ! হাতে যার লণ্ঠন সে টিকে ধরাবার জন্যে প্রতিবেশীর ঘরে আগুন চাইতে যায় কেন?

কি করতে হবে?

'শাস্ত্রে পড়েছি আপনার মত যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা ইচ্ছা করলেই শারীরিক রোগ আরাম করতে পারেন। যেখানটায় কষ্ট সেখানটায় মন একাগ্র করে আরামের তীব্র প্রার্থনা করলেই তা সেরে যায়। তা একবার দেখুন না চেষ্টা করে।'

'তুমি এত বড় একটা পণ্ডিত হয়ে এমন কথা বললে?' ঠাকুর আপত্তির সুরে বললেন, 'যে মন সচ্চিদানন্দে দিয়েছি তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচার উপর দেব?' এটা তুমি কেমন কথা বললে গো?'

সেবার এক কুষ্ঠরোগী এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, দয়া করে যদি একবার হাত বুলিয়ে দেন তবেই আমি সেরে যাই।'

'কই আমি তো জানি না কিছু!'

'আপনাকে কিছু জানতে হবে না।' লোকটি কান্নায় লুটিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে। 'শুধু দয়া করে একটু হাত বুলিয়ে দিন।'

'যখন বলছ দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। মা'র ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।' হাত বুলিয়ে দিলেন ঠাকুর।

হাত বুলিয়ে দেবার পর তখন নিজের হাতে কি অসম্ভব যন্ত্রণা! অস্থির হয়ে উঠলেন। মাকে বললেন আকুল হয়ে, 'মা এমন কাজ আর করব না।'

রোগীর রোগ সেরে গেল আর যত ভোগ নিজে টেনে নিলেন।

দেখতে পেলেন একদিন স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে এসে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দেখলেন তার পিঠময় ঘা। এমন কেন হল?

তখন মা দেখিয়ে দিলে, যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়, তখন তাদের সেই দুষ্কর্মের বোঝা নিতে হয় ঘাড় পেতে। সেই জন্যেই তো এই রোগ, এত কষ্ট।

সকলের পাপ আর তাপ জবালা আর যন্ত্রণা বহন করে নিয়ে যাব। আমার রোগে সকলের আরোগ্য।

নগরের প্রান্তে এসে সিম্খার্ত তাঁর অশ্বকে বিদায় দিলেন। দেখলেন পথের উপর কটিধ্‌তকাষায়পরিহিত এক কিরাত। বললেন, তোমার ঐ ছিন্ন কাষায়খানা আমাকে দাও।

সিম্খার্থের পরিধানে কৌষেয়। বিনিময়ে তা পাবার লোভে কিরাত তার কাষায় ত্যাগ করল। আর তথাগত কৌষেয়বাস ছেড়ে জীবরক্তকলঙ্কিত অশ্‌চি বসন গায়ে ধরলেন।

জীবজগতের প‌্ঞ্জিত বেদনা বহন করে চললেন বনপথে।

কৌষেয়পরা ব্যাধ চলল তাঁর পিছ্‌-পিছ্‌। এ কি, তুমি কোথায় চলেছ এই গহন রাতে?

ব্যাধ বললে, 'এ কী বসন তুমি পরালে আমাকে? তীরধন্‌ক খসে পড়ছে আমার হাত থেকে। জগৎপ্রাণীকে মনে হচ্ছে আত্মজন। তুমি তোমার বসন ফিরিয়ে নাও। আমাকে দাও আমার জীর্ণ চীর।'

সিম্খার্থ তাকে ব্‌কে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'ভাই তুমিই আমার সাধনার পথের প্রথম বন্ধ্‌। জীবনবসন জীবহিংসাচিহ্নিত হয়ে আছে, অহিংসার সাধনায় এস তাকে নবীনধবল করি। কৌষেয় জীর্ণ হোক, দ্‌র হোক হিংসাদ্বেষকলহ আর কাষায় পবিত্র হয়ে বিশ্বমানবের নির্বাণবেশ রচনা কর্‌ক।'

১৩৬

নলিনীদলসনাথ সরোবরের পারে এসে দাঁড়ালেন য্‌ধিষ্ঠির। দেখলেন, হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—চার পর্বতের মত তাঁর চার ভাই, ভীম, অর্জ্‌ন, নকুল, সহদেব, মরে পড়ে আছে। হা কুর্‌কুলকীর্তিবর্ধন, তোমাদের এ দশা কে করল? কাঁদতে লাগলেন আকুল হয়ে।

আমি করেছি। আমি যক্ষ। এই সরোবর আমার অধিকারে। আমার নিষেধ অমান্য করে তোমার চার ভাই জল পান করতে চেয়েছিল, তাই তাদের মেরেছি। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তার পর চাও তো জল খাও।

নিশ্চয়ই। তোমার অধিকৃত বস্তুতে আমার অভিলাষ নেই। বললেন য্‌ধিষ্ঠির। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর কি দিতে পারব ঠিক-ঠিক? আত্মশ্লাঘা করছিনে, সাধ্‌প্‌র্‌ষেরা আত্মশ্লাঘার নিন্দে করে থাকেন, তবে এইট্‌কু শ্‌ধ্‌ বলতে পারি, নিজের ব্‌দ্ধি-অন্‌সারে তোমার উত্তর দেব।

বেশ, তবে শোনো: স্‌র্যকে কে ঊর্ধ্বে রেখেছে? কে স্‌র্যের চার দিকে বিচরণ করে? কে তাঁকে আস্তে পাঠায়? কোথায় বা তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?

য্‌ধিষ্ঠির উত্তর করলেন: ব্রহ্ম স্‌র্যকে ঊর্ধ্বে রেখেছেন, দেবগণ তাঁর

চারদিকে ঘুরে বেড়ান, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠান, আর তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন সত্যে।

ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি কারণে? তাদের কোন ধর্ম সাধুধর্ম? কিসে তাদের মানুষ ভাব? অসাধু ভাবই বা কেন? বেদপাঠের হেতু তাদের দেবত্ব। তপস্যাই সাধুধর্ম। মৃত্যু মনুষ্যভাব। আর পরনিন্দায় তারা অসাধু। ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব মনুষ্যভাব অসাধুভাবই বা কি?

অস্ত্রনিপুণতা দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগই অসাধুভাব।

পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর কে? আকাশের চেয়ে উচ্চতর কে? বায়ুর চেয়ে শীঘ্রতর কে? তৃণের চেয়ে বহুতর কে? মাতা পৃথিবীর চেয়ে গুরুতর। পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু। মন বায়ুর চেয়ে শীঘ্রগামী। আর তৃণের চেয়ে বহুতর হচ্ছে চিন্তা।

কে নিদ্রিত হয়েও নয়ন মুদ্রিত করে না? জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত হয় না? কার হৃদয় নেই? কে বেগে বর্ধিত হয়?

মাছ নিদ্রাকালেও চোখ বোজে না। অণ্ড প্রসূত হয়েও নিষ্পন্দ। পাষাণই হৃদয়হীন। নদীই বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষু—এদের মিত্র কে?

প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্যা, আতুরের চিকিৎসক, মুমূর্ষুর দান।

কে সর্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম কি? অমৃত কি? সমুদয় জগতই বা কি পদার্থ?

অগ্নি সর্বভূতের অতিথি। জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম। সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত। বায়ুই সমুদয় জগৎ।

কে একাকী বিচরণ করে? কে বারে-বারে জন্মায়? কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

সূর্য। চন্দ্র। পৃথিবী।

ধর্মের, যশের, স্বর্গের ও সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

দাস্য ধর্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের, শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

কি ত্যাগ করলে প্রিয় হয়? কি ত্যাগ করলে শোক যায়? কি ত্যাগ করলে ধনী হয়? কি ত্যাগ করলে সুখী হয়?

অভিমান ত্যাগ করলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করলে শোক যায়, কামনা ত্যাগ করলে ধনী হয়, আর লোভ ত্যাগ করলে সুখী।

তপঃ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

স্বধর্মানুবর্তিত্বই ধর্ম, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা আর অকার্য থেকে নিবৃত্তিই লজ্জা।

জ্ঞান শম দয়া ও আর্জব কাকে বলে?

তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখাভিলাষই দয়া আর সমচিত্ততাই আর্জব।

স্থৈর্য ধৈর্য স্নান ও দানের কি লক্ষণ ?

স্বধর্মে নিয়তাবস্থা স্থৈর্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান আর প্রাণিরক্ষাই দান।

অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি ?

অজ্ঞানই অহংকার, ধর্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য আর পরের প্রতি দোষারোপই পৈশুন্য।

সুখী কে ? আশ্চর্য কি ? পথ কি ? বার্তাই বা কাকে বলে ?

যিনি অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে দিবসের অষ্টম ভাগে বা সন্ধ্যাকালে গৃহে শাক পাক করেন তিনিই সুখী। প্রাণিগণ শমনসদনে যাচ্ছে প্রত্যহ তবু অবশিষ্ট সকলে চিরজীবী হতে চায়, এইটেই আশ্চর্য। নানা মুনির নানা মত, ধর্মের তত্ত্ব গুহানিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গেছেই তাই পথ। আর বার্তা ? মহামোহরূপ কটাহে কাল জগৎপ্রাণীকে পাক করছে, সূর্য তার আগুন, দিন-রাত্রি তার ইন্ধন, মাস-ঋতু তার দর্বী।

যক্ষ বললে, তুমি ঠিক-ঠিক সব উত্তর দিয়েছ। এখন শেষ প্রশ্নের জবাব দাও। পুরুষ কে ? আর সর্বধনীই বা কোনজন ?

পুণ্যকর্মের ফলে মানুষের নাম স্বর্গ স্পর্শ করে ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, সেই নাম যত দিন থাকে তত দিনই পুণ্যকর্মা পুরুষ বলে গণ্য। যে অতীত বা অনাগত সুখ-দুঃখ প্রিয়-অপ্রিয় তুল্য বলে মনে করে সেই সর্বধনী।

বেশ, খুশি হলাম। এখন ভ্রাতাদের মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নাও, সে বেঁচে উঠবে।

যুধিষ্ঠির বললেন, তবে একমাত্র নকুল জীবিত হোক।

সে কি ? ভীম, অর্জুন কারু প্রাণ না চেয়ে বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ চাইলে ? ধর্মকে নষ্ট করলে ধর্মই আমাদের নষ্ট করবেন, বললেন যুধিষ্ঠির, আর রক্ষা করলে রক্ষা করবেন। কুন্তী আর মাদ্রী উভয়েই আমার জননী। উভয়ে পুত্রবতী থাকুন এই আমার অভিলাষ।

তুমি কামনায় ও কার্যে, অন্তরে-বাহিরে অনৃশংস। অতএব তোমার সকল ভাইই পুনর্জীবিত হোন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশ্নোত্তরমালিকা দেখ।

পথ কি ? যত মত তত পথ।

দেবতা থেকেও বড় কে ? মানুষ। মানুষ কে ? যে মান-হুঁশ সে। আর আমি কে ? তুমি।

দয়া কি ? সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া। চাতুরী কি ? যে চাতুরীতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সিদ্ধ কে ? পরের দুঃখে যে কাঁদে। তত্ত্বজ্ঞান কি ? আত্মজ্ঞান। লাভ কেমন ? ভাব যেমন।

দেহের যত্ন করবে কেন ? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবে বলে। ঈশ্বর কে ?

মানুষ। কোথায় তার বৈঠকখানা? ভক্তের হৃদয়ে।

জ্ঞান অজ্ঞান কি? এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। যখন হোথা তখন অজ্ঞান, যখন হেথা তখন জ্ঞান।

বীরভক্ত কে? সংসার থেকে যে ঈশ্বরকে ডাকে। উপায় কি? দুটি—অভ্যাস আর অনুরাগ। কার হয় না? যে বলে আমার হবে না।

তপস্যা কি? সত্য কথা। মন্ত্র কি? মন তোর মন্তোর। মায়া কি? কামকাঞ্চন। অবিদ্যা কি? যে ঈশ্বরের পথে বাধা দেয়।

গীতার অর্থ কি? দশ বার গীতা-গীতা বলে যা হয়। কার কাছে ঈশ্বর ছোট? ভক্তের কাছে। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়, কেন না ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভক্তের কেমন স্বভাব? আমি বলি তুমি শোনো, তুমি বলো আমি শুনি।

কোথায় নিমন্ত্রণের দরকার হয় না? যেখানে হরিনাম।

ঈশ্বর আমাদের কি? আমাদের বিলেত।

আর, ইচ্ছা কি? স্বাধীন ইচ্ছা না ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কলকাতা বড় আদালতের উকিল জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'মশায়, একটি সন্দেহ আমার যায় না। এই যে বলি ফ্রি উইল, স্বাধীন হচ্ছে, মনে করলে ভালোও করতে পারি মন্দও করতে পারি, এটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন?'

'সব ঈশ্বরাধীন, সব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। এই দেখ না বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।' আবার বললেন, 'যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রমে তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। পাপে ভয় হত না, পাপে শাস্তি হচ্ছে এ বোধ হত না।'

সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজো হচ্ছে। উঠানে ভক্ত সঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর। ঠেসান দেওয়ার জন্যে ঠাকুরকে তাকিয়া দেওয়া হল। তাকিয়া সরিয়ে রাখলেন।

'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো অভিমান ত্যাগ করা বড় শক্ত। এই বিচার করছ অভিমান কিছু নয়, আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। স্বপ্নে ভয় দেখেছ, জেগে উঠেও ভয়ে বুক দুর-দুর করে। অভিমানও সেই রকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে পড়ে কোত্থেকে। কেবল মুখভার, কেবল নালিশ, আমায় খাতির করলে না, আমাকে তাকিয়া দিল না ঠেসান দিতে।'

নদীর জল নদীতে আছে, সে জল কি আমার? বনের ফুল ফুটে আছে কাননে, সে ফুল কি আমার? জল যখন তুলে আনি কলসীতে তখন বলি আমার। ফুল যখন তুলে এনে ডালিতে সাজাই তখন বলি আমার। জল দিয়ে দাও তৃষ্ণাতুরকে, ফুল দিয়ে দাও দেবতার পুজোয়। তখনই সার্থক, অহং আত্মা।

আমি শরীর তুমি আত্মা। আমি রথ তুমি রথী। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি গাড়ি তুমি ইঞ্জিনিয়র।

বৈদ্যনাথের দিকে ফের তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'আপনি কি বলো ? তর্ক করা ভালো ?'

'আজ্ঞে না। তবে তর্ক করার ভাব জ্ঞান হলে যায়।'

'থ্যাংক ইউ। যদি কোনো মহাপুরুষ বলে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও লোকে তার কথা নেয় না। বলে ও যখন দেখেছে তখন আমাকেও দেখিয়ে দিক। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায় ? যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, সেই বৈদ্যের সঙ্গে ঘোরো। তখন কোনটা কফের কোনটা পিত্তের কোনটা বায়ুর বুঝতে পারবে। আগে সুতোর ব্যবসা করো তবেই তো বুঝতে পারবে কোনটা চাল্লিশ নম্বর কোনটা একচাল্লিশ নম্বরের সুতো।'

খোল বাজছে। এবার কীর্তন শুরু হবে। উৎসুক হয়ে গায়ক জিগগেস করছে, কি পদ গাইব ?

ঠাকুর বললেন, 'ওগো একটু গৌরাঙ্গের কথা কও।'

রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত কীর্তন চলল। ঠাকুর কত নাচলেন, আখর দিলেন।

সুরেন বললে, 'আজ কিন্তু মায়ের নাম একটুও হল না।'

প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'আহা, মা কেমন আলো করে বসে আছেন। দর্শনে ভোগের ইচ্ছা দুঃখশোক সব পালিয়ে যায়। নিরাকার কি দর্শন হয় না—হয়, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এতটুকু থাকলে আর হবে না। দেখ দেখি, বাইরে কেমন দর্শন করছ আর আনন্দ পাচ্ছ।'

সুরেন কারণ পান করে। একবার গিরিশ ঘোষ বসেছিল সামনে। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন সুরেনকে : 'তুমি আর কি ! ইনি তোমার চেয়ে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সুরেন বললে হাসতে-হাসতে, 'ইনি আমার বড় দাদা !'

কারণ খেয়ে কি হবে ? কারণানন্দদায়িনীর করুণাসুধা পান করো। সহজানন্দ হয়ে যাও।

'তুমি কারণ খেয়েছ ?' বলতে-বলতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট।

প্রতিমার সামনে প্রণাম করলেন ঠাকুর। এবার যাবেন দক্ষিণেশ্বর। হাঁক দিলেন : ও—রা, জু—আ ?'

অর্থাৎ, ও রাখাল, জুতো আছে না হারিয়ে গেছে ?

১৩৭

গোপালের মা ভাত রাঁধছে ঠাকুরের জন্যে। সব তৈরি, খেতে বসেছেন ঠাকুর। কিন্তু এ কি, ভাতগুলি যে শক্ত, সেদ্ধ হয়নি ভালো করে। ঠাকুর বিরক্ত মুখে বললেন, 'এ ভাত কি আমি খেতে পারি ? ওর হাতে ভাত আর আমি কখনো খাব না।'

এ কথনো হতে পারে ? গোপালের মা যার তিনি অঞ্চলের নিধি, যার তিনি

অন্ধের নড়ি, কাঙালের কড়ি, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? এ নিশ্চয়ই অভিমানের কথা, হয়তো বা ভয় দেখানো। ভবিষ্যতে সাবধান হোয়ো, মনোযোগী হোয়ো, তারই শাসনউচ্চারণ। দেখবে, এখুনিই মেঘ কেটে যাবে, ধুয়ে যাবে অভিমান, গোপালের মাকে ডেকে এনে করবেন কত স্নেহ-সমাদর, আবার রাঁধতে বলবেন আরেকদিন।

কিন্তু, না, অক্ষরে-অক্ষরে ফলল। কদিন পরেই অসুখ হল ঠাকুরের। দেখতে-দেখতে বেড়ে গেল অসুখ। বন্ধ হল ভাত খাওয়া। গোপালের মা'র হাতে ভাত খাওয়া ঘুচে গেল এবারের মত।

'আজ বিকেলে একবার যদু মল্লিকের বাগানে যাব।' এক ভক্তকে একদিন বললেন ঠাকুর।

কিন্তু সেদিনই দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের সমাগম। সারা দিন কেবল কথা আর কথা। আর সব প্রসঙ্গের শেষ আছে ঈশ্বর প্রসঙ্গের শেষ নেই। আর সব কথা বলতে ক্লান্তি শুনতে ক্লান্তি কিন্তু ঈশ্বরকথা যে বলে যে শোনে দুই-ই অফুরন্ত।

অনেক রাত্রে, যখন সবাই বিদায় হয়ে গিয়েছে, যদু মল্লিকের বাগানে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। আর কি স্থির থাকা যায়! তখুনি উঠে পড়লেন, চললেন হন-হন করে। ও কি, কোথায় যাচ্ছেন? যদু মল্লিকের বাগানে। সে কি, এত রাতে, এই অন্ধকারে! তা হোক, বারণ শুনলেন না কারু, সটান এগিয়ে চললেন। কিন্তু যাবেন কোথায়, বাগানের গেট বন্ধ। তাতে কি, দমবার পাত্র নন ঠাকুর। বাক্য যখন একবার উচ্চারণ করেছেন তখন সত্য পালন করতেই হবে। দারোয়ানকে ডাকলেন। বললেন, গেট খুলে দাও। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তখন বাগানের মধ্যে খানিক পাইচারি করে সুস্থির হলেন।

সুরেন মিত্তিরের বাগান থেকে ফিরছেন ঠাকুর, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমি তখন নুচি খাইনি, আমাকে একটু নুচি এনে দাও।'

লুচির থালা নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। একটু কণিকামাত্র ভেঙ্গে মুখে দিলেন। বললেন, 'এর অনেক মানে আছে। নুচি খাইনি মনে হলে আবার ইচ্ছে হবে। হয়তো আবার আসতে হবে এখানে।'

মণি মল্লিক হেসে বললে, 'বেশ তো সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আসতাম।'

'দেখ রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট।' একদিন বললেন মণি মল্লিককে: 'তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দাও না কেন! কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা আছে, অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনি তুমি নাকি বড় হিসেবী।'

বরানগরে বাগান আছে মণিলালের। সিঁদুরেপটি থেকে প্রায়ই সেখানে আসে আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে দেখে যায়। সারা পথই কি আর গাড়িভাড়া করে আসে? ট্রামে করে প্রথমে শোভাবাজার, সেখান থেকে শেয়ারের গাড়িতে বরানগর। আর বাকি পথটা কখনো পায়ে হেঁটে। অথচ অঢেল পয়সা।

পয়সার প্রতি যে টান সে টান দিতে পারো ঈশ্বরকে ? কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টান। ঠাকুর বললেন, 'তোরা আর কিছু নিস বা না নিস কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর টানটুকু নে।'

হেসে বললেন, 'টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছে করে।'

'টাকা বার করতেই অনেক হিসেব।' বললে মাস্টার : 'তবে ঐ যে বলেছিলেন ত্রিগুণাতীত হয়ে সংসারে থাকা—'

'হ্যাঁ, বালকের মত।' ঠাকুর আরো সহজ করে দিলেন।

কিন্তু বড় কঠিন। সহজ হওয়াই শক্তিমানের তপস্যা।

স্বভাবকে লাভ মানেই সহজকে লাভ। নেব—এটা স্বভাব নয়, দেব—এটাই স্বভাব। মেঘ জল দেয়, বৃক্ষ ফল দেয়, আগুন আলো দেয়। চারদিকেই এই দেওয়ার দেওয়ালি। বিনা কারণে উৎসর্গের উৎসব। আমার চারদিকে এই উৎসব, আর আমি ম্লান স্তব্ধ ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে থাকব ? আমিও মাতব এই উৎসবে। দায় নেই দান বাধ্যতা নেই বিতরণ—সেই আনন্দযজ্ঞে। আর কাউকে কিছু দিইনি, তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে যাব। মৃত্যু দিয়ে তৈরি তুচ্ছ উপকরণ নয়, অমৃত দিয়ে ভরা আত্মার উপঢৌকন।

শুধু ধূমায়িত হব, একবারও প্রজ্বলিত হতে পারব না, এই কলঙ্ক থেকে আমাকে ত্রাণ করো। জ্বালাহীন তুষানলের মত আমাকে অবসাদধূমে আচ্ছন্ন রেখো না। আমাকে একবার তোমার জন্যে দীপ্ত হয়ে ওঠবার তেজ দাও। ত্যাগই আমার তেজ, বিসর্জনই আমার জীবনলোক।

প্রভু, আমার দোষ আর ধোরো না। তোমার তো সমদর্শন, যদি আর-কাউকে পার করে দিয়ে থাকো, দয়া করে আমাকেও পার করে নাও। তোমার খুশি তা জানি। কিন্তু আমার খুশির জন্যে তুমি একটু খুশি হতে পারো না ? পুজোর ঘরের ফল-কাটার যে বঁটি আর কসাইয়ের হাতে যে হিংসার খড়্গ দুই-ই এক লোহার তৈরি। কিন্তু স্পর্শমণির অন্তরে তো দ্বিধা নেই, সে ভালো-মন্দ দুটো অস্ত্রকেই সোনা করে। একই জল, নদীতে তা স্বচ্ছ নালায় তা মলিন, অপবিত্র, কিন্তু দুই-ই গঙ্গায় এসে পড়ে স্বচ্ছন্দে এবং গঙ্গায় পড়ে একই রঙে রঙিন হয়। যেমন গঙ্গার বর্ণ তেমনি ঐ নদী-নালার। তেমনি আমাকে যদি টেনে নাও তোমার মধ্যে, হই না কেন অস্বচ্ছ-অপরিচ্ছন্ন, ঠিক তোমার বর্ণে বর্ণান্বিত হব। তবে কেন দয়া করবে না ? কেন হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে না বলহীনকে ?

আমি শুকনো মাঠ, আমার পাশেই তুমি রয়েছ জলাশয়। আগের থেকেই রয়েছ। আমার সেচের জল, আর্দ্রীকরণ উর্বরীকরণের জল। শুধু আমি অহঙ্কারের আল বেঁধে রেখেছি বলেই তুমি ঢুকতে পারছ না। নইলে কবে ভেসে যেতাম স্নেহসিঞ্চনে, অকৃপণ ফসল ফলাতাম। তুমি এত কিছু ভেঙে-চুরে ফেলছ, আমার এই সামান্য মৃত্তিকার আল ভূমিসাৎ করতে পারো না ? এই মণি মল্লিকের বাড়িতেই, ৮১ সিঁদুরেপটি, একবার নাচলেন ঠাকুর। শুধু নিজে নাচলেন না, সকলকে নাচিয়ে ছাড়লেন। শুধু ভক্তদের নয়, যারা দেখছিল তাদেরও। আপনি

মেতে জগৎ মাতায়। আপনি হেসে জগৎ হাসায়। আর সঙ্গে চিরঞ্জীব শর্মার গান, 'নাচ রে আনন্দময়ীর ছেলে'—বাম বাহু তুলে ও দক্ষিণ ভুজ কুঞ্চিত করে, বাম পা আগে ও ডান পা পিছনে রেখে ঠাকুরের সেই ভুবনস্পন্দন নাচ। এ যেন সেই 'পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।' বিশ্বতনুতে অণুতে-অণুতে যে নৃত্য চলেছে তারই স্বতোৎসার।

এই মণি মল্লিকের বিধবা মেয়ে নন্দিনী। আমাকে ইষ্টদর্শন করিয়ে দিন এই আকুল প্রার্থনা নিয়ে একদিন প্রভুর পায়ে এসে পড়ল।

'ইষ্ট? ইষ্টকে দেখতে চাও?' যেন কত সহজ এমনি নিশ্চয়ভরা চোখে তাকালেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ, দিন দেখিয়ে।'

'বাড়িতে কোন ছেলেটিকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসো?'

'আমার ছোট্ট একটি ভাইপো আছে—তাকে।'

'তবে আর কি। পেয়ে গেছ তোমার ইষ্ট। ঐ ছোট্ট ভাইপোকেই শ্রীগৌরাঙ্গ ভেবে সেবা করো।'

ভেবেছিল ঐ আঁচলধরা অনুরক্ত ছেলেটাই জীবনের বন্ধন। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন আসলে ঐটেই মুক্তি। যেখানে বন্ধন সেখানেই মুক্তি। তোমার স্বভাবই তোমার আসন, তোমার প্রবণতাই তোমার ধ্যান। প্রাণ যা চায় তাই ঈশ্বর। সব পেলেও আবার যা চায় তাই ঈশ্বর।

ঈশ্বর আমাদের ফাউ। বাঁধাবরাদ্দের উপর উপরি-পাওনা। সমস্ত প্রাপ্তির পরিধির বাইরে মহত্তম উদ্বৃত্ত।

ওগো আমার একটু পালো-দেওয়া ক্ষীর খেতে ইচ্ছে করছে। কলকাতার নেমন্তন্ন বাড়িতে যেমন পাওয়া যায় তেমনি ডাক্তারদের একটু জিগগেস করো না খাওয়া চলবে কি না।

ডাক্তারদের আপত্তি নেই।

যোগীন গেল সেই ক্ষীর কিনতে। পথে যেতে-যেতে ভাবনা ধরল, বাজারের ক্ষীর খাওয়া কি ঠাকুরের পক্ষে ভালো হবে? বাজারের ক্ষীরে তো শুধু পালো নয় রয়েছে আরো কত কি ভেজাল কে জানে! তার চেয়ে কোনো ভক্তের বাড়িতে বলে সেখান থেকে ক্ষীর তৈরি করে নিই গে। কে জানে সেইটেই বা ঠাকুরের মনঃপূত হবে কিনা। তেমন কথা তো কিছু বলে দেননি ঠাকুর।

সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে চলে এল সে বলরাম বাবুর বাড়ি। এখন বলুন দেখি কি করি।

বাজারের কেনা জিনিস ঠাকুরকে খাওয়াবে, তুমি পাগল হয়েছ? বাড়িতে তৈরি করে দিচ্ছি। কিন্তু সকাল বেলাতেই তো হবে না। তুমি এ বেলা এখানে থাকো, খাওয়া-দাওয়া করো, পরে বিকেলে নিয়ে যেও তৈরি ক্ষীর। ঠাকুর খুশি হবেন ক্ষীর দেখলে।

তথাস্তু। ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর পৌঁছুতে বিকেল চারটে।

দুপুরে খাওয়ার সময় ঠাকুর অনেকক্ষণ বসে ছিলেন ক্ষীরের জন্যে। এই আসে এই আসে করে মুহূর্ত গুণেছেন। বরাদ্দ সময় পার হয়ে গেল তবু দেখা নেই। তখন আর কি করা, রোজ যা দিয়ে খান তাই দিয়ে খেলেন শুকনো মুখে।

'কি রে এত দেরি হল কেন ?'

'জ্বাল দিয়ে আনলুম বলরাম বাবুর বাড়ি থেকে।'

'তোর কি বুদ্ধি ! তোকে কি তাই আনতে বলেছিলুম !'

যোগীন তাকিয়ে রইল অপরাধীর মত।

'আমি তোকে বলেছিলুম, বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বাজার থেকে কিনে আন। ভক্তদের বাড়িতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে তৈরি করে আনবার কি হয়েছিল ?'

'বাজারের ক্ষীর খেলে আপনার অসুখ বাড়বে মনে করে—'

'আর এ খেলে বাড়বে না ? দেখেছিস কেমন ঘন গুরুপাক ক্ষীর।

অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

যেমনটি বলে দিয়েছি তেমনটি করবি। যা করবি বলে বেরিয়েছিলি তার থেকে বিচ্যুত হবি না। সম্পূর্ণ করাই সম্পন্ন করা। ঠিক-ঠিক কথা ঠিক-ঠিক কাজ।

'এ ক্ষীর আমি খাব না।' বলে পাঠালেন শ্রীমাকে।

'কিন্তু কত কষ্ট করে ভক্ত তৈরি করেছে, কত কষ্ট করে বহন করে এনেছে আরেকজন। সব তো তাঁরই নিবেদনে। তিনি যদি একটুও মুখে না দেন তা হলে কি করে চলে !

'সমস্তটা ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয়। হ্যাঁ, গোপালের মাকে। ভক্তের দেওয়া জিনিস ফেলা চলবে না। ওর মধ্যেই গোপাল আছে। ওর খাওয়াতেই আমার খাওয়া।'

সাধন আর কি ? সহজ সাধন। সেই যা পড়েছিল ছেলেবেলায় : 'সদা সত্য কথা কহিবে।' এ তো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্যে তো কোনো দৌড়-ঝাঁপের দরকার নেই, কোনো কাঠ-খড়ও পোড়াতে হবে না। সহজ সংসারে চলো-ফেরো আর সত্য কথাকে আঁট করে ধরে থাকো। কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ, সব ঠিক-ঠিক বলো। এর জন্যে তো শাস্ত্র পড়তে হবে না, করতে হবে না যাগ-যজ্ঞ, যেতে হবে না তীর্থে স্নানে। শুধু সত্যবাদী হও। হও রৌদ্রে নিষ্কাশিত জ্বলন্ত তরবারি।

'যারা বিষয় কর্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।' সত্যই সাহস। সত্যই ঐশ্বর্য। সত্যই পবিত্রতা।

সামান্য-সাধারণ কথায় সামান্য-সাধারণ আচরণে সত্যকে ধীরে-ধীরে আরোপ করো জীবনে। দেখবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়ে উঠেছ। রক্তের মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি বয়ে চলেছে। দেখছ পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়।

তোমার সত্যময় জীবন সে পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবে।

'মাকে সব দিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না।' বললেন ঠাকুর। 'সত্যতে থাকবে তা হলেই ঈশ্বরলাভ।'

কথা একটু কম কও। দয়া করো, একটু চুপ করে থাকো। চুপ করে থেকে অন্যের কথা শোনো। অন্য আর কোথায়। তোমার অন্তরতম। তুমি চুপ করলেই তার কথা শুনতে পাবে। শুনতে পাবে সেই গভীর গুঞ্জন।

চুপ করে থাকলে অন্তত মিথ্যে বলার হাত থেকে রেহাই পাবে। চুপ করলেই বন্ধ হবে সব ইন্দ্রিয়ের হট্টগোল। হবে পাহাড়ে বেড়ানো, হবে সমুদ্রস্নান। অনুভব করবে সব প্রবাহই জাহ্নবী, সব স্বরূপই সমুদ্র। অন্তরক্ষেত্রে কোথায় সুপ্ত শক্তির বীজটি পড়ে আছে, কুড়িয়ে পাবে। মৌনের আকাশে বহুবিততশাখায় প্রসারিত হবে সে বনস্পতি। নিজেকে নিজে আবিষ্কার করবে, হবে নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। অণীয়ান ও মহীয়ানকে দেখবে একসঙ্গে।

আর কিছু না পারো নির্জন পথে একা-একা হাঁটো। চুপ করে থাকো।

আর যদি কথাই কইবে, সকালে-বিকেলে হরিবোল বলো। হাততালি দাও আর হরিনাম করো।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, কথকতা করে, এসেছে ঠাকুরের কাছে। সাতাশ-আটাশ বয়স, কি নাম কে জানে, সবাই ঠাকুরদাদা বলে ডাকে। সংসার ঘাড়ে পড়েছে তাই বৈরাগ্য নিয়ে উধাও। কিন্তু মন টিকল না, আবার ফিরে এসেছে স্বস্থানে। তার মাটির কেল্লায়।

'কোত্থেকে আসছ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে বরানগর থেকে।'

'পায়ে হেঁটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখানে কি দরকার?'

'আপনাকে দর্শন করতে এসেছি। একটা কথা আপনাকে জিগগেস করব।'

'করো।'

'তাঁকে ডাকি অথচ মনে অশান্তি কেন? দু-চার দিন বেশ আনন্দে থাকি, তারপর আবার অশান্তি।'

'বুঝেছি।' বললেন ঠাকুর, 'ঠিক পড়ছে না। কারিকর দাঁতে-দাঁত বসিয়ে দেয়। ঠিক পড়ছে না। কোথায় একটু আটকে আছে।'

কি সুন্দর করে বললেন। দাঁতে-দাঁত বসছে না। কারিকের হাতেই সে কারসাজি। একটুখানি সরিয়ে দাও একটুখানি বেঁকিয়ে দাও, ঠিক খাঁজে-খাঁজে লেগে যাবে। তখন জলের মত চলে যাবে ক্ষুর। তখনই সর্বশান্তি।

গঙ্গাই শুধু সমুদ্রকে চায় না, সমুদ্রেরও গঙ্গা ছাড়া গতি নেই। 'সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী, সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ।' গঙ্গা সমুদ্র ছেড়ে অন্যত্র যায় না, তেমনি সমুদ্রও গঙ্গার মুখরসেই আনন্দ লাভ করে।

'মন্ত্র নিয়েছ ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মন্ত্রে বিশ্বাস আছে ?'

এইবার মুখে আর কথা নেই ঠাকুরদাদার। তবেই বুঝতে পারছ, কেন বসছে না দাঁতে-দাঁত। মন্ত্রের কাছেই ত্রাণ খোঁজো। নামের কাছেই প্রেম চাও। অভ্যাসের থেকেই নিংড়ে নাও অনুরাগ। অনুরাগকে দৃঢ় করো, প্রগাঢ় করো। তখনই দেখা দেবে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য তো নঙর্থক নয়, নেতিবাচক নয়। বৈরাগ্য সদর্থক, অস্তিবাচক। বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে নিবিড়ানুরাগ।

মর্কট-বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্য আনো। আসক্তির চেয়েও তা বড় শক্তি। আস্পৃহার চেয়েও তা তীক্ষ্ণতর আকর্ষণ।

'জানো না বুঝি, সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল।' বললেন ঠাকুর। 'অনেক দিন খবর নেই। তারপর বাড়িতে একখানা চিঠি এল। লিখেছে তোমরা ভেবো না, আমার এখানে একটি কাজ হয়েছে।'

সবাই হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'তুমি একটা গান ধরো।'

ঠাকুরদাদা গান ধরলেন। তন্ময় হয়ে শুনলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোমার মধ্যে গান আছে, তবে আর কি। ঐ গান ধরেই এগোও ঈশ্বরের দিকে। সংসারে থাকতে গেলেই জ্বালা, হয়তো মাগ অবাধ্য, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলেকে পড়াতে পারছ না, বাড়ি ভাঙা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, মেরামতের টাকা নেই। তবু থাকো, থাকো সংসারে। কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করো। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলেই বেশি বিপদ, সোজা গায়ের উপরেই গোলাগুলি এসে পড়ে।'

'সংসার ত্যাগের দরকার নেই ?'

'কি দরকার। সাধুদের কত কষ্ট। সংসার ত্যাগ করতে যাচ্ছে একজন, তাঁর স্ত্রী বললেন, কোন সুখে চলেছ গৃহ ছেড়ে ? এই এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ এই তো আরাম, মিছিমিছি কেন আট ঘর ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে।'

'তা হলে এখন আমি কি করব ?' কাতর হয়ে প্রশ্ন করলেন ঠাকুরদাদা।

'হাততালি দিয়ে সকালে-বিকালে হরিনাম করবে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলবে।'

আর, বলি আরো একটি সহজ কথা, সত্য কথা বলবে। থাকবে সত্যকে আশ্রয় করে। সেই শুষনি শাক তোলার ঘটনাটা মনে করো। চার-চার মেয়ের মধ্যে বিষয়-আশয় সব ভাগ করে দিয়েছেন রাসমণি। যে পুকুরটা দ্বিতীয় মেয়ের ভাগে পড়েছে তাতে সেজগিন্নি স্নান করতে নেমেছে। সুন্দর শুষনি শাক হয়েছে পুকুরে। আঁচলে করে কিছু শুষনি শাক তুলে নিয়ে গেল সেজগিন্নি। সমস্ত ব্যাপারটা ঠাকুরের চোখে পড়ল। স্নান করতে এসেছিস স্নান করে যা, তা নয়, পরের পুকুরের শাক তুলে নিচ্ছিস। পরের জিনিস না বলে নিলে চুরি করা হল না ? কি দরকার ছিল পরের জিনিসে লোভ করে ?

বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন ঠাকুর। দ্বিতীয় মেয়েকে ডাকিয়ে আনলেন। সব কথা খুলে বললেন তাকে। এমন গম্ভীর মুখ করে বললেন, সত্যি যেন সেজগিন্নির অন্যায়ের অবধি নেই। হাসতে লাগল দ্বিতীয়া। রঙ্গ করে বললে, 'তাই তো, বড় অন্যায় করেছে সেজ। এ চুরি ছাড়া আর কি।' সেজগিন্নিও তখন সেখানে এসে উপস্থিত। সেও হাসতে লাগল। বললে, 'কত কষ্ট করে শাকগুলি তুলে নিয়ে এলুম লুকিয়ে, আর তুমি কি না তাই বলে দিলে।' 'কি জানি বাপু', ঠাকুর গম্ভীর মুখে বললেন, 'বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ-যোগ হয়ে গিয়েছে তখন পরেরটা না বলে নেওয়া কেন? তাই ভাবলুম যার জিনিস গেছে তাকে বলে দি, সে একটা বোঝাপড়া করে নিক।'

দুই বোনে আরো হাসতে লাগল।

সব মাকে দিয়েছি, সত্য দিতে পারিনি।

একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে বলে ফেললেন ভাবাবস্থায়, 'এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।'

তখন ঠাকুরের অসুখ নেই, যথাবিধি খাচ্ছেন ঝোল-ভাত। হঠাৎ এমন কথা কেন বলে বসলেন, শ্রীশ্রীমা'র বুকের মধ্যিখানটা শিউরে উঠল। তিনি বললেন, 'তা কেন? আমি তোমাকে মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব।'

'না, না, পায়সান্ন খাব আমি।'

কিছুদিন পরই ঠাকুর অসুখে পড়লেন। তখন ক্রমে-ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল ঝোল-ভাত। তখন শুধু মণ্ড আর দুধ, নয়তো স্রেফ দুধ-বার্লি।

১৩৮

গিরিশ নিমন্ত্রণ করেছে ঠাকুরকে, যেতেই হবে তার বাড়ি। বলরামের বাড়িতে আছেন, রাত প্রায় নটা হল, উঠে পড়লেন ঠাকুর। ওরে গিরিশের বাড়ি যাব। নেমন্তন্ন করে গিয়েছে। হ্যাঁ, এই রাত্রেই যেতে হবে। আহা, কি সব গান বেঁধেছে বলো দেখি। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী। যার ভেতরে এই সব গান এত সজীব অনুরাগ তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারি?

সেদিন ঠাকুরকে বললে গিরিশ, 'মশাই ছেলেবেলায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি তবু লোকে বলে বিদ্বান—'

বই-শাস্ত্র একটা উপায় মাত্র। ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, 'আসল হচ্ছে খবর সব জেনে নিয়ে নিজেই কাজ আরম্ভ করে দাও।'

নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করো। সেই তো স্বাধীনতার অর্থ। নিজের ঘরে নিজের দেহের মধ্যে নিজের জীবনের মধ্যে কাজ করো। দেখাও তোমার বীরত্ব, তোমার পুরুষকার। তুমি স্বাধীন হয়েছ বুঝব কিসে যদি তুমি এখনও ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে বাস করো। শুধু পড়ে কি হবে কাজ করে দেখাও তুমি কত

বড় কারু, কত বড় শিল্পী।

'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে।' বললেন ঠাকুর, 'অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র মুখস্থ কিন্তু মন রয়েছে টাকা আর দেহসুখের দিকে। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে। শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মরা জানোয়ার।'

বই-শাস্ত্র দেখ। পথ-পদ্ধতি জেনে নাও। তারপর বই বন্ধ করে দিয়ে বাজার করতে বেরোও। যে বাজারে আসল বস্তুলাভ।

কাজ করো। সাধন করো।

'বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি, কত কঠোর সাধন।' বলছেন ঠাকুর, 'গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।'

'আর সকলের ধারণা, এক মুহূর্তে সব হয়ে যাবে।' মাস্টার টিপ্পনি কাটল : 'বাড়ির চারদিকে আঙুল ঘুরিয়ে দিলেই যেন দেয়াল হল।'

কি অবস্থাই গিয়েছে! কুমার সিং সাধু-ভোজন করাবে, নেমন্তন্ন করলে রামকৃষ্ণকে। অনেক সাধুর ভিড়, পঙক্তি করে বসেছে সবাই। রামকৃষ্ণও বসল এক পাশে। কেউ-কেউ পরিচয় জিগগেস করল, এ কে, কোন মতের, কই আগে তো কখনো দেখিনি। অত খবরে কাজ কি। রামকৃষ্ণ আলাদা হয়ে সরে বসল। যেই পাতায় খাবার দিল, কারু দিকে না চেয়ে কারু জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি খেতে শুরু করে দিলে। যেন অভব্য কিছু একটা করছে এমনি অবাক হবার ভাব করে কেউ-কেউ বলে উঠল : এ কেয়া রে!

এ অনন্যসাধারণ! নিজের ঢাক পিটতে রাজী নয়, একেবারে নিরহঙ্কার। পাতে খাবার পড়লে এক মুহূর্ত দেরি করতে রাজি নয়, এমনি তার সত্যপথাশ্রিত সরলতা। রাত নটা, উঠে পড়লেন ঠাকুর।

সে কি, আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি যে। বলরাম আপত্তি করল।

তাও তো ঠিক। খেয়ে না গেলে বলরাম যে কষ্ট পাবে—আবার ওদিকে গিরিশের ডাক, দেরি করবার উপায় নেই। তখন উপায়কুশল বললেন, এক কাজ করো, খাবারটা দিয়ে দাও সঙ্গে।

বোস পাড়ার তেমাথা পার হচ্ছেন, কাছেই গিরিশের বাড়ি, প্রায় ছুটে চলেছেন। পথটুকু পার হতেও যেন তর সইছে না। কিন্তু এ কে, সহসা এ কে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো! আর কে! আপনার সেই লোচনলোভনীয়! যার নাম বলতে আপনি পাগল। সেই ইন্দ্রপ্রতিম নরেন্দ্র। পলক ফেলতে পারছেন না ঠাকুর। যেন 'পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।' কথা সরছে না মুখ দিয়ে। এরই নাম বোধ হয় ভাব। পরম প্রাপণীয়কে পেয়েও অপ্রবৃত্তি। অণুমাত্র প্রাণপবনস্পন্দেই যেন মহীয়ান স্বরূপানন্দ!

চলে গেলেন পাশ কাটিয়ে। গিরিশের ঠিক বাড়ির সম্মুখে আবার দেখা হল। তখন দিব্যি সহজ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'ভালো আছ তো বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারিনি।'

একজন একটা কুয়ো খুঁড়তে আরম্ভ করল। কিছুটা খোঁড়ার পর একজন

এসে বললে, এখানে খুঁড়ে কোনো লাভ নেই। নিচে কেবল শুকনো বালির স্তূপ। লোকটা জায়গা বদলালো। খানিক দূর খুঁড়েছে, আরেকজন এসে বললে, কেন পণ্ডশ্রম করছ, এখানটায় বোদা জল। আবার পিছু সরল। তোমার সময় আর পয়সার কি দাম নেই? নইলে এমন কাঁকুরে জায়গায় কি কেউ মাটি খোঁড়ে? দক্ষিণে যাও, সেখানেই মিলবে তোমার মিষ্টি জলের ঝরণা। বললে আরেকজন। হায়, দক্ষিণে এসেও আবার প্রতিবন্ধ। কি করেছেন মশাই, উত্তর ছেড়ে কি কেউ দক্ষিণে আসে?

কুয়ো খোঁড়া ভুয়ো হয়ে গেল। কিন্তু নরেনের স্থানবদল নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ই তার খননাস্ত্র। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই খুঁড়ছে। হোক তা রুক্ষরুষ্ট, হোক তা প্রস্তরকঙ্করাকীর্ণ, সেখান থেকেই উদ্ধার করবে সে তৃষ্ণার পানীয়। জলও আমার মধ্যে, অস্ত্রও আমার হাতে—আমাকে আর পায় কে! আমিই আত্মদীপ, আমিই জগদ্ভাতি সূর্য। গজেন্দ্রবিক্রম আয়তবাহু মহাবীর। আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড-খণ্ড হলেও উঠব না আমার ব্রতাসন থেকে। আত্মোদ্ধার করব, করব আত্মোদ্‌ঘাটন।

কিন্তু অবতার মানতে সে রাজী নয়। এদিকে গিরিশ অবতারবাদে নিদারুণ বিশ্বাসী। 'তোমরা দুজনে একটু এ নিয়ে বিচার করো না।' গিরিশের বাড়ি এসে বললেন ঠাকুর: 'একটু ইংরিজিতে তর্ক করো। আমি শুনি।'

বাঙলাতেই কথা হল, মাঝে-মাঝে ইংরেজির ছিটেগুলি।

'ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন।' বললে নরেন, 'শুধু একজনের মধ্যেই এসেছেন এ কখনো হতে পারে না।'

'আমারো সেই মত।' নরেনের কথায় সায় দিলেন ঠাকুর। 'তবে একটা কথা আছে। কোনো আধারে শক্তি বেশি কোনো আধারে শক্তি কম। কেউ গেড়ে পুষ্করিণী কেউ বা সায়র দীঘি। কেউ কুঁজো-কলসী কেউ বা জালা। যেখানে যত বেশি শক্তি সেখানে তত বেশি ভগবত্তা।'

গিরিশ নরেনকে লক্ষ্য করে বললে, 'তুমি কি করে জানলে তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না?'

'তিনি মনোবাক্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি আবার একটা সীমাবদ্ধ জীব হবেন কি করে?'

হলে ভগবানের খুব ক্ষতি হয়ে যায়, তাই না? তাঁর পূর্ণতা, তাঁর অনন্ত শক্তিমত্তা, তাঁর সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা বাধিত হয়? কখনোই না। জীবের প্রতি অনুগ্রহই তাঁর শরীর গ্রহণের মুখ্য কারণ।

'অবতার না হলে কে বুঝিয়ে দেবে?' বললে গিরিশ: 'মানুষকে জ্ঞানভক্তি দেবার জন্যেই তাঁর দেহধারণ। না হলে শিক্ষা দেবে কে?'

'কেন অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন।' নরেন হুংকার দিয়ে উঠল।

নরেনকে আবার সায় করলেন ঠাকুর। 'হ্যাঁ, নইলে তিনি অন্তর্যামী কেন?'

'তুমি তাঁর অচিন্ত্যশক্তির কি জানো?' এবার গিরিশ উঠল লাফিয়ে।

দুই সাধু বসে আছে গাছতলায়, সেখান দিয়ে নারদ চলেছেন বীণা বাজিয়ে। প্রভু, কোত্থেকে আসছেন, একজন জিগগেস করল। বৈকুণ্ঠ থেকে আসছি। বৈকুণ্ঠ থেকে? ভগবান সেখানে এখন কি করছেন দেখে এলেন? নারদ বললে, ছুঁচের ছ্যাঁদার মধ্য দিয়ে হাতি-উট এধার-ওধার করছেন। তা আর তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি! তিনি সব করতে পারেন। বললে এক সাধু। অন্যজন বললে, গাঁজাখুরি! ছুঁচের ছ্যাঁদায় হাতি-উট গলানো স্রেফ আষাঢ়ে গল্প। নারদকে বললে, আপনি কোনো কালে বৈকুণ্ঠে যাননি মশাই।

তিনি সূর্য-চন্দ্র করতে পারবেন, সৃষ্টি-প্রলয় করতে পারবেন, শুধু একটা মানুষের ছদ্মবেশে ভূতলে অবতীর্ণ হতে পারবেন না! যেন ওটিই তাঁর হাতে বারণ, আর যা তিনি হোন না করুন না। কিছু বাদ দিয়ে কিছু কেটে-ছেঁটে ছোট করে ঈশ্বরকে নেব কেন? তিনি যদি সব হতে পারেন অবতারও হতে পারবেন।

লেগে গেল তুমুল তর্ক। শেষকালে ঠাকুর শান্তিবারি সেচন করলেন। বললেন, 'তিনি যদি দেখিয়ে দেন এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন তা হলে আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। যেমন অন্ধকারের মধ্যে দেশলাই ঘষতে-ঘষতে দপ করে আলো হয়। সেই রকম দপ করে আলো যদি তিনি জেলে দেন তা হলে সব সন্দেহ মিটে যায়, তা নইলে নয়।'

'ও ভাই হরিপদ, একটা গাড়ি ডেকে আন।' বলে উঠল গিরিশ, 'আমাকে এক্ষুনি থিয়েটারে যেতে হবে।'

'সে কি, এত রাতে?'

'উপায় নেই। কর্মবন্ধন।' গিরিশের মুখে কাতরতা ফুটে উঠল। 'এদিকে আপনি এখানে বসে, আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে থিয়েটারে।'

ধিক্কার দেবার মতন ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুর উদার প্রসন্নতায় বললেন, 'তা ঠিক আছে। এদিক-ওদিক দুদিক রাখতে হবে। জনক রাজার মত। এ-দিক ও-দিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

'একেকবার মনে হয় থিয়েটারটা ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই। ছুটি নিই ছোটাছুটি থেকে।'

'না, না, ও বেশ আছে।' ঠাকুর আবার অভয় দিলেন: 'লোকশিক্ষা হচ্ছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।'

কিন্তু নরেনের সইল না। বিদ্রূপ করে উঠল। 'এদিকে বলছে ঈশ্বর, অবতার, আবার ওদিকে থিয়েটারে টানছে।'

'আমি কি করব, আমি পাপী, ঘোরতর পাপী—'

পাপী? এবার ঠাকুর উঠলেন হুংকার দিয়ে। খবরদার, ও কথা মুখে আনবিনে। বারে-বারে পাপী-পাপী বললে পাপীই হয়ে যেতে হয়? বল আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছেলের আবার পাপ কি। সব ধুলো-কাদা মুছে যদি কোলে তুলে না নেবেন তবে আবার তিনি কেমন মা!

আমি পুরুষ। বীর্যস্বরূপের অনন্ত বীর্য আমার মধ্যে বর্তমান। আমি স্বস্বরূপবিশ্বাসী। আমি শৃগালের শিশু নই, আমি সিংহের কুমার। আমি অনন্ত শক্তির আধার, আমি দ্বিবাহু, হয়ে বহুবাহু। বলো আমি দুর্বল নই, অধম নই, পাপী নই, দীন-হীন নই, আমি অকল্মষ, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির পুত্র। বারে-বারে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবৎশক্তি শত-সর্পগর্জনে জেগে উঠবে। যে নিজেকে বলে ভীরু, কাপুরুষ, দাসত্বসেবী তার মুক্তি কোথায়? দৃঢ়ধন্বা অর্জুন হও, পাবে তবে সেই যোগেশ্বর কৃষ্ণের বন্ধুতা। 'আজ ওই শুভ্র কোলের তরে, ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে, দিয়ো না গো দিয়ো না আরে ধুলোয় শুতে।' তোমার কোল যতই শুভ্র হোক, আর আমার সর্ব অঙ্গে যতই মালিন্য থাক, তুমি আমার মা, আমি জানি, তুমি আমাকে কোলে তুলে নেবেই নেবে। তোমার কোলের জন্যে যখন আমার আকুলতা জেগেছে তখন নেই আর আমার মালিন্যদৈন্য নেই আর আমার ধূলিশয্যা।

হে অর্জুন, তুমি মন্মনা হও, তা যদি না পারো মদ্ভক্ত হও। তাও যদি না পারো নিষ্কাম কর্মে পূজোপরায়ণ হও। তাও যদি না পারো নমস্কার করো আমার সর্বপ্রকাশিত বিশ্বরূপ। তাও যদি না পারো সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতে শরণ নাও। হে সাগরপারলিপ্সু, আমি তোমাকে পার করিয়ে দেব।

কিন্তু কি করে চিনব তোমাকে?

আপনজন বলে অনুভব করো, চিনতে দেরি হবে না। প্রভু যে বেশেই আসুক কুকুর তাকে ঠিক চিনতে পারে। মেষশিশুকে যে খোঁয়াড়েই আটকে রাখুক, প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেই সে উত্তর দেবে। ঠাকুর বললেন, 'যে হয় আপনজনা নয়নে তারে যায় গো চেনা।'

ঠাকুরের কাছে করজোড়ে বসেছে গিরিশ। বলছে, 'ভগবান, আমায় পবিত্রতা দাও। যাতে কখনো একটুও পাপচিন্তা না হয়।'

'তুমি পবিত্র তো আছ।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ।'

'আনন্দ? আজ্ঞে না।' গিরিশ বললে কাতর স্বরে, 'মন বড় খারাপ। বড় অশান্তি। তাই তো ঠেসে মদ খেলুম।'

১৩৯

'এখানকার কথা মানতে হবে'। লাটুকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'তবে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন।' লাটু বললে সরল মুখে।

তক্ষুনি গোপাল ঘোষের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর: 'ওরে গোপাল, শোন লেটো কি বলে। বলে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন। এখানকার কথা কি বোঝানো যায়?' গোপালকে সাক্ষী মানলেন ঠাকুর: 'তুই বল না, বুঝিয়ে

বলবার মত এখানকার কথা ?'

কোথায় ঠাকুরের কথায় সায় দেবে, তা নয়, লাটুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল গোপাল। বললে, 'সত্যিই তো। এখানকার কথা আপনি ছাড়া আর কে জানে। তাই দিন না বলে, হাটে দিন না হাঁড়ি ভেঙে।'

'এ তোমার কেমনতরো কথা। আমার দিকে না থেকে তুমি লেটোর দিকে গেলে। তুমিই বলো বিবেচনা করে এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে ?

'এখানকার কথা জানবার জন্যেই তো আমরা সব এসেছি।' গোপাল বললে বিনত হয়ে, 'আমাদের না বললে আমরা জানব কি করে ?'

হার মানলেন ঠাকুর। যিনি মধুদাতা তিনি আবার মধুপাতা। বললেন, এখন নয়, এখন নয়। এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে বুঝবে সবাই একদিন।'

জগদ্দলের গোপাল ঘোষ। সিঁথির বেণীমাধব পালের দোকান আছে চিনে-বাজারে, বুরুশ-ম্যাটিং এর দোকান, সেখানে কাজ করে। বেণী পাল ব্রাহ্ম হলে কি হয়, ঠাকুরকে মাঝে-মাঝে নিয়ে আসে তার বাড়িতে। সেখানেই প্রথম দেখে ঠাকুরকে। প্রথম দর্শন যেন মর্ম পর্যন্ত পৌঁছল না। কিন্তু আরেকবার দেখ। সমগ্রলক্ষ্যাবদ্ধ হয়ে দেখ। দেখ একবার প্রাণের চক্ষু উন্মীলন করে। গভীর হতে বিচ্ছুরিত যে আনন্দময় জ্যোতি সেই আলোতে চোখ মেলে দেখ এই প্রাণের মানুষকে। পুণ্য-পরিপূর্ণ পাবনপুরুষকে। হৃদয়ের মধ্যে নাও সেই গভীরের সঞ্জীবন।

একদিন ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে পড়ল গোপাল। বললে, 'অনেক দিন ধরে যাওয়া-আসা করছি আপনার কাছে, কই, একদিনও ভাবসমাধি হল না। আমার একদিন ভাবসমাধি করিয়ে দিন।'

'তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা।' ঠাকুর বললেন আশ্বাসের সুরে : 'ভাবছিস বুঝি ঐটেই হলেই সব হল ! ঐটেই বুঝি সার বস্তু। শোন ঠিক-ঠিক ত্যাগ ঠিক-ঠিক বিশ্বাস তার চেয়ে বড় জিনিস। তাকিয়ে দ্যাখ দিকি নরেন্দ্রের দিকে। ও সব বড় একটা তার হয় না। কিন্তু দ্যাখ কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস !'

আর ঠাকুরের যে ভাবসমাধি হয় তাকে শিবনাথ শাস্ত্রী হিস্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। একদিন সরাসরি ধরলেন তিনি শিবনাথকে। পেটেমুখে এক হতে হবে তাই লুকোছাপা করলেন না। বললেন, 'হ্যাঁ হে শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বলো ? আর বলো নাকি, আমি ও সময়টায় অচৈতন্য হয়ে যাই ?' করুণামাখা হাসি হাসলেন ঠাকুর ? 'তোমরা ইট-কাঠ-মাটি টাকা এ সব জড় পদার্থে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর জগৎচৈতন্য সংসার চৈতন্যময়, তাকে দিন-রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম। এ কোন দিশি বুদ্ধি তোমার ?'

শিবনাথের মুখে কথা সরল না। যে জিনিস ধুলো হয়ে যাবে তারই ধুলো ঝাড়ছি। যে কলসে ছিদ্রের অন্ত নেই তারই মধ্যে জল ভরবার দুশ্চেষ্টা করছি

প্রাণপণে। ঘরকে কোথায় বড় করব, তা নয়, জিনিস জমিয়ে-জমিয়ে ঘরের জায়গা মারছি। কণ্ঠাগত প্রাণে সঙ্কুচিত হয়ে নিশ্বাস ফেলবার কায়িক অভ্যাস পালন করছি মাত্র।

জিনিসে-জায়গায় ভরপুর কোথায় আমাদের সেই পরিপূর্ণতা? প্রারম্ভ থেকে পরিমাণ পর্যন্ত কোথায় সেই নিত্যানিয়ত? অমৃত যাঁর ছায়া মৃত্যুও যাঁর ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাকে পুজো করব?

'তুমি অত নরেন্দর-নরেন্দর করো কেন?' নরেনই কিনা অভিযোগ করে। 'অত নরেন্দর-নরেন্দর করলে তোমায় যে নরেন্দরের মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে গিয়েছিল মনে নেই?'

বহুকাল রাজ্য ভোগ করে ছেলেদের মধ্যে তা ভাগ করে দিয়ে মহারাজ ভারত প্রব্রজ্যা নিলেন। এলেন পুলহাশ্রমে। আশ্রমের উত্তরে সরিদুত্তমা গণ্ডকী, সুরম্যসলিলা। নদীতীরে বসে একদিন প্রণব জপছেন ভরত, অদূরে সিংহগর্জন শুনতে পেলেন। একটি গর্ভিনী হরিণী জলপান করছিল, দেখলেন, আতঙ্কে নদী পার হয়ে গেল লাফ দিয়ে। গর্ভের শাবক জলে পড়ে ভেসে চলল। কারুণ্যরসবশংবদ হয়ে রাজা হরিণশিশুকে তুলে আনলেন জল থেকে। মা'র খোঁজ করলেন, দেখলেন, নদীর পরপ্রান্তে এক গুহার মধ্যে মরে পড়ে আছে। তখন কি আর করা! হরিণ-শিশুর পালন পোষণ করতে লাগলেন, বৃক ও বাঘের থেকে রক্ষা করতে লাগলেন নিয়ত। শুধু তাই নয়, কখনো কোলে কখনো কাঁধে করে ফিরতে লাগলেন তাকে নিয়ে। শ্যামলঘন কোমল তৃণ আহরণ করে খাওয়ান তাকে হাতে করে, তার গা চুলকে দিয়ে তাকে যত না আরাম দেন নিজে তার চেয়ে শতগুণে বেশি তৃপ্তিলাভ করেন। ভোজনে-শয়নে ভ্রমণে-উপবেশনে ঐ মৃগশিশুই তাঁর সতত সঙ্গী। ভগবৎসেবারে আর আগ্রহ নেই, সমস্ত নিয়ম-নিষ্ঠা শিথিল হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মৃগতৃষ্ণায় কাল কাটাতে লাগলেন। কিন্তু দুরন্ত কালকে এড়াবেন কি করে? তখনো সেই মৃগচিন্তা। মৃগচিন্তা করতে-করতেই শরীর ত্যাগ করলেন। পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন কাননে। কথা যখন শুরু হয়েছে, শেষটুকুও শোনো। হরিণজন্ম নিলে কি হবে, স্মৃতিভ্রংশ হল না ভারতের। পূর্বার্জিত আসক্তির জন্যে অনুতাপ করতে লাগলেন। কি কষ্ট, সেই ঈশ্বরপথ, সেই বীরবর্ত্ম থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি। কাউকে কিছু না বলে চরতে-চরতে এলেন সেই পুলহাশ্রমে। একা একা ফিরতে লাগলেন, কারু সঙ্গ আশ্রয় করলেন না। কবে মৃগত্বের অবসান হবে তৃষ্ণাপরিপূর্ণ চোখে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সব আগুনই নেবে। জন্মজ্বালার আগুনও নিবল একদিন। পবিত্র তীর্থসলিলে মৃগশরীর ত্যাগ করলেন ভরত। তারপর?

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। জাতিস্মর হয়ে জন্মেছেন, জানেন প্রাক্তন জন্মের বিষয়াসক্তির কথা, তাই জড় মূক ও বধিরের মত ব্যবহার করতে লাগলেন। বাপ অনেক চেষ্টা করল লেখাপড়া শেখাতে, ভস্মে ঘি ঢালা হল। বাপ মারলে মা-ও সহমৃতা হলেন। ভাইয়েরা দূর-ছাই করতে লাগল। খাটাতে লাগল

চাকরের কাজে। বৃষের মত পুষ্ট কঠিন শরীর, মাঠে গিয়ে কাদা চটকে জমি পাট করুক। কিন্তু ক্ষেত্র সম কি বিষম এই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত ওর নেই। কুৎসিত দগ্ধ অন্ন খেতে দাও ওকে। তাই ভরত খাচ্ছে অমৃততুল্য করে।

চৌররাজ ভদ্রকালীকে খুশি করবার জন্যে নরবলির আয়োজন করেছে। যূপকাষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক শিশুকে। কি কৌশলে কে জানে, বাঁধন খসিয়ে পালিয়ে গেল শিশু। খোঁজ খোঁজ, অনুচররা ছুটোছুটি করতে লাগল, বলি যোগাড় না হলে কারু ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না। অন্ধকারে খুঁজতে-খুঁজতে মিলে গেল জড়ভরতকে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। এই যে এই সুলক্ষণ বলি, এটাকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলো চণ্ডিকার কাছে। তথাস্তু। স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে মাল্যতিলকে অলংকৃত করে কালীর সামনে বসালো তাকে অধোমুখে। জড়ভরতের মুখে একটা কথা নেই, কাকুতি নেই। কেই বা খড়্গ, কেই বা ঘাতক, কেই বা বলি, কেই বা যূপকাঠ।

তস্কর-পুরোহিত যেই খড়্গ তুলেছে, ভদ্রকালী প্রতিমা থেকে বেরিয়ে এলেন স্ব-মূর্তিতে। সেই উত্তোলিত খড়্গ কেড়ে নিয়ে একে-একে সকল ডাকাতের শিরশ্ছেদ করলেন। রক্ত পান করে অন্তর্হিত হলেন প্রতিমার মধ্যে। যে ব্রহ্মর্ষি পরমহংস, তার সংহার নেই।

তারপর? আরো আছে। সেইটুকুই সার কথা। সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজার নাম রহূগণ। শিবিকা করে যাচ্ছেন পথিমধ্যে এক জন বাহকের দরকার হল। ইক্ষুমতী নদীতীরে মিলে গেল ভরতকে। বলীবর্দের মত ভারবহনে সমর্থ মনে হচ্ছে, এস পালকিতে কাঁধ দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগিয়ে দিল। পাছে কোনো প্রাণিহিংসা হয় সে আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে সামনে কিছুটা দেখে-দেখে পথ চলে ভরত। তাই শিবিকার সমতা রক্ষা করে চলা কঠিন হয়ে পড়ল। রহূগণ গর্জন করে উঠল। সমান হয়ে চলছে না কেন?

প্রধান বাহক বললে, আমরা ঠিক চলেছি। এই নবনিযুক্ত লোকটাই দ্রুত চলছে না। তাই শিবিকা বিষম হয়েছে।

রহূগণ শ্লেষ করে উঠল ভরতকে। তুমি কি শ্রান্ত? তুমি স্থূলও নও, দৃঢ়াঙ্গও নও, তবে তুমি কি জরাগ্রস্ত?

ভরত কথা কইল না। কিন্তু শিবিকা যেমন অসমান তেমনি।

তুমি কি জীবন্মৃত? রাজা আবার হুংকার ছাড়ল। উপযুক্ত দণ্ড না পেলে তুমি প্রকৃতিস্থ হবে না দেখছি।

এতক্ষণে কথা কইল ভরত। বললে, রাজন, তুমি কাকে ভার বলো? কেই বা ভারবহনে শ্রান্ত হয়? কেই বা স্থূল বা দৃঢ়? জরাই বা কি? জীবন্মৃততাই বা কায়? কেই বা দণ্ড দেয়, কেই বা পায়?

ভারবাহীর মুখে এ কি কথা! তাড়াতাড়ি শিবিকা থেকে নেমে এল রহূগণ। শিবিকাবাহক ভরতের পায়ের কাছে মাথা রেখে বললে, মহাত্মন, আপনি কে। কর্ম থেকে শ্রম হয়, বস্তুর ভার আছে, দেহের স্থূলতা-কৃশতা আছে ব্যবহারিক

জগতে এই তো দেখছি চিরদিন। একে মিথ্যে বলি কি করে? কৃপা করে আমার সন্দেহের নিরসন করুন।

লৌকিক ব্যবহার নিত্যসত্য নয়। বললে জড়ভরত। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া, ভগবান ভিন্ন সমস্তই অবাস্তব।

ভগবানকে লাভ করব কি করে?

বেদাভ্যাস বা বৈদিক ক্রিয়া সূর্য-অগ্নির উপাসনা তপস্যা বা যাগযজ্ঞ—এ সব দ্বারা ভগবানকে লাভ করা দুরূহ। সে প্রাপ্তির একমাত্র মূল্য মহতের পদধূলি। মহতের পদধূলি কুড়োও আর সে মূল্যে নাও বাসুদেবকে।

সেই মহতের পদধূলি দিতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেনের কথায় খুব বিশ্বাস, তাই ভড়কে গেলেন ঠাকুর। তার কথা চিন্তা করতে গেলে তার মত হয়ে যেতে হবে অথচ সে চিন্তা উচ্ছিন্ন করাও যাচ্ছে না। মা'র কাছে গিয়ে পড়লেন। মা বললেন, ওর কথা শুনিস কেন? ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাস তাই ওর জন্যে এত আকুলি-ব্যাকুলি।

নরেনকে গিয়ে ধরলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর কথা আমি মানি না। মা বলেছে তোর ভেতর নারায়ণ দেখি বলেই তোর উপরে টান। যেদিন তা দেখতে না পাব সেদিন তোর মুখও দেখব না রে শালা।'

সেই নরেন এসে আবার শক্ত হাতে ধরেছে ঠাকুরকে। বললে, 'কেমন আপনার মা এইবার দেখব। তাকে বলুন আপনার গলার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

'তোকে বলছি না যে মন সচ্চিদানন্দে অর্পণ করেছি, তা এই হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে আনতে পারব না।'

'ও সব কথা শুনব না কিছুতেই। বলতেই হবে আপনাকে। সন্তানের ব্যথা হরণ করে না সে কেমন জননী!'

ঠাকুর কথা ক'ন না, আবিষ্টের মত তাকিয়ে থাকেন।

'আপনি বললে নিশ্চয় শুনবেন।' নরেন আবার তাড়া দিল: আপনি কিছু খেতে পাচ্ছেন না এই কষ্ট আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

'ওরে ও-সব কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না।'

'আমাদের জন্যে বার করতেই হবে। শুনব না কিছুতেই।' নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, 'যেখানে একটা মুখের কথা বললেই কষ্টের উপশম হয়, কেন আপনি বলবেন না? আপনার জন্যে বলতে বলছি না, আমাদের জন্যে বলুন, আমাদের কষ্টের লাঘবের জন্যে। যাতে অন্তত একটু খেতে পারেন তাই চেয়ে নিন। আপনি খেতে পাচ্ছেন না আর আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছি, এ কষ্ট সহনাতীত।'

ঠাকুর উঠলেন। বললেন, দেখি। যখন বলছিস এত করে। দেখি, বলতে পারি কিনা।' নরেনকে একদিন ঠাকুর পাঠিয়েছিলেন মা'র কাছে টাকাকড়ি চাকরিবাকরি চেয়ে নিতে। ফেরাফিরতি ঠাকুরকে আজ পাঠাচ্ছে নরেন, যাতে স্বচ্ছন্দে দুটি খেতে পারেন তার ক্ষমতার জন্যে।

মহাপ্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী বসে আছেন মন্দিরে। তয়া সর্বমিদং ততম্। সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন। তোমার কাছে কী চাইব মা।

তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্যতমা। তুমি অতিবিস্তীর্ণকান্তি। পর ও অপর উভয়েরই আশ্রয়। তুমিই পরমেশ্বরী। তুমিই ধারণ করছ, পালন করছ, গ্রাস করছ। তুমিই সর্বগ্রাসিনী। আমি যে মুহূর্তে অমৃতায়মান হব আমাকে তুমি তোমার সুস্বাদু আহার্যরূপে গ্রহণ করবে, গ্রাস করবে। আমি মরে অমর হব। মৃত্যুর পঙ্ক থেকে চলেছি সেই অমৃত-অঙ্কে, আর কী চাইবার আছে? সুখেও তুমি, অসুখেও তুমি, অশনেও তুমি, অনশনেও তুমি। তুমি 'সদসৎ' হয়েও আবার 'তৎ পরং যৎ'। আঙুল দিয়ে গলার ঘা ইঙ্গিত করলেন। বললেন, সরল শিশুর মত: 'মা, এইটের দরুন কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

মা বুঝি প্রার্থনা শুনলেন। উজ্জ্বলনয়নে হেসে কি যেন বললেন ঠাকুরের কানে-কানে।

মন্দির থেকে ফিরে চললেন ঠাকুর। নরেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে এল। 'কি, বললেন মাকে?' দীপ্তদ্রুত তীরের মতন তার প্রশ্ন।

'বললুম।'

'বললেন?' উৎসাহে প্রফুল্ল হয়ে উঠল নরেন। যখন বলেছেন, বলতে পেরেছেন, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে কথাটা তখন আর ভাবনা নেই। সুফল অনিবার্য। 'কি বললেন?'

'বললুম, কিছু খেতে পারছি না। যাতে দুটো খেতে পারি তাই করে দে।'

'শুনে মা কি বললেন?'

'তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কেন, তোর একমুখ বন্ধ হয়েছে তো কি হয়েছে! তুই তো এদের শতমুখে খাচ্চিস। লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলুম না।'

নরেনের মাথাও হেঁট হল।

সে আর তার বন্ধুরা যে খাচ্ছে সেও ঠাকুরেরই খাওয়া। এক দরজা বন্ধ তো হাজার দরজা খোলা। এক তারা নিবল তো লক্ষ তারায় তাকিয়ে আছে মহারাত্রি। তুই যে খাচ্ছিস তাইতে আমিও খাচ্ছি। তোর যে সুখ সেইটেই আমার উপভোগ। তোর যে তুষ্টি, তোর যে তৃপ্তি তাইতেই আমার চরিতার্থতা।

'রাজন, এই সংসার এক গহন অটবী।' ভরত ফের বলল রহূগণকে। 'দেহী বণিক, বুদ্ধি নায়ক। নায়ক অসতর্ক হলে ছয় ইন্দ্রিয় ছয় দস্যুরূপে পুণ্যধন লুণ্ঠন করে নেয়। কখনো গহ্বরে এনে ফেলছে কখনো বা তুলছে শৈলশৃঙ্গে। তুমিও বিচরণ করছ এই মায়াকাননে। অসজ্জিত-আত্মা অর্থাৎ অনাসক্ত হও। কৃতভূতমৈত্র হও, অর্থাৎ সর্বজীবে বন্ধুতা করো। সকল জঞ্জালশৃঙ্খল জ্ঞান-খড়্গ দিয়ে ছিন্ন করো। ভবাটবী উত্তীর্ণ হয়ে যাও।'

দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করল রহূগণ। বললে, 'মহৎকে নমস্কার, শিশুকে

নমস্কার, বালককে নমস্কার, যুবককে নমস্কার। যে ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে বিচরণ করছে তাকে নমস্কার। তাদের সকলের অনুগ্রহে সকল রাজার কল্যাণ হোক।'

নিম-জল দিয়ে ঠাকুরের গলার ঘা পরিষ্কার করে দিচ্ছে গোপাল। ভীষণ লাগছে। যন্ত্রণায় ঠাকুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন। ততোধিক যন্ত্রণা গোপালের। হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'তবে থাক, আর ধোয়াব না।'

'সে আবার আরেক কষ্ট ঠাকুরের। তাঁর কষ্টে আর সকলে ব্যথা পাচ্ছে এ আবার দুঃসহ। বললেন, 'না-না তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ আমার আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

দেহ থেকে মন উঠিয়ে নিলেন নিমেষে। গোপাল ধুয়ে দিতে লাগল। আর আর্তনাদ নেই, বিকৃতিচিহ্ন নেই, মুখমণ্ডলে অমোঘ-অনঘ প্রসন্নতা। অপ্রগল্ভ শান্তি।'

'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।' এই ঠাকুরের মূলমন্ত্র। এই যে কষ্টের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দুঃখ আর শরীরের মধ্যে বোঝাপড়া, হে মন, তুমি অসম্পৃক্ত, তুমি স্পর্শদোষশূন্য, তুমি থাকো অখণ্ডিত আনন্দে। ধূমের সঙ্গে কাঠের সঙ্গে সম্বন্ধ, হে অগ্নিশিখা, তুমি অব্যাহত, তুমি সংশ্লেষলেশহীন, তোমাকে কে ছোঁয়, কে তোমাকে মলিন করে!

তাঁতেই লেগে থাকো। দুঃখের পার আছে সুখই অপার। শরীরের শেষ আছে মনই অফুরন্ত। মরুময়ী তামসী নিশাই মায়া, দিকদিগন্তের অধীশ্বর প্রদীপ্তশক্তি সূর্যই একমাত্র সত্য।

'একই সাধে সব সাধে, সব সাধে সব যায়!' এক সাধ করলেই সব সাধ পূর্ণ হয়, অনেক সাধ করলে একটি সাধও মেটে না। যদি বৃক্ষের মূলে জলসেচন করো বৃক্ষ পুষ্পফলব্যাপ্ত হবে; গোড়া ছেড়ে আর সর্বত্র জল ঢালো কোথায় তোমার বৃক্ষশোভা, কোথায় বা পুষ্পকান্তি। সব ছেড়ে সেই এককে ধরো, মূলকে ধরো, শাখা ছেড়ে শিকড়কে আশ্রয় করো। সেই তোমার সবেধন নীলমণি। তোমার একশ্চন্দ্রঃ।

গোপালের সেবাই ঠাকুর বেশি পছন্দ করেন। ওষুধও সেই খাইয়ে দেয়।

'সেই বুড়ো লোকটা কোথায়?' ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেলেও গোপালের দেখা নেই দেখে ঠাকুর জিগগেস করলেন বিরক্ত হয়ে।

সকলের চেয়ে বয়সে বড়, এমন কি ঠাকুরের চেয়েও, তাই ঠাকুর তাকে বুড়ো গোপাল বলে ডাকেন। কখনো বা ডাকেন 'মুরুব্বি।'

খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল কোন কানাচে। একজন এসে বললে, 'ঘুমুচ্ছে।'

'আহা', স্নেহে ও সমবেদনায় ভরে উঠলেন ঠাকুর। 'কত রাত জেগেছে। এখন ঘুমুচ্ছে, আহা, একটু ঘুমুক। তাকে আর জাগিও না।'

ভক্তের দাহেই দাহ। তার উপশমেই তাঁর উপশম।

বুড়ো গোপাল একবার তীর্থে যেতে চেয়েছিল। ঠাকুর জিগগেস করলেন,

'তোমার মন বুঝি এখন তীর্থ-তীর্থ করছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বারে-বারেই ইচ্ছেটা আসে ঘুরে-ঘুরে।'

বহূদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থভ্রমণ করে তার নাম বহূদক। আর যার ভ্রমণের সাধ মিটে গেছে, এক জায়গায় স্থির হয়ে আসন করে যে বসেছে, তাকে বলে কুটীচক।

'যখন হেথা-হেথা তখনই জ্ঞান।' বুড়ো গোপালের দিকে তাকালেন ঠাকুর।

যা আছে নিকটেই আছে, এই মুহূর্তেই আছে, আছে আমার দক্ষিণ হাতের দৃঢ় মুষ্টিতে। কেন আর গ্রন্থি জটিল করছ, গ্রন্থির পাশেই রয়েছে উন্মোচনের উপায়। তাকিয়ে দেখ একবার চোখ মেলে, সূর্য-চন্দ্রের দিকে নয়, দূরে মেঘ-ছোঁয়া মন্দির-চূড়ার দিকে নয়, তোমার পাশে বসা এই সহজ সুন্দর মানুষটির দিকে, বহুপুষ্প-ফলোপেত কল্যাণবৃক্ষের দিকে।

'যা চায় তাই কাছে।' বললেন ঠাকুর স্মিতমুখে। 'অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে মরে।'

যেখানে স্বয়ং ঠাকুর বর্তমান সেখানে আবার তীর্থ কি! যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় সেখানে পথ বাড়াবার কি দরকার!

বলরাম বললে, 'তাই গুরু শিষ্যকে বলে চার ধাম করে এস। যখন একবার ঘুরে দেখে যে এখানেও যেমন সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে।' যাবে কোথায়! যে বিন্দুর থেকে যাত্রা সমাপ্তিসিন্ধুও যে সেইখানে।

শুধু চিনতে পারে না। কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকোয়। কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছনে ছোটে। নিজ পুত্র ও বালক মনে করে বসুদেবও চিনতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণকে। সন্নিকর্ষই অনাদরের হেতু। যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গা ছেড়ে শুদ্ধির জন্যে অন্য তীর্থজলের সন্ধান করে। হাতের শাঁখা দেখতে দর্পণ খুঁজতে বেরোয়।

কিন্তু সাধুই আসল তীর্থ।

'জলময় সকল স্থানই তীর্থ নয়,' বললেন শ্রীকৃষ্ণ, 'মৃত্তিকা বা প্রস্তরময় সকল বস্তুই দেবতা নয়। তীর্থ আর দেবতা পবিত্র করে বহু কাল পরে কিন্তু সাধু পবিত্র করে দর্শনমাত্র।'

সমুদ্র অসীম, গভীর-গম্ভীর, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যে মাধুর্য তা সমুদ্রে কোথায়? ব্রহ্মের চেয়েও সাধু সরস।

দধিমন্থন করছে যশোদা, কৃষ্ণ এসে দণ্ড ধরে বাধা দিল। কোলে তুলে স্তন্যপান করাচ্ছে, দেখল উনুনে দুধ উথলে পড়ছে। অতৃপ্ত শিশুকে জোর করে কোল থেকে নামিয়ে যশোদা ছুটে গেল দুধ নামাতে। এসে দেখল ক্রুধ শিশু শিলাখণ্ড দিয়ে দধিমন্থনের ভাণ্ডটি চূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে ননী চুরি করে এনে নিজে খাচ্ছে, বানরদের খাওয়াচ্ছে।

লাঠি নিয়ে ছেলেকে তাড়া করল যশোদা। মাকে মারমুখো দেখে কৃষ্ণ ছুট দিলে। যশোদাও পিছু নিল। যোগীদের তপঃপ্রেরিত মন যার মধ্যে প্রবেশ

করতে অসমর্থ, চেয়ে দেখ তারই পিছনে কিনা ছুটছে। কিন্তু শিশু তো, কত আর ছুটবে, ধরা পড়ল। মারবার জন্যে লাঠি তুলল যশোদা, কিন্তু দেখল ছেলের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে। তখন মায়া হল। লাঠি ফেলে দিয়ে দড়ি কুড়িয়ে নিলে। দড়ি দিয়ে উদুখলের সঙ্গে বাঁধল কৃষ্ণকে। যার অন্তর-বাহির পূর্ব-পর কিছু নেই, যে নিজেই অন্তর-বাহির পূর্ব-পর, তারই কি না রজ্জুবন্ধন!

কিন্তু কি আশ্চর্য, দড়িতে কুলোচ্ছে না, বারে-বারেই দু আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। বাড়তি দড়ি জুড়লো গিঁট দিয়ে, তবু দু আঙুল কম? সবাই অবাক মানল। এ কি অঘটন, এ কি অতিমানুষী বিভূতি! কিন্তু যশোদা ছাড়বার পাত্র নয়। আরো দড়ি জুড়লে। পরিশ্রমে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়েছে, কবরী ও মাল্য বিস্রস্ত হয়ে পড়েছে, তবু নিবৃত্তি নেই। যে করে হোক তোকে বাঁধবই বাঁধব।

তখন কৃষ্ণ মাকে কৃপা করলেন। স্বিন্নগাত্রা বিস্রস্তকেশা দেখে নিজেই ইচ্ছে করে বাঁধা পড়লেন। বিশ্ব যাঁর বশ তিনি ভক্তের বশ। ভক্তিমানদের পক্ষেই তিনি সুখলভ্য।

১৪০

বাগবাজারের চুনীলাল বোস সাধু দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। অন্তত একবার গঙ্গার ধারটা ঘুরে আসে। জটাভস্ম দেখলেই সঙ্গ নেয়। কোন জটায় জলধারা আছে, কোন ভস্মে বা স্বর্ণখণ্ড তা কে জানে! কিন্তু যত জটা দেখে সব কেশভার যত ভস্ম দেখে দগ্ধাবশেষ।

কে একজন বললে, যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাও রাসমণির কালীবাড়িতে যাও। সে আবার কোথায়।

শুধু ঠিকানা জানলেই চলবে না, পথও জানা চাই। তারার অক্ষরে ঠিকানা তো লেখা আছে কিন্তু পথ কই অন্ধকারে?

আহিরীটোলা থেকে নৌকো পাবে জোয়ারের সময়। দক্ষিণেশ্বরের উত্তরের ঘাটে নামবে। ভাড়া পাঁচ পয়সা।

তবু কি তক্ষুনি-তক্ষুনি যাওয়া যায়? ঘাট থেকে কত নৌকো ছাড়ে, কত জোয়ারের নিমন্ত্রণ আসে তবু সময় হয় না। কি করে হবে? তুমি যখন ডাকবে তখনই তো সময়। তার আগে আর লগ্ন নেই।

কত দিন পরে এল সেই শুভযোগ। আফিসের ছুটি, দুপুরের জোয়ার, মণিব্যাগে পাঁচটি পয়সা এবং সর্বোপরি মন। মন যদি দূরে থাকে কান শোনে না হাজার ডাকে।

ঘাটে নেমেই এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। যেমন সাধারণ লোকের প্রার্থনা তাই আন্দাজ করে ব্রহ্মচারী জিগগেস করলে, 'কি, ওষুধ চাই?'

'না পরমহংসদেবের দর্শন চাই?

'ঐ আছেন কোণের ঘরে। কিন্তু তাঁর কাছে কি ?'

'কিছু নয়। শুধু দর্শন।'

ঠাকুরের ঘরে উত্তরের দিকে একখানি বেঞ্চি, তাতে গুটিসুটি বসল এসে চুনীলাল। ঠাকুর তাকে আপনজনের মত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোথায় থাকে, কি কাজ করে, কত মাইনে, কে-কে আছে তার সংসারে, এই সব ঘরোয়া কথা। প্রেমভক্তি বিবেকবৈরাগ্যের কথা নয়, সর্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি যে ঈশ্বরে সে ঈশ্বরকথা নয়। অথচ একটুও ফাঁকা-ফাঁকা লাগল না, মনে হল না আসার কথা। সব যেন এক নিমেষে সরল করে দিলেন, লঘু করে দিলেন। আপনজন কি আর মুখের কথায় হাওয়া যায় ? আমার আপনজন হবেন অথচ আমার খুঁটিনাটি সব জানবেন না, তা কি হতে পারে ? মুখের কথায় যখন মনের মধু এসে মেশে তখনই তো আপনজন।

চুনীলালের মনে হল, এই তো ভুভারবঞ্জন সর্বলোকসুখাবহ বন্ধু। অজ্ঞান-সংকটে পরজ্যোতি।

যাবার সময় মিছরি প্রসাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, আবার এসো।

বৈরাগ্য এল চুনীলালের মনে। এক মাসের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠালে আফিসে। বাড়ি থেকে সটকান দিলে। কাশী-বৃন্দাবন করলে কদিন, পরে হরিদ্বার-হৃষীকেশ। কিন্তু হৃষীকেশ হৃদিস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি কই ? মর্কটবৈরাগ্যের অবসান হল, ফিরে এল কলকাতা।

এসে দেখল চাকরিটি গেছে। মিউনিসিপ্যাল আফিসে কাজ করে, যত সামান্যই হোক তাইতেই তো সংসারের পালন-পোষণ। বৈরাগ্য গেছে যাক, চাকরিটি যায় কেন ?

ধরাধরি করে চাকরিতে ফের বহাল হল চুনীলাল। এবার তোমার পদপ্রান্তে বহাল করো।

বলরামের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমেই চুনীলালের বাসা। ঠাকুর বলে দিলেন বলরামকে, যেন চুনীলালকে নিয়ে আসে মাঝে-মাঝে। শুধু চুনীলাল কেন, যত ভক্ত যোগাড় করতে পারে, সবাইকে নৌকো করে নিয়ে আসে বলরাম। অন্য দিন না হোক অন্তত রবিবার। কত গরিব লোক আছে, দশটি পয়সা যোগাড় করাও যাদের কষ্ট, বলরাম তাদের এপারের কাণ্ডারী। ওপারের কর্ণধারের কাছেই নিয়ে যাচ্ছে তোমাদের।

চুনীলালকে পাড়ার লোকে বলে বড়লোকের পেটোয়া, যেহেতু ঠাকুরের ইঙ্গিতে সে বলরামের নৌকার সোয়ারী। লোক না পোক ! লোকের কথায় আমি কি এই সরলপথপরায়ণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হব ?

তবু, কে জানে কেন, যোগাভ্যাসের দিকে মন গেল চুনীলালের। পুঁটে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে বসে আসন-প্রাণায়াম করতে লাগল। লাভের মধ্যে হল এই, হাঁপানি শুরু হয়ে গেল। কাজ কামাই, ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ। টানটা কম পড়তে একদিন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর তাকে বকে উঠলেন, 'তোমাদের ও-সব

কেন ? তোমরা গৃহী, ও-সব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। তোমাদের শুধু বিশ্বাসভক্তি। ফেরবার সময় গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ নিয়ে যেও। দেখো, ও-সব কাজ আর কোরো না।'

কি করে জানলেন তার যোগের কথা, তার রোগের কথা ?

আর, কি আশ্চর্য, তিন মাত্রা ওষুধ খেয়েই তার অসুখ সেরে গেল।

'জ্বরে আর দশমূল পাচন চলবে না এ যুগে,' বললেন ঠাকুর, 'এখন ফিভার মিকশ্চার।'

যোগ-প্রাণায়াম নয়, এ যুগে শুধু নারদীয় ভক্তি। অকারণের অবারণের ভালোবাসা।

বড় সাধ চুনীলালের—ঠাকুরের কিছু সেবা করে। কিন্তু বড় গরিব, কিছু ভোগরাগ করার সামর্থ্য নেই। মনের ফুল তুমি নিচ্ছ তা জানি কিন্তু তোমাকে যে বনের ফুলও দিতে ইচ্ছা করে। শুধু ভাব নয় কিছু একটা দ্রব্য দিতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে তোমার মুখে আত্মভোলা শিশুর আহ্লাদ। মাস্টার-মশায়ের কাছে ঠাকুর একটা টুল চেয়েছিলেন, সেদিন চুনীলাল সেখানে ছিল।

ঠাকুর বললেন, 'একটা টুল কিনে আনবে এখানকার জন্যে। কত নেবে?' 'দু-তিন টাকার মধ্যে।' বললে মাস্টার।

'এত ? একটা জলপিঁড়ির দাম যদি বারো আনা, তবে অত হবে কেন ?'

'না, না, বেশি হবে না।' মাস্টার চাপা দিতে চাইল কথাটা।

মাস্টারের কাছে চেয়েছেন, চুনীলাল কি করে কেনে ? তা ছাড়া দু-তিন টাকা খরচ করবার মত তো তার সঙ্গতি নেই।

ঠাকুর বুঝলেন ভক্তের মনের ব্যাথা। বললেন, 'ধাতু-পাত্রে তো জল খেতে পারি নি। তুমি এখানকার জন্যে একটা কাচের গ্লাশ এনে দিও।'

কৃতার্থ হল চুনীলাল। কৃতকৃতার্থ। মনের ব্যাথাটুকুই শুধু জানবে, হরণ-পূরণের কোন ব্যবস্থা করবে না ? তুমি তবে কেমনতরো আত্মজন ?

প্রণবোচ্চারণে অধিকার নেই চুনীলালের, এ আরেক দুঃখ। তাও ঠাকুর জল করে দিলেন। বললেন, 'প্রণবে কি দরকার ? ভগবানের যে কোন একটা নাম ধরো, তাই জপ করো, উচ্চারণ করো।'

এই তো সরলপথপরায়ণ ধর্ম এই তো ক্রান্তদর্শন। এই তো বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। ঈশ্বরের হাত নেই, কিন্তু সমস্ত কিছু রচনা করেন, গ্রহণ করেন। পা নেই কিন্তু সর্বব্যাপক বলে সমধিক বেগবান। চোখ নেই তাই দেখেন অনিমেষে, কান নেই তাই শোনেন অনিরুদ্ধ। অন্তঃকরণ নেই তবু সমস্ত জগৎকে হৃদয়ঙ্গম করেন। অথচ তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন কারও সাধ্য নেই। সনাতন সর্বোত্তম ও সর্বত্রপূর্ণ বলে তিনি পুরুষ। এবং পরমপুরুষ।

'যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, 'এই চোখে, ভাবে নয়, দেখলাম চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্ছে। তাতে বলরামকে দেখলাম, যেন তোমাকেও দেখলাম। আর চুনীলাল

এখানে আনাগোনা করছে, তুমি করছ, তাতে উদ্দীপন হয়েছে।'

উদ্দীপিত করতে পারছে ঠাকুরকে এমন লোক চুনীলাল।

'আচ্ছা এ অসুখটা কত দিনে সারবে বলতে পারো?' কাশীপুরের বাড়িতে এসে জিগগেস করলেন একদিন।

'তা একটু সময় নেবে।' যেন প্রবোধ দিল মাস্টার।

'কত?' নিরীহ শিশুর মত তাকালেন ঠাকুর।

'এই পাঁচ-ছ মাস।'

'বলো কি?' অধীর হয়ে আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। 'এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন এত ভাবসমাধি, তবে আবার এই অসুখ কেন?'

'উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।'

'কি বলো তো?' ঠাকুরের চোখে প্রশান্তির প্রসন্নদীপ্তি ফুটে উঠল।

'একটা শুধু বলতে পারি, আপনি সাকার থেকে নিরাকারে যাচ্ছেন। বিদ্যার "আমি" পর্যন্ত থাকছে না। লোকশিক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলছে। কাকে আর কি বলব। সব রামময় দেখছি। কিন্তু দেখ না এই বড় বাড়িটা ভাড়া হয়েছে বলে কত লোক আসছে। শুধু কথা শুনতে চায়।' হাসলেন ঠাকুর। 'আমি কি কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত সাইনবোর্ড দিয়ে বসেছি যে অমুক সময় লেকচার হবে?'

সেই বাগবিন্যাসবিশারদ পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন। যে বলি-হস্তীর পদমর্দনে ধর্ম নিঃশেষপ্রায় হতে চলেছে সেই প্রমত্ত মাতঙ্গমথনের অঙ্কুশস্বরূপ হয়ে সে আবির্ভূত হয়েছে। মোহনিদ্রাতুর দেশের জাগ্রত চৈতন্য।

'আচ্ছা মশাই আপনি গেরুয়া পরেন কেন?' কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে জিগগেস করলেন একজন।

'শ্রীমদবধূত গুরুপ্রসাদাৎ।'

'বাইরের রঙের চেয়ে ভিতরের রঙ কি ভালো নয়?'

'না। বাইরে রঙ করুন আর না করুন, ভিতক একেবারে শাদা রাখতে হবে। যদি ভিতরে রঙ লেগে যায় তাকে বৈরাগ্যের জলে ধুয়ে ফেলাই ভালো।'

'এ মলিন পোশাক পরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে আপনার লজ্জা করে না?'

হাসল কৃষ্ণানন্দ। 'এ যে অযাচকের পরিচ্ছদ। যাচ্ঞাহীন ব্যক্তি নির্ভীক, ভুজবীর্যসম্পন্ন, আনন্দময়।'

'কিন্তু আপনি তো দান সংগ্রহ করেন শুনছি।'

'সে আমার নিজের জন্যে নয়, ভারতের হিতের জন্যে। এখানে স্বয়ং ভারতই যাচক, ভারতই দাতা।'

'কিছু সুবিধে আছে গৈরিক পরে?'

'যখন শাদা কাপড় পরতাম তখন আমার জামা লাগত, জুতো লাগত, না হলে পরিপূর্ণ হত না। এখন গৈরিক বস্ত্রখণ্ড একাই স্বসম্পূর্ণ। জুতো জামার দরকার হয় না। মাত্র কৌপীন পরলেই মনে হয় পূর্ণ পরিচ্ছদ পরে আছি।'

'শুধু এইটুকু লাভ ?'

'না আরো আছে। আগের দিনে ঋষি ও ব্রহ্মচারীরা যাঁরা গহন বনে বা গিরিগুহায় থাকতেন তাঁরা গিরিমাটিতে বসন রাঙিয়ে নিতেন। গায়ে মাটি মাখলে কি হয় জানো বোধ হয় ? শরীর থেকে যে তৈজসপদার্থ নিত্য বেরিয়ে যাচ্ছে তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। তাতে শরীরের ওজোগুণ বাড়ে, আত্মাতে সমাধি করবার শক্তি বাড়ে। গৈরিক বসন পরলে সেই গিরিমৃত্তিকার স্পর্শে সাধনার্থীর দেহ বলশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং গেরুয়া সাজের জন্যে নয় কাজের জন্যে।'

সেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। তার পর লিখছে তার কাগজে, 'ধর্মপ্রচারকে' :

'ইনি গৈরিক কোপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলিয়া বুঝিয়াছেন ? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি, যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্তচলাচলশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে তৎ-শ্রবণে পাষাণ হৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনীকাঞ্চনকে বস্তুতঃই কায়েন-মনসা-বাচা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্বর তাঁহার শরীরের সহিত সংসৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমন কি যদি কোনো পাপগামী অপরিচিত তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সংবেগ উদয় হয়, এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে তাঁহাকে কেহই কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুতঃ তিনি অজাতশত্রু, তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত-গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী। তাঁহার সংস্রবে ও তাঁহার উপদেশগুণে অনেক অবিশ্বাসী নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে।...'

সেই সব কথাই হৃৎকর্ণরসায়ন কথা। সেই সব কথা শ্রবণই অবিদ্যা নিবৃত্তির পথ, শুদ্ধা রতিভক্তি সংক্রমণের পথ। একমনসোবৃত্তি স্বাভাবিকী যে ভক্তি, যে ভক্তি অনিমিত্তা তা সিদ্ধির থেকে মুক্তির থেকেও গরীয়সী। যারা আমার পদসেবা-পরায়ণ, বললেন শ্রীহরি, তারা আমার সঙ্গে একাত্মতাও ইচ্ছা করে না।

দেখ দেখ আমার রুচির প্রসন্ন মুখ, আমার অরুণলোচন, আমার দিব্যতরঙ্গ-শোভা আর ইচ্ছামত বাক্যালাপ করো আমার সঙ্গে।

'দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।' মাস্টারকে বললেন ঠাকুর, 'আর আর কত কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না।'

তুমি যদি না কও আমরা কইব। আমরা কইব আর তুমি শুনবে। তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে, সেই কপিলজননী দেবহূতি স্তব করেছিল ভগবানের, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ। আর যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে তারাই প্রকৃত তাপস। তারাই ঠিক-ঠিক হোম ও তীর্থস্থান করেছে। তারাই যথার্থ সদাচারী, তাদেরই সার্থক বেদাধ্যয়ন

১৪১

দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায় হনুমানের পাল চুপ করে বসে আছে। যেন কত ভালোমানুষ। যেন সর্ববিষয়ে বীতরাগ। কিন্তু আসল মতলবখানা হচ্ছে, কোন গৃহস্থের চালে-বাগানে হুপ করে লাফিয়ে পড়বে। চালে হয়তো ফলে আছে লাউ-কুমড়ো বাগানে হয়তো কলা-বেগুন। এই মর্কট-ধ্যান, মর্কট-বৈরাগ্য দিয়ে কি হবে? কেশব সেনকে একদিন বলেওছিলেন ঠাকুর: 'তোমাদের ওখানে অনেকের ধ্যান দেখলাম সেই হনুমানের ধ্যানের মত।'

তন্ময় হয়ে যাও, তদেকান্তচিত্ত হও। আবেশেই তো আছ সারাক্ষণ। হয় ধনের আবেশ, নয় মানের আবেশ, নয়তো গূঢ়চর কামনার আবেশ। এবার নতুন আবেশে চলে এস, ঈশ্বর-আবেশে। কালকূটকুম্ভ আলোড়ন করে বারে-বারে পান করছে, মেটেনি তৃষ্ণা, এবার ঈশ্বর-সরোবরে অবগাহন কর। তোমার চিত্ততল আবৃত করেই সেই অমৃতের পয়োধি।

'আচ্ছা, ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান করব?' জিগগেস করল মণিমল্লিক।

'কেন হৃদয়ে।' মুখের উপর জবাব দিলেন ঠাকুর। 'হৃদয়ই ডঙ্কাপেটা জায়গা। নয়তো সহস্রারে। এ-সব বৈধী ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। তাকে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় দৃষ্টি রাখতে হয় কপালে। জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা।'

'আর সাকার ধ্যান?'

'তাকে বলে বিষ্ণুযোগ। দৃষ্টি নাসাগ্রে। অর্ধেক জগতে অর্ধেক অন্তরে।'

একটু কি দুরূহ লাগছে?

ঠাকুর হাসলেন। জল করে দিলেন। বললেন, 'ও সব শাস্ত্রবিধি। যাদের রাগভক্তি হয়েছে, যেখানে খুশি সেখানেই তারা ধ্যান করতে পারে। সব স্থানই তো তাঁর, কোথায় তিনি নেই? গঙ্গা যেমন পবিত্র তেমনি অগঙ্গাও পবিত্র। বলির কাছে এসে যখন তিন পায়ে নারায়ণ স্বর্গ মর্ত পাতাল ঢাকলেন, তখন কি আর কোনো জায়গা বাকি ছিল?'

'পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।' ঈশান মুখুজ্জেকে বলছেন ঠাকুর, 'লোকে না হয় জানুক ঈশান এখন পাগল হয়েছে। কোশাকুশি ছুঁড়ে ফেলে দাও, ঈশান নাম সার্থক করো।'

পাগল নয় কে! কেউ কামের জন্যে পাগল, কেউ নামের জন্যে। কেউ পদের

জন্যে কেউ সম্পদের জন্যে। কয়েকজন না হয় ঈশ্বরের জন্যে পাগল হল! আর সব পাগলদের মধ্যে হানাহানি মারামারি, কিন্তু আমিও ভক্ত তুমিও ভক্ত, জলে জলাকার।

ঈশানের দুর্জয় বিশ্বাস। বলে, 'একবার যখন দুর্গানাম করে বেরিয়েছি, আর আমার ভয় কি! শূলহস্তে শূলপাণি আমার সঙ্গে আছে।'

'তোমার খুব বিশ্বাস।' বললেন ঠাকুর। 'আমাদের কিন্তু অত নেই।'

সকলে হেসে উঠল।

'কি বলো, শুধু বিশ্বাস থাকলেই হয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগুনের সঙ্গে বায়ুর যেমন প্রীতি, তেমনি বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাকুলতার। শিশুর বিশ্বাস আর মায়ের ব্যাকুলতা।

অহংকারের দরুনই আমাদের বিশ্বাস কম।' বললে ঈশান। 'কাক ভুষণ্ডীও প্রথমে মানেনি রামচন্দ্রকে। সপ্তলোক বেড়িয়ে এসে দেখলে কিছুতেই নিস্তার নেই রামের থেকে। তখন নিজে ধরা দিল। রামের শরণাগত হল।'

শরণাগতি তো বীর্যহীনের নিষ্ক্রিয়তা নয়, শরণাগতি হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে ধরা। রোক করে জোর করে ধরা। যে এগিয়ে গিয়ে ধরে সেই তো পুরুষপ্রবীর।

'তুমি খোশামুদের কথায় ভুলো না।' ঠাকুর সাবধান করে দিলেন ঈশানকে। 'বিষয়ী লোক দেখলেই পিছু নেয়। যেমন মরা গরু দেখলেই শকুনি এসে ভিড় করে। আর, বিষয়ী লোকদের কথা বোলো না। কোনো পদার্থ নেই। যেন গোবরের ঝোড়া।'

খুব সালিশি-মোড়লি করে ঈশান, তাকে সবাই মানে-গোণে। পাঁচটা লোকের যদি উপকার হয় তারই সে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

'তোমার ও ভাবনায় কাজ কি? ও সবের জন্যে অন্য থাকের লোক আছে। তোমার এখন সময় হয়েছে, তুমি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দাও। লঙ্কায় রাবণ মরে তো মরুক, বেহুলা কেন কেঁদে আকুল হবে?'

ঘোড়ার গাড়ি করে ঠাকুর যাচ্ছেন ঈশানের বাড়ি। বাবুরাম আর মাস্টারমশাইও চলেছে। শীতকাল। ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কান-ঢাকা টুপি আর মশলার থলে নিয়েছে সঙ্গে করে। বৈঠকখানায় ঈশানের ছেলে শ্রীশের সঙ্গে দেখা। এন্ট্রান্স ও এফ-এ-তে প্রথম হয়েছে। এখন এম-এ আর ল পাশ করে ওকালতি করছে আলিপুরে। বিদ্বান অথচ বিনয়ের প্রতিমূর্তি। দেখলে মনে হবে সংসারে আর সব জ্ঞানী-গুণীর কাছে সে-ই একমাত্র অজ্ঞ।

'তুমি কি করো গা?'

'আজ্ঞে, আমি আলিপুরে বেরুচ্ছি। ওকালতি করি।'

'বলে কি গো?' মাস্টারের দিকে তাকালেন ঠাকুর। 'এমন লোকের ওকালতি?' শেষে বললেন, 'হাজার লেখাপড়া শেখ ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে পাবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে।'

শ্রীশের কটা প্রশ্ন আছে। কর্মভার কমবে কিসে?

ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে-হতে। যতই এগোবে ততই লঘু হবে, মুক্ত হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পুঁটলি বেঁধেছিলে তারই গ্রন্থি মোচন করে পাল করে উড়িয়ে দেবে নৌকোয়।

সংসারে থেকে তার দিকে এগোই কি করে?

শুধু অভ্যাসযোগে। প্রথমটা কাষ্ঠ-আড়ষ্ট মনে হবে বটে কিন্তু ক্রমশই রপ্ত-মুখস্ত হয়ে যাবে। অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। ভূমিকর্ষণেই মেঘবর্ষণ।

কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকবার সময় কই?

এটা একটা খাঁটি কথা বলেছ। তিনি সময় করে না দিলে কিছুই হবার নয়। ছেলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে মাকে বলেছিল, মা, আমার যখন খিদে পাবে তখন আমাকে জাগিয়ে দিস। মা বললেন, খিদেই তোমাকে জাগাবে। আমাকে জাগাতে হবে না। তাই একবার খিদে যদি জাগে তাহলেই সফলমনোরথ।

'কি করবে? কিছুই করবার নেই। শুধু তাঁর পায়ে ঢেলে দাও, বিলিয়ে দাও। যা ভালো হয় করুন। আমি নাবালক, আমি ভালো-মন্দর কি বুঝি!'

কিন্তু ঈশ্বরের নাম নিলেই বা ভালো ফল হয় কোথায়?

'বলো কি? বীজ পড়ামাত্রই কি গাছ দেখা দেয়? আগে গাছ, তবে তো ফুল-ফল।' তবু বপন করো এই নাম-বীজ। বীজের মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে নিরুদ্ধ হয়ে আছে বনস্পতি। তুমি জানো না তোমার আয়তন। তোমার পরিমাণ-পরিসর। হৃদয়ের উর্বর ক্ষেত্রে ফেল একবার এই বীজবিন্দু। দেখ কাকে বলে অসাধ্যসাধন। অফল-ফলন।

'আহা, সেই ছেলেটির গল্পটা বলো না!' ঈশানকে অনুরোধ করলেন ঠাকুর। একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে খবর পেয়েছে ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক। তখন সে ঈশ্বরকে একখানা চিঠি লিখলে। ঠিকানা দিলে স্বর্গ। চিঠি লিখে ফেলে দিল ডাকবাক্সে।

'দেখলে তো! একেই বলে বিশ্বাস। একেই বলে সরলতা। বালকের বিশ্বাস আর বালকের সরলতা।'

ডাকবাক্স তো একটা নয়, তেত্রিশ কোটি ডাকবাক্স। তেত্রিশ কোটি দেবতা। চিঠি পৌঁছুনো নিয়ে কথা। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা গাঁয়ের ডাকবাক্সেই ফেল বা হেড পোস্ট অফিস বা জি-পি-ও-তেই ফেল ঠিকানা ঠিক লেখা থাকলে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে। শুধু ভক্তির টিকিটটা এঁটে দিও। দু-একবার বেয়ারিং হয়ে পৌঁছুতে পারে শেষকালে, বেশি বেয়ারিং দেখলে রিফিউজ করে দেবে। টিকিটটা এঁটে দেওয়াই শান্তি। যখন ব্যাকুলতার ভাষায় লিখেছ তোমার চিঠি, বিশ্বাস করে ফেলে দিয়েছ তোমার নিকটতম ডাকবাক্সে আর তাতে ভক্তির টিকিটটা এঁটে দিয়েছ, তখন আর ভাবনা নেই, তোমার চিঠি পৌঁছেছে ঠিক জায়গায়। এবার অপেক্ষা করো, এই এল বলে তাঁর প্রত্যুত্তর।

জানো না বুঝি, তিনিও গুণাতীত বালক। বালকে-বালকে বন্ধুত্ব। তুমিও

বালক হয়ে যাও।

কালীপ্রসাদ সেদিন এসে খুব আনন্দের কথা বললে। আনন্দই যদি মুখ্য তবে তার মধ্যে আবার শ্রেণীভাগ কি? যার যাতে আনন্দ!

ঠাকুর বললেন, 'তাই বলে ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক?'

দেখ কে বেশি টেঁকসই। স্থান-কালে কে বেশি পরিব্যাপ্ত। কে নিরবচ্ছিন্ন। কে শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

কালী বললে, 'তাঁর শক্তিই তো সব। সেই শক্তিতেই ব্রহ্মানন্দ, সেই শক্তিতেই বিষয়ানন্দ।'

ঠাকুর বললেন, 'সে কি? সন্তান লাভের শক্তি আর ঈশ্বর লাভের শক্তি কি এক?' কালী বুদ্ধগয়া থেকে ফিরেছে। তাই সব সময় আনন্দের কথা কইছে আনন্দের ধ্যান করছে। সুখই যখন আমার উদ্দেশ্য তখন অল্প সুখে তুচ্ছ সুখে আমার সুখ কি! আমি যে সুখের চেয়েও আরো সুখ চাই। সুখ মানেই তো আরো-সুখ। আরো-সুখ মানেই তো অধিকতম সুখ। সেই অধিকতমই তো ঈশ্বর।

শ্রাবস্তীতে এক নবদম্পতী বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে। নবীনা বধূ পরিবেশন করছে স্বহস্তে। স্বামী বুদ্ধের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। তার আতুর দৃষ্টি স্ত্রীর দিকে। বুদ্ধ তার মনের কথা টের পেয়েছেন। বলছেন তাকে, কামনার সমান আগুন নেই, দ্বেষের সমান পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধের সমান দুঃখ নেই, শান্তি বা নির্বাণের সমান সুখ নেই।

পঞ্চস্কন্ধ কি? রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আর বেদনা। জীব এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ অজাতশত্রুর কাছে হেরে গিয়েছে যুদ্ধে। বার-বার তিন-বার। সামান্য কাশীগ্রাম নিয়ে যুদ্ধ। তা হলে কি হয়, পরাজয়ের লজ্জায় অনশন সুরু করেছে প্রসেনজিৎ। বুদ্ধ শুনতে পেলেন অনশনের কথা। বললেন, 'জয় বৈরিতা প্রসব করে, পরাজিত বাস করে দুঃখে, মর্মদাহে। যে জয়-পরাজয়ের অতীত তারই অক্ষুণ্ণ শান্তি।'

কাশীপুরের বাগানবাড়ির ভাড়া প'য়ষট্টি টাকা। তারপর রাঁধুনে বামুন রাখতে হয়েছে, আবার একটি ঝি। অনেক খরচ হচ্ছে।

ঠাকুর বললেন মহেন্দ্র সরকারকে, 'বড় খরচা হচ্ছে।'

'তা হলেই দেখ।' সরকার হাসল, 'কাঞ্চন চাই।'

ঠাকুর নরেনের দিকে তাকালেন। ইচ্ছে সে একটা সমুচিত উত্তর দেয়।

'শুধু কাঞ্চন? কামিনীরও দরকার।'

রাজেন ডাক্তার বললে, 'রান্নার জন্যে অন্তত।'

'দেখলে?'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'কিন্তু বড় জঞ্জাল।'

'জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।'

'টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'সব স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলেই তবে বিদ্যার সংসার।'

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ঠাকুর যেন একটু ভালো আছেন। রাজেন ডাক্তার ভারি খুশি। বললে, 'সেরে উঠে আপনার কিন্তু হোমিওপ্যাথি করতে হবে। 'নইলে বেঁচে থেকে লাভ কি ?'

১৪২

জ্ঞানীর লক্ষণ কি ? লক্ষণ দুটি। বললেন ঠাকুর, 'প্রথম, অভিমান থাকবে না, দ্বিতীয়, স্বভাবটি শান্ত হবে।' থেমে আবার বললেন, যার মধ্যে এ দুটো লক্ষণ দেখবে, জানবে তার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ।'

পালকিতে করে নন্দ বোসের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। পরনে লাল ফিতে-পাড় ধুতি, পায়ে বার্নিশ-করা কালো চটিজুতো। উঠে এসেছেন উপরের হল্-ঘরে। ঘর তো নয়, পটের হাট। প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠাকুর, ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে পড়লেন। তারপর এই দেখ নৃসিংহমূর্তি। জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্বগুহাশয়। সেই উদার আধার বিশ্ববিধায়ক বিষ্ণু। আর দম্ভের স্তম্ভ-বিদারক নৃসিংহ।

আহা, হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রাম আশীর্বাদ করছেন বুঝি ! হনুমানের দৃষ্টি রামের পায়ের দিকে। হে নির্মলজ্ঞানচক্ষু, আর কি আশীর্বাদ করবে ! তোমার পাদপদ্মেই যেন মতি শাশ্বতী হয়।

আর এইটি বুঝি বামন ? ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে বলির যজ্ঞে। এক দৃষ্টে তাকে দেখছেন ঠাকুর। লোকব্যাপারকারণ সর্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েও যে ছদ্মবেশী। তমালশ্যামল কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। রাখাল ছেলেদের সঙ্গে চলেছেন গোষ্ঠে, যমুনাপুলিনে। আর, দেখ, দেখ, রাই রাজা সেজে বসেছে সিংহাসনে। চারদিকে সখীদের শতদল। সব চেয়ে মজা, কুঞ্জদ্বারে ঐ কোটালটিকে দেখ ! চিনতে পেরেছ ? ওটি আমাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়।

এ সব উগ্রমূর্তি রেখেছ কেন ? ধূমাবতী ছিন্নমস্তা বগলা মাতঙ্গী ? ও সব মূর্তি রাখলে পুজো দিতে হয়। আর, আহা, এইটি অন্নপূর্ণা। সর্বজনেশ্বরী সর্বদানেশ্বরী কল্যাণী। হে সর্ববরকামদে, ভিক্ষে দাও। অন্ন দাও। যে অন্নে তুষ্টি-পুষ্টি-অনাময় সেই অন্ন দাও। জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যই সেই অন্ন।

সুরেশ মিত্তির ঠাকুরের ভাব নিয়ে বিচিত্র একটা ছবি করিয়েছিল, দিয়েছিল কেশব সেনকে। সেটি দেখছি এখন নন্দ বোসের বাড়িতে।

ঠাকুর চিনতে পারলেন। বললেন, 'এ সেই সুরেন্দরের পট।'

কে একজন বললে, 'আপনি আছেন এই ছবির মধ্যে।'

'এ হচ্ছে ইদানীং ভাব।' আত্মগত হলেন ঠাকুর, 'এর মধ্যে সবাই আছে।'

ছবির বিষয়বস্তুটি অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভিন্ন-ভিন্ন পথ দিয়ে চলেছে যাত্রীদল। কিন্তু সবাই গিয়ে পেঁছুচ্ছে সেই চির-স্থিরের সকাশে। অর্থাৎ যত মত তত পথ। কর্ম নানা, বিষয় এক। পথ নানা, লক্ষ্য অভ্রান্ত।

দেখতে তো পাচ্ছ তিনি অনন্ত, তাই তার পথও অন্তহীন। তিনি বিচিত্র তাই তাঁর পথও বহুদিঙ্মুখ। তাঁকে মানলেও তিনি, তাঁকে উড়িয়ে দিলেও তিনি। তাঁর কথা বললেও তিনি, তাঁর কথা চেপে গেলেও তিনি। এক ছাড়া দুই নেই। দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত—যত খুশি বাড়িয়ে যাও, সব সেই এককে নিয়ে। বাড়ির মধ্যে রয়েছে একজন, কেউ ডাকছে খুড়োমশাই, কেউ ডাকছে মামাবাবু, কেউ ডাকছে মেসোমশাই, কিন্তু লোকটি ঠিক বুঝতে পারছে আমাকেই ডাকছে। ঠিক-ঠিক সাড়া দিচ্ছে। যার যেমন তাড়া তার তেমনি সাড়া। কথায় বলে যেমন গাওনা তেমনি পাওনা। ঐ বারোয়ারি তলায় মেলায় দেখনি? বললেন ঠাকুর, 'কত রকম মূর্তি তৈরি করেছে। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম, আবার বেশ্যা তার উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও আছে। নানা মতের লোক নানা মূর্তির কাছে ভিড় করে। যারা বৈষ্ণব তারা যায় রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শক্ত তারা যায় হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তাদের লক্ষ্য সীতারাম। আর যাদের ঠাকুরের উপর মন নেই তারা দেখছে ঐ ঝাঁটা-মারা। শুধু তাই নয়, বন্ধুদের ডাকছে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে—'ওরে, ও সব কি দেখছিস, এদিকে এসে দ্যাখ, কেমন তৈরি করেছে মাইরি!'

তেমনি বিষয়ী লোক ডেকে বলছে ভক্তদের, ওদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি দেখছ, এদিকে এসে ভিড় করো, দেখ এই ভূতের নৃত্য।

কিন্তু সারাংশ পরীক্ষা না করে কদলীকাণ্ডে আসক্ত হব না এই বীরত্বই তো ভক্তি। কাম কাঞ্চনের সুখ, এই আছে এই নাই। যে সুখ সারাক্ষণ থাকে না সে সুখ আমি সওদা করতে যাব কেন? আমি কেন ঠকে ঠুনকো জিনিস নেব? এত যাচাই-বাছাই করা আমার অভ্যেস, মাণিক ফেলে কাচ কিনব আমি কোন হিসেবে?

'ভোগান্ত না হলে কি চৈতন্য হয়?' জিগগেস করলে নন্দ বোস।

'ও রকম মত আছে বটে। কাদের মত জানো? যাদের ভোগ করবার ইচ্ছে তাদের। আহা, ভোগ করবে কি? ঐ তো আমড়া, আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্লশূল।'

'তাহলে চৈতন্য হয় কিসে?'

'একমাত্র তাঁর কৃপায়।'

'তবে সবাইকে কৃপা করছেন না কেন?'

'তাঁর খুশি।'

'এ কেমনতরো খুশি?'

'খুশির আবার এমন-তেমন কি? খুশি-খুশি।'

'তা হলে কি বলব ঈশ্বর পক্ষপাতী ?' জিগগেস করল নন্দ বোস।

'কার উপর পক্ষপাত করবেন ?' ঠাকুরের প্রশান্তমুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। 'সবাই তো তিনি। পঞ্চকোটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, তার মধ্যে দুটো একটা বা কাটিয়ে দিচ্ছেন খুশিমত। সেই মুক্তিতে নিজেই আবার হাততালি দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে।'

'আর তাঁর ইচ্ছেতে আমরা মরছি।'

'তোমরা কোথায় ? সব তিনি। তিনিই মরছেন। তিনি হয়েছেন।'

'এ স্বরূপ বুঝি কি করে ?'

'মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা যায় ? বুঝে কি বা হবে ? নানা খবরে নানা বিচারে কাজ কি। কথাটা আর কিছুই নয়, ঈশ্বরের উপর একবার ভালোবাসা আসে কিনা তাই দেখ। তুমি তাঁর ভালোবাসার জন, এ যদি একবার তাঁকে বোঝাতে পারো, তিনি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। কথাটা আর কিছুই নয়, আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও। কত ডাল, কত পাতা এ হিসেবে দরকার কি ?'

নন্দ বোস গদগদ হয়ে তন্ময়ের মত বললেন, 'আমগাছ কোথায় ?'

'আহা, নিত্যবৃক্ষ। শুধু বৃক্ষ ? তিনি কল্পতরু। প্রার্থনা করো, কাঁদো। তরুর মূলে ফল আপনা থেকে খসে পড়বে।'

আমরা কি কাঁদি না ? আমরাও কাঁদি। কিন্তু যে অশ্রু ফেলি সে অশ্রু অমল অশ্রু নয়, আবিল অশ্রু। আকাঙ্ক্ষায় আবিল, ভালোবাসায় অমল নয়।

'নাকের দিক দিয়ে যে চোখের কোণ সে কোণ দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে অনুতাপের অশ্রু আর প্রান্ত দিয়ে যে জল আসে সে হচ্ছে ভালোবাসার।'

গঙ্গাধরকে বললেন একদিন ঠাকুর।

'হ্যাঁ রে, ধ্যান করতে-করতে চোখে জল এসেছিল ?' জিগগেস করলেন গঙ্গাধরকে : 'প্রার্থনা করতে-করতে ?'

'এসেছিল।'

'তবে আর কি। তবে আর ভাবনা নেই। কিন্তু কি করে প্রার্থনা করতে হয় জানিস ?'

চুপ করে রইল গঙ্গাধর।

'ছোট ছেলের মত হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে হয়। কাঁদতে হয় অঝোরে। নাছোড়বান্দার মত। বলতে হয়, মা, আমাকে জ্ঞান দে, ভক্তি দে। আমি কিছুই চাইনে মা। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে ? তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব। কি আশ্চর্য, নিমেষে ঠাকুর ছোট ছেলেটির মতন হয়ে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন হাত-পা ছুঁড়ে, কাঁদতে লাগলেন নিরর্গল।

ছোট ছেলেরই ঐশ্বর্য নেই। দারিদ্র্যে সে দীন নয়, নগ্নতায় সে রিক্ত নয়, ধুলিতেও সে শুচিস্নাত। ঐশ্বর্য জুটতে শুরু করলেই সে সরতে আরম্ভ করে।

'ঐশ্বর্যের অভাবই ঐ। ঐ দেখ না যদু মল্লিককে।' বললেন ঠাকুর, 'বেশি

ঐশ্বর্য হয়েছে, তাই আজকাল আর ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে-আগে বেশ কইত।'

'আচ্ছা মশাই, পরলোকে কি আছে?' নন্দ বোস আবার প্রশ্ন করল।

'থাকলে আছে, না থাকলে নেই। কি দরকার ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? আধ বোতল মদেই যখন মাতাল হও, শুঁড়ির দোকানের বোতলের হিসেবে দরকার কি? একটা জন্মেই যখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—'

'তবু যদি বলেন—'

'সোজা কথা, যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ না হচ্ছে ততক্ষণ বারে-বারে যাতায়াত করতে হবে সংসারে। যতক্ষণ কাঁচা মাটি থাকবে কুমোরের চাকে উঠতে হবে পাক খেতে।'

যতক্ষণ ঘট তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ কুম্ভকার রেখে দেবেন দণ্ড-চক্র। যতক্ষণ নদী অনুত্তীর্ণ ততক্ষণ নৌকো ভাসাবেন কর্ণধার।

যখন আমরা চলি তখন এক পা মাটিতে রেখে আরেক পায়ে মাটি ত্যাগ করি। এক পায়ে ত্যাগ আরেক পায়ে গ্রহণ। এমনি করে ধরে আর ছেড়ে, ছেড়ে আর ধরে আমরা এগোই। যতক্ষণ না মেলে আমাদের গন্তব্যস্থল। জোঁক কি করে? পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে গ্রহণ করে তৃণান্তর। তেমনি প্রাক্তন দেহ ত্যাগ করে ধরছি নবীন দেহ। এক দীপের আলো বহন করছি আরেক দীপে। যতক্ষণ না তার মুখখানি দেখি। তন্তু ছাড়া পটোৎপত্তি অসম্ভব। তেমনি মৃত্যু ছাড়া জন্ম অমূলক।

জীবনটা যখন পেয়েছ তখন সম্ভোগ করে যাবে তো? আর সে সম্ভোগে সুখ কোথায় যে সম্ভোগে নিশ্চিন্ততা নেই? সংসারে নিশ্চিন্ত কে? একমাত্র ভক্তই নিশ্চিন্ত। তারই একমাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধি। সারাবলোকিনী প্রজ্ঞা। সমস্ত জীবনভোর তার প্রসন্ন বায়ুর দাক্ষিণ্য। অনুকূল হাওয়া দিলে মাঝি কি করে? কেবল হাল ধরে বসে থেকে তামাক খায়। অনুকূল বায়ুই হচ্ছে ভক্তি। হাল হচ্ছে ঈশ্বর। আর তামাক খাওয়া হচ্ছে জীবনসম্ভোগ।

বারে-বারে আসব। আমার পুলক-পুজাঞ্জলি দিয়ে যাব তোমাকে। শেষে নিজেকে দিয়ে যাব উৎসর্গ করে। তার আগে আমার ছুটি নেই, চাইও না। আমার সমস্ত দৈন্যকে যতক্ষণ না বৈভবরূপে দিতে পারছি তোমার হাতে ততক্ষণ আমারও বিশ্রাম কোথায়? আমার সমস্ত অপচয়ের পরিপূর্তি তো তুমিই। তুমি আত্মা, আমার পঞ্চপ্রাণ তার সহচর, শরীর গৃহ, বিবিধ উপভোগরচনাই পুজা, নিদ্রা সমাধিস্থিতি, পদসঞ্চার প্রদক্ষিণবিধি আর আমার সমস্ত বাক্য তোমার স্তোত্র। আর যত কর্ম আমি করছি সমস্ত তোমারই আরাধনা।

কি প্রার্থনা ঠাকুরের অন্তরের? যদি একটি মানুষেরও দুঃখ মোচন করতে পারি, উর্ধ্বগমন পথে যদি একটি আত্মাকেও সাহায্য করতে পারি, আমি জন্ম-জন্ম আসব, হোক না তা অতি নীচ জন্ম। সেবাই আমার পরাপুজা। মা, আমাকে বেহুঁশ করিস না। সমাধি সুখের হাত থেকে রেহাই দে মা! আমাকে ডুবিয়ে দিস না মা, আমাকে সন্তরণ করতে দে। সন্তরণেই সিন্ধুতরণ।

অসুখ বেড়েছে, কাউকে কাছে আসতে বারণ, ঠাকুর কাতরস্বরে বলছেন, 'আজ

আর কেউ তো এল না ? আজ তো আমি কারুর কাজে লাগলাম না ? আমার এ কষ্ট কি কম গা ?'

সৌরালোকে যে অখিল জগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে ? তেমনি আমাকেই বা কার সন্দেহ ? আমিই সেই নিত্যস্ফূর্তিময় নির্মল সদাকাশ। মহামোহান্ধকার থেকে আমিই একমাত্র বিনির্গত। আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমাকেই বা কার সন্দেহ ? আমিই অখণ্ড বোধস্বরূপ আনন্দ, আমিই পরাৎপর ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে স্পর্শ করে না তেমনি সাধ্য কি সংসার-দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে ?

একটা বেরাল তার বাচ্চা নিয়ে কাশীপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই নিয়ে ঠাকুরের মহাভাবনা। একদিন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী এসেছে, তাকে একটু একান্তে টেনে নিলেন ঠাকুর। কুণ্ঠিত মুখে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ গা, তোমাকে একটা কথা বলব ?'

· বলুন। আপনি বলবেন তাতে আবার কথা কি! নবগোপালের বউ যেন নিজেই সংকুচিত হল।

'দেখ আমার এখানে একটা বেরাল আছে, তার আবার কতগুলি বাচ্ছা—'

মমতাময় কণ্ঠস্বর। তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল নবগোপালের স্ত্রী।

'কিন্তু জানো, এখানে মাছ নেই, দুধ নেই। বড় কষ্ট হচ্ছে তাদের। তোমাকে যদি দিই নিয়ে যাবে ?'

আপনার দান নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। ঘোষপত্নী হাত পাতল।

এততেও হল না। ঠাকুরের মুখে তখনও কুণ্ঠার কুয়াশা লেগে। বললেন, 'নেবে যে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো ?'

না, না, অসুবিধে কি। আমি তো বেরাল ভালোবাসি।

'কিন্তু তোমার বাড়ির কর্তারা যদি অমত করে ? যদি কেউ বিরক্ত হয় ? যদি কেউ মারে বেরাল-ছানাকে ?'

নবগোপালকে ডাকানো হল। সেও যখন সায় দিলে তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত, তখন তাঁর মুখ ভরে উঠল খুশিতে।

এই নবগোপালেরই শেষকালে নাম হয়েছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'।

ওরে চল্, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে রে, চল বাতাসা নিয়ে আসি।

যেদিন ঠাকুর কল্পতরু হন সেদিন সেখানে নবগোপালও মোতায়েন। রাম দত্ত ছুটে এসে বললে, 'বসে আছেন কি! ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শিগগির যান, যা চাইবার চেয়ে নিন এইবেলা।'

নবগোপাল ছুটল। ঠাকুরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ে বলল, 'আমার কি হবে ?'

'একটু ধ্যান জপ করতে পারবে ?'

বলো পারব, একশোবার পারব, কেন পারব না ? কিন্তু নির্ভয়ে নবগোপাল বললে, 'আমার সময় কোথায় ? ছাপোষা গেরস্থ লোক সংসারের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—'

'ধ্যান না হোক, একটু জপ করতে পারবে না ?'

'তারই বা সময় কই ?'

যখন কাছে এসে পড়েছে, কিছু ফল নেবেই সে কুড়িয়ে। তখন ঠাকুর বললেন, 'জপ করতে না পারো, আমার নাম একটু-একটু করতে পারবে ? সময়ে-অসময়ে, যখন খুশি, যখন তোমার মনে পড়বে—কোনো বাঁধাধরা নেই—আইনকানুন নেই—পারবে ?'

'তা পারব।'

'তা হলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে।'

সেই থেকে নবগোপালের মুখে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ'। পাড়ার ছেলেরা তার পিছু নেয় আর হাত-তালি দিয়ে বলে 'জয় রামকৃষ্ণ'। আফিস থেকে যখন ফেরে দরজায় বাতাসার ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চাকর। চল, চল, ঐ 'জয় রামকৃষ্ণ' আসছে, বাতাসা বিলোবে এবার। চল বাতাসা নিয়ে আসি।

ছেলেরা জড়ো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় নবগোপালকে। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে নাচে। মুঠো ভরে বাতাসা নেয়।

কালীঘর থেকে প্রসাদ পেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল গঙ্গাধর। ঠাকুর তার হাতে একটা পানের খিলি দিলেন। বললেন, 'খা, খাবার পর দুটো একটা খেতে হয়—'

কুণ্ঠিত মুণ্টি খুলে দিল গঙ্গাধর। ঠাকুর বললেন, 'নরেন একশোটা পান খায়। যা পায় তাই খায়। এত বড়-বড় চোখ, ভিতর দিকে টান। সব নারায়ণময় দেখে। কলকাতায় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, বাড়ি-ঘর গাড়িঘোড়া সব নারায়ণময়। তুই তার কাছে যাবি, খুব খাবি আর তার সঙ্গ করবি।'

সেই নরেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কাশীপুরের বাড়িতে। ঠাকুরকে সারাক্ষণ দেখবার জন্যে যে বাড়িঘর লেখাপড়া ছেড়ে চলে এসেছে কাশীপুর, সে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কয়ে চলে গেল উধাও হয়ে! একদিন যায় দুদিন যায়, কোনো খোঁজখবর নেই। শুধু একা যায়নি মনে হচ্ছে, তারক আর কালীপ্রসাদও অনুপস্থিত! কোথায় গেল, কোথায় গেল নরেন ?

১৪৩

'নরেন কি নিষ্ঠুর!' আক্ষেপ করছেন ঠাকুর। 'আমার এই অসুখ আর এই সময়ে আমাকে ও ছেড়ে গেল। কানাই ঘোষের ছেলে, যাকে এখানে সে আশ্রয় দিল, সেই তারক ওকে নিয়ে গেল ভুলিয়ে। কালীকেও সঙ্গে নিলে!'

বালককে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমনি করে বললে একজন : 'কোথায় আর যাবে! এই এসে পড়বে একদিন হুট করে।'

'সত্যিই তো যাবে কোথায়!' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হল : 'তার আর আছে

কোন আস্তানা ? ওলতলা বেলতলা, সেই আসতে হবে ফের বুড়ির কাছে। আমার কাজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছে তখন আমার পেছনেই তাকে ঘুরতে হবে। যাবে কোথায় !'

কিন্তু সত্যি কি আর নরেন ফিরবে ? সে চলে এসেছে বুদ্ধগয়া।

নির্বেদ এসেছে নরেনের মনে। সমস্ত মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে নির্বাণনগরীর দিকে। কঠোর তপস্যায় যদি ঈশ্বর দর্শন হল তো হল নইলে আসনে বসেই দেহপাত করে যাব। ঠাকুরের স্নেহ ও বন্ধন, সেই বন্ধনও ছিন্ন করতে হবে।

'হে ভবতৃষ্ণা, বহু জন্ম ধরে আমার এই দেহগৃহে নির্মাণ করে আসছ, এইবার সেই দেহ ভেঙে দিলাম। আর পারবে না বাসা বাঁধতে।' উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব।

নির্বাণ-নগরের দ্বাররোধ করে দাঁড়িয়ে আছে 'তনহা', তৃষ্ণা—তোমার কামনা-বাসনা। তারাই কর্মের সৃষ্টি করছে আর সেই কর্মের সংস্কার সঞ্চিত হয়ে তৈরি করছে মাকড়সার জাল। তারই নাম 'মার'। 'মার'কে পরাভূত করতে হবে, ছিন্ন করতে হবে উর্ণাতন্তু। সেই বাসনার বোঝা ফেলে দিতে পারলেই হালকা হবে তোমার দেহ-নৌকা। তাড়াতাড়ি পেঁছে যাবে সেই নির্বাণ-বন্দরে। ও তো হল নিজের মুক্তির কথা। নিজে সরে পড়া। তা হলে চলবে না, পরের কথাও ভাবতে হবে, অন্যকেও পেঁছে দিতে হবে সেই আনন্দলোকে। প্রেমে ও প্রসাদে করুণায় ও মৈত্রীতে তোমার শূন্যতাকে ভরে তোলো। প্রেমপ্রবাহে প্রসারিত হয়ে পরিপ্লুত করো সবাইকে।

মৈত্রী করুণা মুদিতা আর উপেক্ষা।

'সুখং বসন্তি মিত্রাণি বিবর্ধতু সুখঞ্চ বঃ।' হে মিত্রগণ, তোমরা সুখে থাকো ও তোমাদের সুখ বর্ধিত হোক। এই হচ্ছে মৈত্রী। আর শত্রুর দুঃখে হৃষ্ট না হয়ে বলো, তোমার সর্বদুঃখের বিমোচন হোক। এই হচ্ছে করুণা। আর মুদিতা কি ? আমাদের মতের বা পথের যারা বিরোধী তাদের অভ্যুদয়ে আমাদের আর ক্লেশ নেই, তাদের পুণ্যাংশ চিন্তা করে মনে আনো এবার প্রসন্নতা। আর উপেক্ষা কাকে বলে ? কে পাপকারী ? কার প্রতি তোমার এত অবজ্ঞা, এত ক্রুরতা ? কার তুমি বিচার করবে ? বলো, আমি নিজেই পাপকারী, নিজেই বিচারপ্রার্থী, তোমাকে আর আমি কি বলতে পারি ? এই মনোভাবের নামই উপেক্ষা। এই সব ভাবনা করে চিত্তের শোধন-সাধন করো। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কুশীনারায় দেহ রাখছেন তথাগত, ম্লান মুখে শিষ্যেরা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আনন্দকে ডেকে নিলেন কাছটিতে, বললেন, 'আনন্দ, আত্মদীপ হও। জ্ঞানালোকের জন্যে বাইরে কোথাও অনুসন্ধান কোরো না। তোমরা নিজেরাই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উৎস। একমাত্র প্রদীপ। সত্য যদি কোথাও থাকে তা তোমাদের নিজেদের মধ্যে।'

অহংকে আত্মাতে দান করো। তা হলেই দুঃখের অপসরণ হবে। কার দুঃখ,

কার সুখ ? তোমার নিজের সুখ ঘটিয়েই বা তোমার শান্তি কোথায় ? অন্যের সুখেই যে তোমার সুখের নিশ্চিন্ততা। সুতরাং এক সুখ এক দুঃখ। তোমার আমার সুখ নয়, নয় তোমার আমার দুঃখ। দুঃখ দুঃখ বলেই নিবারণীয়, আমার তোমার বলে নয়। তেমনি সুখ সুখ বলেই প্রাপণীয়, আমার তোমার বলে নয়। এক অখণ্ড দুঃখ, এক অভিন্ন সুখ। নিজ-নিজ খণ্ড-খণ্ড সুখ আহরণ করতে গিয়েই একে অন্যকে দুঃখ দিয়ে নিজ-নিজ দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছি। যেমন এক দেহ তেমনি এক পৃথিবী। অঙ্গের এক অংশের ব্যাধিতে সর্বদেহ নিপীড়িত, তেমনি এক অংশের আরোগ্যে সর্বদেহের নৈরুজ্য নেই। চাই সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য। সর্বাঙ্গের সৌন্দর্য। আমি স্ফীত আর তুমি বিশীর্ণ, তার অর্থ সমস্ত দেহই কদাকার, রোগক্লিষ্ট। কোথাও গণ্ডী নেই, পৃথক সত্তা নেই। তাই সকলের দুঃখমোচন সকলের সুখসাধন চাই। তা কিসে হবে ? তার উপায় কি ? একমাত্র উপায় মৈত্রী। আকাশজোড়া প্রকাণ্ড প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর, ভালোবাসা।

'সুখের আকাঙ্ক্ষা বর্জন না করলে দুঃখ দূর হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সংসারে যারা দুঃখ পায় সুখের ইচ্ছাতেই সে দুঃখ পায়। আর যারা সুখী হয় পরের সুখেচ্ছাতেই সুখী হয়। সুতরাং "আমি"কে দান করো। নিজের আর পরের উভয়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে উৎসর্গ করো "আমি"কে।'

নদীতীর দিয়ে যাচ্ছে আনন্দ, দেখল একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরছে। কলসী কাঁখে নিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি, আনন্দ তার কাছে এসে বললে, 'আমি তৃষ্ণার্ত, আমাকে একটু জল দেবে ?'

মেয়েটি তাকাল চোখ তুলে। আনন্দের অঞ্জলিতে জল ঢেলে দিল। জল খেয়ে চলে যাচ্ছে আনন্দ, মেয়েটি তার পিছু নিল। তোমার তৃষ্ণা দূর করলাম, এবার আমার তৃষ্ণা দূর করো। ঘরে ফিরে এসে ধুলোয় শুয়ে কাঁদতে লাগল মেয়ে। মা মাতঙ্গীকে বললে, 'আমি দেখে এসেছি কোথায় তিনি থাকেন। তাঁর নাম আনন্দ। আমার যদি বিয়ে দিতে চাও তবে তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দাও। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

কে আনন্দ, সন্ধানে বেরুলে মাতঙ্গী। আনন্দ ? তাকে চেনো না ? সে যে শ্রমণ। বুদ্ধ-শিষ্য।

'এ তোর কী অসম্ভব কথা ?' মা ফিরে এসে শাসন করল মেয়েকে। 'সে বুদ্ধের ভক্ত, সে কি করে বিয়ে করবে ?'

'মা তুমি তো মন্ত্রতন্ত্র জানো। এবার সেই শক্তি প্রয়োগ করো।' মেয়ে মায়ের পা চেপে ধরল।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল মেয়ে। মায়ের মন গলল। গৃহে ভিক্ষা নেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করল আনন্দকে।

আসছে ? আসবে বলেছে ? মেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সর্বাঙ্গে।

আনন্দ এসে দাঁড়াল ভিক্ষাপাত্র হাতে। মাতঙ্গী বললে, 'আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো।'

শান্ত স্বরে বললে আনন্দ, আমি শীল গ্রহণ করেছি, স্ত্রী গ্রহণ করতে পারি না।'

'তোমাকে পতিরূপে না পেলে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করবে।'

কোনো অনুনয় কানে তুলল না আনন্দ। ফিরে যাবার জন্যে যাত্রা করল।

'তোমার তন্ত্রমন্ত্র কোথায় গেল?' মায়ের উদ্দেশে গর্জে উঠল মেয়ে। 'কোথায় তোমার ইন্দ্রজাল?'

এমন মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নেই যা বুদ্ধ বা বুদ্ধের শিষ্যদের অভিভূত করতে পারে।' অসহায়ের মত বললে মাতঙ্গী।

'তা হলে দ্বার বন্ধ করে দাও।' আকুলা কন্যা আবার রোদন করে উঠল। 'আমার কাছেই রয়েছে সে ইন্দ্রজাল। রাত্রি সমাগত হলে স্বভাবতই উনি আমার পতি হবেন।'

মাতঙ্গী দ্বার বন্ধ করে দিল। মন্ত্র দিয়ে বন্ধ করলে আনন্দকে। মেয়ের জন্য শয্যারচনা করলে। আনন্দ অক্ষুব্ধ উদাসীন। সর্বজ্বরবিবর্জিত।

মন্ত্রবলে আগুন আকর্ষণ করল মাতঙ্গী। আনন্দকে টানতে-টানতে নিয়ে এল অগ্নিকুণ্ডের কাছে। বললে, 'যদি আমার মেয়েকে এ দণ্ডে বিয়ে না করো তবে তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করব।'

কি আশ্চর্য, মন্ত্রের মায়া কাটাতে পাচ্ছি না এখনো? একমনে বুদ্ধদেবকে ডাকতে লাগল আনন্দ। আগুন নিবে গেল। খুলে গেল রুদ্ধ দ্বার।

গৃহগণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলো আনন্দ।

'মা ও যে চলে যায়!' মেয়ে আবার কেঁদে উঠল অনাথার মত।

মা বললে, 'আমি আগেই বলেছি আমার মন্ত্রের এমন ক্ষমতা নেই বুদ্ধের শিষ্যকে বশীভূত করতে পারে।'

তবু আনন্দচিন্তা ত্যাগ করতে পারল না মেয়ে। পরদিন সকালে উঠে আবার চলল আনন্দের সন্ধানে। আনন্দ ভিক্ষায় বেরিয়েছে, পিছু-পিছু চলল তার ছায়া হয়ে। বিহারে এসে ঢুকল, মেয়ে তবু কাঁদতে লাগল দ্বারের বাইরে।

বুদ্ধদেব তাকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'তুমি কি চাও? কেন আনন্দের পিছু নিয়েছ?'

স্পষ্ট দুঃসাহসে বললে তরুণী: 'আনন্দকে পতিরূপে বরণ করতে চাই।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তাকিয়ে দেখেছ আনন্দের দিকে?'

'দেখেছি।'

'তার মাথায় চুল নেই দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'কিন্তু তোমার মাথা-ভরা চুল। তুমি আনন্দের মত মাথা মুণ্ডন করতে পারবে? নির্মূল করতে পারবে কেশভার? যদি পারো তোমার হাতে দিয়ে দেব আনন্দকে।'

'পারব।'

'তবে যাও, মাথা মুণ্ডন করে এস।'

মেয়ে ফিরে গেল মায়ের কাছে। বললে, 'তোমার মন্ত্রতন্ত্র যা পারেনি তা অনায়াসেই সফল হতে চলেছে। বুদ্ধ বলেছেন ক্ষুর দিয়ে মাথা মুড়িয়ে নিলেই পাব সেই পরমরম্যকে।'

মাতঙ্গী ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'আহা, কি রূপের ছিরি হবে তখন! বলি, দেশে কত ধনী-গুণী লোক আছে, তাদের কাউকে মনোনীত কর। শ্রমণ ছাড়া কি আর মোহনমনোরম নেই?'

'মরি আর বাঁচি, আমি আনন্দের।'

অভিশাপ দিল মাতঙ্গী। তবু মেয়ে নিরস্ত হয় না। তখন কি আর করে, কাঁদতে-কাঁদতে মেয়ের মাথা কামিয়ে দিল ক্ষুর দিয়ে।

মুণ্ডিত মাথায় বুদ্ধ সমীপে দাঁড়াল এসে মেয়ে। বললে, 'আমি এসেছি। এবার দিন আমার আনন্দকে।'

'তুমি আনন্দকে ভালোবাসো?' জিগগেস করলেন বুদ্ধদেব।

'বাসি।'

'দেহের কোন অংশ ভালোবাসো?'

'চোখ কান নাক মুখ, চলন বলন, সমস্ত—'

'চোখে কানে মুখে নাকে দেহের প্রতি অংশেই ঘৃণিত মল। ক্লেদে-কলুষে মানুষের জন্ম, ক্লেদে-কলুষেই মানুষের মৃত্যু। কাকে তুমি ভালোবাসছ? এই নশ্বর দেহকে? যার অস্তিত্বেও দুঃখ অবসানেও দুঃখ? সত্যি যদি আনন্দ চাও, এমন আনন্দের সন্ধান করো যার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই।'

দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কালদর্শন হল তখন সেই তরুণীর। সেই তো সত্যদর্শন। স্বরূপদর্শন। সেই দর্শনে দিব্যজ্ঞান হল। অর্হত্ত্ব লাভ করল।

বুদ্ধদেব বললেন, 'এবার চলে যাও আনন্দের ঘরে।'

শ্রমণা তখন পড়ল প্রভুর পাদমূলে। বললে, 'ভগ্নতরী ফেলে এবার তীরে এসে উঠেছি। অন্ধের যষ্ঠিলাভ হয়েছে আর আমার কোনো বাসনা নেই।' আমি শান্ত হয়েছি, অভাবনামুক্ত হয়েছি, অপ্রমাদচিত্ত হয়েছি। আর আমি কিছু চাই না।'

আমি দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, শয্যাকাঙ্ক্ষীর শয্যা, আরোগ্যাকাঙ্ক্ষীর মহৌষধ। যতক্ষণ না ব্যাধির বিচ্ছেদ হচ্ছে ততক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে চলবে আমার পরিচর্যা। যতদিন আকাশ থাকবে যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন জগতের সর্বদুঃখ অপনয়ন করতে আমিও থাকব।

বৈশালী থেকে রাজগৃহে ফিরছেন বুদ্ধদেব। দেখলেন নগরের উপকণ্ঠে এক ব্রাহ্মণ চাষী তার গৃহে খুব উৎসবে মেতেছে। চলছে নৃত্য, চলছে পান-ভোজন। কি ব্যাপার? নতুন ফসল উঠেছে ঘরে, ভবনাঙ্গন ভর-ভর, তাই এই উৎসব। ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন এসে দুয়ারে। বললেন, 'ভিক্ষা দাও।'

'এখানে কিছু হবে না।' ব্রাহ্মণ, নাম ভরদ্বাজ, তিরস্কার করে উঠল। 'কত

কণ্টে জমি চষে ঠিকমত সময়ে বীজ বুনে দেহপাত পরিশ্রম করে শস্য ফলাই, আর তুমি বিনাশ্রমের ভিখিরি, দিব্যি হাত পেতে আমাদের উপভোগে ভাগ বসাতে চাও। লজ্জা করে না? আমার কথা শোনো। ঘরে ফিরে যাও। চাষ করো জমি। বীজ বোনো। পরিশ্রমের ফসল ফলাও।

বুদ্ধদেব বললেন, 'বন্ধু, আমিও জমি চাষ করি বৈকি। আমিও বীজ বুনি। মানব-জীবনই আমার ভূমি। বীর্য বৃষ, বিনয় হল, প্রজ্ঞা ফাল। সৎকর্মের বৃষ্টিতে ভূমি উর্বর হয়, তারপর সম্যক দৃষ্টির বীজ বুনি। কর্ষণে কর্ষণে যে জঞ্জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার নাম তৃষ্ণা। তারপরে ভূমি ফল দেয়। আর সেই ফলের নাম নির্বাণ।'

'অমন কথা সব ভিক্ষুই বলে থাকে।' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করল ভরদ্বাজ। 'দেখাতে পারো?'

'পারি। এস আমার সঙ্গে।'

নগরের প্রমোদ-উদ্যানে পৌরনাগরদের ভিড় হয়েছে। কি ব্যাপার? নগরের প্রধানা নর্তকী কুবলয় নাচছে রঙ্গমঞ্চে। সেইখানে ভরদ্বাজকে নিয়ে হাজির হলেন বুদ্ধদেব।

স্পর্ধিনী রূপসী নাচছে লাস্যের তরঙ্গ তুলে। কামার্ত চোখে নগরবিলাসীর দল পান করছে রূপসুধা। অনন্ত রূপের আধার প্রভু তথাগত যে পাশে দাঁড়িয়ে সে দিকে কারু চোখ নেই।

নাচতে-নাচতে হঠাৎ জনতাকে লক্ষ্য করে কুবলয় বলে উঠল, 'আমার মত সুন্দরী আর দেখেছ কাউকে সংসারে?'

লালসাবিলোল চোখে হতবাক জনতা নিস্পন্দ হয়ে রইল।

'আমি দেখেছি।' জনতার মধ্য থেকে বলে উঠলেন বুদ্ধদেব। 'আর সে তোমার থেকে শতসহস্রগুণ বেশী সুন্দরী।'

'কোথায়? কোথায়?' মিলিত স্বরে জনতা হুঙ্কার করে উঠল। 'দেখাও সেই সুন্দরীকে।'

'দেখাচ্ছি।'

কোত্থেকে দেখাবে? কুটিলকটাক্ষ হেনে আবার নাচতে লাগল কুবলয়। লাবণ্যের সরোবরে ফুটতে লাগল আবার লাস্যের শতদল। বুদ্ধদেব তার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন। এ কি! এ কি অঘটন!

ক্রমে-ক্রমে মাথার চুলে পাক ধরল নটিনীর। কুন্দদন্ত খসে পড়ল একে-একে। দুই গালে গহবর হয়ে গেল। দুই চোখ প্রবেশ করল কোটরে। ধীরে ধীরে মৃত পত্রের মত খসে পড়ল রূপ-লাবণ্য। বারাঙ্গ কঙ্কালে পরিণত হল। বিবসনা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চে। ভয় পেয়ে কেউ চোখ বুজল, কেউ বা ঘৃণায় পালিয়ে গেল সভা ছেড়ে। প্রভু বললেন, 'কুবলয়, এবার দর্পণে নিজেকে দেখ। দেখ কত সহস্রগুণে সুন্দরী হয়ে উঠেছ। মায়াবসন ছেড়ে ধরেছ এবার তোমার নিত্য সৌন্দর্যের আকৃতি।'

বসন কুড়িয়ে নিয়ে কুবলয় প্রভুর পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'চিনতে পেরেছি তোমাকে। তোমার করুণা অন্তহীন। তুমি নির্বাচিত করেছ আমাকে। তোমার চরণতলে ডেকে নিয়েছ নিজের থেকে। প্রভু, আর আমাকে বিচ্যুত কোরো না।'

'আমিও চিনেছি তোমাকে।' ভরদ্বাজও ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। 'তুমি কোন কৃষির কৃষক? কি তোমার হল-বৃষ? কি তোমার বৃষ্টিধারা? আমাকেও ডেকে নাও তোমার চাষের কাজে। আমাকেও কৃষাণ করো।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র সব খুব বড়-বড় দেখি। সব যেন রাক্ষসীর মত। আগে ভারি ভয় ছিল। কারুকে কাছে আসতে দিতাম না। এখন তবু অনেক করে মনকে বুঝিয়ে মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বলে দেখি।' আবার বলছেন, 'দেখ, ছাদে একবার উঠতে পারলে হয়। ওঠবার পর ছাদে নাচাও যায়। কি বলো, যায় না? কিন্তু সিঁড়িতে নাচো, তোমার সাধ্য কি। সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান। তখন মেয়েমানুষ থেকে অন্তরে থাকো। একবার সিদ্ধ হয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। তখন মেয়েমানুষমাত্রই সাক্ষাৎ ভগবতী।'

বলরাম বোসের বাড়ির একতলায় তখন একটা বালিকা বিদ্যালয় বসে। শৌচান্তে ঠাকুরের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে বাবুরাম, ইস্কুলের একটা মেয়ে আঁচলে-বাঁধা চাবির গুচ্ছ ঘোরাতে-ঘোরাতে চলে গেল সমুখ দিয়ে। বাবুরামকে বললেন ঠাকুর, 'দেখে রাখ। পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন-বন করে ঘোরায় মেয়েরা। তুইও কি ওদের হাতে পড়ে ঐ রকম করে ঘুরতে চাস?'

স্বগতোক্তি করছেন ঠাকুর। 'আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলুম। রামলালের খুড়িকে জিগগেস করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম আমি সংসার করিনি, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ!'

'সেই পাঁড়ে জমাদারে খোট্টা জমাদারকে চেনো? তার চৌদ্দ বছরের বউ! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লোকে দেখে। তাকে আগলাতে-আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায় জমাদারের।

তিন বন্ধু, নরেন কালী আর তারক, গয়ায় নেমে সাত মাইল পথ হেঁটে সোজা চলে এল বোধগয়ায়। এই সেই বোধিদ্রুম, এই সেই শিলাসন। এখানে বসেই জগৎ সংসারের দুঃখ নিবারণের তপস্যা করেছিলেন বুদ্ধদেব। মানুষের মুক্তি কিসে, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। দুঃখ নিবারণের উপায় তৃষ্ণার উন্মূলনে। আর মানুষের উপায় আত্মার উন্মীলনে।

একদিন সন্ধ্যায় নির্জনে সেই শিলাসনে বসে ধ্যানস্থ হল নরেন। কতক্ষণ পর পাশে বসা তারকের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

'সে কি, কাঁদছ কেন?'

'ভাই বুদ্ধদেবকে দেখলাম। সেই করুণাঘন ক্ষমাসুন্দর প্রশান্ত মূর্তি।'

মন্দিরের মোহান্তের আশ্রয়ে তিনদিন ছিল কোনো রকমে। তিনদিনের পরেই পিছটান। আবার ঠাকুরের কথা মনে পড়ল। সেই সরল সুন্দর প্রেমস্থিত স্নিগ্ধ হিরন্ময় পুরুষ। তাঁকে ছাড়া সব যেন নিরুদক মরুভূমি। চল, চল ফিরে চল নিজের ঘরে। কিন্তু বাহির ঘুরে এলেই তো নিজের ঘরের মর্যাদা।

ঠাকুরের সেই কথা। 'কোথায় আর যাবে ? আকাশ একটু দেখুক উড়ে-উড়ে। শেষকালে বসবে ঠিক এই বৃক্ষশাখে তার নিজের জায়গায়।'

নরেন ফিরে এসেছে। ঠাকুর শুনে মহা খুশি। কোথায় আর যাবে! এখানে ও যেমনটি দেখেছে তেমনটি আর দেখবে না কোথাও। এখানে এমন একটা কিছু ওর চোখে পড়েছে যা আর কোথাও স্পষ্ট নয়।

আমার প্রভুর পায়ের তলে কি শুধু মানিক জ্বলতেই দেখেছ ? শত শত মাটির ঢেলাও সেখানে স্থান পেয়ে কাঁদছে লুটিয়ে লুটিয়ে। আমার গুরুর আসনের কাছটিতে যে কটি চেলা জমেছে সবাই কি সুবোধ ? অবোধও কটি আছে আশেপাশে। সেই অবোধজনকেও কোল দিয়েছেন বলেই তো আমি তাঁর চেলা হতে পেরেছি। পতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তার পথ অনেক। সাগরের দিকে সব নদীই যায় কিন্তু সবাই এক পথে এক নদী হয়ে যায় না। ঠাকুর সব পথে গিয়েছেন। যত মত তত পথ।

১৫৪

ঠাকুরের যন্ত্রণার কিছুতে নিবারণ নেই। সেটা ততোধিক যন্ত্রণা নরেনের। ডাক্তার-টাক্তার সব ফেল মেরে গেল! কোনো প্রতিকার নেই, প্রতিষেধ নেই। কি দুঃসহ অবস্থা! অখণ্ড ধরামণ্ডলে এমন কি কেউ নেই যে প্রতিবিধান করতে পারে! নয়কে হয় করতে পারে! সর্বাস্ত্রকুশল সর্বকামসম্পন্ন ধন্বন্তরি কি কেউ নেই ? উন্মত্তবৎ হয়ে উঠল নরেন। মুখে রাম-নাম গর্জন করতে-করতে বাগানের চারদিকে ছুটতে লাগল। সেই সন্ধ্যে থেকে ছুটছে, মধ্যরাত্রি হয়ে এল, তবু বিরাম নেই। মধ্যরাত্রি কি, শেষরাত্রি! তবু কেউ থামাতে পারছে না নরেনকে। তবু সমানে ছুটছে। রাম রাম রাম রাম! হুঙ্কার ক্রমে আর্তনাদের রূপ নিল। রাম রাম রাম রাম! রাত্রির শেষ প্রহরও বুঝি যায়-যায়!

'যা নরেনকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়।' ঠাকুর আদেশ করলেন ভক্তদের।

কিন্তু কোনো কথাই কানে তুলবে না নরেন। নামধ্বনিতে উন্মূল করবে রোগজ্বালা। ঠাকুর যখন আদেশ করেছেন, ভয় কি, জোর করে ধরে নিয়ে চলো। সবাই তখন নরেনকে গায়ের জোরে বাধা দিল। প্রায় ধরে-বেঁধে নিয়ে এল ঠাকুরের কাছে।

'হ্যাঁ রে অমন করছিস কেন ? ওতে কি হবে ?'

নরেন চুপ করে রইল।

ঠাকুর আবার বললেন, 'তুই যেমন করছিস অমনি বারোটা বছর আমার গিয়েছে। দু-এক রাত্তির নয়, অখণ্ড বারোটা বছর গিয়েছে একটানা একটা ঝড়ের মত। এক রাত্তিরে তুই আর কি করবি বাবা ? ছেড়ে দে, ঘরে যা, ঠাণ্ডা হ।'

যেন থাকবেন না এমনিই ইঙ্গিত করছেন। নইলে নামশক্তিকে তো অস্বীকার করতে পারেন না ঠাকুর। কি ছিল কি হয়েছে!

সেই একদিন হাজরার সঙ্গে বসে নরেন শুকনো জ্ঞানবিচার করছিল, ইংরেজিতে বড়-বড় দর্শনের বুলি, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ?' নরেন বললে, 'লম্বা-লম্বা কথা। সে আপনি বুঝবেন না।'

'তবু শুনি না!' ঠাকুর হাসলেন।

'সে ইংরিজি কথা। দার্শনিক হ্যামিলটন কি লিখেছেন তাই।'

'কি লিখেছেন ?' ঠাকুর নাছোড়বান্দা।

ইংরেজি কথাটা আওড়ালো নরেন।

'এর মানে কি গো ? মানে বলে দাও।'

'মানে হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হয়ে গেলে মানুষ তখন বুঝতে পারে সে কিছুই জানে না। তখন সে ধর্ম-ধর্ম করে। যেখানে বিজ্ঞানের শেষ সেখানেই ধর্মের আরম্ভ।'

আনন্দিত হলেন ঠাকুর। মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।' সমস্ত জানার পরেও থেকে যায় অজানা। সমস্ত বিশ্লেষণের পরেও থেকে যায় অনুভূতি। সমস্ত বিশেষণের পরেও থেকে যায় বিশেষ্য। সমস্ত প্রথার পরেও থেকে যায় প্রাণ।

'এরা সব নিত্যসিদ্ধের থাক।' বললেন ঠাকুর, 'নরেন রাখাল বাবুরাম।' বলে সেই হোমাপাখির কথা বললেন।

বেদে আছে সেই হোমাপাখির কথা। সে পাখি আকাশবাসী, কখনো আশ্রয় নেয় না মাটিতে। আকাশেই ওড়ে ঘোরে, আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিমও মাটিতে এসে পড়ে না, মাটিতে পড়বার আগেই ফুটে যায় ডিম। ডিম ফুটতেই বেরিয়ে পড়ে ছানা। ছানার তখন মাটিতে পড়বার কথা। কিন্তু ছানা বেরিয়ে এসেই উড়তে শুরু করে। উড়তে শুরু করে মাটির দিকে নয়, তার মায়ের দিকে। তার এক লক্ষ্য শুধু উপরে ওঠা, তার মায়ের কাছে পৌঁছুনো।

'ও সব ছোকরারাও সেই রকম।' বললেন ঠাকুর, 'কিসে মা'র কাছে যাব।'

আর, মা কে ? ঠাকুর নিজেই তো মা।

কাল কালীপুজো, আগের দিন ভক্তদের হঠাৎ বললেন, 'পুজো হবে, সব উপকরণ ঠিক রাখিস।'

ঘটনাটা শ্যামপুকুরে থাকতে।

পুজো হবে, শুধু এইটুকু নির্দেশ। ভক্তরা ভাবনায় পড়ল। কি উপচার লাগবে, কি দিয়ে বা ভোগ, কিছুই বললেন না ঠাকুর। এখন কি করে কি যোগাড়যন্ত্র করে ভেবে পেল না কেউ। এ বলে এ, ও বলে ও। এ দিকে ঠাকুরের

মুখে আর কথা নেই।

যাক গে, ফুল আর ধূপদীপ হলেই যথেষ্ট। ভোগের জন্যে না হয় কিছু মিষ্টি, নয়তো বা একটু পায়েস। তারপর অতিরিক্ত কিছু ফরমায়েস করেন তখন দেখা যাবে। কিন্তু, কি আশ্চর্য, পরদিন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয় তবু ঠাকুরের কোনো কৌতূহল নেই। পুজোর কথা তুলছেনও না কারু কাছে। ঘড়িতে সাতটা ছেড়ে আটটা বাজল। তবু যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে আছেন শয্যায়। স্থির, স্তব্ধ, উদাসীন। কি আর করা যাবে, ঠাকুরের বিছানার পাশে মেঝের উপর জিনিসগুলো সাজিয়ে দিল ভক্তরা। নিজেরা বসল চারদিকে। দীপ জ্বলল, উঠল ধূপগন্ধ। কে জানত এই কালী, এই কালীপুজো।

'জয় মা!' বিহ্বলকণ্ঠে বলে উঠল গিরিশ ঘোষ। ফুলচন্দন ফেলল ঠাকুরের পাদপদ্মে। ঠাকুর গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন। দুই হাতে ধারণ করলেন বরাভয় মুদ্রা। উদ্ভাসিত হলেন দিব্যজ্যোতিতে। এ স্বপ্ন নয়, ইন্দ্রজাল নয়, মরুনীর নয়, আকাশে গন্ধর্বনগর নয়, সত্যিই মা আছেন বসে। কালী মানেই রামকৃষ্ণ। কালীপুজো মানে রামকৃষ্ণপুজো।

'জয় মা, জয় মা—' সবাই ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগল।

রাখাল দেখল ঠাকুর শুধু তার নিজের মা নন, অখিলজননী। অনেকাকারা সৃষ্টির আদিকর্ত্রী। মহাকালের মনোমোহিনী। জীবজগতের জগদ্ধাত্রী। রাখালও ফুল দিল শ্রীচরণে। মনে হল ঠাকুরের এ অসুখ, এ বুঝি তাঁর নিজের ইচ্ছে। তবে আর কিসের চিন্তা, কিসের চিত্তক্লেশ! তাঁর রোগের চিন্তা না করে এস তাঁর নিজের চিন্তা করি!

ডাক্তার সরকার এসেছে।

'তুমি নাকি বলেছ ইনি পাগল?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'তা ঠিক বলিনি। বলেছি তোমাতে এখনো অহংকার আছে।'

'অহংকার!' মাস্টার চমকে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি! নইলে অন্যকে কেউ পায়ের ধুলো নিতে দেয়?'

'বা, লোকে যে পায়ের ধুলোর জন্যে কাঁদে।' বললে মাস্টার।

'কাঁদলেই হল? কাঁদলেই দিতে হবে? লোকে পাগল বলে আমিও পাগল হব?'

ডাক্তার বললে উত্তেজিত হয়ে: 'সবাইকে বুঝিয়ে বলবে ছাড়ো এই পাগলামি।' 'যদি প্রণাম করতে না দেন তা হলে আবার কেউ অহংকারী বলবে।' আরেকজন কে বললে পাশ থেকে। 'বলবে, দেখলে লোকটার অহংকার। এত লোক একটু পায়ের ধুলোর ভিখিরি, আর, দেখ না কেমন পায়ে কম্বল বেঁধে বসে আছে!'

'তা নয়, বুঝিয়ে বলো।'

'কাকে বোঝাবো? কে বুঝবে? বুঝিয়ে বলতে গেলেই তো বক্তৃতা। আবার সেই অহংকার।' বললে সেই পার্শ্ববর্তী।

মাস্টার আগের কথার জের টানল। বললে, 'কেন দোষ কি প্রণামে? সর্বভূতে কি নারায়ণ নেই?'

'বেশ, তাই যদি হয়, তবে সব্বাইকে করো। বিশেষ একজনকে কেন?'

'সেই বিশেষের মধ্যেই যে বেশি।' মাস্টার এবার অনেকটা বাগে পেয়েছে ডাক্তারকে। 'জল কোথাও ডোবায় প্রকাশ, কোথাও সাগরে। কোথায় এসে বিহ্বল হন, ডোবায় না সমুদ্রে? আপনি কাকে বেশি মানবেন, ফ্যারাডেকে, না, নতুন বি-এস-সি পাশ কলেজী-ছোকরাকে?'

ঠাকুর মুখ খুললেন। সূর্যকিরণ মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে আরেক রকম। আবার যখন আরশিতে পড়ে তখন একেবারে আলাদা। সেই একই কিরণের বিভিন্ন প্রকাশ। কিছু বেশি প্রকাশ আরশিতে। তাই নয়? তেমনি এমন মানুষও আছে, যেখানে ঈশ্বরবিভূতির বেশি প্রকাশ! যেমন ধরো প্রহ্লাদ। কাকে বেশি মানবে? প্রহ্লাদকে? না, এই যারা ভক্তবৃন্দ সমবেত হয়েছে এদেরকে?

'সব বুঝলাম।' বললে ডাক্তার। 'কিন্তু লোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে এ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভয় হয় এমন একটা ভালো লোককে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকেও তার চেলারা অমনি করেছিল। তোমায় বলি শোনো—'

'তোমার কথা কি শুনব।' ঠাকুর কি বিরক্ত হলেন? বললেন, 'তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।'

'তা হলে বেশ, উঠলাম।' ডাক্তারের গলার স্বরে কি অভিমান বেজে উঠল? বললে, 'তবে এখন থেকে তোমার কেবল গলার অসুখটি দেখে যাব। অন্য কথায় কাজ নেই। তবে যদি অন্য কথা উঠে পড়ে, আমি ছাড়ব না। ছাড়ব না যুক্তির পথ। তর্ক করতে হলে বলব ঠিক ঠিক।'

করো না তর্ক। কটা সিঁড়ি শুধু তো ভাঙবে ধাপের পর ধাপ—তারপর? কটা সিঁড়িই বা প্যারো তৈরি করতে? রাবণের সিঁড়িও ভেঙে পড়েছিল, স্বর্গকে ছুঁতে পারেনি। সিঁড়ির শেষ আছে, কিন্তু যাতে সে স্পর্ধা করে উঠতে চেয়েছে সেই আকাশের শেষ কই, অবধি-পরিধি কই? সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে উঠবে না হয় উচ্চচূড়ে, তুঙ্গচূড়ে, প্রাসাদ-শিখরে। তারপর? আর কোথায় তর্ক, কোথায় বাক্যজাল? অবলম্বনের সূক্ষ্ম সূত্রটিও আর নেই। তখন অবতরণ। তখন শরণাগতি। তাকেই বলি তত্ত্বজ্ঞান।

তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাজরা বললে, 'তত্ত্বজ্ঞান মানে চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞান—'

'চব্বিশ তত্ত্ব কি-কি?' কে একজন জিগগেস করল।

'পঞ্চভূত ছয় রিপু'—হাজরা ফিরিস্তি দিতে বসল।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'ঐ বুঝি তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ? তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান।'

সবাই চমকে উঠল কথা শুনে। তাকাল ঠাকুরের মুখের দিকে।

'তৎ মানে পরমাত্মা আর ত্বং মানে জীবাত্মা।' ঠাকুর বললেন, 'পরমাত্মা আর জীবাত্মা এক, এই জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। আর তাঁকে জানা যা নিজেকে জানাও তা। তাই তত্ত্বজ্ঞানই আত্মজ্ঞান

কিন্তু তর্কে-তত্ত্বে কি দরকার? সোজা পথ ভক্তির পথ। ভক্তিতেই মুক্তি।

তাতেও টিপ্পনি কাটলে হাজরা। বললে, 'যাই বলো ব্রাহ্মণশরীর না হলে মুক্তি হবে না।'

'সে কি?' ঠাকুর ঝলসে উঠলেন: 'শবরী ব্যাধের মেয়ে, শূদ্র। তার ভক্তিতেই মুক্তি হয়েছিল। কি, হয়নি?'

শবরী বনের মেয়ে। ফুল তোলে, পাখির গান শোনে, বুনো ফল খায়, তৃণগন্ধের ঘ্রাণ নেয়। গিরিনদীতে স্নান করে, তরুছায়ায় আলুল চুলে বসে থাকে। কখনো বা শুয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা সূর্যের উদয়-বিলয় দেখে। রাতে চাঁদ উঠলে আর ঘরে ফেরে না। দণ্ডকারণ্যে তার অনেক সঙ্গিনী। তাদেরকে জিগগেস করে, তোরা বলতে পারিস এ সূর্য-চন্দ্র কে করেছে? নীলাম্বর ভরে কে এত ঢেলে দিয়েছে জ্যোৎস্না? পাখিদের কণ্ঠে কে দিয়েছে এত অমিয়? মৃগশাবকের চোখে কে দিয়েছে এত বিস্ময়সারল্য? তোরা বলতে পারিস কে সে?

সঙ্গিনীরা কি বলবে! যা জানি না তা জানি না। খোঁজাখুঁজিতে কাজ কি! কি দিয়েছে তাই দেখ, কে দিয়েছে তা নিয়ে তোর কি দরকার!

আমার প্রশ্ন 'কি' নয়, আমার প্রশ্ন 'কে'?

বাপ শবরীর জন্যে পাত্র ঠিক করেছে। শুধু পাত্র নয়, দিনও স্থির। নিমন্ত্রিতদের জন্যে এক পাল গরু-মোষও কেনা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে ভূরিভোজের।

অন্তরের গভীরে শিউরে উঠল শবরী। তার জন্যে নিরীহ পশুহনন হবে? রক্তনদীর পারে বসে প্রিয়মিলন! তার প্রিয় কে? গিরিধর গোপাল বিনা কে আর আমার প্রিয়তম!

বিয়ের রাত্রে শবরী গৃহ ছাড়ল। বন হতে বনান্তর ঘুরে পৌঁছুল পম্পা সরোবরের পারে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে। পিছনে চর ছুটেছে শবরীকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। এবার মতঙ্গের আশ্রমে এসে শবরী নির্বিঘ্ন হল। কারু সাধ্য নেই মুনির আশ্রয় থেকে তাকে বিচ্যুত করে।

ছোট একটি পর্ণকুটির তৈরী করল শবরী। খষিসেবায় মন দিলে। ভূমিতলে শোয়, গাছের বাকল পরে, ফলমূলের অতিরিক্ত কোনো ভোজন নেই। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঘুম থেকে উঠে শৌচ-পূজা সেরে পথে এসে বসে। যে পথ দিয়ে ঋষিরা স্নানে যাবেন সেই পথে। সেই পথের কণ্টক-কঙ্কর তুলে দেয়, বালি কুড়িয়ে এনে পুরু করে ঢেলে দেয় পাথরের উপর। যাতে ঋষিদের পায়ে এতটুকু কাঁটাখোঁচা না লাগে। ঋষিরা স্নানে গেলে কুশসমিধ আহরণ করতে বেরোয়। তার এই অলক্ষিত সেবা মতঙ্গ মুনি টের পেলেন। দিলেন তাকে যোগদীক্ষা। নাম রাখলেন শ্রমণী। বললেন, নিজ কুটিরে অপেক্ষা করো, তোমার প্রাণনাথ

দেখা দেবেন তোমাকে। অপেক্ষা করবার অধিকার পেয়েছি আর আমার কি চাই! আমার অপেক্ষাই টেনে আনবে অপরূপকে।

রাজা দশরথের বড় ছেলে রাম চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাস করছে, এ খবর বনচরদের মুখে-মুখে। আর বনবাসী ঋষিদের জানতে বাকি নেই রামই বিষ্ণুর অবতার। সেই কমলায়তাক্ষ নবদূর্বাদলশ্যাম রামই আমার প্রিয়তম। সন্দেহ কি, তিনি আসবেন আমার কুটিরে।

গুরুবাক্য মিথ্যে হবার নয়। আমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আমার প্রতীক্ষায়। এমন যেন না হয় তিনি এসেছেন অথচ আমি প্রস্তুত নই।

মতঙ্গ মুনি মারা গেলেন। একে-একে আর-আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। আশ্রম জনমানবহীন হয়ে গেল। বনচরেরা এ আরণ্যপ্রান্ত পরিত্যাগ করলে। শবরী একাকিনী বসে আছে তার কুঁড়ে ঘরে। বিরহোৎকণ্ঠা বিহ্বলা শবরী। প্রভাততপস্যায় তমস্বিনী শর্বরীর মত। এই বুঝি এলেন, পাতার মর্মরে বাতাসের নিশ্বাসে এই বুঝি তাঁর পদশব্দ!

দণ্ডে শতবার বাইরে বেরিয়ে আসে। এগিয়ে গিয়ে দেখে কোথায় তিনি? কোথায় তিনি? আবার ফিরে এসে স্থির হয়ে বসে ঘরের শূন্যতায়। কোথায় তুমি? কবে আসবেন ঠিক নেই, তাই নিত্য প্রত্যূষে স্নান করে গন্ধপুষ্পক চয়ন করে শবরী। শুধু ফুল নয় রসাল ফলমূল। পর্ণপুট ভরে শীতল জল ধরে রাখে। অজিন আসনটি পেতে রাখে মেঝের উপর। আর পথের দিকে সতৃষ্ণ বিমর্ষ চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। দু-এক বছর নয়, দীর্ঘ বারো বছর। ঘরে দরজা নেই শবরীর, চোখে নেই স্বপ্নহরণ নিদ্রা। তবু কোথায়, কোথায় আমার হৃদয়রঞ্জন, আমার লোচনাভিরাম!

সীতাহরণের পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে-বনে ঘুরছেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে পথিমধ্যে মৃতকল্প জটায়ুর সঙ্গে দেখা। জটায়ু বললে, পম্পা সরোবরের পূর্বে ঋষ্যমূক পর্বত। সেখানে গেলেই সন্ধান পাবে জানকীর।

পম্পার দিকে যাত্রা করল রাম-লক্ষ্মণ। ঋষ্যমূকে পরে যাব, দেখে আসি ঐ পর্ণকুটীর, কে রয়েছে একাকিনী। অন্ত্যজার ঘরে দাঁড়ালেন এসে ভগবান।

১৪৫

ঠাকুরের ঘরের রেকাবি হারিয়েছে। বৃন্দে ঝি আর রামলাল কথা-কাটাকাটি করছে। তারপর দুজনে মোকাবিলা হল ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বললেন, 'কই এখন আর দেখতে পাই না। আগে ছিল বটে দেখেছিলাম।'

'আমার সব আছে। স্ত্রী আছে। ঘরে-ঘরে ঘটিবাটিও আছে। বললেন ঠাকুর 'হরে প্যালাদেরও খাওয়াই, হাবির মা এলেও ভাবি।'

মধ্যবিত্ত সংসারীর কথা। কিন্তু মন রয়েছে ঈশ্বরের পাদপদ্মে।

বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌরনিতাই তাই পাঁতি দিলেন : মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল। লোকে ভাবলে খাসা ব্যবস্থা। এস না যদি প্রথম দুটি বস্তু পাওয়া যায়, করি না একটু হরিনাম। মাগুর মাছের ঝোল আর কিছুই নয়, প্রেমের অশ্রুনির্ঝর। যুবতী মেয়ে আর কিছুই নয়, পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল মানে হরিপ্রেমে ধুলোয় গড়াগড়ি। একবার জিভে একটু নাও না হরিনামামৃতচ্ছটা, দেখ না চোখে জল আসে কিনা, ইচ্ছে করে কিনা ধুলোয় বিলুণ্ঠিত হই।

কাঁটালের মাছি কি গোলাপের গন্ধে আকৃষ্ট হবে? হবে না। সুতরাং গোলাপের নির্যাস আগে একটা শিশির মধ্যে বন্ধ করো। শক্ত করে ছিপি আঁটো। তারপর শিশির গায়ে ঘন করে কাঁটালের রস মাখাও। সেই রসের গন্ধে ছুটে আসবে কাঁটালে মাছি। মাছি এসে জড়ো হলেই খুলে দাও ছিপি, ঢেলে দাও গোলাপের নির্যাস। তখন কাঁটালের মাছি বসে খাবে ডুবে যাবে, আর উড়ে পালাবে না। ঘটিবাটি আছে বটে কিন্তু ছুঁতে পারেন না ঠাকুর। গাড়ু পর্যন্ত না। ধাতুদ্রব্য ছুঁলেই হাত বেঁকে যায়, ঝনঝন কনকন করে। কলাপাতায় ভাত খান। জল খান ভাঁড়ে করে। তামাক খান ঠাকুর।

আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ দেখতে এসেছে ঠাকুরকে। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁগা, তামাক খেলে কি হয়?

কবিরাজ বললে, 'বায়ু কম হয়। তবে আপনি যখন খাবেন, ছিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরি দিয়ে খাবেন। তাতে উপকার হবে।'

তথাস্তু। ওরে রামলাল, ধনের চাল মৌরি যোগাড় কর।

সঙ্গে একটি বটুয়া রাখেন। বটুয়ার মধ্যে মশলা। মশলা খান মাঝে-মাঝে। বটুয়াটি রঙিন। সেইবার একটা লেমনেড খেয়েছিলেন অশ্বিনী দত্তের হাতে। ঈশানের বাড়িতে সেবার জল খেতে চেয়েছিলেন। কে একজন এক গ্লাস জল ঠাকুরের সামনে এনে রাখল। কিন্তু সেই জল স্পর্শ করলেন না ঠাকুর। কেন কি হল? যে জল রেখে গেছে সে লোকটা উচ্ছৃংখল। জলের মধ্যে দেখতে পেলেন তার স্বভাবের আবিলতা।

মশারি গুঁজে নিতে পারেন না। না বা জামার বোতাম লাগাতে। শুতে যাবেন দরজায় খিল লাগাবেন না।

কে একজন হঠাৎ তাঁর সামনে নতুন কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন এ যেন তাঁকে লেগেছে।

গরমের দিনে মছলন্দের মাদুর পেতে বসেন বারান্দায়। কখনো বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। মাস্টারকে বললেন, 'পা-টা একটু কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো গা।'

মাস্টারকে বললেন মার্কিনের জামা দিতে। সেদিন বললেন, 'একটা শাদা পাথরের বাটি এনো। এক পো আন্দাজ দুধ যাতে ধরে।' হাতের ইশারায় বাটির গড়ন বুঝিয়ে দিলেন, 'আর সব বাটিতে আঁষটে লাগে।'

খবরের কাগজ দেখতে পারেন না। গিরিশের বাড়িতে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখলেন একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। ইশারায় বললেন সেটাকে সরিয়ে নিতে। না সরানো পর্যন্ত বসলেন না।

কালো বার্নিশকরা চটি পরেন। ধুতির পাড় লাল। এমনিতে গায়ে একটা পিরান, আস্তিনটা কনুই ও কবজির মাঝামাঝি। শীতের দিনে ফুলকাটা মোজা, বনাতের জামা, কান-ঢাকা টুপি।

গেরো বাঁধতে পারেন না। গেরো বাঁধলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।

শম্ভু মল্লিকের ওষুধখানা থেকে একটু আফিং নিয়ে বেঁধেছিলেন কাপড়ের খুঁটে, ব্যস, পথ ভুল হয়ে গেল। শ্রীমা'র হাত থেকে পাওয়া একটু মশলা একদিন গুঁজেছিলেন ট্যাঁকে, ব্যস, গঙ্গায় গিয়ে ডুবলেন। 'দেশেও অমনি একদিন হয়েছিল। আম পেড়ে নিয়ে আসছি, পথে আর পা ফেলতে পারি না। দাঁড়িয়ে পড়লাম কাঠ হয়ে। তখন কি করি, আমগুলো ফেলে দিলুম ডোবার মধ্যে। তখন পায়ে চলার শক্তি এল।'

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেমন এলোমেলো হয়ে বসে তেমনি বসেন চাপাটি খেয়ে। কোঁচা নেই, কাপড়টা লম্বা চাদরের মত করে বাঁ কাঁধে ফেলা। যখন কীর্তনে যোগ দেন কোঁচার কাপড়টা কোমরে ফেট্টি করে বাঁধেন। যখন বালক সাজেন তখন আবার অন্যরকম করে পরেন।

সেদিন বালক সেজে বালিশ কোলে নিয়ে বসেছেন। বালিশকে ছেলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন আর হাসছেন বালকের মত।

সমাধি অবস্থাতেও মুখে হাসি।

হিসেব করতে পারেন না। মাইনে নিয়ে একবার কি গোল বাধল। শ্রীমা বললেন, খাজাঞ্চিকে একবার বলা যাক। ঠাকুর ছি ছি করে উঠলেন: 'হিসেব করব?' সেবার মণি মল্লিক তীর্থ করে ফিরেছে। ঠাকুরকে এসে বললে, 'অনেক সব সাধু দেখে এলাম।'

'কেমন দেখলে সব?'

'দেখলুম, তবে কিনা—'

'তবে কিনা কি?'

'তবে কিনা সব্বাই পয়সা চায়।'

মণি মল্লিক ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় সেই সব অর্থী সাধুদের উপর বিমুখ হয়ে উঠবেন। কিন্তু ঠাকুরের সায় ঐ সব সাধুদের দিকে। বললেন, 'ক'টা বা আর চায় শুনি? হয়তো একটু তামাক বা গাঁজা খাবে তার জন্যে। তোমাদের দুধের বাটি ঘিয়ের বাটি চাই, ওদের একটু তামাক-গাঁজাও খেতে দেবে না? সব ভোগই তোমরা করবে?'

সহজ সদানন্দ পুরুষ, সকলের জন্যে দরদ। সর্বভূতে ক্ষান্তি। গগনাঙ্গনে সর্বকালিকী জ্যোৎস্না। কারু প্রতি কার্পণ্য নেই, কুণ্ঠালেশ নেই। ভূতানুকম্পী জনই আসল সাধু। ঠাকুর হচ্ছেন ভূতানুকম্পী।

নারকেলের নাড়ু ভালোবাসেন। জিলিপিকে বলেন লাটসাহেবের গাড়ির চাকা। আর কিছু না, দাও একটু ভাতের মন্ড, একটু সুজির পায়েস। অল্প নিয়েই আমার তুষ্টি। উপকরণ সামান্য উপভোগ অন্তহীন।

যার যা পেটে সয়। যার যেমন ধাত।

একবার যোগীন ঠাকুরের কোথায় নিন্দা শুনল। নিন্দা করছে তো করুক, ঠাকুরকে তা স্পর্শও করতে পারবে না। ধোঁয়া কি ম্লান করতে পারে আকাশকে? চুপ করে রইল যোগীন। ফিরে এসে ঠাকুরকে বললে।

ঠাকুর রাগ করে উঠলেন। বললেন, 'আমার নিন্দা করল আর চুপটি করে তাই তুই শুনে এলি? প্রতিকার দূরের কথা, প্রতিবাদও করলিনে একটা? তুই কি মানুষ?'

মাথা হেঁট করে রইল যোগীন।

এর কিছুদিন পরে নিরঞ্জন নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর আসছে। সে নৌকোয় আরো অনেক যাত্রী। কথায়-কথায় ঠাকুরের প্রসঙ্গ উঠেছে। কতগুলি যাত্রী ঠাকুরের নিন্দা শুরু করল। যত কলুষকটূক্তি। আর যায় কোথা! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিরঞ্জন। নৌকোর দু'দিকে পা রেখে দোলাতে লাগল নৌকো। বললে, ডুবিয়ে মারব তোদের। ঠাকুরের নিন্দে সইব না প্রাণ থাকতে। সকলে তো ভয়ে থরহরি। নৌকো প্রায় ডুবু-ডুবু। সবাই তখন নিরঞ্জনের হাতে-পায়ে ধরল। অনেক কাকুতিমিনতি করতে লাগল। নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করলে আর নিন্দা করবে না ঠাকুরের। তখন নিবৃত্ত হল নিরঞ্জন।

সেই কথাই সেদিন বলছিল দক্ষিণেশ্বরে। শুনে ঠাকুর তো জ্বলে উঠলেন। 'শালা, তোর কি! আমার নিন্দে করছিল তো বেশ করছিল! তাতে তোর কি মাথাব্যথা?' যার যেমন ধাত। যার যা পেটে সয়। যার যেটি সহজ হয়ে আছে।

আবার আরেকদিন।

কালীমন্দিরের ঘাটে স্নান করতে আসে এক পতিতা। স্নান সেরে ফিরে যাবার পথে ঠাকুরকে প্রণাম করে দূরে থেকে। দু-একটি কথাও বা কয় মাঝে-মাঝে। এই নিয়ে আবার পাড়ায়-বেপাড়ায় ফিসফিস।

কথাটা কানে এল যোগেনের। সে এবার তেরিয়া হয়ে উঠল। এবার আর সে ছেড়ে দেবে না। প্রমাণ যদি দিতে না পারো তবে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। তখন নিন্দুকের দল মেয়েটাকে ধরল।

ছি ছি ছি, পাপপ্রশমন মধুসূদন, আর বাড়িও না পাপের বোঝা। লজ্জানিবারণ, লজ্জা কেড়ে নিও না। নিজের দেহ বিকিয়েছি বলে দেবচরিত্রে কালি দেবো! আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কলুষিত, তবু দেখেছি সেই সরসিজাসন নারায়ণকে।

নিন্দুকের দল লেজ গুটোল। উদ্যতমুষ্টি যোগেন বুঝি পিছু নিয়েছে।

ঠাকুর যোগেনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না বলে! তার জন্যে তোর কেন আস্ফালন? ওসব কথায় তোর কান দেবার কি হয়েছে?

যখন যেমন তখন তেমন। যার বেলায় যা তার বেলায় তা।

কাপড়চোপড় রাখবার জন্যে ঠাকুরের একটা বাক্স ছিল। সেই বাক্সে আরশুলো বাসা বেঁধেছে। বাক্সে একদিন নাড়াচাড়া পড়তেই বেরিয়ে পড়ল আরশুলোর দল।

'ধর্, ধর্—' ঠাকুর তেড়ে গেলেন।

একটাকে মুঠোয় চেপে ধরেছে যোগেন। ঠাকুর বললেন, 'ওটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফ্যাল।'

বাইরে নিয়ে গেল বটে কিন্তু মারল না। ছেড়ে দিল।

এ নিয়ে আবার ঠাকুর মাথা ঘামাবেন ভাবতে পারেনি যোগেন। ঘরে ফের ফিরে আসতেই জিগগেস করলেন, 'কি রে আরশুলাটা মেরে ফেলেছিস তো?'

যোগেন ভ্যাবাচাকা খেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি তোকে কি বলেছিলাম?'

'মেরে ফেলতে বলেছিলেন।'

'তবে ছেড়ে দিলি কেন?'

যোগেনের মুখে কথা নেই।

ঠাকুর বললেন, 'শোন যেমনটি করতে বলব তেমনটি করবি। নিজের মতে চলবিনে।'

গুরুবাক্যই বেদবাক্য, ব্রহ্মবাক্য। পিতা আর গুরু সমান। পুত্র আর শিষ্যও তেমনি। গুরুকে মানলেই গুরু তোকে টানবেন, ঢাকবেন, রাখবেন।

শিব-দুর্গা ঘুমুচ্ছেন দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে গণেশ। হঠাৎ পরশুরাম এসে তার গুরু শিবের দর্শন চাইল। গণেশ বললে, হবে না, আরেক সময় এস। আমার এখুনি দর্শন চাই। পরশুরাম জোর দিয়ে বললে। তাঁরা এখন ঘুমুচ্ছেন, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে দেব না। গণেশ রুখে দাঁড়াল। ও সব কথা শুনছি না, দ্বার ছাড়ো। পরশুরাম নাছোড়বান্দা। দর্শন করতে যখন মন হয়েছে কেউ পারবে না ঠেকাতে। লেগে গেল মারামারি। গণেশ পরশুরামকে ধরে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারল মাটিতে। তখন পরশুরাম কি করে, শিবের থেকে পাওয়া পরশু ছুঁড়ে মারল গণেশের উপর। গণেশের একটা দাঁত ভেঙে পড়ল। রক্তারক্তি কাণ্ড! গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙে গেল শিব-দুর্গার। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন গণেশের এই অবস্থা। তখন ভগবতী শূল তুললেন। তেড়ে মারতে গেলেন পরশুরামকে। মহাদেব নিরস্ত করলেন ভগবতীকে। বললেন, আত্মজ যেমন পুত্র শিষ্যও তেমনি পুত্র। তাই গণেশ আর পরশুরাম সমান। সুতরাং পুত্রবুদ্ধিতে পরশুরামকে ক্ষমা করো। ভগবতীর ক্রোধ শান্ত হল। পরশুরামকে ক্ষমা করলেন, রক্ষা করলেন। গণেশও হতাশ হবার ছেলে নয়। ভগ্ন দন্ত তুলে নিলে মাটি থেকে। সেটিকে নিজের যোগদণ্ড করলে। সেই থেকে তার নামও হয়ে গেল একদন্ত।

হাজরার বেলায় 'পাটোয়ারী বুদ্ধি', অথচ যোগেনের বেলায়, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?

একটা কড়া কিনতে বাজারে পাঠিয়েছেন যোগেনকে। অত শত কে দেখে, দোকানীকে শুধিয়েছে, ভালো জিনিস তো, দোকানী বলেছে, ভালো। সরল বিশ্বাসে তা-ই নিয়ে এসেছে বাড়ি। দেখি কেমন কড়া আনলি? কড়াটা হাতে নিতেই ঠাকুর দেখতে পেলেন কড়াটা ফাটা। জল দিতেই দেখা গেল জল পড়ছে। তখন খুব চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'ভক্ত বলে তুই বোকা হবি? দোকানীর কথায় বিশ্বাস করে একটিবার না দেখেই তুই নিয়ে এলি? দোকানী কি দোকান ফেঁদেছে ধর্ম করতে?'

লজ্জা ম্লান হয়ে গেল যোগেন।

ভবের হাটে সুখ কিনতে বেরিয়েছিস। যাচাই-বাছাই করে দ্যাখ কোন সুখটা টেঁকসই অথচ সুলভ। বাজার করতে এসে আমি ঠকে যাব কেন? আমি ঠকতে তো আসিনি? চোখ কান খোলা রেখে সওদা করে যাব। সুখের বস্তুটাকে দেখব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। টুটা-ফুটো দেখলে কিছুতেই কিনব না। কিছুতেই না।

প্রভু বললেন, 'সহজ না হলে সহজকে চেনা যায় না।'

আর কিছু না পারো সহজ হয়ে যাও। তাকেই বলে সহজানন্দ হওয়া। চলতে চলতে যা কিছু পথ এসে পড়ে তাতেই আনন্দ। তাতেই পরমপূর্ণতা।

তোমার মুখখানি দেখব বলে কত সন্ধান করেছি দিকে-দিকে। গিয়েছি পর্বতে অরণ্যে সজনে বিজনে, হয়েছি একান্তচারী, কখনো বা ঐহিকদর্শী। পরিক্রমা করেছি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। কোথায় তোমার মুখ? সব সময়ে মনে হয়েছে অস্পষ্ট, নীরব, অবগুণ্ঠিত। কোথায় কোন স্বর্গার্গল উদ্ঘাটন করলে দেখব সেই মনোনয়ননন্দন মনোহর মুখখানি?

সর্বতীর্থে স্নান করে এলাম, দীক্ষা নিয়ে এলাম সর্বমন্ত্রে, তবু তোমার সেই উন্মুদ্র কমলকোষ কোমল মুখখানি চোখে পড়ল না।

তারপর শরণ নিলাম মানসনিলয়ে। আশ্চর্য, সেইখানেই তোমার সুচির-রুচির মুখখানি ফুটে আছে। বুঝেছি চিত্তের সহজ সুখই তোমার মুখ।

১৪৬

কায় বাক্য মন এই তিন নিয়ে ধন।

কায়মনোবাক্যে সেবা করছেন শ্রীমা। সেবার, কতদিন আগের কথা, ঠাকুরের যখন আমাশা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, সেবার ভার ছিল হৃদয়রামের হাতে। শ্রীমাকে ঘেঁষতে দেয়নি কাছে। কাশী থেকে না কোত্থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির, অবাক্যব্যয়ে লেগে গেল ঠাকুরের পরিচর্যায়। মাকে ধরে নিয়ে এল তাঁর চালাঘর থেকে। বললে, 'তাঁর এমন অসুখ আর তুমি এমনি দূরে পড়ে থাকবে?'

'কি করি, ভাগ্নের বউ রয়েছে যে ঐ চালাঘরে। আমি নইলে ওকে আগলাবে কে?'

সে ওরা লোকটোক রেখে দেবে'খন।' বললে সেই অপরিচিতা। 'তাই বলে তুমি তোমার স্বামীসেবায় হাত লাগাবে না ?'

আরোগ্যের দেশে ঠাকুরকে নিয়ে আসবার জন্যে আরামের দেশে চলে এলেন শ্রীমা। কিন্তু কাশীর মেয়েটি গেল কোথায় ? যেন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। ঠাকুরের প্রয়োজনে এসেছিল, প্রয়োজন সাধন করে ছুটি নিলে।

এবারের সেবায় প্রথম শ্যামপুকুরে, শেষে কাশীপুরে।

শুধু ওষুধটি হলেই তো চলে না, পথ্যটিও দরকার। পথ্য কে রান্না করে ? শুধু রান্না করলেই তো চলে না, খাওয়ায় কে ? পথ্যের সঙ্গে কে মেশায় প্রচ্ছন্ন-পবিত্র প্রেম ? অন্তর-সুষমার শুশ্রূষা ?

লজ্জাপটাবৃতা হয়ে বাস করছেন শ্রীমা। চারদিকে ভক্ত ছেলেদের ভিড়, তারই মধ্যে সবাইকার মা রয়েছেন অন্তরালবর্তিনী হয়ে। মহাবলসম্পন্না কল্যাণেচ্ছার মত। ভাতের মণ্ড তৈরি করছেন। কখনো বা মাংসের সুরুয়া। দুপুর বেলা পথ্য তৈরি হলে, বুড়ো গোপাল বা লাটুকে দিয়ে খবর পাঠান। এবার তবে লোক সরিয়ে দাও। মা নিজে এসে খাওয়াবেন ঠাকুরকে।

'সেবা বস্তুতে নয়, সেবা অন্তরের ইচ্ছাটিতে।' একদিন লাটুকে বললেন ঠাকুর, 'ভিক্ষে করে এনেও যদি প্রিয় জিনিস কেউ ভগবানকে উপহার দেয়, সে সেবাও উত্তম জানবি।'

কি দিল সেটি বিচার্য নয়, কেমন করে দিল, কোন ভাবের থেকে দিল সেইটিই জিজ্ঞাসা। কে এক বড়লোক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে একখানি ছোট সিংহাসন উপহার দিয়ে গেছে। সেখানে ঠাকুরকে বসিয়ে পুজো করবেন বলে।

তুই এত বড় একটি ডাকসাইটে বড়লোক অন্তত একটা রুপোর সিংহাসন দে। কি একটা জার্মান সিলভারের সিংহাসন দিয়ে এসেছিস। ভক্ত-মেয়েরা লোকটাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। কী হাড়কৃপণ, পয়সা তো নয় যেন বুকের পাঁজর। 'তুমি এ সিংহাসন ফেরত দাও মা।' কেউ-কেউ বললে। 'ও সব জাঁকের বড়লোকের চাইতে গরিবের ভক্তি অনেক বেশি।'

'এ সব কথা বোলো না।' মা বললেন সুধাসিঞ্চিত কণ্ঠে : 'মানুষের প্রাণে যাতে ব্যথা লাগে, এমন কথা বলতে নেই। ভক্ত যদি বাঁশের তৈরি সিংহাসনও আমায় দেয়, আমি তাও খুশি মনে তুলে নেব। জিনিসের বিচার হবে কি জিনিসের দাম দিয়ে ? কখনো না। তার দাম হবে যে দিচ্ছে তার আন্তরিকতা দিয়ে।'

ঈশ্বরকে কি দিচ্ছ ? হয় পাতা নয় ফুল নয় একটুখানি জল। দেওয়ার মধ্যে আন্তরিকতার এক ছিটে রস ঢালো, ঈশ্বর হাত বাড়িয়ে লুফে নেবেন। সমস্ত উৎসর্গ স্বর্গসুধান্বিত হয়ে উঠবে।

কি এক কাজে লাটুকে ঠাকুর পাঠিয়েছেন কলকাতায়। ফিরতে-ফিরতে প্রায় বিকেল। ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কিরে খাওয়া জুটেছে তো কোথাও ? না কি উপোস ?'

'আপনার কাজে গিয়েছি, অভুক্ত থাকতে পারি ?'

'কোথায় খেয়েছিস ?'

'শরতের বাড়িতে।' তৃপ্তির পরিপূর্ণতা ভেসে উঠল লাটুর মুখে : 'শরতের মা যা খাওয়ালে তার তুলনা হয় না।'

'বলিস কিরে !'

'খেতে-খেতে তাই তো এত দেরি হল। কি সুন্দর যে রাঁধেন শরতের মা !'

'কোন রান্নাটা সব চেয়ে ভালো হয়েছিল ?'

'চচ্চড়ি—চচ্চড়ি ! এমন চচ্চড়ি জীবনে আমি আর কখনো খাইনি মশাই।'

'বলিস কিরে ? সেই চচ্চড়ি তুই একা-একা খেয়ে এলি ?' নিজের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর : 'ইখানকার জন্যে একটু আনলিনে ?'

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল লাটু। সত্যিই তো, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। নিজের যা ভালো লাগে তাই তো দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয়। তাকেই তো বলে আত্মবৎ সেবা। অর্থাৎ নিজের সেবার পক্ষে যেটি রুচিকর তাই দিয়ে তোমার প্রিয়তমের সন্তোষ করো। যেটিতে তোমার রতি সেইটিতেই আরতি ভগবানের।

'শোন, কাল আবার যাবি কলকাতায়।' ঠাকুর হুকুমজারি করলেন। 'আর সেই শরতের বাড়িতে। শরতের মাকে বলবি ফের তেমনি করে চচ্চড়ি রাঁধতে। আর সেই চচ্চড়ি নিয়ে আসবি ইখানকার জন্যে। বুঝলি ?'

পরদিনও পায়ে হেঁটে ল্যাটু ঠিক গেল কলকাতায়। শরতের মায়ের থেকে নিয়ে এল চচ্চড়ি। একটু মুখে দিয়ে ঠাকুর তো আনন্দের উর্দ্ধে হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওরে, সত্যিই তো, এ যে অমৃত। এমন চচ্চড়ি তো কোনোদিন খাইনি। শরতের মা'র মন ভালো নইলে কি রান্নায় এমন তার হয় রে ?'

যার মন পরিচ্ছন্ন, তার কাজই শুভাবহ। কাজ মনেরই প্রতিফলন। গোল জিনিসের ছায়া গোল, চৌকোর ছায়া চৌকো। তেমনি তোমার যেমন মর্ম তেমনি কর্ম।

লালাবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, শরপুঞ্জের মত বৃষ্টি নেমে এল, এক দরিদ্র গ্রাম্য নারীর ঘরের দাওয়ায় তিনি আশ্রয় নিলেন। এমন বর্ষণ যে ছেদ টানতে চায় না। দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছেন লালাবাবু, বৃষ্টির সমাপ্তি নেই। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে খিদে পেয়ে গেল যে। গ্রাম্য নারী দরজা খুলে শীলসম্পন্ন অতিথিকে অন্তঃপুরে ডেকে নিল। ঘন দুধে চিনি ফেলে চারটি চিঁড়ে দিল খেতে। পরম তৃপ্তিতে লালাবাবু খেলেন সে দুধ-চিঁড়ে। সেই তৃপ্তি সেই প্রীতি নিবেদন করলেন তাঁর রাধাবল্লভকে। শুরু হয়ে গেল রাধাবল্লভের চিঁড়ে-ভোগ। আমার ভালো লাগা যে তোমারই ভালো লাগা।

আর তোমার যত দুঃখ সব আমার দুঃখের জন্যে।

তাই ঠাকুর একদিন বললেন মাকে, 'জীবের জন্যে আমি শত দুঃখ সয়েছি, তুমিও তাদের একটু দেখো।'

মায়ের খুব জ্বর, থার্মোমিটার লাগাতে এসেছে একটি মেয়ে। থার্মোমিটারটিকে

মা বলেন কাঠি।

বললেন, 'ঠাকুরের কথা রেখেছি আমি মা। যেখান থেকে যে এসেছে, কারুকে বারণ করিনি। সবাইকে নাম বিলিয়েছি। মানুষের পাপে তাপে দেহটা জ্বলে গেল। কাঠিতে কি জ্বর পাবে মা! এ আমার অন্তঃজ্বরা।'

মাঝে-মাঝে ঠাকুরের একটু পা টিপে দেন মা। মাঝে-মাঝে সেটি বুঝি মনের মতন হয় না। তখন ঠাকুর মায়ের গা টিপে দেখিয়ে দেন, বলেন, 'এমনি করে টেপো।' ঠাকুর কিছু খেতে পাচ্ছেন না। ঠাকুরের দাদা রামকুমার বিকারের সময় জল খাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি হাত থেকে জলের প্লাশ কেড়ে নিলেন ঠাকুর। খুব চটে গেলেন রামকুমার, শাপ দিয়ে বসলেন। বললেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলিনে, তুইও তেমনি শেষ সময়ে খেতে পারবি নি কিছু।'

ঠাকুর বললেন, 'আমি তো তোমার ভালোর জন্যে জল খেতে দিচ্ছি না। তাই বলে তুমি আমাকে শাপ দিলে?'

তখন যেন চেতনা হল রামকুমারের। কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ভাই, কেন কে জানে অমন একটা অসম্ভব কথা বেরিয়ে এল মুখ থেকে।'

মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। হোক না সে ছোট ভাই। আপনার জন।

'তার মানে' মা বললেন, 'কর্মের ফল ঠাকুরকেও ভোগ করতে হয়েছে। অনেক জন্মের সংস্কারের ফল। যে কটা ঢেউ আছে সব কাটিয়ে যেতে হবে।'

কিন্তু সবদিন এমন ছিল না। সেই এক বুড়ি লাঠি ধরে কাঁপতে-কাঁপতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ডান হাতে লাঠি, বাঁ হাতে ছোট্ট একটি পাতার ঠোঙা। ইচ্ছে ঠাকুরকে একটু মিষ্টিমুখ করানো। কিন্তু তাঁর ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। সাধ্য কি অনামা-অজানা বুড়ি সে ঘরে ঠাঁই পায়। নিরিবিলিতে বলে একটু তার প্রাণের কথা।

অগত্যা নবতে এসে দাঁড়াল। বললে, 'মা একটু সন্দেশ এনেছিলুম ওঁকে খাওয়াব বলে। কি বিরাট ভিড় হয়েছে সেখানে। উপায় নেই মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করি। তাই তোমার কাছে রেখে গেলুম মা, আমার হয়ে তুমি খাইয়ে এস।'

'ঐ ভিড়ের মধ্যে আমিই বা যাব কি করে?' বললেন শ্রীমা। 'আপনার সন্দেশ আপনিই দিয়ে আসুন।'

বুকে বল বেঁধে ভিড়ের দিকে আবার এগুলো বৃদ্ধা। আশ্চর্য, ঢুকতে কেউ তাকে বাধা দিল না। দেখল তক্তপোশের পায়ার কাছে অনেকে অনেক রকম নৈবেদ্য রেখে গেছে, তারই মধ্যে নিজের ছোট্ট ঠোঙাটি লুকিয়ে রাখল। প্রণাম করে চলে গেল নীরবে। প্রাণের কথাটি বলা হল না। হে হৃদয়বিহারী, বুঝে নাও আমার মর্মের গুঞ্জন।

ভাবাবেশ হয়েছে ঠাকুরের। দেহভূমিতে নেমে বলে উঠলেন, 'খাব। খিদে পেয়েছে।' স্তূপীকৃত নৈবেদ্য থেকে বড় ঠোঙাটি বেছে নিলেন গৌরীমা।

ঠাকুর বললেন, 'উঁহু।'

শাঁসালো দেখে আরো একটি বের করলেন গৌরীমা ; এটিও ঠাকুর বাতিল করে দিলেন। আঙুল দেখিয়ে বললেন : 'ঐ যে, ছোট্ট ঠোঙাটি—'

সেই বুড়ির ঠোঙা। সেই বুড়ির নিবেদন।

সবটুকু সন্দেশ খেয়ে নিলেন ঠাকুর। সন্দেশের মিঠায় শুনলেন তার প্রাণের কান্নার মধুরিমা।

সেদিন ছোট একটি ছেলেকে নিজেই ডাকলেন সন্দেশ খেতে। তিন-চার বছরের শিশু, কখন দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে কে জানে। দাড়ি-গোঁফওলা অচেনা লোক দেখে খানিকটা ভয় পেয়েছে বোধহয়, কিন্তু মুখে দুষ্টুমিমাখা মিষ্টি হাসি—যেন আর দু পা এগিয়ে এলেই কিছু একটা লোভের বস্তু পাওয়া যাবে। 'আয়, আয়।' ঠাকুর হাত বাড়ালেন : সন্দেশ খেতে দেব।

এক গাল হেসে শিশু ঠাকুরের কোলে চড়ে বসল।

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তুই কাদের বাড়ির ছেলে ?'

আর কাদের বাড়ি ! যিনি কোলে তুলে নিয়েছেন, তিনিই আমার বাড়ি-ঘর।

ছেলেটা কথা কয় না, নির্ভয়ে হাসে।

'তোর নাম কি ?'

উজ্জ্বল চোখে ছেলেটা বললে, 'শিবকালী।'

দরজায় কার ছায়া পড়ল। ঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রীলোক। ছেলে কোথায় লুটিয়ে পড়ে ঠাকুরকে প্রনাম করবে, তা নয়, এক লাফে কোলে উঠে বসেছে, তাই অস্থির পায়ে ছুটে এসেছে মা। চোখে নীরব শাসন, নোংরা ছেলে, দুষ্টু ছেলে, নেমে পড় শিগগির।

'এ তোর খোকা বুঝি ?' ঠাকুর বললেন স্ত্রীলোকটিকে, 'বেশ নাম রেখেছ ; শিবকালী।' বলে তিনবার উচ্চারণ করলেন, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী ; আদি-মধ্যান্ত-শূন্য শিব, ভবভয়শমনী কালী। বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথ, কাশীপুরাধিশ্বরী অন্নপূর্ণা।

জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পূর্ব-প্রথম ইজ্য-পূজ্য মান্য-শ্লাঘ্য সকলকে প্রণাম, আবার সদ্যোজাতকেও প্রণাম। প্রণাম শিশু ভোলানাথকে।

কালীঘাট অঞ্চল থেকে এসেছে স্ত্রীলোক। নাম ব্রজবালা। ঠাকুরের কাছে আসবার আগে ছেলে কোলে নিয়ে গিয়েছিল নবতে, শ্রীমা'র কাছে। ছেলের মঙ্গল চেয়েছিল। শ্রীমা বললেন, ছেলেকে ছেড়ে দাও, ঠাকুরের কাছে চলে যাক গুটি-গুটি। আর শিবকালীকে শিখিয়ে দিলেন, গিয়েই ঠাকুরকে প্রণাম করবি, পায়ের নিচে পড়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খাবি। বুঝলি ?

খুব বুঝেছে যা হোক। পায়ে না পড়ে কোলে চড়ে বসেছে। শিশুর হাতে ঠাকুর একটি সন্দেশ দিলেন। বললেন, 'খা।' লোভার্ত ছেলে, অথচ মুঠোর মধ্যে সন্দেশ চেপে ধরে নিস্পন্দ হয়ে রইল। শুধু বলতে লাগল, শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী। ব্রজবালা ছুটে এল মা'র কাছে।

মা বললেন, আর ভাবনা কি, তোমার ছেলের কাজ হয়ে গেল।

শুধু ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকো আর নাম করো। কালাতীতকল্যাণ শিব আর কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা কালী।

একবার একটি ভক্ত এসে বললেন শ্রীমাকে, 'মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলে তো মুখ চলে না আর মুখ চলে তো হাতের গণনা ভুল হয়ে যায়।'

শ্রীমা বললেন, 'এর পর দেখবে হাত-মুখ কিছুই চলবে না, শুধু মনে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে।'

নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করো। নামসাধনই পরম সাধন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই রক্ত চলাচল, দেহরক্ষা। দেহের প্রতিটি অণুতে-পরমাণুতে তার কাজ। অনেক রকম গন্ধ নিয়েছে তোমার ঘ্রাণে, এবার নামসৌরভও নাও। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামগন্ধ মিশে গেলে ধীরে-ধীরে সমস্ত দেহ নামময়, নামাঙ্কিত হয়ে উঠবে। এই ভাবেই সাত্ত্বিক হয়ে উঠবে দেহ। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কর্মও শুভসমন্বিত হবে। নামসাধনই কামশোধন সর্বশোধন।

এমন কি নাম করতে-করতে দেহে, দেহের অস্থিচর্মে পর্যন্ত, নাম ফুটে ওঠে। বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'অর্ধকুম্ভে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। যমুনার চড়াতে দেখলাম সাধুদের ভিড়। ভাবলাম দর্শন করে আসি। বালির উপর দেখলাম একখানা হাড় পড়ে আছে। সন্দেহ নেই মানুষের হাড়। কি মনে হল তুলে নিলাম হাড়খানা। দেখি সমস্ত হাড়খানাতে দেবনাগরী অক্ষরে 'হরেকৃষ্ণ' লেখা। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাড়খানা দেখালাম সাধুদের। সবাই অবাক হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোনো বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি, সকলে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে লাগল। সংকীর্তন লাগিয়ে দিলে। পরে কেশীঘাটের কাছে যমুনার চড়ায়-ই সমাধিস্থ করল অস্থি।' এক ভক্ত শ্রীমাকে বললে, 'জপ করতে আর ইচ্ছে নেই। করে কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।'

'নাম করতে-করতেই কাটবে।' বললেন শ্রীমা, 'নাম না করলে চলবে কেন? পাগলামি কোরো না। যখনই সময় পাবে নাম করবে। ডাকবে ঠাকুরকে।'

'কই কিছুই হচ্ছে না।' স্বরে অপার নৈরাশ্য নিয়ে বললে সেই ভক্ত। 'আবার সেই পুরোনো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, অন্যায় কাজ করি। যতই চেষ্টা করি না কেন কুচিন্তা ছাড়তে পারি না।'

বরাভয়ময়ী মা বললেন, 'ও কি আর জোর করে ছাড়া যায়। ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে। নামেই প্রারব্ধ নষ্ট হবে। নৈরাশ্য ও শুষ্কতার ওষুধই হচ্ছে নাম।' কাশীপুরের বাড়িতে কাঠের সিঁড়ি। ধাপগুলোও উঁচু-উঁচু। আড়াই সের দুধের বাটি নিয়ে শ্রীমা উঠছেন উপরে, হঠাৎ কি হল মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। দুধ তো গেলই, মায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। বাবুরাম ছুটে এসে মাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়।

ঠাকুরের কানে গেল সেই কথা। বাবুরামকে ডেকে এনে বললেন, 'তাই তো

বাবুরাম, এখন কি হবে ? আমাকে খাওয়াবে কে ?'

খান তো ভাতের একটু মণ্ড, তা গোলাপ-মা খাইয়ে দেবে। কিন্তু খাদ্যই তো সব নয়, আসল হচ্ছে সেই সান্নিধ্য সেই আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মাতে চিত্ত সংলগ্ন করে থাকা।

হাতের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে নথ বোঝালেন ঠাকুর। আর নথ দেখিয়ে বোঝালেন শ্রীমাকে। বললেন, 'ও বাবুরাম, এই ওকে তুই একটু আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবি ?'

'কি করে আনব ! মায়ের পায়ে যে ব্যথা। মাটিতে ফেলতে পারেন না পা।'

'কেন একটা ঝুড়িতে বসিয়ে মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি এখানে। তুই আর নরেন। পারবি নে ?'

নরেন আর বাবুরাম তো হেসে খুন।

তিনদিনেই ব্যথার কিছু উপশম হল। নরেন আর বাবুরাম মাকে ধরে নিয়ে গেল উপরে, ঠাকুরের কাছে।

এবার আমাকে তোমার সেবার কাজে লাগাও। আমাকে একলা ফেলে রেখো না। তুমি আমাকে তোমার কাছে-কাছে থাকতে দাও। তোমার এই কাছে-কাছে থাকাটিই আমার একমাত্র পুজো। আমার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিও না। আমাকে তুমি ডেকে নাও তোমার পাশটিতে। আমার হৃদয়ে তোমারই যে সঞ্চিত সুধা তারই আস্বাদ গ্রহণ করো আমার হাত থেকে। শুধু আমিই তো তোমাকে চাই না, তুমিও আমাকে চাও। শুধু তুমিই তো আমাকে কাঁদাও না, আমিও তোমাকে কাঁদাই। তাই এবার সব ব্যবধান ভেঙে দাও। তোমার কৃপাচোখে আমাকে দেখ। তোমার স্নেহকরতলে নির্ভয়-নিভ'য় করো। আর নাও আমার এই দেবনিন্দিত হৃদয়ের সহজশোভন সম্ভাষণ।

'মাগো, সংখ্যা রেখে কি জপ করব ?' শ্রীমাকে জিগগেস করলে এক ভক্ত।

'সংখ্যা গুনে যোগ করতে গেলে কেবল সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকবে।' বললেন শ্রীমা—'তাই এমনি জপ করবে।'

'কিন্তু জপ করতে-করতে মন কেন তাঁতে মগ্ন হয় না ?'

'করতে-করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। বসলেই দেহ স্থির, নাম করতে করতে মন স্থির। তাঁকে ষোলো আনা না দিলে চলবে কেন ? একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণীনাথায়'। সে ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারত না। সে বলত 'রুকু' 'রুকু'। তাতে তাকে ঠেকতে হয়েছিল। পরে গুরুকৃপায় ফের মন্ত্র পেয়ে ভেলা ধরল।'

ঠাকুর বললেন, 'তুমি যদি ষোলো আনার কাপড় চাও তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোলো আনা তো দিতে হবে। একটু কম পড়লে একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার জো নেই। টেলিগ্রাফের তারে কোথাও যদি একটু ফুটো থাকে তা হলে আর খবর যাবে না।'

কিন্তু যাদের গুরুদত্ত মন্ত্র লাভ হয়নি তাদের কি হবে ?

তাদের শুধু আকুল প্রার্থনা, প্রভু, তুমি তো সর্বত্রই আছ তবু আমার কাছে এসে দাঁড়াও ; তুমি তো সব কিছুই দেখছ তবু আমার চোখের উপর চোখ রেখে আমাকে দেখ ; সব কিছুই তুমি শুনছ তবু আমার বুকের উপর তোমার কান রেখে শোনো আমার নিঃশব্দ কান্না।

সেই নিঃশব্দ কান্নাই আমার মহামন্ত্র। হে জগদ্‌গুরু, এ মন্ত্র তো তোমার দেওয়া মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। হে প্রাণপাল, নিজের দেওয়া মন্ত্রের থেকে নিজের কান ফিরিয়ে নিও না। শোনো আমার কান্না, আমার চিরন্তনী প্রাণবাণী।

১৪৭

ঠাকুরের কাছে বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন।

কথায়-কথায় বলেন বিজয়কৃষ্ণ, 'কে একজন সদাসর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন কোথায় কি হচ্ছে।'

'ঠিক গার্ডিয়ান এঞ্জেলের মত। তাই না ?' বললে নরেন।

ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'জানো, আমি ঢাকায় এঁকে দেখেছি।'

'ঢাকায় ?' নরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, শুধু ছায়া দেখিনি, গা ছুঁয়ে দেখেছি। টিপে-টিপে দেখেছি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে তবে আরেকজন।'

নরেন ঢোঁক গিলল। বললে, 'আপনার কথা বিশ্বাস করি না এ কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, কেননা আমিই নিজে যে এঁকে দূরে বসে দেখেছি। অনেক-বার।' ঠাকুর গোপনে বললেন শ্রীমাকে, 'আত্মাটা যে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে, এ ভালো নয়। দেহ বুঝি আর এবার বেশিদিন থাকবে না।'

ঠাকুর তখন অপ্রকট, একটি গৃহস্থ শিষ্য এসেছে মা'র কাছে। বললে, 'মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না ?'

'দর্শন কি এতই সোজা ?' বললেন মা, 'ডাকতে থাকো, ক্রমে-ক্রমে হবে। এ জন্মে না হয় পরজন্মে হবে। পরজন্মে না হয় তার পরজন্মে।'

নরেনের হয়েছিল। হয়েছিল বিজয়কৃষ্ণের।

শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গের পঞ্চমখণ্ডে লিখছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : "গয়াতে দীক্ষা গ্রহণের পর ঠাকুর (শ্রীবিজয়কৃষ্ণ) কলিকাতায় আসিয়া বরাহনগর মণি মল্লিকদের বাগানে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে দেখিয়াই বলিলেন, এ কি, তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে। ঠাকুর তখন তাঁহাকে দীক্ষালাভের সমস্ত পরিচয় দেন। পরমহংসদেব শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আর একবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শনমানসে যান। পরমহংসদেব একটু

অসুস্থ ছিলেন। শিষ্যেরা ঠাকুরকে নিকটে যাইতে বাধা দিতে লাগিল। পরমহংসদেব তখন হাতে তালি দিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুর সম্মুখে যাওয়া মাত্রই পরমহংসদেব বলিলেন, আহা, তোকে দেখে যে আমার হৃদয়পদ্মটি ফুটে উঠল। এই বলিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। একবার ঠাকুর পশ্চিমাঞ্চলে বহু স্থান ঘুরিয়া কলিকাতা আসিলেন। একদিন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। পরমহংসদেব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি বল দেখি? ঠাকুর কহিলেন, কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বারো আনা চৌদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোলো আনা এখানে। পরমহংসদেব শুনিয়া ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন।"

ঠাকুরের যেমন কালী, বিজয়কৃষ্ণের তেমন শ্যামসুন্দর।

একদিন শ্যামসুন্দর বিজয়কৃষ্ণকে বললে, 'আমি সোনার চুড়ো পরব। আমাকে একটা গড়িয়ে দে না।'

বিজয়কৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মসমাজে। সে বললে, 'আমি তোমাকে মানি না। যারা মানে, তাদের বলো গে। আমার টাকা-পয়সা নেই।'

'তোর নেই, তোর খুড়ির আছে।' বললে শ্যামসুন্দর। 'দ্যাখ গে তোর খুড়ির ঝাঁপির মধ্যে অনেক টাকা। খুড়িকে বলে চেয়ে নে না।'

খুড়িমাকে বললে বিজয়কৃষ্ণ।

'কি আশ্চর্য', খুড়িমা অভিভূতের মত বললে, 'কাল যে আমাকে স্বপন দিয়েছেন শ্যামসুন্দর। বললেন, ওগো আমি সোনার চুড়ো পরব। আমি বললুম, টাকা কোথায় পাব? শ্যামসুন্দর বললেন, দ্যাখ না ঝাঁপি খুলে, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা কোন্ না পাবি? লুকিয়ে-লুকিয়ে সাতষট্টি টাকা জমিয়েছিলাম ঝাঁপিতে, কেউ জানে না, কিন্তু শ্যামসুন্দর ঠিক দেখে রেখেছেন। সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দি।'

অগত্যা বিজয়কৃষ্ণের হাতে টাকা দিল খুড়িমা। সেই টাকায় ঢাকা থেকে গড়ানো হল সোনার চুড়ো। সেই সোনার চুড়ো পরানো হল শ্যামসুন্দরকে।

সন্ধের আগে ছাদে গিয়েছে বিজয় শ্যামসুন্দর ঘর থেকে উঁকি মারল উপরে। বললে, 'ওরে একবার দেখে যা না চুড়ো পরে আমাকে কেমন দেখতে হয়েছে।

'আমি কি দেখব', স্নেহকটাক্ষ ফিরিয়ে দিল বিজয়। 'আমি তো আর তোমাকে মানি না। যারা তোমাকে মানে তাদের ডেকে আনো গে।'

শ্যামসুন্দর হাসল মৃদু-মৃদু। বললে, 'নাই বা মানলি, তাতে একবার দেখতে কি দোষ।'

সত্য তো, দেখতে বাধা কি! একটা পাথরের মূর্তির মাথায় মুকুট পরানো হয়েছে, এইটুকুই তো দেখা। দেখি না কেমন গড়িয়ে আনলাম সোনার চুড়ো!

শ্যামসুন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল বিজয়কৃষ্ণ। এ কি, চোখ যে আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না! পদ্মপত্রবিশালাক্ষ কি অপার স্নেহে তাকিয়ে আছেন! তমালশ্যামল-দ্যুতি সর্বাঙ্গে, সমস্ত ঘর নয়, সমস্ত ভুবন যেন আলো করে দাঁড়িয়ে

আছেন। 'কি রে, মানিস না, তবে অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন?' বললে শ্যামসুন্দর। 'চোখের দেখা তো কখন হয়ে গিয়েছে। এবার যা না ফিরে।'

পা ওঠে না বিজয়ের, চোখে পলক নেই, বললে, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে এতদিন এত ঘোরালে কেন? কালাপাহাড় বানিয়ে সব ভাঙালে কেন একধার থেকে?

শ্যামসুন্দর বললে, 'তুই কে? সব আমি। ভেঙেও ছিলাম আমি, এখন আবার গড়েও নিচ্ছি আমি। ভেঙে গড়লে কত সুন্দর হয় তার খেয়াল আছে?'

বিভ্রম্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশ শ্যামসুন্দরের দিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল বিজয়। আমি মানি আর না মানি কি এসে যায়, তুমি তারণ্যামৃতপারাবার, তুমি মধুর মধামণি। আমি জানি আর না জানি কি এসে যায়, তুমিই লীলাকল্লোলবারিধি, তুমিই সর্বসৌন্দর্যের সিন্ধু।

এক দিন দুপুরে বসে আছে বিজয়, শ্যামসুন্দর এসে নালিশ করলে।

'দ্যাখ, আজ আমাকে খেতে দিয়েছে বটে, কিন্তু জল দেয়নি।'

'এ কখনো হয়?'

'জিগগেস কর না তোর খুড়িকে।'

খুড়িমাকে ডেকে জিগগেস করলে বিজয়। 'শ্যামসুন্দরকে আজ জল দাওনি?'

'কে বললে তোকে?'

'শ্যামসুন্দর বললেন।'

'শ্যামসুন্দর তো আর লোক পেল না, তুই ব্রেহ্মজ্ঞানী, তোকে বলেছে জল দেবার কথা।'

'বেশ তো, তুমি একটু খোঁজ করেই দেখ না।'

খোঁজ নিয়েই খুড়িমা মাথায় হাত দিলেন। সত্যিই শ্যামসুন্দর আজ অপীত।

আমি তোমাকে না চাইলেও তুমি আমাকে চাও। আমি না মানলেও তুমি আমাকে ধরে থাকো। আমি তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে চাই, কিন্তু কিছুতেই তুমি ছাড়ো না।

ঠাকুর তীব্র বৈরাগ্যের গল্প বলছেন বিজয়কে। তীব্র বৈরাগ্য মানে দুঃসাহসিক অনুরাগ। শরণাগতি মানে চুপ করে করজোড়ে বসে থাকা নয়, শরণাগতি মানে হচ্ছে শরণে আগতি, এগিয়ে গিয়ে ধরা, রোক করে ধরা, জোর করে আঁকড়ানো। একজনের স্ত্রী তার স্বামীকে একদিন বললে, শুনেছ? দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্নিসি হবার চেষ্টা করছে! বলো কি? কি করছে তোমার দাদা? খাওয়া কমিয়েছে, মাটিতে শোয়, বউয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা হয় না। তাই বড় ভাবনা হয়েছে, পাছে সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে যায়। স্বামী শুধু একটু হাসল। বললে, দূর ক্ষেপি, সে যাবে না, মিছে কথা, সন্নিসি কি অমনি করে হয়? স্ত্রী বললে, ওগো না সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিকঠাক, সে নিশ্চয়ই

যাবে। স্বামী আবার হাসল। বললে, আমি বলছি যাবে না। সন্নিসি কি অমনি করে হয় ? স্ত্রী ক্ষেপে গেল। ঝাঁজিয়ে উঠে বললে, অমন করে হয় না তো কেমন করে হয় ? কেমন করে হয় দেখবে ? বলে স্বামী হঠাৎ নিজের পরা কাপড়খানি ছিঁড়ে ফেলে কোপনি করে পরলে। বললে, এমনি করে হয়। বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। আর এল না।

'একবার আমার ভারি ব্যামোর সময় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গেল।' বলছেন ঠাকুর। 'গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, স্বর্ণ পটপটি খেতে হবে। কিন্তু জল খেতে পাবে না। বেদানার রস খেতে পারো। সকলে ভাবলে, এ কি সম্ভব, জল না খেয়ে কি করে থাকব ! এই কথা ? আমি তখন জল খাব না বলে রোক করলুম। পরমহংস, আমি তো পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস। দুধ খাব।'

যা একবার মিথ্যা বলে জেনেছি তাকে যদি রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে না পারি তাহলে কিসের মনুষ্যত্ব?

'তুমি মাঝে-মাঝে আসবে।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর, 'তোমাকে দেখতে বড় চ্ছে করে।'

মামুলি নিয়মকানুন মেনে বিগ্রহ গড়লে বা চিত্রপট আঁকলেই চলবে না, তাতে মেশাতে হবে কারুকারের ভাবলাবণ্য, ভক্তির পবিত্রতা। সেই নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিল বিজয়ের সঙ্গে। বিজয়কৃষ্ণ বললে, 'চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে আঁকা উচিত। আজকাল বিশেষ আর সেই ভাবশুদ্ধি দেখা যায় না।'

'এঁড়েদায় মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে দেখেছ ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না দেখিনি।'

'ঐ চিত্রপট ঠিক-ঠিক আঁকা। একবার গিয়ে দেখে এস।'

'আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তবেই যাওয়া হয়।'

'বেশ তো যাব।'

দুজনে একদিন গিয়ে হাজির হলেন এঁড়েদায়। মন্দিরে গিয়ে দেখলেন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কখন খুলবে ? কেউ ঠিক বলতে পারে না। পূজারী সামনের দিকের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে পিছনের দরজায় তালা দিয়ে চলে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে।

দুজনে মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম করলেন। কাছেই কোন এক বৈষ্ণবের সমাধি আছে তাই গেলেন দর্শন করতে।

ফিরে এসে দেখেন তখন মন্দির বন্ধ। মন্দিরের আঙিনার পাশে ছোট একখানি ঘর, তাতে বসলেন দুজনে। ঠাকুর গান ধরলেন আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আঙিনায়। মুহূর্তে কি হল কে জানে, মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সে কি, পূজারী ফিরে এল নাকি ? না, পূজারী কোথায় ! মন্দিরের পিছনের দিকের দরজায় তেমনি তালাবন্ধই আছে। কতক্ষণ পরে পূজারী ফিরে এসে তো হতভম্ব। মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল কি করে ? ব্যাকুলতায়

খুলে গেল। এ তো শুধু বাইরের থেকে টান নয়, এ যে ভিতর থেকেও ঠেলা। এ বেগ দুদিকের। ওরা শুধু দেখতে আসেনি, আমিও যে দেখতে চাই। কতক্ষণ ওরা বসে থাকবে, তাই আমিই খুলে দিই দরজা। দেবতাই দরজা খুলে দিলেন।

প্রসাদী মালা ঠাকুর আর বিজয়কৃষ্ণের গলায় পরিয়ে দিল পূজারী।

এই দেখ সেই চিত্রপট। বারন্দায় সেই মনোনীত ছবিটি বিজয়কৃষ্ণকে দেখালেন ঠাকুর।

'প্রেম কাকে বলে?' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'ঈশ্বরে যার প্রেম হয় তার জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত প্রিয় যে দেহ তা পর্যন্ত হুঁশ থাকবে না। বিজয় এখন বেশ হয়েছে, হরি-হরি বলতেই মাটিতে পড়ে যায়। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলেই একেবারে সাষ্টাঙ্গ। আর অতি উদার সরল। সরল না হলে কি ঈশ্বরের কৃপা হয়?' প্রেম রজ্জুস্বরূপ। প্রেম হলেই ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন। প্রেম হলেই সর্বভূতে সাক্ষাৎকার।

প্রেমই মধু। সেই মধুব্রহ্মের ভজনা করো। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মনোনেত্রোৎসবকে উপভোগ করো চতুর্দিকে।

মৈত্রেয়ীকে বলছেন যাজ্ঞবল্ক্য, 'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। কারু কামনায়ই কেউ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।' এ আত্মা কে? এ আত্মাই মধুব্রহ্ম। মধুরাধিপতির সমস্ত অখিলই সুমধুর।

'খুব ভালোবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখিব।' বললেন ঠাকুর, 'খুব ন্যাবা হলে তবেই তো চারদিক হলদে দেখা যাবে।'

'সব ঋণ থেকে মুক্ত কে?' আবার বললেন ঠাকুর। 'শুধু একজন। যে প্রেমোন্মাদ। তার আর তখন কে বা বাপ কে বা মা কে বা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালোবাসা যে পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। খসে গিয়েছে সমস্ত ঋণশৃঙ্খল।' যখন প্রিয়মিলনের লগ্ন এসে পড়েছে তখন আর কিসের বিদ্যুৎ, কিসের ঘনঘটা, কিসের বা উল্কাবৃষ্টি।

১৪৮

সূর্যের উদয়াস্তের সঙ্গে-সঙ্গে বৃথা চলে যাচ্ছে আয়ু। চরম ভোগের উপাদান আজো পেলাম না খুঁজে-খুঁজে।

শুধু টিঁকে থাকাই কি জীবন? শুধু নিশ্বাস নেওয়া? গাছও তো টিঁকে আছে, বেঁচে আছে পত্রে-পুষ্পে। কামারের দোকানের হাপর নিশ্বাস ফেলছে সমানে। গ্রাম্য পশুরাও মেতে আছে আহারে-বিহারে। কান পচে গেল নানা শব্দের কোলাহল শুনে-শুনে, কবে শুনতে পাব সেই হরিনাম, শ্রবণমঙ্গল

রসায়ন ? কত কথাই তো বলছে জিহ্বা, একবার বলবে কবে হরিকথা ? পট্টকিরীটই কি মাথার ভূষণ হবে, ভগবদভক্তের পদরেণু কি মাথায় ধরতে পাব না ? যে হাত হরির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিল না, কাঞ্চনকংকণ থাকলেও তা মড়ার হাত। পা থাকতে যে হরিক্ষেত্রে গেল না তাতে আর তৃণগুল্মে প্রভেদ কি ? কি প্রভেদ তাতে আর পাথরে যার হরিনামেও চোখে নেই অশ্রু, অঙ্গে নেই রোমহর্ষ ! আর কত ঘ্রাণই তো নিলাম নাসিকায়, শ্রীবিষ্ণুপদার্পিত তুলসীর গন্ধটুকু নেব কবে ?

দিন থাকতে-থাকতে বেরিয়ে পড়ো। হৃদয়নলিনদিনেশ এখনো অস্ত যায়নি। এখনো কিঞ্চিৎ আয়ু অবশিষ্ট আছে।

দেহ ধরেছিস কেন ? সমস্ত রোমাঞ্চের শ্রেষ্ঠ—ঈশ্বর-রোমাঞ্চ আস্বাদ করবার জন্যে। 'তাই তো দেহের যত্ন করি।' বললেন ঠাকুর, 'ঈশ্বরকে নিয়ে যে সম্ভোগ করব।'

আবার বললেন, 'এক-এক সময় মনে হয় দেহটা খোলামাত্র, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বই আর কিছু নেই।'

দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি। দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান। যতক্ষণ এ দেহ আমার বলে বোধ আছে ততক্ষণ্ সোঽহং নেই। যখনই এ দেহ তোমার বলে বোধ হবে তখনই দাসোঽহং।

আমার দেহ তোমার হাতের বীণা। তোমার হাতের লেখনী। যতদিন খুশি যেমন-তরো খুশি, বাজাও, লেখ। যখন ইচ্ছে হবে ছুঁড়ে ফেলে দিও অন্ধকারে। সেই অন্ধকারেই আবার তোমার হাতের নতুন বীণা নতুন লেখনী হয়ে উঠব।

দীপেরই বদল হয়, দ্যুতিটি অক্ষুণ্ণ। দেহেরই নাশ হয়, আত্মা চিরশিখা। দীপ আর তেলের তারতম্যে জ্যোতির তারতম্য। মাটিতে স্নিগ্ধ, স্ফটিকে তীব্রপ্রভ। ঘৃতে স্বচ্ছ, রেড়ির তেলে বিমলিন। শুধু এই তো সাধনা যেন ভালো দীপ পাই, ভালো আধার পাই, আহরণ করতে পারি ভালো তেল, আরো শক্তি। যেন আরো জ্বলন্ত পাই উজ্জ্বল হয়ে। জ্বলতে-জ্বলতে মিশে যেতে পারি সেই নিখিলজ্যোতিতে।

'সুখ দুঃখ রোগ শোক জন্ম মৃত্যু এ সব দেহের, আত্মার নয়।' বললেন ঠাকুর, 'দেহের মৃত্যুর পর ঈশ্বর হয়তো ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, ভালো আধারে—যেমন প্রসব বেদনার পরে সন্তানলাভ।'

কিন্তু যতদিন দেহ ততদিনই তো কষ্ট। এ খোলস যত শিগগির ছেড়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।

কেন দুঃখে ?

'দেহ থাকলেই বা।' বললেন ঠাকুর। 'এই সংসার যেমন ধোঁকার টাটি তেমনি আবার মজার কুটিও হতে পারে। শুধু একবার গুরুদত্ত কৃপা হলেই হয়। সমস্ত গেরো খুলে যায়, দিবাচক্ষু ফুটে ওঠে। ভেলকি বাজি দেখান ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি, তার একধার একটা জায়গায় বাঁধে বাজিকর। তারপর আরেকধার

নিজের হাতে ধরে দড়িটাকে নাড়া দেয়। যেই নাড়া দেওয়া অমনি সব গেরো খুলে যায় একে-একে। অন্য লোকের সাধ্যও নেই টানাহেঁচড়া করেও সে সব গেরো খুলতে পারে। দেহে যেই একটু নাড়া খাওয়া এমনি দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়া। মনের শুদ্ধিতেই দিব্যদৃষ্টি। নইলে ভাবো, সাধারণ একটা কুমারী মেয়ে, তার মধ্যে দেখলাম কিনা সাক্ষাৎ ভগবতী!'

গঙ্গা দিয়ে একখানি নৌকা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়-হয়। মাঝি গান ধরেছে আপন মনে। গঙ্গার জল ছুঁয়ে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে সেই গীতধ্বনি ঠাকুরকে এসে স্পর্শ করল। অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরে পুলককণ্টক। মাস্টার কাছে ছিল, তার হাত ধরলেন। বললেন, 'দেখ-দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ।'

মাস্টার ঠাকুরের গায়ে হাত রাখল। আনন্দে-আবেগে সে দেহ শিহরিত হচ্ছে, কাঁপছে থরথর করে। শব্দরূপে ব্রহ্ম আচ্ছন্ন করছে ঠাকুরকে।

মণি মল্লিকের নাতজামাই এসেছে। সে খুব জাঁক করে বলছে, ইংরেজের বইয়ে লিখেছে ঈশ্বর তেমন সর্বজ্ঞ নয়। সর্বজ্ঞ যদি হবেন তবে লোকের এত দুঃখ কেন? কোনো কার্যকারণ নেই তবু দুঃখ, ব্যাখ্যাহীন দুঃখ। একদিন যখন মরবেই তখন তাকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারা কেন? লেখক বলেছে, সে হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো সৃষ্টি করতে পারত।

পণ্ডিতের কথা, শুনতে হয় সমীহ করে।

শেষে ঠাকুর বললেন বিনয়নম্র হয়ে, 'তাঁকে কি বোঝা যায় গা? আমিও কখনো তাঁকে ভাবি ভালো, কখনো মন্দ। এক সের ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? কখনো অজ্ঞান চলে যায়, কখনো আবার তা ঘিরে ধরে। যেন পানাঢাকা পুকুর। একটা ঢিল ছোঁড়ো, দেখতে পাবে খানিকটা জল। কিন্তু কতক্ষণ! খানিক পরেই দেখতে পাবে পানা নাচতে-নাচতে এসে সে জলটুকুও ঢেকে ফেলেছে।'

বউবাজারের রাখাল-ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসেছে মাস্টার। সকলেই দেখেছে তুমিও একবার দেখ। কিছু করতে পারো কি না।

ডাক্তারের আঙুলের দিকে তাকালেন ঠাকুর। দেখলেন আঙুলগুলো মোটা-মোটা। 'যারা কুস্তিগীর তাদের মত তোমার আঙুল।' সহাস্যে বললেন ঠাকুর। 'দেখলে ভয় করে। মহেন্দ্র সরকার জিভ এমন জোরে টিপেছিল যে ভীষণ লেগেছিল, যেন গরুর জিভ টিপছে।'

'না, না, আমি হাত দেব না।' ডাক্তার বললে অপ্রস্তুতের মত। 'আপনার লাগবে না কিছু।'

তবে দেখ।

শুধু ঐটুকু। আর কথাবার্তা নেই ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারের কি অভিমত, কি ব্যবস্থাপত্র, কৌতূহল নেই কণামাত্র। ভক্তদের সঙ্গে আলাপ।

আমাদের কিসে কি হবে! এই তো একমাত্র জিজ্ঞাসা।

'দীঘিতে-বড় মাছ আছে, চার ফেল।' বললেন ঠাকুর।

চার কি? চার কোথায়?

অত কথায় কাজ নেই। ঠাকুর বললেন, দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে ডাকো। একটু নির্জনে চলে যাও। নির্জনে গোপনে কেঁদে-কেঁদে তাঁকে ডাকো তিনি সব করে দেবেন।'

এবার নির্জনে এসেছি, সংসার-কোলাহলের প্রান্ত উত্তীর্ণ হয়ে। আমার এবার ভয় ভেঙে দাও। আমি যে একাকী নই এটি বুঝতে দাও প্রাণ ভরে। একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাও আমার দিকে! হৃদয়ের থেকে উদ্ধৃত হয়ে দাঁড়াও আমারে চোখের সামনে। তোমার জন্যে কত ধূলোপথ হেঁটে এসেছি, এড়িয়ে এসেছি কত অপবাদ ও প্রতিবাদের কণ্টক। তুমি যদি এখন দেখা না দাও ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে? আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, ঝড়ের নিশান উড়ছে ঈশান কোণে। আমাকে আশ্রয় দাও। ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে তুলে ধরো আমাকে। আমাকে স্পর্শ করো। কোলে করে রাখো। আমি তোমার জন্যে এক পা এলে তুমি কি আমার জন্যে দশ পা আসবে না?

রাধিকার সর্প-অভিসারের গল্প বলছেন ঠাকুর। বলছেন লক্ষ্মীকে ও সারদামণিকে: 'নিকুঞ্জে এসেছে শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশির সংকেতধ্বনি করেছে। আর যায় কোথা! ললিতা বিশাখাকে নিয়ে শ্রীমতী সাজতে বসল। যাব—যাব আজ অভিসারে। ত্বরা কর ত্বরা কর সখি, তৃষ্ণাতরঙ্গিণী দুলে উঠেছে। কিন্তু তখুনি প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখন যাবি কি করে? পাথর ডাগল, আতুর বারি, কাহে অভিসারবি তুঁহু সুকুমারী। আমোদিনী রাধা উন্মাদিনী হয়েছে। বললে, কাকে সখি নিবারণ করছ? সমস্ত মর্যাদা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেছি, এখন কি এই সামান্য বৃষ্টির জলকে ভয় করব? তীর যদি একবার ছোঁড়া যায় সে কি আর ফিরে আসে? তোরা থাক। তুই যদি না শুনিস আমরা শুনব না। বললে সব সখিরা। তুই বৃক্ষ আমরা তার পত্রপুষ্প। তুই আকাশ আমরা তার চন্দ্রতারা। তখন সবাই বেরুল রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। এমন নয় যে রাস্তায় বেরুবার পর ঝড়-বৃষ্টি এসে পড়েছে আচম্বিতে। এ ঝড়-বৃষ্টি দেখে শুনে রাস্তায় বেরুনো। ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, উড়িয়ে দিয়ে। রাস্তায় জলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সাপ শুয়ে আছে। রাধা ও সখিদের লক্ষ্য নেই, সাপের উপরেই পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সাপ আর কেউ নয় স্বয়ং অনন্তদেব। যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছে অনন্তদেব সোঁ করে ফণা বিস্তার করে একেবারে তাদের নিকুঞ্জের ধারে পৌঁছে দিলেন। কেউ টেরও পেল না। এক পলক পতনের পরে আরেক পলক তুলে দেখল, একি, নিকুঞ্জে চলে এসেছি যে! ওমা গো, এ যে দেখি মস্ত বড় সাপ! সবাই হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সাপের থেকে। এ যে সাপের উপর পা দিয়ে আছি গো! চল পালাই কৃষ্ণের কাছে। বুঝলি একেই বলে সর্পাভিসার।'

যদি দুস্ত্যজ অনুরাগ হয়, যদি আসে সর্বভঞ্জন ব্যাকুলতা ঠিক এসে উপনীত

হবে। যাঁর মুরলী ত্রিজগন্মানসাকর্ষী তিনিই টেনে নিয়ে যাবেন। তুমি শুধু একবার ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও বাইরে এসে দাঁড়াও।

জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, ভক্তের কাছে ভগবান। ব্রহ্ম ক্ষুরধারের মত দুর্লক্ষ্য আর ভগবান সর্বরস-কদম্বমূর্তি। সমস্ত রসের আধার-আশ্রয়।

মল্লের কাছে অশনি, নরের কাছে নৃপতি, রমণীর কাছে মূর্তিমান মীনকেতু, গোপীর কাছে স্বজন, দুষ্টের কাছে শাস্তা। বাপ-মায়ের কাছে শিশু, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞের কাছে বিরাটস্বরূপ, যোগীর কাছে পরমতত্ত্ব আর বৃষ্ণির কাছে দেবতা।

যে ঈশ্বরকে যেমন ভাবে দেখে ঈশ্বর তার কাছে তেমনি। কৃষ্ণ যখন কংসের মল্লমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন সকলে তাঁকে এক রূপে এক চোখে দেখল না। কৃষ্ণে যে সকল রসেরই যুগপৎ আবির্ভাব তা কয়জনে দেখে! মল্ল দেখল রুদ্ররূপে, রমণী দেখল কন্দর্পরূপে, বাপ-মা সন্তানরূপে, দুষ্ট রাজা বীররূপে আর কংস ভয়ঙ্কররূপে। রৌদ্র শৃঙ্গার বাৎসল্য বীর আর ভয়ানক সর্বরসের সমুচ্ছ্বাস।

সর্বরসের আস্বাদ্য ও আস্বাদক দুই-ই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যেমন সকলের প্রিয় সকলেও তাঁর তেমনি প্রিয়। তাঁর বাঁশি ডাকছে সবাইকে আর সকলেও সেই বংশীরবের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শুধু মানুষ নয়, বনের পশু-পাখি, বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম।

কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণীরাও ছুটে এসেছে কৃষ্ণের কাছে। বিমুক্তগৃহাশা গেহিনীর মত এই সারকৃষ্ণ ছেড়ে যাবে না আর কৃষ্ণসারের কাছে। সারসহংসের দল চারুগীতহৃতচিত্ত হয়ে শ্রীহরির কাছে এসে মিলিতনেত্রে বসেছে স্তব্ধ হয়ে। পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা আর প্রণতভারপুলকিত তরু প্রেমহৃষ্ট হয়ে মধুধারা বর্ষণ করছে। আর গোপীরা? তারা গোবিন্দে গতবাককায়মানসা। কৃষ্ণ বললেন, তারা মন্মনস্কা, মৎপ্রাণা, মদর্থে ত্যক্তদৈহিকা। 'ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ'। তারা আমাকেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে, আমার জন্যে ছেড়েছে দেহস্বার্থ, পতিপুত্র। আমিই তাদের প্রিয়তম আত্মা, আমি মন দিয়ে পাবার, আমাকে তারা পেয়েছে মন দিয়ে। যারা আমার জন্যে লোকধর্ম বিসর্জন দিয়েছে আমি তাদেরই পালক-পোষক।

উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব, তারা আমার জন্যে বিরহোৎকণ্ঠ বিহ্বল হয়ে আছে। আমি দূরস্থ বলেই তারা আমাতে এমনি নিবিড় সংলগ্ন। আবার ফিরে যাব বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম, আহা, সে কথা বিশ্বাস করেই তারা বহুক্লেশে দেহ ধারণ করে আছে। তুমি যাবে, একবার দেখে আসবে তাদের?

বাবুরাম বলে উঠল, 'আমি গোপী-টোপী জানি না।'

ঠাকুর ঝলসে উঠলেন, 'শালা, কলিকালে গোপীদের ভাব কি আর নিতে পারবি? শুধু তাদের টানটুকু নে। যে কৃষ্ণকে শিব ব্রহ্ম ইন্দ্র ধর্ম ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ ব্যাস শুক দূরে থেকে স্তব করে, রাসের সময় সেই কৃষ্ণের গলা ধরে নৃত্য করেছে গোপীরা। অনিমেষ লোচনে পান করেছে তার মুখমাধুর্য।'

উদ্ধব ব্রজে এসেই প্রথমে নন্দ-যশোদার সঙ্গে দেখা করল। উদ্ধব, গোবিন্দ কি আমাদের কথা আর মনে রেখেছে? সে কি আর আসবে না ফিরে? তার অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি কি আর দেখতে পাব না? নন্দ প্রেমগদগদ কণ্ঠে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে লাগল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল বলতে-বলতে। প্রেমরসবিহ্বল হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কাঁদতে লাগল যশোদা। স্নেহের গাঢ়প্রাচুর্যে তার পয়োধর থেকে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল।

উদ্ধব বললে, দেহীদের মধ্যে আপনারা দুজনেই শ্লাঘ্যতম। অখিলগুরু নারায়ণে আপনাদের এই বিগাঢ়মতি। সন্তান-আলম্বন-বিভাব। আপনারা আশ্বস্ত হোন। শীঘ্রই কৃষ্ণ ফিরে আসবে আপনাদের কাছে।

আরো বললে, 'কৃষ্ণের কাছে প্রিয়-অপ্রিয় কিছুই নেই, না বা উত্তম-অধম না বা সমান-অসমান। বাপ মা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-পর দেহ জন্ম-কর্ম কিছু নেই। কাঠের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন অনল তেমনি সকল দেহীর অন্তরেই নিহিত তার নির্মল সত্তা। শুধু ক্রীড়ার জন্যে শুধু সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে সকল যোনিতেই তাঁর আবির্ভাব। কুম্ভকারের ঘূর্ণ্যমান চক্রে চোখ রাখলে মনে হয় সমস্ত ভূমিই বুঝি ঘুরছে, তেমনি অহংদৃষ্টিনিবন্ধ মানুষ ভুল করে ভাবছে আমিই একমাত্র কর্তা, আমিই একমাত্র স্বয়ং-তন্ত্র। তিনি যেমন তোমাদের তেমনি আর সকলেরও। যে, যে ভাবে চায় তাকে তিনি সেই ভাবে দেখা দেন।'

ব্রজদ্বারে হেমময় রথ দেখে গোপীরা বিচলিত হল। এ কি, কৃষ্ণচোর অক্রূর আবার এল নাকি? এবার বুঝি আমাদের দেহ কুড়িয়ে নিয়ে তার মৃত প্রভু কংসের পিণ্ড দেবে?

না, এ অক্রূর নয় তো! আজানুলম্বিত বাহু, কমললোচন, পীতাম্বর, পুষ্করমালী সুন্দর পুরুষ। দেখতে প্রায় কৃষ্ণের মত। এ কোত্থেকে এল বল দেখি?

আমি কৃষ্ণের বার্তাবহ। কৃষ্ণানুচর। বললে উদ্ধব। বসল সুখাসনে।

তখন সকলে তাকে বেষ্টন করে দাঁড়াল। সমুচিত সংবর্ধনা করলে। বললে, তুমি কৃষ্ণের সখা, আমরাও একদিন তার সখী ছিলাম। পিতামাতার প্রতি প্রিয়কাম হয়ে সে তোমাকে পাঠিয়েছে ব্রজপুরে, আমাদের জন্য নয়। বন্ধুদের স্নেহবন্ধন, শুনেছি, মুনিরাও সহজে ছিঁড়তে পারে না। কিন্তু তোমার কৃষ্ণের ব্রজধামে কিছুই আর স্মরণীয় নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের মৈত্রী নিমিত্তমাত্র, যেমন ফুলের প্রতি ভ্রমরের। পাখি যেমন বীতফল বৃক্ষকে ত্যাগ করে, মৃগগণ যেমন দগ্ধ বনকে, তেমনি তোমার কৃষ্ণ আমাদের ত্যাগ করেছে।

একটা অলি উড়ে এসে গুঞ্জন করতে-করতে এক গোপীর পায়ের উপরে বসতে চাইল। গোপী বললে, ধূর্তের বন্ধু, চিনেছি তোমাকে। আর কেন পুরোনো বন্ধুর গান শোনাতে এসেছ আমাদের? তুমি যেমন মধুশেষ ফুল ত্যাগ করো, মধুপতি তেমনি আমাদের ছেড়ে গেছে। তার আপাতমধুর কথায় আমরা ভুলেছিলাম, লক্ষ্মীকে আবার ভুলিয়েছে। লক্ষ্মীর কাছে আমরা কি!

লক্ষ্মী কেন, ত্রিভুবনে এমন কে কন্যা আছে যে সেই কপটসুন্দর সহাস্য মুখের দুষ্প্রাপ্য? তবু জানতাম দীনজনের জন্যেই তার উত্তমশ্লোক নাম। কিন্তু এ তার কেমন ব্যবহার, কেমন রীতিনীতি? কেন বারে-বারে পায়ের উপর বসছ জিগগেস করি। জানি অনেক চাটুবাক্য শিখেছ সেই কপটাচারীর কাছে। যার জন্যে আমরা স্বামী পুত্র গৃহ-কুল এমন কি পরকাল পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি, যে কৃতঘ্ন এ কথাও ভুলতে পারে তার সঙ্গে আবার সন্ধি কি? যে অসিত তার সঙ্গে আবার সখ্য কি? কিন্তু হায়-হায়, তার প্রসঙ্গও যে ছাড়তে পারি না, ভুলতে পারি না। অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন তবু সেই কৃষ্ণসঙ্গমই ধ্যান করি। ব্যাধশরে হরিণীর মত বুক বিদ্ধ হয়ে গেছে তবু সেই ক্ষত দেখেও কঠিন হতে পারি না। বরং সেই কঠিনের প্রতিই কামমোহিত হচ্ছি। হে প্রিয়-প্রেরিত বন্ধু, বৃথা রাগ করছি তোমার উপর, বলো সেই প্রিয়তমের কথা। এই দাসীদের কথা কি ভুলেও একবার সে উচ্চারণ করে? সে কি তার অগুরুবাসিত হাতখানি আমাদের মাথার উপর রাখবে না আর কোনো দিন?'

উদ্ধব বিহ্বল হয়ে পড়ল। বললে, তোমরাই ধন্য, তোমরাই সিদ্ধকাম, তোমরাই লোকপূজ্য। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ। তোমাদের এই বিরহসন্তাপ দেখেই বুঝতে পারছি, ভগবৎ-প্রেমসুখ কি অনির্বচনীয়। তিনি তোমাদের জানাবার জন্যে কী বলে পাঠিয়েছেন জানো? বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে তাঁর আর বিয়োগ নেই। ধ্যানকাম হয়ে সর্বদা তোমাদের মন তাঁতে মগ্ন হয়ে থাকবে, তারই জন্যে তাঁর এই দূরস্থিতি। প্রিয়তম সর্বক্ষণ কাছে থাকলে রমণীদের আকর্ষণে আলস্য আসে, দূরে থাকলেই জাগে তাতে বিহ্বলপ্রাবল্য। তাই সম্পূর্ণ মন আমাকেই আবিষ্ট কর।

থাক, ঢের হয়েছে। শত্রু নাশ করে এখন সে রাজ্যলাভ করেছে, রাজকন্যাও বিয়ে করেছে শুনলাম, এখন আর এ বনচারিণীতে তার রুচি থাকবার কথা নয়। কিন্তু জিগগেস করি আমাদের সে একদিন যেমন করে ভালোবেসেছিল তেমন করে কি বাসে, বাসতে পারে মধুপুরের কামিনীদের? কজ্জল নয়নের স্নিগ্ধ সলজ্জ হাসি দিয়ে অবলোকন দিয়ে তারা কি আমাদের মত পারে তার অর্চনা করতে? বলো আর কি সে আসবে না? তার গাত্রস্পর্শে সুশীতল করবে না, সঞ্জীবিত করবে না আমাদের? জানি, নৈরাশ্যই সুখ, তবু আশা ছাড়তে পারছি কই? গোপীরা আবার শোক করতে লাগল।

'তোমাদের হরিকথাগীতে লোকত্রয় পবিত্র হয়, তোমাদের চরণরেণু বন্দনা করি।' উদ্ধব বলতে লাগল, 'শ্রীহরির নিজ অঙ্গে একান্ত সংলগ্ন লক্ষ্মীর প্রতিও এমন অনুগ্রহ হয়নি। ভদ্রাচারের ধার ধারে না যে বনচারী তারা শুদ্ধ ভালোবাসার জোরেই ঈশ্বরকে লাভ করল। আমি আর কিছু চাই না, বৃন্দাবনে যে সকল গুল্মলতা ও ওষধি এদের পদরেণুস্পর্শে পবিত্র হয়েছে আমি তাদের মধ্যে যে কোনো একটি হতে চাই।'

গোপীদের তাই বললেন শ্রীকৃষ্ণ, তোমাদের ঋণ আমি কোনো কালে শোধ

করতে পারব না। দেবতার আয়ু পেলেও নয়। দুর্জরগৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে আমাতে আত্মার্পণ করেছ, প্রত্যুপকার দ্বারা নয়, তোমাদের প্রীতি দ্বারা আমিই অঋণী হব।

ঠাকুর আবার বলতে শুরু করলেন কৃষ্ণকথা :

'শ্রীকৃষ্ণ যেদিন রাসলীলা করেন সেদিন বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মীও এলেন লীলা দেখতে। যোগমায়া দ্বার রক্ষা করছে, তাকে বললেন, দোর ছাড়, রাসস্থলীতে যাব। যোগমায়া বললে, আগে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদের প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। কি, এত বড় কথা? আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আমি গোয়ালা মেয়েদের পদরজে গড়াগড়ি দেব? যাব না রাসস্থলী। আমি তপস্যা করে ভগবানকে নিয়ে করব রাসলীলা। আজও পর্যন্ত বৃন্দাবনে বিল্ববনে লক্ষ্মী তপস্যা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণ কি তপস্যার জিনিস? গোপীরা সাধন ভজন তপজপ কিছুই জানে না, তাদের একমাত্র সম্বল ভালোবাসা।

'তারপর শিব এল কৈলাস থেকে। যোগমায়া পথ আটকাল। বললে, গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে গোপীদের প্রাপ্ত হও, তার পরে যেতে পাবে রাসস্থলীতে। আশুতোষ ভোলানাথ, অভিমানের লেশমাত্র নেই। তখুনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গোপীদের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগল। গড়াগড়ির ফলে গোপীদেহ লাভ করল ভোলানাথ। নাচতে লাগল গোপীদের সঙ্গে। ললিতা-বিশাখাকে বললে শ্রীমতী; আমাদের শ্বেতাঙ্গ সখী শুধু একজন—অনঙ্গমঞ্জরী। এ নতুন শ্বেতাঙ্গ সখী কোত্থেকে এল? ও মা, তার কপালে যে দপদপ করে আগুন জ্বলছে! কৃষ্ণকে জিগগেস করলে, চেন ওকে? কৃষ্ণ বললে, কৈলাস হতে শিব এসেছে। সকলে পুষ্পাঞ্জলি দাও তাকে। কৃষ্ণ গিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, আপনি এখানে গোপীশ্বর হয়ে বিরাজ করুন। আজও পর্যন্ত তাই রাসস্থলীতে গোপীশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান।'

তার পর লক্ষ্মীকে বললেন ঠাকুর, 'আমার কাছে যা সব শুনলি তোরা দুজনে, খুড়ি-ভাসুরঝিতে মিলে বলাবলি করবি। গরুগুলো দিনের বেলা যা খায় রাত্রে তা জাবর কাটে। বলাবলি করলেই আর ভুলে যাবিনে। মনে গেঁথে থাকবে।'

আবার বললেন, 'আমার দোকানে সব রকম জিনিস পাওয়া যায়। যে যেমন খদ্দের তাকে সেই জিনিসের জোগান দি। শোন আরো কৃষ্ণকথা :

'আয়ান ঘোষ আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল। ঘোরতর তপস্যা করলে। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললে, তোমার লক্ষ্মীকে পেতে চাই, তাকে আমার গৃহিনী করে দাও। ভগবান ভ্যাবাচাকা খেলেন, বললেন, ও ছাড়া অন্য বর নাও। অন্য বর নেব না, লক্ষ্মীই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ভগবান চলে গেলেন। কিন্তু তপস্যা ছাড়ল না ব্রাহ্মণ। দেখি কেমন তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু। ভগবানকে আবার আসতে হল। বললেন, লক্ষ্মী ছাড়া আর যে কোনো বর নাও। ব্রাহ্মণ

বললে, আর সব ছাড়তে পারি লক্ষ্মীছাড়া হতে পারব না। আবার চলে গেলেন ভগবান। ব্রাহ্মণের তপস্যা আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনল। বার-বার তিনবার। তখন অনুপায় হয়ে বর দিলেন। বললেন, বেশ তুমি গয়লার ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে আর লক্ষ্মী তোমার ঘরণী হবে। কিন্তু তুমি ক্লীব হবে, ঘরণীকে স্পর্শও করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হাসল। বললে, তোমার লক্ষ্মী আমার ঘরণী হবে তাতেই আমি খুশি। তাকে আমার স্পর্শ করবার দরকার নেই. আমি তপস্বী, দিবানিশি তপস্যা করব। তথাস্তু। আয়ান ঘোষ খাবার সময় বাড়িতে একবার আসে আর বাকি সময় কেশীঘাটে বসে তপস্যা করে।'

সৎ চিৎ আর আনন্দ। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। মানে ভক্তি। সরস্বতীর কর্মধারা যমুনার জ্ঞানধারা আর গঙ্গার ভক্তিধারা। ঈশ্বরের তাই তিন রূপ। প্রতাপঘন, প্রভাবঘন আর প্রেমঘন। অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রভাব আর অনন্ত প্রেম।

তাই কর্ম জ্ঞান আর প্রেমের সাধনা করো। কর্মে সর্বভূতে হিতকারী জ্ঞানে সর্বভূতে সমদর্শী আর প্রেমে সর্বভূতে প্রীতিমান।

১৪৯

আমার অসুখ কেন হল বলতে পারো ? জিগগেস করলেন ঠাকুর।

তার তিন কারণ। প্রথম কারণ, পাপ গ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বললেন, 'গিরিশের পাপ। আহা, ও যে কষ্টভোগ করতে পারবে না।'

যদি জানতুম তরে যাবো তবে আরো পাপ করে নিতুম। বললে গিরিশ ঘোষ।

'ঠাকুরের কাছে সব শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল, আমিই একমাত্র পাপী, একমাত্র দুরাচার। হেন পাপ নেই যা করিনি। তবু তিনি আমায় নিয়েছিলেন, পথের এক পাশে ফেলে দেননি। কোনোদিন কিছু নিষেধ করেননি আমায়। অহেতুক কৃপার কাছে আমার শুধু অবারিত প্রশ্রয়।'

কত লোক গিরিশের সম্পর্কে নালিশ করতে এসেছে ঠাকুরের কাছে। বলেছে কত বিরুদ্ধ কথা। ঠাকুর বললেন, 'না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না, ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে।'

তোমার কৃপার কাছে আবার পাপ কি। তোমার কৃপার অনলে অঙ্গার হয়ে যাবে সর্বপাপ।

'গিরিশের কথা আলাদা।' বললেন ঠাকুর, 'যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব। নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে আবার রামকেও লাভ করবে।'

'আগেকার দল ছেড়েছে গিরিশ।' বললে নরেন।

'তা ছাড়লে কি হয় ? বাটিতে যদি একবার রসুন গোলা হয় সে গন্ধ কি

আর যায় ? বাবুই গাছে কি আর আম ফলে ?'

'কেন ফলবে না ?' হুমকে উঠল নরেন।

'তা তেমন সিদ্ধাই থাকলে ফলতে পারে।' বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু তেমন সিদ্ধাই কি সকলের হয় ?'

আর কারু না হোক গিরিশের হবে। প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসই গিরিশের একমাত্র সিদ্ধাই।

'কিন্তু যাই বলো গিরিশের খুব বিশ্বাস।' উজ্জ্বল চোখে ঠাকুর বললেন। "সত্যি এমনটি আর কোথাও দেখেছিস ?'

ঠাকুর একদিন কি উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন গিরিশকে। গিরিশ লাফিয়ে উঠল, 'আপনার কাছে এসেও আমাকে উপদেশ শুনতে হবে ? উপদেশ তো আমিও অনেক দিতে পারি। অনেক লিখেওছি বইতে। কেন আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি আমায় কিছু করে দিতে পারেন তো তাই করুন। উপদেশ তুলে রাখুন কুলুঙ্গিতে।'

রামলালকে একটা শ্লোক আবৃত্তি করতে বললেন ঠাকুর। রামলাল আবৃত্তি করলে।

তার মানে ? তার মানে বিশ্বাসই হচ্ছে পদার্থ।

পার্বতী মহাদেবকে জিগগেস করলেন, 'ঈশ্বরলাভের খেই কোথায় ?

মহাদেব বললেন, 'বিশ্বাসই এর খেই।'

'তাই বলুন।' গিরিশ বললে উল্লসিত হয়ে, 'আপনার দেখা পেয়েছি এর পর আবার কি চাই ? এখন বলুন, এত দিন যা করছি তাই এখনো করে যাব ?'

'তাই করে যাও। তোমার কিছুই ছাড়তে হবে না।'

যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, স্তব্ধীভূত অপ্রগল্‌ভ বিশ্বাস, তা হলে পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক, কিছুতে ভয় নেই।

'বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞানও তত বাড়বে।' বললেন ঠাকুর। তাঁর নামে বিশ্বাস করলে তীর্থেরও প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণকিশোর বলত, ওঁ রাম ওঁ কৃষ্ণ নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। বলত, বোলো না কাউকে, আমার সন্ধ্যাটন্ধ্যা ভালো লাগে না। ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পুজো-সন্ধ্যা সে কি চায় ? সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়। ভক্তির যেমন তমঃ তেমনি বিশ্বাসের তমঃ আনো। রাম বলেছি কালী বলেছি, আমার আবার বন্ধন আমার আবার কর্মফল! একশোবার যদি পাপী-পাপী বলো, পাপীই হয়ে যেতে হয়। আমি মা বলে ডেকেছি আমার আবার পাপ কি ? ঈশ্বরের নামস্পর্শেই জিহ্বা পবিত্র হয়েছে, দেহ-মন পবিত্র হয়েছে।'

গিরিশের সেই বিশ্বাসের তমঃ।

'কিন্তু এত হৈ-চৈ গালাগাল মুখখারাপ করে কেন ?' কৌতুকস্বরে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

শুধু তোমার কৃপা আস্বাদন করার জন্যে। কর্দমের বদলেও কুঙ্কুম লাভ করা

যায়, তা প্রমাণ করার জন্যে।

'মদ খেয়ে কত গালাগাল দিয়েছি, কত অপমান করেছি।' বলছে গিরিশ, 'কখনো যদি স্নেহভরে বলেছেন পা টিপে দিতে ভেবেছি এ কি আপদ! মানিনি ধরিনি গ্রাহ্য করিনি। তবু টেনে তুলে নিলেন, শুধু তাই নয়, নমস্কার করলেন।'

ঠাকুর বললেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? কখনো না, ব্রহ্মজ্ঞান আনি। তিনিই সব হয়েছেন, সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই তখন মাতৃযোনি। তখন বেশ্যা আর সতী-লক্ষ্মীতে তফাত দেখি না।'

রাত্রে এসেছে গিরিশ। ঠাকুরের ঘুম নেই, বসে আছেন বিছানায়।

ওরে আলোটা আন। গিরিশকে একটিবার দেখি।

মাস্টার আলো এনে ধরল।

'ভালো আছ?' কণ্ঠে অপার স্নেহ ঢেলে জিগগেস করলেন গিরিশকে।

গিরিশ বুঝি খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কোন্ ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে আসছে তার ঠিক কি! ব্যস্ত হয়ে বললেন লাটুকে, 'ওরে লেটো, এঁকে তামাক খাওয়া। পান এনে দে।'

লাটু ছুটল তামাকের যোগাড়ে। ওরে পান কই? সাজা পান নিয়ে আয়।

পান-তামাক দিল এনে গিরিশকে। শুধু এতে কি হবে? ঠাকুর আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ওরে জলখাবার এনে দে।

লাটু বললে, আনতে গেছে জলখাবার।

যার তার দোকান থেকে আনিসনি যেন। বরানগরে যেতে বল। ফাগুর দোকান থেকে যেন কচুরি নিয়ে আসে। কচুরি হচ্ছে রজোগুণের। তাই খাবে আজ গিরিশ। শুধু কচুরি নয় লুচি-মিষ্টিও এসেছে ফাগুর দোকান থেকে। প্রকাণ্ড একটা থালায় সাজিয়ে সমস্ত খাবার প্রথম ধরল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর প্রসাদ করে দিলেন। সমস্ত খাবার নিজের হাতে তুলে দিলেন গিরিশের হাতে। গিরিশ খাচ্ছে আর ভাবছে, এ কী খাচ্ছি! ফাগুর দোকানের কচুরি না কি অপ্লব অমৃত-উদধি! জল? জল দিতে হবে না গিরিশকে? বৈশাখের রাত, কী গরম পড়েছে কদিন থেকে। ঘরের কোণে জলের কুঁজো। দাঁড়াবার শক্তি নেই তবু উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দেবেন গিরিশকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন, এবার পিপাসামোচন করবেন। উঠে দাঁড়ালেন। দিগম্বর। একটি সকললোকসুন্দর বালক মূর্তি। সকলে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। নিজের হাতে জল গড়াচ্ছেন ঠাকুর। হাতে একটু ঢেলে দেখলেন যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিনা। বোধহয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা নয়। না হোক, এখন আর এর চেয়ে ভালো জল কোথায় মিলবে! নাও এই জলই নাও। নাও আমার হাত থেকে।

তোমার হাত থেকে যখন নিয়েছি তখন এ জল সর্বতাপশোষণ শীলতা। হোক বা তা অশ্রুজল, যখন তোমার হাত থেকে নিয়েছি তখন এতেই অত্যন্তনিবৃত্তি শান্তি।

কী দেব তোমাকে এই জলের পরিবর্তে? শুধু অশ্রুজল—অশ্রুজল ছাড়া

আমার কী আছে ? আকাশ বিগতাভ্র হল। পথ সমতল হল কুশকণ্টকরহিত হল। উৎপথগামী হল বুঝি সৎপথগামী। তুমি একাধারে প্রণম্য ও প্রিয়। আমার প্রাণের প্রণাম নাও। নাও আমার গভীর প্রিয়সম্ভাষণ।

গিরিশ বললে, 'শুধু প্রণতিপরায়ণ হও। নিয়ত নমো-নমো করাই প্রকৃত যোগসাধন।'

কে একজন ভক্ত ক-গাছা ফুলের মালা এনে দিল ঠাকুরকে। একে-একে সবগুলি ঠাকুর গলায় পরলেন। এ কি আমি পরলাম ? আমার হৃদয়মধ্যে যে হরি আছেন তাঁকে পরিয়ে দিলাম।

দু-গাছি মালা আবার তুলে নিলেন গলা থেকে। নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন গিরিশকে।

এ কি শুধু কৃপা ; এ পূজাও ? আমি যে তোমার মাঝে দেখলাম সেই ভৈরবকে। এক হাতে সুধা আরেক হাতে সুরা। এক হাতে বিষসর্প আরেক হাতে অভয় কবচ।

তুমিই সেই বিরূপাক্ষ, বিষমলোচন। নিরাভাস নিরাময়, নিঃসংশয় নিরঞ্জন। তোমার গঙ্গা তোমার গদ্যপদ্যময়ী বাণী, তোমার চৈতন্যলীলা বিল্বমঙ্গল।

খুব মদ খেয়ে এসেছে গিরীশ। কাঁদছে অঝোরধারে। ঠাকুরের পায়ের উপর মাথা ঢেলে দিয়ে কাঁদছে।

ঠাকুর তার পিঠের উপর হাত রাখলেন। গিরিশও মাথা তোলে না, ঠাকুরও হাত সরান না। এক দিকে সমস্ত ঢেলে দেওয়া, আরেক দিকে সমস্ত তুলে নেওয়া।

'ওরে একে তামাক খাওয়া।' ঠাকুর হাঁক দিয়ে বললেন এক ভক্তকে।

প্রত্যাখ্যান তো নয়ই, আপ্যায়ন। গিরিশ মাথা তুলল। হাত জোড় করে দাঁড়াল স্থির হয়ে। বললে, 'প্রভু তুমিই পরব্রহ্ম। তুমিই চরাচর ও চিরন্তন। তুমিই ভুবনাকার বৃক্ষ, তুমিই এর মূল, তুমিই এর শাখা-পল্লব।'

ঠাকুর শুনেও শুনছেন না।

'তুমিই পরশুপাণি মহাদেব। রাজীবলোচন রাম। লোকপিতামহ ব্রহ্ম। পুণ্য-পরিপূর্ণ পাবনপুরুষ নারায়ণ।'

কথাও কানেও তুলছেন না ঠাকুর। বলছেন হাঁক দিয়ে, 'ওরে, এর জন্যে তামাক আন।' আবেশে গলার স্বর বিহ্বল হয়ে এল গিরিশের। 'বড় দুঃখ রইল মনে প্রাণ ভরে তোমার সেবা করতে পেলুম না। বর দাও ভগবান, এক বছর, শুধু একটি বছর তোমার সেবা করব। মুক্তিফুক্তি কিছু চাই না, শুধু সেবা, শুধু গুরুশুশ্রূষা'—ঠাকুর তাকালেন চোখ তুলে। যেন জনান্তিকে বললেন, 'ওরে এখানকার লোক ভালো নয়। কেউ আবার কিছু বলবে। বর-টর চলে না এখানে। 'ও সব কথা আমি শুনব না। বলো রাখবে কিনা প্রার্থনা।' গিরিশ এগিয়ে এল দৃঢ় পায়ে। 'বলো। অন্তত আ'র এক বছর। সেবা করব, দেহ ঢেলে প্রাণ ঢেলে' —'আচ্ছা হবে' খন।' ঠাকুর পাশ কাটাতে চাইলেন। 'যখন তোর বাড়িতে যাব

তখন করিস।'

'না, আমার বাড়িতে নয়। এইখানে। তুমি যেখানে বসছ-শুচ্ছ সেইখানে। আমার বাড়ি কী আবার একটা জায়গা?'

অনমনীয় জেদ গিরিশের। কারুণ্যবশংবদ ঠাকুর হার মানলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তাই। কিন্তু সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

আরো এক পা এগিয়ে এল মাতাল। বললে, 'তোমার অসুখ আমি ভালো করে দেব।'

'সে কি রে, তুই ভালো করে দিবি?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে ওষুধ আছে।'

'ওষুধ?'

'হ্যাঁ, মন্ত্র। তোমাকে শুধু মুখে একবার উচ্চারণ করতে হবে। তা হলেই ব্যাধি মুক্তি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'সে আবার কি মন্ত্র?'

'শুধু মুখে একবার বলবে, আমার এই অসুখ আরাম হয়ে যাক। ব্যস, তাহলেই হল।' গিরিশ লাফিয়ে উঠল: 'তাহলেই উড়ে যাবে এক ফুঁয়ে।'

'ও আমি পারব না।'

'পারতেই হবে। বেশ, না পারো তো, আমিই ঝেড়ে দেব। আমি জানি কি করে ঝাড়তে হয় রোগের ভূত। কালী, মহাকালী।' বলে ঠাকুরের গা-সই করে শূন্যের উপর দিয়ে হাত চালাল গিরিশ। তার পর কটা ফুঁ দিল। 'ফু'। ফু'!'

'ওরে এতে আমার লাগবে।' ঠাকুর সংকুচিত হলেন।

লাগুক গে। তুমি ভালো হয়ে গেলে আর লাগবে না। আপনমনে হাত চালাতে-চালাতে বলতে লাগল গিরিশ, 'যা যা, ভালো হয়ে যা। ভালো হয়ে যা। যদি ও-পায়ে আমার কিছু ভক্তি থাকে, তবে ভালো হয়ে যা। বলো, গেছে, ভালো হয়ে গেছে।'

এ এক আচ্ছা মাতালের পাল্লায় পড়া গেছে! ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বলেন, 'যা বাপু, ওসব আমি বলতে পারি না।'

'কাকে বলতে পারো না?'

'মাকে।'

'মা আবার কে। তুমিই মা। তুমিই সব। আমার যদি ও-পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, বলো, আছে কিনা ভক্তি, তাহলে বলতেই হবে তোমাকে—'

'আচ্ছা, যা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।'

'বলো, তোমার ইচ্ছায়।'

'ছিঃ ও কথা বলতে নেই।' কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর। 'আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় চলেছি। আমি সেই মহান প্রভুর দাস, সেই মহান গুরুর সেবক।'

'কেন অত কথা বাড়াও?' গিরিশ অস্থির হয়ে উঠল। 'ছোট্ট সোজা কথা, সেটুকু বলে ফেললেই তো চুকে যায়। তুমি কি বা কে, সে কথা পরে হবে'খন।

এখন শুধু বলো, ভালো হয়ে যাবে। ভালো হয়ে যাবে।'

কি একগুঁয়ে নাছোড়বান্দার হাতেই পড়েছি! শেষ পর্যন্ত হার মানলেন ঠাকুর। বললেন, 'আচ্ছা, যা। যা হয়েছে তা যাবে।'

যা বললেই কি যাওয়া যায়?

কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। গাড়োয়ান ডাকাডাকি করছে।

বড় বেআক্কেল তো এই গাড়োয়ান! গিরিশ উঠে দাঁড়াল। রোক করে চলল বাইরে, গাড়োয়ানকে শায়েস্তা করতে।

কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এল। করজোড়ে বললে, 'আমায় ভুলো না।'

ওদিকে গাড়োয়ানও ভুলছে না। আবার শুরু করেছে হাঁকডাক।

বেগে বেরিয়ে গেল গিরিশ।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে মাস্টারকে বললেন, 'দেখ, দেখ, কোথায় যায়! গাড়োয়ানকে মারধোর করে না যেন।' মাস্টার গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এই গিরিশকেই গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ দিলেন ঠাকুর।

বুড়ো গোপালের শখ হয়েছে সাধুদের গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা দেয়। সাধু কোথায়? গঙ্গাসাগরে যাবার জন্য দেশ-বিদেশের বহু সাধু জমায়েত হয়েছে কলকাতায়, তাদের থেকেই বাছাই করব। বিশ্রুত-বিখ্যাত সাধু।

ঠাকুর শুনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বলিহারি তোকে গোপাল, তুই সাধু খুঁজতে গঙ্গাসাগর গেলি?

গোপাল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'ভুললি জটা দেখে, দাড়ি দেখে, ত্রিশূল-চিমটে দেখে? চোখের সামনে জ্বলছে যে দ্বাদশ আদিত্য তা তোর চোখে পড়ল না? সেই যে কথায় বলে না ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়োতে বনে যায়—তোর দেখি সেই দশা।'

দ্বাদশ আদিত্য!

হ্যাঁ, আমার ভক্ত ছোকরার দল তোর ও-সব বাজারে সাধুর চাইতে ঢের-ঢের খাঁটি। যা বারোখানা গেরুয়া কাপড় আর বারোটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে আয়। আমিই বিতরণ করে যাই। অভিষেক করে যাই আমার রাজকুমারদের।'

তথাস্তু। বুড়ো গোপাল কিনে নিয়ে এল বস্ত্র-মালা। হিসেব তো মোটে এগারোজন হয়। নরেন রাখাল তারক বাবুরাম শরৎ যোগীন নিরঞ্জন কালী হরি লাটু আর বুড়ো গোপাল নিজে। বারো নম্বরের কোন জন? এক-এক করে এগারোজনকে বিতরণ করা হল। আরেকজন? সেই আরেকজনই গিরিশ। গিরিশ? সে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের অধিকারী?

'হ্যাঁ, এই কাপড় আর মালা তুলে রাখো তার জন্যে। সে এলে তাকে দিয়ো।' বললেন ঠাকুর, 'কিংবা কেউ গিয়ে দিয়ে এস তার বাড়িতে।'

সবাই অবাক। সে তো মশাই পাপী, অপবিত্র।

তার জ্বলন্তপাবক বিশ্বাস। প্রচণ্ডতরঙ্গ ভক্তি। সেই বিশ্বাস-ভক্তিই তার পবিত্রতা তার দেহে-মনে জাগ্রত আনন্দ। এই আনন্দেই তার পাপক্ষয়।

গিরিশ বললে, 'ভগবান, আমাকে পবিত্রতা দাও।'

'তুমি পবিত্র তো আছ।' ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'তোমার যে বিশ্বাস-ভক্তি। তোমার যে আনন্দ-নিবাস।'

অভেদদর্শনই জ্ঞান, মনের বিষয়শূন্যতাই ধ্যান, মনের অশুদ্ধিত্যাগই স্নান আর ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ।

কিন্তু গিরিশ যে ঘোরতর গৃহী। ও তো গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হবে না, মান রাখবে না রুদ্রাক্ষের।

গৃহই তো ঈশ্বরসাধনার নবতম পীঠস্থান। আর বৈরাগ্যই তো মনে। আর মনোমালাই তো জপমালা।

১৫০

ঠাকুরের ব্যাধির দ্বিতীয় কারণ, ভক্তসেবকদের তাঁর চার পাশে একত্র করা, একসূত্রে গেঁথে নেওয়া, একসঙ্গে সংহত করা।

সূত্রটি কি? সূত্রটি সেবা।

সঙ্ঘটি কিসের? ভগবানের কাজে আত্মোৎসর্গের।

'ওরে আমাদের সেবা নেবেন, তাই তিনি এমন অসুখ করেছেন।' বললে নরেন। 'আর কিছু নয়, শুধু সেবা লাগিয়ে দে। সেবাই আমাদের পুজো, সেবাই আমাদের উপাসনা।'

এই কষ্টের মধ্য থেকে আনন্দের মধ্য থেকে চরমতম দীক্ষা নে। এখন ভগবানের সেবা করছিস, পরে জগৎজনের সেবা করবি। জগজ্জনের সেবাই ভগবানের সেবা। 'আপনাদের সব সময়েই তো তাঁর সেবা করতেই দেখি, উপাসনা করেন কখন?' কৌতূহলী কে একজন জিগগেস করলে।

উত্তর দিলে লাটু। যে বলে, 'হামনে ঠাকুরের মেথর আছে।' বললে, 'তাই আমাদের আবার উপাসনা কি? তাঁর যে সেবা করতে পারচি এই আমাদের উপাসনা।'

উপাসনা কাকে বলে? অমুক দিকে মুখ করে অমনি ভাবে বসো, চোখ বোজো, অমনি করে নিশ্বাস ফেল, অতগুলো মন্তর বলো—এই কি উপাসনা? ঠাকুর বললেন, উপাসনার সময় ভাববে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তুমি তাঁকে নাওয়াচ্ছ খাওয়াচ্ছ সাজাচ্ছ-গোছাচ্ছ, হৃদয়ে এনে বসাচ্ছ, করছ কত সুখ-দুঃখের আলাপন। আমরা যে এই প্রত্যক্ষভূতকে সেবা করছি এই আমাদের উপাসনা।

যোগীনের অসুখ করেছে।

'আমি আগেই জানি। আমার সেবার ত্রুটি হবে বলে নিজের শরীরের যত্ন নিত না এতটুকু। ওরে তা কি হয়?' ঠাকুরের স্বরে করুণার সঙ্গে কাতরতা ফুটে উঠল।

'তোদের শরীর যদি ভেঙে পড়ে আমার তবে যত্ন করবে কে ? কথা শোন বাপু, ঠিক সময়ে সব খাওয়া দাওয়া কর, ঘুমুতে যা।'

শশী বসে-বসে পাখার হাওয়া করছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে যায়, তবু ওঠবার নাম নেই। তার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিলেন ঠাকুর। বললেন, 'ওগো যাও, নেয়ে-খেয়ে নাও। আমি এখন দিব্যি ভালো আছি। খেয়ে-দেয়ে না হয় আবার বোসো।'

ওরে গোপাল কোথায়, বুড়ো গোপাল ? আমার যে এখন ওষুধ খাবার সময়। আর সেই যে আমাকে ওষুধ খাওয়ায়।

বুড়ো গোপাল ঘুমুচ্ছে। কে এসে বললে ঠাকুরকে।

'আহা ঘুমোক।' চিদঘনলীলাবিগ্রহ ঠাকুর আনন্দ করে উঠলেন : 'কত রাত জেগেছে, কত কষ্ট করছে আমার জন্যে। ওকে তোমরা জাগিও না, ঘুমুতে দাও চোখ ভরে।'

ঠাকুরের যেই আমলকী খাবার সাধ হল, বেরিয়ে পড়ল দুর্গাচরণ। স্বর্গ-মর্ত মন্থন করে তিনদিন পরে সে আমলকী নিয়ে এল। এই তিনদিন আর নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। কোথায় আমলকী। কিন্তু ঠাকুর যখন খেতে চেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই অকাল-ফলোদয় হবে।

হলও তাই। কোত্থেকে কে জানে টাটকা আমলকী নিয়ে এল দুর্গাচরণ।

তার রুক্ষ-শ্রান্ত চেহারা দেখে মমতায় উথলে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'আগে স্নান করো, কিছু খেয়ে নাও।'

ভাতের থালা সামনে, বসে আছে চুপ করে। 'কি, খাচ্ছেন না কেন ?'

'আজ একাদশী।'

তিনদিন অভুক্ত তারপর আজ আবার উপবাস ! কিন্তু দুর্গাচরণকে টলায় এমন কারো সাধ্য নেই।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে কেউ গিয়ে ভাতের পাতাটা এখানে নিয়ে আয়।'

শশী নিয়ে এল ভাতের থালা। ঠাকুর তার থেকে এক কণা তুলে মুখে দিলেন। আর যায় কোথা। হোকগে একাদশী, কিন্তু যখন অন্ন প্রসাদ হয়ে গেছে তখন আর ভাবনা কি। নিয়ে এস।

শুধু ভাত-ডাল নয়, পাতাসুদ্ধ খেয়ে ফেলল দুর্গাচরণ।

ঠাকুর তাকে বলে দিলেন, 'তুমি গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় পেলে গৃহীরা ঠিক-ঠিক বুঝবে গৃহস্থের ধর্ম কি।'

আহা, কি সুন্দর গৃহই দিয়েছে প্রভু ! চারখানা ঘর, তার মধ্যে তিনখানারই ছাদ ফুটো। সেবার অঢেল বর্ষা নেমেছে, যে ঘরখানা নিটুট সে ঘরেই সস্ত্রীক থাকে দুর্গাচরণ। হঠাৎ দুজন অতিথি এসে উপস্থিত। খাওয়ানো না হয় হল কিন্তু রাত্রে শুতে দিই কোথায় ? এদিকে যে অবিচ্ছেদ বৃষ্টি।

স্ত্রী একবার তাকাল স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ বললে, 'যে ঘরখানা আমাদের তাই ওদেরকে ছেড়ে দেব। আজ তো

আমাদের মহা ভাগ্য। অতিথি-নারায়ণের সেবায় আমাদের ঘুম ও আরাম উৎসর্গ করতে পারছি।'

অতিথিদের ভালো ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে দুর্গাচরণ আর তার স্ত্রী ভাঙাঘরে গিয়ে বসল। চতুর্দিক দিয়ে জল পড়ছে। কোথাও এতটুকু শুকনো নেই, কোণটুকু পর্যন্ত নয়। সেই জলকে মাথা পেতে নিয়ে দুজনে বসল পাশাপাশি। ভয় কি। মুক্ত কণ্ঠে শুরু করে দিল শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম।

সেই নামই তো আনন্দাম্বুধিবর্ধন। সেই নামের কাছে দান ব্রত তপ তীর্থ কিছু নয়। সেই নামই সংসার-ব্যাধিভেষজ, সেই প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়।

হে ভগবান, নামব্যাপারে আমাকে কৃপণ করো। কৃপণ যেমন নানা জায়গা থেকে ধন সংগ্রহ করে, ধনের মনোহারিতা ও বহুমূল্যতা বিচার করে আর সর্বক্ষণ ধনের রক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করে, তেমনি তোমার নাম আমার সঞ্চয়ের, বিচারের ও চিন্তনের বিষয়ীভূত করো। হে ভুবনমঙ্গল, দিব্যনামধেয়, তোমার নামামৃত-সিন্ধুর লহরীকল্লোলে নিত্য আমাকে নিমজ্জিত করো, আমি যেন গলদশ্রুনেত্র ও অবশ হয়ে থাকি। হে বৈদগ্ধিসারসর্বস্ব মূর্ত লীলেশ্বর, আমার রসনায় তোমার বাসা হোক।

দুর্গাচরণের স্ত্রী ঘর ছাওয়াবার জন্যে ঘরামি লাগিয়েছে।

দুর্গাচরণ বাড়ি এসে দেখল চালের উপর ঘরামি। অমনি হায়-হায় করে উঠল। ওরে, নেমে আয় শিগগির, নেমে আয়। আমি যে এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না।

কি দৃশ্য ?

'আমার সুখের জন্যে অন্য লোকে খাটবে, এ যে আমার কাছে অসহ্য! এ আমাকে ঠাকুর কী গৃহস্থাশ্রমে থাকতে বললেন!' দুর্গাচরণ রোল তুলে কাঁদতে লাগল। 'ওরে নেমে আয়, যদি পারি নিজে ঘর ছাইব, নইলে ভিজব বসে বৃষ্টিতে। আমার জন্যে তুই খাটতে যাবি কেন ?'

ঘরামি তো হতভম্ব।

কপালে করাঘাত করতে লাগল দুর্গাচরণ। ওরে নেমে আয়। নেমে আয় বলছি। কি আর করে, নেমে এল ঘরামি। পাখা নিয়ে দুর্গাচরণ তাকে হাওয়া করতে লাগল। নিজে বসে তাকে তামাক সেজে দিল। চুকিয়ে দিল সমস্ত দিনের মজুরি।

পেটে শূলব্যথা, ঘরে পড়ে আছে দুর্গাচরণ, অথিতি এসে হাজির। দু-একজন নয়, আট-দশজন। বাজারে বেরোতে হয়, নইলে অতিথিসৎকার হয় কি করে? ব্যথা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আট-দশজনের বাজার, তা ছাড়া ঘরে চাল নেই, চাল কিনতে হল, সব মিলে প্রকাণ্ড একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। একটা মুটে ডাকলেই তো হয়। সর্বনাশ। নিজের বোঝা অন্যকে দিয়ে বওয়াব ? কখনো না। মুটে না ডেকে নিজেই সে মোট মাথায় তুলল দুর্গাচরণ। কিন্তু কত দূর যাবে ? পেটে নিদারুণ যন্ত্রণা। পড়ে গেল চলতে চলতে। পড়ে-পড়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'খুব তো সংসারাশ্রম করতে বলে গেছ। কিন্তু অতিথি-

নারায়ণের সেবা করতে দিচ্ছ কই ?'

ব্যথার উপশম হলে মোট মাথায় নিয়ে ফের চলতে লাগল দুর্গাচরণ। বাড়ি পৌঁছে আবার কান্না : 'আপনাদের কাছে অপরাধী হয়ে রইলাম। কত দেরি হয়ে গেল আপনাদের সেবা করতে।'

'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সে-ই বীরভক্ত। যে সংসার ত্যাগ করেছে, সে ঈশ্বরকে ডাকবে তার মধ্যে বাহাদুরি কি ?' বললেন ঠাকুর। 'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে সে-ই বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে গহ্বরে কি আছে। সে-ই বাহাদুর, সে-ই বীরপুরুষ।'

সংসারী লোকের এই বেলা বিশ্বাস তো ঐ বেলা সংশয়। এই বেল আশা তো ঐ বেলা নৈষ্ফল্য। এই বেলা স্বীকার তো ঐ বেলা প্রত্যাখ্যান। অস্তি-নাস্তির মধ্যে দুলছে অহরহ। কত দুঃখে ক্লান্ত, কত অপমানে বিশীর্ণ, কত অবিশ্বাসে কলুষিত। কত তার বাধার কণ্টক-ক্লেশ কত তার বুদ্ধির বৈগুণ্য। পিছনে সর্বসময়ে তার অপ্রতিবিধেয় নিয়তি। তন্তুবন্ধ শকুনির ন্যায় সে পরাধীন। তবু তারি মধ্যে বিনির্মল মুহূর্ত খুঁজে বসছে প্রশান্ত হয়ে, নিজের হৃদয়ের গভীরে ডুবে গিয়ে খুঁজছে সেই হৃদয়নিহিতকে। এত বাধাতেও যে হটে না, এত জ্বরেও যে জ্বলে না, সে বীর নয় তো আর বীর কে ?

'সংসারচারিণী সেই পতিব্রতার গল্প জানো না ?'

এক তপস্বী গিয়েছিল এক পতিব্রতার বাড়িতে ভিক্ষে করতে। গিয়েছিল অসময়ে। পতিব্রতার স্বামী তখন ঘরে ফিরেছে, পতিব্রতা তার সেবায় ব্যস্ত। আগে জল দিয়ে নিজের হাতে পা ধুয়ে দেবে, মাথার চুল দিয়ে পুঁছে দেবে, তারপর খেতে দেবে, খাওয়ার সময় পাশে বসে হাওয়া করবে। একটু দাঁড়াতে হবে তপস্বীমশাই। তপস্বী তো রেগে টং। এতদূর স্পর্ধা, এক ডাকে ভিক্ষে দিচ্ছে না ? আমি একবার রোষদৃষ্টিতে তাকালে কাক-বক ভস্ম হয়ে যায়, এ কি জানে না ঐ গৃহস্থ-স্ত্রী ? চেঁচিয়ে হাঁক দিল তপস্বী, দেরি কোরো না বলছি, শিগগির ভিক্ষে দাও, নইলে এমন চোখে তাকাব ভস্ম হয়ে যাবে। পতিব্রতা হাসল, বললে, আমাকে তোমার কাকী-বকী পাওনি, আমি পতিব্রতা। আমার আগে পতি, পরে অতিথি। আমি সংসারব্রতিনী। তপস্বী রোষপুরুষে চোখে তাকাল। কিচ্ছু হল না।

বলরাম বোস দুর্গাচরণকে বললে, পুরী চলো। তোমার যা খরচ লাগে আমি দেব।

দুর্গাচরণ বললে, 'ঠাকুর বলে গেছেন ঘরে থাকতে। তাঁর কথা এক চুল লঙ্ঘন করি আমার সে সাধ্য নেই। ঘরে থাকা মানেই তাঁকে ধরে থাকা।'

স্বয়ং বিবেকানন্দ বলে পাঠালেন : 'আপনি মঠে এসে থাকুন।'

সেখানেও দুর্গাচরণের সেই এক উত্তর : 'ঠাকুর যে আমাকে ঘরে থাকতেই বলে গেছেন। তাঁর আজ্ঞার লঙ্ঘন করি কি করে ?'

শীতবস্ত্র নেই, গিরিশ ঘোষ একখানা কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছে দুর্গাচরণকে।

দেবেন মজুমদার স্বয়ং বয়ে এনে দিয়ে গিয়েছে। নিয়েছে দুর্গাচরণ। গিরিশ ঘোষ জানত পরের থেকে কোনো জিনিসই সে গ্রহণ করে না, তাই এই জিজ্ঞাসা। নিয়েছে, মাথায় করে নিয়েছে। শুনে আশ্বস্ত হল গিরিশ।

কিন্তু ঐ মাথায় করে নেওয়াই। কদিন পর গিরিশের কানে এল, কম্বল দুর্গাচরণ গায়ে দেয়নি, সেই মাথায় করেই রেখেছে। খোঁজ নিতে পাঠাল দেবেনকে। তুমি একবার গিয়ে দেখে এস তো।

দেবেন মজুমদার দেখে এল। কি দেখে এলে? দেখে এলুম কম্বল মাথায় করে বসে আছেন নাগমশাই।

জেলে মাছ বেচতে এসেছে। কই, মাগুর, সিঙ্গি। কাছেই এই পুকুরের মাছ মশাই, জ্যান্ত, দেখুন লাফাচ্ছে চুপড়িতে। লাফাচ্ছে না ছটফট করছে? সমস্ত মাছগুলি কিনল দুর্গাচরণ। আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মাছগুলি পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এল। জেলে তো থ! দাম আর চুপড়ি যেই ফিরে পেল অমনি ছুট দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ভাত-ডালের পিণ্ড হাতে নিয়ে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়াল দুর্গাচরণ। পোষা কটি মাছ আছে তাদের নাম ধরে ডাকে। জলের কোন গভীর স্তর থেকে উঠে আসে মাছগুলি। জলের মধ্যে খাবার ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে না, দুর্গাচরণ জলের ধারেই বসে পড়ে, জলে হাত ডুবিয়ে রাখে, হাতের থেকেই মাছগুলি খাবার তুলে নেয়। উঠোনে বসে তামাক খাচ্ছে দুর্গাচরণ, দুটো বুনো শালিক উড়ে এসে বসেছে তার পাশটিতে। প্রথমটা খেয়াল করেনি, পাখি দুটো শেষে তার পা ঠোকরাতে লাগল। এসেছিস মা? তাদের গায়ে দুর্গাচরণ হাত বুলুতে লাগল। দাঁড়া, তোদের খাবার দি, জল দি, চাল নিয়ে এসে হাতে করে খাওয়াতে লাগল তাদের, বাটি করে জল দিল। খেয়েছিস, পেট ভরেছে? এবার যা, বনে গিয়ে খেলা কর। কাল আবার আসিস। পা ঠুকরে তন্দ্রা ভাঙাস।

এই যে তোদের খেলা আমার সঙ্গে এই তো আমার ঠাকুরের খেলা।

একটা গোখরো সাপ বেরিয়েছে উঠোনে। মারো, মারো। সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল। শুধু দুর্গাচরণ নির্বিচল। বললে, 'বনের সাপে খায় না মনের সাপে খায়। যদি ওর অনিষ্ট ইচ্ছা না করো ও-ও করবে না কিছু অনিষ্ট। যেমন ব্যবহার তেমন ব্যবহার। যেমন দেবে তেমনি পাবে।'

নাগরাজ! নাগরাজ! সাপকে ডাকতে লাগল, দুর্গাচরণ।

'আসুন আমার সঙ্গে। জঙ্গলে থাকেন, কেন এই ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে পদার্পণ করেছেন? এখানে কে বোঝে আপনার মর্যাদা?'

তুড়ি দিতে-দিতে দুর্গাচরণ চলতে লাগল আগে-আগে আর বিষধর সাপ তার অনুগমন করতে লাগল নতশিরে। গৃহাঙ্গন ছেড়ে চলে গেল জঙ্গলে।

নিজেও মাঝে-মাঝে ফণাধারী ভুজঙ্গ সেজেছে।

দুর্গাচরণের কাছে কে একজন ঠাকুরকে নিন্দে করছে। দুর্গাচরণ প্রথমে তাকে বিনয় করে বললে, থামুন, ও সব মিথ্যে কথা।

নিন্দুকের রসনা আরো লেলিহান হয়ে উঠল। মিথ্যে কথা ? আরো সে কুৎসা-বর্ষণ করতে লাগল।

'এ বাড়িতে বসে এ সব নিন্দাবাদ করতে পারবেন না বলছি। এই কানে শুনতে পারব না গুরুনিন্দা।' দুর্গাচরণ হুমকে উঠল।

গালাগালেরও একটা নেশা আছে। তাই তখন পেয়ে বসেছে লোকটাকে। সে নিরস্ত হল না।

'বেরোও, বেরোও তুমি এখান থেকে। নইলে মহা বিভ্রাট হবে বলে দিচ্ছি।'

কে কার কথা শোনে! লোকটার মাথায় তখন ভূত চেপে বসেছে। গলার স্বর সে শেষ পর্দায় তুললে।

'তবে রে—' সেই লোকটার পায়ের জুতো কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পিটতে লাগল দুর্গাচরণ। 'বেরোও, বেরোও এখান থেকে!'

চলে যেতে যেতে লোকটা বললে, 'আচ্ছা দেখে নেব তুমি কেমনতরো সাধু। পাবে এর প্রতিফল।'

দুর্গাচরণ ঘন-ঘন ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগল। ঠাকুর, 'কেন, কেন তুমি আমাকে গৃহস্থ হতে বললে? তারই জন্যে তো এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা। শুনতে হয় তোমার নিন্দা, করতে হয় তার প্রতিকার। তারপর আবার প্রতীক্ষা করতে হয় দোর্দণ্ড প্রতিফল।

মুহূর্তে কি ভোজবাজি হয়ে গেল নাকি? সেই লোকটা দেখি ফিরে আসছে। লাঠিসোটা নিয়ে নয় দুটি হাত জোড় করে। দুর্গাচরণের কাছে বসে দীন বচনে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! আনন্দে লাফিয়ে উঠল দুর্গাচরণ। আরে বসুন-বসুন উঠছেন কেন? গ্রামের এত বড় একজন আপনি গণ্যমান্য লোক, অমনি-অমনি কি ফিরে যেতে আছে? তামাক খেয়ে যান। দুর্গাচরণ তামাক সাজতে বসল।

পাটের কলের দুটো সাহেব পাখি মারতে এসেছে দেওভোগে দুর্গাচরণের গ্রামে। দুর্গাচরণ ছুটে গিয়ে তাদের অনুরোধ করলে, মারবেন না পাখি।

একটা রুক্ষশুষ্ক পাগলের মত দেখতে। এর কথা কে কবে গ্রাহ্য করে! সাহেব পাখির দিকে তাক করল বন্দুক।

খপ করে বন্দুক ধরে ফেলল দুর্গাচরণ। কি স্পর্ধা, সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বন্দুকের গুলি পাখির নয় তোমারই হৃদয় ভেদ করবে দেখ। কিন্তু সাধ্য কি দুর্গাচরণের মুঠোর থেকে ছিনিয়ে নেয় বন্দুক। রোগা লিকলিকে শরীরে এখন শত সিংহের শক্তি। ধস্তাধস্তিতে সাহেব তাকে কিছুতেই টলাতে পারছে না। আরেকজন সাহেব এল তার সাহায্যে। তবুও নয়। দুর্গাচরণ বন্দুক কেড়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে জলে হাত ধুয়ে ফেলল দুর্গাচরণ। কি ভীষণ প্রাণঘাতী অস্ত্র স্পর্শ করেছি।

ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুচ্ছে লাটু। কি আশ্চর্য, হাত বুলুতে-বুলুতে ঘুমিয়ে পড়েছে! শশী কাছাকাছি ছিল, এসে দেখল, ঠাকুর চোখ চেয়ে আছেন,

আর তাঁর মাথায় নিশ্চল হাত রেখে দিব্য ঘুম মারছে লাটু।

লাটু, লাটু, ডাকতে লাগল শশী। এত সজাগ ঘুম লাটুর, তবু সাড়া দেবার নাম নেই। গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল তবু ওঠে না।

'ওকে বিরক্ত করিসনি।' স্নেহমধুর স্বরে ঠাকুর বললেন, 'ও কি এখন আর এ জগতে আছে! চলে গিয়েছে সমাধির দেশ দেখতে।'

শশী তখন এক পাশে বসে ঠাকুরের মাথায় হাত বুলুতে লাগল।

মাদ্রাজ মঠের ছাদ ফেটে বৃষ্টির জল পড়ছে মেঝেতে। ঠাকুরঘরেও পড়ছে নাকি? শশী বারে-বারে উঠে-উঠে গিয়ে দেখে আসছে। হ্যাঁ, এখন দেখছি ঠাকুরঘরেও পড়ছে। ঠিক যেখানটাতে ঠাকুরের ছবি, সেইখানে। কি হবে?

একটা ছাতা খুলে ঠাকুরের মাথার উপর ধরল শশী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। ধরে দাঁড়িয়ে রইল এক ঠাঁয়ে। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি। সমস্ত রাত ধরে দাঁড়িয়ে।

সবাই বললে, শুকনো জায়গায় ফোটোটি সরিয়ে দিলেই তো হয়।

কি সর্বনাশ, নাড়াচাড়া করতে গেলে ঠাকুরের ঘুম ভেঙে যাবে যে।

সেদিন গ্রীষ্মের দুপুরে কি অসহ্য গরম। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে বসেছে শশী, সাধ্য কি একটু তন্দ্রার স্পর্শ পায়! আহা ঠাকুরের না জানি কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। মনে হওয়া মাত্রই উঠে পড়ল শশী, ছুট দিল ঠাকুরঘরে। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে। চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।

নিজের ফোটো নিজে দেখছেন ঠাকুর। বললেন, 'এ যে দেখছি এক মহাযোগীর মূর্তি। ওরে ফুল নিয়ে আয়, একে আমি পুজো করব।'

ভবনাথ ফুল নিয়ে এল। নিজের ফোটো নিজেই ঠাকুর পুজো করলেন।

শ্রীশ্রীমাকে বললেন, 'দেখ, ঘরে-ঘরে এর একদিন নিত্যপুজো হবে।'

শুধু ঘরে-ঘরে? হৃদয়ে-হৃদয়ে।

১৫১

যিনি মহাকাশে মহাতপস্বী মহাকাল তাকে মনের ইয়ত্তার মধ্যে মনন করা যায় কই?

'আমার অবস্থা তবে তুমি কি মনে করো?' ডাক্তার সরকারকে জিগগেস করলেন ঠাকুর: 'ঢং?'

মৃদু হাসল ডাক্তার। বললে, 'ঢং মনে করলে কি এত আসি? ছ-সাত ঘণ্টা ধরে বসে থাকি? কিন্তু তাই বলে মনে করো না অমুকে তোমাকে মেনেছে বলে আমিও তোমাকে মানব।'

'আমি কি তোমাকে মানতে বলছি।'

'তবে কি বলছ?'

'সব ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

'সব ?'

'সমস্ত। ঘাসের ডগাটিও নড়ে না ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া। অর্জুন তো কত বললে, কিছুতেই যুদ্ধ করব না, জ্ঞাতিহত্যা করা আমার কর্ম নয়। শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, বললেন, তুমি কি আর করবে, তোমার স্বভাবে করাবে। এই দেখ আমি আগের থেকে সবাইকে মেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত মাত্র।'

'সব যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তবে তুমি বকো কেন? কি দরকার কথা কয়ে?' ডাক্তার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করল।

'বলাচ্ছেন তাই বলি', প্রশান্ত মুখে বললেন ঠাকুর। 'তিনি যন্ত্রী আর আমি তাঁর যন্ত্র।'

তিনি লেখক আর আমি তাঁর লেখনী। তিনি শিল্পী আর আমি তাঁর তুলিকা। 'চুপ করে থাকলেই পারো।' ডাক্তার আবার ফোড়ন দিল। 'কেন আর তবে পরমহংসগিরি করছ? আর এরাই বা তোমার সেবা করে মরছে কেন? আর কেনই বা বলছ অসুখটি সারিয়ে দাও ডাক্তার।'

কি আর করি বলো। সব তাঁর ইচ্ছাতেই করা। যতক্ষণ এই দেহ রয়েছে এই আমি-ঘট রয়েছে ততক্ষণ হবেই এই আর্তনাদ।

'মনে করো মহাসমুদ্র।' বললেন ঠাকুর, 'তার মধ্যে রয়েছে একটি ঘট। আত্মার সমুদ্রের মধ্যে অহংএর ঘট। সে ঘটের ভিতরেও জল বাইরেও জল। কিন্তু বাইরের জলের সঙ্গে ভিতরের জলের একাকার হতে হলে ঘটটি ভেঙে ফেলা চাই। যাঁর মহাসমুদ্র তাঁরই আবার এই ঘট। তিনিই এই আমি-ঘটটি রেখে দিয়েছেন সমুদ্রের মধ্যে। তিনি এই পোড়া-মাটির দেয়ালটুকু ভেঙে না দিলে জলে জলময় হওয়া যাবে না।'

ডাক্তার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তবে কি বলতে চাও এই লক্ষ-কোটি "আমি" এ সব শুধু ঈশ্বরের চালাকি? তিনি কি চালাকি করছেন আমাদের সঙ্গে?'

গিরিশ কাছেই ছিল, সেও খাপ্পা হয়ে উঠল। বললে, 'আপনি কি করে জানলেন যে করছেন না চালাকি?'

ঠাকুর বললেন, 'যেমন করেই বলো না কেন সব তাঁর লীলা। এই খেলার মেলা বসাবার জন্যেই এতগুলো আমির খেলোয়াড়। বলতে চাও তো বলো একটা ভোজ-বাজি। সেই রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একটু দূরে সরে গিয়ে জিগগেস করলে, কি দেখছ বলো তো? একটা ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখছি। সওয়ার কেমন দেখতে? খুব সাজগোজ, খুব জেল্লাজমক, হাতে রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। রাজা সবাইকে বললেন, এবার তবে বিচার করে দেখ। সবাই বিচারে বসল। বিচারে সাব্যস্ত হল, ঘোড়া সত্য নয়, সাজগোজ জেল্লাজমক অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়, সত্য হচ্ছে সওয়ার। সে সওয়ারই একলা দাঁড়িয়ে। বাজিকর যে সওয়ারও সে।'

কিংবা আরেক রকম করে বলি।

'মনে করো, একটা হাঁড়িতে ভাত চড়িয়েছ, আলু বেগুন ছেড়ে দিয়েছ তাতে। কতক্ষণ পরে আলু-বেগুন নড়তে-চড়তে লাফাতে সুরু করল। ছোট ছেলে যার জ্ঞান হয়নি সে ভাবছে আলু-বেগুন বুঝি নিজের থেকেই লাফাচ্ছে। কিন্তু লাফাবার আসল কারণ হচ্ছে ঐ হাঁড়ির নিচেকার আগুন। যতক্ষণ আগুন ততক্ষণই লাফঝাঁপ। জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে যাও উনুন থেকে, সব ঠাণ্ডা। সব আমরা ঈশ্বরের শক্তিতেই শক্তিমান। আমরা সব তাঁর খেলার পুতুল।'

সব তাঁর খেলা বা খেয়াল। 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা।' শুধু জগৎ নয় আমার হৃদয়টুকুও। আমার হৃদয়টুকুও যে তাঁর খেলবার আঙিনা। আমি না হলে তাঁর খেলা জমবে কেন? দুজন না হলে কি খেলা জমে?

ঈশ্বরের আস্বাদন ও উপভোগের জন্যেই আমরা। এর বাইরে আর কি প্রয়োজন আছে জীবনের? এই বোধই তো মানুষের চরমবোধ। যার জীবনে ঈশ্বরের উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত সেই ভক্ত। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা।

ভক্ত মুক্তি চায় না। সে চায় ঈশ্বরের রূপ দেখতে, আলাপ করতে। জগৎকে সে বলে না স্বপ্নবৎ। বলে তিনিই এ সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ, নানা ছাঁদ। সবই ঈশ্বরের ঝিলিক, ঈশ্বরের চাকচিক্য। বলে, বা, এ সব বেশ হয়েছে দিব্যি হয়েছে।

ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। ভক্তি মায়া ছাড়ে না। মহামায়ার ভজনা করে। জ্ঞানী জোর করে খুলে দেয় ঘোমটা। ভক্ত স্তব করে ঘোমটা খোলায়।

একটু অহং থাকে ভক্তের। সে অহং আস্বাদনের অহং, সে অহং তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি মা, আমি সন্তান।

'এই বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, এতে দোষ নেই।' বললেন ঠাকুর, 'বজ্জাত আমিতেই দোষ। ভক্তের আমি মানে বালকের আমি। কেমন জানো? যেন আর্শির মুখ। আর যাই করুক গালাগাল দেয় না। যেন পোড়া দড়ি। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দাও উড়ে যাবে। জ্ঞানাগ্নিতে অহঙ্কার পুড়ে গেছে। এখন আর কারু অনিষ্ট করে না। এখন নামমাত্র আমি।'

'সেদিন মহিম চক্রবর্তির বাড়ি গিয়েছিলাম।' বললে নরেন।

'তাই নাকি?' ঠাকুর উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'ওরকম শুষ্কজ্ঞানী দেখিনি।'

'বটে? কি হল ওখানে?'

'আমাদের গান গাইতে বললে। গঙ্গাধর গাইলে—"শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি-উতি চায়, সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়।" গান শুনে কি বললে জানেন?'

'কি বললে?'

'বললে, ও সব গান কেন ? প্রেম-ট্রেম ভালো লাগে না। তা ছাড়া মাগ-ছেলে নিয়ে থাকি, ও সব গান এখানে কেন ?'

'দেখলে, কি ভয় !' ঠাকুর হেসে উঠলেন।

জ্ঞানীরই ভয়, ভক্তের ভয় কি ! যে মায়ের সন্তান সে তো অকুতোভয়। তার মুখে মা-মন্ত্র সে তো অভী-মন্ত্র। আমার মা আছেন আর আমি আছি, আমার আবার কিসের ভাবনা !

বোশেখ মাস, রোদের দিকে তাকানো যায় না। ঘরেও দুঃসহ গরম। নিঃসন্দেহ কষ্ট হচ্ছে ঠাকুরের। সুরেন মিত্তির খসখস এনে দিয়েছে। পরদা বানিয়ে টাঙিয়ে দাও জানলায়। জলের ছিটে দাও। ঘর ঠান্ডা হবে।

কিন্তু কে দেয়। কার আর এ সব দিকে নজর আছে !

সুরেন হৈ-চৈ করে উঠল। 'এ কি, কেউ পরদা করে টাঙিয়ে দিলে না খসখস ? কি আশ্চর্য, এ দিকে কারু মনোযোগ নেই।'

'কি করে হবে !' কে একজন পাশের থেকে টিপ্পনি কাটল : 'শিষ্য সেবকদের যে এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন কেবল সোঽহং চলছে। আবার যখন তুমি প্রভু আমি দাস চলবে তখন এসব দিকে নজর আসবে। তার আগে নয়।'

কিন্তু নরেন কি ভক্ত না জ্ঞানী ?

নরেনের হাত মুখ স্পর্শ করছেন ঠাকুর। বলছেন গাঢ়স্বরে, 'মায়াবাদ-? মায়াবাদ বড় শুকনো।' তাকালেন নরেনের দিকে। 'কি বললাম বল তো।'

'শুকনো।'

'কিন্তু তুই ? তুই তো শুকনো নোস। তোর মুখ-চোখ তো শুকনো নয়। তোর সর্বাঙ্গে যে ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানের পর যে ভক্তি সেই ভক্তির ব্যঞ্জনা।'

ভক্তি নইলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায় ? জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করার পর কি করবে ? থাকবে বিদ্যামায়া নিয়ে। ভক্তি দয়া বৈরাগ্য নিয়ে। তার দুই উদ্দেশ্য। এক উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, দ্বিতীয় রসাস্বাদন। জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকে তবে লোকশিক্ষা হয় না। তেমনি ঈশ্বরের আনন্দকে কি করে সম্ভোগ করবে যদি ভক্তি না থাকে ?

তাই নরেন ভক্তশ্রেষ্ঠ। তার এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা।

লোকশিক্ষা ?

সমাধিতে বসেছে নরেন। উঠব না বসব না নড়ব না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করব। সমস্ত দেহ নিঃসাড় নিস্পন্দ। মৃতুশীতল মধ্যরাত্রির পাথরে নেই এতটুকু একটা নিশ্বাসের রেখা। পাশে বুড়ো গোপাল বসে ছিল। তার ধ্যানে ছেদ পড়ছে বারে-বারে। আড় চোখে দেখছে নরেনকে। কিন্তু এ কি, ঘুমন্ত লোকেরও একটা অস্তিত্ব থাকে। নরেনের গায়ে সে ঠেলা মারল। ডাকল, নরেন, নরেন ! কে সাড়া দেবে। গা একেবারে নিষ্প্রাণ ঠান্ডা। ছুটে দোতলায় একেবারে ঠাকুরের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল গোপাল। বললে, 'নরেন নেই।'

'নেই, গেল কোথায় ?'

'মরে গেছে।'

'বেশ হয়েছে। থাক অমনি কতক্ষণ শূন্য হয়ে। সমাধি-সমাধি করে আমাকে কম জ্বালিয়েছে! এখন ঘুরুক একটু সমাধির দেশ।'

দেহজ্ঞান ফিরে এলে পর টলতে-টলতে ঠাকুরের কাছে উঠে এল নরেন। ঠাকুর বললেন, 'কি রে, বেড়ানো হল একটু সমাধিভূমি? কেমন দেখলি? কিন্তু যাই বল, ঘর তোকে দেখিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু দরজার চাবি এঁটে বন্ধ করে দিলাম।'

'বন্ধ করে দিলেন?' যেন চমকে উঠল নরেন। 'কিন্তু তার চাবি?'

'তার চাবি আমার কাছে থাকল। সে ঘরে যে তোর হামেসা যাওয়া চলবে না। তোর যে অনেক কাজ।'

'কাজ? কিসের কাজ? কার কাজ?' নরেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'আমার কাজ।' ঠাকুর তাকালেন নরেনের চোখের দিকে। 'সে কাজ যখন ফুরুবে তখন আমিই চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ ঘর আবার খুলে দেব, দেখিস।'

'কিন্তু কাজটা কি শুনি?'

কাগজ-পেন্সিল তুলে নিলেন ঠাকুর। যেন কী গূঢ় কথা জানাচ্ছেন গোপনে এমনি করে লিখলেন। লিখলেন, 'লোকশিক্ষা।'

'বয়ে গেছে।' প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়া দিল নরেন। বললে, 'পারব না, কিছুতে পারব না।'

ঠাকুর দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তোর ঘাড় পারবে।'

তুই যে ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোর এক দিকে ঈশ্বরসম্ভোগ অন্য দিকে লোকশিক্ষা।

কিন্তু ভক্তিই সব? বিজ্ঞান বা সায়ান্স কিছু নয়? ডাক্তার সরকার উসখুস করে উঠল।

কে বললে কিছু নয়? প্রতীয়মান সত্যকে কে অমান্য করবে, কে মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হবে? ঈশ্বরেরই যে ইচ্ছা, বুদ্ধির জগতে বিজ্ঞান সিংহাসন নিক। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রমাদেরই জয়জয়কার হোক। জড়বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান—এরাই তো প্রকৃতীশ্বরের জীবন্ত ধর্মগ্রন্থ। এদেরকে বাদ দিলে চলবে না, কিন্তু ওদের বাইরে আর জায়গা নেই তাও নয়। বুদ্ধির জগতের বাইরে রয়েছে আরেকটা বোধির জগৎ। স্বল্প কল্পনার স্বপ্নরহস্যের জগৎ নয়, প্রতীয়মানের ঊর্ধ্বে অননুভূয়ের জগৎ। আপেক্ষিকের ঊর্ধ্বে অব্যাহতের। তাকেই বা বাদ দেব কেন? ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বুদ্ধির বিজলির আলোর ঊর্ধ্বে স্বয়ম্প্রভ বোধির জ্যোৎস্নাকেও উপভোগ করব না কেন?

সেই উপভোগের কৌশলটিই ভক্তি।

কাচের বোয়ামের মধ্যে জল, তাতে লাল মাছ খেলা করছে। ডাক্তার সরকার তাতে একটা এলাচের খোসা ফেলে দিল। মাছের খাবার সেই এলাচের খোসা।

'দেখলে, দেখলে', কাছে বসেছিল মাস্টার, তাকে লক্ষ্য করে ডাক্তার বললে, 'মাছগুলো আমার দিকে চেয়ে আছে। এদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিয়েছি

তা দেখছে না। তাই তো বলি শুধু ভক্তিতে কিছু হবে না জ্ঞান চাই।'

কটা ময়দার গুলি পাকিয়ে খোলা ছাদের উপর ছুঁড়ে দিল ডাক্তার। কটা চড়ুইপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, খাক এই ময়দার গুলি।

'দেখলে, চড়ুইপাখি উড়ে পালাল। ময়দার গুলি দেখে ভয় পেল। ওটা যে খাবার জিনিস তা জানে না। ওর খাওয়া হল না জানে না বলে। ওর ভক্তি হল না জ্ঞান নেই বলে।'

নিশ্চয়। জ্ঞানের পরেই তো ভক্তি। এত জেনেও তোমাকে জানা হল না, তাইতো তোমাকে ভালোবাসা।

পাশাপাশি দুটো পাতকুয়ো আছে। একটার জল আসছে নিচে ঝরণার থেকে, আরেকটার আসছে বর্ষার থেকে। দুটোই সমান পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্ষার পাতকুয়োর জল কতক্ষণ টিকবে? যেই বর্ষা শেষ হবে অমনি জলও শেষ হবে। কিন্তু যে-পাতকুয়োর নিচে ঝরণা তার অনন্ত পরমায়ু। তার জলের আর শেষ নেই। সে সব সময়েই কানায়-কানায় ভরা। তেমনি তোমার সায়ান্সের জ্ঞান ঐহিকের জ্ঞান দুদিন পরেই শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যে ভক্ত তার মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের উৎস, সে সব সময়েই ভাবে-রসে-সুখে-প্রেমে পরিপূর্ণ।

'কিন্তু ভক্তিপথে মানুষ যে আটকে যায়।' বললে ডাক্তার।

'তা যায় বটে। তাতে হানি হয় না।' বললেন ঠাকুর। 'সেই সচ্চিদানন্দের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। বিচারের পথে জ্ঞানের পথে যেখানে এসে পৌঁছুবে, আমি যে শুধু ভক্তির জোরেই সেখানে পৌঁছুতে পারি।'

'কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম কি অমনিতে হয়?' বললে ডাক্তার। 'ঘোড়ার চোখের দুদিকে ঠুলি দাও। তেমন বেয়াড়া হয় ঘোড়া একেবারে বন্ধ করে দাও চোখ। ঐটেই বিচার।'

'ভক্তিপথেও তাই হতে পারে।' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর আবেগমধুর হয়ে উঠল: যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর গুণগান করতে ভালো লাগে, তাহলে আর চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়সংযম করতে হয় না। রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়।'

ডাক্তার তো স্তম্ভিত। এত-বড় একটা কঠিন রুগী, দুর্বল যন্ত্রণাজর্জর, সে কিনা মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেছে! শরীরের দুঃখদৈন্য চলে গিয়েছে নির্বাসনে, মন শুধু সুধাস্নানে মাতোয়ারা। এ কি, ডাক্তারের চোখেও ঘোর লাগল নাকি। সে কি চোখের সামনে একজন ব্যাধিক্লিষ্ট রুগী দেখছে, না আর কেউ? যা এমন অসাধ্য ব্যাধির অসহ্য কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে, সে না জানি কি দ্রব্য! শুধু ঠাকুর নন, যারা-যারা ভক্ত সেখানে জমায়েত হয়েছে, ছোট-নরেন, লাটু, সবাই সমাধিস্থ। নাড়ী চলছে না, নড়ছে না হৃৎপিণ্ড। সবাই জড় জিনিসের মত নিশ্চলস্তূপ হয়ে আছে। ঠাকুরের চোখের পাতা মেলে আঙুল ঢুকিয়ে দিল ডাক্তার, চোখের পাতা কাঁপল না এতটুকু। বিজ্ঞান কি পঙ্গু হয়ে গেল নাকি? পর্বতের গা বেয়ে কত দূর উঠে বসে পড়ল নাকি? থেমে পড়ল নাকি? পাথেয়

ফুরিয়ে গেল নাকি তার ?

ভাবের উপশম হবার পর আরেক বিচিত্র কাণ্ড। ভক্তেরা কেউ হাসছে কেউ কাঁদছে। এতে হাসবারই বা কি আছে, কাঁদবারই বা কি আছে! সুস্থসমর্থ ছেলেগুলো সহসা পাগল হয়ে গেল নাকি? পাগল না হবে তো এ কেমন ব্যবহার!

'কিন্তু, যাই ভাবো আর বোঝো, তুমি রসবে।' ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর।

তোমাকে শুকনো থাকতে দেব না। এমনি যা জানবে সব শুকনো। যখন ঈশ্বরকে জানবে তখনই তুমি সরল-তরল। আর ঈশ্বরকে জানাই সমস্ত জানার চরম। সমস্ত বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।

ঈশ্বরই অপ্রমেয়। তিনি সর্বভূতের বাসস্থান তাই তিনি বাসুদেব। বৃহৎ বলে তিনি বিষ্ণু। মা শব্দের অর্থ বুদ্ধি। মৌন ধ্যান ও যোগশক্তিতে আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে দূরীকৃত করেন বলে তিনি মাধব। কৃষি-শব্দের অর্থ সত্তা আর ন-শব্দের অর্থ আনন্দ। সৎ ও আনন্দস্বরূপ বলে তিনি কৃষ্ণ। পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ পরমস্থান ও অক্ষ শব্দের অর্থ অব্যয়। পরম স্থানে বাস করেন আর তাঁর লয় নেই বলে তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ। দস্যুদের বিত্রাসিত করেন বলে জনার্দন। কারু গর্ভে জন্মান না বলে অজ। সাতিশয় দান্ত ও ইন্দ্রিয়দের মধ্যে স্বপ্রকাশ বলে দামোদর। হৃষ্ট ও ঐশ্বর্যবান বলে হৃষীকেশ। নরগণের আশ্রয় বলে নারায়ণ। সর্বভূতের পূরণকর্তা বলে পুরুষোত্তম।

সেদিন আবার গান শোনাবার জন্যে নরেনকে পীড়াপীড়ি করছেন ঠাকুর। আর গান মানেই তো ঈশ্বরগুণগান।

মাস্টারকে ইশারা করল ডাক্তার। বললে, গান-টান আর নয়। উত্তেজিত হবেন আর তাতে মহাঅনর্থ হবে। বারণ করে দাও।

কে কাকে বারণ করে!

ঠাকুর নিজে থেকেই জিগগেস করলেন, 'কি হে গান শুনবে ?'

'আমি শুনতে পারি কিন্তু তুমি শুনো না।'

'আমি শুনব না ?'

'না, গান শোনা তোমার অপকার।'

'অপকার ?'

'হ্যাঁ, গান শুনলেই যে তুমি তিড়িং-মিড়িং করে ওঠো।'

মুখখানি ম্লান করলেন ঠাকুর, বললেন, 'কি করতে হবে ?'

'ভাব চেপে রাখতে হবে।'

'তাই রাখব। চুপ করে থাকব। তবু গান হোক।'

নরেন গান ধরল। 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ !'

দেখতে-দেখতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়ে গেল। ডাক্তার কোথায় বিরক্ত হবে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সেই আশ্চর্য মুখের দিকে। এমন মুখ, পলকপতন-

কালেও না দেখে হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে। এ কি মানুষের মুখ ? এ কি জরাজরা-পীড়িত মর্ত দেহ না কি সূর্যাগ্নিসংকাশ দিব্যপুরুষ ?

এ কি, গান শুনতে-শুনতে যে ডাক্তারের চোখেও জল ভরে এল !

'তুমি রসবে।' ঠাকুরের কথা না ফলে যায় না।

শুধু তাই নয়, ভাবাবেশে ডাক্তারের কোলের মধ্যে পা তুলে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'আহা তুমি তখন কি কথাই বলেছ ! তাঁরই কোলের মধ্যে বসে আছি, দুঃখ-কষ্টের কথা আধি-ব্যাধির কথা তাঁকে বলব না তো কাকে বলব !'

ঠাকুরেরও দু-চোখ ভেসে গেল জলে। ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তার, তুমি খুব শুদ্ধ, খুব খাঁটি। তা না হলে কি তোমার গায়ে পা রাখতে পারি ?'

তিন যুদ্ধে জয়ী হলেন ঠাকুর। প্রথম যুদ্ধ সংশয়ের সঙ্গে, অবিশ্বাসের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি নরেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ পাপের সঙ্গে, উচ্ছৃংখলতার সঙ্গে, যার প্রতিনিধি গিরিশ। তৃতীয় যুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে, যার প্রতিনিধি ডাক্তার, মহেন্দ্র সরকার।

১৫২

প্রতীক্ষা করে থাকো। বিশ্বাস হারিও না। নিরাময় হতে পারে না এমন রোগ নেই। অপসৃত হতে পারে না এমন বাধা নেই। বিগলিত হতে পারে না এমন কাঠিন্য নেই। আর ঈশ্বরের শক্তি ? কোথাও তার সীমারেখা টানতে চেয়ো না। আরোপ করো না কোনো সর্তের ঘেরাটোপ। সমস্ত নিয়ম নির্দেশের বাইরে তাঁর ইচ্ছা। আনন্দ পাও বা না পাও তাঁকে ধরে থাকো। চালিয়ে যাও ধ্যান-ধারণা। অভ্যাস-যোগের পৃষ্ঠা উলটিয়ে যাও। পড়ে থাকো, লেগে থাকো, বাকি রাতটুকু কোনো রকমে কাটিয়ে দাও জেগে থেকে।

দেখনি, পিত্তদোষ হলে মুখে চিনি ভালো লাগে না। কিন্তু রোজ যদি অভ্যেস করে একটু চিনি খাও, পিত্তদোষ তো সেরে যাবেই, চিনিকেও মিষ্টি বলে অনুভব করবে। পিত্তদোষ মানে অবিদ্যাদোষ আর চিনি মানে ঈশ্বরপ্রীতি। একটু-একটু রোজ সাধনভজন নাম-জপ করো, দেখবে অবিদ্যাদোষ কেটে যাচ্ছে আর সুস্বাদু লাগছে ভগবানকে। হবে না হচ্ছে না বোলো না, শুধু লেগে থাকো। জেগে থাকো। বীজ বুনতে-বুনতেই কি ফল হয় ? ধৈর্য ধরো, বীজ বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হও। জল সেচ, নিড়েন দাও, পোকার কামড় বা পাখির ঠোকর যেন না লাগে। তার পর বেড়া দাও, ছাগল-গরু যেন না মুখ বাড়ায়। এত হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতের পরেই না ফসলের হাতছানি।

সমস্ত খাটুনির মজুরি মেলে, ঈশ্বর খাটুনির মজুরি মিলবে না ?

আর যাই করো, তালে ভঙ্গ দিয়ো না।

সেই কৃপণ রাজার গল্প শোনো। বুড়ো হয়েছে, রাজকাজ দেখবার ক্ষমতা

নেই, অথচ শাসনভার যে ছেড়ে দেবে ছেলের উপর তারও প্রবৃত্তি হয় না। ছেলে বড়ো হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে তাতে কি। রাজ্য পেলে পাছে বেশি খরচ করে সেই ভয়েই অভিভূত। মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু তার বিয়ে দিতে গেলেই বেরিয়ে যাবে অনেক টাকা। তাই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেও রাজা উদাসীন।

সেই রাজ্যে নামজাদা নট-নটী এসেছে। ইচ্ছে রাজাকে নাচ দেখায়। এত বড় নাচিয়ে-বাজিয়ে, না দেখলেও রাজার মান থাকে না। অথচ দেখতে গেলেই তো একগাদা খরচ। নট-নটীকে সরাসরি 'না'ও বলছে না। অথচ আসরও বসাচ্ছে না। হবে—হচ্ছে—বলে ঠেকিয়ে রাখছে। নট-নটী মন্ত্রীর শ্বারস্থ হল। মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে বললে, আপনার কিছু খরচ হবে না, আপনি আসর ডাকুন।

কিছু খরচ হবে না জেনে রাজা আশ্বস্ত হল। তবে আসর জমাও। ঢ্যাটরা পিটিয়ে দাও।

সভায় তিলধারণের স্থান নেই। রাত্রির প্রথম প্রহরেই শুরু হল তামাশা। নটী নাচছে আর নট তাল বাজাচ্ছে। একেকটা নাচ শেষ হয়, নটী তাকায় এদিক-ওদিক, যদি কোথাও থেকে আসে কোনো উপঢৌকন। একটা কাণাকড়িও কেউ ছুঁড়ে মারে না। বিষাদভাব কাটিয়ে নটী আবার নাচ শুরু করে, নট আবার ঢোল তুলে নেয়। নৃত্যশেষে আবার সেই রিক্ততা। সেই শূন্যাঞ্জলি।

ক্লান্ত হয়ে পড়ল নটী। রাত্রির দ্বিপ্রহর কখন কেটে গিয়েছে, তবু একটা পয়সা উপার্জন হল না। আশার শেষ নেই, আবার তাল বাজাল নট। তৃতীয় প্রহর গিয়ে এখন শেষ প্রহরও প্রায় যায়-যায়। নটী বোধ হয় এবার ভেঙে পড়বে। ম্লান কণ্ঠে বললে এবার নটকে, 'রাত তো প্রায় কাবার হতে চলল। শরীর অবসন্ন। একটা ফুটো পয়সাও মিলল না এ পর্যন্ত। হে নট, বিরথা তাল বাজাও। তোমার তাল বাজানো অনর্থক।'

বিমর্ষ চোখে ক্ষীণ হাসির আভা এনে শান্ত স্বরে নট বললে, 'বৃহৎ গেয়ি, থোরি রহি, থোরি ভি আভি যায় ; নট কহে দায়িতাকো, তালমে ভঙ্গ না পায়।' রাতের অনেকটাই চলে গেছে, তবু অল্প কিছু এখনো আছে। নট তার প্রিয়াকে বলছে, এখনি তালে ভঙ্গ দিও না।

এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।

এখনো আশার জলসেক নিঃশেষ হয়নি। এখনো প্রদীপে খানিকটা তেল আছে ; সম্পূর্ণ পুড়ে যায়নি মোমবাতি। যতক্ষণ বর্ষে ততক্ষণ অর্শে। হেরে যেও না, ছেড়ে দিও না। নেচে যাও, আমিও যাই বাজিয়ে।

নটের কথা শুনে অঘটন ঘটে গেল। এক সাধু ফকির ছিল দর্শকদের মধ্যে, সে তার কম্বলখানা, তার একমাত্র সম্পত্তি, দিয়ে দিল নটকে। যুবরাজ তার হাত থেকে খুলে দিল সোনার তাগা। আর রাজকুমারী? রাজকুমারী তার গলার থেকে তুলে নিল রত্নমাল্য।

রাজা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সাধুকে বললে, 'এ কি ব্যাপার?'

সাধু বললে, 'নটের ঐ মন্ত্র শুনে দিব্যচক্ষু খুলে গেল।'

'মন্ত্র ?'

'হ্যাঁ। ঐ যে বললে তালমে ভঙ্গ না পায়, সেই মন্ত্র। অনেক দিন থেকে সাধুগিরি করে ঘুরেছি দেশে-দেশে, সেই ছেলেবেলা থেকে, বুড়ো হয়ে পড়েছি এখন। কি কষ্টের যে এই সাধুগিরি, আর পোষাচ্ছে না এই বার্ধক্যে। ঠিক করেছিলুম গৃহস্থজীবনে আবার ফিরে যাব। বাকি দিন কটা কাটাব একটু আলস্যে আরামে। এমন সময় এই নটের মন্ত্র কানে এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—কে জানে এই অল্পই হয়তো অনেক। অল্প যেতে-যেতেও হয়তো অনেক। নেচে যাও বাজিয়ে যাও। তাল কাটিয়ে দিও না। স্বস্থানে নিয়তস্থিত থাকো। তাই ঠিক করলাম জীবনের বাকি কটা দিন যেমন সাধুগিরি করছিলাম তেমনি সাধুগিরিই করে যাব।'

'আর তুমি ?' রাজা জিগগেস করলে যুবরাজকে।

'ঠিক করেছিলাম গোপনে আপনাকে হত্যা করে রাজা হব। এমন সময় অতালভঙ্গের মন্ত্র এল। ভাবলাম বৃদ্ধ রাজা কদিনই বা আর বাঁচবে। বাকি অল্পকালের জন্যে কেন পিতৃহত্যার পাতকে লিপ্ত হই ? যাক না যেমন যাচ্ছে। আর কটাই বা দিন। কেন সন্তানধর্ম থেকে বিচ্যুত হই ? তাই মন্ত্রদাতাকে গুরুপ্রণামীস্বরূপ দিলাম ঐ হাতের তাগা।'

'আর তুমি ?' রাজকন্যাকে লক্ষ্য করল রাজা।

'ঠিক করেছিলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। এমন সময় বিদ্যুতের মত মন্ত্রের চমক এল। অনেক গেছে, অল্প আছে—সে অল্পও বুঝি যেতে বসেছে, তবু অল্পের জন্যে স্খলিত হয়ো না। বুড়ো বাপের আয়ুই বা আর কত দিন। কার্পণ্যের জন্যে বিয়ে দিচ্ছেন না, তার তিরোভাবেই আসবে সেই দাক্ষিণ্যের শুভ লগ্ন। কেন দুদিনের জন্যে রাজকুলে কালি দিই, আপনাকে ক্লিষ্ট করি। তার চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকি, বাধা অপসারিত হবে, পাব সেই মনোনীতকে।' মহাজ্ঞানস্বরূপ ফল লাভ করল রাজা। ছেলেকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। মেয়েকে সমর্পণ করল বাঞ্ছিত পাত্রে।

তাই, শুধু লেগে থাকো, পড়ে থাকো, ধরে থাকো। শুধু নাম করে যাও। শুধু সহ্য করে যাও।

ঠাকুর হৃদয়কে বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে। তা না হলে ডাকতে হবে খাজাঞ্চীকে।'

আর কিছু করতে না পারি সইতে পারি। একমাত্র সহ্য করে যাওয়াই সাধন করে যাওয়া। ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না। পনেরো মাসে এক বছর করলে কি হয় ? চিঁড়ের ফলার হয়ো না। জোর করো। রোক করো। উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো। এগিয়ে গিয়ে ধরো। এগিয়ে গিয়ে ধরার নামই শরণাগতি। ভক্তিমান কে ? যে শক্তিমান সেই আসলে ভক্তিমান।

আর শক্তি হচ্ছে সহ্য করার শক্তি। আঁকড়ে থাকবার শক্তি।

মাস্টারকে বললেন, 'সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়। কারু-

কারু চট করে হয়ে যায়। আমার কিন্তু বড় বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল মা-মা বলে ডাকতাম। মা-মা বলে কাঁদতাম।'

সেই তো একমাত্র ডাক, যে ডাকে শ্রান্তি নেই, যে ডাক সাড়া না আনলেও সান্ত্বনা আনে। আর যখনই সান্ত্বনা পেলে তখনই বুঝলে সাড়া এসেছে।

আর কেউ আমার থাক না থাক, আমার মা আছে, এই তো ধরে থাকবার কৌশলকলা। মা ভুলিয়ে রাখতে চান খেলা দিয়ে। কিন্তু মা যখন বুঝবেন ছেলে খেলনা চায় না মাকেই চায়, তখন আর মা কি করবেন!

তাই শুধু মাকেই ধরে থাকো! যখন তাঁর স্বত্বে আছি তখন তাঁর ঘরে আমারও হিসসা আছে। আমি ভয়-ভাবনাশূন্য।

উঠোনের দোষ দিয়ো না, শুধু নেচে যাও। যারা খেলতে জানে তারা কানা-কড়িতেও খেলে। আর সব পুরানো হয়ে যায়, তেতো হয়ে যায়, শুধু ঈশ্বরপ্রীতিতেই বিস্বাদ নেই। একঘেয়েমি নেই। তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং। নবীনের থেকেও নবীনতর ঈশ্বর। শুধু মা নামেই অরুচি নেই। মা নামেই বিশ্বাস, মা নামেই ব্যাকুলতা। ডাকলেই মনে হয় যেন পাশের ঘরে রান্নাঘরে আছেন, এখুনি ছুটে আসবেন। আছেন—এইটি বুঝিয়ে বিশ্বাস আনান। আর আসবেন—এইটি বুঝিয়ে আনান ব্যাকুলতা। আর যদি একবার বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা আসে তবে ঈশ্বরই চলে আসবেন। আর ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরদর্শনের জন্যেই নরজন্ম। চক্ষের এত তৃষ্ণা শুধু শেষ সেই ঈশ্বরকে দেখব বলে। তাই সমস্ত বন্ধ কুঠুরির চাবিকাঠি হচ্ছে মা-ডাক। মাতৃস্তোত্র করো।

হে শরণাগতের আর্তিহারিণী, অখিলজগতের জনয়িত্রী, সর্বচরাচরের অধীশ্বরী, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি যদি প্রসন্ন হও তাহলে আর আমার ভয় কি! তাহলে আর আমার কিসের দৈন্য-কাতর্য, কিসের বা অজ্ঞান-অবোধ!

তুমি জগদ্ধাত্রী, মহতী মহীমূর্তি। মৃত্তিকা হয়ে সবাইকে আঁকড়ে আছ, আবার জল হয়ে আপ্যায়িত করছ সবাইকে। আমাকে তাই তুমি কোলে ধরো, স্তন্যদানে স্নিগ্ধ করো। ধারণ-পোষণের উৎস তুমি, তোমার শক্তির সঙ্গে কে এঁটে উঠবে! তুমি অলঙ্ঘ্যবীর্যা।

তোমার বীর্যবিভবের অন্ত কোথায়? তুমিই সর্বব্যাপিনী স্থিতিশক্তি। তুমিই বিশ্বের বীজ, তুমিই আবার প্রকাশপল্লব। তুমিই পরমা মায়া। তুমিই সম্মোহিনী, তুমিই আবার মোক্ষদাত্রী। তুমি শুধু প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হলেই কামকাঞ্চনের লাজলজ্জা খসে পড়বে, উদ্ভাসিত হবে তোমার অভয়-অক্ষয় মাতৃমূর্তি।

তাই তুমি সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি। যা-কিছু দেখি সব তোমারই ভেদ, তোমারই ভাগ। জগৎজোড়া সমস্ত স্ত্রীই তুমি, তোমারই বিকিরণ। মাতৃস্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে তুমি পরিপূর্ণ করেছ, সমাচ্ছন্ন করেছ, তোমার আমি কী স্তুতি করব। তবু তোমার নাম করি, তোমার স্তোত্র পড়ি, সে শুধু আমার বাকশুদ্ধির জন্যে। তুমি নিত্যস্তুতা, যেহেতু তুমি সর্বভূতা, স্বর্গমুক্তিবিধাত্রী। এমন কি উক্তি

আছে যে অবাকগোচরাকে ব্যাখ্যা করে। তুমিই তোমার বেত্তা, তুমিই তোমার ব্যাখ্যাতা। তুমি সর্বলোকের হৃদয়ের বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। তুমিই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। স্বর্গও দাও, অপবর্গও দাও। ভোগ দাও, আবার দাও ভোগাতীত সম্ভোগ। তোমাকে প্রণাম।

তুমিই মুহূর্ত, তুমিই পরিণাম। তুমি কালের পরিচ্ছেদ, তুমিই আবার অপরিচ্ছিন্ন সত্তা। সকলের হয়েও প্রত্যেকের। ব্যষ্টির নয় সমষ্টিরও সংহারকর্ত্রী।

তুমি সর্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী। শুভময়ী। সমস্তবাঞ্ছিতকারী। সর্বাভীষ্ট-সাধিকা তুমিই আশ্রয়ণীয়া। ত্রিনয়না গৌরী। তোমার ত্রিনেত্র—সূর্য, চন্দ্র আর বহ্নি, স্থূলে সূক্ষ্ম আর কারণ, স্মৃতি কল্পনা আর আশা, শব্দ স্পর্শ আর রস, অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তুমি সৌম্যা, মনোহরা।

তুমি মহতী চিতিশক্তি। তোমার তিন স্পন্দন, সৃষ্টি স্থিতি আর বিনাশ। গুণত্রয় যখন তোমার আধারে প্রকাশিত হয়, যখন তুমিই স্বয়ং গুণময়ী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন আবর্তনের অতীত, তুমি আবার নিত্যা সনাতনী।

শরণাগত, দীন ও আর্তের তুমি পরিত্রাণপরায়ণ। তোমাকে বুঝিনি বলেই তো আমি দীন, তোমাকে পাইনি বলেই তো আমি আর্ত। তারপর যখন বুঝি কোথায় আমার আশ্রয়, কোথায় আমার প্রতিষ্ঠা, তখনই দেখি, হে নিবৃত্তিকারিণী, তুমি আমার সর্ব অভাব মোচন করেছ।

তুমি ব্রহ্মাণী। তুমি সর্বব্যাপিনী বিশ্বকল্পনা। তোমার কমণ্ডলুরকুশপূত বারি ক্ষরণ করো। তোমার এই বারিসিঞ্চন ছাড়া কর্মপিপাসা নিবৃত্ত হবার নয়।

ত্রিশূলে, চন্দ্র আর অহি তুমি ধারণ করে আছ জ্ঞানে আর মনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাবে বলে। অধিষ্ঠিত আছ ধর্মরূপী বৃষভে। তুমি স্বপ্রকাশরূপা মাহেশ্বরী। ময়ূর ভুজঙ্গদলকে বিনাশ করে। তুমি সেই পাপনাশিনী পবিত্রতা। তুমি কুমারী, তুমি অনঘা, তুমি মহাশক্তি।

তুমি শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী। শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গশোভিতা। তুমি প্রসন্ন হও। তুমি বারাহীমূর্তিতে উগ্র মহাচক্র ধারণ করে দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধার করেছ বসুন্ধরাকে। তুমি না তুললে কে ভাঙত তার তিমিরমগ্নতা ? তার কামকর্ম থেকে কে তাকে নিয়ে যেত চিরন্তন মঙ্গলের দিকে ? মা তুমি মঙ্গলরূপিণী।

তুমি নারসিংহী। দম্ভের স্তম্ভ বিদীর্ণ করে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করলে। তুমি ত্রৈলোক্যত্রাণকারিণী নারায়ণী। তুমি কিরীটিনী, তুমি মহাবজ্রা। তুমি সহস্রনয়নোজ্জ্বলা। অনাত্মবোধরূপী বৃত্র তোমারই শস্ত্রপ্রহারে পরাভূত। তুমি অসুরঘাতিনী ব্রাহ্মীশক্তি। তুমি শিবদূতী। ঘোররূপা, মহারাবা, সর্বসন্ত্রাস-কারিণী। তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা, শিরোমালাবিভূষণা। তুমি চামুণ্ডা, দানবমথনা। তুমি লক্ষ্মী। তুমি লজ্জা। তুমি পুষ্টি। তুমি শ্রদ্ধা। তুমি স্বধা। তুমি ধ্রুবা বিনিশ্চলা। তুমি অজ্ঞানরূপা মহারাত্রি। অনাত্মপ্রত্যয়রূপা অবিদ্যা। তুমি আবার পরমা সমুহতী ব্রহ্মবিদ্যা। তুমি মেধা ধারণাবতী বুদ্ধি। তুমি সরস্বতী,

শুদ্ধজ্ঞানবাসিনী অখিলবিদ্যা। তুমি বরা, অভয়পদপ্রদা। তুমি সাত্ত্বিকী, তুমি রাজসী, তুমি তমোভূতা। তুমি নিয়ন্তা, নিশ্চয়াত্মিকা। তুমি সর্বস্বরূপা সর্বেশা। সর্বশক্তিসমন্বিতা। তুমি আমাদের ভয় থেকে ত্রাণ করো জন্ম-মৃত্যুপীড়িত অল্পজ্ঞতা থেকে। হরণ করো আমাদের জীবত্বের দুর্গতি।

তোমার লোচনত্রয়ভূষিত সৌম্য মুখমণ্ডল আমাদের সর্বভূতে থেকে রক্ষা করুক। রক্ষা করুক জড়ত্বের শাসন থেকে। তুমিই তো জড়ত্ববাসিনী চৈতন্যশিখা। তোমার জ্বালাকরাল ত্রিশূল আমাদের রক্ষা করুক। রক্ষা করুক তোমার জগৎ-পরিপূরণী আনন্দিনী ঘণ্টাধ্বনি। রক্ষা করুক অসুররক্তপঙ্কলিপ্ত তোমার করোজ্জ্বল খড়্গ। রক্ষা করুক ভয় থেকে পাপ থেকে বন্ধতা থেকে। তুষ্ট হয়ে তোমার রোগনাশন, রুষ্ট হয়ে তোমার রোগশাসন। তোমার তুষ্টি-রুষ্টি দুই-ই তোমার মঙ্গলস্পর্শ। তোমার তুষ্টিতে অভীষ্টপূর্তি রুষ্টিতে অভীষ্টবিলয়। কখনো সঞ্চিত করো কখনো বঞ্চিত করো। কিন্তু যে তোমাকে আশ্রয় করেছে তার আর কিসের ভয়, কিসের অভাব। না, তুমিই মমত্বগর্তে বিবেকদীপ। তুমিই বিভ্রান্ত হয়ে অনুসন্ধান করছ নিজেকে। আবার ভ্রান্তিও যে তুমি। আবার উদ্ভাসিনী উন্মুক্তিও তুমি। অনেকরূপে আত্মমূর্তিকে বহুধা করে পরিব্যাপিনী হয়ে আছ। রূপে-রূপে প্রতিরূপা হয়ে আছ কন্যা? তুমি ছাড়া আর কে আছে? বহু হয়েও তোমার একত্ব অক্ষুণ্ণ। অনন্ত আধারে তুমিই একাধেয়া। যেমন অজ্ঞানে তেমনি অধ্যবসায়ে। যেমন অন্ধকারে তেমনি বিধূম পাবকে। কা ত্বদন্যা? আর কে আছে তুমি ছাড়া? তুমি সর্বজীবসম্মোহিনী শর্বরী। তুমিই আবার সর্বভূতহিতৈষিণী জ্যোতির্গঙ্গা।

'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' আমার দ্বিতীয় কোথায়!

আমিই স্পন্দনাত্মিকা নিত্যপ্রবৃত্তিমতী শক্তি। আমিই প্রবুদ্ধসলিলা বেগবতী স্রোতস্বতী। আমিই লোকবরদা বিশ্বেশবন্দ্যা।

ঠাকুর বলছেন মাস্টারকে। 'আর বিচার কোরো না। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়াতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বলছেন আবার মাস্টারকে। 'ভোগের লুচি বেড়ালকে খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছে, বেড়াল পর্যন্ত।'

'কিছু হল না তাতে?'

'খাজাঞ্চি সেজবাবুর কাছে চিঠি পাঠালে, অনাচারের শাসন করতে। সেজবাবু লিখলে, উনি যা করেন তাতে কিছু বলতে যেও না।'

আহা কত রূপে মাকে দেখলাম। কত বেসে কত বয়সে।

'কাল মাকে দেখলাম।' ঠাকুর বলছেন প্রাণকৃষ্ণকে, 'গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নেই জামাতে। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন।'

শুধু ভাব-ভক্তিতে দর্শন। ভাবতে-ভাবতে প্রেমের চক্ষু হয়ে যায়। সেই চক্ষুতেই মায়ের আবির্ভাব।

হলধারী কি তা মানত? বলত, তিনি তোমার ভাবের জন্য বসে আছেন আর

কি। তিনি ভাব-অভাবের অতীত।

'আমি তখন মাকে গিয়ে বললাম, 'মা, হলধারীর কথাই কি ঠিক? তাহলে তোমার এই রূপ-টূপ সব মিথ্যা? মা তখনি রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন।'

'কে রতির মা?'

'লালবাবুর রানী কাত্যায়নীর মোসায়েব। গোঁড়া বৈষ্ণবী। কিন্তু বড় একঘেয়ে।'

'রতির মা'র বেশে দেখা দিয়ে মা কি বললেন?'

'বললেন তুই ভাব নিয়েই থাক।'

কিন্তু আমরা সংসারীরা আছি অভাব নিয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'অভাবও পথ। ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। মা, আমার হাত ধরে নিয়ে যাও। ঠাকুর হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঁদছেন মায়ের জন্য। আমি ছোট ছেলে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলতে পারছি না। তুমি এগিয়ে এসে আমাকে ধরো। আমাকে কোলে করে নিয়ে যাও। যে পথ দিয়েই হাঁটি না কেন তোমার কোলটুকুই আমার শেষ পৌঁঠা।

'কারণ নন্দরূপিণী, মা, বলো, আমি খাব না তুমি খাবে?'

এ সংসারে ডরি কারে
রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর
খাস তালুকে বসত করি।

১৫৩

ঠাকুরের ব্যাধির তৃতীয় কারণ কি? নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন, 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মাকে বললাম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। ঢুকে যাও। তাই তো এখন এই হীন-দেহ।'

নইলে কী হত?

'নইলে সেই জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোক জ্বালাতন করত। সর্বক্ষণ ভিড় লেগে থাকত। সামলানো যেত না। তিষ্ঠোতে দিত না এক মুহূর্ত।'

এখন কি হচ্ছে?

রূপের প্রকাশ নেই দেখে আগাছারা পালিয়ে যাচ্ছে। বলাবলি করছে, এই অবতার? এ তো আমাদের মত সামান্য সাধারণ। আমাদের মতই ভুগছে অসুখে অপ্রতিকার্য যন্ত্রণায়। তবে এ আর আমাদের কী মনস্কামনা পূরণ করবে। নিজের ব্যাধি সারাতে পারে না আমাদের কোন ব্যাধির নিরসন করবে। চলো ফিরে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করব! দেখেছ? শরীর কেমন হয়ে গিয়েছে

ভুগে-ভুগে! এতই যখন ভুগছে, শরীরের যখন এই হাল, তখন একজন সাধারণ সাধুর সঙ্গে তফাত কি!

'এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানেই ঐ।' বললেন ঠাকুর, 'যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে। যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা আমাকে অহেতুক ভালবাসে তারাই লেগে থাকবে, তারাই টি'কে থাকবে। আগাছার দল শুকিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ব্যাঙের ছাতা।'

সেইখানেই তো তুমি অবতার। এই সাধারণত্বেই তো তুমি অসাধারণ। তুমি আর-আরদের মত ঐশ্বর্য নিয়ে আসোনি এবার। না রাজসম্পদ না বা শাস্ত্র-ব্যাকরণ। না বা রূপবল স্বাস্থ্যশক্তি। একটা সিদ্ধাই পর্যন্ত দেখালে না। ছদ্মবেশ ধরে এলে। পাঁচজনের একজন হয়ে রইলে। আমাদের ছেড়ে চলে গেলে না বনে-পর্বতে, মঠে-মন্দিরে, বিদেশে-বিভুঁয়ে। আমাদের মাঝখানেই বাসা বাঁধলে। নিরীহের মত, নিরাভরণের মত। আমাদের মত দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত রইলে। দুঃখ-কষ্টের পাশ কাটিয়ে চলে গেলে না। ইচ্ছামৃত্যু ঘটালে না। সমাধি অবস্থায় দেহ ছাড়লে না। শূন্যে মিলিয়ে গেলে না হাওয়া হয়ে। তিল-তিল করে ভুগলে, তিল-তিল করে জীর্ণ করলে দেহ। কেন? শুধু এই আশ্বাস দিতে যে তুমি আমাদেরই একজন। আমাদের রোগে শোকে দুঃখে কষ্টে যদি কেউ পাশে দাঁড়াবার থাকে সে তুমি। তুমিই সাহস তুমিই উৎসাহ। এই বোঝাতে যে দুঃখকষ্টও ঈশ্বরের অভিপ্রায়, আর এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমি অপাপ, অকলঙ্ক। 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন, তুমি আনন্দে থাকো।'

'শরীরের রোগ হলে বোধ হয় আমার রোগ হয়েছে।' হীরানন্দকে বললেন ঠাকুর। 'কিন্তু আমাকে কে ধোঁয়? দোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না।'

হীরানন্দ সিন্ধী, কলকাতার কলেজে পড়ে বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু ভক্ত। সবচেয়ে বড় কথা—শান্ত। আর কথা যেন মধুমাখা।

হীরানন্দ জিগগেস করলে, 'ভক্তের এত দুঃখ কেন?'

নরেনের কি হল, হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললে, দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মনে হয় এক শয়তান। আমি যদি হতুম তা হলে এর চেয়ে ঢের-ঢের ভালো জিনিস তৈরি করতুম।'

'কেন? দুঃখ আছে বলে?' হীরানন্দ বললে, 'দুঃখ না থাকলে সুখবোধ কোথায়? অন্ধকার না থাকলে কে আর আলোকে অভ্যর্থনা করত? বিরহ ছিল বলেই তো মিলন এত স্পৃহণীয়। অন্যায় যদি না থাকত তা হলে কে দিত সুবিচারের মর্যাদা?'

সবাই ভালো সর্বত্রই ন্যায় এই নিষ্প্রাণ সমতলতা জীবনের বৃদ্ধির পথে অভিশাপ। নিচুটি ছিল বলেই তো উঁচুর মাথা উঁচু। মন্দটি ছিল বলেই তো ভালোর জন্যে এত প্রসার প্রচেষ্টা। যদি জন্ম থেকেই ভালো থাকতাম তাহলে আর বড় হতাম কি করে? যদি না পড়তাম কি করে আসত তবে ওঠবার সংকল্প?

মৃত্যু ছিল বলেই তো অমৃতের প্রতি অভিসার। সে জন্যেই তো অমৃতলোক থেকে মৃত্তিকালোক এত মধুর। দেবতার চেয়েও মানুষ বড়।

সীতা অযোধ্যায় ফিরে আসার পথে রামকে নালিশ করলে, 'কেন এত সব ভাঙা বাড়ি? কেন সব সমান সুন্দর নয়?

রাম বললে, 'সব বাড়িই যদি সুন্দর হয় তাহলে মিস্ত্রিরা কি করবে?'

ঠাকুর সেই মিস্ত্রি। সবাই যদি সৎ ও ধার্মিক হয়, লেশমাত্র গ্লানি ও ম্লানতা কোথাও না থাকে, তাহলে তো আসেন না অবতার। তাহলে তো পেতাম না ঠাকুরকে। নয়নমনোহরকে। সংশয়-ক্লেশনাশনকে। কি করে হত তবে পরমতম সুহৃদসাক্ষাৎ। কোথায় তবে পেতাম জীবনের সংক্ষিপ্ত ও সারতম উত্তর? মহাবিরাট থেকে ক্ষুদ্র কীটাণু সবই যে এক অভিব্যক্তি, কোথায় তবে পেতাম সেই বিশ্বাসের অকার্পণ্য? সব পথেই যে সেই গতিসত্তম, সেই অখণ্ডমণ্ডন, কে দিত এই শুভদৃষ্টি? কার এত মধুম্রক্ষিত কথা, বেদানুসারিণী শোকবিনাশিনী বাণী? কে তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার, ধর্মের আয়তন? কে আমার সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি, আমার প্রাণবহনের সমীরণ!

আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। তমসার তীর থেকে জ্যোতির নির্মল তীর্থে।

অমৃতত্বের ধারয়িতাই এই শরীর।

'দেহ ধরেছি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব বলে।' বললেন ঠাকুর। 'আর এই বুঝব বলে, শরীরটা দুদিনের জন্যে, এই আছে এই নেই, সত্য শুধু ঈশ্বর।' সব রকম রাগিণী বাজিয়ে যাব। সব রকম স্পর্শের আস্বাদ নিয়ে যাব তাঁর হাত থেকে। কখনো তাঁর রুদ্রতেজ কখনো বা বরাভয়। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার কোলে নিচ্ছেন হাত বাড়িয়ে। বিচ্ছেদ-পারাবারের পারে নির্মিত করে রেখেছেন আবার মিলন-নিকেতন। কামকণ্টকের বৃন্তে ফোটাচ্ছেন প্রেমপ্রসূন। 'শরীর এই আছে এই নেই, তাই তাঁকে তাড়াতাড়ি ডেকে নাও।' বললেন ঠাকুর, 'আলোটি নিবতে না নিবতে দেখে নাও তাঁর মুখখানি।'

চোখের পাতাটি খোলো। আলোক-অন্ধকারে দেখ সেই আনন্দমুখ।

'শরীরটা যেন বাখারি-সাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে।' বললেন ঠাকুর, 'কিন্তু ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে।'

ভিতরে একজন আছে বলেই এত আশ্চর্য ব্যাপার। নেপথ্যে একজন রয়েছে বলেই এত রঙ্গলীলা। আমাকে ধরে রেখেছে কে? পৃথিবী। পৃথিবীকে ধরে রেখেছে কে? আকাশ। আকাশকে ধরে রেখেছে কে? কেউ জানে না। আর আকাশে কি একটা সূর্য, একটা চন্দ্র, একটা ধ্রুবতারা? আকাশে নক্ষত্র-পরমাণুপুঞ্জ। কত সেই অমেয় স্থান যাতে অগণন আশ্রয় পেয়েছে। আর সবই কিনা ঘুরছে একটি সুশৃঙ্খল সুষমায়। একটি সুকেন্দ্রিত ছন্দে। সেই সর্বাকর্ষণের কেন্দ্র কে?

সেই কেন্দ্রই আবার বিরাজ করছে আমার হৃদয়ের মধ্যে। আমার শরীরকে

বেঁধে রাখতে চাইছে একটি ছন্দের বিধানে।

'শরীরটা যেন হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল।' বলছেন ঠাকুর, 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আলু-পটল। আর সচ্চিদানন্দ অগ্নি।'

'কিন্তু অবতারের বেলায় ?'

'অবতারেরও দেহ-বুদ্ধি আছে।' বললেন ঠাকুর, 'শরীর ধরলেই মায়া। সীতার জন্যে রামও কেঁদেছিলেন, ধনুর্বাণ তুলতে পারেননি। তবে অবতারের জীবে প্রভেদ আছে। প্রকাশের প্রভেদ।'

বেলঘরের গোবিন্দ মুখুজ্জে এসেছে। বললে, 'কি রকম ?'

'অবতার ইচ্ছে করে নিজের চোখ কাপড়ে বাঁধে। ঐ যে ছেলেরা কানামাছি খেলে—দেখবি ? তেমনি। কিন্তু মা ডাকলেই খেলা থামায়।'

'আর জীব ?'

'তার অন্য কথা। তার যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ের পিঠে আটটা ইসক্রুপ আঁটা। সেই আট ইসক্রুপের নাম অষ্টপাশ। গুরু না খুলে দিলে উপায় নেই।'

আবার বললেন, 'ভগবান অবতার হয়ে আসেন কেন ? প্রেম-ভক্তি শেখাবার জন্যে। ঈশ্বরের অনন্ত লীলা। অত আমার দরকার কি ? আমার দরকার প্রেম-ভক্তি। আমার দরকার ক্ষীর। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাঁট।'

কিন্তু অবতারেও দেহবোধ আছে।

কে একজন যুবক এসে জিগগেস করলে, 'মশায়, কাম কি করে যায় ?'

ঠাকুর বললেন, 'একটু কাম-ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল তা কমাবার চেষ্টা করবে।'

'কি করে কমাব ?'

'শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। বহিঃ শিব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল।'

শ্রীশ্রীমাকে একজন জিগগেস করলে, 'মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।'

মা বললেন, 'ভয় কি, শুধু তাঁর নাম করো। যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।'

'কিন্তু মা, কাম যে যায় না ?'

'কাম কি একেবারে যায় গা ? শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে।' মা বললেন অভয়শান্ত মুখে, 'তবে কি জানো, তাঁর নাম করো, দেখবে সাপের মাথায় ধুলো-পড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।'

সেই লোকটি আবার জিগগেস করল ঠাকুরকে, 'এত চেষ্টা করি, তবু মাঝে-মাঝে মনে কুচিন্তা আসে।'

'আসুক না।' বললেন ঠাকুর। 'ও নিয়ে মাথা ঘামাস কেন ? আসবে আবার চলে যাবে।' লোকটি অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওরে ভগবানের দর্শন একবার না হলে কাম একেবারে যায় না। তা হলেও বা কি ! শরীর যত দিন থাকে তত দিন একটু-আধটু থাকে। তবে কি জানিস ?

মাথা তুলতে পারে না ! তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে ?'

যুবক মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'একবার মনে হয়েছিল কামটা সম্পূর্ণ জয় করেছি।' প্রসাদবদান্য মুখে ঠাকুর বলতে লাগলেন। 'বসে আছি পঞ্চবটীতে, হঠাৎ এমনি কামের তোড় এল যে সামলাতে পারি না। তখন ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, মা, ভীষণ অন্যায় করেছি অহঙ্কার করে ফেলেছি। আর নিজেকে কখনো ভাবব না কামজয়ী বলে। এত কাঁদবার পর তবে যায়।'

যুবকটির সান্নিহিত হলেন ঠাকুর। অন্তরঙ্গের মত বললেন, 'তোদের এমন যৌবনের বন্যা, তাই পাচ্ছিস না বাঁধ দিতে। বন্যা যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে ? তবে তোকে বলি শোন, কলিতে মনের পাপে পাপ নয়।'

'নয় ?'

'না। ওগুলো শরীরের ধর্মে আসে যায়। মনে যদি কুভাব এসে পড়ে তাতে ঘাবড়াবি কেন ? কি ভাব এল গেল নজরও দিবিনে। শুধু হরিনাম করবি আর প্রার্থনা করবি। দেখবি আস্তে-আস্তে সব বাঁধ মেনেছে। হজম ভালো আছে, আর উঠবে না মনের চোঁয়া ঢেঁকুর।'

একটি ভক্ত-মেয়ে মাকে বললে জাঁক করে, 'মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে। মা তখুনি চমকে উঠলেন। বাধা দিয়ে বললেন, 'বোলো না, বোলো না, অমন না।'

'কথা বলতে নেই।'

কখন দর্পনাশনের বজ্র উদ্যত হয়ে উঠবে বলা যায় না। সুতরাং শান্ত হও, দীনতা আনো, প্রার্থনা করো।

'মা গো, কি করে লাভ হবে ভগবান ?' আর্ত হয়ে মেয়েটি জিগগেস করল মাকে।

'জপধ্যান সাধন আরাধনা—এ সবে ?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি গাঢ়।

'কিছুতে না ?'

'কিছুতে না।' মায়ের স্বরটি দৃঢ়।

'কিছুতে না ?'

'কিছুতেই না।' মায়ের স্বরটি কঠিন-তীক্ষ্ন।

'তবে কি হবে ! কিসে হবে ?' চারদিকে যেন আঁধার দেখল মেয়েটি।

'একমাত্র তাঁর কৃপাতে হবে।' সমস্ত গ্রন্থি মোচন করে দিলেন মা। বললেন, 'তাই বলে কি ধ্যানজপ করবে না ? করবে। ধ্যানজপে মনের ময়লা কাটবে। মনের ময়লা না কাটলে কৃপার প্রসাদ ধরবে কি করে ? যেমন ফুল নাড়তে-নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে-ঘষতে গন্ধ বের হয় তেমনি ভগবানের আলোচনা করতে-করতে ভগবানের উদয় হয় চোখের সামনে।'

কৃপা—শুনতে অযৌক্তিক, কিন্তু আসলে একমাত্র যুক্তি—ঐ কৃপাই।

'তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার জো নেই।' বলছেন ঠাকুর, 'কামকাঞ্চনকে ঠিক-ঠিক মিথ্যে বলে বোধ হওয়া, এই জগৎ তিন কালেই অসৎ এর সম্যক ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়, নইলে যত সাধন-ভজন করই না, সব ফাক্কার। মানুষের কতটুকু শক্তি ? সে শক্তি দিয়ে কতটুকু সে চেষ্টা করবে, কতটুকুই বা আয়ত্ত করবে ?'

'জ্ঞানভক্তি দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে না ?' জিগগেস করল মাস্টার।

'আধারের উপর নির্ভর করছে।' বললেন ঠাকুর, 'কোনো বাঁশের ফুটো বড়, কোনো বাঁশের ফুটো সরু। ঈশ্বরবস্তুর ধারণা কি সকল আধারে সম্ভব ? এক সের ঘটিতে কি দু সের দুধ ধরবে ?'

'কিন্তু যদি তাঁর কৃপা হয় ?' মাস্টার উছলে উঠল। 'তিনি যদি কৃপা করেন তবে তো ছুঁচের মধ্য দিয়ে উটও চালাতে পারেন।'

ঠাকুর হাসলেন। 'কিন্তু কৃপা কি অমনি হয় ?'

'অমনি হয় না ?'

ঠাকুর আবার হাসলেন। 'ভিখিরি যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়, কিন্তু যদি একেবারে রেল-ভাড়া চেয়ে বসে ?'

মাস্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরও স্তব্ধ। হঠাৎ আত্মগতের মত বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হতে পারে। তাঁর কৃপা হলে কারু-কারু আধারে দুই-ই হতে পারে। কেন পারবে না ? তাঁর কৃপায় কি দাঁড়-বেড়া আছে ?'

তার দৃষ্টান্ত আর কে নরেন ছাড়া ?

কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, দেখা দে, ওরে আমার বড় সাধ, ভক্তের রাজা হব। একে-একে সে সব লোকই জুটছে। যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তার আসতেই হবে এখানে। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তের দল। নরেনের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হচ্ছে আজকাল। ছোট-নরেনের কুম্ভব সমাধি। এমন কি ডাক্তার সরকারও বুঝি দলে ভিড়ল।

'কাল রাত তিনটের সময় তোমার জন্যে বড্ড ভেবেছিলুম।' ডাক্তারের গলা স্নেহসিক্ত।

'কেন বলো তো ?'

'বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। ভয় হল তোমার ঘরের দোর-টোর সব খুলে রেখেছে না কি করেছে কে জানে !'

ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। 'বলো কি গো।'

'আর না বলে করি কি ! তোমাকে যে ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছুঁয়ে-ধরে আমারও প্রায় সাধু হবার দশা।'

'উপায় নেই।' বললে মাস্টার। 'ঠাকুর একবার জাদুঘর দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, জানোয়ার ফসিল—পাথর হয়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসলেন, পাথরের সঙ্গে থেকে-থেকে পাথর হয়ে গেছে। তেমনি সাধুর কাছে থাকতে-থাকতে সাধু হয়ে যায়।'

'কিন্তু তোমার দেহটি টিঁকিয়ে রাখতে না পারলে কি করে দুদিন সঙ্গ করি ?'

'কিন্তু সর্বক্ষণ দেখছি যে দেহ আলাদা আত্মা আলাদা। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা শাঁস আলাদা তেমনি। যেমন খাপ আলাদা তলোয়ার আলাদা। তাই তো দেহের অসুখের জন্যে বলতে পারি না মাকে।'

'দেহটি থাকলেই তো মায়ের নামগুঞ্জন হবে।' ডাক্তার তদ্গতের মত বললে। 'তাই তো, সেবার আমার খুব অসুখ, কালীঘরে বসে আছি, কেন কে জানে, মা'র কাছে খুব প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হল। নিজের হয়ে বলতে বাধল। হৃদের হয়ে বললাম। বললাম, মা, হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বলতে। বলা আর শেষ হল না, চোখের কাছে দপ করে সেই জাদুঘরের ছবি ভেসে উঠল। মা-ই দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন তারে বাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ। আমি বললুম, মা, তোমার নামগান করে বেড়াব, দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও।'

দেহের আর কাজ কি ! ঈশ্বরের হাতের বীণা হও।

আমাকে তোমার হাতে তুলে নাও, ধুলো থেকে তুলে নাও, তোমার নন্দননিকুঞ্জ থেকে সুর এনে একে প্রাণময় করো, গীতিময় করো, রসবর্ষণময় করো। তোমার নয়নস্পর্শে বধির অন্ধকারে আলোর পুলকিত তারকার কণিকাগুলি জ্বলে-জ্বলে উঠুক। হৃদয়হারা রুক্ষ পাথর গলে-গলে যাক অশ্রুর উদ্বেলতায়। আমাকে বেদনায় চেতনায় জর্জরিত করো। নবীন আঘাতের স্নানে নবজন্মের নির্মল আয়ু আনো জীবনে।

আর মনের কাজ কি ? সপ্ততীর্থে উপনীত হও।

সত্যতীর্থ, ক্ষমাতীর্থ, দমতীর্থ, দয়াতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, তপতীর্থ আর তীর্থ প্রিয়বাদিতা। এই সপ্ততীর্থ মানসতীর্থ। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী আর দ্বারাবতী এই সপ্ত স্থানতীর্থে কি হবে, যদি মানসতীর্থে না অবগাহন করতে পারো ! তীর্থফল হচ্ছে মনের নির্মলতা। মানসতীর্থে সেবা না করলে সেই ফলপ্রাপ্তি হবে কি করে ? তোয়পূতে দেহ দিয়ে কি হবে, তোয়পূতে মন চাই। যার চিত্ত সুবিশুদ্ধ সেই যথার্থ স্নাত।

'তীর্থে গেলে কী হয় ? আর কিছু হয় না, উদ্দীপন হয়।' বললেন ঠাকুর, 'মথুরবাবুর সঙ্গে সেই বৃন্দাবন গিয়েছিলাম না ? কালীয়দমন ঘাট দেখামাত্রই উদ্দীপন হত, বিহ্বল হয়ে যেতাম। ছোট একটি ছেলের মতন করে হৃদে নাওয়াতো আমাকে। বৃন্দাবনের বেশ ভাব তাই না ? নতুন যাত্রী এলে বৃন্দাবনের ব্রজবালকেরা কলরব করতে থাকে, হরি বোলো গাঁঠরি খোলো। হরি বোলো গাঁঠরি খোলো।'

ভাবের নদীতে উজান এসেছে। নৌকো ছাড়ো। পাল তুলে দাও। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে এতদিন গাঁঠরি-বোঁচকা বেঁধেছ সেই বস্ত্রখণ্ড খুলে নিয়ে পাল টানাও। আর ভাবনা নেই, হাততালি দাও আর গান গাও।

'অবতার যখন আসে সাধারণ লোকে জানতে পারে না।' বললেন ঠাকুর,

'অবতারকে চিনতেও সাধন লাগে। সেই হীরের দর যাচাই করতে পাঠিয়েছিল বেগুনওয়ালার কাছে। বেগুনওয়ালা বললে, বড়জোর ন সের বেগুন দিতে পারি, তা এও বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি। পরে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। কাপড়ওয়ালার পুঁজি বেশি, সে বললে, নশো টাকা। হাজার টাকা দাও তো ছেড়ে দিয়ে যাই। ওরে বাবা, বাজারদরের চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছি। এবার চলো খাঁটি জহুরির কাছে। জহুরি এক পলক দেখেই লাফিয়ে উঠল। বললে, এক লাখ টাকা দেব। যার যেমন পুঁজি তার তেমন দর।'

জহুরির চোখ চাই। চাই জ্ঞানপ্রেমের চক্ষু।

'অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে কই? অবতার ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, 'কোথাও বন্ধ হয় না বন্দী হয় না।' বলছেন ঠাকুর, 'অবতারের আমি পাতলা আমি। বলতে পারো ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের দুই দিকেই অনন্ত মাঠ। পাঁচিলের যে দিকে দাঁড়াও সেই দিকেই দেখা যায় অনন্ত মাঠ। ফোকর দিয়ে এদিক ওদিক আনাগোনা করা যায়। এদিকে দেহধারণের যোগ ওদিকে আবার দেহাতীত সমাধি।'

যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণ অনেক সব দেখালেন। গোলোক দেখালেন, দেখালেন অখণ্ড জ্যোতি। যশোদা বললেন, 'কৃষ্ণ রে, ও-সব কিছু দেখতে চাই না। তোর মানুষরূপ দেখা। আমার কোলে ওঠ, আমার বুকে আয়। আমি তোকে কোলে করব নাওয়াব-খাওয়াব।'

'তাই অবতারের শরীর থাকতে-থাকতেই তাঁর সেবা-পূজো করতে হয়।' বললেন ঠাকুর, 'আর অবতারের উপর একবার ভালোবাসা এসে গেলেই হয়ে গেল।'

ভালোবাসা এলে কী হলে? নিশ্চিন্ত হলে।

সুজির পায়েস খেতে দিয়েছে ঠাকুরকে। কিন্তু খেতে-খেতে কাশি উঠল বুঝি। পুঁজরক্তমেশানো গয়ার ফেললেন সেই পায়েসের বাটিতে।

ভক্তদের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'অবতার তো বলো, খেতে পারো এই উচ্ছিষ্ট পায়েস?'

খুব পারি। পায়েসের বাটি মুখে তুলল নরেন। এক চুমুকে খেয়ে ফেলল যা-কিছু ছিল সেই বাটিতে।

১৫৪

একমাত্র নরেনই পারে। নরেনই পারে সমস্ত হজম করতে।

সে একাধারে জাগ্রত বহ্নি আর তুহিন-তুষার। সেই পারে জ্বালিয়ে দিতে পুড়িয়ে দিতে, গলিয়ে দিতে তলিয়ে দিতে। সূর্যের দীপ্তি আর চন্দ্রের শৈত্য একসঙ্গে। একসঙ্গে অপ্রমেয় অপরাজিত জ্ঞান আর মাধুর্যধৈর্যসুভগা ভক্তি। এক

দিকে মুরজ-ডিণ্ডিম-বাদ্য বিলক্ষণ, অন্য দিকে মধুর-পঞ্চমনাদ-বিশারদ। নরেনই তো সেই ভস্মভূষণ ভাস্কর কন্দর্প-দর্পনাশন শিব। ওই তো পারে সেই বিষ ধারণ করতে। 'যখন ও বুঝবে ও কে', বললেন ঠাকুর, 'তখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে।'

সেই আত্মনিরীক্ষণ করবার জন্যেই তো নরেন যেতে চায় সমাধিভূমিতে। ঠাকুর তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। বললেন, চাবি রেখে দিলাম আমার হাতে, আমি না খুলে দিলে সেই বন্ধ ঘরে তুই ঢুকতে পাবিনে।

মনের সপ্তম ভূমিই সমাধি।

ঠাকুর সমাধির বিশ্লেষণ করছেন। প্রথম তিন ভূমি লিঙ্গ গুহ্য আর নাভি। যতক্ষণ মনের কামকাঞ্চনে আসক্তি ততক্ষণ এই তিন ভূমিতেই ঘোরাফেরা করে, কিছুতেই পারে না ঊর্ধ্বে উঠতে। কিন্তু যদি একবার ছাড়া পায় মন উঠে আসে চতুর্থভূমিতে, হৃদয়ে। তখন একটা আলো দেখে, নূতন দেশের আলো। অবাক হয়ে যায় এ আভা কোথায় ছিল, কোথায় ছিল এত অব্যক্ত ব্যঞ্জনা! তখন মন আর নিচে নামতে চায় না। বলে, দেখেছি ঢের দেখেছি তোমাদের জারিজুরি, তোমাদের চটুকে রঙ্গ। আর ও-সবে ভুলছিনে। আস্তে-আস্তে শেষে পঞ্চভূমি, কণ্ঠে আসে। মন যার কণ্ঠে উঠছে ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে বা শুনতে তার ভালো লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে সেখান থেকে উঠে যায়। তার পর, ষষ্ঠভূমি?

ষষ্ঠভূমি কপাল। সেখানে গেলে মন নিরন্তর ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কিন্তু সর্বক্ষণ ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না সেই নিরুপমকে, নিরবদ্যকে। তখনও একটু থেকে যায় আমিত্বের পরদা। যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো বাইরে তার কাচের আবরণ। এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললাম, আলিঙ্গন করলাম সেই দিব্যজ্যোতিকে, কিন্তু না, এখনো একটু বাধা আছে।

বাধা-ব্যবধান সব দূরে গিয়েছে, উড়ে গিয়েছে সপ্তমভূমিতে। সেই ভূমিই সমাধিভূমি। তার স্থান শিরোদেশে। সেখানে উঠলেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। নিত্য আলিঙ্গন। সেই অবস্থায় একুশ দিনে মৃত্যু।

'কিন্তু এ সব জ্ঞানের পথ, কঠিন পথ।' বললেন ঠাকুর সংসারী ভক্তদের। 'তোমাদের ভক্তির পথ। ভালোবাসার পথ। ভালোবাসায় কি হয়? মন প্রাণ লীন হয়ে যায়। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা তেমনি নিষ্ঠা আনো ঈশ্বরে। সেই ভালোবাসার থেকেই ভাব হবে—ক্রমে মহাভাব।'

ভাব হলে কি হয়? মানুষ অবাক হয়ে যায়। বায়ু স্থির হয়, সেই বায়ু স্থির হওয়ার নামই কুম্ভক। বন্দুকের গুলি ছোড়বার সময় যে গুলি ছোড়ে সে বাক্‌শূন্য হয়, তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। তেমনি প্রেমের জিনিসের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হও, অর্মনণেই যোগ হয়ে যাবে।

মা ঠাকরুণ বললেন 'আমি একবার তারকেশ্বর যাব।'

'কেন?' ঠাকুর তাকালেন আকুল চোখে।

'সেখানে গিয়ে হত্যে দেব। বলো, যাব ?'

'যেতে চাও তো যাও। কিন্তু কিছু কি হবে ?'

'কেন হবে না ? একবার সিংহবাহিনীকে জাগিয়েছিলাম, এবার পারব না পশুপতির ঘুম ভাঙাতে ? সেবার নিজের অসুখে এবার তোমার অসুখে। আর, তুমি তো জানো, তোমার অসুখেই আমার অসুখ।'

হে তারকেশ্বর, জাগো, ত্রাণ করো।

তুমি কাশীতে বিশ্বনাথ, কৈলাসে কৈলাসেশ্বর। কামরূপে বৃষধ্বজ, মণিপুরে মহারুদ্র। হরিদ্বারে গঙ্গাধর, নেপালে পশুপতিনাথ। চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, নর্মদায় বাণলিঙ্গ। উৎকলে জগন্নাথ, নীলাচলে ভুবনেশ্বর। সেতুবন্ধে রামেশ্বর, পুষ্করে পুরুষোত্তম। ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ আর রাঢ়ে তারকেশ্বর।

যাচ্ছ, যে, পারবে জাগাতে ?

কেন পারব না ? সাবিত্রী পারেনি ?

সত্যবান বললে, সাবিত্রী, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে করছে ঘুমুই।

সাবিত্রী মাটিতে বসে পড়ল। স্বামীর মাথা কোলে টেনে নিল। খানিক পরেই দেখতে পেল কে একজন রক্তবসন রক্তনয়ন পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ সূর্যের মত তেজস্বী।

আস্তে-আস্তে স্বামীর মাথা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সাবিত্রী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। কম্প্রবক্ষে হাত জোড় করে বললে, 'আপনাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, আপনি কে, কেন এসেছেন ?'

'সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না', বললে সেই অভ্যাগত, 'তাই তোমাকে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। শোনো, আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। এই দেখ, আমার হাতে পাশ। আমি তাকে এই পাশে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার অনুচরদের না পাঠিয়ে আপনি নিজে এসেছেন কেন ? সাবিত্রী এতটুকু ভয় পেল না।

'তোমার স্বামী পরমধার্মিক, রূপবান, গুণসাগর। তাই দূত না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি।' এই বলে যম সত্যবানের দেহের মধ্যে থেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ করে সবলে আকর্ষণ করে নিষ্কাশিত করল। মুহূর্তে সত্যবানের দেহ শ্বাসহীন, প্রভাহীন, চেষ্টাহীন হয়ে গেল।

যম চলল দক্ষিণ দিকে।

ব্রতসিদ্ধা সাবিত্রী দুঃখার্তচিত্তে চলল তার পিছু-পিছু।

কৃতান্ত বললে, 'এ কি, তুমি চলেছ কোথায় ? তুমি ফিরে যাও, তোমার স্বামীর পারলৌকিক কাজ সমাধা কর। তুমি তোমার ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, তোমার আর ভয় কি ?'

'স্বামী যে স্থানে নীত হন বা স্বয়ং যেখানে যান সেখানে স্ত্রীরও গতি, এই নিত্যধর্ম। তপস্যা গুরুভক্তি, ভর্তৃস্নেহ ও ব্রতবলে ও সবার উপরে আপনার

প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত। আপনার সঙ্গে সপ্তপদ ভ্রমণ করা হয়ে গিয়েছে, তাই আপনি আমার মিত্র। সেই মিত্রভাব থেকে আপনাকে যা বলছি শুনুন। গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বধর্মের প্রধান। পতিহীনা হয়ে বনে বাস করে আমি কি করে সেই ধর্মাচরণ করব ?'

'অনিন্দিতে, তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।' যম ফিরে দাঁড়াল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া যা চাইবে তাই পাবে। বর নিয়ে ফিরে যাও।'

'আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে অরণ্যবাসী হয়েছেন। আপনি তাঁকে চোখ দিন। চোখ পেয়ে অগ্নি আর দিবাকরের মত তিনি বলবান হোন।'

'তথাস্তু। এবার তবে নিবৃত্ত হও।' যম বললে, 'তুমি পথশ্রান্ত হয়েছ। আরো যাবে তো আরো তোমার ক্লান্তি বাড়বে।'

'আমি যখন আমার স্বামীর কাছে-কাছে আছি তখন আর আমার ক্লান্তি কি ? যেখানে তিনি যাবেন আমিও সেইখানে যাব। তিনিই আমার যাত্রা, তিনিই আমার গতি। সুতরাং আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, দিগন্তরেখা উত্তীর্ণ হয়ে আমি হেঁটে যাব। তা ছাড়া আপনার মত সজ্জনসংগ পাব কোথায় ? সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সমাগমেই মিত্রতা, তাই সাধুসমাগমও কখনো নিষ্ফল হয় না। তারই জন্যে সাধুসংসর্গেই বাস করা বিধেয়।'

যম উৎসাহিত হল। বললে, 'ভামিনি, তোমার বাক্যবিন্যাস হৃদয়রঞ্জন, হিতকর ও বুধগণেরও বোধবর্ধন। তুমি আরেক বর, দ্বিতীয় বর চাও। সত্যবানের জীবন ছাড়া যে কোনো প্রার্থনা।'

'আমার শ্বশুর তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পান ও তাঁর ধর্মে অবিচ্যুত থাকুন।' সাবিত্রী দ্বিতীয় বর চাইল।

'তথাস্তু।' যম দ্রুতক্ষেপে পা চালাল। 'কিন্তু এ কি, এখনো আসছ কেন ? আর যে পারবে না চলতে, তোমার পা টলে-টলে পড়ছে।'

'পড়ুক'। যমকে থামতে দেখে সাবিত্রীও থামল। বললে, 'আপনারই নিয়মে জীবজগৎ নিগৃহীত, কর্মের নিয়মে আবার যার যা যাতায়াত। সর্বত্রই এই নিয়মের বিধানশাসন। তাই আপনার যম-নাম সুবিখ্যাত। আমার আরো কথা শুনুন। কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ আর দান এই সাধুদের সনাতনধর্ম। শত্রু হলেও সে যখন মর্তের লোক তখন নিশ্চয়ই সে দুর্বল ও অল্পজীবী, তাই সাধুরা শত্রুদের দয়া করেন।'

'কি সুন্দর তোমার কথা সাবিত্রী!' যম গদগদ ভাষে বললে, 'যেন পিপাসিতের কাছে শীতল জল। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া তৃতীয় বর যাচ্ঞা কর।'

'আমার পিতার পুত্র নেই, তাঁর যেন বংশকর শত পুত্র জন্মে, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।'

'তথাস্তু।' যম আবার চলতে শুরু করল। 'এবার তো তুমি কৃতকামা হলে, এখন প্রতিনিবৃত্ত হও। দেখ কত দূরে পথে চলে এসেছ।'

'আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে আছি তখন কোনো পথই আমার দূরে পথ নয়।' সাবিত্রী স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আমার মন দূরতর পথে ধাবমান। বেশ তো, আপনি চলতে-চলতেই আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের পুত্র, তাই আপনি বৈবস্বত। প্রজাদের পক্ষপাতরহিত ধর্মশাসন করেন বলে আপনি ধর্মরাজ। সুতরাং আপনি সজ্জন। সজ্জনের উপর যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।'

'ভদ্রে, এমন চারুবাণী আর কোথাও শুনিনি।' যম হাত তুলল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ বর প্রার্থনা করো।'

'সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্যশালী কুলবর্ধন এক শত পুত্র হোক —এই আমার চতুর্থ প্রার্থনা।' সাবিত্রী দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

'তথাস্তু। তোমার বলবীর্যবান আনন্দবর্ধন শত নন্দন হোক। এবার তবে প্রত্যাবর্তন করো।'

সাবিত্রী আবার যমকে অনুগমন করতে লাগল। বলতে লাগল, 'সাধুদের ধর্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সাধুরা কখনো অবসন্ন হন না, ব্যথিত হন না, সাধুর সঙ্গে সাধুর সমাগম চিরকাল ফলান্বিত। সাধুরাই সত্য দ্বারা সূর্যকে চালিত করছেন, তপস্যা দ্বারা ধারণ করছেন পৃথিবীকে। পরস্পর অপেক্ষা না করে আর্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করে থাকেন। তাঁদের প্রসাদ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারু প্রার্থনা বা সম্মানের হানি হয় না। তাই সাধুরাই সকলের রক্ষাকর্তা।'

যম বললে, 'তোমার সুবিন্যস্ত ধর্মসংহত বাক্য যত শুনছি ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অতএব আবার তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করো।'

'হে মানদ! আপনি আমাকে শতপুত্রের বর দিলেন কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ, স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নই। স্বামী ছাড়া আমার মৃত্যুতুল্য। সুতরাং আমাকে শতপুত্রতা বর দিয়ে কি করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামীকে? অতএব আমার স্বামী জীবিত হোন, এই আমার পঞ্চম, আমার পরম প্রার্থনা।'

সানন্দচিত্তে যম বললে, 'তথাস্তু। কুলনন্দিনি, এই তোমার স্বামীকে পাশমুক্ত করে দিচ্ছি। ইনি নীরোগ, কৃতার্থ ও তোমাতে বশীভূত হয়ে চারশো বছর জীবিত থাকবেন আর যজ্ঞ ও ধর্ম দ্বারা খ্যাতিলাভ করে তোমাকে শত পুত্রের জননী করবেন। এবার যাও, স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

দ্রুত পায়ে সাবিত্রী ফিরে গেল, যেখানে তার স্বামীর মৃত কলেবর পড়ে আছে। ভূমি নিপতিত ভর্তাকে আলিঙ্গন করে তার মাথা নিজের কোলের উপর নিয়ে বসল। সত্যবান চোখ খুলে সপ্রেমে তাকাল সাবিত্রীর দিকে, প্রবাসাগত লোক যেমন তাকায় তার প্রণয়িনীর দিকে। বললে, 'কি কষ্ট। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, আমাকে জাগাওনি কেন এতক্ষণ? যিনি আমাকে টেনে নিয়ে

যাচ্ছিলেন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায় ?'

'জীবিতনাথ', সাবিত্রী আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, যাঁর কথা জিগগেস করছ তিনি লোকসংহর্তা যম। তিনি এখন ফিরে গিয়েছেন স্বস্থানে। যদি শরীরের শক্তি ফিরে পেয়ে থাকো তো ওঠবার চেষ্টা করো। রাত ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে।' সত্যবান উঠে বসল। সমুদায় দিক আর অরণ্যানী নিরীক্ষণ করতে লাগল। বললে, 'সুমধ্যমে, এখন বেশ মনে করতে পারছি। কাষ্ঠপাটন করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে। শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, তোমার বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তারপর। তারপর স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না, ঘোরতিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে দেখলাম। সে কে ? যদি তুমি কিছু জানো তো বলো।'

'কাল বলব। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। তোমার মা বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। কি করে পথ দেখবে ?'

'তবে থাক, আজকের রাত এখানে বসেই কাটিয়ে দিই। তুমি পীড়িত, দুর্বল, পথ চলতে অসমর্থ। ঐ দেখ, এখানে-ওখানে শুষ্ক তরু জ্বলছে, ওখান থেকে আগুন এনে কাঠ জ্বালাই, সে আগুনে তুমি তোমার শরীরগ্লানি অপনোদন করো।' সাবিত্রী উঠে পড়ল।

'না, না, এখানে রাত কাটাব না। মা-বাবার কাছে ফিরে যাব।' সত্যবান অস্থির হয়ে উঠল. 'এখনো বাড়ি ফিরিনি, না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন আমার জন্যে। দুজনেই বৃদ্ধ হয়েছেন, তা ছাড়া আমার বাবা নয়নহীন। আমিই তাঁদের যষ্ঠিস্বরূপ। তাঁদের জীবনেই আমার জীবন। তাঁদের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠানই আমার একমাত্র ধর্ম।' গুরুপ্রিয় ধর্মাত্মা সত্যবান পিতামাতার উদ্দেশে কাঁদতে লাগল। সাবিত্রী তার অশ্রুমার্জনা করে রাত্রির উদ্দেশে বললে, 'যদি আমি কোনো তপশ্চর্যা করে থাকি তা হলে হে শর্বরি, আমার শ্বশ্রু, শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে কল্যাণকারিণী হও। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখনো মিথ্যা বলিনি, আজ সেই সত্য তাঁদের অবলম্বন হোক।'

'আমাকে শিগগির তাঁদের কাছে নিয়ে চল। যদি দেখি তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়েছে তা হলে এ জীবন আর রাখব না। আমি এখন সমর্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি, বরারোহে, তুমি এখন ত্বরান্বিত হও।'

কেশপাশ দৃঢ়বদ্ধ করে দু-বাহু দিয়ে সবলে স্বামীকে টেনে তুলল সাবিত্রী। ফলের থলে আর কাঠ কাটবার কুঠার তরুশাখায় ঝোলানো ছিল, তুলে নিল। নিজের কাঁধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করে দক্ষিণ হাতে তাকে আলিঙ্গন করে ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল।

এগুতে লাগল মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে। নবাবির্ভাবের প্রাণলোকে।

ঠাকুর বললেন, 'এই তোর দুই দেবতা, মা আর বাবা। এদের ছেড়ে তুই কোথায় যাবি ? কোন বনে, কিসের সন্ধানে ?'

'বাবা-মা কত বড় গুরু।' আবার বললেন ঠাকুর। 'রাখাল আবার জিগগেস করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না? তবে কি জানো? যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাউকে দেয় না। এমন কি কুকুরকেও না।'

রাম এসে নালিশ করল ঠাকুরের কাছে। 'বাবা গোল্লায় গেছেন।'

বাবার অপরাধ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন।

'শুনলে?' ঠাকুর ভক্তদের দিকে তাকালেন। 'বাবা গোল্লায় গেছেন আর উনি ভালো আছেন।'

বিমাতার এখন বয়স হয়েছে তবু রামের রাগ পড়েনি। বলে, 'একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে। বলি, বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকুন, তা নয়।'

'তোমার স্ত্রীকেও অমনিধারা বাপের বাড়িতে থাকতে বলো না।' কে একজন টিটকিরি দিয়ে উঠল।

'এ কি হাঁড়ি-কলসী গা?' ঠাকুর সহাস্য প্রতিবাদ করলেন: 'হাঁড়ি এক জায়গায় সরা আরেক জায়গায়? এ যে শিবশক্তি। এদের তো একত্র স্থিতি। বেশ তো, বাপের বাড়ি কেন, আলাদা বাড়ি করে দাও না। মাস-মাস খরচ দেবে।'

'কিন্তু বাপ মা যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করেন, তাহলেও কি তাঁদের ত্যাগ করা যাবে না?' কে আরেকজন জিগগেস করল।

'কখনো না। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না মাকে।' ঠাকুর বললেন, 'গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে শিষ্যরা বললে, ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে! নষ্ট হল তো কি হল। তুমি তাঁকেই ইষ্ট বলে জেনো।'

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

'মা-বাপ কি কম জিনিস গা?' বললেন ঠাকুর। 'তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না। যেই বাবা-মা মানুষ করল, তাদের ফাঁকি দিয়ে ছেলে-মাগ নিয়ে যে বেরিয়ে আসে, হলই বা না বাউল-বৈষ্ণব, আমি বলি ধিক।'

প্রাণ ফিরে পেয়েই সত্যবান চলল তাই তার গৃহে, তার বাপ-মা'র কাছে। তার যুগ্ম-দেবতা দর্শনে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পেল কার তপস্যায়? কে সে মহীয়সী, কৃতান্ত-নিবৃত্তিনী?

দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটালেন শ্রীমা। তারকেশ্বর মুখ তুলে চাইল না। তবু ছাড়ব না তোমার চৌকাঠ। ঠায় পড়ে রইলেন। তাঁর ব্যাধি সারিয়ে দাও। তাঁকে অক্লেশ-অব্রণ করো।

তৃতীয় দিনের মধ্যরাত্রে, হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন শ্রীমা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। যেন পর-পর বসানো আছে মাটির হাঁড়ি, তা যেন একটার পর একটা কে লাঠির বাড়ি মেরে ভেঙে দিচ্ছে। ঐ শব্দে জেগে উঠলেন শ্রীমা। কই, কিছু নেই তো। এর তবে মানে কি?

হৃদয়ের গভীরে উত্তর পেলেন শ্রীমা। এ জগতে কে কার স্বামী, কে কার

স্বামী ? যিনি গড়বার গড়েছেন, যিনি ভাঙবার ভাঙবেন। সব সেই কামারের দোকানের হাঁড়িকুঁড়ি!

মায়ার মেঘ সরে গেল এক মুহূর্তে। যা হবার হবে যা করবার করবেন, আমি কেন আত্মহত্যা করি! আমার আত্মনিধন নয়, আত্মনিবেদন।

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মন্দিরের পিছনে এসে পৌঁছুলেন। হাতড়ে-হাতড়ে পেলেন স্নানকুণ্ড। অঞ্জলি করে জল তুললেন। পিপাসায় কণ্ঠ কাঠ হয়ে আছে। তাই দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করলেন। দেহে যেন একটু বল এল। হ্যাঁ, এবার ফিরতে পারবেন কাশীপুর।

'দু-ভাই রামলক্ষ্মণ সশরীরে লঙ্কায় যাবে ঠিক করেছে।' ঠাকুর গল্প বলছেন। 'কিন্তু সামনে সমুদ্র, দুষ্পার বাধা। লক্ষ্মণের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কি এত বড় কথা ? সমুদ্র আমাদের বাধা দেবে ? ধনুর্বাণ উত্তোলন করল। বললে, বরুণকে এক্ষুনি বধ করব। রাম তাকে বুঝিয়ে বললে, ভাই লক্ষ্মণ, চোখের সামনে যা দেখছ সব মায়া, স্বপ্নবৎ। সমুদ্রও মায়া, তোমার রাগও মায়া। একটা মায়া দিয়ে আরেকটা মায়ার বিনাশ করবে, সেটাও মায়া।'

সেই নহবৎখানার সাধুর কথা মনে নেই ? কারু সঙ্গে কথা কইত না, শুধু এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করত। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ এল আর দেখতে-দেখতে সর্বনাশা ঝড় এল হুড়মুড় করে। ঝড়ে উড়িয়ে নিল মেঘ। দেখা গেল আবার সেই আকাশ-ভরা রোদের ঝিকিমিকি। সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় নাচতে শুরু করল। হাততালি দিতে লাগল আনন্দে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি তাকে জিগগেস করলুম, তুমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ থাক, হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দে নৃত্য করছ কেন ? তোমার হল কি ?'

হল কি! সাধু বললে, মায়ার খেলা হল। চোখের সামনে মায়ার খেলা দেখলুম। এই দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল দিকদিগন্ত। কোত্থেকে ঝড় এসে উড়িয়ে নিল মেঘ। আবার সেই পরিষ্কার আকাশ।

মায়া শব্দের আসল অর্থ কি ? আসল অর্থ হচ্ছে ভগবদিচ্ছা।

শ্রীমা ম্লানমুখে ঠাকুরের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন, 'কি গো, কিছু হল ?' পরে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, 'কিছুই হবার নয়।'

জানো ? আমিও সেদিন স্বপ্ন দেখলাম ওষুধ আনতে হাতি গেল। মাটির নিচে ওষুধ পোঁতা, মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে হাতি। দিব্যি খুঁড়ছে, ওষুধ এই বেরুলো বলে, এমনি সময় গোপাল এসে ঘুম ভেঙে দিল।

'আচ্ছা, তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ ?' ঠাকুর জিগগেস করলেন শ্রীমাকে।

'সেদিন দেখেছিলাম।'

'কি দেখলে ?'

'দেখলাম কালী-মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর ঘাড় কাত।'

'মাকে কিছু জিগগেস করলে ?'

'বললাম, মা তোমার ঘাড় কাত কেন ?'

'মা কি বললেন ?'

'বললেন, আমার গলায় ঘা ।'

'কিছু বুঝলে ?'

স্থির নয়নে প্রশান্ত আস্যে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমা ।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে ফিরেছে বিবেকানন্দ। বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সমস্ত দেহ চাদরে ঢেকে মা এককোণে দাঁড়িয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গে। বলল, 'মা, তোমার ঠাকুর কিছু নয়।'

'কেন বাবা, কি হল ?'

'একেবারে কিছু নয়! কোনো কিছু শক্তি ধরে না। নিজের অসুখ তো সারাতে পারলই না, আমাদেরও না। একেবারে বাজে ঠাকুর।'

মা ক্ষীণ একটু হাসলেন। কি হয়েছে তাই বল না ?

'কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আনাগোনা করত।' বললে স্বামীজি। 'তাতে সেই ফকিরের খুব আক্রোশ হল আমার উপর। নিজের চেলাকে ঠেকাতে পারে না, যত রাগ আমার উপর। শেষে ফকির আমাকে শাপ দিল। বললে তিন দিনের মধ্যে তোমার পেটের অসুখ হয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আমি ঠাকুর ভরসা করে নিশ্চিন্ত মনে আছি, ঠাকুরের কাছে কিসের ঐ পাহাড়ী ফকির! কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমার ঘোরতর পেটের অসুখ শুরু হল আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। সামান্য একটা ফকিরের কাছে হেরে গেলেন।'

'বিদ্যা! বিদ্যা মানতে হয় বই কি বাবা!' মা বললেন স্নিগ্ধ স্বরে। 'আমাদের ঠাকুর তো কিছুই ভাঙতে আসেননি, সব মেনে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যও শুনেছি নিজের দেহে ব্যাধি আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো সেই ঠাকুরের খুড়তুতো দাদাকে—'

'কে, হলধারীকে ?'

'তিনি একবার ঠাকুরকে শাপ দিয়েছিলেন তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। তা উঠেছিল সেই রক্ত। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা।'

'ও সব কিছুই মানি না। তুমি তোমার ঠাকুরের দিকে টেনে কথা কইছ। আসলে তোমার ঠাকুর কিছুই নয়। যাই কেন না বলো আমি আর মানতে রাজী নই।'

মা বললেন, 'না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা! তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।'

নরেন হাসতে লাগল।

সিদ্ধাই দেখিয়ে কি হবে? হরিপদ তাপহরণের ধাম, সেই দিকে এগুতে পারবে এক পা? জাগাতে পারবে কুলকুণ্ডলিনী? মূলাধারে সেই সর্পীতুল্য শক্তি? পদ্মমৃণালের মধ্যবর্তী তন্তুর মত অতি সূক্ষ্মা, শঙ্খবর্তসমা নবীনচপলার মত দেদীপ্যমানা। ভ্রমরমালার গুঞ্জনের মত আবার অস্ফুট মধুর শব্দ করছে। সেই কূজনকারিণী জীবনদায়িনী শক্তিকে জাগাতে পারবে?

ঠাকুর বললেন, সেই সমুদ্রপারের সাধু ঝড় থামাতে গিয়ে জাহাজডুবি করেছিল। জানো না সেই কাহিনী?

সাধু সিদ্ধ হয়েছে। একদিন বসে আছে সমুদ্রের ধারে, ঝড় উঠল। ঝড়ে তার খুব অসুবিধে হচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, ঝড় থেমে যা। তার কথা মিথ্যে হবার নয়। বলা মাত্রই ঝড় থেমে গেল। তাতে ফল হল এই, পাল তুলে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, হাওয়া বন্ধ হওয়ামাত্রই জাহাজ টুক করে ডুবে গেল। অনেক লোক ছিল জাহাজে, মারা পড়ল। তার জন্যে যে পাপ হল তা বর্তাল এসে সেই সিদ্ধপুরুষে। সিদ্ধাই তো গেলই, নরকবাসের থেকেও রেহাই পেল না।

চিনু শাঁখারির কথা মনে আছে? কামারপুকুরের সেই বুড়ো সাধক, পরম বৈষ্ণব। ছেলেবেলায় যার পায়ে পড়ে বলেছিল রামকৃষ্ণ ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার তোরা হরিবোল বল। দেখা হলেই রামকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করত আর বলত, ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।

একবার হল কি শোনো। কতকগুলি সাধু ঘুরতে-ঘুরতে কামারপুকুরে একদিন চিনুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হল। তখন আমের সময় নয়, তবু সাধুদের কি বেয়াড়া সাধ, তারা মৌরলা মাছ দিয়ে আমের টক খাবে। চিনু তো মাছ যোগাড় করল কিন্তু আম কোথায়? অতিথি নারায়ণ, তাদের ইচ্ছা তো আর অপূর্ণ রাখা যয় না! চিনু বিমূঢ়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কেমন করে মুখ রাখি, কেমন করে ধর্মহানি থেকে রক্ষা পাই?

কাতর হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চিনু শেষকালে একটা আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। গলায় কাপড় দিয়ে মাথা কুটতে-কুটতে বললে, আমার ভিটেয় আজ ছলনা করতে অতিথিরূপে নারায়ণ এসেছেন। এসে বলছেন আম দিয়ে মাছের টক খাবেন। আমি দীনহীন পথের কাঙাল, অসময়ে আম কোথা পাব? কেমন করে তুষ্ট করব তাঁদের? দেবতার যদি দয়া না হয়, আমি কি করতে পারি?

আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি গুটিকতক কাঁচা আম ঝরে পড়ল গাছ থেকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন সেই কাহিনী। চিনুকে বললেন, 'ছি দাদা, বিভূতি, সিদ্ধাই, হ্যাক থুঃ। অমন আর করোনি। তা হলে বেটা-বেটিরা তোমার মাথা খাবে। খবরদার ও-সব আর করতে যেওনি, ও সবে মন দিলে মন নেমে যাবে।'

হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, নদীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া, আগুনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা, আরেক দেশে কে

কি বলল তাই ঠিক বলতে পারা—এই সব ইন্দ্রজাল। এই সবে আছে কি! প্রতিষ্ঠা আর লোকমান্য হতে পারে, কিন্তু সে বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে সরে পড়ে। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না।

সত্যিকারের সাধুর লক্ষণ কি?

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু। সত্যই যার বল, যার ভিত্তি, সর্বজীবে অসূয়াহীন। সর্বোপকারক। বিষয়ে অক্ষুব্ধ, সংযত, মৃদু, শুচি আর অকিঞ্চন। অনিচ্ছুক, বিত্তত্যাগী, শান্ত, স্থির আর শরণাগত। অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা আর যে ষড়গুণ জয় করেছে। নিজে মানাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং অমানীমানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক আর কবি অর্থাৎ সম্যকবোদ্ধা।

আর ভক্তের লক্ষণ কি? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দর্শন অর্চন আর পরিচর্যা। স্তুতি আর গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান। আমাতে লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন। আমার জন্মকর্মকথন, আমার পর্বানুমোদন। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব আর নিজে সে কি করেছে তার পরিকীর্তনে অস্পৃহা।

এই ভক্তি লাভ হবে কি করে।

একমাত্র সাধুসঙ্গে। সর্বমঙ্গলনাশক সাধুসঙ্গ। যোগ, সাংখ্যধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্ত্যাগ, পূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম কিছুই আমাকে বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে সাধুসঙ্গ। তুমি শুধু সাধু হও, আমি তোমার সঙ্গী হব। তুমি শুধু মধুর হও, আমার সঙ্গে তোমার অপরিচ্ছিন্ন মৈত্রী। বৃত্র, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, জটায়ু, আর কুব্জা—এদের কি ছিল? এরা বেদ পাঠ করেনি, উপাসনা করেনি, এদের ব্রত ছিল না। তপস্যা ছিল না, শুধু নিজ সঙ্গ দ্বারা, শুধু সাধুসঙ্গহেতু পেয়েছিল আমাকে।

আর ব্রজাঙ্গনারা?

তাদের কিছু নেই, আছে একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ। একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ থেকেই একান্ত ভক্তিলাভ হয়। মহাভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের তাই সম্বোধন করল উদ্ধব। বলল, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছ। অস্পর্শসমুদ্রে মগ্ন আছ সর্বক্ষণ। তোমরা ছাড়া আর কার এমন মহাভাগ্য! মুনিদুর্লভা ভক্তির তোমরাই জনয়িত্রী। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে, আমার সঙ্গকালে গোপবালারা এক রাত্রিকে ক্ষণার্ধ বলে মনে করেছে। আর অক্রুর এসে যখন আমাকে মথুরায় নিয়ে গেল, তখন আমার বিরহে তাদের এক রাত্রিকে মনে হয়েছিল এক কল্প। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পৃথক অস্তিত্ব হারায় তেমনি তারাও আমাতে মিশে নিজেদের হারিয়েছিল। পুত্র পতি দেহ স্বজন ভবন—কোনো দিকে তাকায়নি। কিন্তু কী তাদের সম্বল? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বা আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ

ভক্তি নিয়ে আমার শরণ নাও, তাহলে আর তোমার ভয় নেই।

'মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ', বলছে গোপীরা : 'বনবাসিনী আমাদের দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলার মত যদিও আমরা জানি, নৈরাশ্যই পরম সুখ তবু শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের দুরত্যয়া আশা। তাঁর বার্তার জন্যে কে নিরুৎসুক থাকতে পারে? তাঁর সেবাধন্য সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ-গাভী, বেণুরব, তাঁর শ্রীনিকেতনস্বরূপ পদাঙ্ক বারে-বারে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সেই ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন আর মধুর বচনে আমরা হৃতধী। তাঁকে ভুলি কি করে? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজগত, হে আর্তিনাশন, দুঃখনিমগ্ন গোকুলকে উদ্ধার করো।'

কোথায় বনচারী গোপী, কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ! কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃতকে যে জানে না সেও যদি তা আস্বাদ করে, পায় তার শ্রেয়োফল। তেমনি গোপীরা জানে না কার সঙ্গ করেছে, কিন্তু ফল পেয়েছে হাতে-হাতে। আমাদের কিছু জেনে দরকার নেই। বলছে ব্রজবালারা, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণ-পাদাম্বুজাশ্রয় হোক। আমাদের কথা তাঁরই নামাভিধায়িণী হোক। আমদের কায় ভুলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করুক। মঙ্গলাচরিতে হোক, কর্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হতে-হতেই হোক, যেখানেই থাকি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অচঞ্চল থাকে।

গোপীদের প্রণাম করল উদ্ধব। প্রার্থনা করল, গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা ওষধির মধ্যে আমি যেন একটা কিছু হই। যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করেছে সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারে-বারে বন্দনা করি।

ভক্তিই মুখ্য। কর্মমীমাংসক বলে, ধর্মই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কারিক বলে, যশই উদ্দেশ্য। বাৎস্যায়ন বলে, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকার বলে, সত্য আর শমদমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎ বলে, ঐশ্বর্যই উদ্দেশ্য। চার্বাক বলে, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি, যাকে আশ্রয় করলেই ঈশ্বরদর্শন।

'ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্রলোক চায় না, কিছু চায় না, শুধু আমাকে চায়।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ কিছুই আমাকে তত বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে ভক্তি উর্জিতা ভক্তি।'

ভক্তের জাত নেই। তাদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও!' গেঁড়াতলার মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুসলমান ফকির আর্তনাদ করছে। এই আর্তনাদের সুরটি ভালোবাসার। মনস্তনুময় ব্যাকুলতার। কাকে ডাকছে অমন গলা বাড়িয়ে? কাকে বুকে ধরবার জন্যে মেলে ধরেছে দুই বাহু?

একটা ছ্যাকরা গাড়ি এসে দাঁড়াল না? কে একজন যেন নামল গাড়ি থেকে! এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ না?

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।' মুসলমান ফকির প্রেমগদগদস্বরে অথচ তীক্ষ্ণ আর্তি নিয়ে ডাকতে লাগল।

ঠাকুর কালীঘাট থেকে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। পথে এসেছেন মৌলালি। ফকিরকে দেখে যেতে। বুক ভরে নিতে তার ভক্তগাত্রস্পর্শ।

'প্যারে আ যাও, প্যারে আ যাও।'

মুসলমান ফকির আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা পড়লেন।

তপস্যার কি দরকার? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন তাহলে তপস্যা নিরর্থক, যদি না থাকেন তাহলে আরো নিরর্থক। তাই তপস্যা থেকে বিরত হও। শুধু ভক্তি লাভ করো, সুপক্কা ভক্তি। এই ভক্তি-কাটারি দিয়েই ভবনিগড় ছেদন হবে। জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি।

জীবকোটি ভক্তি ধরে সমাধিতে আসে। আর ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধ, নির্বিকল্প সুসমাহিত। যেমন শুকদেব।

বিষ্ণু পাঠালেন নারদকে,শুকদেবকে নিয়ে এস, পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাতে হবে।' বলছেন ঠাকুর। 'নারদ এসে দেখে শুকদেব সমাধিস্থ, জড়ের মত বসে আছে বাহ্যশূন্য হয়ে। তখন বীণা বাজাতে শুরু করল নারদ। চারশ্লোকে বর্ণনা করতে লাগল হরির রূপ। প্রথম শ্লোকে শুকদেবের রোমাঞ্চ, দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্রু, তৃতীয় আর চতুর্থ শ্লোকে একেবারে রূপদর্শন।'

জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত এই শুকদেব। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় তার হৃদয়ে দেদীপ্যমান, তবু সুরগুরু বৃহস্পতির কাছে গেল ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র পড়তে। সর্বলোকের মাননীয় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুতেই শান্তি নেই। নিখিল যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও নয়। মোক্ষ ছাড়া শান্তি নেই কিছুতেই। ব্যাসকে গিয়ে বললে, 'বাবা, আপনি মোক্ষধর্মকুল, কিসে আমার চিত্ত প্রশান্ত হবে তার উপদেশ করুন।'

ব্যাস বললে, 'তুমি মিথিলাধিপতি জনকের কাছে যাও, তিনিই উপদেশ করবেন।' শুকদেব তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাস তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ দিয়ে যেও না, সাধারণ মানুষের মত পায়ে হেঁটে উপনীত হবে। পথে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের খোঁজ করবে না, করলেই বদ্ধ হবে সঙ্গপাশে। জনক আমাদের যজমান জেনে কিছুমাত্র অহঙ্কার দেখাবে না, সব সময়ে তাঁর বশবর্তী হয়ে থাকবে। দেখবে তিনিই তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন।'

পায়ে হেঁটে যাত্রা করল শুকদেব। পাহাড় নদী তীর্থ সরোবর শ্বাপদাকীর্ণ অটবী পার হল একে-একে। সুমেরুশৃঙ্গ থেকে শুরু করে চীন-হূণ দেশ দেখে ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল। কত রমণীয় পত্তন, কত সমৃদ্ধিশালী নগরী, কত মনোহর উদ্যান-উপবন চোখে পড়ল, কিন্তু চিত্ত কিছুতেই সমাকৃষ্ট হল না। কত অন্ন পানীয় আর ভোজন, ধান্য ও গোধূম, কত সুশোভিত ঘোষপল্লী, কত খেচর-জলচর পাখি, কত রূপবতী পদ্মিনী

কামিনী, কিন্তু কিছুতেই চিত্তবিকার ঘটল না। মনে শুধু এক চিন্তা, মোক্ষচিন্তা। মিথিলার রাজভবনের প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করা মাত্র দ্বারপালেরা কঠোর বাক্যে নিবারণ করল শুকদেবকে। অপমানেও কিছুমাত্র ব্যথা পেল না শুকদেব, মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মত দাঁড়িয়ে রইল একাকী। দারোয়ানদের মধ্যে একজন তাকে বন্দনা করে ঢুকিয়ে দিল দ্বিতীয় কক্ষায়। আগের মহলে ছিল রোদ এ মহলে ছায়া। কি রোদ কি ছায়া, শুকদেবের কাছে সমতুল।

মন্ত্রী এসে শুকদেবকে নিয়ে গেল তৃতীয় কক্ষায়। এখানে পুষ্পিত পাদপ আর কেলিসরোবর শোভা পাচ্ছে। এর নাম প্রমদাবন, মিথিলার আমরাবতী। মুহূর্তমধ্যে মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল আর উপস্থিত হল পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা। সকলেই তরুণবয়স্কা ও প্রিয়দর্শনা, আলাপকুশলা ও নৃত্যগীতনিপুণা। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পুজো করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করল শুকদেবকে। মনে মোক্ষচিন্তা নিয়ে আহার করল শুকদেব। হৃদয়জ্ঞা কামদক্ষা বারবিলাসিনীরা শুকদেবকে নিয়ে প্রমদাবন দেখিয়ে বেড়াতে লাগল আর সর্বক্ষণ মেতে রইল হাস্যগীতে নৃত্যক্রীড়ায়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হল না। সন্ধ্যা হলে বারবনিতারা শুকদেবকে আসন ও শয়ন দিলে। মহামূল্যে আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ রত্নজালভূষিত আসনশয়ন। আসনে বসে ধ্যাননিরত হয়ে পূর্বরাত্র কাটিয়ে দিল শুকদেব। মধ্যরাত্রি সুশান্ত নিদ্রায় যাপন করলে। শেষ রাত্রে উঠে শৌচক্রিয়া সেরে আবার ধ্যাননিমগ্ন হল। ধ্যানে ও সুষুপ্তিতে সর্বসময়েই তাকে ঘিরে বসেছিল বারবনিতারা, কিন্তু শুকদেবের মন বিচলিত হল না।

পরদিন জনক নিজে এসে গুরুপুত্রের সৎকার করলে। মাটিতে বসে করজোড়ে জিগগেস করলে, 'কি হেতু আগমন?'

'আমি পিতার আদেশে সংশয়নাশের জন্যে আপনার কাছে এসেছি। মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ আমাকে তা বলুন।'

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ অসম্ভব। আবার গুরু ছাড়া জ্ঞান লাভের আশা নেই।' বললে জনক। 'আচার্যই সংসার-সাগরের কর্ণধার আর জ্ঞান পল্লবস্বরূপ। সুতরাং গুরুর থেকে জ্ঞান লাভ করে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান আর গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করবে। কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ যাতে না হয় তারই জন্যে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একে-একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন করে কর্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করতে পারলেই মোক্ষপ্রাপ্তি।'

'কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই কি মোক্ষলাভ হতে পারে না?' অস্থির হয়ে জিগগেস করল শুকদেব।

'কেন পারবে না?' জনক তাকে আশ্বস্ত করল: 'বহু জন্মের সাধনায় ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়েছে, যার চিত্ত-বিশুদ্ধি হয়েছে, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। আর একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মোক্ষলাভ হলে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রম

গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না।'

জনক তারপর বলতে লাগল : 'জলচর যেমন জলে থেকেও জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল প্রাণীতে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে অবস্থিত দেখেও নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করবে। সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করবে। যে অন্যকে ভয় দেখায় না, নিজেও ভীত হয় না, এককালে কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করেছে, যে করেছে সম্পূর্ণ বৈরভাব বর্জন, যার মনে নেই আর মোহকারিণী ঈর্ষা, প্রিয়-অপ্রিয় কথা শুনে বা প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু দেখেও যার আহ্লাদ বা শোক নেই, স্তুতি-নিন্দা, লোহ-কাঞ্চন, সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্ম অর্থ-অনর্থ জীবন-মরণ যার কাছে সমান, সেই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করে। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার ঘর প্রকাশিত হয় তেমনি জ্ঞান দ্বারা লক্ষিত হয় পরমাত্মা। তোমার ভয় কি? তুমি ছিন্নসংশয়, দেহাভিমানশূন্য। বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও নির্মলনির্লোভ। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি নৃত্যগীতে-অনুরাগ বন্ধুস্নেহ শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি তোমার অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তুমি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করেছ সে পথই একমাত্র পথ।'

আত্মসাক্ষাৎকার হল শুকদেবের। হিমালয়ের পূব দিকে পিতার কাছে সে ফিরে গেল। সেখানে নারদের সঙ্গে দেখা। শুকদেব জিগগেস করল, 'দেবর্ষি, ইহলোকে কি হিতকর, আপনি আমাকে উপদেশ করুন।'

নারদ বললে, 'বৎস, বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ থেকে তপস্যাকে, মাৎসর্য থেকে শ্রীকে, মানাপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে আত্মাকে সতত রক্ষা করবে। আনৃশংসাই পরম ধর্ম। ক্ষমাই পরম বল। আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান। আর সত্যের সমান পরম আর কিছু নেই। কিন্তু সত্যের চেয়েও হিতবাক্যই বেশি বলবে। আমার মতে, যে বাক্য দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়, তাই সত্যবাক্য। কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য ব্যবহার করবে, এই দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছ, তবে আবার কার সঙ্গে শত্রুতা? অনৈশ্বর্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচাপল্যই পরম শ্রেয়। যে মরেছে বা যা নষ্ট হয়েছে তার জন্যে শোক করা মানে দুঃখ থেকেই দ্বিগুণতর দুঃখ টেনে নেওয়া। সুতরাং চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ। জ্ঞানতৃপ্ত হও। চারদিকে সুখাসক্ত জনতার মধ্যে একাকী অবস্থান করো। সংসার নদী অতি ভীষণ। রূপ এই নদীর কূল, মন এর স্রোত, স্পর্শ এর দ্বীপ, রস এর প্রবাহ, গন্ধ এর পঙ্ক আর শব্দ এর জলস্বরূপ। আর নৌকো তোমার এই শরীর, ক্ষমা তার ক্ষেপণী, দয়া তার বায়ু, ধর্ম স্থৈর্য, আকর্ষণ রজ্জু। এই শরীর-নৌকায় নদী পার হয়ে যাও। তপোবলে সংসারবন্ধ থেকে বিমুক্ত হয়ে অনন্তসুখসংবর্ধনী সিদ্ধি লাভ করো।

'আর দেখ, যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ আসে তখন কি পৌরুষ কি প্রজ্ঞা কি নীতিবল কিছুতেই তার নিবারণ করা যায় না। তবু স্বভাবত সর্বদা সাবধান থাকবে। জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ দেহ, সর্বদাই তার ক্ষয় হচ্ছে। সূর্য নিজে অজর

কিন্তু পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হয়ে জীবের সুখদুঃখ জীর্ণ করছে, ইষ্টানিষ্টকে সহচর করে রাত্রিও পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। চেয়ে দেখ ক্রিয়াফল কিছুই তোমার হাতে নেই। তা যদি হত তোমার সব বাসনাই সব উদ্যোগই তুমি সিদ্ধ করতে পারতে। কত নিয়মধারী কার্যদক্ষ মতিমান লোক সৎকর্ম থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে ফল লাভে বঞ্চিত হয়, আবার কত নিগুর্ণ নরাধম মুর্খও উৎকৃষ্ট ফল পায়। কত লোক সর্বদা হিংসা ও বঞ্চনা করেও পরম সুখে কালাতিপাত করে আর কত সাধু বিবিধ বিচিত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেও অসমর্থ ও অকৃতকাম।

'লোকে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আবার সে চিকিৎসকও কালক্রমে ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগের মত রোগের কবলে গিয়ে পড়ে। ধন, রাজ্য বা তপস্যা দিয়ে কেউই স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। শুধু কামনানিবন্ধনই যত ক্লেশভোগ। তুমি মোহবিহীন হয়ে প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করো।'

শুকদেব স্থির করলেন যোগবলে কলেবর ত্যাগ করে বায়ুভূত হয়ে তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করব। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে দেখা করে যাই। ব্যাসকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াল শুকদেব। নিত্য-স্নানের উদ্দেশে যোগানুষ্ঠান করতে যাবে শুনে ব্যাস চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকো, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু চরিতার্থ হোক।'

স্নেহশূন্য সংশয়মুক্ত শুকদেব পিতার বচনমাধুর্যে বিচলিত বা বিগলিত হল না। পিতাকে ত্যাগ করে সিদ্ধনিষেবিত কৈলাস পর্বতে চলে গেল।

ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল ব্যাস আর সরোদনে 'শুক' বলে আহ্বান করতে লাগল। সর্বগামী সর্বতোমুখ শুকদেব স্থাবরজঙ্গম অনুনাদিত করে প্রত্যুত্তর করল, 'ভোঃ'। সেই অবধি সমুদয় বিশ্বমধ্যে এই একাক্ষর 'ভোঃ' প্রচলিত হল। আজও গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ করলে ঐ একাক্ষর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শব্দাদিগুণকেও অতিক্রম করল শুকদেব। ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হিমালয়প্রস্থ দেশে ব্যাস পুত্রের অনুধ্যান করতে বসল। কাছেই মন্দাকিনী-তীরে স্নানরতা বিবস্ত্রা অপ্সরারা বিরাজ করছিল, ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে কেউ জলে ডুবল, কেউ লতাগুল্মের অন্তরালে পালাল, কেউ-কেউ বা ত্বরান্বিত হয়ে টেনে নিল ত্যক্ত বাস। ব্যাস বুঝল, তার পুত্রই মুক্ত আর তার নিজেরই বিষয়কলুষ। যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় অভিভূত হল ব্যাস।

পুত্রশোকার্ত পিতার কাছে পিনাকপাণি শঙ্কর আবির্ভূত হল। বললে, মহর্ষি, তুমি আমার কাছে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের মত বীর্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করেছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলাম। তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে, তবে তোমার কিসের দুঃখ? তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয়কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। আর মহামুনি, তোমাকে

এই বর দিচ্ছি, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্বদা সর্বস্থানে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে। এই দেখ। শুকদেবের ছায়া এসে দাঁড়াল।

'একমতে আছে, শুকদেব সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র আস্বাদ করেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'সমুদ্রের হিল্লোল-কল্লোল দর্শনশ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু ডুব দেন নাই সমুদ্রে।'

হিমালয়ের ঘরে পার্বতীর জন্ম। পিতাকে তার নানা রূপ দেখাতে লাগল পার্বতী। হিমালয় বললে, 'মা এসব রূপ তো দেখলাম, কিন্তু তোমার যে একটি ব্রহ্মস্বরূপ আছে, সেইটি একবার দেখাও।'

পার্বতী পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তাহলে সংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'হিমালয় জানে না সে দর্শনের মানে কি।'

কিছুতেই ছাড়বে না হিমালয়। তখন পার্বতী একবার দেখাল।

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'দেখামাত্রই গিরিরাজ মূর্ছিত।'

ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও শরীর রাখতে পারে কে? একমাত্র অবতার। তাও শুধু লোকশিক্ষার জন্যে।

১৫৬

অত-শতয় দরকার কি? শুধু সরল হয়ে যাও।

'সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।' বলছেন ঠাকুর।

কিন্তু সরল হওয়া কি সহজ কথা?

বঙ্কিম চাটুজ্জেকে বলছেন, 'কপট হয়েছ কি, তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। সেয়ানাবুদ্ধি পাটোয়ারিবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি করতে গিয়েছ—অমনি তিনি বেপাত্তা।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন। একবার দেখ না ডেকে। ছেলে যেমন মাকে না দেখে দিশেহারা হয়, মেঠাই-সন্দেশে ভোলে না, কেবল মা-মা করে; তেমনি করে একটু ডাকো না। একবার আন্তরিক কাতর হও না মায়ের জন্যে। দেখ না মা আসে কিনা ছুটে। একটি নির্ভুল সরলরেখার মত।

'তাই তো ছোকরাদের এত ভালবাসি।' ডাক্তারকে বলেছেন ঠাকুর। 'যেন নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। আর বিষয়ী লোকেরা হচ্ছে দই-পাতা হাঁড়ি, দুধ রাখলেই নষ্ট। তা, তোমার ছেলেটি বেশ। এখনো বিষয়বুদ্ধি কামিনীকাঞ্চন ঢোকেনি।'

'বাপের খাচ্ছেন কিনা তাই।' ডাক্তার পরিহাস করল। 'নিজের করতে হলে দেখতুম বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কিনা।'

'তা বটে।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কি জানো, ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধির থেকে দূরে;

নইলে একেবারে হাতের মধ্যে।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন।

এক যাত্রাওয়ালা দেখা করতে এসেছে, তাকে বলছেন। 'শোনো, আরেকটি কথা। যাত্রাশেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে যারা গায় আর যারা শোনে সকলেই একটু ঈশ্বর ভাবনা করতে-করতে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হবে।'

যাত্রারম্ভে তো করোনি যাত্রাশেষে করো হরিনাম। পরিণামে হরিনাম। কিন্তু সমস্ত পথ ধরে করে না এলে কি শেষ কালে মনে পড়বে?

তাই সরল হয় শেষ জন্মে। 'শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'বহু জন্মের তপস্যার পরেই সরল-উদার হওয়া চলে।'

তবে এ জন্মের উপায় কি?

খুব করে বালকের সঙ্গে মেশ। বালক ভাব আরোপ করো নিজের মধ্যে। যতক্ষণ বালকদের সঙ্গে মিশবে ততক্ষণ তুমি নিজেও বালক, নিজেও আত্মভোলা। বালকের মতই তুমি সরল, বালকের মতই তুমি বিশ্বাসী। শিখবে কি করে আখখুটে হতে হয়, কান্না জুড়ে ছুঁড়তে হয় হাত-পা, মায়ের কোল পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হয়।

দুটি সন্তানবতী গৃহস্থবধূ দর্শন করতে এসেছে ঠাকুরকে। দুটি জা, একই পরিবারের। এসেছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে। নম্রশ্রীতে বসেছে ঠাকুরের কাছে।

'শোনো, শিবপুজো করবে।' বললেন ঠাকুর।

সর্বভূতাত্মা সর্বলোককৃৎ সর্ববিগ্রহ শিব। সর্ববাসী সর্বচারী সর্বকালপ্রসাদ। দেখবে স্ফটিকশুভ্র শিব বসে আছেন পদ্মাসনে। কাঁধে-গলায় সাপ গর্জন করছে, মাথার জটায় কুল-কুল করছে গঙ্গা। চূড়ায় শশধরের মুকুট।

'ঠাকুর পুজোর কাজ অনেকক্ষণ ধরে করবে। অনেকক্ষণ ধরে।' তাদের বলতে লাগলেন ঠাকুর। 'এই প্রথম ফুল তুললে, পাতা বাছলে, মালা গাঁথলে, অনেকক্ষণ —অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে ঠাকুরের বাসন মাজলে, চন্দন ঘষলে, ঠাকুরের জল-খাবার সাজালে। এ সব যে কাজ করছ এও ঠাকুর পুজো। দু জায়ে যে কথা কইবে তাও ঠাকুরের কথা। তখন কোথায় সংসারের হীনবুদ্ধি, রাগদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-হীনতা! তখন শুধু তেলের ধারার মত আনন্দের ধারা।'

যখন বাসন মাজবে, মনে করবে চিত্তমার্জনা করছ। যখন চন্দন ঘষবে, মনে করবে নিজেকে নির্মল করে কোমল করে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিচ্ছ ঈশ্বরে।

পুজোর আয়োজনও পুজো। প্রেমের আয়োজনই প্রেম।

'আমাদের কি একটু কিছু বলে দেবেন?' বড় বউটি জিগগেস করল।

'কি, মন্ত্র?'

দু-চোখে সস্মিত সম্মতি ভরে তাকাল বউটি।

'কিন্তু আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র নিলে শিষ্যের সব পাপ-তাপ নিতে হয়। মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন।'

বউ দুটি কি একটু বিমর্ষ হল ?

ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমাদের যে ভাবে পুজো করতে বলে দিলাম তাই কোরো, ভাবনা কি। তা ছাড়া হরিনাম যে করতে বলেছিলাম তা হচ্ছে ?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বউ দুটি।

'তবে আর কথা নেই।'

সর্বদা নাম করবে। নামে ভাসবে নামে ডুবে থাকবে। দেখবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হবে। দেখবে ঘুমেও নাম ছাড়া নও। নামে যদি একবার আনন্দ হয় তাহলে আর কিছু করতে হয় না। করবার দরকারও হয় না। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, যথাতিরিক্ত।

'তোমরা উপোস করে এসেছ বুঝি ?' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বউ দুটি চুপ করে রইল।

'উপোস করে এসেছ কেন ? মেয়েরা আমার মা'র এক-একটি রূপ। তাই তাদের একটু কষ্টও আমি দেখতে পারি না। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে। ওরে রামলাল !'

রামলাল এসে হাজির।

'ওরে বউ দুটিকে বসা। একটু জল খাওয়া।'

ফলহারিণী পুজার প্রসাদ, লুচি আর নানারকম ফল মিষ্টি এনে দিল রামলাল। প্লাস ভরে এনে দিল চিনির পানা।

'আহা-হা, তোমরা কিছু খেলে, আমার প্রাণটা শীতল হল।' ঠাকুর বললেন সতৃষ্ণনেত্রে। 'ওগো, মেয়েদের উপবাসী আমি দেখতে পারি না।'

আর্ত, জিজ্ঞাসু, আর্থার্থী, জ্ঞানী—আমি তো কিছুই নই। শুনেছি ঐ চার-রকমই নাকি বৈধী ভক্তির চার উপায়। তা হলে আমার কী উপায় হবে। কিন্তু কী তুমি জিগগেস করি। আমি কাঙাল, দীনহীন। বটে ? তাহলে তো আর ভাবনা নেই, তাহলেই তো তুমি প্রভুতবিত্ত। নিজেকে দীনহীন কাঙাল মনে করে ঈশ্বরের পা ধরে পড়ে থাকো, দেখবে কখন ভক্তি এসে গিয়েছে। শুধু ধরে থাকো, শুধু পড়ে থাকো। শুধু ভবে থাকো। শুকনো লাগছে কাঠ-কাঠ লাগছে, বিরস-বিস্বাদ লাগছে, তবু নাম করে যাও। যত বিরক্তির সঙ্গেই খাও না ওষুধ তার কাজ করবেই। তেমনি নামের বস্তুগুণ সর্বাবস্থায় কার্যকর। বস্তুগুণ কি অবস্থার অপেক্ষা করে ?

সংসারে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। সবাই মনমরা, হৃতসর্বস্বের মত চেহারা। মুখে হাসি নেই, প্রাণে স্ফূর্তি নেই। কেন, কিসের দুঃখ, নামের নেশা ধরো। দেখ আনন্দ আসে কিনা উজান ঠেলে। ধুয়ে-পাখলে যায় কিনা তোমার ঐ রোদজ্বলা মুখের চেহারা।

গনুর মা'র বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রাস্তার উপরে একতলা বাড়ি। বৈঠকখানায় ছোকরাদের কনসার্ট পার্টির আখড়া, সেখানেই বসেছেন। ঠাকুরকে পেয়ে ছোকরারা বাজনা শুরু করে দিয়েছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই ভেঙে

পড়েছে দলে দলে। জানলার উপর দাঁড়িয়েছে কেউ-কেউ। কতগুলি অপোগণ্ড শিশু।

'তোরা এখানে কেন? যা-যা বাড়ি যা।' কেউ বুঝি ওদের তেড়ে গেল।

'না, থাক না। থাক না।' ঠাকুর বাধা দিলেন।

যা শুনছেন সব চমৎকার। আশে পাশে যত লোক সব বেশ লোক। আনন্দে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই আছে ঈশ্বরসংস্রবে।

তিন রকম আনন্দ। বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। এক সিঁড়ির পরেই আরেক সিঁড়ি। উঠে যাও, শক্তির প্রমাণ দাও। যে শক্তিমান সেই ভক্তিমান।

'আপনি ভেতরে আসুন।'

'কেন গো?'

'ভেতরে জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'

'এখানেই এনে দাও না।'

'ঘরটায় পায়ের ধুলো দিন, তাহলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে।' বললে গনুর মা।

'কখন ঘরে মরে পড়ে থাকব, আর তাহলে কোনো গোল থাকবে না।'

যেখানে তোমার পা দুখানি রেখেছ, ঘরেই হোক আর অন্তরেই হোক, সেখানেই কাশী।

গনুর মা'র কি আছে? শুধু সরলতা। যারা ফ্লুট হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে তাদের বা কি আছে? ঐ সরলতা। জানলার উপরে ঐ শিশুর দল ঠাঁই পেয়েছে কেন? শুধু ঐ সরল বলে।

আর দেখ এই সরলের প্রতিমূর্তি, বিজয়কৃষ্ণকে।

ঠাকুর বললেন, 'আহা বিজয়কে দেখ। কেমন উদার-সরল। অধর সেনের বাড়ি গিয়েছিল, তা যেন আপনার বাড়ি, সব্বাই যেন আপনার লোক।'

ব্রাহ্ম সমাজে একদিন উপাসনা করছে বিজয়, বড় শুকনো-শুকনো লাগছে। নে ভাবভক্তি কিছু আসছে না। কি করে যাবে এ প্রাণের শুষ্কতা? কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। তবে এই কাষ্ঠ উপাসনা যে ছাড়তে হবে, এ ঠিক। কছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল একটা কুলি। অমনি তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল বিজয়। সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রাণ সরস হয়ে উঠল। চলে এল ভক্তির প্রবাহিণী। আবার উপাসনায় গিয়ে বসল। ভীষণ জমল উপাসনা।

'আরেকদিন,' বলছে বিজয়, 'আরেকদিন শুষ্কতায় কিছুই ভালো লাগছে না, মন বসছে না উপাসনায়, উঠে গিয়ে দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে এলাম। তখন মনটি সরস হল। উপাসনাও খুব ভালো হল।'

'তোমরা অত পাপ-পাপ বলো কেন? একশোবার আমি পাপী আমি পাপী বললে তাই হয়ে যায়।' বিজয়কে বলছেন ঠাকুর: 'এমন বিশ্বাস করা চাই যে তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি। তিনি আমাদের বাবা-মা, তাঁকে বলো

যে পাপ করেছি আর কখনো করব না। আর তাঁর নাম করো, জিহ্বা পবিত্র হয়ে যাবে, দেহমন পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ-পাখী উড়ে পালাবে দেহবৃক্ষ থেকে।'

মায়ের কাছে সন্তান কি পাপী? সন্তান পীড়িত। সন্তান দুঃখী। সন্তানের দুঃখ হরণ করতে রোগহরণ করতে মা কী না করবে? ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দেবে। সমস্ত উপশমের উৎসই তো হচ্ছে মা'র করকমল। আর, পাপ রোগ ছাড়া কি, ব্যাধি ছাড়া কি। মা-ই তো সমস্ত ব্যথার সমস্ত ব্যাধির বিশল্যকরণী।

ঈশ্বরই তো বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো। বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? আর এ তো তোমার প্রবল বন্ধু, পরাক্রান্ত বন্ধু। ক্ষমায় সুন্দর, ঔদার্যে বিশাল স্নেহে বিপুলদক্ষিণ। সর্বসময় অব্যবহিত। তোমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত। তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা হাত বাড়িয়ে আছে। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে রয়েছে চোখ মেলে। এমন বন্ধুকে যদি না চেনো তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব।

মনের কথা বলে প্রাণ খোলসা করতে পারো এমন বন্ধু কে আছে ঈশ্বর ছাড়া? আর যাকেই বিশ্বাস করে বলো তোমার গোপন কথা, কদিন পরে দেখবে সে কথা বাজারে বিকোচ্ছে। তখন তুমি দেখবে মতে-মতে মিলনই বন্ধুতা নয়, এক উদ্দেশ্য এক দল এক বাণিজ্য এ-ও বন্ধুতা নয়। আজকের বন্ধু কালকের কালসাপ। তাই কাকে তুমি বলবে তোমার প্রাণের কথা, তোমার সুখ-দুঃখের কাহিনী? যদি কথা কয়ে প্রাণ উজাড় করে দিতে না পারো তাহলে হালকা হবে কি করে? তাই একমাত্র যিনি বিশ্বাস্য, একমাত্র যিনি ক্ষুদ্র-অন্তঃকরণ নন তাঁর সঙ্গে কথা কও। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা মানেই সরল হয়ে যাওয়া। আর যে সরল সেই সত্যবাদী।

আগড়পাড়া থেকে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসে ঠাকুরের কাছে। এসে, কি সাহস, দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ইশারা করে ডাকে। ঠাকুরও তেমনি। উঠে যান সেই অচেনা ছোকরার ইশারায়। ছেলেটি ঠাকুরকে নিয়ে যায় নির্জনে।

'এখানে কেন?'

'তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইব। ওখানে বড্ড ভিড়। চুপি-চুপি না হলে কি মনের কথা কওয়া যায়?'

'বেশ তো, কও না মনের কথা। চুপি-চুপিই কও।'

ছেলেটি নির্ভয় হয়ে গেল, নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারো আমার কামভাব কি করে যাবে?'

ঠাকুর বললেন, নিজেকে মেয়ে বলে ভাবো। এ-ও একটা উপায় কামজয়ের। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে কামভাব নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মতই কথা কয়, দাঁত মাজে।'

নির্জন না হলে নিরঙ্কুশ হবে কি করে? নির্মুক্ত না হলে কইবে কি করে

মনের কথা ?

তাই তাঁর সঙ্গে খেল, যে এই সৃষ্টির আসল খেলুড়ে। মাটিতে বীজ পুঁতলে অঙ্কুর হয়, এ কৃষকের গুণ নয়, সৃষ্টিকর্তার নিয়মের গুণে। অংকুরের মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁর নিয়ম দেখাই তাঁকে দেখা।

সাধুরা ধুনি জ্বালায় কেন ? শীতের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে, না, গাঁজা খাবার জন্যে ?

মোটেই না। কাম-ক্রোধকে ইন্ধন করে আহুতি দেবার জন্যে। কাঠের একটা করে কুঁদো নেয়, কোনোটাকে কাম ভাবে কোনোটাকে বা ক্রোধ। আর আগুনকে মনে ভাবে ইষ্ট, মনোবাঞ্ছার পরিপূর্তি। আগুনের কাছে বসে খুব তেজের সঙ্গে নাম করলে আগুনেরও দাহ-দীপ্তি বাড়তে থাকে। কাঠের কুঁদো ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আসন ছাড়ে না, অবিশ্রান্ত নাম করে। নিরিন্ধন হয়ে যায়।

চিমটে কেন ? ধুনি খোঁচাবার জন্যে ? মোটেই না। চিমটে হচ্ছে বাকসংযমের প্রতীক। যার জিহ্বা সংযত হয়নি, সে ধরতে পারবে না চিমটে। আর কমণ্ডলু ? জল খাবার জন্যে নিশ্চয়ই ? মোটেই না। টইটম্বুর করে জল রাখো কমণ্ডলুতে। নির্মল ঠাণ্ডা জল। জলের ঐ সাম্য শৈত্য ও স্থৈর্য তাদের সঙ্গে মনের যোগ রেখে সাধু ভগবানের নাম করে। সব সময়েই দেহ-মন ঠাণ্ডা থাকে, তপ্ত হয় না। চিত্ত অবিকৃত অচঞ্চল থাকে। মনে বিরাজ করে পক্ষপাতনিরপেক্ষ সমতা। আর ত্রিশূল ? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের থেকে বাঁচবার জন্যে ? মোটেই না। সত্ত্ব রজ আর তম এই তিন গুণ যার করায়ত্ত, সেই-ই ত্রিশূল ধারণের অধিকারী।

'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো, তাই তোমার নাকি খুব নিন্দে হয়েছে ?' ঠাকুর জিগগেস করলেন বিজয়কে।

বিজয় চুপ করে রইল।

'যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি। জাগ্রতে স্বপ্নে সে চিরস্থির, একাবস্থ। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্বিকার। তোমাকে কত কি বলবে, কত কটূক্তি। যেহেতু তুমি আন্তরিক ভগবানকে চাও তুমি সব সহ্য করবে। টলবে না গলবে না।'

বিজয় হাসল।

'দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকেও কি ঈশ্বরচিন্তা হয় না ?' সরল শিশুর মত ঠাকুর বললেন; 'দেখ না বনের মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকত কেমন ঋষিরা। চারদিকে বাঘ, ভালুক, তবু সাধনার থেকে নিবৃত্তি নেই। যেমন নিন্দুক আছে তেমনি আবার সৎসঙ্গও আছে। মাঝে-মাঝে সৎসঙ্গ করা বড় দরকার।'

বিজয় বললে, 'সময় কই ? কাজে আবদ্ধ হয়ে আছি।'

'তোমার আচার্যের কাজ। অন্যের ছুটি হয় কিন্তু আচার্যের ছুটি নেই।'

'ছুটি নেই ?'

'আচার্যের নেই। দেখনি নায়েব যদি এক ধার শাসিত করতে পারে, জমিদার তাকে আরেক ধার শাসন করতে পাঠায়।'

বিজয় বললে, 'আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।'

'ও সব অজ্ঞানের কথা। আমি কে! আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।'

লোকলজ্জা ত্যাগ করে সেই অনন্তের নাম কীর্তন করো। তুমিই তো চলমান তীর্থ।

রাতের অন্ধকারে গোদোহন করছে, কালপ্রেরিত সাপ এসে নারদজননীকে দংশন করল। মায়ের মৃত্যুকে নারদ ভগবানের অযাচিত কৃপা বলে মনে করল। চলে গেল গৃহ ছেড়ে। গভীর অরণ্যে গিয়ে বসল এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় স্থাপন করল। কি হল তারপর? প্রেমভরে দেহ পুলকিত হতে লাগল, দু-চোখ ভরে উঠল প্রেমাশ্রুতে। দ্বিতীয় কোনো সত্তার আর জ্ঞান থাকল না। তখন হৃদয় মধ্যে ভগবানের সর্বশোকাবহ দিব্যভাস্বরকলেবর অপরূপ রূপ আবির্ভূত হল। কিন্তু আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। একি, কোথায় পালালে? বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়ল নারদ। খোঁজাখুঁজি করতে লাগল এখানে-ওখানে। কোথায় সেই ভুবনমনোমোহন মূর্তি! তাকে বাইরে খুঁজছি কোথায়? তাকে তো দেখেছিলাম অন্তরের অন্তঃপুরে। সুতরাং আবার মন স্থির করে বসি। নারদ শান্তসংকল্প হয়ে বসল সেই বৃক্ষতলে। বসল প্রেমধ্যানে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই মণ্ডল-মণ্ডন সুমোহন! আর্ত, আতুর ও অস্থির হয়ে উঠল নারদ। তখন আকাশপথে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হল —হায়, তুমি আর আমার দেখা পাবে না এ জন্মে। তোমাকে যে একটিবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছি তা শুধু তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যে। যারা কুযোগী, যাদের আন্তর মালিন্য বিদূরিত হয়নি, তারা তো একবারমাত্রও দর্শন পায় না। তুমি যে পেয়েছ তা শুধু তুমি নিষ্পাপ বলে। কিন্তু সর্বক্ষণই যদি দেখ কোথায় পাব তোমার এই আর্তি এই অনুরাগ, এই খরতরা ব্যাকুলতা!

সেই থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করে দেবদত্ত বীণার ঝংকারে হরিগুণ গান করতে-করতে পৃথিবী পর্যটন করছে নারদ।

'আমিও চোখ বুজে ধ্যান করতুম।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর। 'শেষে ভাবলুম, চোখ বুজলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই, এ কখনো হতে পারে? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ জীবজন্তু গাছপালা চন্দ্রসূর্য তারা-তৃণ সব তিনি।'

কিন্তু আমরা তোমাকে দেখি কোথায়? অন্তর অস্বচ্ছ, চর্মচক্ষুও অপরিচ্ছন্ন, আমাদের কি করে দর্শন হবে? আমাদের শ্রবণই দর্শন। আমরা যে তোমার কথা শুনেছি সেই আমাদের তোমাকে দেখা। আমাদের না দেখেই ভালোবাসা। আমাদের শুধু বাঁশি শুনেই অভিসার। আমাদের অনুপলব্ধিই প্রমাণ।

তোমাকে দেখে তুমি সুন্দর এ বলা কত সহজ। কিন্তু আমরা না দেখেও বলতে পারি তুমি সুন্দরতম, তুমি মধুরতম, তুমি মঙ্গলতম।

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'মশায়, পরজন্মের কথা কিছু বলতে পারেন?'

'এ জন্মের কথা বলতে পারি।'

বৈষ্ণব বাবাজী তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে।

'এ জন্মের সার কথা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ। ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছ। সেই জন্মস্বত্ব অর্জন করো।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মরবার পর আবার কি জন্ম হবে ?'

'গীতায় বলেছে, যে যা ভেবে দেহত্যাগ করবে তার সেই ভাব নিয়ে জন্ম হবে। হরিণকে চিন্তা করে ভরতরাজার হরিণজন্ম হয়েছিল।'

'এটা যে হয় তা কেউ চোখে দেখে বলে, তবে তো বিশ্বাস করতে পারি।'

'তা জানি না বাপু। নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!'

১৫৭

ঈশ্বর নাবালকের অছি। ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায় সে তাই পায়। জগৎ দেখলেই বোঝা যায় ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক। যদি কারু উপর জোর চলে সে একমাত্র ঈশ্বরের উপর। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতেই শান্তি। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়।

সব ঠাকুরের কথা।

তাই মা-মা করো। নাম করো। নামে যদি অরুচি হয় তার ওষুধও ঐ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তেতো হয় তখন মিছরিও তেতো লাগে। সেই তিক্ততার ওষুধও ঐ মিছরিই। খেতে-খেতে দেখবে ঐ তেতো মুখেই আবার মিষ্টি লাগতে সুরু করেছে। আনন্দ না পেলে নাম করব না যখন ভালো লাগবে তখন নাম করব, এ ভাব পাটোয়ারি। ভালো লাগুক আর না লাগুক নাম করতেই হবে। তৃণের মত নত হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে অমানীকেও মান দিয়ে নিরভিমান হয়ে নাম করো। তা হলে নামের ফল পাবে। নামের ফল আর কি? নামের ফল মহানন্দ। মা বলে ডাকো। শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো সবচেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মা'র কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ পবিত্র হয় নিমেষে। মা বলে ডাকলেই মনে হয় পাশের ঘরে আছেন, এখুনি আসবেন ব্যাকুল হয়ে।

যদু মল্লিকের মাকে বললেন, 'যখন মৃত্যু আসবে সেই সংসারচিন্তাই আসবে। ছেলেমেয়ের চিন্তা, উইল করবার চিন্তা বাড়িঘরের চিন্তা। ঈশ্বরচিন্তা আসবে না।'

'উপায় ?'

'উপায় তাঁর নামজপ নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে তবেই মৃত্যুকালে তাঁর নাম মুখে আসবার আশা।'

কিন্তু যতক্ষণ ভোগ আছে ততক্ষণ যোগ হবে কি করে? ভোগাসক্তি ত্যাগ হলেই শরীর যাবার সময় মনে পড়বে ঈশ্বরকে। তাই তাড়াতাড়ি ভোগের পালা শেষ করে নাও। নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ তখন রাসমণির বাগানে গরু চরাত। তার অনেক ভোগ ছিল। তাই রেড়ির তেলের কল করে অনেক টাকা করেছে। দেখনি আলামবাজারে তার রেড়ির কলের ব্যবসা?

বিধিপূর্বক যে ভোগ তাতে শাম্য হয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যে ভোগ তার নাম উপভোগ। উপভোগে শাম্য নেই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। এর অর্থ এ নয়, কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না। এর অর্থ হচ্ছে কামীদের কাম উপভোগের দ্বারা উপশম হয় না। ভোগ হচ্ছে শাস্ত্র-সম্মত ভোগ আর উপভোগ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারপ্রসূত ভোগ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করল যযাতি। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা যযাতির রাজপুরীতে বন্দিনী, দেবযানীর দাসীত্ব তার আমরণ অভিশাপ। সেই শর্মিষ্ঠারই ছেলে পুরু। দাসীগর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যযাতিকে শাপ দিল শুক্রাচার্য। এই শাপ যে, যৌবনেই যযাতি জরাপ্রাপ্ত হবে। একটু দয়াও করল দৈত্যগুরু। সঙ্গে এই বর দিল, যদি কেউ রাজী থাকে তা হলে এই জরা তাকে দান করে তার যৌবন সে চেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে রাজী হবে এই দুর্ব্যাপারে? ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চার-চার ছেলের কাছে গিয়ে যযাতি মিনতি করল, প্রত্যেকের কাছেই মিলল প্রত্যাখ্যান। তখন কনিষ্ঠ ছেলে পুরুর কাছে গিয়ে যযাতি দাঁড়াল কাতরচক্ষে। পুরু রাজী হয়ে গেল। পিতার জরা চেয়ে নিয়ে নিজের নবযৌবন বাপকে দান করল। দেবযানীকে নিয়ে পুনরায় বিষয়ভোগে মত্ত হল যযাতি। দু-চার বছর নয়, পূর্ণ সহস্র বৎসর।

তখন যযাতি দেবযানীকে বললে, 'পৃথিবীতে যত শস্য, যত স্বর্ণ, যত স্ত্রী, যত পশু আছে সমস্ত পেলেও কামপূত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগে কামনার নিবৃত্তি নেই, বরং ঘৃতাহুত বহ্নির মত কেবলই বাড়তে থাকে। পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করে, সমদৃষ্টি হয়, তখনই তার কাছে দিঙ্মণ্ডল সুখময় হয়ে ওঠে। যে তৃষ্ণা দুস্ত্যজ্য, শরীর জীর্ণ হলেও যা জীর্ণ হয় না, সতত দুঃখপ্রদ, এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারলেই কল্যাণ। এক হাজার বছর অবিরাম বিষয়সেবা করলাম, তবুও তৃষ্ণার পার পেলাম না। তাই ঠিক করেছি এবার সকল বিষয় ত্যাগ করে পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করব, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হয়ে অরণ্যের হরিণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করব।'

পুরুকে ডেকে পাঠালেন যযাতি। তার যৌবন তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তুলে নিলেন নিজের জরাভার। তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গহনারণ্যে। অক্লেশে, নিস্পৃহ নির্বিঘ্ন চিত্তে। নীড়ত্যাগী জাতপক্ষ পাখির মত।

দিব্যানুভবে দেবযানীও উদ্দীপ্ত হল। বুঝল সমস্তই ভগবন্মায়া, বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কারু কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, সকলেই ঈশ্বরপরতন্ত্র, আর এই যে সুহৃৎসন্নিবাস এ হচ্ছে পানশালায় আসা কতকগুলো তৃষ্ণার্ত লোকের সঙ্গে

ক্ষণমিলন। হে বাসুদেব, তুমিই সর্বভূতাধিবাস, তুমিই বৃহৎশান্তি, তোমাকে প্রণাম। এই বলে দেবযানী দেহ রাখল।

খুব সংগ্রাম করো, লোভের সঙ্গে পাপের সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে। সংগ্রাম আরম্ভ হলেই বুঝবে ধর্মজীবন আরম্ভ হল। অগণন তোমার শত্রু কিন্তু তোমার একমাত্র অস্ত্র নামমন্ত্র। জানি তুমি বারে-বারে পড়বে, আবার বারে-বারে ওঠো গা-ঝাড়া দিয়ে। প্রতিপদে পরাস্ত হতে-হতে যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, চারদিক অন্ধকার দেখবে, তখনই বুঝবে তোমার একলার ক্ষমতায় কিছু হবার নয়। তখনই তুমি উপলব্ধি করবে, তুমি অধম-অক্ষম অকর্মণ্য-অসমর্থ তখনই তুমি প্রবল কোনো বন্ধুর সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবে, বুঝবে সে ছাড়া তোমার গতি নেই। সে শুধু প্রবল নয়, সে অপরাভূয়ে। তীব্র তপস্যায় হবে না, না কঠিন বৈরাগ্যে, না বা নিদারুণ সাধন-ভজনে। যখন বুঝবে তুমি দীনহীন পতিত-কাঙাল, তখনই তুমি প্রাণের থেকে ডাকবে ঈশ্বরকে, সে ডাক আর তোমার শেখানো বুলি হবে না। সে ডাকই ডেকে নিয়ে আসবে তাঁর কৃপা। শরণাগতিই নিয়ে আসবে শতশৃঙ্গ পর্বতের আশ্রয়। তখনই বুঝবে তাঁর কৃপাই সার। সাধন-ভজন কেন? সংগ্রাম কেন? তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়, এটুকু পরিষ্কার বোঝবার জন্যেই সাধন-ভজন। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ।

কর্নেল অলকট কলকাতায় এসেছে।

'কে অলকট?'

'প্রকাণ্ড একজন থিয়োসফিস্ট। মানে ঈশ্বরবিজ্ঞানী।'

'সে কি করেছে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'সে কি, তার নিজের ধর্ম কি দোষ করল?' ঠাকুর যেন আহত হলেন। 'তার নিজের ধর্ম সে ছাড়ল কেন? তার ধর্মে কি ঈশ্বরজ্ঞানের ঘাটতি পড়েছে?'

সুরেন মিত্তির অফিস-ফেরতা ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। হাতে চারটি কমলালেবু আর দুইগাছা ফুলের মালা।

রাত প্রায় আটটা। ঠাকুর বসে আছেন বিছানার উপর। দু-একজন ভক্ত এদিকে-ওদিকে।

'আফিসের কাজ সেরে এই সবে এলাম। আরো আগে কি আসতে পারতাম না? আগে আসতে হলে আফিসের কাজ শেষ না করে আসতে হয়। সেটা কি ভালো?'

ঠাকুর ইঙ্গিত করলেন, ভালো নয়।

'দুই নৌকোয় পা দিয়ে লাভ কি? তাই কাজ সেরেই চলে এলাম।'

হ্যাঁ, কাজ সেরেই চলে এস। কিন্তু যতক্ষণ কাজ না সারা হয় ততক্ষণ উন্মনা হয়ে থাকো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছুবে? এই উন্মনা হয়ে থাকাটিও ঈশ্বরকৃপা। 'তাছাড়া আজ নববর্ষ। তার উপর আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হল না।' সুরেনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ভাবলাম যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক

চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে।'

ঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

'গুরুদর্শনে, সাধুদর্শনে কিছু ফুল-ফল আনতে হয় শুনেছি। তাই এগুলি আনলাম।'

ঠাকুর নিলেন হাত বাড়িয়ে।

মনে পড়ল একদিন তার দেওয়া মালা ঠাকুর নেননি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সে মালায় অহঙ্কারের স্পর্শ ছিল, অনেক টাকা খরচ করে এই মালা এনেছি, ছিল সেই আভিজাত্যের ঝাঁজ। মালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর প্রথমটা সুরেনের রাগ হয়েছিল, ভেবেছিল রাঢ় দেশের বামুন এ সব জিনিসের মর্যাদা কি বুঝবে! পরে খানিক পরে তার চেতনা হল। বুঝল ভগবান পয়সার কেউ নন, অহঙ্কারের কেউ নন, লোকমান্যের কেউ নন, তিনি শুধু দীনহীন অকিঞ্চনের। আমি অহঙ্কারী, আমি কামকামী, আমি হঠবাদী, আমার পুজো কেন তিনি নেবেন! কেন তিনি বরদাস্ত করবেন এই ঔদ্ধত্য, এই ক্ষুদ্রতা? আমার ইচ্ছে নেই বাঁচতে। দু-চোখ বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল সুরেনের। তখন সেই বিক্ষিপ্ত মালা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরলেন ঠাকুর। নৃত্য করতে লাগলেন।

সেদিনের কথা।

'আজ যে এ দু-গাছা মালা এনেছি তার মোটে চার আনা দাম।'

ঠাকুর আবার নীরবে হাসলেন।

সুরেন বললে, 'ভগবান তো পয়সা দেখেন না, মন দেখেন। কারু হয়তো একটি পয়সা দিতে কষ্ট আর কেউ হয়তো একমুঠো ধুলোর মত এক হাজার টাকা ফেলে দিতে পারে অক্লেশে। ভগবান জিনিসে নয় হৃদয়ে। উপকরণে নয় ভক্তিতে। ঠাকুর কথা বলতে পারছেন না, স্নিগ্ধ হেসে সায় দিলেন।

'কাল সংক্রান্তি, তাই আসতে পারিনি। কাল শুধু আপনার ছবিটিকে ফুল দিয়ে সাজালুম।'

এই সেই সুরেন, ঠাকুর যাকে সুরেশ বলে ডাকতেন, এক নম্বরের মাতাল, গিরিশেরই যমজ ভাই। কিন্তু সেই মদ কোথায়? একটুখানি বেঁকিয়ে দিলেন ঠাকুর। মদ-মাতালকে মন-মাতাল করে দিলেন।

'তুমি অ্যাফিসে মিথ্যা কথা কও, তবু তোমারটা খাই কেন!' ঠাকুর তাকে বলেছিলেন একদিন। 'খাই তোমার যে দানধ্যান আছে। তোমার যা আয় তার চেয়েও তোমার বেশী দান। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, যেহেতু তা সৎকাজে যায়। যার দানধ্যান তারই ফললাভ।'

'কিন্তু আমার ধ্যান জমে না কেন?' দুঃখ করেছিল সুরেন।

'না জমুক। স্মরণ-মনন আছে তো!'

'আজ্ঞে, মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আহা-হা, তাহলেই হল। মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই ভালো।'

আর কিছু নয়। শুধু মাকে ডাকো। মাকে প্রণাম করো!

রৌদ্রাকে প্রণাম, গৌরীকে প্রণাম। নিত্য যে ধাত্রী, তাকে প্রণাম। চির-জ্যোৎস্নাকে প্রণাম। প্রণাম সুখস্বরূপাকে। বৃদ্ধিসিদ্ধিরূপিণীকে প্রণাম, সর্বাণী ভূভৃৎলক্ষ্মীকে প্রণাম, প্রণাম আবার মা'র রাক্ষসীমূর্তিকে। তুমি দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া আবার দুর্গপরা। তুমিই সর্বকারিণী স্থিরাংশরূপিণী। তুমিই অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা করুণাময়ী ব্যথাহারিণী আবার অপগতবাসনা প্রকটিতবদনা ভয়ংকরী। দৃষ্টিসম্পাতমাত্র যদি তোমাকে না চিনি সহস্র চক্ষু পেলেও তোমাকে চিনব না। তুমি এত সরল এত সহজ এত সন্নিহিত। তোমার হাতের মার খেয়ে যখন কাঁদি তখনও তা আনন্দেরই উচ্চারণ। দুঃখ-দারিদ্র্য যে ভোগ করি সেই ভোগের মধ্যেও আনন্দ। যোগ-দৃষ্টি কোথায় পাব? তোমার কৃপাই আমার যোগ-চক্ষু।

ছোট চৌকিতে শুয়ে আছেন ঠাকুর, পায়ের কাছে বসে ঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছে গঙ্গাধর। হঠাৎ ঠাকুরের দু-পায়ের দুটো বুড়ো আঙুল নিয়ে নিজের কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক আঁকতে লাগল।

'ও কি, কি হচ্ছে!'

'আপনি যে বলেন যারা সাত্ত্বিক তারা গঙ্গাস্নান করতে-করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়। আমি আজ তেমনি সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।'

হরিপ্রসন্ন চাটুজ্জে মানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বেলায় কি করলেন! জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে তুই কুস্তি লড়তে পারিস?'

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুগঠিত সুন্দর। ঠিক পালোয়ানের মত দেখতে। দেখতে কি, সত্যি-সত্যি কুস্তিগির পালোয়ান। দুশো-আড়াইশো করে ডন-বৈঠক দেয় রোজ। প্রায় লোহা চিবিয়ে খায়।

'দেখি না, আমার সঙ্গে লড় না এক হাত!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর। এ কেমনতরো সাধু! হরিপ্রসন্ন তো অবাক। সাধু কিনা কুস্তি লড়তে চায়। এমনতরো কোথাও শুনিনি!

'আয় না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' তাল ঠুকতে ঠুকতে হরিপ্রসন্নর দিকে এগুতে লাগলেন ঠাকুর। তার দু-হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে ঠেলতে লাগলেন পিছনের দিকে।

আর পেছপা হয়ে থাকা যায় না। হরিপ্রসন্নও ঠেলতে লাগল। হারিয়ে দিল ঠাকুরকে।

তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে ও-দিকের দেয়ালে চেপে ধরল।

ঠাকুর তবু হাসছেন। 'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

হারিয়েছি! হরিপ্রসন্নর সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কি একটা আশ্চর্য শক্তি যেন তার মধ্যে প্রবেশ করছে। মুহূর্তে অবসাদে শিথিল হয়ে এল হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর তাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'কি রে, হারিয়েছিস তো?

ভক্ত ও ভগবানের লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে কে বলবে! যতক্ষণ লড়াই

করেছিলে তন্ময় হয়ে ছিলে। প্রীতিতে বরং বিচ্যুতি ঘটে শত্রুতায় বিচ্যুতি নেই। সুতরাং ঈশ্বরের বন্ধু হতে না পারো শত্রু হও। বৈরানুবন্ধে যেমন তন্ময়তা তেমন তন্ময়তা ভক্তিযোগেও হয় না। অখিলাত্মা ঈশ্বরের তো কোনো ভেদজ্ঞান নেই। তিনি যদি কাউকে দণ্ড দেন নিজের সুখের জন্যে নয়, জীবের হিতের জন্যে। তাই বৈরিতা ভয় স্নেহ কাম যে উপায়ে হোক তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও। এক উপায় আরেক উপায়ের বিরোধী, তা মনে কোরো না।

তাই ঈশ্বরের সঙ্গে করমর্দন করতে না পারো কুস্তি করো। প্রেমে আলিঙ্গন না হয় মল্লযুদ্ধে আলিঙ্গন। প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা না এলে ঈশ্বরতাৎপর্য বুঝবে না। কান দিয়ে আলোকের জ্ঞান হয় না, চোখ দিয়ে হয় না শব্দের। তেমনি মেধার দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা নয়, একমাত্র প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা দিয়েই প্রেমের অনুভব। প্রসন্নোজ্জ্বল হবে কিসে? একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শে। কর্মও চাই, কৃপাও চাই। পুরুষকারও চাই, দৈবও চাই। উভয়ের সমাবেশেই সিদ্ধি। পর্জন্য সলিল বর্ষণ করলে কি হবে, ক্ষেত্রে যদি না কর্ষণ থাকে। পুরুষকার যোগে কর্ম, দৈবযোগে সিদ্ধি। দৈবশূন্য পুরুষকার নিষ্ফল আর পৌরুষশূন্য দৈবও অসম্ভব। তাই কর্ম দিয়ে কৃপা আকর্ষণ করো। ক্লান্ত হলেই পাবে কৃপার সমীর স্পর্শ।

কুরুক্ষেত্র জয়ের পর রাজশ্রী ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন যুধিষ্ঠির। ভায়েদের বললেন, আমি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করব। মিতাহারী ও চর্মচীর জটাধারী হয়ে দুই-সন্ধ্যা স্নান করে হুতাশনে আহুতি দেব। ফলমূল খেয়ে মৃগযূথের সঙ্গে সঞ্চরণ করব। ক্ষুৎ-পিপাসা শ্রান্তি শীত আতপ ও বায়ু সব ক্লেশ সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব। একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক-একদিন অতিবাহিত করতে-করতে প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করব। গ্রামবাসী কি বনবাসী কারুর অপকার করব না, কারুর প্রতি কখনো ভ্রূভঙ্গী বা উপহাস করব না। কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব না শূন্য চিত্তে যে কোনো একটি পথ ধরে চলে যাব। স্বভাব সকলের আগে-আগে যায়, সেই কারণে আমাকে হয়তো বা গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমি তখনই তার দ্বারস্থ হব যখন তার গৃহ ধূমহীন, অগ্নিহীন, অতিথিসঞ্চারবিরহিত। তাকে ব্যস্ত করব না, যদি না জোটে থাকব নিরাহারে। আশাপাশে বাঁধা পড়ব না, বাতাসের মত সর্বলোকের অনায়ত্ত থাকব। লাভ-ক্ষতি নিন্দা-স্তুতি শোক-হর্ষ শুভ-অশুভ সব আমার পক্ষে সমান হবে। দেহমাত্র ধারণ করব কিন্তু কোনো কাজে লিপ্ত হব না। বিষয়া-বাসনাপরতন্ত্র হয়ে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করেছি। এখন বৈরাগ্যেই আমার শাশ্বত সন্তোষ। এই নির্ভয় পথে চলতে-চলতে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বেদনায় অভিভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি ত্যাগ করব।

অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে ভীম আর অর্জুন, নকুল আর সহদেব, এমন কি দ্রৌপদী কঠোর ভাবে তিরস্কার করতে লাগল। অর্জুন বললে, উদ্যমহীন ভিক্ষুক, ভীম বললে, ক্লীব অকৃতী। দ্রৌপদীও

বিদ্যুল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ধিক! পূর্বে দ্বৈতবনে তোমার ভায়েরা শীতে আতপে পরিক্লিষ্ট হলে তুমি বলেছিলে দুর্যোধনকে বিনাশ করে সসাগরা বসুন্ধরাকে উপভোগ করবে। কিন্তু এখন কেন এই গিরিকাননসমন্বিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে চাইছ? তুমি বিদ্যা দান সন্ধি যজ্ঞ বা যাচঞা দ্বারা এ পৃথিবী লাভ করোনি। গজাশ্বরথসম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় বীরদের সংহার করে অধিকার করেছ। পুরুষশার্দূলের মত ব্যবহার, এখন কেন এই হীনতা? তোমার প্রমত্ত গজেন্দ্রসদৃশ ভায়েদের দিকে দেখ, অরাতিতাপন অমরসদৃশ তোমার ভায়েরা চিরদুঃখভোগী, এদের আহ্লাদবর্ধন করা কি তোমার কর্তব্য নয়? শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই বৈরাগ্য ও বানপ্রস্থের কথা চিন্তা করে।'

দ্রৌপদীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ভীমার্জুন আবার কটূক্তি করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির বললেন, তোমরা কেবল অসন্তোষ প্রমাদ মদ মোহ রাগ দ্বেষ বল অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হয়ে রাজ্যভোগে বাসনা করছ। ওসব ত্যাগ করে প্রশান্ত হও। যে রাজা এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁরও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নেই। একদিন বা এক বছর ছেড়ে দি, যাবজ্জীবন চেষ্টা করলেও কেউ আশা পূর্ণ করতে পারে না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হলেই জ্বলে আর কাষ্ঠশূন্য হলেই শান্ত হয়, অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তিই কেবল নিজের উদরপূরণের জন্যে অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। সুতরাং আগে উদরকে পরাজয় কর, তাহলেই সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হবে। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে, তোমরা তা পরিত্যাগ করে মহৎভাব থেকে বিমুক্ত হও। যে নরপতির ভূমণ্ডলে অখণ্ড প্রভুত্ব তাকে কৃতকার্য বলা যায় না, যার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য। অতএব সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হয়ে অক্ষয় পদলাভের চেষ্টা করো। ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিই নির্ভয়নির্মুক্ত। ভোগ্যবস্তুই বন্ধন, ভোগ্যবস্তুই কর্মবলে কীর্তিত। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিই পরম পদে আরোহণ।

জনক রাজা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, কিন্তু আমার কিছুই নেই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

প্রজ্ঞারূপে প্রসাদে এসে অশোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহ হও। বুদ্ধিপূর্বক চতুর্দিক অবলোকন কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হও। যে যথার্থ বুদ্ধিমান ঈশ্বর তারই আয়ত্ত। 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

ঠাকুর বললেন, 'ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'

অল্পবয়সী ছাত্র, কিন্তু ঈশ্বরে দুরন্ত ব্যাকুলতা। ব্রাহ্ম, তবু এসেছে কালীমন্দিরে। কালীঘরের দরজার সামনে বসে প্রাণ ঢেলে গান গাইছে। কে গায় রে?

ভূপতি। ভাই ভূপতি।

ঠাকুর কান পেতে শুনলেন গান। কি সুন্দর গাইছে। অপূর্বের দ্বার যেন খুলে গেছে নিমেষে:

'হরি কান্ডারী যেমন
এমন কি আর আছে নেয়ে!
পার করে দীনজনে
অভয় চরণ-তরী দিয়ে।'

ভাবাবেশে কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। 'এই নে।' বলে ভূপতির বুকের উপর পা তুলে দিলেন। ভূপতি চোখ চাইল।

এ কে? এ যে তার সেই ইষ্টদেবতা, সচ্চিৎসুখ, পূর্ণসনাতন। আর যায় কোথা। লেখাপড়ার মন উবে গেল আস্তে-আস্তে! সর্বক্ষণই সে পদচ্ছায়ার আশ্রয়ের কাছে ঘোরাফেরা করে। যদি সংসারে টানটুকু কাটিয়ে দেন। যদি টেনে রাখেন তাঁর কোলের কাছটিতে।

সেদিন বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন ঠাকুর। সর্ব অঙ্গে ঈশ্বর-আবেশ। 'দেখ, দেখ, কি নির্মল নিরাময় প্রেমমূর্তি!' গদ্‌গদ ভাবে বলে উঠল মহিমাচরণ।

ভূপতি স্তব শুরু করল। 'তুমিই স্বরাট বিরাট। নরোত্তম নারায়ণ। শাস্ত্র-বাদে বনে-দুর্গে জ্বরে-ঘোরে সংগ্রামে-সংকটে বিজনে-শ্মশানে তুমিই একমাত্র রক্ষকর্তা। পদ্মদলায়তলোচন, দয়াঘন, আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো। সংসার-দাবদহনাতুর আমি, সর্বত্রই আমার ভয়, তুমি আমাকে নিঃসংশয় করো। শরণাগতির শরদম্বরকান্তি আনো আমার মধ্যে।' পরে গান ধরল।

'চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি!'

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর একটু সলজ্জ শিশুর মত হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি যেন একটা হয় এই আবেশে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না। এখন ভারি লজ্জা হচ্ছে। এখন গুনতে বলো, গুনতে পর্যন্ত পারি না। এক সাত, আট এই রকম হয়ে যায়।'

'সবই তো সেই এক।' বললে নরেন, 'একের সঙ্গে এক যোগ করেই সমস্ত।'

'না। এক আর এক, দুই। সমাধি হচ্ছে সেই এক-দুয়ের পার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত।' বললে মহিমাচরণ।

'যাই বলো, হিসেব থাকে না, হিসেব পচে যায়।' বললেন ঠাকুর, 'হিসেব

করে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্যি ? হাতে একখানা বই দেখি, বড়জোর রাজর্ষি বলতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বলি কাকে ? ব্রহ্মর্ষির কোনো চিহ্ন নেই। চিহ্ন থাকবে কি করে ? ব্রহ্ম বেদ পুরাণ তন্ত্র সমস্ত কিছুর পার।'

আরেকদিন ঠাকুরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে করজোড়ে বসে আছে ভূপতি। চোখের পলক ফেলতে দিচ্ছে না। যতই কেন না চক্ষুকে নিষ্পলক করি তুমি যদি না দেখাও, তুমি যদি না চক্ষুকে দ্যুতিমান করো, সাধ্য কি আমার দর্শন হয় ! আর যতক্ষণ না দর্শন হয় ততক্ষণ আর কিছুই দেখব না চারদিকে। হে দীপপ্রদ এই অন্ধতার অন্ধকার দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দাও।

'এতই যখন সাধ দেখবার দ্যাখ চোখ মেলে।' ভাববিহ্বল মূর্তিতে ঠাকুর দাঁড়ালেন প্রকটিত হয়ে।

এ কাকে দেখছে ভূপতি ? তার হৃদয়সংকল্পিত প্রাণবল্লভকে ? এ কি, এ তো একজন নয়, এ যে তিনজন একাধারে। চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ আর পঞ্চবক্ত্র। হংস, গরুড় আর বৃষ। তন্ময়ের মত প্রণাম করল ভূপতি। যা বলে-বুদ্ধিতে হবার নয়, না বা শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে, সাধন-ভজনে, কর্ম-কাণ্ডে, যোগ-জপ-তপস্যায় তা সাধ্য হবে শুধু একটিমাত্র নমস্কারে। নিজের দেহ-মন-প্রাণ একটি নমস্কারের পদ্মকোরকে সুসম্বদ্ধ করে তাঁর পায়ে নিবেদন করে দাও।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ই বেদ। বেদই বহন করে যজ্ঞ পুরুষ বিষ্ণুকে। বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপক চৈতন্য। পাখি যেমন দুই পাখা মেলে উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান করে তেমনি গরুড়ের দুই পাখার এক হচ্ছে কর্ম, অন্য হচ্ছে জ্ঞান। আর উন্মুক্ত আকাশের নামই মোক্ষ।

গণেশের বাহন কি ? গণেশের বাহন মূষিক। মূষিক কি করে ? কেটে ছারখার করে। তেমনি তোমার কর্মফলগুলি কর্তন করো, ছেদন করো। কর্মফল-মোচনের উপরেই সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। আর গণেশই সিদ্ধির দেবতা, সিদ্ধিদাতা। কর্মফলগুলি না কাটা পর্যন্ত পৌঁছুবে না সিদ্ধিদ্বারে।

শিবের বাহন কি ? শিবের বাহন বৃষ। বৃষ মানে ধর্ম। আর শিব মানে ? শিব মানে মঙ্গল। ধর্মই কল্যাণকে বহন করে নিয়ে আসে। বৃষটি শুভ্র কেন ? সত্ত্ব গুণের রঙটি শুভ্র। আর সত্ত্ব গুণের উদয়েই ধর্মের আবির্ভাব। বৃষের তো চার পা। ধর্মও চতুষ্পাদ। শৌচ দান দয়া ও তপস্যা এই তার চার ভিত্তি। যখন এই চতুষ্পাদ ধর্মের আচরণ করবে তখনই তোমার শিবদর্শন।

দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহের ধর্ম কি ? সিংহের ধর্ম হিংসা। অর্থাৎ তোমার জীবভাবকে হিংসা করো, হনন করো, জীবভাববিলয়ের মধ্যেই ব্রহ্মত্বের অভ্যুদয়।

এদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেচক দিবান্ধ। আর মানুষ দিব্যান্ধ। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ আত্মজ্ঞানে অন্ধ ততক্ষণ লক্ষ্মী ধনেশ্বরী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী হলেও আসলে লক্ষ্মী ব্রহ্মশক্তি। কিন্তু যতক্ষণ আত্মজ্ঞানে দৃষ্টিহীন ততক্ষণ এই ব্রহ্মশক্তির উপলব্ধি কোথায় ?

কিন্তু সরস্বতী ? সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁর বাহন হংস। হংস মানে প্রাণবায়ু।

হং মানে নিশ্বাস, স মানে প্রশ্বাস। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে মন্ত্রোচ্চারণ তাকেই বলে অজপা। আর যে অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তাকেই বলে হংসধর্মী। প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ হচ্ছে এই উপলব্ধি হলেই ব্রহ্মবিদ্যা। আর হাঁসের গুণ কি ? দুধে জল মিশেল হয়ে থাকলে জল ত্যাগ করে দুধটুকু গ্রহণ করে। তুমিও তেমনি নশ্বর থেকে ঈশ্বরকে সংগ্রহ করে নাও। তারি জন্যে হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।

আরো কটি ছোকরা এসেছে। একটির নাম মণীন্দ্র গুপ্ত। বয়েস পনেরো-ষোলো। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। একদিন কি মনে করে এক বন্ধুর সঙ্গে শ্যামপুকুরে এসে হাজির। আর এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে-মারতে একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন ঠাকুর, হঠাৎ উঠে বসলেন। কে যেন এক আপনজন চলে এসেছে বিনা নিমন্ত্রণে। ইঙ্গিত করলেন কাছে আসতে। কাছে আসতেই গা-হাত-পা টিপে দেখতে লাগলেন লক্ষণগুলো। কানে-কানে বললেন, 'কাল আবার এসো। কেমন ? কিন্তু কাউকে সঙ্গে এনো না। একা-একা এসো।'

রাত কি আর কাটে। দিন এলেও কাজ কি সহজে ফুরোয় ?

সন্ধ্যার আগেই এসে হাজির হল মণীন্দ্র। ঠাকুর একেবারে তাকে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন। বললেন, 'এত দিন ছিলি কোথায় ?' বলেই সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মণীন্দ্রকে। জিগগেস করলেন, 'কিছু একটা চাইবি ?'

'চাইব।'

'চা।' সরল শিশুর মত বললেন ঠাকুর।

কি যেন খানিকক্ষণ চিন্তা করল মণীন্দ্র। তার কিশোর কল্পনা কতদূর তাকে সাহায্য করল কে জানে, সে বলে বসল, 'আমাকে প্রকাশক্ষমতা দিন।'

'সে আবার কী জিনিস ?'

মণীন্দ্র বললে, 'চারদিকে কত লোক দেখি, জগতের কত সৌন্দর্য, কত বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে বলতে পারি না, লিখতে পারি না। আমার সেই দৈন্য মোচন করুন।'

ঠাকুর স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। বললেন, 'তুই তাঁকেই নে না, যিনি সমস্ত কিছুর প্রকাশক। তাঁকে ধরলেই তো তিনি সব কিছু ধরিয়ে দেবেন।'

মণীন্দ্রর মনে হল কি একটা শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলছে। যেন মহাশূন্যে সে একাকী, কাকে যেন খুঁজে খুঁজে ফিরছে, যেন একা থাকবার উপায় নেই, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না সেই মহা একাকীকে। তাই আকুল হয়ে কাঁদছে মণীন্দ্র। সে কান্না আর থামে না।

ঠাকুর বললেন, 'একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সেখানেও কান্না।

ঠাকুরের সেবা করছে মণীন্দ্র। মণীন্দ্রের ডাক-নাম খোকা। সেবা করছে খোকা

ও আরেকটি ছেলে। তার নাম পতু। দুজনে মিলে হাওয়া করছে ঠাকুরকে। একজনের হাত ব্যথা হলে আরেকজন। দোল-পূর্ণিমার দিন। সবাই রঙের খেলায় মেতেছে, উড়ছে লাল আবিরের ধুলো। মণীন্দ্র আর হরিপদ, ডাক-নাম পতু—ঠাকুরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে।

'কি রে, রঙ খেলতে যাবিনে ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না।' চোখ নামিয়ে নিল মণীন্দ্র।

'সে কি রে, সবাই খেলছে, হুল্লোড় করছে। তোদের বয়সী ছেলেরা কেউ আজ চুপ করে বসে নেই। যা না, খেল না গিয়ে।' ঠাকুর আবার তাদের তাড়া দিলেন। 'না, আমাদের রঙ খেলে দরকার নেই।' মণীন্দ্র জোরে পাখা করতে লাগল। ঠাকুরের সেবা ফেলে কিছুতেই গেল না। তোমাকে সেবা করাই আমাদের রঙ-খেলা। তুমি যদি আমাদের চোখের দিকে তাকাও সানন্দ চোখে, তাতেই আমাদের রঙিন হয়ে ওঠা।

ঠাকুর বলেন, মণীন্দ্রর প্রকৃতি-ভাব। ভগবানের নামগুণগান শুনেছে, কি, অমনি ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে থাকে।

'কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি'—মহিমা চক্রবর্তী বললে এসে ঠাকুরকে।

'কি স্বপ্ন ?'

'যেন আপনি আমাকে আদেশ করছেন মণীন্দ্র গুপ্তকে মন্ত্র দিতে।'—

'কি মন্ত্র বলো তো ?'

মহিমা সেই স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। উচ্চারণ করা মাত্রই ঠাকুর সমাধিতে ডুবে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর বললেন, 'হ্যাঁ, এই মন্ত্র, এই মন্ত্রই তুমি দিও মণীন্দ্রকে।'

আমার কাজ আমি কাকে দিয়ে কার জন্যে কখন করিয়ে নেব, তা আমিই জানি। আরো একটি ছোট ছেলে এসেছে, বারো বছর বয়স, নাম ক্ষীরোদ।

মাস্টার বললে, 'দেখুন, দেখুন, এই ছেলেটি বেশ। ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।' 'আহা, চোখ দুটি যেন হরিণের মত।' ঠাকুর তার দিকে নেত্রপাত করলেন। পা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। ক্ষীরোদ পা-খানি তুলে নিল কোলের মধ্যে।

সেই ক্ষীরোদ গঙ্গাসাগর যাবে।

ঠাকুর বললেন মাস্টারকে, 'আহা ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগরে যায়, তাকে তুমি একখানা কম্বল কিনে দিও।'

'দেব।'

একটু সুজির পায়েস খেতে বসেছেন ঠাকুর। আহা, যেন খেতে পারেন। খেতে যেন না কষ্ট হয়। সত্যি খেতে পারলেন ঠাকুর। শিশুর মতন আনন্দ করে বললেন, 'খেতে পারলাম। মনটায় তাই বেশ আনন্দ হচ্ছে। তুমি ক্ষীরোদকে একটু দেখো। আমার অসুখ, আমি বলেছি তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। বেশ ভালো ছেলে। তুমি তার একটু যত্ন কোরো।'

'করব। আমার পাড়াতেই তো ওর বাড়ি।'

আর পূর্ণ। পূর্ণরও মোটে তের বছর বয়স কিন্তু বহ্নিময় অনুরাগ। ছাদ থেকে দেখেছে মাস্টারমশাই যাচ্ছে ট্রামে করে, দেখেই পাগলের মত ছুটে এসেছে রাস্তার উপরে। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই প্রণাম করছে মাস্টারমশায়ের উদ্দেশে। ঠাকুর শুনে বলছেন, 'আহা, কি অনুরাগ! কেন এই অনুরাগ? না, ইনি পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্যে যে ব্যাকুল সেই পারে এমনি করে ছুটে আসতে।'

যদি একবার অন্তরে আসে সেই ব্যাকুলতা আর ফিরে যাওয়া নেই। যদি পাহাড় পড়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। যদি মরুভূমি পড়ে শ্যামছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যদি সমুদ্র পড়ে, বুকে করে তুলে নিয়ে যাবে তরঙ্গের উপর দিয়ে।

রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষের ছেলে, বাড়ি থেকে আসতে দিতে চায় না। বড়লোকের ছেলে কিন্তু বাবা না দিলে পয়সা কই?

ঠাকুর পূর্ণের চিবুক ধরে আদর করে বললেন, 'যখনই সুবিধে হবে চলে আসবি এখানে। আমি তোর গাড়িভাড়া দেব।'

শুধু আমিই কি ওর জন্যে ব্যাকুল? ও ভীষণ চতুর। বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্যে।

তা হলেই আর কথা নেই। তা হলেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নহবতখানায় নিয়ে এলেন একদিন। বললেন, 'এই পূর্ণ, একে পেট ভরে খাওয়াও।'

চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। ইনি কে? আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী! নম্রনেত্রা সমুৎফুল্লা।

'আগে মালা-চন্দনে সাজাও ছেলেটাকে, তার পরে ভোজনের আহুতি দাও।' ঠাকুর আবার বলেন সেই গৃহলক্ষ্মীকে। সর্বসম্পৎস্বরূপা রাজলক্ষ্মীকে।

মায়ের মত স্নেহভরে পূর্ণকে কাছে টেনে নিলেন সেই মহিলা। মালাচন্দনে সাজিয়ে খাওয়াতে লাগলেন-কাছে বসে। ঠাকুর বারে-বারে এসে উঁকি মারছেন, বলছেন, ওগো এই তরকারিটা একটু বেশি করে দাও।' আবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার ঘুরে আসছেন। 'ওরে, কেমন খেলি? পেট ভরল?' খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'ওগো, একে হাত-মুখ ধোবার জল ঢেলে দাও।' আঁচানো হয়ে গেলে পর ফের বললেন, 'ওগো, একে ষোলো আনা দিও।'

গৃহলক্ষ্মী একটি টাকা এনে পূর্ণর হাতে দিলেন। স্নেহার্দ্র স্বরে জিগগেস করলেন, 'বলো তো আমি কে?'

চিনত না, তবু চিনতে কি আর বাকি আছে? প্রাণ ঢেলে পূর্ণ বললে, 'তুমি আমার মা, সকলকার মা।'

ঘরে বসে পড়ছে পূর্ণ, দেখল জানলায় কার ছায়া। এ কি, মাস্টারমশাই! পড়া ফেলে ঘরের বাইরে ছুটে এল পূর্ণ। চোখে-মুখে জ্বলন্ত ঔৎসুক্য।

'ঠাকুরকে দেখবে?'

'কোথায় ?'

'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মোড়ে।'

'কোথায় ? কোন মোড়ে ?'

'শ্যামপুকুরের মোড়ে।'

ছুট দিল পূর্ণ। ঠাকুর ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। দুই চোখে উজ্জ্বল সুখ নিয়ে বলছেন, 'ওরে তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছি। নে, খা।' বলে রাস্তার মাঝেই তার মুখে সন্দেশ তুলে দিলেন ঠাকুর।

ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, পূর্ণরও যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যখন পূর্ণ চোখ বোজে, রোগশয্যা ছেড়ে একা-একা বাইরে গেছে, পা টলে পড়ে গেছে মূর্ছিত হয়ে। কেউ বুঝি নেই ধারে-পারে। না, একজন আছেন। সবল বাহুতে শিশুর-মত পূর্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে শুইয়ে দিলেন শয্যায়। চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। এ যে সেই ঠাকুর, সেই শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাইয়েছিলেন যিনি, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আরেকটি ছোট ছেলে আসে, সারদাপ্রসন্ন।

ঠাকুর বলেন, সারদার বেশ অবস্থা। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল, যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।'

আর কি চাই। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যে আনন্দে আকাশে-আলোকে উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই আনন্দেরই প্রকাশ। তাকিয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। আমার মুখে সেই অমৃতনেত্রস্পর্শ পড়েছে কিনা। পড়েছে বলেই তো আমি অকুণ্ঠিত, আমি উচ্চারিত, আমি উচ্ছ্বসিত।

প্রসন্ন বলছে দুঃখ করে, 'না হল জ্ঞান, না হল প্রেম। কি নিয়ে থাকি ?'

'জ্ঞান হল না বুঝি, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে ?' তারক জিগগেস করল।

'কই, কাঁদতে পারলাম কই। কাঁদতেই যদি না পারলাম তাহলে আর প্রেম হল কি করে ?'

আহা, দেখ না একবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। জ্ঞান আর প্রেমের সমাহার। একদিকে শঙ্কর আরেকদিকে গৌরাঙ্গ।

ঠাকুর বললেন, 'জ্ঞানীর ভিতর টানা গঙ্গা। আর ভক্তের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা।' জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। এ পথ কলিকালের পক্ষে নয়। কলিকালের পক্ষে ভক্তি। জ্ঞান যায় সদরমহল পর্যন্ত, ভক্তি একেবারে অন্তঃপুরে। জ্ঞানী আইন মানে, ভক্তি অকুতোভয়। জ্ঞানীর কাম্য ভক্তি, ভক্তের কাম্য ভালোবাসা। জ্ঞান সূর্য, ভক্তি সুধাংশু।

আরেকটি ছেলে আসে, পলটু। কিন্তু তার বাবার সায় নেই।

'তুই তোর বাবাকে কি বললি ?'

'বললাম, ওঁর ওখানে যাওয়া কি অন্যায় ?'

'না, না, ওরকম করে জবাব করিসনি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পলটু চলে যাচ্ছে, ঠাকুর সস্নেহকণ্ঠে বলছেন, 'ওরে এখানে আসিস এক-আধবার।'

'সময় পেলে আসব।'

'ওরে কলকাতায় যেখানে যাব, যাস একটু।'

'দেখব, চেষ্টা করব।'

'ওরে, কি রকম কথা তোর!'

'তাছাড়া আবার কি। চেষ্টা করব না বললে যে মিছে কথা বলা হবে।'

'তোদের মিছে কথা আমি ধরি না।'

সে এক জ্ঞানী ছিল অথচ অজস্র মিথ্যে কথা বলে। লোকে প্রতিবাদ করে, তিরস্কার করে। বলে, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বলছ অথচ মিথ্যে কথা তো ঝুড়ি-ঝুড়ি। জ্ঞানী বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ। সবই মিথ্যে এ জ্ঞানই তো ব্রহ্ম-জ্ঞান। সবই যখন মিথ্যে তখন যাকে সত্য কথা বলছ সেটাও মিথ্যে। বুঝলে না, সত্যটাও মিথ্যা মিথ্যাটাও মিথ্যা।

হরীশ মুস্তফি এসেছে ঠাকুরের কাছে। যদি কটা আসন শিখিয়ে দেন।

ঘোরতর অসুস্থ রোগীকে কেউ এমন অনুরোধ করতে পারে? যখন করে ফেলেছে, প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। বিছানার উপর উঠে বসলেন ঠাকুর। সাকার উপাসনার আসন শিখিয়ে দিলেন। নিরাকার উপাসনার আসন শেখাচ্ছেন, নিজেই সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। ডাক্তার এত করে বলে গেছে, আর সমাধি ভূমিতে যাওয়া চলবে না যদি বাঁচতে চাই। তুমি চাও কিনা জানি না আমি তো চাই বাঁচতে। সুতরাং ডাক্তারের অনুরোধই বা তুমি রাখবে না কে? শুধু তো আরোগ্যের বাধা নয়, দুর্বিষহ ব্যাধিযন্ত্রণা।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নেমে এলেন সমাধি থেকে, প্রায় জোর করে। নেমে এসেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

লজ্জায় বিবর্ণ মুখে হরীশ বললে, 'আপনার এত কষ্ট হবে অথচ আপনি ও সব করতে গেলেন কেন?'

'করতে গেলুম কেন? না করলে শিখবে কি করে? কষ্ট?' ঠাকুর হাসলেন। 'সবই তোমাদের জন্যে।'

আমার কষ্ট তোমাদের জন্যে। আমার ধৈর্য তোমাদের জন্যে। আমার ত্যাগ তোমাদের জন্যে।'

রন্তিদেবের কথা মনে করো। সর্বপ্রকার দানে বিশেষত অন্নদানে যে সদাব্রত। বহুদিন উপবাসে কেটেছে রন্তিদেবের, সেদিন কিছু যোগাড় হয়েছে ভোজ্য দ্রব্য। সেই মুহূর্তে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে দ্বারস্থ হল। সেই অন্নের পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে তার পরিতুষ্টি করল রন্তিদেব। বাকি অন্ন পরিজনদের বিভাগ করে দিয়ে নিজাংশ নিয়ে বসল।

ভোজনে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় শূদ্র জাতীয় আরেক অতিথি এসে উপস্থিত। নিজাংশ থেকে রন্তিদেব তাকেও দিয়ে দিল যথেষ্ট অন্ন।

সামান্য পরিমিত অবশিষ্টাংশ নিয়ে বসেছে, চেয়ে দেখল চোখের সামনে আরেক জন দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আবার কতকগুলি কুকুর। সে বললে, শুধু আমি নই, আমার কুকুরগুলিও বুভুক্ষু। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। হৃষ্টচিত্তে নত মস্তকে বাকি অন্ন তাদের দিয়ে দিল রন্তিদেব। তখন আর কিছুই খাদ্য নেই, শুধু খানিকটা জল রয়েছে পাত্রে। সেই জল খেয়েই ভোজন সমাধা করবে আজ। জলপাত্র মুখে তুলেছে, এক চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু চাইলে। বললে ধারে কাছে কোথাও নদী বা সরোবর নেই, পথশ্রমে দারুণ পিপাসার্ত হয়েছি, ঐ জলটুকু আমাকে দান করুন।

তথাস্তু। নিজে ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ, তবু রন্তিদেব সেই জলটুকু দিয়ে দিল চণ্ডালকে।

বললে, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অষ্টৈশ্বর্যান্বিতা পরাগতি চাই না, চাই না মোক্ষ বা অপুনর্ভব। আমি যেন অখিল জীবের অন্তরে বাস করে তাদের সমস্ত দুঃখ নিজের মধ্যে টেনে নিই, যাতে তারা দুঃখ-মুক্ত হয়। জীবিতকামী জীবের জীবনরক্ষার জন্যে আমার জীবন বলি প্রদান করলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি-ক্লান্তি আর্তি-কাতরতা খেদ-বিষাদ শোক-মোহ সব অপগত হবে।'

তখন দেবতারা নিজ-নিজ মূর্তি ধরে দেখা দিল রন্তিদেবকে। বললে, তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে আমরাই এসেছিলাম ছদ্মবেশে।

আমার প্রণাম নিন আমাকে নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ করুন। শুধু ভগবান বাসুদেবেই যেন আমার চিত্ত সমর্পিত থাকে। ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। যদি একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করতে পারি তাঁর গুণময়ী মায়া স্বপ্নের মতই বিলীন হয়ে যাবে।

'মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বলে বোধ হয়।' বললেন ঠাকুর। 'এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। কামারপুকুরের একটা পুকুর দেখেছিলাম পানায় বোঝাই। একটা লোক তৃষ্ণার্ত হয়ে সে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। পানা সরিয়ে জল খেল, সেই জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। লোকটা কি বোঝাল ? বোঝাল, সচ্চিদানন্দ জল মায়ারূপ পানাতে ঢাকা। বোঝাল, যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।'

আমাকে সরিয়ে দেখব তোমাকে। অহং-এর বৃন্তে ফোটাব আত্মার শতদল।

১৫৯

'তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের দিকে চেয়ে। 'নইলে সব্বাই যদি বলো, এত কষ্ট, তবে দেহ যাক, তাহলে দেহ যায়।'

পাষাণেরও বুক ফেটে যায় কথা শুনে। ঠাকুরের কষ্ট চোখে দেখা যায় না অথচ এ কষ্টের অবসানের জন্যে দেহের অবসান হোক, এ ভাবলেও তো প্রাণ শতধা

হাহাকার করে ওঠে।

প্রকাশ মজুমদার এক ডোজ নাক্সভমিকা দিয়েছে ঠাকুরকে। শুনে ডাক্তার সরকার খুব চটেছে। বললে, 'সে কি কথা! আমাকে না বলে নাক্সভমিকা দেওয়া! আমি তো মরিনি।'

'তোমার অবিদ্যা মরুক।' ঠাকুর বললেন পরিহাস করে।

পরিহাস ঠিক বুঝতে প্যরল না ডাক্তার। সে ভাবল অবিদ্যা মানে বোধ হয় গণিকা। গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার কোনো কালে অবিদ্যা নেই।'

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার কি বুঝেছে। বললেন, 'না গো, তা বলিনি। সন্ন্যাসীর জানো তো, অবিদ্যা মা মারা যায় আর বিবেক সন্তান হয়। মা মারা গেলে অশৌচ হয়, তেমনি অবিদ্যার মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর অশৌচ। তারই জন্যে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নেই।'

'আচ্ছা মশাই, পাপের শাস্তি আছে শুনেছি, অথচ ঈশ্বরই সব করেছেন, এ কেমনতরো কথা?' বলেছিল শ্যাম বসু। 'বুঝিয়ে দিন!'

'কি তোমার সোনারবেনে বুদ্ধি!' ঠাকুর রঙ্গ করে উঠলেন।

'সোনারবেনে বুদ্ধি মানে ক্যালকুলেটিং বুদ্ধি।' বুঝিয়ে দিল নরেন।

'তোমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি! ফিলজফি লয়ে বিচার করে তোমার কি হবে?'

'আধপো মদেই তুমি মাতাল', বলছেন ঠাকুর, শুঁড়ির দোকানের মদের হিসেবে তোমার কি দরকার?'

ডাক্তার সরকার বলে, 'আর ঈশ্বরের মদ অনন্ত। সে-মদের শেষ নেই।'

'তুমি তাঁকে সব ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না।' বললেন ঠাকুর, 'সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, সে কি অন্যায় করে? পাপের শাস্তি তিনি দেন কি না দেন তিনি বুঝবেন। তোমার কিসে ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তাই দেখ।'

'মানুষ হিসেব করে কি বলবে?' ডাক্তারও চলে এসেছে ভক্তি-বিশ্বাসের পথে। বললে, 'তিনি সমস্ত হিসেবের পার।'

'মানুষের নিজের মধ্যে যেমন, ঈশ্বরের মধ্যে তেমনি দেখে।' বললেন ঠাকুর। 'বলে কিনা ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ। একজনকে সুখে রেখে আরেকজনকে দুঃখে রেখেছেন। নিজের গজ-ফিতে দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যায়।'

ঠাকুরের বাহ্যিক দেহে দুর্দান্ত যন্ত্রণা, তবু তিনিই নিজে আবার ভক্তদের ভুলিয়ে রাখছেন। আমার কষ্ট দেখে ওদের মুখে ক্লেশচ্ছায়া দেখা দেবে, সে যে আমার ততোধিক কষ্ট।

সেই বড়বাজারে মাড়োয়ারী-ভক্তের বাড়ি গিয়েছিলেন, তার গল্প করছেন। হিন্দুস্থানী এক পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আলাপ। তাকে ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয় কারু হয় না, এর মানে কি?'

পণ্ডিতজী কি সুন্দর করে বললে। বললে, ঠিক ঠাকুরের প্রতিধ্বনি: ঈশ্বরে বৈষম্য নেই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে

চাইতে হয়।'

আঠারো শো ছিয়াশী সালের পয়লা জানুয়ারী ঠাকুর কল্পতরু হলেন।

বেলা প্রায় তিনটে, ছুটির দিন। গৃহস্থ ভক্তরা সমবেত হয়েছে কাশীপুরের বাগানে। ছুটির দিন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে। যদি এক ফাঁকে দেখা যায় একটু ঠাকুরকে।

অপেক্ষা করেই তো আছি। যেদিন সংসারে এসেছি তাঁর পদাশ্রয়-বিচ্যুত হয়ে সেই দিন থেকেই তো অনিকেত আমরা। এই সব মাটির ঘর কি আমাদের আশ্রয় হতে পারে? যে মুহূর্তে ডাক পড়বে সে মুহূর্তেই তো বিদায় হতে হবে। বাড়ি ঘরের মেরামত বাকি, দরজায় তালা ল্যাগিয়ে আসি, কোনো ওজুহাতই শুনবে না। যে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব নেই সে কি আমার বাড়ি? এই একটু বৃষ্টিটা ধরবার জন্যে ছাতার তলায় দাঁড়ানো। ডাকটি শোনবার আশায় একটু বসে যাওয়া। পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। কখন আসবে সেই ডাকহরকরা কেউ জানে না। স্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে আছি ট্রেন ধরবার জন্যে।

মুসাফিরখানায় কি ঘর বাড়ি?

'ওরে ওরা আমার জন্যে সব বসে আছে।' ঠাকুর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'আমাকে কাপড়-জামা দাও. আমি পরব, সাজব, যাব আমি বাগানে বেড়াতে।'

এ কি অসম্ভব কথা! শয্যালীন কঠিন রুগী, এ যাবে কি করে নিচে নেমে?

যাব, সহজেই চলে যাব, ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখানে ওদের আসতে বারণ, অনেক বিধি-নিষেধের কণ্টক। আমিই যাব আগ বাড়িয়ে। রোদে ওদের ছায়া দেব।

মনোহর বেশ পরব। তেলধুতি নয়, ধোয়া ধুতি। নিয়ে এস আমার বনাতের জামা। আমার কানঢাকা টুপি। আমার ফুলকাটা মোজা।

একবার দুখানা তেলধুতি কিনতে বলেছিলেন মাস্টারকে। মাস্টার তেলধুতি তো কিনলই, দুখানা ধোয়াও কিনল।

ঠাকুর বললেন, 'তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, আর ধোয়া দুখানা তুমি নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞে।'

'আবার যখন দরকার হবে তখন এনে দেবে। আমার সঞ্চয় করবার জো নেই। সেবার সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে বেণী পালের বাগানে গিয়েছিলাম। রাত দশটার পর কালীঘরে ফেরবার জন্যে গাড়িতে উঠছি, দেখি বেণী পালের হাতে লুচি-মিষ্টির চ্যাঙারি। কি ব্যাপার? রামলাল আসতে পারেনি তার জন্যে কিছু খাবার দিতে চাচ্ছে। ও বাপু বেণী পাল, আমি বললুম তাকে মিনতি করে, আমার সঙ্গে ও সব দিও না। আমার সঙ্গে কোনো জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নেই।'

সিন্ধুবাসী হীরানন্দ ঠাকুরকে পাজামা উপহার দিতে চায়। বলে, আমার দেশের পাজামায় বেশি আরাম পাবেন। তার আগ্রহ দেখে ঠাকুর বলছেন, দিও

পাঠিয়ে। আমার আবার আরাম-বিরাম! আমার আবার বসনভূষণ!

কোমরে কাপড় রাখতে পারছেন না ঠাকুর। প্রায় বালকের মত দিগম্বর। দুটি ব্রাহ্মভক্ত এসেছে হীরানন্দের সঙ্গে। তাই এক-আধবার কাপড়খানি টানছেন কোমরের কাছে। হীরানন্দকে বলছেন, 'আপনি তো বালক।'

প্রিয়নাথ ব্রাহ্ম। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন, 'উনি বলেন।'

'মাইরি কোন শালা ভাঁড়ায়।' মাঝে-মাঝে এই বলে বালকের মত শপথ করেন ঠাকুর। 'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি। বলতে-বলতে কখন আবার বলে ওঠেন, 'কত মনে করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না শরীরে। আমাকে বালকের মত করে রাখেন। সেবার একটা ছোট ছেলে ফুল নেব বলে বায়না ধরলে। বাপ বোঝালে, নিতে নেই, ও ফুলে ঠাকুরপুজো হবে। কে শোনে কার কথা। ছেলে কান্না জুড়ে দিল। আমি তখন তাকে দিলাম সেই ফুল। ফুল পেয়ে কি আনন্দ সেই শিশুর। তারপর? তার পর দূর যাঃ, বলে সে ফুল সে ফেলে দিল ছুঁড়ে।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আজ্ঞে পায়ে বন্ধন, এগুতে দেয় না।'

'থাক না পায়ে বন্ধন, মন নিয়ে কথা। মনে কেন বাঁধন পরাও?'

'হায়, মন যে আমার বশ নয়।'

'মন অভ্যাসের বশ। অভ্যাস কর, মনকে যে দিকে খুশি নিয়ে যেতে পারবে।' ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি পরলেন, গায়ে দিলেন সবুজ বনাতের জামা। মোজা পায়ে চটিজুতো পরলেন। মাথায় আঁটলেন কানঢাকা কাপড়ের টুপি।

যার নাকি শয্যাশয়ন অসুখ, সে উঠে বসে সাজগোজ সমাধা করল। হেঁটে চলল। নেমে চলল সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে এসে উপস্থিত হল সামনের মাঠে। যেখানে গৃহীভক্তরা জমায়েত হয়েছে। জমায়েত হয়ে তাকিয়ে আছে উর্ধ্বমুখে। চলে এলেন সেই গৃহীদের আহবানে যিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের শিরোমণি। পর্বতচূড়ায় তুষার হয়ে বসে রইলেন না, নেমে এলেন সাধারণের সমতলে। পাপী তাপী দুঃখী দুর্গতদের মাঝখানে। যারা নানা বাধা বেদনায় জর্জর, সংশয়ে অবিশ্বাসে পীড়িত, আকাঙ্ক্ষায় অহংকারে অভিভূত তাদের এলাকায়। প্রবৃত্তিতে শত তাড়িত হয়েও যারা অম্লান ভক্তিমান। যারা সংসার-কারাগারে বন্দী থেকেও সর্বদা সেই নীল আকাশের ভিখারী।

এসেছে গিরিশ ঘোষ, অতুল ঘোষ, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন, হারান দাস, কিশোরী রায়, বৈকুণ্ঠ সান্যাল। নবগোপাল ঘোষ, হরমোহন মজুমদার আর মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত। আরো অনেক, হরীশ মুস্তাফি, চুনীলাল বসু, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ওরে চেয়ে দ্যাখ কে এসেছে!

শরীরে বেঁচে থেকে যে বিশ্বাস করা যায় না। এ কি সত্যি, না দিবাস্বপ্ন? একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টিভ্রম হয় কি করে? ওরে এ যে তিনিই। মর্তের ঘরে আকাশের দিনমণি!

কই তাঁর রোগ কই? কষ্ট কই? এ যে সর্বদীপ্ত প্রসন্নতা। সর্বশুভো পরিতৃপ্তি। দু-চোখে এত রূপ ধরে না। হৃদয়মৃৎপাত্রে ধরে না যে করুণার শ্রাবণ-উৎসার।

হে ঈশ্বর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে ভালো, সকলের চেয়ে মহৎ সকলের চেয়ে মধুর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে কঠিন আবার সকলের চেয়ে করুণাময়। সকলের চেয়ে ন্যায়ী, সমস্ত বিচারের শেষ বিচার। সমস্ত অর্থের শেষ অর্থ। নতনম্র হয়েও প্রচণ্ড। এত কাছে অথচ কোন দুষ্প্রবেশ্য প্রচ্ছন্নে যেন গা ঢেকে আছ। অচঞ্চল, অথচ তোমাকে ধরতে পারছি না। নিজে বদলাচ্ছ না অথচ বাকি সমস্ত জিনিস বদলে-বদলে দিচ্ছ। এত পুরোনো হয়েও নিত্য-নতুন। এক ব্যস্ত অথচ কি সুন্দর বিশ্রাম করছ! এত কষ্ট করছ অথচ মুখে কি অম্লান হাসি। এত সঞ্চয় করছ অথচ কিছু তোমার প্রয়োজন নেই। বলো তোমাকে ছাড়া কী আর আমার চাইবার আছে! আর সমস্ত পেলেও আমার তৃপ্তি নেই। তোমাকে চাইতে পারলেই আমার তৃপ্তি!

কিন্তু কি করে তোমাকে চাই, তুমি যদি না চাওয়াও। কি করে তোমাকে দেখি যদি তুমি না দেখা দাও দয়া করে?

তাই তুমি নিজের থেকেই চলে এলে নেমে এলে আমাদের মধ্যে। তোমার দুয়ারে কত রক্ষী, কত পাহারাওয়ালা, কত নিয়মকানুনের অস্ত্রশস্ত্র। সমস্ত বিধিনিষেধ তুমি নস্যাৎ করে চলে এলে। তুমি বুঝলে আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্যের অসাফল্যের বেদনা, তাই তুমি নিজের থেকে এসে ধরা দিলে। সৈন্য-সান্ত্রীরা লজ্জায় মুখ লুকোলো!

তুমি যে আমাদেরই একজন। তুমি যে আমাদের কাছে সংসারীর চেনা পোশাকে দেখা দিলে, গেরুয়া পরে এলে না। তোমার সন্ন্যাস তো সংসারের সঙ্কোচন নয় সংসারের সম্প্রসার! আমার ঘরের আঙিনাকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে বড় করে দেওয়া। পরিবারকে পল্লীতে, পল্লীকে নগরে, নগরকে দেশে, দেশকে পৃথিবীতে, পৃথিবীকে তিন ভুবনে নিয়ে আসা। স্বদেশং ভুবনত্রয়ং। একটি-একটি করে পাপড়ি উন্মোচিত করা। অহং-এর বৃন্তে বিশ্বাত্মার শতদল ফোটানো!

আর সকলে আমাদের পরিত্যাগ করেছে। কেউ গিয়েছে অরণ্যে, কেউ সমুদ্রে, কেউ শৈলশৃঙ্গে, কেউ বা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে। সাধ্যি নেই তাদের আমরা অনুসরণ করি। কি করে ছাড়ব রাজ্য, ছাড়ব স্ত্রী-পুত্র, কি করে বা সংসারনিবাস? তুমিই একমাত্র বললে, তোকে কিছু ছাড়তে হবে না, তুই বসে থাক তোর নিজের জায়গায়, নিজের কোটে, নিজের আয়ত্তি-অধিকারের মধ্যে। আমিই সমস্ত তীর্থ ঘুরে তীর্থোদকে কুম্ভ পূর্ণ করে তোর ঘরে এসে উঠছি। তোর ঘরেই তাঁর কোল পাতা। তোর সংসারই তাঁর পীঠস্থান। তুই ঠিক থাক, তুই ঠাঁই-নাড়া হসনি, যা আছে ভুবনে তাই তোর ভবনে, যা ব্রহ্মাণ্ডে তাই তোর ভাণ্ডে, যা হোথায় তাই হেথায়!

যত মত তত পথ। এ কথা কে বলতে পারে? যে সমস্ত মত আচরণ করেছে সমস্ত পথ বিচরণ করেছে। আর, সমস্ত মত সাধন করে সমস্ত পথ ভ্রমণ করে তুমি কোথায় এসে উঠলে? কোনো মঠে নয়, আখড়ায় নয়, গুহায় নয়, তরুতলে নয়, উঠলে এসে সংসারে মা-মন্ত্রের প্রতিচ্ছবি নিয়ে। তুমি মাতৃভক্ত, তুমি বিবাহিত—এ তো সংসারীর লক্ষণ। আর সকলে হয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে নয় পরিহার করেছে। তুমি তাকে অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমা দিয়েছ। বিবাহের কি মহত্তম আদর্শ তাই দেখালে জগৎকে। বললে, আমি ষোলো আনা করে যাচ্ছি যাতে তোরা অন্তত এক পয়সা করিস। সাড়ে-পনেরো আনা চাওনি—মোটে এক পয়সা। বললে, একটি-দুটি সন্তান হবার পর স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোন হয়ে যাস। স্ত্রী কত বড় শক্তি কত বড় শ্রী তাই বোঝালে তাকে পুজো করে। এত প্রকাণ্ড মহাভারত, কোথাও এর দৃষ্টান্ত নেই। তুমি মহাভারতকে অতিক্রম করলে। নারীকে কত বড় সম্মান, কত বড় স্বীকৃতি দিলে। এ সবই তো সংসারকে স্বর্গ করার জন্যে। যে ঘরে নারীর মান নেই সে ঘর তো শ্মশান। যে জায়া সেই জননী। তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা। যে মাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সংসার ছেড়ে, তার মুখে মা-ডাক আর ফুটবে কি করে? তাতে থাকবে কি করে সত্যের সুর, সারল্যের সুর? এ মা ডাক তো তোমার-আমার। যেহেতু তুমি-আমি দুজনেই সংসারী।

এক হিসেবে সংসারীই তো মুক্ত। ঈশ্বরের জন্যে সে সবখানে যাবে, যেমন তুমি গিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকেই তার সব শেখা। তার মধ্যে কোনো গণ্ডি নেই, গোষ্ঠী নেই, সম্প্রদায় নেই। সব কিছু মানে, যেমন তুমি মানতে, হাঁচি টিকটিকিও মানতে। সে পাদরির কাছেও যাবে পীরের দরগায়ও যাবে। ফোঁটা-তিলকের কাছে যাবে, যাবে ত্রিপুণ্ড্রকের কাছে। বেলতলায় ষষ্ঠীতলায়। অশ্বত্থ-পাকুড়ের নিচে, হয়তো বা কোনো জলাশয়ে। যে যা বলবে তাই শুনবে। একগুঁয়ে হবে না, একঘেয়ে হবে না। সর্বত্র তার রিক্ত পাত্রটি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে যেটুকু মধু পায়, যেটুকু রস পায়, তাই নিচ্ছে সংগ্রহ করে। সর্বত্র মধু। সর্বভূতে মধু। তুমিই বলেছ, সব যে বিশ্বাস করবে তার শিরগির হবে।

ঠাকুর গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি আমার সম্বন্ধে কী বলছ এখানে-সেখানে? আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে?'

গিরিশ নতজানু হল। ঊর্ধ্বমুখে তাকাল ঠাকুরের দিকে। করজোড়ে বলল, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলব?'

চারদিকে জয়-জয় পড়ে গেল।

ঠাকুর হাত তুললেন। বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

চারদিকে চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেল। দেশকাল দিকবিদিক মুছে গেল নিমেষে। প্রণামের প্রেমপুজাঞ্জলি পড়তে লাগল পায়ের উপর। কত সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে ছোঁবে না, তাদের কলুষস্পর্শে ক্লিন্ন করবে না সে দিব্য দেহ, সব ভুলে গেল। মনে হল এ নিত্যদীপপ্রদ চৈতন্য,

কিছুতেই এতে মালিন্যস্পর্শ নেই, সর্বাবস্থায়ই এ জ্যোতি বিশুদ্ধতম, এ জ্যোতি নির্মলতম। স্পর্শ করে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে নাও সেই চৈতন্য-প্রবাহ, বিদ্যুৎপ্রবাহ। রুদ্ধদ্বার বিদীর্ণ করে দাও। নিঃশস্য বন্ধ্যাভূমিতে নিয়ে এস প্রবল জলস্রোত। জাগিয়ে দাও কুলকুণ্ডলিনী।

এ কাকে দেখছি! শিউরে উঠল রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে বসে কখনো তাকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে দেখতে পাইনি। যখন পা দেখছি মুখ দেখতে পাইনি। যখন মুখ দেখছি তখন কোথায় পা দুখানি! এখন মনে হল সে মূর্তি যেন আশির-পদনখ স্পষ্ট ও স্থির হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সর্বগঠনসুন্দর। হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত হয়ে গোটা মূর্তি আলোকে পুলকে ঝলমল করে উঠেছে।

রাম দত্ত অঞ্জলি ভরে ফুল দিতে লাগল পায়ে। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

দুটি জহুরি-চাঁপা নিয়ে এল অক্ষয় সেন। ফুল দুটি পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

বেলেঘাটার হারান দাস পায়ের কাছে প্রণাম এনে রাখতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন তার মাথার উপর।

কৃপার কল্পতরু হয়েছেন ঠাকুর। আত্মপ্রকাশ করেছেন। করেছেন অভয়-প্রকাশ।

এই সেই মহাভাগ ভাগবতবৃক্ষ। গোচরণ করতে-করতে শীতলছায়ান্বিত গাছ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন বয়স্যদের, 'এই সব মহৎ বৃক্ষকে দেখ। পরার্থেই এরা একান্ত-জীবিত। পরের উপকার করবার জন্যেই এরা জীবনধারণ করে। বাত বর্ষা হিম তাপ কত সহ্য করেছে অক্লেশে। সহ্য করে রক্ষা করছে আমাদের। এরাই সর্বপ্রাণীর জীবনধারণের হেতু, এদেরই বরজন্ম, কোনো যাচকই এদের কাছে বিমুখ হয় না। পত্র-পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি পল্লব—সব দিয়ে সকলের কামনা পূরণ করে। তেমনি প্রাণ মন বুদ্ধি বাক্য দিয়ে সর্বদা জীবের কল্যাণসাধন করাই মানুষজন্মের সার্থকতা।'

'ওরে কে কোথা আছিস এই বেলা চলে আয়, মুঠো-মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে।' সানন্দে চীৎকার করে উঠল অক্ষয়। 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, যার যা খুশি, ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। এমন দিন আর পাবি না রে। কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু। আয়, নিয়ে যা দেখে যা।'

দেখে যা এই অমৃত ও অভয়ের অধিপতিকে। যাঁর চরণযুগলই সকল কর্মের ও সকল মঙ্গলের নিদান। স্পর্শ করে ধন্য হ সকলে।

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। গিরিশকে, কিশোরীকে, রামলালকে।

বৈকুণ্ঠ বললে, 'আমাকে কৃপা করুন। আমাকে স্পর্শ করুন।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি যখন বলছেন হয়ে গিয়েছে, তখন আর তাতে ভুল কি।' তবু মুখের উপর যেন একটু কোথাও বিষাদছায়া লেগে আছে। 'কিন্তু অল্পবিস্তর একটু বুঝতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ কাছে এস।'

কাছে এসে দাঁড়াল বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর তার বুকের উপর হাত রাখলেন।

একটা বিরাট ভাবান্তর হল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেল চতুর্দিকে যেন ঠাকুর হাসছেন। গাছপালা বাড়িঘর লোকজন—এরা যেন গাছপালা বাড়িঘর লোকজন নয়, সবই ঠাকুর, ঠাকুরের সুহাস মূর্তি।

বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছিল অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণকে বললে, প্রতিসংহার করো এই মূর্তি, এ আমি সইতে পারছি না। আবার তুমি তোমার মানুষরূপটি ধরো। তোমার সেই সকলসুন্দরসন্নিবেশ সৌম্যমূর্তি।

বৈকুণ্ঠও তেমনি ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে, 'প্রভু, এ ভাব ধরতে পারছি না। দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, এ ভাবের উপশম ঘটিয়ে দাও।'

ঠাকুর হাসলেন। বৈকুণ্ঠ শান্ত হল।

সন্তোষ অভ্যাস করবে। সন্তুষ্ট নিরীহ ও আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ কামধাবমান লোকের সে সুখ কোথায় ? কামক্রোধের বরং অন্ত হয়, লোভের অন্ত হয় না। সংকল্পত্যাগ দ্বারা কামকে, কামত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগপ্রতিবন্ধককে, কামনা বিষয়ে অচেষ্টা দ্বারা হিংসাকে জয় করবে। যার থেকে ভয় তার হিতাচরণ করে সেই ভয় নিবারণ করবে। মনঃপীড়া ও দুঃখকে সমাধি দ্বারা আত্মজনিত কণ্টকে যোগের দ্বারা চাঞ্চল্যকে নির্জনবাস দ্বারা জয় করবে। অভ্যাসেই চিত্ত কাষ্ঠশূন্যবহ্নির মত শান্ত হয়ে যাবে। সর্ববৃত্তিতিরোহিত চিত্তই ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করতে পারে। সেই পরাস্ত করতে পারে দুর্জয়া মায়াকে।

ওরে তোরা কে কোথা আছিস ছুটে আয়।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তরা ছিল ঘরের মধ্যে, তারা সে ডাকে সাড়া দিল না। ঠাকুর নিচে নেমে যেতেই তারা ঠাকুরের বিছানাপত্র রোদে দিতে লাগল, মেতে উঠল ঘর গুছোতে। কত দিন ঝাড়া-পোঁছা হয়নি, এবার এই সুযোগে সংস্কার করে নি। মার্জনা করে নি। তাই উপরের বারান্দা থেকে ঘটনাটা দেখলেও তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ-আবেগের ঢেউ জাগল না।

ওরে আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেল। কোথায় কে আছিস আর্ত-বঞ্চিত অন্ধ-বিভ্রান্ত, ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বোস এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণার নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরমধন স্পর্শমণিকে একবার স্পর্শ কর। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা। রান্নাঘর থেকে হিড়হিড় করে রাঁধুনি বামুনকে টেনে আনল গিরিশ।

'এ কি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

'ওরে চেয়ে দ্যাখ, প্রভু আজ অকাতর হয়েছেন, নিয়ে যা রুপার কণিকা।'

রাঁধুনি বামুনও এসে কুড়িয়ে নিল মহাস্পর্শ।

প্রাণ ঢেলে প্রাণ ভরে চা। আনন্দৈকমাত্র ভগবান সদাব্রত খুলেছেন, তুইও তোর প্রার্থনায় অবারিত হ। চা না কি তোর চাইবার!

আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, ছায়া চাই না, কাঠ চাই না। হে মহাভাগ বৃক্ষ, আমি শুধু তোমাকে চাই।

১৬০

ঠাকুর আবার তাঁর বিছানায় এসে শুলেন।

কলিমলহন্তা অখিলপাপনাশন হরি সকলের পাপ টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। আমরা, আমাদের কী হল? আমরা তো পাইনি সে পরমস্পর্শ। আমরা যে ঘোর কলিপীড়িত, কালপীড়িত। আমাদের উপায় কি?

কলিতে সর্বপ্রকার ধর্মাচারের নাশ, ধন আর বলেরই মাহাত্মপ্রাবল্য। অভিরুচিমত স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড-অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুলবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য আর দম্ভ দ্বারা সাধুতা প্রমাণিত হবে। উদরপূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা, যশোলাভের জন্যেই ধর্ম। বলবত্তমই রাজা হবে আর করভারক্লিষ্ট অপহৃতধন প্রজারা পাহাড়ে-কাননে আশ্রয় নেবে। দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করবে। হিমে-রৌদ্রে বিবাদে-ব্যাধিতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বেশি দিন বাঁচবে না। তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, শোক ও মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করবে। তবে আমাদের উপায় কি? কলিকৃত অশুভের খণ্ডন হবে কি করে?

একমাত্র হরিকীর্তনে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা, কলিতে হরিকীর্তন।

একমাত্র কেশবকে হৃদয়স্থ করো। তাতেই মিলবে তোমার পরমা গতি, পরমা প্রতিষ্ঠা।

চুনীলাল বসুর আসতে দেরি হয়েছে। এখন এসে শোনে, ঠাকুর শুয়ে পড়েছেন আর তাঁর কাছে বর চাওয়া চলবে না। পা স্পর্শ করা দূরস্থান। কিন্তু একবারটিও কি দেখতে পাব না চোখের দেখা!

না। দ্বাররক্ষী নিরঞ্জন! সে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, অনেক হুলুস্থুল। এবার প্রভুকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। নির্জনে। এই চুনীলালের কত দুঃখ ঠাকুর বুঝেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তার কুলগুরুর থেকে তার দীক্ষা হয়েছিল। দুর্বল ফুসফুসে প্রাণায়াম করতে গিয়ে হাঁপানি হয়ে গেল তার। অনেক দিন যেতে পারেনি ঠাকুরের কাছে। একটু সুস্থ হয়ে সেদিন এসেছে, ঠাকুর তাকে দেখে তিরস্কার করে উঠলেন:

'তোমরা গৃহী মানুষ, তোমাদের ওসব কেন ? ওসব যোগ-টোগ তোমাদের জন্যে নয়। অমন কাজ আর কোরো না, যাও গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ চেয়ে নাও গে। সেরে যাবে হাঁপানি।'

ঠাকুর কি করে জানলেন যে যোগ করে চুনীলাল ? আর ঐ যোগের জন্যেই তার ব্যাধি ? আরো আশ্চর্য গোপালের তিন মাত্রা ওষুধেই সেরে গেল হাঁপানি।

কত বুঝেছেন দুঃখদৈন্য। একটি গ্লাশ চেয়ে ফেলেছেন চুনীলালের কাছে, কিন্তু রুপো বা কাঁসার গ্লাশ কিনে দেয় চুনীলালের সাধ্যি কি ? তখুনি বলে ফেললেন, 'তুমি শুধু একটা কাচের গ্লাশ দিও।'

প্রণব উচ্চারণের অধিকার নেই চুনীলালের। তাই মুখখানি শ্লান করে বসে আছে। ঠাকুর বললেন, 'সে কি-রে, নাই-বা হল প্রণবমন্ত্র। ভগবানের যে কোনো একটি নাম ধরে ডাক, অজস্র তাঁর ডাক নাম, দেখবি ঠিক সাড়া পাবি। মন্ত্রের জন্যে নামের জন্যে ভাবনা ?'

নামের জন্যে ভাবনা ?'

কত বুঝেছেন।

কি তার নাম কিছু জানি না। একমাত্র তোমাকে জানি। তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সুতরাং রামকৃষ্ণই আমার জপমন্ত্র, আমার ধ্যানবস্তু।

নরেন এসে বললে, 'আজ যা বুঝলাম ঠাকুরের শরীর বেশিদিন থাকবে না। এই বেলা যা চাইবার চেয়ে নিন।'

কিন্তু নিরঞ্জন ঢুকতে দেয় না যে।'

ঢের হয়েছে, অনেক তোলপাড় করেছে। কেশব সেন বলেছিলেন গ্লাশ-কেশে তুলে রাখতে, গ্লাশ-কেসের বাইরে তাঁকে ফুল দিতে, সে গ্লাশ-কেস তোমরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। আর কোনো প্রশ্রয়-প্রার্থনা শুনব না তোমাদের। আমরা কি করব। ঠাকুর তো করুণায় নিজের থেকে নেমে এসেছেন। তিনিই তো বইয়ে দিয়েছেন অমৃতস্পর্শের বন্যা, চৈতন্যের মহাপ্লাবন।

ও-সব কথায় কান পাততে নিরঞ্জন রাজী নয়। ঢের শুনেছি। যাও ফিরে যাও। যেতে পাবে না উপরে। দেখা হবে না কিছুতেই।

কি একটা কাজে নিরঞ্জন একটু সরে গেল দরজা থেকে। ঠাকুরই সরিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ কি। অন্তরের ব্যাকুলতার কাছে কিসের কি বাধার প্রহরা !

নিরঞ্জন সরে যেতেই নরেন ইশারা করল চুনীলালকে। আর অমনি চুনীলাল টুক করে ঢুকে পড়ল। একেবারে সটান দোতলায়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে। 'আসতে দেরি হল বুঝি ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আমার সব তাতেই দেরি।'

ধর্মের রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো দেরি নেই। দেরিতে এসেছ বলে তুমি পাত পাবে না, এ হতে পারে না। তোমার খাবার ঠিক তোলা আছে।

'তাতে কি।' ঠাকুর ইশারা করে চুনীলালকে কাছে ডাকলেন : 'তুমি কিছু চাও ?'

'চাইব না, এ কখনো হতে পারে ? চাই ।'

'বেশ তো বলো না কি চাইবে ?'

সত্যিই, কি চাইব কিছুই মনে এল না চুনীলালের। কোন চাওয়াটা সেরা চাওয়া, কোন বস্তুর তার তীব্রতম অভাব, কি চাইলে আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদাবান করা যায়, কিছুই বুঝে উঠল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'শোন, কিছুই চাইতে হবে না, শুধু এইটেতে ভক্তি-বিশ্বাস রাখিস, তা হলেই হবে। ঠাকুর নিজের দেহের দিকে সংকেত করলেন, শুধু তোর হবে না, সকলের হবে।'

জয় রামকৃষ্ণ ! আর কি চাই। সাধ্যি কি কলি আমাদের বলি দেয় !

শুধু বিশ্বাস ! শুধু নাম। অভ্যাসে অনুরাগ। অনুরাগই ভক্তি। অনুরাগই স্পর্শমণি। পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধিতও যদি 'হরিকে নমস্কার' একবার বলে তা হলেই তার সর্ব পাতকের মোচন ঘটে। সূর্য যেমন তমসাকে ও ঝড় যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি হরিনামও সকল দুঃখ-কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করে ফেলে। যে কথায় হরির প্রসঙ্গ নেই সে কথা মিথ্যা, সে কথা অসৎ। সেই কথাই সত্য সেই কথাই মঙ্গল সেই কথাই পুণ্য যে কথায় ভগবানের গুণের কথার বর্ণনা আছে। উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই রমণীয় ও রুচির ও নিত্যনবীন আর তাই মানস মহোৎসব। 'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং!' হরিনামই মানুষের শোকার্ণবশোষণ। আবার আরেকদিন রোগশয্যা থেকে উঠে পড়লেন ঠাকুর।

লাটু রাখাল নরেন নিরঞ্জন ঠিক করেছে বাগানের মধ্যে ঐ যে খেজুর গাছ আছে, শেষ রাত্রে তারা রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তা টের পেয়েছেন। কিন্তু ঐ খেজুর গাছের তলায় যে একটা কালসাপ। কি করলেন ! উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। যে পথ দিয়ে ছেলেরা যাবে সে পথ দিয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে তিনি রওনা হলেন গাছের দিকে। সাপটা তাড়িয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানা নিলেন। যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে চলে এলেন।

অতন্দ্রা প্রার্থনার মত শ্রীশ্রীমা ছিলেন জেগে। তিনি দেখলেন ব্যাপারটা।

আর ছেলেরা ? ছেলেরা সেই খেজুর গাছই খুঁজে পায় না। বাগানের প্রতিটি গাছ যাদের চেনা, চেনা সমস্ত আনাচ-কানাচ, তাদেরই চোখের কাছ থেকে গাছ আজ উধাও হয়ে গেল ! ঘুরে-ঘুরে সবাই ক্লান্ত কিন্তু গাছের পাত্তা নেই।

সবাই বুঝল এ প্রভুর কৌতুক।

পরদিন পথ্য খাওয়াবার সময় শ্রীমা জিগগেস করলেন, 'কাল রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটেছিলে কোথায় ?'

'তুমি দেখেছ বুঝি ?' ঠাকুর তখন বললেন কি হয়েছিল। তার পর বললেন অন্তরঙ্গের মত, 'তুমি যেন এই কথা কাউকে বোলো না।'

রামলালকে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী বলবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে না। তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা-কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

সারদামণিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'আমার ইষ্ট-কবচ তুমি নাও, তোমার কাছে রেখে দাও।'

'না, না', অন্তরে হাহাকার করে উঠলেন শ্রীমা, 'তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক।'

বলা বৃথা। ঠাকুর বাহু থেকে খুলে ফেলেছেন ইষ্ট-কবচ। শ্রীমা'র হাতে সঁপে দিয়েছেন। তবে কি মহাপ্রস্থানের আর দেরি নেই? চলে যাবেন বলেই কি দেহে আর ইষ্ট-কবচ রাখতে চাচ্ছেন না?

আমি আর তবে কি করতে পারি? কাঁদতে পারি মনের নিরালয়। প্রভু, তুমি শোনো। তুমি বিধান করো। তুমি আমাকে অবসন্ন হতে দিও না।

দ্রৌপদী খেয়ে-দেয়ে সুখাসীন হয়েছে, অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা কাম্যক-বনে এসে উপস্থিত। আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্রণ করল যুধিষ্ঠির। আহ্নিক সমাধান করে আসুন।

সশিষ্য স্নান করতে গেল দুর্বাসা। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এত লোককে খাওয়াব কি করে?

অনন্যোপায় হয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল: হে বাসুদেব, হে জগন্নাথ, প্রণতার্তিবিনাশন, হে বিপন্নপাল, হে পরাৎপর, হে সর্বসাক্ষী পরাধ্যক্ষ, আমাকে রক্ষা করো। হে শরণাগতবৎসল নীলোৎপলদলশ্যাম, পদ্মারুণেক্ষণ, দুঃশাসনের থেকে যেমন একদিন মুক্ত করেছিলে, আজ আবার এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করো।

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে ত্যাগ করে চলে এলেন ত্বরিত গমনে। প্রণাম করে দ্রৌপদী বললে তাকে দুর্বাসার কথা।

কৃষ্ণ বললে, 'দ্রৌপদী, আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, আগে আমাকে ভোজন করাও।'

লজ্জায় অধোমুখ হল দ্রৌপদী। কাতরকণ্ঠে বললে, আমার ভোজন পর্যন্ত থালা অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিছু নেই আর থালাতে।'

বাসুদেব বললেন, 'আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত, এখন কি পরিহাস করা উচিত? শিগগির সেই থালা এনে আমাকে দেখাও।'

নির্বন্ধাতিশয় লঙ্ঘন করতে পারল না দ্রৌপদী। থালা এনে দেখাল। থালার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল, বাসুদেব তা খেয়ে কৃষ্ণাকে বললেন, 'এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হোক।' ভীমকে বললেন, 'যাও, ব্রাহ্মণদের ডেকে আনো।'

দেবনদীতে স্নান করছে দুর্বাসা ও তার শিষ্যরা, ভীমসেন ডাকতে এল। দুর্বাসা বললে, 'আমাদের আর খেয়ে দরকার নেই, পেট ভরে গিয়েছে। পেট ভরে গিয়েছে।'

'উদ্গার তুলতে লাগল সকলে। বললে, আমাদের জন্যে আর রাঁধতে হবে না। পাকক্রিয়া বন্ধ করুন।'

বৃথা পাকের জন্যে হয়তো অপরাধী হলাম। পাণ্ডবের কোপদৃষ্টিতে আমরা না ভস্মসাৎ হই। ব্রতধারী তপস্বী সদাচাররত নারায়ণ-পরায়ণ পাণ্ডবেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হলে আমরা তুলোর মত পুড়ে মরব। অতএব শীঘ্র পালাই চলো। পাঞ্চালকুমারী, ভয় নেই। বললে কৃষ্ণ, যারা ধর্মের অনুগত তারা কখনোই অবসন্ন হয় না।

ঠাকুর বললেন, সেখানে সন্তোষ করলেই সকলেই সন্তোষ।

মূলে জলসেচন করো। শাখায় পল্লবে কে জল দেয়, গোড়ায় জল পেলেই বৃক্ষ পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলান্বিত হয়ে উঠবে।

ডাক্তার সরকার বলছে ঠাকুরকে দেখিয়ে, 'ইনি যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকের নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবে চাকটি বেশ হয়।'

যত মত তত পথ কে বলতে পারে? যে সব মত আচরণ করেছে সব পথ বিচরণ করেছে। সব পথই পৌঁছেচে গিয়ে ঈশ্বরে। সব পথে হেঁটে সেই চূড়ান্তকে স্পর্শ করে ফিরে-ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছেন আমাদের জন্যে। ছেড়ে যাওয়াতেও ঈশ্বর, ফিরে আসাতেও ঈশ্বর। সন্ন্যাসেও ঈশ্বর, সংসারেও ঈশ্বর। যেখানে থাকো সেখানেই রামের অযোধ্যা।

মহিমাচরণ বললে, 'আপনার যখন অসুখ তখন ডাক্তারেরা তার কি করবে? এ হচ্ছে ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়ানো।'

ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি খুব ভালো ডাক্তার, আর এঁর খুব বিদ্যা।'

'তা কে সন্দেহ করে।' বললে মহিমাচরণ, 'উনি জাহাজ আর আমরা ডিঙি। কিন্তু ওখানে,' ঠাকুরের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলে, 'ওখানে সবই সমান।'

আমি তো চিকিৎসা করতে আসিনি, আমি নিজেই চিকিৎসিত হতে এসেছি। আমার তিনি অহঙ্কার বাড়াবেন কি, আমার অহঙ্কার তিনি ধুলো করে দিলেন। জড়বাদী ছিলুম, জড় যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ ছাড়া কিছু নয় তাই শিখলুম দেখতে। অবতার মানতুম না কিন্তু দেখলুম গোষ্পদীকৃত যে জল তাই আবার সমুদ্রায়িত। বিজ্ঞানী ছিলুম কিন্তু দেখলুম জানার বাইরে অজানা কি বিশাল! সেই মহৎ অজানাকে স্বীকার করলুম, প্রণাম করলুম। শুষ্ক ছিলাম, ঠাকুর আমাকে 'রসিয়ে' দিলেন। বললেন, শুকনো আছ কিন্তু তুমি রসবে। আমি রসাস্বাদপরিপূর্ণ হয়ে উঠলুম।

চিরপুরাতনের মধ্যে দেখলুম সেই নিত্যনতুনকে। যিনি সর্বদা অনুভূয়মান হয়েও আপন মাধুর্যের দ্বারা অননুভূতের মত বিস্ময় জন্মিয়ে থাকেন, তিনিই তো নিত্য-নতুন। হে অপরিমেয় অমৃত, তোমাকে বুঝতে না দাও, দাও আস্বাদ করতে। অন্তত এটুকু যেন বুঝি তোমার সর্বব্যাপী ভূমমূর্তির কাছে সকলে পরাভূত। তোমার বিশ্বরূপ দেখলে পৃথিবীকে মনে হবে পরমাণু, সমুদ্রকে মনে

হবে জলবিন্দু, জ্যোতির্মণ্ডলকে অগ্নিকণা, বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আকাশ সূচীছিদ্র, জগৎ-উৎপত্তিপ্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সামান্য জীব আর অন্যান্য দেবদেবী ক্ষুদ্র কীটাণু। হে পূষণ, হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মের জন্য যে উন্মুখ তার দৃষ্টিতে তুমি একে উন্মুক্ত করো।

তিনজনকে পরাভূত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম, নিরন্ধ্র সংশয়—নরেন্দ্রনাথ ; দ্বিতীয় দুরপনেয় পাপ—গিরিশচন্দ্র ; তৃতীয় স্পর্ধোদ্ধত বিজ্ঞান—মহেন্দ্র সরকার।

নিশাচর একটা পাখি ডেকে উঠল রাতের অন্ধকারে। অমঙ্গলের ভয়ে শ্রীমা'র মন শিউরে উঠল। না, অমঙ্গল কোথায় ! সর্বত্র শিব, সর্বত্র শুভ। সর্বত্র শান্তি। সমস্ত বিশ্বের স্বস্তি হোক। খল প্রসন্ন হোক, অনুকূল হোক। সমস্ত প্রাণী পরস্পরের হিতচিন্তা করুক। শুধু ভজনা করুক মৃত্যুঞ্জয় মঙ্গলকে। আর কিছু নয়, ঈশ্বরে মতি হোক অহৈতুকী।

১৬১

অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু দেবসৈন্য মারা গেল। দুর্বাসার সাপেও স্বর্গ শ্রীহীন, যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায়। নিরুপায় হয়ে দেবতারা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা তাদের নিয়ে এল ক্ষীরোদসাগরের পারে, বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললে, অসুরদের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর সমুদ্রমন্থন করে উদ্ধার করো অমৃত। সেই অমৃতেই স্বর্গের পুনরুজ্জীবন হবে।

মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে নাও। প্রথমে বিষ উঠবে তাতে ভয় কোরো না। অনেক হয়তো কামনীয় বস্তু উঠবে তাতে লোভ কোরো না। লোভের জিনিস না পেলে ক্রোধ কোরো না। যদি কোথাও শান্তি থাকে তা অন্বেষে। অসুররাজ বলির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল দেবতারা। সন্ধিতে সম্মত হল বলি। কিন্তু এ কি কাণ্ড, জলে নেমেই মন্দর ডুবে গেল অতলে। ভগবান তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করে মন্দরকে পিঠে তুললেন। তাকে দাঁড়াবার আধার দিলেন।

শুরু হল মন্থন। প্রথমেই হলাহল উঠল। দেবতারা ভয় পেয়ে গেল, সর্বপ্রাণীর সুহৃদ শঙ্করের শরণ নিল। অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের দুঃখে সন্তপ্ত হওয়াই অখিলাত্মা পরমপুরুষের আরাধনা। যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ পরস্পর বৈরভাবে আবদ্ধ তাদের প্রতি কৃপা করলেও ভগবান প্রীত হবেন। সুতরাং আমি এই বিষ পান করব। প্রজাগণের স্বস্তি হোক।

মহাদেব অঞ্জলি করে পান করল হলাহল। তীব্র বিষের প্রভাবে কণ্ঠ নীল হয়ে গেল। আবার মন্থন চলল। ক্রমশ উঠল সুরভি নামে গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে

অশ্ব, ঐরাবত নামে হস্তী, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি অষ্ট দিগগজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি আর পারিজাত নামে সর্বকামবরদ বৃক্ষ। সর্বশেষে উঠলেন শ্রীদেবী। দেবী নিজের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগলেন। তাকালেন ব্রহ্মার দিকে। উচ্চপদ আছে কিন্তু কামজয় নেই। তাকালেন শুক্রাচার্যের দিকে। জ্ঞান আছে কিন্তু অনাসক্তি নেই। তাকালেন সনকের দিকে। সর্বসঙ্গবর্জিত বটে কিন্তু সমাধিলীন। তাকালেন পরশুরামের দিকে। ধর্ম আছে কিন্তু দয়া নেই। তাকালেন মার্কণ্ডেয়ের দিকে। দীর্ঘ আয়ু আছে কিন্তু শীল নেই, মঙ্গল নেই। তাকালেন দুর্বাসার দিকে। তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধজয় নেই। কোথায়, কোথায় আমার আশ্রয়?

তাকালেন মুকুন্দের দিকে। আত্মারাম, জ্ঞানকর্মপ্রেমের মূর্তির দিকে। তাকেই বরণ করলেন। তার পর উঠল সুরা নামে আরেক কন্যা। অসুরেরা তাকে আয়ত্ত করল। তোমরা শ্রীকে নাও আমরা সুরাকে নেব। এবার অমৃতকুম্ভ হাতে উঠে এল ধন্বন্তরি। তার হাত থেকে অসুরেরা ছিনিয়ে নিল সুধাভাণ্ড।

দেবতারা হতভম্ব হয়ে গেল। ম্লান মুখে দাঁড়াল এসে শ্রীহরির সামনে। শ্রীহরি মোহিনী মূর্তি ধরলেন। মোহিনীকে দেখে অসুরেরা কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। বললে, ভামিনি, অমৃতের অভিলাষে আমরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়েছি, তুমি আমাদের এই গৃহকলহ ভঞ্জন করো। এই অমৃতকুম্ভ তুমি নাও, তুমিই বণ্টন-বিতরণ করে দাও।

মোহিনীর হাতে অমৃতকুম্ভ তুলে দিল অসুরেরা। এক পঙক্তিতে দেবতা ও আরেক পঙক্তিতে অসুরদের আলাদা করে বসিয়ে দিল মোহিনী। এবার যাকে যোগ্য মনে করি তাকেই দেব এই অমৃত জরামরণহারিণী সুধা।

শুধু চারুবাক্যে অসুরদের তৃপ্ত রাখল মোহিনী। অমৃত পান করাল দেবতাদের। অসুর-রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে বসেছিল দেবতাদের পঙক্তিতে। সে-ও অমৃত পান করলে। চন্দ্র-সূর্য চিনতে পারল রাহুকে। ছদ্মবেশী, তুমি এখানে? চক্র দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলল তক্ষুনি। মাথা কাটলে কি হবে অমৃত পান করেছে রাহু, তাই মরল না। চন্দ্র-সূর্যের চিরশত্রু হয়ে রইল। শ্রীহরি তখন স্ত্রীরূপ ত্যাগ করলেন। এই কাণ্ড?

অসুরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবতাদের আক্রমণ করলে। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। দেবতারা অমৃত পান করেছে, তাদের সঙ্গে কে পারবে? বলি দ্বৈরথসংগ্রামে ইন্দ্রকে আহ্বান করলে। এত বড় কথা? ইন্দ্র তার শতপর্ব বজ্র উত্তোলন করে বলির দিকে ধাবমান হল। স্পর্ধা করে বললে, এখুনি আমি তোর শিরশ্ছেদ করছি।

বলি হাসল। বলল, বৃথা হর্ষ রাখো। আমরা সকলে কালপ্রেরিত হয়ে কর্ম করছি, তুমি যদি জয়ীও হও, মনে কোরো না তুমি তোমার জয়ের বা আমার পরাজয়ের কর্তা। কর্তা স্বয়ং বিভু। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ তাই স্পর্ধান্বিত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করছ।

তর্ক রাখো। বজ্রাঘাতে বলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করল দেবরাজ।

অসুরেরা বলিকে অস্তপর্বতে নিয়ে গেল। শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী দিয়ে বলিকে বাঁচিয়ে দিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি, পরাজয়েও খিন্ন হল না, পরাভূত হল না। পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করল। যজ্ঞের হুতাশন থেকে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূণীর কবচ উত্থিত হল। শুক্রাচার্য দিব্য শঙ্খ দিলেন। ইন্দ্রপুরী অবরোধ করল। ধ্বনিত করল সেই মহাস্বন শঙ্খ। দেবগুরু বৃহস্পতি ভয়চকিত হয়ে ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া কেউ বলিকে নিরস্ত করতে পারবে না। তোমরা দ্রুত অদৃশ্য হও, অর্থাৎ পলায়ন করো। পালিয়ে গেল দেবতারা। বলি স্বর্গপুরী অধিকার করে বসল। দেবমাতা অদিতি স্বামিত্যক্ত আশ্রমে অনাথার মত বাস করতে লাগল। অদিতিপতি কশ্যপ একদিন ফিরে এলেন আশ্রমে। দেখলেন আশ্রম আনন্দশূন্য, অদিতি দীনা-হীনার মত বসে আছে এক কোণে। কি, সমস্ত কুশল তো? কোনো অতিথি ফিরে যায়নি তো অনাদৃত হয়ে?

কুশল? এর চেয়ে ঘোরতর দুর্দিন আর কি হতে পারে? শত্রুরা আমার পুত্রদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের শ্রীহরণ করেছে, রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে, আপনি যদি এর প্রতিবিধান না করেন তো কে করবে?

কিসের রাজ্য, কিসের শ্রী? কে-বা কার পতিপুত্র? কশ্যপ হাসলেন। সমস্তই বিষ্ণুমায়া। সেই মায়াতেই এই জগৎ স্নেহবন্ধ, মোহাক্রান্ত। যদি কিছু সত্যবস্তু থেকে থাকে তা হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরভক্তিই অমোঘা, নিশ্চিতফলপ্রদা।

সুতরাং বাসুদেবপরায়ণ হও। পয়োব্রত নামে ব্রত উদ্‌যাপন করো। সে ব্রতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অসদালাপ বর্জন, উচ্চ-নীচ সমস্ত রকম ভোগ-ত্যাগ, সর্বভূতে অহিংসা আর ঈশ্বরে নিশ্চল একাগ্রতা।

ব্রত উদ্‌যাপন করল অদিতি। আদিপুরুষ ভগবান তার কাছে আবির্ভূত হলেন। প্রীতি-বিহ্বল হয়ে অদিতি ভূমিতে দেহ রেখে দণ্ডবৎ তাঁকে প্রণাম করল। রোমাঞ্চিতকায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রু। প্রভু, দাঁড়াও, তোমাকে আরো একটুকু দেখি।

শোনো। বলপ্রয়োগে অসুরেরা এখন পরাজিত হবে না। আমি নিজে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। বলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীহরি। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হল। বটুরূপ ধারণ করলেন। কত জনে কত উপহার নিয়ে এল। সূর্য দিল সাবিত্রীমন্ত্র, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, মাতা অদিতি কৌপীন। স্বর্গ দিল ছত্র, সোম দণ্ড, সরস্বতী অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, কুবের ভিক্ষাপাত্র আর ভগবতী ভিক্ষা।

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবটু চলল বলির যজ্ঞক্ষেত্রে। প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করতে-করতে।

এ কে তুমি অভিনব? তেজোদৃপ্ত রূপচ্ছটায় বলি অভিভূত হয়ে গেল। এস তোমার পা দুখানি নিজ হাতে ধুয়ে দিই।

নিজ হাতে পা ধুয়ে দিয়ে সেই পাদশৌচ জল মাথায় তুলে নিল বলি। বললে, আজ আমার যজ্ঞ ফলান্বিত, আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত আর আমার কুল পবিত হল। আপনার পদজলে আমার পাপ প্রক্ষালিত হল, আপনার পদন্যাসে ভূমিতল তীর্থীকৃত হল। আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলেই অনুমান করছি। গাভী কাঞ্চন গজ তুরঙ্গ রথ গৃহ অন্ন পেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম বিপ্রকন্যা যা আপনি অভিলাষ করেন, তাই আপনাকে দেব অকাতরে। দেব ভূরিভূরি।

তোমার এই বাক্য সুনৃত ধর্মান্বিত, তোমারই কুলোচিত। বললে বামনদেব। তোমাদের বংশে এমন কেউ নিঃস্বত্ত্ব কৃপণ জন্মেন নি যে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে করো তোমার পিতা বিরোচনের কথা। শত্রু দেবতা ছদ্মবেশ ধরে এসেছে জেনেও তাকে তার পরমায়ু দিয়ে ফেললে। তুমি যোগ্য কুলভূষণ। শোনো আমার যাচনীয় বিশেষ কিছু নেই, আমি তোমার কাছে শুধু তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করছি।

বলি পরিহাস করে উঠল। বললে, আপনার আকারের মতই আপনার বুদ্ধি! বালকের মত কথা বলছেন কেন? যে ত্রিলোকের একেশ্বর তার কাছে আপনি শুধু তিন-পা মাটি চাইছেন? ভূমিই যদি নিতে হয় অন্তত জীবিকা ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করুন।

আমার যাবন্মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুই আমি নেব। বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনং। তার বেশি নিলে আমার পাপ হবে। বললে বামনদেব। যা যদৃচ্ছাক্রমে আসে তাতে যে সন্তুষ্ট, সেই যথার্থ সুখী। যে অসন্তুষ্ট অজিতাত্ম তার ত্রিভুবনেও সুখ নেই। তিন-পা ভূমিই আমার যথেষ্ট, তাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি। সুতরাং তার অতিরিক্ত আমার কামনীয় নয়।

বেশ, তবে তিন-পা ভূমিই আপনাকে দেব।

ভূমিদানের জন্যে বলি জলপাত্র হাতে নিয়েছে, শুক্রাচার্য ছুটে এল। বললে, মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।

সে কি?

আপনি জানেন না এই বামনবেশী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু। মায়াবলে আপনার সমস্ত কেড়ে নিতে এসেছে। আপনার স্থান শ্রী যশ বিদ্যা—সমস্ত। সমস্ত কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেবে ইন্দ্রকে, আপনার প্রতিপক্ষকে এ আপনি কিছুতে সহ্য করবেন না। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপদ দিয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করবেন। অবহিত হোন, এঁকে কিছু দান করবেন না। দৈত্যকুলের মহা অনর্থ ডেকে আনবেন না। তিন লোক দিয়ে এঁর তিন-পদ পূরণ করতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে নিরয়গামী হবেন! যে দানে দাতার জীবন বিপন্ন হয় সে দান অদেয়।

কিন্তু মিথ্যাকথনের পাপে লিপ্ত হব? বলি প্রতিবাদ করে উঠল।

শুক্রাচার্য বললে, স্ত্রীর কাছে, কৌতুকে, বিবাহব্যাপারে, জীবিকার জন্যে, প্রাণসংকটে, সর্বস্বাপহরণ কালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে, কারু প্রাণহিংসা নিবারণ-

কল্পে মিথ্যাকথন দূষণীয় নয়। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হয়ে সত্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক। আর যে সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারে সে-ই প্রকৃত ধর্মজ্ঞ। অকৃতপ্রজ্ঞ লোক ধর্মাভিলাষী হয়ে কৌশিকের মত মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

কে কৌশিক ?

এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। গ্রামের অনতিদূরে অরণ্যপ্রান্তে বাস করতেন। একমাত্র ব্রত ছিল, সে হচ্ছে সত্যকথন। সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। একদা কতকগুলি লোক দস্যুতাড়িত হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করল। পশ্চাদ্ধাবিত দস্যুরাও খুঁজতে-খুঁজতে এল সেই বনপ্রান্তে। কৌশিককে জিগগেস করলে, কতকগুলি লোক ভীত-ত্রস্ত হয়ে এই দিকে এসেছিল আপনি দেখেছেন ? দেখেছি। কোন পথে গিয়েছে যদি জানেন সত্য করে বলুন। সত্যব্রতরত কৌশিক বললেন, ঐ বৃক্ষলতাগুল্ম বেষ্টিত অটবীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। ক্রূরকর্মা। দস্যুরা অরণ্যে ঢুকে লোকগুলির সন্ধান পেল ও তাদের আক্রমণ ও বিনাশ করল। সূক্ষ্মধর্মে অনভিজ্ঞ কৌশিক সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে ঘোর নরকে নিপতিত হল।

বলি বললে, প্রভু, যা বললেন তা গৃহস্থদের ধর্ম। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের বংশধর, দেব বলে কথা দিলে সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারব না। বিত্তের বিবেচনা আমার কাছে বিবেচনাই নয়। তার নাশে-লাভে আমার সমান অস্পৃহা। পৃথিবী বলেছে, অসত্যের চেয়ে বড় অধর্ম আর কিছু নেই। অসত্যপর নর ছাড়া আর সকলের ভারই সহ্য করতে পারি, মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শই অসহ্য। নরককে ভয় করি না, সর্ব-দুঃখের আকর দারিদ্র্যকে ভয় করি না, মৃত্যুকে না, স্থানচ্যুতিকে না ; একমাত্র ভয় করি মিথ্যাকে, বঞ্চনাকে, প্রতিশ্রুতি-পালনের পরাঙ্মুখতাকে। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হোন আর শত্রুই হোন, এই বটুর প্রার্থিত ভূমি আমি দান করব।

শুক্রাচার্য বিফলমনোরথ হয়ে শাপ দিল বলিকে।

গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হল না বলি। বামনকে অর্চনা করে ভূমিস্পর্শ করে প্রথমে জলদান করল। বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী স্বর্ণকুম্ভ ভরে আরো জল নিয়ে এল। সে জলে বলি স্বয়ং বামনের পদযুগল ধুয়ে দিল। আর সেই বিশ্বপাবন জল মাথায় ধরল। এবার নিন আপনার ত্রিপাদ ভূমি।

এক পদে সমস্ত মর্তমহী আকাশ ও দিগ-দিগন্ত আক্রমণ ও আচ্ছন্ন করল বামন। যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করল স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মহর্লোক ও তপোলোক ছাড়িয়ে পেঁছুল গিয়ে শেষলোকে, সত্যলোকে। তৃতীয় পদের জন্যে আর অণুমাত্র স্থান রইল না।

বামন বললে, দুই পদে সমুদয় স্বর্গমর্ত ঢাকা পড়েছে, এবার তৃতীয় পদের জন্যে স্থান দাও। নিজেকে আঢ্য মনে করে দানের অঙ্গীকার করেছ, এবার পূরণ করো অঙ্গীকার। অর্থীকে প্রতিশ্রুত বস্তু না দিয়ে যে বঞ্চনা করে তার মনোরথ

বৃথা, তার স্বর্গ দূরস্থ এবং তার পতন অনিবার্য।

আমার বাক্য কখনো মিথ্যে হবার নয়। বললে বলি। হে উত্তমশ্লোক, আপনার তৃতীয় পদের জন্যেও আমি স্থান দেব। আমি কখনোই ভঙ্গ করব না প্রতিজ্ঞা। আমার এই মাথাই আপনার তৃতীয় পদের স্থান। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজং।' পদচ্যুতি পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, আমার ভয় অপযশে। আমার মাথায় রাখুন আপনার তৃতীয় পদ। অন্তে যে দেহের অবসান হবে তাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী দস্যু স্বজনবর্গেই বা কি প্রয়োজন? সংসারহেতুভূতো স্ত্রীতেই বা কি দরকার? এ আমার কি সৌভাগ্য, যে সম্পদ কৃতান্তকে ভুলিয়ে রাখে সে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আপনার সামীপ্য পেলুম। পেলুম আপনার পদস্পর্শের অধিকার।

সেখানে তখন প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। পিতামহকে পূজোপহার দিতে পারছে না, বলি ব্রীড়ামণ্ডিত অধোমুখে অশ্রুবিলোল নয়নে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীহরিকে প্রণাম করে প্রহ্লাদ বললে, ভগবান, আপনিই বলিকে ইন্দ্রপদ দিয়েছিলেন, আপনিই আবার সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করলেন। এর চেয়ে বলির আর কি ভাগ্য হতে পারে?

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে বিন্ধ্যাবলী, হে ঈশ্বর! আপনি নিজ খেলার জন্যে এই ত্রিজগৎ রচনা করেছেন। যারা কুবুদ্ধি তারাই কর্তৃত্বের অভিমান করে। যতই অহংকার করুক তাদের সাধ্য কি দান করে আপনাকে?

ব্রহ্মা বললে, হে ভূতেশ, হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ নিগ্রহযোগ্য নয়, সত্যরক্ষার জন্য সর্বস্ব দান করেছে আপনাকে। দান করেছে নিজেকে, নিজের মাথা আপনার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কি চাই?

তাই তো হয়। বললেন শ্রীহরি। যাকে আমি কৃপা করি তার সকল সম্পদ আমি কেড়ে নিই। যে লোক সম্পদে মত্ত ও স্তব্ধ, সে যে আমাকেও অবজ্ঞা করে। দৈত্য কুলের কীর্তিবর্ধন এই বলি দুর্জয়া মায়াকে পরাভূত করেছে। জ্ঞাতিরা একে ত্যাগ করেছে, গুরু অভিসম্পাত দিয়েছে, তবুও আমার ছলনা বুঝতে পেরেও সত্য থেকে বিচলিত হয়নি। একে আমি দেবদুর্লভ স্থান দিচ্ছি। বলি, তুমি সুতলে গিয়ে বাস করো। সেখানে দেবদানব কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আমি সানুচর তোমাকে রক্ষা করব। তুমি সর্বক্ষণ আমাকে তোমার কাছে সন্নিহিত দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হোক।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাত। ঠিক-ঠিক সন্ন্যাসী, ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধু বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরভাবেতে রয়েছে আবার কামিনি-কাঞ্চন নিয়ে মেতেছে। ঠিক-ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতক পাখির মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র তেরো

নদী ভরপুর, সে জন্য জল ছোঁবে না। ছোঁবে না কামিনী-কাঞ্চন। পাশে আসক্তি হয় কাছেও রাখবে না।'

ডাক্তার সরকারকে এবার লক্ষ্য করলেন ঠাকুর, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। তবে এ জানবে টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়, থাকবার একটি স্থান হয় আর ঠাকুরের ও সাধু ভক্তদের সেবা হয়। ব্যস এই পর্যন্ত। আর স্ত্রী। স্বদারায় গমন দোষের নয়। তবে একটি দুটি ছেলেপুলে হয়ে গেলে ভাই-ভগিনীর মত থাকবে।'

কিন্তু সন্ন্যাসী? কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। "সন্ন্যাসী নারী হেরবে না" এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল, চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন। কালো পাঁঠা মা'র সেবার জন্যে বলি দিতে হয়, কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। সন্ন্যাসী রমণীসঙ্গ তো করবেই না; মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না। জিতেন্দ্রিয় হলেও না, লোকশিক্ষার জন্যেও না। তার এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।'

আর টাকাকড়ি?

'টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা। হিসাব, দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, দেহের সুখের চেষ্টা, এই সব এসে পড়ে। সূর্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর পক্ষে গেরো দেওয়া সেলাই করা পরদা গুটানো দোরবাক্সে চাবি দেওয়া এই সব চলবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা নেওয়া মানে ব্রাহ্মণের বিধবা হবিষ্য খেয়ে বাগদি উপপতি করা। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? সন্ন্যাসীর ষোলো আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকের সাহস হবে।' বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন: একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে বেরুল তীর্থ করতে। পথে যেতে স্বামী দেখতে পেল এক জায়গায় কয়েকটা হীরে পড়ে আছে। ভাবলে এগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি, নইলে যদি স্ত্রী দেখতে পায় তবে লোভ হতে পারে। মাটি চাপা দিয়ে রাখছে, স্ত্রী পিছন থেকে এগিয়ে এসে বললে, ও কি করছ? স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী ছাড়বে কেন, নিজেই পা দিয়ে মাটিগুলি সরাতে লাগল। যেই সরিয়েছে দেখতে পেল, হীরে। তখন বললে, আশ্চর্য, এখনো হীরে-মাটি তফাত দেখছ, তবে তুমি মরতে বনে এলে কেন?

তেজচন্দ্র মিত্রকে ডেকে পাঠান ঠাকুর। কিন্তু তার কি আসবার সময় আছে? তার কেবল কাজ, কেবল আপিস! 'তোকে এত ডেকে পাঠাই আসিস না কেন?' সেদিন আসতেই জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আপনিই ডাকেন, আপনিই আবার আটকান। মন্দিরও আপনি আপিসও আপনি।'

'আমি তোকে আপনার জন বলে জানি, তাই ডাকি।'

'কিন্তু সাড়া দেবার মত প্রাণ দিচ্ছেন না কেন? অবসর নেই, অবসর নেই,

এই তো প্রাণের কান্না।'

'অবসর নেই, অবসর নেই!' প্রতিধ্বনি করলেন ঠাকুর।

এই অনবসরের মধ্যেও ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন তিন পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আচ্ছন্ন করেছেন, তখন স্থানে-কালে অবসরে-অনবসরে কোথায় আর ব্যবধান? আমার ধ্যানে যেমন ঈশ্বর আমার বিক্ষিপ্ততায়ও তেমনি ঈশ্বর। আমার নামে যেমন ঈশ্বর বিস্মৃতিতেও তেমনি ঈশ্বর। যেমন ঈশ্বরচিন্তনে তেমনি ঈশ্বর-বিভ্রান্তিতে।

তোমাকে যদি আমি ভুলে থাকি সে তুমিই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ বলে। আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত যে এই নিশ্বাস এ তোমারই তপ্ত প্রাণ-স্পর্শ। আমি এই যে লিখছি এ-ও তোমাকেই লেখা। এই যে পড়ছি এ-ও তোমাকেই দেখা।

'দিবীব চক্ষুরাততং।' একসঙ্গে অতি সহজেই সমস্ত আকাশকে চোখে দেখা। তেমনি তোমাকে দেখতে দাও। ভেঙে-ভেঙে নয়, টুকরো-টুকরো করে নয়, জীবনের ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নয়, সম্মিলিত করে একসঙ্গে দেখা, সমগ্র করে একসঙ্গে আস্বাদ করা। ঈশ্বরের পদতলে বলি হওয়া।

১৬২

দুপুরবেলা। মেঘ নেই বৃষ্টি নেই, রোদেভরা আকাশ, হঠাৎ একটা বাজ পড়ল। আচমকা আওয়াজ শুনে চমকে উঠল লক্ষ্মী। চমকে উঠলেন শ্রীমা। বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ কি অলক্ষণ! দুজনেই ছুটে গেল ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর বললেন, 'কি গো, ভয় পেয়ে ছুটে এসেছ বুঝি?'

তা ছাড়া আবার কি! দুজনে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। ঠাকুরের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

'রাম-অবতারে লীলা-অবসানের আগে কালপুরুষ স্বয়ং এসেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'এবার বজ্রধ্বনিতে সংকেত করে গেলেন দিন আর নেই। খেলাঘর ভেঙে দাও এবার।'

লক্ষ্মী বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

'কিসের দুঃখ কিসের শোক!' লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিলেন ঠাকুর: 'এখানকার কত কথাই তো শুনলি, সেই সব কথা বলবি সবাইকে। সে তো শুধু আনন্দের কথা, অমৃতের কথা। দেশে রঘুবীর আছে, তাকে নিয়ে থাকবি। আর কতদিনের জন্যেই বা এই তিরোধান। শোন, একশো বছর—মোটে একশো বছর—'

দুজনে তাকাল উৎসুক হয়ে।

'একশো বছর পরে আবার আসব।'

'এই একশো বছর থাকবে কোথা?' জিগগেস করলেন শ্রীমা।

'থাকব ভক্তহৃদয়ে।'

'আপনি আসুন গে। আমি আর আসছি না।' অভিমানভরে বললে লক্ষ্মী, 'তামাককাটা করলেও না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবি কোথায়? প্রাণ টিকবে না যে আমাকে ছাড়া। কলমির দল এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

লক্ষ্মীকে ঠাকুর শীতলা-জ্ঞান করতেন। কামারপুকুরের ঘরে যে মা-শীতলা আছেন লক্ষ্মী তাঁরই প্রতিরূপ।

হৃদয় যখন চলে যায় ঠাকুরকে বলেছিল, 'মামা, এখানে কি করতে পড়ে আছ? গঙ্গার ধারে তোমার জন্যে যে একখানা বাগান দেখে এসেছি সেখানে চল তোমাকে নিয়ে গিয়ে বসাই। তারপর দেখাই একবার ভানুমতীর খেল্।'

ঠাকুর বললেন, 'শালা তুই আমাকে শীতলা পেয়েছিস? শীতলার বামুনের মত তুই আমাকে ফিরি করে বেড়াবি? আমি তোর পয়সা রোজগারের ফিকির? এই হীনবুদ্ধি নিয়ে তুই জীবন কাটালি? তোর দুঃখ তবে কে ঘোচাবে?'

যে শীতলা বামুনের থালায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না, যে শীতলা ভক্তের হৃদয়পদ্মে স্থির হয়ে থাকে সে-ই লক্ষ্মী।

ভবতারিণী ও রাধাকান্তের জন্যে কত ভোগসামগ্রী আসে, কত ভালো-ভালো ফল আর মিষ্টি, আহা আমার কামারপুকুরের শীতলা কিছুই খেতে পায় না এই ভেবে কষ্ট হয় ঠাকুরের। একদিন মা-শীতলা স্বপ্ন দিলেন ঠাকুরকে, 'গদাই, আমি একরূপে ঘটে আর এক রূপে তোমাদের লক্ষ্মীতে। লক্ষ্মীকে খাওয়ালেই আমার খাওয়া হবে।'

কাশীপুরে দুবার ঠাকুর পুজো করলেন লক্ষ্মীকে। তার উচ্ছিষ্ট খেলেন।

গিরিশকে বললেন, 'লক্ষ্মীকে মিষ্টি-টিষ্টি একদিন খাইও। তাহলে মা-শীতলাকে ভোগ দেওয়া হবে। লক্ষ্মী মা-শীতলারই অংশ।'

শ্রীমাকে বললেন, 'আমার বড় সাধ লক্ষ্মীকে একজোড়া বালা ও একছড়া হার দি।' রাম দত্ত কাছে ছিল, বলে উঠল, 'বেশ তো, আগামী রোববারই আমি নিয়ে আসব।' আগামী রোববার আর আসে না। ঠাকুর বললেন, 'শালা ভেগেছে।'

শ্রীমা বললেন, 'বেশ তো, তোমার যখন অত সাধ, আমার পুরোনো বালা ও হার লক্ষ্মীকে দিয়ে দি।'

'না, না, তোমারটা দিতে যাবে কেন? আমার নতুন গড়িয়ে দেবার সাধ। মা-শীতলা বলে দেব।'

লক্ষ্মীর কানে গেল কথাটা। বললে, 'আমি হার-বালা চাই না। আমি ঐ টাকায় বৃন্দাবনে যাব।'

'সে তো যাবিই। কিন্তু তোর নতুন গয়নাও চাই যে।'

ঠাকুর বেঁচে থাকতে সে গয়না হয়নি। পরে যখন ভক্তরা জানতে পেল ঠাকুরের সাধের কথা, হার-বালা গড়িয়ে দিল লক্ষ্মীকে। ঠাকুরের সাধ, লক্ষ্মী তাই হাতে-গলায় পরল সে গয়না। কিন্তু পরামাত্রই খুলে ফেলল। দিয়ে দিল অন্যকে।

শ্রীমা বললেন, 'কাল উনি বীজমন্ত্র আমার জিভে লিখে দিয়েছেন। তুই যা না। তোকেও লিখে দেবেন দেখিস।'

লক্ষ্মী কেমন কুণ্ঠিত হল। বললে, 'আমার বড় লজ্জা করে।'

'সে কি রে? তাঁর কাছে যাবি, লজ্জা কিসের?'

'কি বলে চাইব?'

'মুখ খুলে চাইতে হবে কেন? অন্তরে অভিলাষটি নিয়ে দাঁড়াবি, তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। একবার শোনাতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন, নিজের থেকেই ব্যবস্থা করবেন—'

'কারা সব আছে।'

সেদিন গেল না লক্ষ্মী। তারপর এমনি একদিন গিয়েছে প্রণাম করতে, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর কোন ঠাকুর ভালো লাগে?'

লক্ষ্মীর বুকের ভিতরে আনন্দ উথলে উঠল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, রাধাকৃষ্ণ। 'জিভ বার কর।' জিভের উপর বীজ ও নাম লিখে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তোর গলায় দেখছি তুলসীর মালা। কে দিয়েছে?'

'লাহাবাবুদের পেসন্নদিদি।'

'হ্যাঁ, ঐ মালা রাখবি। তোকে বেশ দেখায়।'

শ্রীমা এসে বললেন, 'সে কি গো? লক্ষ্মীর যে আগে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

'সে আবার কবে?'

'ঐ যে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী এসেছিল কামারপুকুরে, নাম পূর্ণানন্দস্বামী, তার কাছ থেকে।'

'তা হোক গে। লক্ষ্মীকে আমি যে মন্ত্র দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি।

পুরী এসেছে লক্ষ্মী। স্বর্গদ্বারে নেমেছে স্নান করতে। ঢেউয়ের দোলায় কি করে কে জানে ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছে চক্রতীর্থ পর্যন্ত। গোপবেশী কে একজন হিন্দুস্থানী যুবক জলে নেমে তাকে উদ্ধার করল, টেনে তুলল ডাঙার উপর। সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকে আর দেখতে পেল না লক্ষ্মী।

ক্লান্তদেহে মুহ্যমানের মতো বাড়ি ফিরে এল লক্ষ্মী। তারপর দেহে আরো একটু বল এলে গেল জগন্নাথদর্শনে। এ কি! মন্দিরের বলরামের জায়গায় যে সেই গোপ-বালক। মাঝে-মাঝে বলরামের আবেশ হয় লক্ষ্মীর। তখন গলায় নবমল্লিকার মালা দুলিয়ে উত্তাল কেশ এলিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। সঙ্গে-সঙ্গে গান ধরে বিভোর হয়ে। পায়ের নিচে মাটি টলমল করতে থাকে। বলে, 'মেয়েছেলে হয়ে এসেছি, নইলে দেখাতাম, কাকে বলে নৃত্য কাকে বা কীর্তন।'

জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়ে দেখে যে জগন্নাথ সেই রামকৃষ্ণ।

ঠাকুর বললেন, 'ঠাকুর দেবতা স্মরণে না আসে তো আমাকে ভাববি। তাহলেই হবে। কি রে, আমাকে মনে হয় তো? কেমন, মনে হয়?'

লক্ষ্মী ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'হ্যাঁ তা হয়।'

'কি রকম হয় ?'

'এই যেমন দেখছি তেমনি।'

লক্ষ্মীকে ভিক্ষেয় পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'যা বাড়ি-বাড়ি নাম বিলিয়ে আয়।'

'লোকে যদি গালাগাল দেয় ?'

'দিক না গালাগাল। তোর পায়ের ধুলো তো তাদের বাড়িতে পড়বে। তাতেই ওদের মঙ্গল।'

কুঠিঘাটা রতনবাবুর বাড়ি ভিক্ষে করতে গেল লক্ষ্মী। তারা একটা সিকি দিল। লক্ষ্মী তো মহাখুশী। ঠাকুরকে এসে বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে।

ঠাকুর বললেন, 'বড়লোকের বাড়ি গেলি কেন ? গরিবের বাড়ি যাবি।'

ঠাকুরকে কি ভাবে স্মরণ করবে জানো ? লক্ষ্মী প্রণালী বাতলে দিল। প্রথমে ভাববে ভোরবেলা, ঠাকুর উঠলেন ঘুম থেকে। মুখ-হাত ধুলেন, গেলেন ঝাউ-তলায়। তারপর তাঁর পা ধুয়ে দিলে। কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। তারপর তাঁর গলায় দিলে বেলফুলের মালা। তারপর তাঁকে খেতে দিলে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজ আর গঙ্গাজল। সঙ্গে মাখন-মিছরি। তারপর খেতে দিলে পান-তামাক। তারপর জপের জিনিস এগিয়ে দিলে হাতের কাছে।

দুপুরবেলা খাইয়ে দিলে, ডাল-ভাত ডুমুর কাঁচকলার ঝোল। তারপর তাঁকে শুতে দিলে। পাখা করতে থাকলে। কখনো বা পা টিপতে।

রাত্রে সামান্য লুচি আর পায়েস দিলে খেতে। তারপর আবার শয়ন দিলে। হাওয়া করলে। বসলে পাদপদ্মের সেবায়।

শ্রীমা আর লক্ষ্মীর দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বলরামকেও বলেছি আর বেশিদিন কষ্টভোগ করতে হবে না।'

'আহা, বলরামের কি স্বভাব।' বললেন ঠাকুর, 'রাতদিন ঠাকুর নিয়ে আছে। যেন মালী ফুলের মালাই গাঁথছে অবিরাম। আমার জন্যে উড়িষ্যার কোঠারে যায় না। ভাই, মাসোয়ারা বন্ধ করেছিল আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাক, মিছিমিছি কেন এত টাকা খরচ ! ও সব কথা কানে তুলল না বলরাম। শুধু আমার কাছে থাকবে বলে। আমাকে দেখবে বলে।'

বলরামের বাড়িতে রথ টানলেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিশ, নরেন, কালী, রাম দত্ত, প্রতাপ মজুমদার, মাস্টারমশাই, শশধর তর্কচূড়ামণি। সকলেই দড়ি ধরল।

গান ধরলেন ঠাকুর, সঙ্গে ভাবস্বচ্ছন্দ নৃত্য। নদে টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোল রে। শশধরকে বললেন, 'শশধর, একেই বলে ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ ভোগ করে, ভক্তরা ভজনানন্দ। ভজনানন্দ ভোগ করতে-করতেই ব্রহ্মানন্দ।'

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, শশধরের বাড়ি এলেন ঠাকুর। জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি রকম লেকচার দাও ?'

বিনীতস্বরে শশধর বললে, 'আজ্ঞে, শাস্ত্রের কথা বোঝাতে চেষ্টা করি।'

ঠাকুর বললেন, 'জানো তো, আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকশ্চার।' এত বড় পণ্ডিত, কথাটার মানে যেন ধরতে পেল না শশধর।

'বুঝলে না, শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবার মতো মানুষের সময় কই ? আজকাল শুধু নারদীয় ভক্তি। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।' শশধরের দিকে স্নেহচোখে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'বাবা আরেকটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধনভজন করো। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কোরো না। তবে, সন্দেহ কি, যেটুকু করছ লোকের ভালোর জন্যেই সব করছ।' বলে ঠাকুর মাথা নত করে শশধরকে নমস্কার করলেন। ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মা সেদিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আজ আবার এখানে এনেছিস। দেখলুম শশধরকে।'

আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।

শশধর বললে, 'তবে আপনারও বিচারবুদ্ধি ছিল ?'

'তা এক সময় ছিল।'

'তাহলে বলে দিন আমাদেরও একদিন যাবে। আপনার কেমন করে গেল ?'

'অমনি একরকম করে গেল।' বললেন ঠাকুর, 'এখন এই সার কথা, ভক্তিই, সার ঈশ্বরকে ভালোবাসাই সার। শুধু শুষ্ক জ্ঞান নিয়ে থেকো না। প্রেম ধরো। প্রেমেই সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।'

প্রেমই সর্বসাধ্যসার। এ হচ্ছে সেই অনুরাগ যা 'অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।' তদার্পিতাখিলাচারিতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা।

শ্রীমাকে বললেন, 'তোমাকে থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। লক্ষ্মী তোমার দোসর হবে। কখনো তাকে কাছ ছাড়া করবে না। আমার তো হয়ে এল। সে তোমার কাছে থাকলে কত ভালো কথা কয়ে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা করবে।'

কেন শোক করছি, কিসের জন্যে কার জন্যে শোক ? শরীর মন ইন্দ্রিয় দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, তবে মৃত্যুরূপ পরিবর্তনকে ভয় কেন ? মৃত্যুরূপ পরিবর্তনের পরেও তো আছে আরেক অস্তিত্ব। লোকবিচ্ছেদজরামরণ-বর্জিত অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বই তো অবিনাশী। আদ্যন্তরহিত আনন্দরসাশ্রয় অস্তিত্ব। মায়ার জন্যেই দুঃখ। কিসের ভ্রান্তি কিসের মায়া। মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, ঈশ্বরেই বর্তমান, কিন্তু নিজে তিনি মায়ায় আবদ্ধ নন। সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সে বিষে সাপ নিজে মরে না, সে মুখ দিয়ে সে খাচ্ছে ঢোঁক গিলছে, তবুও না, কিন্তু যাকে কামড়ায় সেই মরে। সমস্ত জগৎ মায়ারই বিজৃম্ভণ মাত্র। মায়া পরমেশ্বরাশ্রয়া। মনই মায়া। যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণই দ্বৈত আছে। মন থাকলেই বিকার আর বিকার থাকলেই বিনাশ। বিকার মিথ্যা, আধারই সত্য। বিশ্ব তাই স্বপ্নমায়ার মত, গন্ধর্বনগরের মত। আসলে জীব সর্বাবস্থায়ই মুক্ত, শুধু অবিদ্যার বশে আত্মস্বরূপবিস্মৃত। কাঁধে গামছা আছে, কপালে-তোলা চশমা আছে, শুধু মনে নেই। হাত যায় না কাঁধে, চশমা ঠিক বসে না চোখের সামনে।

যা তিনকাল ও তিন অবস্থায় সৎ তাই সত্য, যা অবাধিত, অনিরুদ্ধ তাই সত্য। যার বোধ হয় রোধ হয় তা মিথ্যা। সত্য চিরকাল সমস্ত অবস্থাতেই সত্য। শুধু দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন। এই সত্য-মিথ্যা নিয়েই চলেছে লোক-ব্যবহার। এই বস্তুকে অন্যবস্তু বলে বোধই অজ্ঞান। যথার্থস্বরূপের বোধই জ্ঞান। যথার্থস্বরূপকে দেখ। যা বৃহৎ যা মহান যা বাধারহিত যা নিরতিশয় তাই যথার্থ-স্বরূপ। যার চেয়ে ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট কিছু নেই তাই যথার্থস্বরূপ। যা নশ্বর তাই দোষযুক্ত! যা দোষলেশশূন্য, নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত তাই যথার্থ-স্বরূপ? তাই ব্রহ্ম। তাই আত্মা, সকলের আত্মা। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

পুরী থেকে মা ফিরেছেন কলকাতায়, সে তেরোশো এগারো সালের মাঘ মাস। এসেই বললেন, চল একবার আমার শাশুড়ি-ঠাকুরুনকে দেখে আসি।

পালকি এসে থামল বোসপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়িতে। এখানে মা'র শাশুড়ি কে! এখানে তো নিবেদিতা থাকে। নিবেদিতা তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছে অঘোরমণিকে, গোপালের মাকে। হাঁটবার-চলবার শক্তি নেই গোপালের মা'র, কেউ দেখবার-শোনবার নেই, তাই নিবেদিতা নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আর কে না জানে গোপালের মা-ই সারদামণির শাশুড়ি।

শয্যায় মিশে আছে গোপালের মা। বাইরে কি একটা কথা বলেছে সারদামণির, কণ্ঠস্বর ঠিক চিনতে পেরেছে। কে ও? আমার মা কি এলে? আমার বৌমা? আমার বৌমা এসেছে?

'হ্যাঁ, মা, আমি এসেছি।' কয়েকটা ফল হাতে নিয়ে সারদামণি ঘরে ঢুকল। ফল কটি গোপালের মা'র হাতে দিয়ে প্রণাম করল সারদামণি। চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটু আদর করল গোপালের মা। বললে, 'ও বৌমা, আমার গোপাল কেমন আছে?'

'তিনি তো ভালোই আছেন।'

'তুমি সময়মত আমার কথা তাকে মনে করিয়ে দিও, মা।'

'তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন।'

এই গোপালই তো মীরাবাঈ-এর রণছোড়, তার গিরিধারী নাগর। 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোঈ।' আমার কাছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব বাপ মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন। আমি কুলের মর্যাদা ছেড়েছি, আর কে কী আমার করবে? সাধুদের সঙ্গ করে লোকলজ্জা খুইয়েছি। চোখের জল ঢেলে-ঢেলে প্রেমলতা পুঁতেছি, সে লতায় ফুল ধরেছে, ধরেছে আনন্দফল। আমাকে দেখে সংসার কাঁদছে কিন্তু ভক্তের দল খুশি। হে ভক্তের ভগবান, তুমিও খুশি হও। হে লাল-গিরিধর, মীরা তোমার দাসী, তাকে তুমি ত্রাণ কর।

মেবারে মেড়তা-তালুকের জমিদার রতনসিং-এর মেয়ে মীরাবাঈ। ছেলে-বেলায় কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে গিয়েছে বিয়ের নেমন্তন্নে। মাকে

জিগগেস করছে, মা, আমার বিয়ে কার সংগে ? আমার বর কই ?

বাড়িতে কুলদেবতা গিরিধারীলালে, সেই বিগ্রহ দেখিয়ে মা বললেন, 'ঐ তোমার বর, ওরই সংগে তোমার বিয়ে।'

মীরার যখন সত্যি বিয়ে হয়, দেখল সংসারবিলাসে সুখ নেই, 'হরি বিন রহ্যা ন যায়।' সখি আর যে থাকতে পারি না হরিহারা হয়ে। শাশুড়ি কাটব্য করে, ননদ গঞ্জনা দেয়, রানা তো বিরস-বিরক্ত হয়েই আছেন। ঘরে বন্দী করেছেন, দরজায় তালা লাগিয়েছেন, রেখেছেন পাহারাওয়ালা। কিন্তু এ তো আমার পূর্ব-পূর্ব জন্মের পুরোনো প্রেম, এ আমি ভুলি কি করে ? হে মীরার গিরিধারী নাগর, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে আমার মনে ধরে না।

হে মীঠাবোলা সাজন-ঘরে একবার এস। পথের পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কতদিন আর চেয়ে থাকব ? আসতে তোমার ভয় কি, এলেই তো সুখোৎসব। হে শ্যামলমোহন, তোমাকেই তো দেব আমার দেহমন, তুমি এলেই তো রংগ পূর্ণ হবে আর দেরি কোনো না। 'কাজল-তিল-তমোলা' সব রঙ ত্যাগ করেছি তোমার জন্যে তোমারই রঙে রঙিন হব বলে। তোমার জন্যে বুকের আঁচল আজ খুলে দিয়েছি, তুমি এস।

হে প্রভু মীরাকে তোমার 'সাঁচী দাসী' করে নাও। মিথ্যা সংসারমায়ার ফাঁদ ছাড়িয়ে দাও। আমার বিবেকের ঘর এরা লুঠ করে নিল, শত বল-বুদ্ধি-খাটিয়েও এঁটে উঠতে পারছি না। হে রাম, কিছুই যে আমার বশে নেই, মৃত্যুর পথে চলেছি বিফল হয়ে। তুমি এস, আমাকে বাঁচাও। প্রত্যহ ধর্মের উপদেশ শুনেছি, মনকে ভয় পাইয়ে রেখেছি কুপথ থেকে সর্বদা সাধুসেবা করছি, স্মরণে-ধ্যানে চিত্তকে ধরে আছি দৃঢ় করে। তুমি এবার মুক্তির পথ দেখাও। মীরাকে 'সাঁচী দাসী' বনাও।

ননদ এসে বললে, 'ভাবি, সাধুসঙ্গ ছাড়, তোমার কলঙ্কে যে কান আর পাতা যায় না, তোমার নিন্দায় শহর-গাঁ তোলপাড়। তুমি যে রাজকুলের বধূ তা কি ভুলে থাকবে ?'

'আমি গিরিধারীর দাসী। গিরিধারীই আমার যশ, গিরিধারীই আমার নিন্দা।'

'তোমার এই শুষ্ক বেশ আর দেখতে পারি না। পর তোমার মুক্তাহার, তোমার কেয়ূর কঙ্কণ। রাজকুলশোভা হয়ে বিরাজ করো।'

মীরা বললে, 'অসার রত্নভূষণ ছেড়ে শীলসন্তোষকেই আমি বরণ করেছি।'

মা গো, আমি রামরতনধন পেয়েছি। আমি তো রামরতনধনই পেয়েছি। এ ধন খরচ হয় না, চুরি যায় না, দিন-দিনই বেড়ে চলে। এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, এত প্রকাণ্ড যে ধরণীও ধরে উঠতে পারে না। নামের তরীতে ভজনের প্রদীপ জেবলে বসেছি। হে কাণ্ডারী, হে নাগর গিরিধর, আমাকে ভবসাগর পার করে দাও।

রানা হরিচরণামৃত বলে বিষ পাঠাল মীরাকে। মীরা সে বিষ খেয়ে ফেলল।

মীরার স্পর্শে সে বিষ অমৃত হয়ে গেছে।

হে প্রিয়, তুমি এ বন্ধন ছিঁড়তে পারো, আমি ছিঁড়ব না। তোমার প্রীতির ডোর ছেড়ে আর কার সঙ্গে বাঁধব? আমার আর কে আছে? তুমি তরু আমি বিহঙ্গ। তুমি সরোবর আমি মীন। আমি চকোর তুমি সুধাংশু। তুমি মুক্তো আমি সুতো। তুমি আমার সোনা আমি সোহাগ হে ব্রজবাসী, মীরার প্রভু, তুমি ঠাকুর আমি তোমার দাসী।

বিয়ের দশবছরের মধ্যেই বিধবা হল মীরা। সবাই বললে কুলবধূর মতো অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাক। লজ্জাহীনার মতো পথে-বিপথে সাধুসঙ্গ করে বেড়িও না।

কে কার উপদেশ শোনে! সংসারবিষ পান করে হরিপ্রেমস্পর্শে অমৃতত্ব আস্বাদ করেছি, বল, কোথায় গেলে সে হরির দর্শন পাব? সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী সেজে মীরা চলল বৃন্দাবনে।

'তুমি বিন সব জগ খারা।' তোমাকে ছাড়া সমস্ত জগৎ বিস্বাদ। আমার দুঃখ কে বোঝে বল? তোমার বিরহে শূলশয্যায় শুয়ে আছি, কি করে ঘুম আসে? তোমার শয্যা গগনমণ্ডলে, সেখানে তোমার সঙ্গে কি করে মিলব? ব্যথিত যে সেই ব্যথা বোঝে আর বোঝে সে, যার জন্যে ব্যথা। রত্নের মূল্য বোঝে জহুরি আর বোঝে যে কেনে সেই রত্ন। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় সেই জ্বরহর? আমার শ্যামলসুন্দর যখন বৈদ্য হয়ে দেখা দেবে তখনই আমি শীতল হব।

ফাগুন যে শেষ হতে চলল, দিন চারেক আর বাকি। ওরে মন, হোলি খেলে নে। করতাল নেই পাখোয়াজ নেই, শুধু অনাহতের ঝঙ্কার উঠেছে, রোমে-রোমে অনুভব করছি সেই পুলকপ্রবেশ। প্রেমগীতির পিচকিরি করেছি, শীলসন্তোষের কেশর গুলেছি, গুলালের বাদলে অপার আনন্দ ঝরে পড়ছে। 'ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈ, লোকলাজ সব ডার রে।' সমস্ত আবরণ খুলে দিয়েছি, জলাঞ্জলি দিয়েছি সব লোকলজ্জা। ওরে মন, হোলি খেল, ঐ দেখ মনোহরের চরণকমল, প্রিয়তম ঘরে এসেছেন।

সখি, আমি তো প্রিয়তমের রঙে রঙিন। পাঁচ রঙে আমার চোলি রাঙিয়ে দে, এবার আমি ঝুরমুট খেলতে যাই। ঝুরমুট খেলায় পাব আমার প্রিয়তমকে, দেহের আবরণ ফেলে আমি মিলব তাঁর সঙ্গে। তখন আর কিছুই থাকবে না, চাঁদ যাবে সূর্য যাবে পৃথিবী আকাশ সব যাবে, থাকবে শুধু সেই অটল অবিনাশী। মনের প্রদীপে নিত্যস্মরণে শিখা জ্বালাও, প্রেমের হাট থেকে তেল আনো তাঁর জন্যে, সে দীপের নির্বাণ নেই। আমার বাস বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতেও না, সদগুরুর উপদেশই আমার আশ্রয়। অন্তরসখি, আমারও ঘর নেই তোরও ঘর নেই। শুধু হরির রঙেই রঙে আছি আমরা। হরিই আমাদের ঘরদোর।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শন যাচঞা করল। গোস্বামী বলে

পাঠালেন, 'আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করি না।'

মীরা বলে পাঠাল, 'আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা আমার জানা নেই।'

লজ্জা পেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর এসে পৌঁচেছে। দর্শন দিলেন মীরাকে।

নিন্দা কুৎসা নির্যাতন অত্যাচার কিছুই গ্রাহ্য করেনি মীরা। তোমার জন্যে সব ছাড়লাম তুমি আমাকে কি করে ছেড়ে থাকবে? দিনরাত্রি এই কান্নাই শুধু তার সম্বল। মেবার ছেড়ে বৃন্দাবনের দিকে যেদিন যাত্রা করে মীরা, সেইদিন থেকেই মেবারের দুর্দিনের সূচনা। মেবারবাসীরা বুঝল মীরাই মেবারের রাজলক্ষ্মী. যে করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মীরা তখন দ্বারকায়। সেখানে মেবারদূত এসে তাকে মিনতি-বিনতি করতে লাগল। তুমি ফিরে চল। মেবারের দুরবস্থা দেখবে একবার স্বচক্ষে। তার রাজলক্ষ্মী আজ ধুলোয় নির্বাসিত।

রণছোড়জীর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল মীরা। গান ধরল। 'সাজন, সুধ জ্যোঁ জাতে ত্যো লীজে হো।' হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ বলে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। অন্নে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই, দিন নেই, রাত নেই, পলে-পলে দেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে আর বিচ্ছেদ ঘটিও না।

গাইতে গাইতে ঢলে পড়ল মীরা। রণছোড়জীর বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেল।

ঠাকুর বললেন, 'সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক, তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে। একটা ফুল দেখে হয়তো বললে, আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি। ব্যস, হয়ে গেল।'

এতটুকুতে হবার নয়। দুর্দম ব্যাকুল হও। বন্যার উলঙ্গ উন্মাদনা, আগুনের লেলিহান আনন্দ।

'ব্যাকুলতা চাই।' বললেন আবার ঠাকুর, 'ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাবা, আপনার মা, তাঁর উপর জোর খাটে। দাও পরিচয়। নয় গলায় এই ছুরি দিলাম।'

সারদামণির দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমিও যা আমিও তা। আমরা অভেদ। আমি যাব তুমি থাকবে।'

দুধে যেমন ধাবল্য অগ্নিতে যেমন দাহিকা পৃথিবীতে যেমন গন্ধ তেমনি আমিই তোমাতে ওতপ্রোত আছি। আমি অচ্যুতবীজরূপ আর তুমি সৃষ্টির আধারভূতা। সমতুল্য প্রকৃতি-পুরুষ। আমাদের অনশ্বর ঐক্য, শাশ্বত সাযুজ্য।

দুই শালতরুর মাঝখানে অমিতাভ বুদ্ধ শুয়েছেন বিশ্রামের জন্যে। আশ্চর্য অকালবসন্তের উদয় হল বৃক্ষশাখে। অমিত পুষ্পভারে বৃক্ষশাখা নুয়ে পড়ল। নুয়ে পড়ল অমিতাভের শয়নমঞ্চের উপর। আকাশ হতেই ফুল ঝড়ে পড়তে লাগল। আকাশ থেকে গীতিধ্বনি নেমে এল মাটিতে।

আনন্দকে উদ্দেশ করে বললেন তথাগত : 'আনন্দ দেখ, দেখ এখন ফুল ফোটবার সময় নয়, তবু গাছ ভরে অজস্র ফুল ফুটেছে। শুধু তাই নয় সে ফুল ঝরে পড়ছে আমার উপর। আকাশে সুর বাজছে মধুক্ষরা। দেবতারা বুদ্ধপূজা করছেন। তাই না ?'

'তাই।' আনন্দ চোখ নত করল।

'কিন্তু আনন্দ, এই ভাবে বুদ্ধের সম্যক পূজো হয় না।' বললেন বুদ্ধদেব। 'সত্যে শ্রদ্ধাবান সকল নরনারী নিজের জীবনের ধর্মের যথাযথ শীলন ও পালন করলেই বুদ্ধের যথার্থ পূজা হয়। তাই তোমাকে বলি ধর্মানুসারে জীবন যাপন করবে। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারেও ধর্মের পবিত্র বিধি পালন করতে কুণ্ঠিত হবে না।'

আনন্দ কাঁদছে। পাছে তার কান্না দেখে ফেলেন, আনন্দ সরে পড়ল।

আমি এখনো লক্ষ্যে উপনীত হইনি। এর জন্যে আনন্দের কান্না। আমার কাম্যবস্তু পাইয়ে দেবার আগেই চলে যাচ্ছে কাম্যতম। জগজ্জ্যোতি যাত্রা করেছে নির্বাণে। আনন্দকে ডেকে পাঠালেন বুদ্ধদেব। বললেন, 'আনন্দ, শোক কোরো না, হতাশ হয়ো না। ভেবে দেখ, শোকের বা নৈরাশ্যের কিই বা আছে। যা আমাদের প্রীতিকর যা আমাদের ভালোবাসার বস্তু তার থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হবই। যা অচিরস্থায়ী তাকে হারিয়ে শোক কি ? যা জাত, গঠিত, তা কি করে অবিনাশী হবে ? তা ধ্বংসান্ত হতে বাধ্য।'

আনন্দ চোখ ফিরিয়ে নিল।

'আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত থেকেছ আমার পাশে-পাশে, চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে তোমার আদর্শ থেকে এক তন্তু ভ্রষ্ট হওনি। এই তো যথার্থ পথ। এই পথ ধরে চলে যাওয়াতেই তো সিদ্ধি।'

যুগ্ম শালতরুর নিচে ভগবান বিশ্রাম করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দলে-দলে বুদ্ধকে পূজা করবার জন্যে আসতে লাগল নরনারী।

নিশীথ রাত্রি। বুদ্ধদেবের কাছে এসে বসল আনন্দ। বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমার হয়তো মনে হবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আর কেহ রইলেন না। কিন্তু তা মোটেই নয়। ধর্ম রইল, যে ধর্ম আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, এই ধর্মই তোমাকে পথ দেখাবে। এই ধর্মই তোমার একমাত্র শাস্তা।'

আবার বললেন, 'যা নির্মিত হয়েছে তা বিনষ্ট হবেই। তার জন্যে শোক করা বৃথা। আনন্দ, তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হও, নিজেতেই আশ্রয় গ্রহণ

কর। অবিশ্রান্ত যত্ন করে নিজের মুক্তির পথ নিজে পরিষ্কৃত কর।'

নিজের খোঁজ নাও। চলো কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে সহজের মধ্যে। যারা বলে তিনি দূরে আছেন তারাই দূরে আছে। অনুভবের রসে মাতাল হও। অনুভবই অগম্যের বাণী।

আমি নিজেই নৌকা নিজেই মাঝি নিজেই নদী নিজেই কূল।

আত্মপূজো করছেন ঠাকুর।

ঠাকুরের সামনে পুষ্পপাত্রে ফুলচন্দন এনে রেখেছে। ঠাকুর উঠে বসেছেন শয্যায়। ফুলচন্দন দিয়ে নিজেকেই পুজো করছেন। সচন্দন ফুল কখনো রাখছেন মাথায় কখনো কণ্ঠে কখনো হৃদয়ে কখনো নাভিদেশে। ফুলের মালা নিজেই নিজের গলায় দোলালেন।

পুজো-অন্তে মনোমোহনকে নির্মাল্য দিলেন। মাস্টারমশাইকে একটি চাঁপা ফুল। আর সুরেন মিত্তির এলে তার গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

আমি কাকে পুজো করি? আমার মাঝে মা আছেন, সেই শুদ্ধাবোধানন্দময়ী মাকে পুজো করি। সর্বকেন্দ্রস্বরূপিণী সুধাসিন্ধুনিবাসিনী মাকে।

তুলসী দত্ত, নির্মলানন্দ স্বামী, যখন প্রথম আসে দক্ষিণেশ্বরে, দেখল ঠাকুর নিজ সাধনস্থানে পঞ্চবটীতে প্রণাম করে বসলেন নিচের সিঁড়িতে আর ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কি যে কথা বোঝবার সাধ্য নেই তুলসীর, শুধু মাঝে-মাঝে কানে আসতে লাগল হৃদয়পরিপূর্ণ ধ্বনি, মা, মা!

বাগবাজারে তুলসীর বাড়ি। সে বাড়িরই এক অংশে গঙ্গাধর, অখণ্ডানন্দ স্বামী থাকে, সামনেই হরিনাথ বা তুরীয়ানন্দের বাসা। তিনজনের গলায়-গলায় ভাব।

হরিনাথ আর গঙ্গাধর ঠাকুরকে প্রথম দেখে দীননাথ বসুর বাড়িতে, তুলসী দেখে বলরাম বসুর বাড়িতে। হরিনাথরা শোনে কে একটা পাগল গান গাইছে, যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, আর তুলসী দেখল কে একটা মাতাল টলতে-টলতে বৈঠকখানায় এসে ঢুকছে। চোখে চোখ পড়ল তুলসীর আর মুহূর্তে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎকম্পন উঠে গেল। যেন বার্তা পাঠালেন। যাস দক্ষিণেশ্বর। যাস একা-একা। যখন শুধু তোতে-আমাতে।

কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ঠাকুরের ভাষার, জীবন্ত শিব। তুলসী যখন নিতান্ত বালক মা-বাবার সঙ্গে কাশী এসেছে। খেলার জায়গা করেছে যেখানটায় মৌনী হয়ে অবস্থান করছেন ত্রৈলঙ্গ। এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে তুলসীও ত্রৈলঙ্গর শান্তিভঙ্গ করছে। একদিন খাপ্পা হয়ে সব শিশুগুলোকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু কি মনে করে তারই মধ্যে থেকে তুলসীকে ডাকল ইশারায়। কি জানি কেন তাকে একটু প্রসাদ খেতে দিল।

তুলসী বলে, দীক্ষা নানারকমের হয়, কখনো বা উদরের মাধ্যমে। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছ থেকে আমি উদর-মাধ্যমে প্রথম দীক্ষা পেলুম।

কিন্তু এই দীক্ষা দৃষ্টির মাধ্যমে। যে হয় আপনজনা, সহজেই যায় যে চেনা।

একদিন দুপুরবেলা একা-একা গিয়েছে তুলসী। বলা-কওয়া নেই সটান ঢুকে পড়েছে ঠাকুরের ঘরের মধ্যে। কোনটা যে ঠাকুরের ঘর এও তার জানার কথা নয়। গিয়ে দেখল ঠাকুর খাচ্ছেন। বলা-কওয়া নেই, মেঝের উপর নিচু হয়ে ঢিপ করে প্রণাম করল। এই কি প্রণাম করবার ছিরি? খাবার সময় কেউ প্রণাম করে? কে জানে! নিয়মকানুন শিখলুম কোথায়!

খাওয়াশেষে ঠাকুর ঘাটে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে ঘাটে বসেই পান-তামাক খেতে লাগলেন। বললেন, 'জানিস, তোর মতন একটা ছেলে সেদিন এসেছিল আমার কাছে—'

'আমার মতন?'

'অবিকল তোর মতন। এমনি মুখ-চোখ, এমনি ছিরি-ছাঁদ। ধর্ না, তুইই এসেছিলি।'

'বা, আমি আসলুম কখন?'

'তা তুই কি করে জানবি। ধর্ ঘুমের মধ্যে চলে এসেছিলি।'

'এসে কি বললাম?'

'বললি, আমার মধ্যস্থ হতে পারবেন?'

'বা, আমি কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম যে আপনাকে মধ্যস্থ হতে বলব!'

'ওরে ঝগড়ার মধ্যস্থ নয়, মিলনের মধ্যস্থ। বুঝতে পারছিস না?'

'না।'

'তুই এসে আমাকে বললি, আপনি আমাকে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারবেন? তুই যদি ভাগ্যক্রমে এসে না মিলিস তবে তোকে মেলাব কি করে?'

ঠাকুর তাঁর বাঁ হাতখানা রাখলেন তুলসীর কাঁধের উপর।

তুলসী চকিতে বুঝল ইনিই হচ্ছেন গুরু, মধ্যস্থ। পরে বুঝল,অনাদিমধ্যান্ত। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপং।

বরানগরে নারায়ণ শিরোমণি প্রকাণ্ড কথক। ঠাকুরকে দেখতে একবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। বলছে, 'আমি দেশবিদেশ ঘুরে কত হরিনাম করে বেড়াই, কত গীতা-ভাগবতের কথা শোনাই, কত লোককে মাতিয়ে দি। শুনতে পাই আপনিও নাকি অনেক উপদেশ দেন, হরিগুণগান করে লোক মাতান। আমাতে-আপনাতে তফাত কতটুকু? শুনতে পাই আপনার নাকি খুব উচ্চ অবস্থা। বলতে পারেন সে অবস্থায় পেঁছুতে আমার কত দেরি?'

ঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন, 'ওগো, বেশি দেরি নেই, বেশি তফাতও নেই—এই একটুকুন বাকি।' বলে আঙুলের একটি কড় দেখালেন। 'তুমি কি কম লোক গা? তোমার গুণের অবধি নেই। তুমি হরিকথা শুনিয়ে কত প্যালা পাও, আর আমার এখানে কারু প্যালা লাগে না। তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে কি আমার তুলনা হতে পারে। আমি মুখখু-সুখখু মানুষ, লেখাপড়ার ধার ধারি না, মা যা বলান তাই বলি। আর তোমার কত বিদ্যা, কত মুখস্থ, কত জ্ঞানগরিমা—' আবার বললেন, 'মাকে বলি, মা, মুখখুর মত গাল নেই। তুই

আমার এই গালটা ঘ্ুচিয়ে দে। কিন্তু মা আমার কথায় কানও দেয় না।'

যোগীনকে ডাকলেন ঠাকুর। 'যোগীন, পাঁজিখানা নিয়ে আয় তো।'

যোগীন পাঁজি নিয়ে এল।

'পঁচিশে শ্রাবণ থেকে প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্র সব পড়ে শোনা তো।'

যোগীন পড়তে লাগল। পঁচিশে, ছাব্বিশে, পড়তে লাগল পর-পর। পড়তে-পড়তে এল শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে। একত্রিশে শ্রাবণ।

'রাখ্, আর পড়তে হবে না।' ইঙ্গিতে পঞ্জিকা রেখে দিতে বললেন।

'কেন?' যোগীনের কণ্ঠ উদ্বেগভারাতুর।

'বেশ রাত্রি, বেশ তিথি। ঝুলনপূর্ণিমা।'

নরেনকে ডাকলেন। শশী ছিল দাঁড়িয়ে, তাকে বললেন, 'নিচে যা। কেউ যেন না থাকে ধারে-কাছে। শুধু আমি আর নরেন।'

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। নরেনকে বললেন, 'চারদিকে ভালো করে দেখে আয় উঁকি দিয়ে, কেউ যেন না উপরে আসে।'

নরেন দেখে এল। বললে, কেউ নেই।

'বোস আমার কাছটিতে।'

শান্ত হয়ে তন্ময় হয়ে পিপাসু হয়ে বসল নরেন।

আরেকদিনের কথা মনে পড়ল নরেনের। বলছে মাস্টারমশাইকে, 'আমাকে একদিন একলা একটি কথা বললেন। কাউকে বলবেন না যেন সে কথা।'

'না। কি বললেন?'

'বললেন আমার তো সিদ্ধাই করবার জো নেই। তোর ভিতর দিয়ে করব।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি তাঁকে এক-কথায় হটিয়ে দিলুম। বললুম, না, তা হবে না। তিনি চুপ করে গেলেন।' স্বগতোক্তির মত বলছে নরেন, ওঁকে মানতুম না, ধরতুম না, ওঁর সব কথা উড়িয়ে দিতুম। তিনি বলতেন, ওরে আমি কুটির উপর থেকে চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়, তোদের না দেখে যে আর থাকতে পারি না। মা বলে দিলেন ভক্তেরা সব আসবে। ঠিক-ঠিক মিলল। তোরা সব এলি একে-একে।'

কত আপনার জন, চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র প্রাণের প্রাণ, এমনি ঘনতম অন্তরঙ্গতায় বসেছে নরেন। দয়াঘন স্নেহপরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর।

করুণা। সেই মধুরভাবের পাগলিনী, যাকে দেখে ঠাকুরের ভয়, তারও প্রতি ঠাকুরের কি থেকে-থেকে চলে আসে ফটক খুলে। কারুর নিষেধ-বাধা মানে না একেবারে সোজা দোতলায় উঠে আসে। এসেই মায়ের গান ধরে। কি মিষ্টি গলা। গান শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায়।

আমার সন্তানভাব। মধুরভাবের পসারিনীকে আমার এখন বড় ভয়।

'ওরে পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে আসতে দিস না।'

নিরঞ্জন লাঠি নিয়ে তাড়া করে তবু সরে না পাগলী। কালীপ্রসাদ তো একদিন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে থানায়ই রেখে এল। আবার কখন থানা থেকে সরে পড়ে চলে এসেছে বাগানে। আবার গান ধরেছে। গান শুনে ঠাকুরের আবার ভাবাবেশ।

এবার আর তাড়া নয়, এবার রীতিমত প্রহার। তবুও নিবৃত্তি নেই। দিগম্বর বালক হয়ে ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ঠাকুর, পাগলীর সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। শশী বলল, 'উপরে উঠলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, আসবে আবার চলে যাবে।'

'না, আসবে না।' নিরঞ্জন হুমকে উঠল।

রাখাল দুঃখ করতে লাগল, পাগলের উপর আবার আস্ফালন!

'তোর মাগ আছে কিনা তাই তোর মন কেমন করে।' নিরঞ্জন গর্জে উঠল, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।'

'কি বাহাদুরি!' রাখালও পাল্টা বললে, 'কিন্তু জিগগেস করি ঠাকুর কি শুধু তোর-আমার? শুধু এই ঘরের লোকদের? বাইরের লোকদের নন? তিনি কি শুধু আমাদের এই কয়জনের জন্যেই এসেছেন? আপামর সকলের জন্যে আসেননি? উনি কি শুধু সদগুরু? উনি জগদগুরু, সদগুরুই জগদগুরু। উনি সকলের। পাগলেরও।'

'তাই বলে অসুখের সময় কেন?' শশী প্রতিবাদ করল: 'উপদ্রব করে কেন?'

'উপদ্রব সবাই করে। আমরা করিনি? গিরিশ ঘোষ করেনি? নরেন-টরেন আগে কি রকম ছিল, কত যন্ত্রণা দিত, কত তর্ক করত। কষ্ট কি আমরাই কিছু কম দিয়েছি? ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে। বলেনি? ধরতে গেলে কেউই নির্দোষ নয় নিরুপদ্রব নয়।'

ঠাকুর বললেন, 'রাখাল, কিছু খাবি?' রাখালের প্রতি তাঁর স্নেহ উচ্চারিত হয়ে উঠল।

রাখাল বললে, 'খাবোখন।'

পাগলী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আজ আর কোনো উপদ্রব করল না। শুধু প্রণাম করে চলে গেল। কিন্তু ঠাণ্ডা থাকবার পাত্র নয় পাগলী। আবার হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে। গান জুড়েছে। আবার ভাবাবেশে ঠাকুরকে ক্লিষ্ট করা। এখন শুধু মন নিচে নামিয়ে রাখবার প্রয়োজন।

নরেনকে একদিন বলেছিলেন, 'আচ্ছা, তোর কি মনে হয়? এখানে সব আছে না? নাগাদ মুশুরডাল, ছোলার ডাল তেঁতুল পর্যন্ত।'

নরেন বললে, 'সব আছে, আপনি সব অবস্থা ভোগ করে নিচে এসে রয়েছেন।' 'সব অবস্থা ভোগ করে ভক্তের অবস্থায়।' মাস্টারমশাই বললে।

'কে যেন নিচে টেনে রেখেছে।' বললেন ঠাকুর।

পাগলীকে নিরঞ্জন একদিন একটা খালি ঘরে বন্ধ করে রাখল। যদি এমনিতরো শাস্তিতে শিক্ষা হয়। কতক্ষণ পরে দরজা খুলে দিতেই আবার সিঁড়ি

বেয়ে উপরে। আবার সেই গান।

তখন নিরঞ্জন কাঁচি দিয়ে পাগলীর মাথার চুলগুলি কেটে দিল। তারপর পাগলী আর এল না।

নিরঞ্জনের যা কিছু করা তার মূলে গুরুসেবা।

'দেখ না নিরঞ্জনকে।' বলছেন ঠাকুর, 'কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিয়ের কথায় বলে, বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ। নিরঞ্জনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'

আহা এই তো চাই! কোনো লেনা-দেনা নেই। যখন ডাক পড়বে তখনই যেতে পারবে।

'লোক বাছা যা বলছ ত ঠিক।' মাস্টারকে বলছেন ঠাকুর, এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে কেমন আছেন মশাই জিগগেস করে তারা বহিরঙ্গ।'

নীলকণ্ঠের গানেই বা কত মধু কত ভক্তি। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনদূতী সেজে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় সকলকে। হাটখোলায় বারওয়ারিতলায় শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাগান করবে, ঠাকুর বালকের মত মেতে উঠলেন তিনি যাবেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আয়। লাটু আর কালী, চল আমার সঙ্গে।

লোকে লোকারণ্য ভিড়। ভিতরে ঢোকেন এমন সাধ্য নেই। সুতরাং স্বয়ং নীলকণ্ঠকে ধরো। খবর পৌঁছল তার কাছে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব এসেছেন। শোনামাত্র গান থামাল নীলকণ্ঠ। নিজে গিয়ে ভিড় সরিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে এল আসরে। শ্রীরাধার প্রেমে মত্ত হয়ে গান ধরল নীলকণ্ঠ: 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে।' ঠাকুর নিজের থেকে আখর দিতে শুরু করলেন। গান ভীষণ জমে উঠল। কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে সমাধিস্থ দেখে নীলকণ্ঠ বারে-বারে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগল। সমাধি ভাঙবার পর আবার চুপ করে বসে গান শুনতে লাগলেন। গানে আর শোভায় সারা বারওয়ারিতলা গমগম করতে লাগল।

সেই নীলকণ্ঠ আবার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরকে বলছে, 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।'

'ওগুলো কি বলছ? আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

'যাই আপনি বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

'বাপু হে, আমার আমিই তো খুঁজে ফিরছি, কিন্তু পাই কই?'

'আমরা কি অতশত বুঝি?' নীলকণ্ঠ হাত জোড় করল: 'আমাদের শুধু কৃপা করবেন।'

'কি বল! তুমি কত লোককে পার করছ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে!'

'পার করছি বলছেন ?' নীলকণ্ঠ হাসল। 'কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজে না ডুবি!'

'যদি ডোবো তো, ঐ সুধা-হ্রদে।' বললেন ঠাকুর। তোমার এখানে আসা, যাকে অনেক কিনা সাধ্যসাধনা করে তবে পাওয়া যায়। বেশ, তবে একটা তুমি গান শোনো।' বলে গান ধরলেন ঠাকুর। গান শেষ করে বললেন, 'আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। ভাবছি তোমাদের আবার গান শোনাচ্ছি।'

'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার আজ পুরস্কার হল।' ঠাকুরকে আবার প্রণাম করল নীলকণ্ঠ।

নরেন একবার বলেছিল ঠাকুরকে, 'আমি শান্তি চাই, ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।' আহা, ঈশ্বরই তো শান্তি।

ঠাকুরের পাশটিতে বসে সেই শান্তিই যেন আস্বাদ করছে নরেন।

নরেন তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের নিষ্পলক দৃষ্টি। সর্বসংশয়-চ্ছেদী অভয় আশ্বাসে পরিপূর্ণ। চেয়ে থাকতে-থাকতে নরেনের মনে হল কি একটা আশ্চর্য স্পন্দন তার সমস্ত দেহে আলোড়িত হচ্ছে। মনে হল ঐ দুটি পুণ্যচক্ষুর আভা ছাড়া সংসারে আর তার কোনো অনুভূতি নেই।

হঠাৎ চমক ভাঙল নরেনের। দেখল ঠাকুর কাঁদছেন।

'এ কি, কাঁদছেন কেন ?'

'নরেন, আমার যা কিছু ছিল, আমার যথাসর্বস্ব, তোকে আজ দিয়ে দিলুম।' নরেনের একটা হাত ঠাকুরের একখানি হাতের মধ্যে ধরা: 'দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলুম, ফতুর হয়ে গেলুম। তুই রাজরাজেশ্বর হয়ে গেলি!'

নরেন অনুভব করল এ কান্না আনন্দের নির্ঝর। এ কান্না তার রাজাভিষেকের পুণ্যবারি। নরেনও কাঁদতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'তুই সবাইকে আঁকড়ে থাকবি, সকলের আশ্রয় হবি। সকলের ভার তোর হাতে দিয়ে গেলুম। তারপর তোর যখন কাজ ফুরুবে, যখন একদিন বুঝতে পারবি তুই সত্যি কে, ফিরে যাবি স্বধামে।'

নরেন গুরুবলে বলীয়ান হয়ে উঠল। অয়মহং ভোঃ। ওঠো জাগো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈপ্সিততমকে অর্জন করতে পারছ ততক্ষণ নিবৃত্ত হয়ো না।

ঠাকুর বললেন, তিনিই সব হয়েছেন। কেন? সবই আবার তিনি হবেন বলে। তুই এই হওয়ার বার্তাটি পৌঁছে দে ঘরে-ঘরে। পৌঁছে দে জনে-জনে।

১৬৪

'আমরা গোরার সঙ্গে থেকেও তার ভাব বুঝতে নারলাম রে।' চৈতন্যলীলায়ও এ আক্ষেপ করেছিল পার্ষদরা, এবারও বুঝি সেই মনস্তাপ। ঠাকুর তাই ঠিক করলেন, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাবেন।

'এখানকার যা কিছু সব নজির স্বরূপ।' বললেন ঠাকুর।

কিসের নজির ?

জীবমাত্রেই ব্রহ্মের প্রতিভাস। তুমিও তাই 'তদগতান্তরাত্মা' হয়ে ওঠো। ঈশ্বরলাভের জন্যেই মানবজীবন। তাই এখানে দেখ সেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

'আমি ষোলো টাং করে গেলাম যদি তোরা এক টাং করিস।' যদি ষোলো দেখে অন্তত এক হতে চাস। যদি মহৎকে দেখে অণু হবারও প্রেরণা জাগে।'

'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নবরূপ তাহার স্বরূপ!' নরবপু যে তাঁর স্বরূপ এটুকু অন্তত বুঝে যাও। একটা অগ্নি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে-রূপে রূপায়িত প্রাণে-প্রাণে প্রতিয়মান হয়ে উঠেছে। ঠাকুর বললেন, 'নরলীলায় মন কুড়িয়ে আনলেই হয়ে গেল। আরশুলা কুমড়ো পোকা হয়ে গেলেই হয়ে গেল। সেই মহত্তম পরমতম হয়ে-ওঠাকে দেখ। 'নরলীলা কেমন জানো ?' আবার বললেন ঠাকুর : 'যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড়-হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ—তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে, নলের ভিতর দিয়ে আসছে।' তুমি আমি হয়ে ওঠ। অর্জুনকে তাই তো বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'মদভাবমাগত' হও। 'সকলের চেয়ে গুহ্যতম পরমকথা এবার শোনো।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, 'তুমি আমার প্রিয় হতে প্রিয়তর তাই তোমাকে বলছি এ গোপন কথা। সব ভুলে আমাকে ভাবো, আমার দিকে চোখ ফেরাও, আমাগতপ্রাণ হয়ে ওঠ। তুমি আমার প্রিয় তাই প্রতিজ্ঞা করে তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হয়ে উঠতেই হবে। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ। অনেকে শুধু আমার হাত ধরে আমা-সম হয়ে উঠেছে।'

অরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বললেন, এই সুবিশাল বটবৃক্ষ দেখছ, এর থেকে একটি ফল আহরণ কর।

বটফল আহরণ করল শ্বেতকেতু।

'ভাঙো।'

ভাঙল বটফল।

'কি দেখছ ?'

'ছোট-ছোট বীজকণা।'

'একটি কণাকে ভাঙো। আরো ভাঙো। কি দেখছ ?'

'এখন আর কিছুই দেখছি না।'

'যা এখন আর দেখছ না সেই সূক্ষ্মাংশ থেকেই উৎপন্ন হয়ে এই মহাবল বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে।' অরুণি বললেন, 'বৎস, শ্রদ্ধান্বিত হও। শ্রদ্ধা না থাকলে এই তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য।'

'কিন্তু সত্যই যদি জগতের মূলে হয় তবে তা প্রত্যক্ষ হয় না কেন ?' জিগগেস করলে শ্বেতকেতু।

অরুণি বললেন, 'এই নুন নাও, জলে ফেলে দিয়ে এস। কাল প্রাতঃকালে

দেখা কোরো।'

প্রভাতে দেখা করতে এল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'বৎস, রাত্রে যে নুন জলে ঢেলে দিয়েছিলে সেই নুন নিয়ে এস।'

অনেক অনুসন্ধান করেও সে নুন পাওয়া গেল না। যদিও সে নুন বিলীনরূপে বিদ্যমান। জলপাত্র নিয়ে উপস্থিত হল শ্বেতকেতু।

অরুণি বললেন, 'বৎস, এই জলের উপরি ভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'মধ্যভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'অধোভাগ থেকে আচমন করো। কেমন বোধ হচ্ছে?'

'লবণাক্ত।'

'এবার জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে বোস।'

বসল শ্বেতকেতু। অরুণি বললেন, 'শোনো, ঐ লবণ জলের মধ্যেই সর্বদা বিদ্যমান ছিল। এই জলের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও যেমন তুমি লবণকে দেখতে পাওনি তেমনি এই দেহমধ্যেই সেই সত্য সেই ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান আছেন।'

আগে নুন যখন হাতে করে নিয়ে এসেছিলে তখন তাকে স্পর্শ করে জেনেছিলে চোখ দিয়ে দেখেছিলে। কিন্তু যেই জলে মিশে গেল অমনি চক্ষু আর স্পর্শের বাইরে চলে গেল। তখন সেই নুনকে জানবে কি করে? সেই জানার উপায়ান্তর আছে। সেই উপায়ান্তর হচ্ছে জিহ্বা। তখন তুমি জিহ্বা দিয়ে জানবে এই সেই নুন। তেমনি জগতে মূল সৎব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য। কিন্তু তাকেও জানবার উপায়ান্তর আছে।

আছে? কি সেই উপায়ান্তর?

অরুণি বললেন, 'যদি কাউকে চোখ বেঁধে গান্ধারদেশ থেকে নিয়ে এসে তারও চেয়ে নির্জন জায়গায় এনে ছেড়ে দেয় তার কি দশা হয়? সে দিগভ্রান্ত হয়ে কখনো পূবে কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে কখনো বা পশ্চিমে ছুটোছুটি করতে থাকে। আর এই বলে আর্তনাদ করে, আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে আর, দেখ, বদ্ধ-চক্ষু অবস্থাতেই ফেলে গেছে এখানে। তখন কেউ যদি তার বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলে, এই দিকে গান্ধারদেশ এই দিকে যাও, তখন সেই আলোকপ্রাপ্ত উপদেশপ্রাপ্ত লোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কথা জিগগেস করতে-করতে সেই গান্ধারদেশে এসে উপস্থিত হয়। তেমনি সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি, আচার্যবান পুরুষ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।'

অবতারই সেই মানুষরতন। যিনি তরণ করে তারণ করেন।

'অবতারের ভিতরই ঈশ্বরের শক্তির বেশি প্রকাশ।' বললেন ঠাকুর, 'অবতারের আমির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।'

কে একজন ভক্ত বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা।'

'ও কথা আর বোলো না।' বলে উঠলেন ঠাকুর, 'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা নয়। আমি এত বড় লোক, আমি অমুক, আমি শম্ভু মল্লিক বা আমি মহিম চক্রবর্তী, আমি ধনী আমি বিদ্বান এই আমি ত্যাগ করতে হবে। আমি-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

সেইবার ঠাকুরের যখন হাত ভাঙা, হাতে বাড়-বাঁধা, উত্তরগীতা পড়ে শোনাচ্ছে মহিমাচরণ। 'ব্রাহ্মণদের দেবতা অগ্নি, মুনিদের দেবতা হৃৎস্থ, অর্থাৎ হৃদয়মধ্যে, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের দেবতা প্রতিমায় আর সমদর্শী মহাযোগীদের দেবতা সর্বত্র।'

'প্রতীমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনাম। সর্বত্র সমদর্শিনাং'—কথা কয়টি শোনামাত্র আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। হাতে সেই বাড় ও ব্যান্ডেজ বাঁধা। ভক্তেরা নির্নিমেষে দেখছে সমদর্শী মহাযোগীকে।

আকীটপতঙ্গপিপীলিক ব্রহ্ম। সকলেই তাঁর অবতার। 'তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।' পর ও অবর, উৎকৃষ্টে ও অপকৃষ্টে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করো। সেই দর্শনেই হৃদয়বন্ধন ভিন্ন, সংশয়জাল ছিন্ন ও কর্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত। 'মোমের বাগানে সবই মোম।'

চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছেন ঠাকুর। সিংহদর্শন করেই সমাধিস্থ।

'ঈশ্বরীর বাহনকে দেখেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হল।' বললেন ঠাকুর।

আবার বললেন, 'আমি একবার মিউজিয়মেও গিয়েছিলুম। দেখলুম ইট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখ, সঙ্গের গুণ কি। তাই সর্বদা যদি সাধুসঙ্গ কর সাধু হয়ে যাবে।'

উপনিষদের ভাষায় এটিই উপায়ান্তর।

'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে, ভবনদী পার হতে জানা দরকার।' বললেন ঠাকুর। নৌকো করে কজন গঙ্গা পার হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল পণ্ডিত, সর্বদা বিদ্যা জাহির করতে ব্যস্ত। পাশের লোককে জিগগেস করল, বেদান্ত জানো? সে বললে, আজ্ঞে না। সাংখ্য-পাতঞ্জল জানো? আজ্ঞে না। ষড়দর্শন? তাও না। এমন সময় ঝড় উঠল নদীতে। নৌকো প্রায় ডোবে। তখন পাশের লোকটি ভীতত্রস্ত পণ্ডিতকে জিগগেস করলে, পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন? পণ্ডিত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, না। পাশের লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আমি সাংখ্যপাতঞ্জল জানি না কিন্তু সাঁতার জানি।'

স্টার-থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখছেন ঠাকুর। গিরিশকে শুধোলেন, 'এ কার থিয়েটার? তোমার, না, তোমাদের?'

গিরিশ বললে, 'আজ্ঞে আমাদের।'

'আমাদের কথাটিই ভালো, আমার বলা ভালো নয়। কেউ-কেউ বলে আমি নিজেই এসেছি, নিজেই করেছি।' বলছেন ঠাকুর, 'এ সব হীনবুদ্ধি অহঙ্কেরে লোকের কথা।'

নরেন বললে, 'সবই থিয়েটার।'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক কথা।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কোথাও বিদ্যার খেলা কোথাও অবিদ্যার।'

নরেন জোর গলায় বললে, 'সবই বিদ্যার।'

'হ্যাঁ, তবে ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়। ভক্তের কাছে দুই আছে, বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া। খোসাটি আছে বলেই আমটি আছে। মায়া হচ্ছে খোসা, আম হচ্ছে ব্রহ্ম। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব।'

নরেনের হঠাৎ মনে হল, এখন যদি প্রকাশ করে বলেন, বলতে পারেন, তাহলে বুঝি। তবেই বিশ্বাস করি। কি বলবেন?

কি শুনতে চাস?

অনেক সময় বলেন তিনিই সেই, ছদ্মবেশে রাজ্যভ্রমণে এসেছেন। তিনিই ভগবানের অবতার, তিনি পুরুষোত্তম। এখন সে কথা কি তিনি ঘোষণা করতে পারেন? এই অসহন রোগক্লেশের মধ্যে, এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে? বলতে পারেন, তিনিই আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, সমস্ত বিশ্বের নিলয়-নিধান? বলতে পারেন তিনিই বেত্তা তিনিই বেদ্য তিনিই সেই অব্যয় অক্ষর? বলতে পারেন তিনিই ভগবান?

'এখনো তোর জ্ঞান হল না? নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে কমলবিশদ প্রসন্ন চোখ মেলে ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। বললেন: 'এখনো তোর সংশয়? সত্যি-সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।'

থমকে দাঁড়াল নরেন। অপরাধের গ্লানিতে দুই চোখ জলে ভরে উঠল। ভুবনমঙ্গল স্বরূপানন্দ ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলকে। তোমার চরণে শাশ্বতী স্থিতি দাও। বৈরাগ্যবলসম্পন্ন জ্ঞান দাও। ভবপ্রদা গৃহাসক্তি ছেদন কর।

এই অসুখ হবার প্রায় চার-পাঁচ বছর আগে শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'যখন দেখবে যার-তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাচ্ছি, তখনই বুঝবে দেহরক্ষার আর বাকি নেই।'

কত দিন থেকেই তো কলকাতায় নানা ভক্তের বাড়িতে অন্ন ছাড়া অন্য ভোজ্য খাচ্ছেন, বলরামের বাড়িতে তো অন্নই খেয়েছেন রীতিমতো, আর রাতও কাটিয়েছেন মাঝে-মাঝে। তবে দিন কি ঘনিয়ে এল? তবু খাবারের অগ্রভাগ তো এখনো কাউকে দেন নি। কিন্তু সেবার কি হল? নরেনের পেট খারাপ হয়েছে, কদিন আসছে না দক্ষিণেশ্বর। কেন আসছে না রে? দক্ষিণেশ্বরে তার উপযুক্ত পথ্য হবে না। কিন্তু বলগে, আমি তাকে ডেকেছি। সকালবেলা তার কাছে লোক পাঠালেন ঠাকুর। নরেনকে আসতে হল। ঠাকুরের নিজের জন্য ঝোলভাত তৈরি হয়েছে, তারই অগ্রভাগ নরেনকে খেতে দিলেন। বললেন, 'যা বাকি আছে তাই আমার জন্যে নিয়ে এস।'

সারদামণি বুকের মধ্যে ধাক্কা খেলেন। বললেন, 'না, না, আমি তোমাকে ফের নতুন করে রেঁধে দিচ্ছি।'

কিন্তু ঠাকুর শোনবার পাত্র নন। বললেন, 'নরেনকে দিয়ে খাব তাতে দোষ কি! নিয়ে এস যা আছে।'

ঠাকুর কি বলেছিলেন তা যেন মন থেকে মুছে দিতে চাইলেন শ্রীমা। ভাবলেন নরেনের সঙ্গে কার কথা! নরেন যেন সব কিছুর ব্যতিক্রম।

কিন্তু আজ, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন মা এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন? ঠাকুরের মহা-সমাধির দিন কি তবে সমুপস্থিত?

একখানি দিশি শাড়ি শুকোতে দিয়েছিল ছাদে, খুঁজে পেলেন না। জলের কুঁজোটা তোলবার সময় হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সেবক-সন্তানদের জন্যে খিচুড়ি রাঁধছেন, তলাটা ধরে গেল। সারাদিনই ভাববিভোর হয়ে আছেন। ঘন-ঘন সমাধি হচ্ছে। কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না।

অতুলের নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। সে এসে নাড়ী দেখল। মুখ অন্ধকার করে বললে, 'আলো নিভতে আর দেরি নেই।'

বিকেলের দিকে অবস্থা আরো খারাপ হল। শ্বাসক্লেশ দেখা দিল ডাক্তর আর কি করবে, তবু শশী ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। যে ডাক্তার দেখছিল শেষদিকে তার বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল। সাত মাইল পথ প্রায় এক নিশ্বাসে পার করে দিল শশী। ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, ডাক্তার বাড়ি নেই। কোথায়, কত দূর যেতে পারে? কি করে বলব, দেখুন এদিক-সেদিক। এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। আরো এক মাইল ছুটে ধরল ডাক্তারকে। চলুন শিগগির কাশীপুর। ডাক্তার বলে, জরুরি কল আছে অন্যত্র। এর চেয়েও জরুরি? ডাক্তারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

দেখে-শুনে ডাক্তার বললে, যেমন বলে, ভয় নেই।

সন্ধ্যের দিকে চোখ খুললেন ঠাকুর। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সারাদিন দেবতাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি। আমি এখন খাব। ভারি খিদে পেয়েছে।'

সারাদিন কিছু মুখে তোলেননি, সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু তরল পথ্য নিয়ে এল। কিন্তু গিলতে পারলেন না। অগত্যা জল দিয়ে মুখ মুছে দিল আস্তে-আস্তে, পায়ের নিচে দিল কটা বালিশ গুঁজে। হে আত্মারাম, কি আরাম তোমাকে আমরা দিতে পারি?

হরি ওঁ তৎসৎ—মুখে উচ্চারণ করে ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়লেন।

মধ্যরাত্রের দিকে আবার সমাধি হল ঠাকুরের। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। পাখা করছিল শশী, তার মনে হল এ সমাধি যেন অন্যরকম। শিশুর মত কাঁদতে লাগল ফুলে-ফুলে।

গিরিশ আর রামকে খবর পাঠাও।

কোনো ভয় নেই, এস, হরি ওঁ তৎসৎ কীর্তন করি। নরেন ডাকল সবাইকে। ঠাকুরকে ঘিরে বসল। শোকগদগদ কণ্ঠে কীর্তন শুরু হল, হরি ওঁ তৎসৎ। রাত প্রায় একটার সময় ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট, সুস্থস্বরে বললেন, 'আমি খাব। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে!'

সবাই আনন্দচকিত হয়ে উঠল। কি খাবেন?

'ভাতের পায়েস খাব।'

ভাতের পায়েস আনা হল। ঠাকুর বললেন, 'বসে খাব।'

যে শয্যাবিলীন দুর্বল সে কিনা উঠে বসতে চায়। ছেলেরা ধরাধরি করে সন্তর্পণে ঠাকুরকে বসিয়ে দিল বিছানায়। শশী খাওয়াতে লাগল ভাতের পায়েস। আশ্চর্য, স্বাভাবিক অনায়াসে খেতে লাগলেন। গলায় যেন ঘা নেই যন্ত্রণা নেই। বললেন, এত খিদে যে ইচ্ছে হচ্ছে হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খাই। সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন এই খিচুড়ি খাবার ইচ্ছে?

শ্রীমা সকালে যে খিচুড়ি রেঁধেছিলেন তিনি কি তার গন্ধ পেয়েছেন? আরো কি টের পেয়েছেন তলাটা ধরে গিয়েছিল তার? উপরের ভালো অংশ সন্তানদের দিয়ে নিচেকার সেই পোড়াঝোরা নিজে খেয়েছেন শ্রীমা?

নাকি আর সব অবতারের যেমন বিশেষ প্রিয় ভোজ্য থাকে, ঠাকুরের তেমনি খিচুড়ি! রঘুনাথের প্রিয় ভোজ্য রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয় ভোজ্য ক্ষীর-সর, বুদ্ধদেবের প্রিয় ভোজ্য ফাণিত বা ফেণী বাতাসা। তেমনি নবদ্বীপচন্দ্রের মালসাভোগ, শঙ্করপন্থীদের পুরি-নাড়ু আর রামকৃষ্ণের খেচরান্ন।

খেয়ে খানিক সুস্থ বোধ করলেন। নরেন বললে, এবার তবে একটু ঘুমুন। কালী, কালী, কালী—স্বচ্ছ স্পষ্টকণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করলেন ঠাকুর। জগজ্জনকে বরাভয় দেবার ইচ্ছায় দু-হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

রাত তখন একটা বেজে গেছে, ঠাকুরের সর্বদেহ কাঁপল দু-একবার, গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি নাসাগ্রভাগে এসে স্থির হল। মুখের উপর ভেসে উঠল অম্লান আনন্দজ্যোতি।

এই সমাধি বুঝি আর ভাঙে না।

হরি ওঁ, হরি ওঁ, আবার সবাই কীর্তন শুরু করল। বিগতমেঘ আকাশের মত এই বুঝি আবার চক্ষু উন্মীলন করবেন। কতবার গভীর সমাধি থেকে উঠে এসেছেন, এবারেও উঠবেন বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরে রকে বসিয়ে ঠাকুরের একবার ফোটো তোলা হয়েছিল। তাঁর যে পদ্মাসনস্থ ধ্যানমূর্তি, যে মূর্তি ঘরে-ঘরে পটে-পটে বিরাজমান সেই ফোটো। ফোটো তোলাতে বসে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যান। ফোটো তোলা শেষ হয়ে যাবার পরেও সমাধি ভাঙে না। ফোটোওয়ালা ভয় পেয়ে যন্ত্রপাতি ফেলে চম্পট দেয়। তারপর সমাধি ভাঙলে পরে ঠাকুর বললেন, 'দেখবি কালে ঘরে-ঘরে এই ছবিরই পুজা হবে।' সে ছবি তাঁকে দেখানো হলে তিনি তাকে প্রণাম

করলেন, পুজো করলেন।

এই বুঝি জাগেন, এই বঝি ওঠেন, সর্বক্ষণ সকলের মনে এই ঔৎসুক্য।

বুড়ো গোপালকে ডাকল নরেন, 'একবার রামলালকে ডেকে আনতে পারো?'

লাটুকে নিয়ে বুড়ো গোপাল চলল দক্ষিণেশ্বর।

আকাশের পূর্ণ চাঁদ লাল হয়ে উঠল। ক্রমে হলদে হল। শেষে নীল হয়ে অস্ত গেল।

রাতেই চলে এসেছে রামলাল। বললে, 'ব্রহ্মতালু এখনো গরম আছে। তোমরা একবার কাপ্তেনকে খবর দাও।'

ভোর হয়ে গেল তবু ঠাকুর তখনো ঘুমে। বাগান থেকে ফুল তুলল ছেলেরা। দিব্যতনুর শেষ পুজোর আয়োজন করল। শ্রীপদে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিল। গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা। এ কি, শ্রীঅঙ্গে যে এখনো তাপ। এখনো দিব্যদ্যুতি। কে খবর দিয়েছে কে জানে, ভোর হতে না হতেই ডাক্তার সরকার এসে হাজির। তিনি দেখে-শুনে বললেন, এ মহাসমাধি ভাঙবার নয়। লীলা সম্বরণ করেছেন ঠাকুর।

কাপ্তেন, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসে ঘি মালিশ করতে বললে। বললে, দেহে যখন এখনো তাপ আছে, বলা যায় না, এ মহাসমাধি ভাঙতেও পারে। যোগশাস্ত্রে বিধি আছে সমাধিস্থ রোগীর গ্রীবা বক্ষ ও গুলফে যদি কোনো ব্রাহ্মণ গব্যঘৃত মালিশ করে তাহলে সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা। ঘি আনা হল। শশী গ্রীবায় শরৎ বক্ষে ও বৈকুণ্ঠ সান্যাল পায়ে মালিশ করতে লাগল। তিন ঘণ্টারও উপর মালিশ করা হল একনাগাড়ে। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হল না।

সমস্ত অবরোধ ভেঙে নদীর উচ্ছ্বাসের মত শ্রীমা ছুটে এলেন। পড়লেন মাটিতে লুটিয়ে। কণ্ঠে শুধু এক বুকভাঙা আর্তনাদ: আমার কালী মা কোথায় গেলে গো?

যোগীন আর বাবুরাম ছুটে গেল মা'র কাছে। গোলাপ-মা এসে মাকে তুলে নিল। মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন তাঁর গলার আওয়াজ আর শোনা গেল না।

বাতাসের মুখে খবর ছুটল। নানা ধারায় আসতে লাগল জনস্রোত। ডাক্তার সরকার বললেন, 'এই দিব্যাবস্থার ছবি নেওয়া দরকার। আমি যাই, কলকাতায় গিয়ে এর একটা ব্যবস্থা করি।'

উদ্ধব বললে, হে অচ্যুত, যোগচর্চা অতি দুশ্চর। মানুষ যাতে সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে তাই বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'আর কিছু নয়, আমাকে এবং আমার জন্যই তোমার কর্ম এ ভাবটিকে সর্বদা মনে রেখে কর্ম করা অভ্যাস করবে। সকল ভূতের অন্তরে ও বাইরে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখবে না। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সাধু-তস্কর সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ক্রূর-অক্রূর সকলকে যে সমান দেখে সেই পণ্ডিত। মন বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ববস্তুতে মদ্‌ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়।'

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মাথায় নিল উদ্ধব। বললে, হে অজ, হে আদ্য, আপনার সান্নিধ্যগুণেই আমার মোহজাল ছিন্ন হয়েছে। আর কিছু চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার অনপায়িনী রতি হোক।

'উদ্ধব, তুমি আমার প্রিয়ধাম বদরিকায় চলে যাও। সেখানে আমার পাদতীর্থোদকে স্নান ও আচমন করে শুচি হও। বল্কল পরিধান করে বন্য ফল ভোজন করে অলকানন্দা দর্শন করে বিধৌতকলুষ হয়ে বিরাজ করো। সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব ত্যাগ করে মন আমাকে সমর্পণ করে আমারই প্রদত্তজ্ঞান স্মরণ করো।'

বদরিকায় চলে গেল উদ্ধব।

বাসুদেব চলে এলেন প্রভাসে। সেখানে যদুকুল একে-অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতে লাগল। কৃষ্ণ ও বলরামকেও আক্রমণ করলে। বলরাম আর কৃষ্ণের হাতে কেউ আর অবশিষ্ট রইল না।

তখন সমুদ্রবেলাতে বসলেন বলরাম। যোগ অবলম্বন করে পরমাত্মাতে আত্মা সংযুক্ত করে মনুষ্যলোক ত্যাগ করলেন। বলরামের নির্বাণ দেখে বাসুদেব একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে এসে বসলেন। চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে দিঙমণ্ডল আলোকিত করে বিধূম পাবকের মত বিরাজ করতে লাগলেন। দক্ষিণ উরুর উপর কমলকোরকসন্নিভ বাম পদতল স্থাপিত তুষ্ণীম্ভূত সমাহিত মূর্তি।

সেই পদতলকে মৃগ মনে করে জরা-ব্যাধ শর ছুঁড়ল। শর বিদ্ধ করল পদতল। ব্যাধ এগিয়ে গিয়ে দেখল চতুর্ভুজ বিভ্রাজ-মূর্তি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হে অনঘ উত্তমশ্লোক, বুঝতে পারিনি, আমার এই অনপনেয় পাপ ক্ষমা করুন।

'তুমি আমার অভিলষিত কাজই করেছ।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'সুকৃতীদের পদ স্বর্গলোক লাভ করো।'

কৃষ্ণসারথি দারুক এল রথ নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'রথে চড়ে নয়, আমি লোকাভিরাম ধ্যানমঙ্গল নিজ দেহ নিয়েই স্বধামে প্রবেশ করব। ভুবনে এই প্রতিষ্ঠিত করে যাব যে মর্ত তনু দ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়। আমি কি ব্যাধের খরশর থেকে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিলাম? না, দারুক, এইটুকু শুধু জেনো যে আমিই সত্য আর সমস্তই আমার মায়ারচনা।'

১৬৫

আমাকে দেখ।

চিদমৃতসুখরাশিতে চিত্তফেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিতরঙ্গ আর নেই। নিশ্চলসুখসমুদ্র নিশ্চেষ্ট ও সুপূর্ণ। আমি সর্বদা একাবস্থ। আমাতে দুঃখ কি করে সম্ভব? আমি আনন্দরূপ, আমি অখণ্ডবোধ। আমি পরাৎপর, ঘনচিৎপ্রকাশ। মেঘ যেমন আকাশকে ছোঁয় না, আমিও তেমনি সংসারদুঃখের বাইরে।

যে সূর্যলোকে অখিলজগৎ প্রতীত, তাকে কে সন্দেহ করে? তেমনি আমি যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপ্রকাশ কেবল-শিব তাতে কার সংশয়? দেখ আমাকে। আমি নিত্যস্ফূর্তি, নির্মলসদাকাশ, আমি নিত্যসুখশান্ত, আমার থেকেই সমস্ত মহামোহ দূরীকৃত, আমিই বেদ-প্রত্যয়-বিহীন অখিলতত্ত্ব।

চীনেবাজারের বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার কোম্পানির লোক এল ফোটো তুলতে। আসতে আসতে বিকেল করে ফেলল। সকালের দিকে ঠাকুরের দিব্যদেহে, হরিপাদপঙ্কজপরাগপবিত্র দেহে, যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি ছিল তা তখন ম্লান হয়ে গিয়েছে। পীতবস্ত্রে সাজানো হল সেই দেহ। নিচে নামানো হল খাটে করে। ভক্ত ও সন্তানেরা দাঁড়াল সন্নিহিত হয়ে, নরেনের কাঁধে হাত দিয়ে রাম দত্ত। ফোটো নেওয়া হল দুখানা।

সেদিনের কথা মনে পড়ছে ডাক্তার সরকারের, যেদিন প্রথম এসেছিল শ্যামপুকুরের বাড়িতে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে সেই ধন্য সেই বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু-মণ বোঝা আছে, আর এদিকে বর যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মাথায় বোঝা তবু বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে কি এ সম্ভব?

'দেখ আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে-পড়ে মাকে ডাকতুম, বলতুম, মা আমি কিছু শুনিনি। কিছু জানি না, তুই শুধু আমায় দেখিয়ে দে। কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে। আমার কিছু নেই, আমার আছে শুধু ভক্তি। তোকে ভালোবাসি এই অখণ্ড অধিকার। এই অধিকারেই নেব তোর অভয়পদ—আমার পরম পদ।'

ডাক্তার বলেছিল আর-আরদের, 'বই পড়লে এঁর এত জ্ঞান হত না।'

ঠাকুরেরও সেই কথা: 'অনেকে মনে করে বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী দেখা অনেক তফাত।' আবার বললেন, 'যারা নিজে দাবা খেলে তারা চাল তত বোঝে না, কিন্তু যারা না খেলে উপর-চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক-ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে আমরা বড় বুদ্ধিমান। তারা নিজে খেলছে তাই তারা নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধু নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে।'

চারদিকে শোকের পাথর দুলে উঠেছে। সব চেয়ে কাঁদছে বেশি শশী।

ডাক্তারের মনে পড়ল একবার ঠাকুর বলেছিলেন, শোকেরই মতই এই ঈশ্বর।

যদি কারু পুত্রশোক হয় সেদিন কি আর সে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না, নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? সে কি লোকের সামনে জাঁক করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ করতে পারে? তেমনি যদি ঈশ্বরে সত্যি ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণগান ভালো লাগে তাহলে কি আর ইন্দ্রিয়ভোগে মন যায়?

মহেন্দ্র মুখুজ্জে বললে, 'সংসারে কি শুধু দারিদ্র্যই দুঃখ ? এ দিকে ছয় রিপু, তারপরে রোগ-শোক।'

'আবার মানসম্ভ্রম।' বললেন ঠাকুর, 'টাকা থাকলেই বা কি হবে ! জয়গোপাল সেন কত টাকা করেছে, কিন্তু বিষম দুঃখ, ছেলেরা মানে না। যা হোক, তুমি তো একটা ধরেছ—নিরাকার। যা বিশ্বাস তাই রাখবে, কিন্তু এটা জানবে যে তাঁর সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই সম্ভব। সাকারও সম্ভব।'

'আর জেনো তিনি চৈতন্যরূপে বিশ্ব ব্যাপ্ত করে আছেন।'

'তিনি চেতনেরও চেতয়িতা।'

'এখন ঐ ভাবেই থাকো, টেনেটুনে ভাব বদলাবার দরকার নেই। ক্রমে জানতে পারবে ঐ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। যাকে জড় বলছ তাও চৈতন্যেরই আবরণ।'

তাই ঠাকুর যখন সায়েন্স-এ্যাসোসিয়েশান বা বিজ্ঞানসভায় যাবার জন্যে ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন তখন ডাক্তার বলেছিল, 'কি সর্বনাশ! তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'কেন, কেন ?'

'ঈশ্বরের নানা আশ্চর্য কাণ্ড দেখে।'

'তা বটে।' গম্ভীরমুখে বললেন ঠাকুর।

ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ডাক্তার। ভাবছে, আমার কি এখনো গ্রেপ্তার হবার সময় আসেনি ?

রবীন্দ্র নামে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে আসত ঠাকুরের কাছে। একবার একনাগাড়ে তিন রাত তাঁর কাছে বাসও করেছিল। তাকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর কিন্তু দেরি হবে, এখনো তোর একটু ভোগ আছে কপালে। এখন কিছু হবে না। যখন ডাকাত পড়ে তখন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ কিছু করতে পারে না। একটু থেমে গেলে তবে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে।'

ডাক্তার ভাবছে তার ডাকাতি কি শেষ হয়নি এখনো ? এখনো কি সই হয়নি পরোয়ানা ?

ঠাকুরের তিরোধানের ক-মাস পরে রবীন্দ্র একদিন পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে বরানগর মঠে এসে উপস্থিত। পরনে আধখানা মোটে কাপড়। আর আধখানা কোথায় গেল কে জানে ?

'তোমার আর আধখানা কাপড় কোথায় গেল ?

'আসবার সময় কাপড় ধরে টানাটানি করলে, তাই আধখানা ছিঁড়ে গেল। নাও আধখানা। তবু তোমার খপ্পর থেকে যে করে পারি আসব বেরিয়ে—'

'কে সে ?'

'আর কে ? মদ আর তার সঙ্গিনী অবিদ্যা।'

'কি করে এলে ?'

'স্রেফ পায়ে হেঁটে। ছুটতে-ছুটতে। যাই গঙ্গাস্নান করে আসি। আর সংসারে

ফিরব না।'

রামলালও কাঁদছে অঝোরে। কি কথা ভাবছে কে জানে।

ঠাকুর যখন চিকিৎসার জন্যে যান কলকাতা তখন রামলাল বলেছিল, আপনার জন্যে বড় মন কেমন করবে। ঠাকুর বললেন, মনে করবি যে ঝাউতলায় গেছি আবার আসব। যাব কোথায়? সর্বদাই আছি আমি দক্ষিণেশ্বরে।

মনে পড়ছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ বারান্দার দেয়ালে ঠাকুরের কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ছবিটি। একটি টবের উপর পদ্মফুলের গাছ, আর সেই ফুলের উপরে একটি পাখি। কাশীপুরের বাড়িতেও ছোট একটা কাঠির সাহায্যে দেয়ালে বালির উপর একটি গাছ এঁকেছেন আর গাছের ডালে বসা একটি পাখি। পাখিটা এমন জীবন্ত যেন এখনি উড়ে যাবে।

'ছেলেবেলায় কত ছবি আঁকতাম। বলতেন সবাইকে: 'পোটোদেরও তাক লেগে যেত।'

শম্ভু মল্লিকের বাগানে কে একজন এসেছে, হিপনটিজম জানে। ঠাকুর শুনে শুধোলেন সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে মন্ত্রের গুণে লোককে অজ্ঞান করে তাকে দিয়ে ইচ্ছা মত কাজ করানো। ঠাকুর তাকে বললেন, হ্যাঁ গা, তুমি তো অনেককে করো, কই আমায় একবার ঐ রকম করো না। পারলে না, লোকটা ঠাকুরকে পারলে না অজ্ঞান করতে। ঠাকুর বললেন, কে জানে বাপু, মা'র ইচ্ছে নয় যে আমি অজ্ঞান হই।

সেই সেবার আলমবাজারে শিবু আচার্যির পাঁচালি শুনতে গিয়েছিল রামলাল। আসরে ভারি মজার ব্যাপার, একতাড়া কলার ঝাড় ও পঞ্চাশ-টাকার নোট ঝোলানো। তার মানে যে ভালো করতে পারবে সে পঞ্চাশ-টাকা পাবে আর যারটা সবচেয়ে খারাপ হবে সে পাবে ঐ কলার ঝাড়। গান শুনে এসে ঠাকুরকে বললে রামলাল, কি সুন্দর গান! 'এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।' ঠাকুর দুঃখ করে বললেন, 'আহা, আমি শুনতে পেলুম না।'

কদিন পরেই শিবু আচার্য হাজির দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন, 'আহা, সেই গানটা গাও না।' রামলাল শুনে কত প্রশংসা করলে। শিবু গান ধরল। দু-চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ঠাকুর, রামলালকে বললেন, 'গানটা লিখে নে।' শিবুকে বললেন, 'আহা, কত লোককে গান শোনাচ্ছ, চার-পাঁচ ঘণ্টা গাইছ একভাবে, তোমার গলা খারাপ হয় না, এ কি কম কথা! যার দ্বারা দশজন আনন্দ পায় আর যার আকর্ষণশক্তি বেশি, তার হৃদয়ে যেন শক্তি বিরাজ করছে।' একদিন শিবু আচার্য চারখানি নৌকো নিয়ে হাজির। ওপারে ভদ্রকালিতে তার শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবে। সে কি ধুমধাম করে যাওয়া হল সেবার। এক নৌকোয় ঠাকুর, নরেন, রাখাল আর রামলাল। আরেক নৌকোয় অক্ষয় মহিম আর মাস্টারমশাই। নিশান টাঙানো হল নৌকোয়। শিঙে খোল-করতাল বাজিয়ে হরিনাম করতে-করতে যাত্রা। পারে কত লোক এসে দাঁড়িয়েছে। কারু হাতে ফুলের মালা, কারু হাতে বা ধামিভরা বাতাসা। ঠাকুরের গলায় মালা দিলে, হরিবোল-হরিবোল বলে

বাতাসাগুলি ছড়িয়ে দিল চারদিকে। টলমল টলমল করতে-করতে ঠাকুর নামলেন নৌকো থেকে।

কি হচ্ছে এখানে? একদিকে কীর্তন অন্যদিকে পণ্ডিতদের আলোচনা। ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বসিয়ে দিল। সে কি তর্ক পণ্ডিতদের মধ্যে। সবচেয়ে দুর্ধর্ষ রঙ্গব্রত সামাধ্যায়। তার জিভের আগে কেউ টিকতে পাচ্ছে না। যা বলছে সব সে কেটে দিচ্ছে। কিছু মানছে না কিছু রাখছে না। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিলেন ঠাকুর, পরে রামলালকে বললেন, চল্ তো রে একটু বাইরে যাব। বাইরে গিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে বললেন, মা শালা ভারি তর্ক করছে। কারু কথাই নিচ্ছে না ধরছে না। ভারি শুকনো পণ্ডিত। তুই ওকে একটু ঠাণ্ডা করে দে দিকিনি। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর সামাধ্যায়ের ডান হাঁটুটা খপ করে ধরে ফেলে বললেন, হ্যাঁ গা কি বলছিলে বলো না। সামাধ্যায় হেসে বললে, ও আমি ঠাট্টা-তামাশা করছিলাম!

যখন খেয়ে-দেয়ে দুপুরে শুতেন কত তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। কতক্ষণ পরেই বলতেন, যা এইবার একটু গড়িয়ে নে গে যা। মাদুর-বালিশ নিয়ে একটু শুতুম, তারপর দপ্তরখানায় চিলে-ছাতে যেতুম রসিকের সঙ্গে গল্প করতে। কামারপুকুরের রসিকলাল সরকার মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের যোগানদার, তখন থাকত সেই চিলে-কোঠায়। ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর ডাকতেন, ওরে রামনেলো, শালা, শিগগির আয়, আমি বাইরে যাব। গল্পে এত মত্ত থাকতুম কখনো ঠিক-ঠিক শুনতে পেতুম না। যখন শুনতুম, পড়ি-মরি ছুট মারতুম। বলতেন, 'শালার রসিকের ওপর এখন ভালোবাসা, গল্প করবে তো মাদুর-বালিশ তুলতেও সময় পায়নি।'

কত তামাক সেজে দিয়েছি। ঠাকুরের বায়ুবৃদ্ধি হয়েছে, আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবরেজ চিকিৎসা করছে। হ্যাঁ গা, তামুক খেলে কি হয়? বায়ু কমে। বললে বিশ্বনাথ। তবে যখন তামাক খাবেন তখন চিলিমের উপর কিছু ধনের চাল আর মৌরি দিয়ে খাবেন। ও রকম করে কতবার সেজে দিয়েছি।

কত ডাকা-আনা করেছি নরেনকে। ওরে রামলাল, একবারটি নরেনের খবর নিয়ে আয়। এই দ্যাখ এক মাড়োয়ারি ভক্ত এসে বাদাম-কিসমিস খেতে দিয়ে গেছে। যা এগুলো পৌঁছে দিয়ে আয় নরেনকে।

আবার কবে আসবি? নরেনকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। বুধবার আসব। ক'টায়? তিনটেয়। সেই বুধবার এসেছে, আর ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা কইবেন কি, বারে-বারে বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, চটিজুতো পায়ে দিয়ে হনহন করে ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন ঠাকুর। এ কি নরেন দাঁড়িয়ে। কি রে, কখন এলি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নরেন বললে, এখন সবে দুটো, অনেক আগে এসে পড়েছি। সত্যরক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, তিনটে বাজলে যাব। ঠাকুর দাঁড়িয়ে রইলেন। ফটকের সামনে দুজনের দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা। যখন ঠিক তিনটে বাজল তখন নিয়ে এলেন ঘরে।

কত দিনের কত কথা ভিড় করছে মনে।

মনে পড়ছে কাপ্তেনকে। কুকুর-কাপ্তেন। কোন একটা কুকুর মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকত। ঠাকুর তাকে কাপ্তেন-কাপ্তেন করে ডাকতেন। ডাকলেই সে ঠাকুরের পায়ে এসে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুরের হাতের লুচি-সন্দেশ পেলে দারুণ খুশি। ঠাকুর বললেন, দ্যাখ এত যে কুকুর রয়েছে কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর জুড়ি নেই। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। ওর পূর্বজন্মের সংস্কার যা ছিল তাই এখানে এসে করছে। ধন্য হয়ে গেল।

সিস্টার নিবেদিতা শ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখল বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির উপর একটা কুকুর শুয়ে আছে। নিবেদিতা হাত জোড় করে কুকুরটিকে বললে, 'ভক্তবর, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি জগন্মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করতে এসেছি, আমার পথরোধ করে থেকো না। আমি জানি তুমি ছদ্মবেশী মহাভক্ত, পূর্ব-পূর্ব জন্মে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কি কারণে কে জানে এবার কুকুরদেহ ধারণ করেছ। মায়ের পদধূলি পড়েছে এ সিঁড়িতে, পড়েছে কত সন্তান ভক্তের, তাই তুমি এ মহাতীর্থ ছাড়ছ না। আমিও তোমার সতীর্থ, আমাকে একটু পথ করে দাও।' কুকুর দোর ছাড়ল না, শুধু একটু পাশ দিল নিবেদিতাকে। ঠাকুর যখন কল্পতরু হলেন তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রামলাল ভাবতে লাগল, সকলের তো একরকম হল, আমার কি গাড়ু-গামছা বওয়াই সার হবে? এই কথা যেমনি মনে হওয়া ঠাকুর অমনি পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি রে রামলাল, অত ভাবছিস কেন? আয়-আয়?' এই বলে রামলালকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, তার গায়ের চাদর খুলে দিলেন। তার বুকে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'দ্যাখ দিকিনি এইবার।' রামলাল দেখল চারদিক অপার্থিব আলোতে ভরে গিয়েছে।

আর নরেন? নরেন কি ভাবছে?

ভাবছে তার গুরুদায়িত্বের কথা। বলে গেলেন যাবার আগে, তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তোর হাতে আর সব ছেলেদের ভার দিয়ে গেলাম। দেখিস ওদের, ছাড়িসনে। রাত্রে, আহারান্তে, ঠাকুর যখন খানিক স্বস্তি বোধ করলেন, বললেন, 'জানিস, আজ সারাদিন ভগবানের খেলা দেখে বিভোর ছিলাম তাই তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি।' তখন নরেন বলে উঠল, 'ভগবান তো সর্বভূতেই আছেন, ভুবনজোড়া তাঁর খেলার মাঠ—'

তখন ঠাকুর বললেন, 'ওরে তোর বেদান্তের ঈশ্বর নয়। তিনি চিন্ময়ও বটেন আবার চিদঘনও বটেন। লীলায় সেই চিন্ময়ের জমাট রূপ। দেখছি তিনি অপরূপ বালকৃষ্ণ হয়ে আপনমনে ধুলোখেলা করছেন। নবীন মেঘের মত রঙ, জ্যোতিতে সব দিক আলো, রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে! পথ দিয়ে যত লোক যাচ্ছে তাদের গায়ে ধুলো দিয়ে আনন্দ। কেউ গাল দিয়ে গেল ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ আদর করে কোলে করতে এল, অমনি দে-দৌড়। আবার কেউ আনমনে

চলে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে তার কোলে উঠলেন। বালকের খেলা কিনা, কোনো হেতু নেই। যে আদর করলে তাকে উপেক্ষা, আর যে ভুলেও ডাকেনি তাকে কৃপা।'

বিকেল পাঁচটায় শুরু হল শোভাযাত্রা। গলায় ফুলের মালা, শ্রীপাদপদ্মে সচন্দন ফুল, চললেন ঠাকুর নারায়ণী দেহে আনন্দৈকমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে। প্রেমব্যাকুল হয়ে সবাই ছুটোছুটি করতে লাগল। কেউ একটু খাট ছুঁতে পারে কিনা। কেউ একটু পারে কিনা কাঁধ দিতে। হে চরমশরণ, তোমাতে দৃঢ়া দুরোপা রতি দাও, দাও পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্তি। শতবর্ষ তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করবে, আমার হৃদয় তোমার বাসের যোগ্য করে তোলো।

খোল-করতালে সংকীর্তন চলল আগে-আগে। সঙ্গে নিশান, ওঁকার, ত্রিশূল। সমস্ত ধর্মের প্রতীক। বৈষ্ণবের খুন্তি, খৃস্টানের ক্রুশ, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র। চলেছেন সর্বধর্মসমন্বয়—সর্বধর্ম একীকরণমন্ত্রের উদ্গাতা। যত মত তত পথ তো বটেই, যত মত এক পথ।

জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্তিতে গৌরাঙ্গ, বৈরাগ্যে বুদ্ধ, আত্মবলিদানে যীশুখৃস্ট, ঔদার্যে মহম্মদ। সর্বত্র অবিরোধ, সর্বত্র অবিদ্বেষ। তুমি সেই সর্বত্রগামী। সেই সর্বাত্মা। এক ঈশ্বর। এক পৃথিবী। এক মানুষের সত্তা। হে এক, তোমাকে অনন্ত চক্ষুতে দেখতে দাও।

রাম দাও লাটুকে বললে, 'তুই বাগানে এখন কিছুক্ষণ থেকে যা। পরে যাস শ্মশানে।'

লাটু তাই থেকে গেল। শোভাযাত্রার সঙ্গে গেল না। ছন্নছাড়া শিশুর মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

'ঠাকুরের মিরাক্‌ল্ বা বিভূতি যদি কিছু দেখতে চাও তো লাটু মহারাজকে দেখ।' বলেছিল অতুল। 'ঠাকুর যে বলতেন ওরে লেটো, তোর মুখে দিয়ে বেদ-বেদান্ত ফুটে বেরুবে, ঠিক তাই ফলেছে।'

'দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে শুকিয়ে যায়,' বলছে লাটু, 'বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি তাহলে জল আর শুকোয় না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারে না, জগৎ আর নিরানন্দ লাগবে না।' আবার বলছে, 'দেখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে মাথার উপর হাজার মণ জল থাকলেও ভারটা বোঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধরে ডুব দিলে সংসারের বোঝা আর বোঝা বলে মনে হয় না। সংসারকে মনে হয় আনন্দের নিকেতন। যো যাকে শরণ লিয়ে সে রাখে তাকো লাজ, উলঠ জলে মছলি চলে বহি যায় গজরাজ।'

সব তাঁর ইচ্ছা এই ভাবে নিষ্পন্ন থাকো। ঠাকুরের সেই গল্প মনে পড়ল।

একজন লোক অনেক মেহনত করে পাহাড়ের উপর একখানি কুঁড়েঘর করেছিল। একদিন ভারি ঝড় উঠল। টলমল করতে লাগল ঘর। লোকটি তখন কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল, হে পবনদেব, দেখো, ঘরটি যেন না পড়ে।

পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড় করতে লাগল। তখন লোকটি একটা ফন্দি ঠাওরাল। হনুমান তো পবনদেবের ছেলে, তার নাম করে দোহাই দিলে। বাবা, এ হনুমানের ঘর, দেখো যেন ভেঙো না। কিন্তু তখনো ঘর পড়ো-পড়ো। তখন অনুপায় হয়ে লোকটি বললে, বাবা, এ লক্ষ্মণের ঘর। তবুও বারণ মানছে না ঝড়। বাবা, এ রামের ঘর, রামের ঘর। তবুও না। ঘর যখন সত্যি ভাঙতে শুধু করেছে, যখন আর উপায় নেই, তখন লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, যা শালার ঘর। কিছুই করবার নেই। তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে। আবার সবই তাঁর কৃপা।

দরোয়ান হনুমন্ত সিং-এর সঙ্গে এক ভারি পাঞ্জাবী কুস্তি লড়তে এসেছে। পাঞ্জাবী লোকটা ভীষণ জোয়ান, দিন পনেরো ধরে খুব কসরত চালাল আর ঘি দুধ মাংস খুব খেতে লাগল। তার চেহারা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে তারই জিত হবে। হনুমন্ত সিং-এর কোনো আয়োজন নেই, শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ চাইলে। ঠাকুর বললেন, খাওয়া কমাতে হবে, কসরত কমাতে হবে আর দিনভোর মহাবীরজীর শরণ নিতে হবে। মহাবীরজীর কৃপা হলে সব বিপক্ষ নিরস্ত হবে। লোকে ভাবলে এ কি সর্বনেশে বিধান, খাওয়া-দাওয়া কমালে লড়বে কি করে? কিন্তু ঠাকুরের উপর হনুমন্তের অটুট-বিশ্বাস, তাঁর কথা পুরোপুরি মেনে নিলে। জয় মহাবীরের জয়। কুস্তিতে হনুমন্তের জয় হল। আর সে কৃপার কোনো কার্যকারণ নেই।

একদিন দুপুরবেলায় লাটুকে নিয়ে ঠাকুর চললেন তালতলায়, ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। চল, একবার তাঁকে গলাটা দেখিয়ে আসি, এমন ডাকসাইটে ডাক্তার।

অনেকক্ষণ ধরে দুর্গাচরণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলে, কিন্তু কি যে অসুখ, বলতে পারলে না। ঠাকুর তাকে যতবার বলেন, হ্যাঁ গা, রোগ সারবে তো, দুর্গাচরণ তত বলে, ওষুধটা আগে খেয়ে দেখুন। বাড়ি ফিরে এসে ঠাকুর লাটুকে বলছেন, রোগ সারবে কিনা তার খোঁজ নেই, বলে ওষুধটা খেয়ে দেখুন। খাব না ওর ওষুধ। তবে সেখানে গেলেন কেন? ওরে তুই জানিস না, ও লুকিয়ে-লুকিয়ে যেত দক্ষিণেশ্বর। কতবার গিয়েছে, একবার আমার না গেলে কি ভালো দেখায়? ও তো নিজে থেকে ডাকল না ওর বাড়ি, না ডাকুক, আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গেলাম। কতদিন রাত্তির দশটা-এগারোটার সময় গিয়ে 'হৃদে হৃদে' করে ডাকত। ওর গলা শুনে বুঝতে পারতুম, হৃদেকে বলতাম, ওরে দোর খুলে দে, কলকাতা থেকে দুর্গাচরণ এসেছে। হৃদয় দোর খুলে দিত। ডাক্তার একটাও কথা বলত না। চুপচাপ বসে থাকত অনেকক্ষণ। ঠাকুর বললেন, 'কি চোখে আমাকে দেখেছিল তা ও-ই জানে।'

রোজ সকালে ঘুম ভাঙতেই দু-চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে ঠাকুরকে ডাকত লাটু। ঠাকুর এসে দাঁড়াতে তবে চোখ খুলত। দিনের প্রথম দর্শন দিনমণি নয়, দিনের প্রথম দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এখন কোথায় দেখব তোমাকে?

লাটু ছুটল কাশীপুর শ্মশানে। চন্দনকাঠের চিতা জ্বলছে। চিরঞ্জীব শর্মা গান গাইছে শোকাশ্রু-গম্ভীর কণ্ঠে : 'জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ-দুঃখের ভিতরে।' 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ি অবাক হয়েছি। হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।'

কিন্তু প্রজ্বলিত চিতার পাশে পাখা হাতে কে বসে? আগুনকে হাওয়া করছে এ কে উন্মাদ? উন্মাদ নয়, গুরুগতপ্রাণ শশিভূষণ। প্রভুর সেবাকালে অহরহ পাখা করেছে, এখনো দেহরক্ষা করার অন্তেও চলেছে সেই সেবাকাজ। দেহে নেই বলে যারা ভাবছে ঠাকুর তিরোহিত তারাই শশীকে উন্মাদ বলবে কিন্তু শশী সর্বকালে সর্বঘটে তার ইষ্টকে দেখছে, তার দৃষ্টিতে অগ্নিতে আর রামকৃষ্ণে কোনো ভেদ নেই, তাই সে-ই সত্যদ্রষ্টা সে-ই সত্যধ্যানী।

চিতা নিবে গেল তবুও শশীর পাখার বিরাম নেই।

লাটু তুলল তার হাত ধরে। নরেন আর শরৎ নিজেদের কি প্রবোধ দেবে তা জানে না, শশীকে প্রবোধ দিতে লাগল।

ঠাকুরের সব ভস্মাস্থি একত্র করে একটি তামার কলসীতে রাখল শশী। মাথায় করে নিয়ে চলল। কাশীপুরের বাড়িতে ফিরে ঠাকুরের শয্যাস্থানে রাখল। আবার বসল পাখা করতে।

কে বলে তিনি নেই?

আমি আছি। আগুনে দগ্ধ হলেও আমি উড়ে যাই না, জলে মগ্ন হলেও আমি ধুয়ে যাই না। আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আমি নিত্য সর্বব্যাপী স্থির অচল ও সনাতন। আমিই প্রাণীর গতি ও প্রতিপালক। আমিই প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাসস্থল ও কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হিতকারী। স্রষ্টা ও সংহর্তা। আধার ও প্রলয়ভাণ্ড। আমিই অক্ষয়কারণ।

আমাকে দেখো।

'নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।' আমার বিভূতির অন্ত নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু পরম-প্রধান তাই আমি। প্রকাশকদের মধ্যে আমি মরীচিমালী সূর্য, পুরোহিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে কার্তিক আর জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। পর্বতের মধ্যে মেরু, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে সুধাংশু। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, অষ্ট বসুর মধ্যে অচল, সর্বভূতে অভিব্যক্ত চেতনা। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, শব্দের মধ্যে ওঁকার। দেবর্ষির মধ্যে নারদ, গন্ধর্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধের মধ্যে কপিল। অশ্বের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মানুষের মধ্যে নরপতি। আয়ুধের মধ্যে বজ্র, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসুকি। সৃজনশক্তির মধ্যে কাম, নিয়ামকদের মধ্যে যম, সংখ্যাকারিকের মধ্যে কাল। পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড়, মৎস্যের মধ্যে মকর। নাগের মধ্যে অনন্ত, জলদেবের মধ্যে বরুণ, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। বেগবানের মধ্যে বায়ু, নদীর মধ্যে গঙ্গা, শস্ত্রপাণিদের মধ্যে রামচন্দ্র। অক্ষরের মধ্যে অ-কার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস, বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। সমস্ত

সৃষ্টির আমিই আদি আমিই মধ্য আমিই শেষ, ক্ষণ-রূপে আমিই অক্ষীণ কাল, আমিই সর্বকর্মের ফলদাতা। অপহারীদের মধ্যে মৃত্যু, ভাবীকালের উৎকর্ষ, বিতণ্ডার মধ্যে বিচার। নারীর মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ছেলের মধ্যে অক্ষ, তেজস্বীর মধ্যে তেজ, বিজয়ীর মধ্যে বিজয়, উদ্যোগীর মধ্যে অধ্যবসায়। যাদবের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবের মধ্যে অর্জুন, মুনির মধ্যে ব্যাস, কবির মধ্যে শুক্রাচার্য। আমিই শাসকের দণ্ড, জিগীষুদের নীতি, গুহ্য বিষয়ে মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান। যা কিছু বীজস্বরূপে তাই আমি। সমস্তই আমার সত্তার সত্তান্বিত। সবই মদাত্মক। আমার বিভূতির এত কথা জেনেই বা তোমাদের কি দরকার? এইমাত্র জেনে রাখো আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ আবৃত করে আছি।

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি
জয় জয় পরমা নিবৃতি হে নমি নমি।
অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে নমি নমি
পাপক্ষালনপাবন হে নমি নমি।
সর্ব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে নমি নমি॥'

১৬৬

মা-ঠাকরুন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, ঠাকুর সশরীরে দেখা দিলেন। বললেন, 'কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এঘর আর ওঘর।'

কারু সাধ্য নেই মাকে থানকাপড় এগিয়ে দেয়। নিজ হাতেই মা কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিয়েছেন। লোকনিন্দা যায় না। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণকন্যা সোনার বালা পরে পেড়ে কাপড় পরে এ কি কথা! তাহলে মানতে হয় দেশাচার। আবার খুলতে যাচ্ছেন বালা আবার ঠাকুরের আবির্ভাব। এবার একেবারে মা-ঠাকরুনের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিগগেস কোরো ও সব শাস্ত্র জানে।'

ঠাকুরের তিরোধানের খবর পেয়ে গৌরীমা তো কেঁদে আকুল। ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হল। অমনি চোখ চেয়ে দেখল সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। তুই মরবি নাকি? ঠাকুর ধমক দিয়ে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গৌরীমা উঠে দাঁড়াল। ঠাকুর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গৌরীমা বুঝতে পারল তার দেহত্যাগ ঠাকুরের ইচ্ছা নয়। এখনো অনেক বুঝি তার কাজ বাকি।

'কি বলবে বলোই না।' কাশীপুরে একদিন মা দেখলেন ঠাকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অপলকে। দুই চোখ কি যেন বলি-বলি করছে।

'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না ? সব এ-ই করবে ?' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর।

'না না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর : 'এ আর কি করেছে ? তোমার অনেক-অনেক কাজ বাকি। দায় শুধু আমারই ? দায় তোমারও।'

এখন ঠাকুর অপ্রকট হবার পর, মা'র ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'জগতে মাতৃভাব প্রকাশের জন্যে তোমাকে রেখে গিয়েছি। তুমি থাকো।'

এদিকে মায়ের সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়া বেধেছে ঠাকুরের ভস্মাস্থি নিয়ে। কাশীপুরের বাড়ির ভাড়া টানবার আর সঙ্গতি নেই সন্তানদের তবে ঠাকুরের পূতাস্থিপূর্ণ কলসীটি কোথায় রাখা হবে ? যতদিন এ-বাড়ির মেয়াদ আছে ততদিন না হয় এখানেই সে কলসীর পূজার্চনা হবে—তারপর ?

রামদত্ত আর তার দলের লোকদের ইচ্ছা কলসী কাঁকুড়গাছিতে তার যোগোদ্যানে নিয়ে সমাহিত করা হয়। কিছুতেই তা হতে দেবে না। শশী আর নিরঞ্জন রুখে দাঁড়াল। গঙ্গাতীরে জমি কিনব নিজেরা আর সেখানে সমাহিত করব পূতাস্থি। কিন্তু জমি কেনবার মত টাকা কই ? নিজস্ব একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই যেখানে এ সম্পদ আগলাতে পারি। সন্ন্যাসী ভক্তরা যুক্তি করতে বসল। তাম্রকলসী রামবাবুকেই দেওয়া হোক কিন্তু তার আগে পূতাস্থিভস্মের অধিকাংশ সরিয়ে নেওয়া হোক। কিন্তু দেখো, রামবাবু যেন জানতে না পারে।

তাই হল। বেশির ভাগ পূতাস্থিভস্ম সরিয়ে নেওয়া হল কলসী থেকে। রাখা হল একটি আলাদা কৌটোয়। সে কৌটোটি লুকিয়ে রাখা হল বলরাম বসুর বাড়িতে। সেখানেই হবে নিত্যপূজা।

মায়ের কানে গেল এই ঝগড়ার কথা। গোলাপ-মাকে বললেন দুঃখ করে, 'এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই দিয়ে ঝগড়া করছে।'

এত কথার দরকার কি। বললে নরেন, 'আমাদের দেহেই ঠাকুরের জীবন্ত সমাধি হোক।'

পূতাস্থির খানিকটা হামানদিস্তাতে চূর্ণ করা হল। সেই চূর্ণ ভাগ করে নিল সন্ন্যাসী-সন্তানরা। জিহ্বায় স্পর্শ করল সকলে।

ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন ৩১শে শ্রাবণ, তার কিছুদিন পরে, জন্মাষ্টমীর দিনে, অস্থির কলসী নিয়ে যাওয়া হল যোগোদ্যানে। কে আর নেবে, শশীই মাথা পাতল। যথোচিত পূজা হল কলসীর। তারপর তাকে যখন মাটির নিচে পোঁতা হল, উপরে মাটি ফেলে দুরমুশ করতে লাগল, তখন শশী তীব্র যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠল : 'ওগো, ঠাকুরের গায়ে যে বড্ড লাগছে।'

নবীন শ্যামল ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ঠাকুরের যেমন হত। ওগো,

মাড়িয়ো না, মাড়িয়ো না, বুকে ভীষণ বাজছে। ঘটে পটে কাঠে শিলায় সর্বত্র চৈতন্য।

একটি ভক্ত মেয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। উত্তরদিকের দরজা একটু ফাঁক করে দেখে একলা ঘরে ঠাকুর তক্তপোশের উপর বসে পশ্চিমদিকের দেয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর ছবিদের সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে হাসছেন, কথা কইছেন। ভিতরে ঢুকে তাঁর আনন্দের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছা হল না। কিন্তু অন্তর্যামী ঠাকুর জানতে পেরেছেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন মেয়েকে, বললেন, 'দেয়ালের এই সব ছবি চৈতন্যময়, তাই এদের সঙ্গে কথা কইছি। তোমার ঘরে যে গোবিন্দের পট আছে তাকে ছবি মনে কোরোনি, তার সঙ্গে কথা কোয়ো—তাকে চিন্ময় ভাবতে-ভাবতে একদিন ঠিক তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। সেইদিনই সার্থক হবে তোমার পুজো, তোমার ভোগরাগ।'

গোবিন্দ মানে জানো তো? যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে রক্ষা ও পরিচালনা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ তিনিই গোবিন্দ। বৃন্দাবনে গরু চরিয়ে বেড়াতেন যে গোবিন্দ সেই তিনিই জীবের ইন্দ্রিয়ের রাখাল। সকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা মন, সেই মন গোবিন্দপাচনবাড়িতে জব্দ থাকে। গোবিন্দই মনোরথের সারথি।

মনকে নিগৃহীত করো। মন নিগৃহীত না হলে অভয়লাভ অসম্ভব। মন নিগৃহীত হলেই দুঃখক্ষয়, প্রবোধ ও পরাশান্তি। ধীরে-ধীরে মননিগ্রহ করো। কুশাগ্রের মুখে বিন্দু-বিন্দু করে জল তুলে সমুদ্র সেঁচে ফেল। কামেই চিত্তের বিক্ষেপ। কামভোগ কেবল দুঃখ এই বোধে বৈরাগ্যবলে উদ্দীপ্ত হও। আত্মানাত্মবিবেকই উপসেব্য।

মনের সংযমই শম। কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমই দম। সকল ব্রহ্ম এ জেনে ইন্দ্রিয়গ্রাম যদি সংযত হয় তখন যে অবস্থা তাই যম। প্রতিকারের চেষ্টা না করে চিন্তা আর বিলাপ না করে দুঃখ সহ্য করাই তিতিক্ষা। নিগৃহীত মন আবার যদি বিষয়াভিমুখী হয় তাকে প্রত্যাহৃত করাই উপরতি। গুরু বেদান্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। পরমগুরু পরমেশ্বর একান্ত অনুরক্তিই সমাধান।

বলরামকে ঠাকুর বললেন, 'আমার ইচ্ছে দুখানি ছবি যদি পাই। একটি ছবি, যোগী ধুনি জেবলে বসে আছে; আরেকটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখে দিয়ে টানছে আর সেটা দপ করে জবলে উঠেছে। এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন শোলার আতা দেখলে সত্যিকার আতার উদ্দীপন হয়।'

একটা থেকে আরেকটা।

অরুন্ধতী পাতিব্রত্যের প্রতীকস্বরূপ। তাই নবোঢ়াকে অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখানো হয়। সে নক্ষত্র অত্যন্ত ছোট, সহজে চোখে পড়ে না। সুতরাং স্বামী নিকটের একটি স্থূল উজ্জ্বল তারার দিকে সংকেত করে বলে, ঐ দেখো অরুন্ধতী। যখন বধূর দৃষ্টি তাতে সুস্থির হল একাগ্র হল তখন স্বামী বললে, না, না, ওটা নয়, ওর কাছে ঐ যে ছোট্ট তারাটি আছে ঐটিই অরুন্ধতী।

প্রতিমা দেখছ, তারপর দেখ সেই নিষ্প্রতীককে। মনোবুদ্ধি অহংকার চিত্ত

দেখছ, তারপর দেখ এই আপনাকে। আত্মসাক্ষাৎকার করো।

কি চাই জানবার আগে কে চায় নির্ণয় করো। অন্বিষ্ট বস্তু ও অন্বেষক শক্তি কি আলাদা? তাই নিজেকে ফোটাও, নিজে হও। নিজেকে জানো। নিজেকে জানাই সত্য, নিজেকে জানাই সাধুতা। নিজের তাগিদে নিজের অনুপাতে হয়ে ওঠো। অন্যকে নকল করে নয় নিজে অবিকল থেকে।

শিবের কোলে কালী বসে, এই ক্ষেমংকরী ছবিটি ঠাকুরকে দিয়েছিল সুরেশ মিত্তির। ঠাকুর বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে। মা, এই ঘরে থাকো, আর মন্দিরে গিয়ে খেও। ওরে রামলাল, কালীপুজোর দিন মা'র ছবিটি মা'র ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি। মা সেদিন অনেক কিছু খাবে।'

ভবনাথ এনে দিয়েছিল নবদ্বীপের গৌরাঙ্গকীর্তনের ছবি। যমুনাপুলিনের ছবিটি দিয়েছিল রাখাল। 'বা, রাখালের কি পছন্দ! রাধিকা কোমরে হাত দিয়ে যেন বাঁশরী কাড়তে যাচ্ছে।' শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তিটি দিয়েছিল পাইকপাড়ার রানী কাত্যায়নী। নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দিয়েছিল গণপতি মূর্তি। কেশবচন্দ্র দিয়েছিল যীশুখৃষ্টের ছবি, মহেন্দ্রলাল দিয়েছিল ষোড়শী আর যশোদাগোপাল শিকদারপাড়ার পোটো দিয়েছিল পাষাণী অহল্যা, রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র।

সব কি সজীব। সর্বত্র উদ্দীপন।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্মমন্দিরের বেদীর সামনে ঠাকুর প্রণাম করলেন। বললেন, 'নরেন বলে সমাজ-মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়? উদ্দীপন হয়। মন্দির দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে। যেখানে তাঁর কথা সেখানেই তাঁর আবির্ভাব। সেখানেই সকল তীর্থের উপস্থিতি। একজন, জানো তো, বাবলাগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল, কেননা ঐ কাঠে রাধাকান্তের বাগানের জন্যে কুড়ুলের কাঠ হয়। একজনের এমন গুরুভক্তি, গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই ভাবে বিভোর। মেঘ দেখে নীল বসন দেখে রাধিকার ব্যাকুলতা।'

নন্দনবাগানে সদরালা কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতেই এই ব্রাহ্মমন্দির। সেদিন সে উৎসবে উপস্থিত আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদমন্ত্রপাঠের উপর উপাসনা হচ্ছে। তারপরে প্রার্থনা। মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে। মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। হে চিরপ্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পাও, আমাতেই তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ করো। হে রুদ্র হে ভয়ংকর, তোমার প্রসন্নসুন্দর মুখ আমাকে দেখাও, সে মুখের অভয়লাবণ্যে আমাকে বাঁচাও, আমাকে উজ্জীবিত করো।

ঠাকুর খুব খুশি। বলছেন, 'অশ্বত্থই সত্য, ফল দুদিনের জন্যে। গাছ কে দেখে সব ফল কুড়োতেই ব্যস্ত। অন্তর শুদ্ধ না হলে বিশ্বাস হয় না। যার ঠিক বিশ্বাস তারই ঠিক দর্শন। তবে কিনা সংসারী লোকদের ঈশ্বরানুরাগ ক্ষণিক— যেন তপ্ত লোহায় জলের ছিটে, জল যতক্ষণ থাকে।'

এক শিখ-সেপাই এসেছিল ঠাকুরের কাছে। বললে, 'আমরা হরদম মারপিট

করছি, সরকারী হুকুমে গুলি করে লোক মারছি, আমরা কি রকম থাকব ?'

ঠাকুর ভাবে দেখলেন একটা ঢেঁকি ধান ভানছে। বললেন, 'দেখ ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু-নিচু ওঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে কিন্তু দু-পাশের দুটো কাঠি দুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, কোনো নড়চড় নেই, তেমনি মন রেখে কাজ কোরো।'

কাশীপুর বাগানের পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে ছেলেরা। নরেন, নিরঞ্জন আর কালী। কালীই বেশি ওস্তাদ। নরেন-নিরঞ্জন একটি মাছ গাঁথতে যত সময় নেয়, তার মধ্যে কালী প্রায় চার-পাঁচটি ধরে ফেলে। ঠাকুরের কানে গেল এ সংবাদ। ছেলেদের তিনি ডেকে পাঠালেন।

কালীকে বললেন, 'তুই নাকি পুকুরে ছিপ ফেলে খুব মাছ ধরিস ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছিপ দিয়ে মাছ ধরা বড় পাপ।'

'কেন, জীবহত্যা ?' নরেন বললে।

'হ্যাঁ জীবহত্যা।'

'সে কি ? নায়ং হন্তি ন হন্যতে। আত্মা কাউকে মারতেও পারে না, নিজেও মরে না, তাহলে পাপ কোথায় ?'

'পাপ বিশ্বাসঘাতকতায়।' বললেন ঠাকুর, 'আহারের লোভ দেখিয়ে বঁড়শি লুকিয়ে রাখা আর অতিথি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে তার খাদ্যে গোপনে বিষ দেওয়া একই পাপ। আত্মা মরে না, অন্যকেও মারে না—এ সত্য, কিন্তু এই জ্ঞান যার হয়েছে সে তো আত্ম-স্বরূপ হয়েছে। তার আর অপরকে হত্যা করার প্রবৃত্তি হবে কেন ? যতক্ষণ ঐ হত্যাবৃত্তি আছে ততক্ষণ সে আত্মা-স্বরূপ হয়নি, সুতরাং তার আত্মজ্ঞানও হয়নি। তাই জেনে রাখ, ঠিক-ঠিক জ্ঞান হলে পা আর পড়ে না বেতালে।'

প্রয়াগে এসেছেন মা-ঠাকরুন। ঠিক করলেন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানকালে কেশদাম বিসর্জন দেবেন। কাউকে সে কথা প্রকাশ করলেন না, লক্ষ্মীকেও না। স্নানের দিন খুব প্রত্যুষে মা শুনতে পেলেন কে যেন লক্ষ্মীকে ডাকছে। 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।' বেদনাবিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মা চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে। দেখলেন ঠাকুর দুই হাত দিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পলক স্থির হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মায়ের প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। কেন, কেন ঠাকুরের এই কাতরতা ? সহসা মনে হল, তাঁর কেশদাম জলাঞ্জলি দেওয়া ঠাকুরের ইচ্ছে নয়।

কাশীধামে এসেছেন শ্রীমা। মৃত্তিকার কাশী নয় সুবর্ণের কাশী। কাশীতে এক গুরু তার শিষ্যকে এক ডেলা মাটি আনতে বললে। শিষ্য সারা কাশী ঘুরে-ঘুরে গুরুর কাছে ফিরে এল দিনান্তে। বললে, গুরুদেব, আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন করতে পারলুম না। কোথাও একটু মাটি নেই। এ কি অসম্ভব কথা ! গুরু ক্রুদ্ধ হল। সারা কাশী খুঁজে এক ডেলা মাটি পেলে

না তুমি ?

বিনয়বচনে শিষ্য বললে, না গুরুদেব। অন্নপূর্ণার সোনার কাশী, এখানে মাটির ছিটেফোঁটাও নেই—সমস্তই সোনা।

গুরু স্তম্ভিত হয়ে গেল। শিষ্য তাকে ছাড়িয়ে সাধনভূমির কত উঁচুতে উঠে গেছে।

বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছেন শ্রীমা, আর দেখছেন, অনাদি লিঙ্গ কোথায়, ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালছেন সব ঠাকুরের পায়ে পড়ছে। হাত পা কাঁপতে লাগল শ্রীমা'র, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরলেন। এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন মা ? কে একজন জিগগেস করলে। মা বললেন, ঠাকুর আমাকে হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।

আরেকদিন মা নারায়ণ দেখলেন। বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে যেমন দেখেছেন তেমনি। শুধু নারায়ণ নয়, নারায়ণের পাশে ঠাকুর। ঠাকুর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুর হাতজোড় করে কেন ? 'তাঁর কথা ছেড়ে দাও।' বললেন মা। সকলের কাছেই তাঁর দীনভাব—ঐ ওঁর বিশেষত্ব। এবারে যে বালকবৎ অবস্থা অবলম্বন করে লীলা করলেন।'

একবার এক ভক্ত ঠাকুরকে একজোড়া মোজা দিল। নতুন মোজা পরে ঠাকুর ছোট ছেলের মত আহ্লাদে আটখানা। হুটকো গোপাল এসেছে দর্শন করতে, আনন্দময় ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে, আমাকে আজ মোজা পরে কেমন বাবা সাজিয়েছে দ্যাখ।'

গোপাল হাসছে।

'তুই বড় হাসছিস যে ?'

'মোজা পরে তো বেশ সেজেছেন।' বললে হুটকো গোপাল, 'এদিকে পরনের কাপড়খানার যে ঠিক নেই।'

ঠাকুরের কাপড়খানা এলোমেলো হয়ে ছিল। তিনি নির্লিপ্তের মতো বললেন, 'তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তো।'

কাপড়খানা ঠিকঠাক পরিয়ে দিলে গোপাল। একেবারে শিশু। সদানন্দ সর্বানন্দ শিশুর মতই হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হয়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গেলেন মা। দেখলেন ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন। মা একবার ভাবলেন ভাঙাবেন না ঘুম ; আবার ভাবলেন ঘুম না ভাঙলে খেতে যে দেরি হয়ে যাবে। ভাবতে না ভাবতেই ঠাকুরের ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'জানো গা, এক দূর দেশে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোক সব শাদা-শাদা। তারা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা তারা পাবে না।'

তাদের অগ্রদূতী নিবেদিতা। মাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটো দিয়েছে, তাতে মা ঠাকুরের কেশ রেখেছেন। বলেন, 'নিত্য পূজার সময় যখন এই কৌটোটির দিকে তাকাই, নিবেদিতাকে মনে পড়ে। নিবেদিতা আমায় বলেছিল,

না, আমরা আর জন্মে হিন্দু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি।'

কোয়ালপাড়াতে খুব জ্বরে ভুগছেন শ্রীমা। বেহুঁশ হয়ে বিছানাতে অসামাল হয়ে পড়ছেন। হুঁশ হয়ে যখনই ঠাকুরকে স্মরণ করছেন তখনই দর্শন পাচ্ছেন। সেই হৃষীকেশ থেকে এক সাধু লিখেছে মাকে, মা তুমি বলেছিলে, সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে, কই তা হল ?

চিঠি পেয়ে মা বললেন, 'ওকে লিখে দাও হৃষীকেশে গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকেননি ! সাধু হয়েছে ভগবানকে ডাকবে না তো কি করবে ? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।'

'আপনাকে দর্শন করেছে অথচ আপনার উপর বিশ্বাস-ভক্তি নেই তাদের কি কিছুই হবে না ?' একজন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

ঠাকুর বললেন, 'ওরে নাই বা মানলেক, দর্শনের ফল যাবে কোথায় ? পরের জন্মে তাদের সাধন-ভজনে মতিগতি হবে।'

কেউ-কেউ বা অশরীরী অবস্থাতেও উদ্ধার পায়।

গোপালের মা'র বাড়িতে ঠাকুর আর রাখাল গেছেন মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণে। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়ির নিচের ঘরটিতে থাকে গোপালের মা। কি রাশীকৃত রান্নার আয়োজন করেছে কে জানে, তার রান্না তখনো শেষ হয়নি। উপরের ঘরটি খুলে দিয়ে অতিথিদের বিশ্রাম করতে বললে।

ঠাকুরের পাশে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে রাখাল চোখ বুজে শুয়ে রইল। খানিক পরে শুনতে পেল কে যেন ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইছে। বলছে, 'আপনি এখানে আসতে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে ! বাইরে এই দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে বড় কষ্ট আমাদের।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমরা কারা ?'

'আমরা প্রেতাত্মা। পাশের চটকলে কাজ করতুম, অপঘাতে প্রাণ গিয়েছে। সদ্গতি হয়নি কখনো। এই বাগানে ঘুরে বেড়াই আর এই খালিঘরে থাকি।'

'আহা, তোমাদের এত কষ্ট, এখুনি চলে যাচ্ছি আমি।'

ঠাকুর উঠে পড়লেন।

রাখাল চোখ চেয়ে দেখল পাশে ঠাকুর নেই। ছুটে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে ধরল। এ কি, নেমে যাচ্ছেন কেন ? কার সঙ্গে কথা কইছিলেন এতক্ষণ ?

'ওরে, এই ঘরটাতে ভূত থাকে। তারা বলছিল তাদের কষ্ট হচ্ছে বাইরে থাকতে। তাই নেমে যাচ্ছি। খবরদার এ কথা যেন বলিসনি বামনিকে।'

'আপনাকে দেখেও কি ওদের উদ্ধার হবে না ?'

'হবে। এখানকার টান চলে গেলেই উঠে যাবে উপরে।'

এখানকার টান কি যে-সে টান। ছড়া কাটলেন :

রানী টানেন কোল পানে
রাখাল টানে বন পানে

রাই টানেন চোখের টানে
বল শ্যাম দাঁড়াই কোথা—

'সংসারে থাকো কিন্তু আসক্তির গোড়া কেটে।' বললেন ঠাকুর, 'আসক্তি পুষে রাখলে এগুবি কি করে? নোঙর না তুলে দাঁড় টেনে গেলে নৌকো এক হাতও এগোয় না।'

'তবে কি সংসার থেকে দয়া-মায়া স্নেহ-ভালবাসা তুলে নেব?'

'তোমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে এ কে বলছে? সংসারের সবাইকে আপনার জন মনে না করে ভগবদ্‌জন বলে ভাবতে শেখ। তারই জন্যে মনের জঞ্জাল আগে সাফ করো। মনের জঞ্জাল ঘুচলেই চোখের দৃষ্টি ফুটবে। তখন দেখতে পাবে এ সংসারেও তাঁরই রচনা। যার যা পেটে সয় তার জন্যে তেমন খাবারের ব্যবস্থা।' যেখানে থাকো না কেন স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই। তুমি ছাড়া কেউ তা তোমার হয়ে আবিষ্কার করতে পারবে না।

ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে থাকো। সব সময়ে তাঁর কথা ভাবো। তাঁর নাম করো। পুণ্যতীর্থ, নদীতীর, গুহা, পর্বতশৃঙ্গ, তীর্থস্থান, নদীসঙ্গম, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল, গিরিতট, দেবমন্দির, সমুদ্রতীর, নিজ গৃহ অথবা যে স্থানে মন প্রশস্ত হয় প্রসন্ন হয় সেখানেই নাম করো। অত বাছবিচারের বা দরকার কি। যখনই মনে পড়বে তখনই নাম করবে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে খেতে-শুতে —যখন-তখন। নাম করতে-করতে মনের জঞ্জাল সাফ হবে। দেখা দেবে পবিত্রতা। পবিত্রতাই চিরতুষারমণ্ডিত কৈলাসধাম। নাম করতে-করতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। চিত্তকে একতান বা একাগ্র করার নামই যোগ। বুদ্ধির সমস্ত মুখ বেঁধে দিয়ে একটিমাত্র মুখ খুলে রাখার নাম যোগ। আর সব মুখ বেঁধে দিয়ে ঈশ্বরের মুখটি খুলে রাখো। দেখো কি রকম বেগ কি রকম শক্তি!

চিত্তে বাসনা থাকতে যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। তোমার চিত্ত তোমারই অধীন হবে, তুমি চিত্তের অধীন হবে না এইটিই যোগের লক্ষণ। সর্বদিকে নিরুদ্ধ, শুধু একদিকে একাগ্র। ঈশ্বরের তীব্রভাবনার নামই যোগ। সে অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রস্তুত হওয়া মানেই অধিকারী হওয়া। নিশ্চিন্তপুরুষ হয়ে যাও।

বর্ষার রাত, অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড়ও চলছে দুর্নিবার, এক গোয়ালার ঘরের দেয়ালের ধারে ছেঁচতলায় আশ্রয় নিয়েছেন বুদ্ধদেব। জানলা দিয়ে গোয়ালা দেখলে, গেরুয়া কাপড়। হেসে বললে, সন্ন্যাসী, ওখানেই থাকো, ঐ তোমার ঠিক

জায়গা।' তারপরে গান ধরল গোয়ালা, আমার গরু-বাছুর ঘরে আনা হয়েছে, সুন্দর আগুন জ্বলছে, আমার স্ত্রী নিরাপদে আছে, শিশুরা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, হে মেঘ, তুমি আজ যত খুশি বর্ষাও সারা রাত। বাইরে থেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার চিত্ত সংযত হয়েছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল কুড়িয়ে এনেছি, হৃদয় আমার দৃঢ়, হে সংসারমেঘ, যত পারো বর্ষণ করো সারা জীবন।' এই হচ্ছে নিশ্চিন্তপুরুষ।

একটি আসনে বসো ও ধ্যান করো। যে অবস্থায় সুখে অজস্র ব্রহ্মচিন্তা হয় তাই আসন। এ ছাড়া অন্য আসন সুখাসন নয়, সুখনাশন। শুধু স্তব্ধতাই মৌন নয়। বাক্য ও মন যাকে না পেয়ে নিবর্তিত হয় তাই মৌন। সমরস ব্রহ্মে লীন হওয়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমতা। নইলে শুধু শারীরিক ঋজুতাই সমতা নয়। নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিই যোগদৃষ্টি নয়। জ্ঞানময় দৃষ্টিতে সকলই ব্রহ্মময় দেখাই যোগদৃষ্টি। ব্রহ্মই আমি, এই জ্ঞানে যে নিরালম্বন স্থিতিলাভ হয় তাই ধ্যান। নির্বিকার ব্রহ্মরূপে অবস্থানে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিই সমাধি।

বিষয় আর কিছুই নয়, দুটি মাত্র অক্ষর : হ আর রি।

কি খুঁজছ ? সুখ ? হায়, হায়, সুখ কি খোঁজবার বস্তু ?

এমন একটা জিনিস চাই যাকে ধরে বাঁচতে পারি। যে আমাকে অন্তহীন আশা দেবে, অতলগভীর আশ্বাস দেবে, অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দেবে। নিজের মধ্যে এত আমি অনিশ্চিত, যে আমাকে অকম্পিত নিশ্চয়তা দেবে। কে সে ? ঐ দুটি মাত্র অক্ষর।

রাখাল ঠাকুরকে বললে, 'মাকে বলুন, যাতে শরীরটা আর কিছুদিন থাকে।'

নরেনেরও সেই কথা : 'আপনি ইচ্ছে করলেই মা'র ইচ্ছে হবে।'

'না রে না, এখন আর মাকে বলে কিছু হবে না।' বললেন ঠাকুর, 'এখন আর মা'র আর আমার ইচ্ছার মধ্যে ভেদ খুঁজে পাচ্ছি না।' পরে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এর মধ্যে দুটো। একটা মা—পূর্ণ ও আর একটা ছেলে—অবতীর্ণ। ছেলেরই হাত ভেঙেছিল, ছেলেরই এখন অসুখ। পূর্ণই অবতীর্ণ হয়, মানুষ হয়ে ভক্তসঙ্গে আসে, তার সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তরাও চলে যায়। বাউলের দল এল, নাচল, চলে গেল, কেউ চিনলে কেউ চিনলে না। জীবের জন্যেই এই শরীরধারণ, আর শরীর থাকলেই কষ্ট।'

ঠাকুর তাকালেন নরেনের দিকে। জিগগেস করলেন, 'আমাকে কি বলে বোধ হয় ?'

নরেন বললে, 'আপনি সত্যদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনিই স্বয়ং শ্রীমতী রাধারানী।'

ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখছি যা কিছু আছে, সব এখান থেকেই।'

তুমিই সব।

তুমি সমস্ত ঘর-ঘোরা পরিপক্ক ঘুঁটি। তুমি সব ঘরে সব ঘাটে সব পথে সব স্তরে। সব দৃষ্টিকোণে।

তুমি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, শূন্যবাদীর শূন্য, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত।

তুমি অভেদবাদীর এক, প্রভেদবাদীর বহু, দ্বৈতবাদীর দুই।

তুমি কি নও? তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, সংসারী, ব্রহ্মচারী। তুমি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত।

তুমিই আমার একমাত্র।

সার তুমি বস্তু তুমি প্রয়োজন তুমি। তুমিই আমার ঘর-বাড়ি মাঠ-আকাশ সাগর-পর্বত। আমার সমস্ত ভালোবাসা স্তবস্তুতি কথনকীর্তন—সব তোমার।

তুমি দুর্বলের বল, দুঃখীর দরদী, দরিদ্রের ধনরত্ন।

তুমি নিরাকুল শান্তি, নিরাময় ক্ষমা, নিরঞ্জনা সান্ত্বনা।

তুমি মধুরে সর্বতোমধুর।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥

বেণুর্মধুরো বেণুর্মধুরো
পাণির্মধুরং পাদৌ মধুরৌ।

নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং ।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥

হে অমৃতের পুত্রগণ, যারা দিব্যধামে আছে, শোনো। জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে আমি জেনেছি।

তিনি সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপারে বিরাজমান।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

সেখানে সূর্য দীপ্তি পায় না, না বা চন্দ্রতারা। বিদ্যুৎও সেখানে ম্লান। আর অগ্নিই বা কোথায়!

তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান। তাঁর আলোকেই সমস্ত বিভাসিত।

ভূমিকা

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন, জেনেছেন, প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানুভু।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকেও তেমনি সুন্দর। তত্ত্বের তাৎপর্য না বুঝি কাব্যের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই।

সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে। বিহিত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ কবি।

পূজার শেষে যেন প্রসাদী ফুল হতে পারি বনের ফুলের এই শুধু নিবেদন।

অচিন্ত্যকুমার

১

'আমাকে রসে-বশে রাখিস, মা। আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।'

এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা। এই হচ্ছে নিত্যকালের কবির প্রার্থনা। রস চাই, সঙ্গে-সঙ্গে বশও চাই। আবেগ চাই, সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সংযম, শৃঙ্খল! ভাবের সঙ্গে চাই রূপ, সীমা, সৌষ্ঠব। নিবিড়তার সঙ্গে পরিমিতি।

নদীর আরেক নাম রোধবতী। তার বেগ আছে সেই সঙ্গে আবার রোধ আছে তীর আছে। তট আছে বলেই সে তটিনী। যদি তার তীরের বন্ধন না থাকত সে হত বন্যা। আর যদি তার তরঙ্গ-রঙ্গ না থাকত সে হত পল্বল। রস যদি অ-বশ হয়, তাহলে যা—বশ যদি বিরস হয় তা হলেও তাই। ফল একই, অর্থাৎ কোনোটাই কবিতা হয় না। একটি তৈলস্নিগ্ধ পলতেতে আগুনকে বন্দী করতে পারলেই সে মসৃন দীপশিখা হয়ে ওঠে, নইলে হয় সে স্ফুলিঙ্গ, নয় সে দাবানল। দীপশিখাটিই কবিতা।

রসে গাঢ় বশে দৃঢ়—শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। রসে সিক্ত বশে শক্ত—কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।

উদার অর্থে, কবিতা কাকে বলে? অল্প কথায়, কবিতা হচ্ছে একটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে রসে জ্বাল দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝংকার—এ সব বসন-ভূষণ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়। বৃক্ষের বল্কল-পল্লব মাত্র, নয় পুষ্পবস্তু। প্রাণের আসল দীপ্তিটি চর্মে নয়, চক্ষে। দেখ কতদূর পর্যন্ত সে তাকায়, অন্তরের কোন সুগহন অন্ধকার পর্যন্ত। দেখ একটি চকিত নেত্রপাতে কেন অতলতলের অন্ধকার তা আলোকিত করে!

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কাঠামোটি গদ্য। গদ্যে যে কবিতা হয় এতে আর দ্বৈধ নেই। আর, সে-গদ্য রোদ্দুরে ঝলসে-ওঠা ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে। তীরের মত তীক্ষ্ণলক্ষ্য। দূরবেধী। যা মাত্র ব্যক্ত তার সীমা পেরিয়ে একটি অব্যক্তের প্রতি ইশারা। গোচর পেরিয়ে গভীরের দিকে। যা মাত্র স্পষ্ট তার কায়ার ঊর্ধ্বে একটি ছায়াময় রহস্যরাজ্যের প্রতি নির্দেশ। বিদিত ছেড়ে অবিদিতের দিকে। মৃন্ময় ছেড়ে চিন্ময়ের।

কণাটি হয়তো শিশিরের, কিন্তু উৎস আকাশ। বিন্দুটি অশ্রুর কিন্তু বেদনা ভুবনপ্লাবী। ডাকটি একাক্ষর 'মা'; কিন্তু আর্তি দিগন্ত পর্যন্ত। অঙ্কুরটি ছোট কিন্তু তার মধ্যে দীর্ঘজট বট প্রচ্ছন্ন। বাক্যটি লঘু কিন্তু তার মধ্যে ভাবের বিস্ফোরণ। নিরীহ শুকনো কাঠ, কিন্তু আসলে অগ্নিমন্থ। শ্বেত-শান্ত একটি শঙ্খ, তাতে স্তব্ধ হয়ে আছে সমুদ্রের আহ্বান। আর এইখানেই তো কাব্যের প্রকাশ। অল্পের মধ্যে অতিশয়ের সংবাদ। প্রত্যক্ষের মধ্যে পরোক্ষের পরিচয়। নিকটের মধ্যে সুদূরের উপস্থিতি। নিরর্থকের মধ্যে অমূল্যের আবিষ্কার।

যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' ততক্ষণ পর্যন্ত গদ্য। যেই 'তুমি' এলে অমনি হল কবিতার জন্ম। যতক্ষণ আমি ততক্ষণ বন্ধ। যেই তুমি এলে অমনি ছন্দ বেজে উঠল। আমি তোমার 'সহিত' হলাম।

২

তাই যার সত্যিকার সাহিত্য, সেই নিত্যকার কবি। সাহিত্য মানে কি? সাহিত্য মানে সহিত-ত্ব। সাহিত্যের মধ্যে যে তত্ত্বটি নিহিত আছে সেটা হচ্ছে 'সহিতে'র তত্ত্ব; মানে, মিলিত হওয়া সংযুক্ত হওয়ার তত্ত্ব। কিন্তু কার সঙ্গে মিলন? কার সঙ্গে সংযোগ?

উত্তর বিশেষ কঠিন নয়। সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে, সমস্ত সংসারসৃষ্টির সঙ্গে, সমস্ত প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে। যা কিছু দৃশ্য জ্ঞেয় স্পৃশ্য গ্রাহ্য ভোগ্য আস্বাদ্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধের সঙ্গে। গম্য ও গোচর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের সঙ্গে। শুধু স্বসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেই নয়, মানে, আত্মসুখ বা আত্মক্রীড়া বা আত্মরতির সঙ্গেই নয়, এই অন্তরঙ্গতা পরসংবেদ্য জিনিসের সঙ্গেও। তার মানে, আমার আশে-পাশের প্রতিবেশী মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উত্থান-পতন বঞ্চনা-বিক্ষোভের সঙ্গে। এই সংসর্গ প্রতিটি ধূলিকণা প্রতিটি মুহূর্তকণা সংসার-সমুদ্রে ঘটনা-তরঙ্গের প্রতিটি ফেণকণার সঙ্গে। বিশ্বসৃষ্টিতে কিছুই যেন পরিত্যক্ত হয়নি, উপেক্ষিত হয়নি, সাহিত্যেও তেমনি সমগ্রের জন্যে সমুদয়ের জন্যে উদার নিমন্ত্রণ প্রসারিত। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য মেধ্য-অমেধ্য সকলের জন্যে সমান ছায়াসত্র। অভিজাত-অপজাত কুলীন-অকুলীন পাঙক্তেয়-অপাঙক্তেয় সকলের জন্যে নিরপেক্ষ গণতন্ত্র। যেমন সৃষ্টিতে তেমনি সাহিত্যেও পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজ, কামের সঙ্গে প্রেম, বাসনার সঙ্গে বৈরাগ্য। মোটকথা, জীবনের বীণায় যত সুর ওঠে, কড়িতে আর কোমলে, ধৈবতে আর গান্ধারে—সমস্ত সুরের সম্পূর্ণতা এই সাহিত্যে। সাহিত্য কিছুই বর্জন করে না, অস্বীকার করে না, পরিহাস করে না, প্রত্যাখ্যান করে না—না ব্যক্তিতে না সমাজে। খণ্ডকালের সমস্ত খণ্ডতা, সমস্ত ক্রমবাহিতার দিকে সে চোখ রাখে। ঘটনার সঙ্গে সে পা মিলিয়ে চলে, সমাজ সম্বন্ধে সে সক্রিয়সচেতন হয়, ইতিহাস সম্বন্ধে সে জাগ্রতদৃষ্টি উদ্যতমুষ্টি হয়ে ওঠে। সে শুধু কালিতে কলম ডুবিয়ে লেখে না, সে লেখে স্বেদে ক্লেদে শোণিতে কলম ডুবিয়ে। যারা লেখনিক, তারা সৈনিক, আর এই অমোঘ লেখনীই তাদের হাতের অব্যর্থ অস্ত্র। শাণিত শায়ক।

কিন্তু এইখানেই কি সাহিত্যের শেষ? এইটুকুই কি সাহিত্যের পরিধি? না, আরো আছে। সৈনিকের পরে আছে আবার একটি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে আরো একটি ইন্দ্রজাল। বস্তুবাদের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মচেতনার সংবাদ। ইদানীন্তনের ওপারে চিরন্তনের ইঙ্গিত। খণ্ডকালের উপরে একটি নিত্যধামের

অস্তিত্ব। সীমান্বিতা পৃথিবীর ওপারে অন্তহীন নীলাম্বর। তাই আবার 'সহিতত্ব' চাই ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে, সনাতনের সঙ্গে। নিত্যধ্রুবনির্বিকল্পের সঙ্গে। শুধু ভূমিকে আশ্রয় কবে থাকলেই চলবে না, আশ্রয় করতে হবে ভূমাকে। শুধু গম্য ও গ্রাহ্যকে নিয়ে থাকলেই চলবে না, যেতে হবে গোপনের দিকে গভীরের দিকে, গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠের দিকে। ইদানীন্তনের সঙ্গে মেশাতে হবে চিরন্তনকে। যা ইদানীন্তন তা হচ্ছে সংবাদ, যা চিরন্তন তা-ই সত্য। আর, সাহিত্য শুধু সংবাদ নয়, শুধু সত্যও নয়—দুয়ে মিলে সাহিত্য হচ্ছে সত্যের সংবাদ। এই সত্যের সংবাদটি যিনি সুন্দরের থালায় পরিবেশন করবেন তিনিই কবি।

আরো একটু বিশদ হই। পৃথিবীতে অনেক কান্না, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সমস্ত কান্না ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছি একটি হাসির শব্দ, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু কান্নাতেই ক্ষান্ত হবে না, আনবে সেই হাসির ইশারা—যে আনন্দময়ের থেকে এই হাসি উৎসারিত আনবে সেই আনন্দময়ের স্পর্শ। পৃথিবীতে এত মৃত্যু সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সমস্ত পূতিগন্ধ ছাপিয়ে আমাদের ঘ্রাণে ভেসে আসছে একটি প্রগাঢ় পুষ্পসৌরভ, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু এই ক্লিন্ন পূতিগন্ধেই নিমগ্ন থাকবে না, আনবে একটি পবিত্রগাত্র সুগন্ধময়ের সান্নিধ্য। পৃথিবীতে আছে অনেক ক্ষুধা আর বঞ্চনা, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সেই ক্ষুধা ও বঞ্চনার ঊর্ধ্বে দেখতে পাচ্ছি একটি সুধাময় অতলস্পর্শ তৃপ্তি, সেইটিই হচ্ছে সত্য। তাই সাহিত্য শুধু ক্ষুধা আর বঞ্চনার হাহাকারই হবে না, দেখাবে একটি অনির্বচনীয় প্রসন্নতা, সহজলভ্যের মধ্যে দেখাবে একটি দুর্লভ আবির্ভাব। ক্ষণকালের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে খুলে দেবে সে নিত্যকালের সিংহদ্বার। মানুষকে সে এক-বেলার কাঙালী ভোজের আসরে ডাক দিয়ে ফিরবে না, তাকে সে ডাক দেবে অনন্তকালের অমৃতভোজের নিমন্ত্রণে।

সংবাদপত্রে মানুষের চেহারা পরাভূতের চেহারা, প্রবঞ্চিতের চেহারা। সাহিত্যেই মানুষ চিরজয়ী, আদিত্যবর্ণ অমৃতপুত্র। সাহিত্যেই তার সত্য পরিচয়, অবিকৃত কুলকীর্তি। তাই সাহিত্য হবে না শুধু বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কার, সাহিত্য হবে পূজার মন্ত্র, সুন্দরের পূজায় আনন্দ-মন্ত্র। তাই সাহিত্য অর্থ, শেষ পর্যন্ত, সেই আনন্দময়ের সহযোগ।

এই অভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর। এই বিশ্বসৃষ্টিটা মানুষের কাছে লেখা ঈশ্বরের একটি প্রেমপত্র। আর মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার প্রত্যুত্তর। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের সুরসম্ভাষণ, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ঈশ্বরের কান্তিগৌরব, সাহিত্য হচ্ছে তার প্রতিচ্ছায়া আমি যেমন আমার লেখার স্রষ্টা তেমনি এই বিশ্বরচনার কি কেউ স্রষ্টা নেই? আমি গ্রন্থকার হয়ে মানব না এই বিশ্বরচকের গ্রন্থকর্তৃত্ব? আমি আছি আর তিনি নেই?

৩

তিনি আছেন। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। কবি হচ্ছেন বেদবিৎ, বিদ্বান, কোবিদ, বিপশ্চিৎ। কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। যিনি শেষ পর্যন্ত দেখেন। অতিক্রম করেও দেখেন।

কবির আরেক অর্থ সবিতা। জনয়িতা রচয়িতা। যার থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম। সমস্ত কিছুর যাত্রা। সমস্ত কিছুর ভূমিকা। আদিকবি ঈশ্বর। তাকিয়ে দেখ একবার চার দিকে, নক্ষত্রখচিত আকাশ, কানন-কুন্তলা পৃথিবী, গহনভয়াল অরণ্য, উদার-উদ্বেল উদধি। দেখ কেমন বিরাট তোমাকে বেষ্টন করে রয়েছে। একদিকে তুষারকিরীটী বিশাল পর্বত, অন্য দিকে কল্লোলিনীবল্লভ সমুদ্র। দেখ কেমন শ্যামল শস্যাঢ্য প্রান্তর, আবার দেখ দলিতাঞ্জন ঘননীল মেঘপুঞ্জ। দেখতে পাচ্ছ না একটি বিচিত্র বিন্যাস, একটি নিপুণ গঠনসজ্জা? কত গাছ কত ছায়া, কত ফুল কত রঙ, কত পাখি কত ডাক, কত জল কত সুর—দেখতে পাচ্ছ না একটি অনবদ্য ছন্দ, একটি অবিচ্যুত শৃঙ্খলা? ঋতুর পদপাতে দেখেছ কখনো বিন্দুমাত্র যতিপাত? চার দিকে পাচ্ছ না কি একটি প্রেম-প্রসন্ন রসপ্রকাশ? হচ্ছে না কি একটি গভীর অর্থবোধ?

সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণও কবি। যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে। সুষমান্বিত বিন্যাসে। অক্ষুণ্ণ একটি অর্থের দ্যোতনায়।

কিন্তু রামকৃষ্ণ গোড়াতেই বলেছেন, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' যতক্ষণ পেটে অন্ন নেই, ততক্ষণ সংসারে রস নেই, আর যতক্ষণ রস নেই ততক্ষণ ঈশ্বরও নেই। যতক্ষণ মানুষ রসহীন ততক্ষণ সে জড়পিণ্ড, ততক্ষণ সে যন্ত্রায়িত। যতক্ষণ তার পেটে রুটি নেই ততক্ষণই চাঁদ ঝলসানো রুটি; যতক্ষণ তার মাঠে ধান নেই ততক্ষণই চাঁদ কাস্তে। অজন্মা বা অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে কিন্তু ভাবের শেষ নেই। রোষ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু রস অফুরন্ত। খিদে জুড়োয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।

আমি ক্ষুধার্ত, বঞ্চিত, পীড়িত, পরাভূত এই কি আমার চিরকালের পরিচয়? আমি ঈর্ষী ঘৃণী অসন্তুষ্ট, এই কি আমার আত্মনির্ণয়? আমি দৈন্য-দীর্ণ সংকীর্ণ অশান্ত উদ্ধত—এতেই কি আমার তৃপ্তি? নিজের মাঝে খুঁজে পাব না বৃহতের সত্তা, ইয়ত্তাহীন আয়তন? নিজেকে কোনোদিন ভাবব না অপরূপ বলে? তাই দৈন্যদুঃখদুরিত একচেটে নয়। খিদে একদিন মেটে। সেদিন আবার মনে হয় খিদে মিটলেই তৃষ্ণা যায় না। অন্ন পেলে জোটে আবার অন্য ক্ষুধা। পরমান্নের লোভ। মনে হয় সে প্রসাদের পাত্র এই সমস্ত সৃষ্টি, তারাকণা থেকে ধূলিকণা। মনে হয় এ অমৃতে আমার জন্মগত অধিকার। আমি শুধু অন্নাধীন নই আমি পরমান্নভোজী। তাই 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'-র, পরেই অন্য চিন্তা পরাৎপরা। তখন, সেদিন, চাঁদকে মনে হয় শিশুর হাসি, প্রিয়ার মুখ, মা'র

স্নেহধারা। রাত্রিকে মনে হয় শ্রীসৌন্দর্যসুধানদী। শুধু রুটি নয়, রুচি চাই—যে রুচি-র মানে হচ্ছে দীপ্তি দ্যুতি কান্তি প্রীতি, লালিত্য লাবণ্য! তখন এই শুধু বলতে ইচ্ছে করে :

'মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক॥'

ঠিকই তো, যতক্ষণ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা', রামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, ততক্ষণ 'কালিদাস বুদ্ধিহারা'। কিন্তু ভাত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে কালিদাস যখন তার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন সে আবার চমৎকৃত হবে। তখন সে বুদ্ধির সীমা ছেড়ে চলে এসেছে অনুভবের অসীমায়। প্রমিতি ছেড়ে অপরিমিতিতে। তর্কের ধুলিজাল ছেড়ে বিশ্বাসের শ্যামলতায়। সন্ধান ছেড়ে সিদ্ধান্তে। প্রমা ছেড়ে প্রেমে। যখন ভালোবাসার আলো আসে তখন বুদ্ধির মোমবাতিকে ফু দিয়ে নিবিয়ে দিতে হয়। তখন রামকৃষ্ণের মতই দেখি, 'চাঁদমামা সকলের মামা।'

ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর। সকলের আপন। সকলের একলার।

অল্পযায়ী বুদ্ধির আলোটি নিবিয়ে দিলেই আসবে সেই স্পর্শানুভবের জ্যোৎস্না। ঘর ভরে দেবে। সংসারাঙ্গন ভরে দেবে। দিকদেশ-মণ্ডল শুচি হবে স্নিগ্ধ হবে তার ধারাস্নানে।

রসো বৈ সঃ। তিনি সর্বব্যাপী পরমানন্দ। সর্বত্র তাঁর প্রসারিত প্রসন্নতা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছেন। আমাদের অমরত্বের, বিজয়-বীরত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি কবি নন তো কে কবি!

৪

গাঁয়ের পাঠশালায় পড়েছিলেন কদিন। নিজের নাম সই করতে পারতেন। সাত টাকা মাইনের কালী-ঘরের পুজুরী ছিলেন। মাইনে নেবার সময় খাজাঞ্চির খাতায় দস্তখত করতেন। তাও বা কদিন।

বাঙালা দেশে শুর-সুরীদের রাজত্ব তখন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহেন্দ্র সরকার। যে এসেছে সে-ই তাঁর বাক্যের কাব্যামৃত আস্বাদ করে গেছে। পান করেছে, স্নান করেছে সেই সুধা-সাগরে।

রামকৃষ্ণ নিজেও অবাক, কি করে এত কথা জুটেছে আমার ঝুলিতে? পুরাণ-পুঁথি পড়িনি, শাস্ত্রের নিশ্বাস আমার জানা নেই। কি-করে সমানে-সমানে আলাপ করব ওদের সঙ্গে? তবু ভয় নেই, দ্বিধা নেই, কুণ্ঠা নেই এতটুকু। সে ভাবটুকুও বলছেন উপমা করে : 'মা আমার পেছনে থেকে রাশ ঠেলে দেন।'

ধান মাপবার সময় একজন মাপে আরেক জন রাশ ঠেলে দেয়। হাটে কোথাও দেখেছিলেন কয়ালের কারবার। মনে করে রেখেছেন।

'মা'র যদি একবার কটাক্ষ হয় তা হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে ?'

কথাটি কটাক্ষ, কৃপা নয়। কটাক্ষ মানে অপাঙ্গ দৃষ্টি। কবিতার দিক থেকে কৃপার চেয়ে অনেক জোরদার।

উপমা রামকৃষ্ণস্য। উপমা কালিদাসস্য ছিল। সেটা বদলে গেছে। সর্বাঙ্গশোভনা বপুষ্টমা উপমা। শুধু বাইরের ব্যাপার নিয়ে নয়, ঘরের বিষয় নিয়ে। বৈচিত্র্যের সঙ্গে এত সুষমা আর কোথায় দেখেছি ! কোথায় এত সূক্ষ্মতা, চারুতা, প্রসাদরম্যতা ! শুধু কল্পনা নয়, পর্যবেক্ষণ। নির্বাচনে এত বৈশিষ্ট্য। ঘরোয়া জিনিস, অথচ টাটকা। সোজা কথা, অথচ শক্তিশালী। শাদামাটা ছবি অথচ বর্ণাঢ্য।

ব্রহ্ম কি ? কে বলতে পারে ? কে পেরেছে বলতে ?

কিন্তু এক কথায় বলা যায়। তাই বলেছেন রামকৃষ্ণ।

'ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

আর সব কিছুরই সংজ্ঞানির্ণয় হয়েছে, হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা-বক্তৃতা। শুধু ব্রহ্মই কারু মুখ থেকে বেরিয়ে আসেনি। কেউ বলতে পারেনি সে কেমন, সে কি, সে কেন ? তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তবু চারদিকে বাক্যের ছড়াছড়ি। সে অনুচ্চার্য, অনির্বচনীয়। কেউ বলবে সে অবাঙমনসোগোচর। সে নির্বিকার নিরাধার। সর্বাত্ম সর্বসাক্ষী। কত কথা, কত গুণ-কীর্তন। তবু তার ইতি নেই। আয়ত্তিতে নেই। সে স্ব-প্রকাশ হয়েও অ-প্রকাশনীয়। বহুভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছে অনেকে। যে অবর্ণনীয় তাকে নিয়ে অনেক বর্ণলিপি। রামকৃষ্ণ তাকে এক কথায় ব্যক্ত করেছেন। যে অপরিমেয় তার একটি পর্যাপ্ত অর্থ দিয়েছেন। 'ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।' ব্রহ্ম কোনো দিন এঁটো হয়নি। কোনো রসনা স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। কারু সাধ্য নেই যে দন্তস্ফুট করে।

বিদ্যাসাগরকে একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে ছেলে দুটিকে আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বছর পর শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল। বড় ছেলেকে জিগগেস করলেন বাপ, ব্রহ্ম কেমন বল দেখি। বেদ থেকে নানা শ্লোক আওড়ে বড় ছেলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। যখন ছোট ছেলেকে জিগগেস করলেন বাপ, সে কিছুই বললে না, হেঁটমুখে চুপ করে রইল। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।'

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর কার এত সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী উক্তি আছে যা এতখানি অর্থ ধরে ! কিন্তু ব্রহ্ম তো লাভের বস্তু, উপলব্ধির বিষয়। যে তাকে দেখেছে, জেনেছে, পেয়েছে, সেও কি তাকে বর্ণনা করতে পারবে না ? সেও না। কেননা সে তখন 'লবণ পুত্তলিকা।' অপূর্ব একটি ছবি এঁকেছেন রামকৃষ্ণ। 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যেই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দেবে ?'

প্রেম মিশে গেল প্রেমের সঙ্গে। চোখের জল চোখের জলের সঙ্গে। তখন আর

পৃথকত্ব কোথায় ? বিরহ-বিপ্রয়োগ কোথায় ? তখন আর আমি-তুমি নেই। তখন একমাত্র তিনি। এই কথাটিই আবার অন্য ভাবে বলেছেন : 'আগেকার লোক বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না।'

তীরে দাঁড়িয়েই দর্শন-স্পর্শন করো। সমুদ্রে নেমেছ কি তলিয়ে গেছ। ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গস্পর্শের আনন্দের একটু আভাস দাও।

রামকৃষ্ণ আবার একটি প্রতীক অবলম্বন করলেন। বললেন, 'যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ঘি কেমন খেলে ? তাকে এখন কি করে বোঝাবে ? হদ্দ বলতে পারো, কেমন ঘি, না যেমন ঘি।' বলেই একটি গল্প ফাঁদলেন : 'একটি মেয়েকে তার সঙ্গিনী এসে জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে তোর স্বামী এল, তার সঙ্গে তোর কেমন আনন্দ হল ? মেয়েটি বললে, ভাই, এ বলে বোঝানো যায় না। তোর যখন স্বামী হবে তখন তুই জানতে পাবি।'

ঈশ্বরের আনন্দটি বোঝবার জন্যে মানুষের দেহী কল্পনার চরম আনন্দকেই বেছেছেন রামকৃষ্ণ। খাদ্যের মধ্যে নিয়েছেন ঘি, চরম সারবস্তু। সংস্কারমুক্ত উদার কবিত্বের ব্যঞ্জনা এইখানে। যে ব্রহ্মময় সে পূর্ণ। আর, যে ভরপুর সে আর কথা কয় না। যতক্ষণ প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণ কোলাহল। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। শিবনাথ শাস্ত্রী যতক্ষণ সভায় আসেনি ততক্ষণই তাকে দেখবার জন্যে হট্টগোল, যেই সে এল অমনি তাকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেল। এই পূর্ণতার কথা স্তব্ধতার কথাটি বলেছেন নানা উপমায়।

'ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই বলকলানি। পাকা ঘিয়ের শব্দ নেই। তেমনি, যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। আবার, পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভকভক শব্দ করে। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না।'

তপ্ত ঘিয়ের শব্দ, ভ্রমরের ঝঙ্কার আর পূর্ণায়মান কলসীর কলরব। তিনটি বিচিত্র ধ্বনি শুনছি কান পেতে। কিন্তু সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দেবার জন্যে আবার যখন নেমে আসে তখন কথা কয়। কি রকম শব্দ হয় তখন ?

'যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর-একবার ছ্যাঁক-কল-কল করে। মধু খেয়ে মাতাল হবার পর কখনো আবার গুনগুন করে মৌমাছি। ভরা কলসী থেকে যদি আরেক কলসীতে ঢালাঢালি হয় তা হলে আরেকবার শব্দ ওঠে।'

বেদ-পুরাণে যে বলেছে ব্রহ্মের কথা, সে কেমনতরো জানো ? উপমা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'একজন সাগর থেকে আসার পর যদি তাকে জিগগেস করা হয়, সাগর কি রকম, তখন সে যদি বলে, ও কী হিল্লোল-কল্লোল দেখলুম, ব্রহ্মের কথাও সেই প্রকার।'

৫

এই বাহ্য আগে কহ আর। ব্রহ্ম অস্তি-নাস্তির মধ্যে থেকেও অস্তি-নাস্তির বাইরে। নেতি-নেতি করে এগুতে হয় তার দিকে। ব্রহ্ম কি মাটি? না। ব্রহ্ম কি আকাশ? না। ব্রহ্ম কি সূর্য? না। ব্রহ্ম কি সমুদ্র? না। এমনি 'না'-র সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যাও পরমতম অস্তিমতম 'হাঁ'-র ছাদের দিকে। এমনি বর্জন করতে-করতে অর্জন করো। এটি বোঝবার জন্যে সুমধুর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণ। একটি ঘরোয়া ছবি। অনবদ্য কবিতা।

'একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। সঙ্গে সমবয়স্ক কয়েকজন ছোকরা। বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে মেয়ে আর তার সমবয়সী সখীরা তাদের দেখছে। সখীরা বরকে চেনে না। একজনকে দেখিয়ে সখীরা বলছে মেয়েটিকে ঐ কি তোর বর? মেয়েটি হেসে বলছে, না। আরেকজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি? উঁহু। আবার আরেকজনকে দেখছে। আবার অস্বীকার। এমনি জনে-জনে। শেষকালে ঠিক-ঠিক বরকে লক্ষ্য করে বলছে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেইখানে চুপ।'

নেতি-নেতি করে যেখানে মনের শান্তি হয় সেইখানে ঈশ্বর। যেখানে আর প্রশ্ন নেই, সাক্ষী-প্রমাণ নেই, যেখানে মীমাংসার মৌন, সেখানে ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরেকটি কাহিনী গেঁথেছেন রামকৃষ্ণ। উজ্জ্বল একটি কল্পনার অলকা।

'সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। বন্ধুকে নিয়ে একজন গিয়েছে রাজদর্শনে। প্রথম দেউড়িতে গিয়ে দেখে একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ অনেক লোকলস্কর নিয়ে বসে আছে। খুব জাঁকজমক। লোকটি তার সঙ্গীকে জিগগেস করলে, এই কি রাজা? সঙ্গী ঈষৎ হেসে বললে, না। প্রথম দেউড়ি পার হয়ে দ্বিতীয় দেউড়ি। সেখানেও পূর্ববৎ। যত এগিয়ে যায়, দেখে, ততই ঐশ্বর্য। একে-একে সাত দেউড়ি পার হয়ে গেল। তখন যাকে দেখলে তার ঐশ্বর্যের আর তুলনা নেই। তখন লোকটি দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে। সঙ্গীকে আর প্রশ্ন করতে হল না। বুঝলো, এই রাজা। সন্দেহের আর অবকাশ নেই এক তিল।'

আর সকলকে চিনতে দেরি হয়, ঈশ্বরকে চিনতে দেরি হয় না। আর সকলকে চিনিয়ে দিতে হয়, ঈশ্বরকে চিনিয়ে দিতে হয় না। বিরহানলের প্রদীপটি যখন জ্বলে তখনই আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মুখচন্দ্রিকা ঘটে।

'নেতি-নেতি'র আরো একটি গল্প আছে রামকৃষ্ণের: 'চোরেরা খেতে ফসল চুরি করতে আসে। তাই মানুষের চেহারা করে খড়ের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে মাঝখানে। তাই দেখে চোরেরা ভয় পেয়েছে। কোনোমতে ঢুকতে পারছে না। তখন এক চোর গুটি গুটি পায়ে কাছে গিয়ে দেখে এলো খড়ের ছবি। বললে, ভয় নেই, মানুষ নয়, খড়। তবু চোরেরা আসতে চায় না। বলে, বুক দুর-দুর করছে। তখন আগের চোরটা খড়ের ছবিটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলতে লাগল,

নেতি, নেতি। এ কিছু নয়—নয়, এ কিছু নয়।'

তেমনি বস্তু এসে দাঁড়ায় পথের সামনে। যখন লোভ হয় তখন ভয়ও হয়। কিন্তু একবার বলো সাহস করে আমি বস্তু চাই না, উপকরণ চাই না, আমি সত্যকে চাই। আমি ত্যাগের পথ দিয়ে সত্যের সন্ধানে চলেছি। কলির কালরাত্রি থেকে চলেছি সত্যের সুপ্রভাতে। সত্যের কল্যাণালয়ে। মৃত্যুই কলন বা কলি। মৃত্যুই ভয়মিশ্রিত। সত্যই অভয়, সত্যই অমৃত, সত্যই ব্রহ্ম। যা তিনকালে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, যার ধ্বংস নেই, উৎপত্তি নেই, বিকার নেই, পরিবর্তন নেই, চলেছি তারই অভিসারে। দীপাধার চাই না, চাই সেই দীপবহ্নিকে। মেদমজ্জা মাংসচর্ম চাই না, যিনি প্রাণরূপে প্রতীয়মান তাঁকে চাই। কত কি চোখের সামনে দাঁড়াবে এসে ছদ্মবেশে। বললে, আমার দিকে তাকাও। বলব, তাঁকে যখন দেখব তখন শুধু একদিকে দেখব না। দরকার হবে না কোনো ঘোষণার। শিশুকে বলে দিতে হবে না এইটিই তার মা। তার মা সুপ্রকাশ, সন্নিহিত। 'আবিঃ সন্নিহিতং'। যা আছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে তাই সত্য। 'অস্তীতি ভাতীতি চ সত্যং'। হে ছদ্মধারী, তুমি নও, তুমি নেই, তুমি নেতি।

৬

কিন্তু নেতি-নেতি করে যেখানে এসে পৌঁছুব সেখান থেকে আবার ইতিকে দেখতে হবে। আত্মাকে ধরে তাকাতে হবে আবার পঞ্চভূতের দিকে। সেই কথাটিই আবার বলেছেন রসায়িত করে: 'ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে-একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে জিনিসে ছাদ তৈরি—ইট চুন সুরকি—সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈরি। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই আবার জীবজগৎ, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। যিনি আত্মা তিনিই আবার পঞ্চভূত।'

এই ভাবটির আরেকটি রূপ দিয়েছেন: 'সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। নি-থেকে আবার সা-তে নেমে আসতে হয়। ব্রহ্ম থেকে আবার জীবে।'

শুধু একের মধ্যে নয়, প্রত্যেকের মধ্যে, সকলের মধ্যে, সকলের মধ্যেই তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু সেই এককে না জেনে অনেককে চিনব কি করে? তাই জ্ঞানের শিখর থেকে নেমে আসতে হবে প্রেমের নির্ঝরিণীতে। সমতল নিম্নভূমিতে। সর্বানুভূ রয়েছেন বিরাজমান এ বোধ না জন্মালে সর্বভূতে তাঁকে দেখবো কি করে? যিনি আপ্তিতে আছেন তিনি ব্যাপ্তিতেও আছেন। যত বিস্তৃত করে তাঁকে দেখব ততই আমার আনন্দের পাত্রটি গভীর হবে। তাঁকে যদি সর্বত্রই না দেখি তবে বিশ্ববোধের মহাঙ্গন ছেড়ে চলে এলাম ক্ষুদ্র-বুদ্ধির অন্ধকূপে। আমার জ্ঞানস্বরূপ কি বিজনবাসী একচর? কিন্তু তাঁকে জানি এমন সাধ্য কই?

চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ে গিয়েছিল বেড়াতে। তার গল্প ফাঁদলেন রামকৃষ্ণ :

'চিনির পাহাড়ে এক পিঁপড়ে গিয়েছিল। একদানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে, এবারে এসে পাহাড়টা সব নিয়ে যাব।'

ঈশ্বর চিনির পাহাড়, আমরা পিঁপড়ে। অতুলন উপমা। তিনি রসস্বরূপ, আমরা রসপিপাসু। কিন্তু সেই রসের সরসীর কি তল পাব, না, কূল পাব? আর, অনন্তকে জানারই বা আমার কি দরকার!

দরকারও নেই। তাই এ নিয়ে আরেকটি কবিতা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে এ মাপবার আমার কী দরকার? আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসেবে আমার লাভ কি!' আবার তেমনি : 'বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। কত ডাল কত পাতা এ সব হিসেবের দরকার নেই।'

একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি তাঁকে মনে পড়ে যায়, যদি জীবনের কোনো একটি নির্জন স্থানে এসে তাঁর উপর ভালোবাসা আসে, তা হলেই হল। ভালোবাসাই আলো জেলে পথ দেখিয়ে দেবে। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। বিচার করে কি হবে? বিচার করে কি পথ পাব? আমরা যখন ভালোবাসি তখন কি বিচার করে ভালোবাসি? সেই তো নিরন্তর প্রার্থনা। প্রেম-বারি বর্ষণ করো। ঢালো তোমার অমৃতবিন্দু। লতা-পাতা তৃণ-গুল্ম বনরাজি সব শুকিয়ে গেল। পিপাসায় মরে গেল আমার আত্মবল্লী, জল দাও। এই বিচারের কথাই বলতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছেন এক কথায় : 'আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি। আমার এমন কখনো ইচ্ছে হয় না যে বলি, আমি ব্রহ্ম। আমি বলি তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস। আমি তাঁর নামগুণগান করব এই আমার সাধ।'

কত সহজ করে বলেছেন কথাটি। আরো সহজ করেছেন এ কটি কথায় : 'বেশি বিচার করতে গেলেই সব গুলিয়ে যায়। এ দেশের পুকুরের জল উপর-উপর খাও, বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়।'

তাই বিচার নয়, বিশ্বাস। তর্ক নয়, প্রেম। বলেছেন, 'বিচার যেখানে থেমে যায় সেইখানে ব্রহ্ম'—তারপর একটি অভিনব উপমা : 'কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।'

এই ভাবটিকে আবার আটপৌরে চেহারা দিয়েছেন : 'বিচার বন্ধ হলেই দর্শন। তখনই মানুষ অবাক, সমাধিস্থ। থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে—এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দা উঠে যায়, সব গল্পটল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই তখন মগ্ন হয়ে থাকে।'

তোমাকে যখন দেখি তখন শুধু চেয়ে থাকি তোমার মুখের দিকে। তুমি কী সুন্দর এই কথাটুকুও আর বলতে হয় না। সেটুকুও অনাবশ্যক হয়ে যায়।

তুমি সুন্দর বলেই তো আমার চোখ খুলল। তুমি সুন্দর বলেই তো এত আলো জ্বলল দিনে-রাত্রে! ঘৃতের দীপ জেবলে মন্দিরের-অন্ধকারে দেবতাকে দেখেছি। আজ অন্তরের স্থিরধামে প্রেমের পূণ্য আলোতে তোমাকে দেখি। প্রেমেই সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার শান্তি।

৭

এখন, এই ব্রহ্মের স্বরূপটি কি? উপমার পর উপমা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ।

'ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যেমন সূর্য। শিষ্টের উপর যেমন আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও তেমনি আলো দিচ্ছে। সূর্য নির্বিকার। যেমন আগুন। আগুনে যে রঙের বড়ি দেবে সেই রঙ দেখা যাবে। লাল বড়ি দিলে লাল, নীল বড়ি দিলে নীল। আগুন নির্গুণ। যেমন বায়ু। ভালোমন্দ সব গন্ধই সে নিয়ে আসে। বাতাস উদাসীন। যেমন সাপ। সাপের মুখে বিষ আছে। সর্বদা সেই বিষ মুখ দিয়ে খাচ্ছে, ঢোঁক গিলছে, কিন্তু সাপ নিজে মরে না। যাকে কামড়ায় সেই মরে।'

ব্যাসদেবের একটি গল্প বললেন এইখানে।

গল্পে রামকৃষ্ণের দুর্লভ কৃতিত্ব। শুধু বিষয়ের মূল্যে নয়, বলবার কৌশলে। একটি ছত্রকেও ফেলা যায় না সে বর্ণনা থেকে। শেষ লাইনটি না আসা পর্যন্ত তাঁর গল্পের শেষ নেই। গল্পের প্রাণ যে বিস্ময় থেকে বিচ্ছুরিত সেই আশ্চর্য চমকটি হীরের আলোর মত ঠিকরে পড়ছে। সেই চমকটুকুতেই তীক্ষ্ণ হয়েছে সংকেত। রামকৃষ্ণ শুধু কবি নন, তিনি শিল্পী। তিনি শুধু প্রাণদাতা নন, তিনি রূপকার।

যমুনা পার হবেন ব্যাসদেব। দধি-দুধের ভাঁড় নিয়ে গোপীরা উপস্থিত। তারাও পার হবে নদী। কিন্তু নৌকো নেই। ব্যাস বললেন, আমার খিদে পেয়েছে। খিদে পেয়েছে তো ভাবনা কি। গোপীরা তাঁকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াতে লাগল। সব ভাঁড় প্রায় উজাড়। তবু দেখা নেই নৌকোর। তখন ব্যাস বললেন যমুনাকে, 'যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তোমার জল দু-ভাগ হয়ে যাবে আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা সোজা চলে যাব।' যেই কথা সেই কাজ। যমুনা দু-ভাগ হয়ে গেল। গোপীরা তো অবাক। অবাক হয়ে হবে কি! মাঝখানে ঠিক ওপারে যাবার পথ হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে পার হয়ে গেল সকলে।

গোপীরা কিছু বললে না। বুঝলে, আমি খাইনি মানে, আত্মা আবার খাবে কি। আত্মা নির্লিপ্ত—সাত দেউড়ির পার। তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সে অজর অমর সুমেরুবৎ।' বাংলায় একটি নিরুক্ত-সূক্তি।

আরেকবার খুঁজবে ব্রহ্মকে ? 'সে পেঁয়াজের খোসা। পেঁয়াজের প্রথমে লাল খোসা ছাড়ালে, তারপর শাদা পুরু খোসা। বরাবর এমনি ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ছাড়াতে-ছাড়াতে ভিতরে আর কিছু খুঁজে পাচ্ছ না।'

আরেকবার দেখবে ব্রহ্মকে ? সর্বভূতে সর্বাণাভূকে ?

'ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। ঘোলেরই মাঝ, মাঝেরই ঘোল।

এই ব্রহ্মের স্বরূপ যে বুঝেছে, যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কেমন অবস্থা ? তার দেহ আর আত্মা আলাদা হয়ে গেছে।

'যেমন', উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ, 'যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়-বড় করে। কাঁচা শুপুরি বা কাঁচা বাদামের মধ্যে শুপুরি-বাদাম ছাল থেকে তফাৎ করা যায় না। কিন্তু পাকা অবস্থায় শুপুরি-বাদাম আর তার ছাল আলাদা হয়ে যায়। পাকা অবস্থায় রস যায় শুকিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে শুকিয়ে যায় বিষয় রস।'

আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়-বড় করে। ভাষায় তেজ আর প্রসাদগুণ একসঙ্গে। তার সঙ্গে অর্থের বিদ্যুতি।

আমি কবে নির্লিপ্ত হব ? কুমুদ জলে থেকেও জলে নেই, তার যোগ চাঁদের সঙ্গে। তেমনি কবে তোমার সঙ্গে যুক্ত হব ? আমি যদি তোমার সঙ্গে লিপ্ত হই, তুমি কি পারবে নির্লিপ্ত থাকতে ? আমি যদি তোমার অমৃতসমুদ্রে স্নান করি তুমি কি নামবে না আমার হৃদয়ের সরোবরে ?

৮

ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, তবে কাজ করছে কে ? চালাচ্ছে কে জগৎসংসার ? চালাচ্ছে শক্তি। নিত্য আর লীলা। সংসারজুড়ে তারেই নৃত্যলীলা। অগ্নি আর তার দাহিকা। বিদ্যুৎ আর তার দীপিকা। জল আর তার শৈত্য। সূর্য আর তার দীধিতি। পুরুষ আর প্রকৃতি। এ রূপটিকে কত ভাবেই প্রকাশ করেছেন রামকৃষ্ণ : 'কাঠামো আর দুর্গাপ্রতিমা।'

সাপ আর তার তির্যক গতি। জল আর তার ঢেউ। বাবু আর তার গিন্নি। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, তির্যকগতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। জল স্থির থাকলেও জল, হেললে-দুললেও জল। যতক্ষণ স্থির ততক্ষণ পুরুষ-ভাব। তার মানে প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে। আর যেই নড়া-চড়া, চলা-ফেরা তখুনি প্রকৃতি পুরুষের থেকে আলাদা হয়ে কাজ করছে। পুরুষ অকর্তা। প্রকৃতির কাজ সাক্ষীস্বরূপ হয়ে দেখছেন। প্রকৃতিরও সাধ্য নেই পুরুষ ছাড়া কাজ করে।

'ওই যে গো দেখনি বে-বাড়িতে ? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে-বসে আল-বোলায় তামাক টানছে। গিন্নি কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে বাড়িময় ছুটোছুটি

করছে। একবার এখানে, একবার ওখানে। এ কাজটা হল কিনা, ও কাজটা করলে কিনা সব দেখছে-শুনছে। বাড়িতে যত মেয়েছেলে আসছে, আদর-অভ্যর্থনা করছে। আর মাঝে-মাঝে কর্তার কাছে এসে হাত-মুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছে, এটা এই রকম করা হল, ওটা ঐ রকম। আর ঐটি যা ভেবেছিলে করা হল না। কর্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনছে আর হুঁ-হুঁ করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্ছে। সেই রকম আর-কি।'

কত কঠিন একটি তত্ত্ব, অথচ কত সহজ, কত রসাল করে এঁকেছেন। কত হৃদয়ঙ্গম করে। শিব-শক্তির তত্ত্ব। শিব যে শব হয়ে পড়ে আছেন তার মানে ত্যক্তকর্মা হয়ে আছেন, আর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করছেন মহাকালী। কালহরণী, শিবাসনা। কর্ত্রীহন্ত্রী বিধাতৃকা। কিন্তু এটুকুই লক্ষ্য করবার যা কাজ সে করছে, পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্তাত্মা হয়ে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও তাই। যোগমায়া মানেই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। ঐ যে বঙ্কিম ভাব তাও ঐ যোগের জন্যে।

কাপড়ে হলুদ মেখে ছুটোছুটি করছে। একটি হালকা তুলির টানে একটি জীবন্তোজ্জ্বল চিত্র। পুরুষ আর প্রকৃতি। কবি আর তার কল্পনাশক্তি। সেই কল্পনা নানা রূপে বিকশিত হচ্ছে কবিতায়। কোনটা বড় কবিতা, কোনোটা বা ছোট। কোনোটাও বা অলক্ষ্য। জল কোথাও সাগর, কোথাও দিঘি, কোথাও বা ধানের শিষে ক্ষুদ্র একটি শিশিরকণা। ফুল কোথাও পদ্ম, কোথাও গোলাপ, কোথাও বা ঘেঁটু। কোথাও শঙ্খ, কোথাও শম্বুক, কোথাও বা শুক্তি। বিভূরূপে সর্বভূতে তাঁর বিভূতি। সেইটেই বলেছেন কাব্যায়িত করে : 'কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে বা একটা মশাল। সূর্যের আলো মৃত্তিকার চেয়ে জলে বেশি প্রকাশ। আবার জল চাইতে আর্শিতে বেশি প্রকাশ। তাঁর লীলার সব বিচিত্রতা। কোথাও শক্তি কম, কোথাও বা বেশি। তা না হলে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ পালায় মোটে একজনের থেকেই।'

তাই যে হারে যে জেতে সব তাঁরই খেলায় তাঁরই হার-জিত। যার রোগ তারই চিকিৎসা। সাপ হয়ে যে খায় রোজা হয়েই সে ঝাড়ে।

তাই আমার যেটুকু ক্ষুদ্রশক্তি সেইটুকুও তোমারই আভা। আমার যেটুকু ভালোবাসা সেটুকু তোমারই পেলবতা। তুমি আকাশব্যাপিনী বর্ষা হয়েই নেই, তুমি আছ আমার নিঃসঙ্গ অশ্রুতে। তুমি তোমার এই ভুবনজোড়া রাজপ্রাসাদেই নও, তুমি আছ আমার শূন্য মন্দিরে। কিন্তু যাই বলো ব্রহ্ম আর শক্তি, নিত্য আর লীলা এক। একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক রাজা এক যোগীর কাছে এক কথায় জ্ঞান চেয়েছিল। এক দিন এক জাদুকর এসে উপস্থিত। বলছে, রাজা, এই দেখ এই দেখ। রাজা দেখল জাদুকর দুটো আঙুল ঘোরাচ্ছে। অবাক হয়ে তাই দেখছে রাজা। খানিক পরে দেখলে দুটো আঙুল এক আঙুল হয়ে গেছে। সেই একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে জাদুকর ফের বলছে, রাজা, এই দেখ, এই দেখ।' রাজা তাই দেখল। পেল এক কথার জ্ঞান। অর্থাৎ একের জ্ঞান। তাই

আবার বলেছেন রামকৃষ্ণ : 'এক জানার নামই জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।'

এক বই আর দুই নেই, কিছু নেই। প্রথমে দুই বোধ হয়—শিব আর শক্তি, নিত্য আর লীলা। কিন্তু জ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। তখন অভেদ, তখন একীভাব। তখন অদ্বৈত। একই আসল। ব্রহ্ম হচ্ছে সেই এক। শক্তি হচ্ছে সেই একের পিঠে শূন্য। সংখ্যার প্রতীকেই বোঝালেন ব্রহ্মশক্তিকে। বললেন, 'একের পিঠে অনেক শূন্য দিলেই সংখ্যা বেড়ে যায়। এককে পুঁছে ফেল, শূন্যের আর মূল্য নেই।'

সেই 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' থাকতে বলেছেন রামকৃষ্ণ। মানিক ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিচ্ছি আমরা। কিন্তু যদি শূন্য গ্রন্থিও পড়ে, তা হলেও যেন বিশ্বাস কার ঐ শূন্যতার মধ্যেও তিনি আছেন। শূন্যের যা আকার, পূর্ণেরও সেই আকার। যা শূন্য ভুবন তাই পূর্ণ ভুবন। তিনি গলার হার হয়ে গলায় আছেন, চোখের মণি হয়ে চোখে, হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে হৃদয়ে। বাইরে কোথায় তাঁকে খুঁজে বেড়াব? কোন বিদেশে? এক ভিন্ন দুই নেই। এক ভিন্ন পৃথক নেই। তিনিও যা আমিও তা। দৃষ্টির সিংহাসনে আমিও তাঁর সঙ্গে বসেছি একাসনে। কিন্তু বসব কখন? বসব ভালোবাসার অংশী হয়ে। গভীর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণ : 'মনিব চাকরকে খুব ভালোবাসে। চাকরকে একদিন ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। চাকর তো কিছুতেই বসবে না, মনিব তাকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলে, আরে বোস, তুইও যা আমিও তাই। কিন্তু ভাবো চাকর যদি সেধে নিজের থেকে বসতে যায় চেয়ারে, তবে মনিব কি করে? তাকে দেয় বসতে?'

৯

সেই শক্তির নাম মহামায়া। ব্রহ্মের চেয়ে মহামায়ার জোর বেশি। কি রকম? রামকৃষ্ণ বললেন, 'জজের চেয়ে প্যায়াদার বেশি ক্ষমতা।'

পেয়াদা যদি পরোয়ানা জারি করে না আনে, সাধ্য কি জজসাহেব মামলার বিচার করেন? জজসাহেব ব্রহ্ম, পেয়াদা শক্তি।

জগৎসংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে মহামায়া। মুগ্ধ করে রেখে তার খেলা খেলিয়ে নিচ্ছে। সৃষ্টি-সংহারের খেলা। মহামায়াই আবরণ, অবরোধ। সে দ্বার ছেড়ে না দিলে যাওয়া যায় না অন্দরে। যে জ্ঞানী সে মায়াকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যে ভক্ত সে স্তব করে। বলে, মা, তুমি পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ না ছাড়লে ব্রহ্মকে দেখি কি করে? লক্ষ্মণ এমনি স্তব করেছিল সীতার। সীতা সরে দাঁড়াতেই লক্ষ্মণের রামদর্শন হল।

'তাঁর মায়াতেই তিনি ঢাকা রয়েছেন।' বিচিত্র উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেন পানা-ঢাকা পুকুর। পানা-ঢাকা পুকুরে ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়,

আবার পরক্ষণেই পানা নাচতে-নাচতে এসে জলকে ঢেকে দেয়। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে বাঁশ ঠেলে পানা আর ভিড়তে পায় না। তেমনি মায়াকে সরিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পারলে মায়া আর ভিতরে আসতে পারে না।'

একখানি তুচ্ছ গামছা, তার কী শক্তি! চোখের কাছে আড়াল দিয়ে প্রদীপের আলো আর দেখা যায় না। এমন কি সূর্য তাকে ঠেকানো যায় চোখের কাছে হাত তুলে। আড়ালটি সরাও। তোমার অবগুণ্ঠনটি উন্মোচন করো। তোমার অবগুণ্ঠনটি না তুললে তোমার মুখখানি দেখি কি করে! কি করে দেখি তোমার সেই ধরা-পড়ার হাসি! তোমার সেই আনন্দের কটাক্ষ! কত ছোটখাটো আবরণ রচনা করেছি তোমাকে যাতে দেখতে না পাই। কত তুচ্ছ দেয়াল তুলে দিয়েছি তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ব্যবধানের ভঙ্গুর কত বেড়া বেঁধেছি চারপাশে। মোহ আর অহংকার, আত্মাদর আর পরশ্রীকাতরতা। কে বা পর আর কারই বা শ্রী! চারদিকে সব ধূলির আচ্ছাদন। এ সব ধূলির আচ্ছাদন ধূলিসাৎ করে দাও। কু-আশার কুয়াশা দাও সরিয়ে তোমাকে একবার দেখি। নত-হয়ে-পড়া মাকে যেমন শিশু দেখে, নত-হয়ে-পড়া সূর্যকে যেমন দেখে পদ্ম, তেমনি তোমাকে দেখি। বিশাল আকাশ হয়ে অমৃতের ভারে তুমি আমার উপর নত হয়ে পড়েছ। অন্তরীক্ষ ভরা অনন্ত চক্ষুতে দেখি তোমার সেই স্নেহ-স্থির মাতৃদৃষ্টি।

যে জ্ঞানী সেই বীর। সেই মায়াকে চিনতে পারে। আর মায়াকে যদি একবার চেনা যায় মায়া আপনিই ভয়ে পালায়। দুটি সরল-সুন্দর গল্প বলেছেন রামকৃষ্ণ: 'এক গুরু শিষ্যবাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে চাকর নেই। পথের মাঝে একটা লোককে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরে, আমার সঙ্গে যাবি? ভালো খেতে পাবি, আদরে থাকবি, বেশ তো চল না। লোকটা ছিল মুচি। আমতা-আমতা করে বললে, ঠাকুর আমি নিচু জাত, কেমন করে আপনার চাকর হই? গুরু তাকে প্রশ্রয় দিলেন, বললেন, কোনো ভয় নেই, কাউকে তুই নিজের পরিচয় দিস না, কি কারু সঙ্গে আলাপ করিস না। নিশ্চিন্ত হয়ে রাজী হল মুচি। সন্ধ্যার সময় শিষ্য-বাড়িতে বসে গুরু সন্ধ্যা করছে, এমন সময় আরেক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। সামনে চাকর দেখতে পেয়ে বললেন, আমার জুতো জোড়াটা এনে দে তো। চাকর কথা কইল না। আবার তাড়া দিলেন ব্রাহ্মণ। তাতেও চাকর চুপ করে রইল। কি রে, কথা কচ্ছিস না কেন? ওঠ্! তবু চাকর নড়ল না। তখন ধমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ, আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনছিস না? তুই কি জাত? মুচি নাকি? চাকর তখন ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললে, ঠাকুর মশাই গো! ঠাকুর মশাই গো! আমায় চিনেছে! আমি পালাই!'

মায়া পালিয়ে গেল। প্রশ্রয় দিয়ে গুরু তাকে রেখেছিল স্ববশে, নিজেকেও বিস্মৃতির বিভ্রমে। তুই তোর জাত গোপন করে থাক, আমিও জানতে যাব না তুই কে? কিন্তু সহসা চলে এলেন জিজ্ঞাসু। জ্ঞানীকে দেখেই মায়া সঙ্কুচিত হল। যতই সে জড়সড় হয় ততই জ্ঞানী তেড়ে আসে। প্রশ্ন করে বসে, তোর

জাত কি? লক্ষণা কি? তুই কি মায়া? যেই স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল অমনি মায়া লজ্জায় চম্পট দিলে।

'হরিদাস বাঘের ছাল পরে ছেলেদের ভয় দেখাচ্ছে। একজন বীর ছেলে বললে, তোকে আমি চিনেছি। তুই আমাদের হরে।'

হরিদাস নয়, হরে। একেবারে নস্যাৎ করে দিলে। হরিদাস নিশ্চয়ই বয়স্ক ব্যক্তি। বালকের পক্ষে তাকে অন্তত বলা উচিত ছিল, তুমি আমাদের হরিদাস। তাহলে বোধ হয় সম্ভ্রম দেখানো হত তাকে। কিন্তু তাকে একেবারে লোপ করে দেওয়া হল—তুই মিথ্যা, তুই মায়া। মায়া কি সহজে যায়? সংস্কার দোষে মায়া আবার লেগে থাকে। মায়ার সংসারে থেকে-থেকে মায়াকেই সত্য মনে হয়। দেখে লোকে আবার কাঁদে। এই নিয়েও গল্প আছে রামকৃষ্ণের : 'এক রাজার ছেলে পূর্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। একদিন খেলা করবার সময় সমবয়সীদের বলছে, এখন অন্য খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস-হুস করে কাপড় কাচ।'

তুমি আমার মনোহরণ করবার জন্যে কত জিনিসই তৈরি করেছ। কত রঙচঙে খেলনা। কত সুন্দর পুতুল। দু বেলা মেলার থেকে কিনে আনছি হর-রকমের সওদা-সুলুপ। জিনিস দিয়ে ঘর ভরছি প্রাণপণে। যতই জিনিস বাড়াচ্ছি ততই কমাচ্ছি তোমাকে। যতই স্তূপীকৃত করছি ততই তুমি সংকুচিত হচ্ছ। তোমার জায়গা জিনিসে মেরে দিচ্ছে। জিনিসের চাপে পড়ে তুমি সরতে-সরতে চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দা, পরে বারান্দা পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ রাস্তায়। কোথায় আমি বেরুব, না, তুমি বেরিয়ে গেলে!

আমি জিনিস, তুমি জায়গা। জিনিস ফেলে দিয়ে কবে আমি জায়গা হব! কবে বুঝব তুমিই সব আর সব আমার অভিমান! তুমিই সোনা আর সব আমার অহঙ্কারের রাঙতা! ছোট্ট একটি গল্প বললেন এখানে : 'এক মাতাল দুর্গা-প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে, মা, যতই সাজো আর গোজো, দিন দুই-তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে।'

তেমনি মাতাল হও ঈশ্বর-প্রেমে। দেখবে সব কাঠ আর খড়, মাটি আর শোলা। বড় জোর জরি আর চুমকি। ডাকের গয়না-পরা দুদিনের প্রতিমা।

উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'তালগাছই সত্য। তার ফল-হওয়া আর ফল-খসা দুদিনের। বাজিকরই সত্য। বাজিকরের ভেলকি দুদণ্ডের।'

১০

কিন্তু এই ঈশ্বরের চেহারাটি কি রকম? সাকার, না নিরাকার? ঈশ্বর দু রকমই। তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। ভক্তের কাছে তিনি সাকার, জ্ঞানীর কাছে নিরাকার। নিরাকার মানে নীরাকার। সাকার মানে তুষারাকার। এ

ভাবটি কত বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করেছেন রামকৃষ্ণ। প্রকাশ কত রসাশ্রিত হয়েছে: 'যেমন বরফ আর জল। জল জমেই তো বরফ। বরফ গলেই তো জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু দেখ, জলের রূপ নেই—একটা বিশেষ আকার নেই। কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডা-গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে নানা রূপ ধরে চাঁই বেঁধে জলে ভাসে, তেমনি ভক্তি-হিম লেগে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে মূর্তির বিকাশ হয়। জ্ঞানীর কাছে তিনি অব্যক্ত, ভক্তের কাছে তেমনি ব্যক্ত। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল। অধঃ-ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ, জলে জল।'

তুমি যেমন ভাবে তেমনি আবার গঠনে। তুমি যেমন রূপে তেমনি আবার অবয়বে। তুমি যেমন মৌনে তেমনি আবার হাহাকারে। তোমার কি ইতি আছে? তুমি যদি আকাশে থাকতে পারো, কেন আধারে থাকতে পারবে না? তুমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করে আছ, শুধু দাঁড়াতে পারবে না আমার চোখের সম্মুখ? রামকৃষ্ণ বললেন, ঘরের মধ্যে থেকে দেখাও যা, পাশ থেকে দেখাও তাই। দুই দেখাই ঘরকে দেখা।'

তোমাকে যখন দেখিনি অথচ তোমার কথা ভাবতাম, তখন তুমি নিরাকার। তারপর তোমাকে যখন দেখলাম, ধরলাম, তোমার নিশ্বাসের স্পর্শ পেলাম, তখন তুমি সাকার। কিন্তু যখন তোমাকে দেখি তখন সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখতে পারি কই? তখন তুমি সাকার হয়েও নিরাকার। আবার যখন দূরে বসে তোমাকে ভাবি তখন সেই ভাবের মধ্যে কখনো দেখি তোমার অপলক চোখ, কখনো বা পদপল্লব দুখানি। তখন আবার তুমি নিরাকারের মধ্যে সাকার।

ঈশ্বর সত্যিই কি রকম তা ঈশ্বরের থেকেই জেনে নিলে হয়। 'সে পাড়াতেই গেলি না, জানবি কি!' একটি অসাধারণ উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'আগে কল্যাকাতায় যাও তবে তো জানবে কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক। খড়দা বামুনপাড়া যেতে হলে আগে তো খড়দায় পৌঁছুতে হবে।'

তা না, শুধু ঘোরাঘুরি। তলা না ছুঁয়ে উপর-উপর ভাসা। শিকড়ে না গিয়ে শুধু পাতায়-পাতায় হাওয়া খাওয়া। এ যেন নায়েব-গোমস্তার থেকে জমিদার-বাড়ির খবর নেওয়া। এক-এক জন এক-এক রকম খবর বলে, একটার সঙ্গে আরেকটা মেলে না—ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াই। যাই না আসলের ঘরে, যাই না সেই সারাৎসারের আসরে। রামকৃষ্ণ তার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন: 'যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ করতে হয়, তা হলে তার কখানা বাড়ি, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ—আমার অত খবরে কাজ কী! যো সো করে, স্তব-স্তুতি করেই হোক বা দারোয়ানের ধাক্কা-ধুক্কি খেয়েই হোক, কোনো মতে বাড়ির ভিতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে একবার আলাপ করে নে। আর যদি তার টাকা-কড়ি তালুক-মুলুকের খবরই জানতে ইচ্ছে হয়, সরাসরি তাকে জিগগেস করলেই তো হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম, তার পরে রামের ঐশ্বর্য—জগৎ।

তাই বাল্মীকি "মরা" মন্ত্র জপ করেছিলেন। "ম" মানে ঈশ্বর আর "রা" মানে জগৎ—তাঁর ঐশ্বর্য।'

তাই কোথায়, কার দুয়ারে আমি যাব তোমার খবর করবার জন্যে! আমি আমার নিজের দুয়ারে বসলাম, আমার অন্তরের দুয়ারে। তুমি ভিতর থেকে বন্ধ দরজায় টোকা মেরে বোঝাচ্ছ তুমি আছ। আমি বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা মেরে বলছি, খুলে দাও দরজা। আশ্চর্য, আমারই ঘরে ঢুকে আমাকে বাইরে রেখে দিব্যি তুমি ঘর বন্ধ করে দিলে। আমারই ঘর-দ্বার, আর আমিই পর, আমিই বার! দরজা খুলে দাও। দেখাও তুমি কেমন দেখতে। তুমি সাকার, না নিরাকার! তুমি কি দীপ্তি, না দীপ? তুমি কি কল্পনা, না কবিতা? তুমি কি তন্ত্রের তিনি? না, তুমি কি প্রেমের তুমি? না, তুমি কি অহঙ্কৃতির অহং? তুমি কি 'ওঁ তৎসৎ', না 'তত্ত্বমসি', না 'সোঽহং'? রামকৃষ্ণ বললেন, 'মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবেই।'

তুমি আমার মিছরির রুটি। তোমাকে ভাবতেই ভালো লাগে। তুমি সকল ভালোর আসল ভালো। জীবনে কত সংগ্রাম, সমস্ত সংগ্রামের সর্বশেষ উদ্দেশ্য যে শান্তি, তুমি আমার সেই শান্তি। কত দুঃখ, সমস্ত দুঃখের অবসানে যে আনন্দের সঙ্কেত, তুমি আমার সেই সঙ্কেত। কত বঞ্চনা, সমস্ত বঞ্চনার পরপারে যে সামঞ্জস্যের স্বীকৃতি, তুমি আমার সেই স্বীকৃতি। তুমিই আমার সাম্য, তুমি আমার সন্ধি, তুমিই আমার সত্তা। তুমি বলে দাও তুমি আমার কে! রামকৃষ্ণ গল্প বললেন একটি: 'কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিল, এ জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন তারা হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগল, কেমন না জানি দেখতে হাতিকে! কারু হাত পড়ল শুঁড়ে, কারু বা পায়ে, কারু বা কানে, কারু বা পেটে। কেউ বললে, হাতি ঠিক থামের মত, কেউ বললে, গাছের ডালের মত। কেউ বললে, কুলোর মত, কেউ বা বললে, দূর, জলের জালার মত!'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। যে যেমন বুঝেছে মনে করছে তাই বলছে। হাতির চেহারা নিয়ে মারামারি করছে কানারা। কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বৈষ্ণব, কেউ অবধূত। কেউ সাকার, কেউ নিরাকার। ভাবছে আমিই আসল ফিরিওয়ালা। এই ভাবটিই আবার সংক্ষেপে বলেছেন একটি সজীব উপমার সাহায্যে: 'সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। কিন্তু কারু ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে না। শুধু সূর্যই ঠিক যাচ্ছে। তাই মাঝে-মাঝে সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নাও।'

নিরাকারও আছে, সাকারও আছে। এবার একটি গাছের উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'একডেলে গাছও আছে, আবার পাঁচডেলে গাছও আছে।' তারপর দিলেন মাছের উপমা: 'নানারকম পুজোর তিনি আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে তাহলে মা নানা রকম মাছের ব্যঞ্জন রাঁধের—যার যা পেটে সয়। কারু জন্যে ঝোল কারু জন্যে ঝাল কারু জন্যে বা মাছের পোলাউ। ভাজা-অম্বল-চচ্চড়ি। যার যেটি ভালো লাগে। শুধু যার যেটি মুখে রোচে নয়, যার

যেটি পেটে সয়। তাই কারু কৃষ্ণ, কারু শিব, কারু রাম, কারু কালী। কারু বা নিরাকার—ওঁ খং ব্রহ্ম।'

তাই তুমি তো কত ভয়ঙ্কর, কত ঘোরদর্শন। কত অগ্ন্যুৎপাত, কত তুষার-ঝড়, কত জলপ্লাবন! কত বিশাল কত ভয়াল কত প্রচণ্ড! কিন্তু আমার যেমনটি সয় তেমনি করে তুমি এসেছ আমার আস্বাদের জন্যে। কোমল হয়ে মধুর হয়ে শোভন হয়ে এসেছ। এসেছ ভয়ত্রাতা দুঃখহর্তার হাসি নিয়ে। ফেলে রেখে এসেছ তোমার ঐশ্বর্যের সাজ, তোমার প্রতাপের রাজমুকুট। রাখালের ছেলে হয়ে এসেছ তোমার বাঁশিটি নিয়ে। কিংবা প্রবাস থেকে গৃহাগত ছেলের কাছে স্নেহময়ী মা'র মত। যে যেমনটি চায় তার কাছে তেমনটি হয়ে এসেছ। তাই কখনো এসেছ প্রেয়সীর কাছে তার স্বামীর মত। কখনো বা নয়নানন্দ আনন্দদুলাল হয়ে। তুমি কি শুধু এক? তুমি এক হয়েও একের পিঠে বহু শূন্য। এক হয়ে তুমি অনন্ত। তুমি বিচিত্র, তুমি বিবিধ। এই ভাবটিই আবার অন্য রূপে প্রকাশ করেছেন। এবার বাজনার মধ্য দিয়ে: 'রশুনচৌকিতে দুজনে বাঁশি বাজায়। একজন সানাই, আরেকজন পোঁ। দুটো বাঁশিতেই সাতটা করে ফোকর। সাতটা ফোকর থাকতেও একজন কেবল পোঁ ধরে থাকে। আরেকজন নানান রাগ-রাগিণী বাজায়, দেখায় সুরের নানান করতব।'

ঐ পোঁ-টি নিরাকার। আর সানাইটি সাকার। ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁকে নানা ভাবে সম্ভোগ। তিনি কামধেনু, আমি বৎস। তাঁর দুগ্ধধারা আমার জন্যে। আমি নইলে সেই দুগ্ধ কে পান করবে? সেই দুধ দিয়ে আমি ছাড়া কে করবে পায়সান্ন? তাই তিনিও আমার সন্ধান করে ফিরছেন। বৎসহারা গাভীরই মত ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমাকে। আমি নেবার জন্যে কাঁদছি, তিনি দেবার জন্যে কাঁদছেন। আমি না থাকলে তাঁর প্রেম যে অসম্পূর্ণ থাকে। আমার হৃদয় না পেলে কোথায় তিনি খেলবেন, কোথায় তিনি ফলবেন! তিনি যে কত বিচিত্র, কত স্বাদগন্ধবর্ণময় তাই বোঝাবার জন্যে তাঁর এত আয়োজন। তিনি যত বড়ই লেখক হন তিনি চান আমারই মুগ্ধ প্রশংসা। আমার স্তুতি না পেলে তাঁর লেখা যেন দীপ্তি পায় না। তাই তো রাজ্যেশ্বর হয়ে আমার ভাঙা ভবনের দুয়ারে তিনি করাঘাত করেন। বলেন, এ কবিতাটি কেমন লিখেছি দেখ তো!

প্রতিটি দিনের পৃষ্ঠায় নবীনতরো কবিতা। বলেন, তোমার ভাষ্যটি না পেলে আমার ভাবা যে নিরর্থক হয়ে থাকে।

১১

তারপর শোন সেই গিরগিটির গল্প: 'গাছতলায় সুন্দর একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। কে একজন এসে বললে। তখুনি আরেকজন প্রতিবাদ করে উঠল: লাল কেন হবে? তোমার খানিক আগে সেই গাছতলায় গেছলুম

আমি। স্বচক্ষে দেখে এসেছি, সে সবুজ। চাল মারার আর জায়গা পাওনি? বললে তৃতীয়জন। এই দুটো চর্মচক্ষে দেখে এসেছি কাল। সে গিরগিটি লালও নয় সবুজও নয়, দস্তুরমতো নীল। আশ্চর্য, কী বলছে এরা। আমি যে দেখে এলুম হলদে। সবাই পাগল হয়ে গেল নাকি? বললে শেষ জন। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব কি করে? আমি যে দেখে এলুম পাঁশুটে। নানা মুনির নানা মত। নানা দ্রষ্টার নানা দৃষ্টি। শেষে এতে ওতে ঝগড়া বেধে গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বললে এসে আরেক ব্যক্তি। সব বিবরণ যখন শুনলে তখন বললে, আমি ঐ গাছতলারই বাসিন্দে। তোমরা প্রত্যেকে যা বলছ, সব সত্য। ও গিরগিটি কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো নীল, কখনো ধূসর। আবার কখনো দেখি একেবারে শাদা। রঙের রেখা নেই এতটুকু। একেবারে নির্গুণ।'

তুমি বিচিত্র, আমি বিশেষ। এই বিশেষের মধ্যেই তোমার বিচিত্র লীলা। আমি যদি বিশেষ না হতাম তা হলে তোমাকে বিচিত্র বলে কে অনুভব করত? তেমনি আবার আমাকে বিচিত্র করে তুমি বিশেষ হয়ে ধরা দিয়েছ। আমাকে বন্ধু করে নিজে ধরা দিয়েছ বন্ধু বলে। আমাকে পুত্র করে নিজে ধরা দিয়েছ পুত্র রূপে। আমাকে দীন সেবক করে ধরা দিয়েছ অমিতপ্রতাপ প্রভু হয়ে। আমি ভাব নিয়ে কী করব, আমি বস্তু নেব, তোমাকে নেব। আমি তুমি হব। বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে কাপড় রঙ করবার জন্যে তার কাছে আসে। যে যে-রঙ চায় তাকে সেই রঙে ছুপিয়ে দেয় কাপড়। নীল আর লাল, হলদে আর বেগনি। একজন দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই আশ্চর্য ব্যাপার। তার দিকে চোখ পড়ল রঙওয়ালার। তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি, তোমার কাপড় কোন রঙে ছোপাতে হবে বলো? তখন সেই লোকটি বললে, ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সেই রঙে রাঙিয়ে দাও।'

একটি মনোমোহন কবিতা। ইঙ্গিতে তাৎপর্যে নিখুঁত।

ঈশ্বরের রঙ কী? ঈশ্বরের রঙ হচ্ছে প্রেম। আমাকে প্রেমে রঙিন করো। আমি কোনো ঐশ্বর্য কোনো সামর্থ্য চাই না—আমি চাই শুধু প্রেম, প্রেমের দীনতা প্রেমের বিধুরতা। তোমাকে যদি ভালোবাসতে পারি সবাইকে তখন ভালোবাসবো, দেখবো ভালো চোখে। সবার সঙ্গে রঙে-রসে মিশে তোমার সঙ্গেই একাকার হব। হে পূর্ণপ্রবাহ নদী, প্রেমের ঢেউয়ে আমাকে সকলের ঘাটে-ঘাটে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

সাকার থেকে চলেছি নিরাকারে। স্থূলে স্থূল থেকে চলেছি নিরাকারে। আকার হচ্ছে একটা সেতু। সেই সেতু পেরিয়ে যাব সেই নির্গুণ নিঃসীম নিরুপমের ঘরে। দ্বিতীয় না হলে ধরি কি করে সেই অপরূপ অদ্বিতীয়কে? এই দ্বিতীয়ই তো মাধ্যম। এই দ্বিতীয়ই তো প্রতিমা। ঘরোয়া একটি দৃষ্টান্ত দিলেন এইখানে : 'মেয়েরা যদ্দিন স্বামী না পায় ততদিনই পুতুল খেলে। যেই বিয়ে হয়, সত্যিকার স্বামী জোটে, অমনি পুতুলগুলি প্যাটরায় পুঁটুলি বেঁধে তুলে রাখে। ঈশ্বর লাভ হলে আর প্রতিমার কী দরকার?'

ঈশ্বরের মূল্য কী, কিসে ? তাঁর ঐশ্বর্যের ওজনে ! আমি সে ভারের পরিমাপ করব কি দিয়ে ? তার দরই বা কষব কিসে ? কোন হাটে তার যাচাই হবে ? কে বা সে যাচনদার ? তোমার মূল্যে তোমার ঐশ্বর্যে নয়। তোমার মূল্যে আমার আনন্দে। তোমাকে নিয়ে আমি যত আনন্দিত, আমার কাছে তুমি তত মূল্যবান। আনন্দেই তোমাকে সম্বোধন, আনন্দেই তোমার প্রতিধ্বনি। কী করে তোমার ঠিকানা পেতাম যদি অন্তরে আনন্দের আলোটি না থাকত ! যদি আনন্দের আলোটি না থাকত, তুমি বা কী করে চিনতে আমার বাতায়ন ! তাই তোমাকে যে ভাবে যে ভঙ্গিতে যে রূপে যে রীতিতে দেখে আমার সুখ, সেই-সেই প্রকারে সেই-সেই পদ্ধতিতে আমারও অবস্থিতি। আমার আনন্দেই তোমার অভিনন্দন।

আরেকটি কবিতা রচনা করলেন রামকৃষ্ণ : 'ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই দেখবে তাঁর আর নাম রূপ নেই। দূরে বলেই কালীকে শ্যামবর্ণ দেখায়। যেমন দূরে থেকে দিঘির জল কালো, সমুদ্রের জল সবুজ দেখায়। কাছে গিয়ে হাতে জল তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই। দূর থেকে নীল দেখায় আকাশ, কাছে কোনো রঙ নেই। সূর্য দূরে থেকে ছোট, কাছে গেলে ধারণার বাইরে। পেছিয়ে একটু দূরে সরে এলেই কালী আমার শ্যামা-মা, কালীকে তখন চৌদ্দপোয়া দেখায়।'

উপাসনায় পরিচ্ছিন্নতা দরকার। তার মানে মূর্তিরূপ পরিচ্ছন্ন বস্তু কাছে রাখলেই বৃহৎ বস্তুর ধারণা সম্ভব। একটি ঘটকে বড় করে দেখতে হলে তার পাশে একটি ছোট ঘট রাখো। না ছুঁয়ে একটি রেখাকে বড় করতে হলে তার পাশে টানো একটি ছোট লাইন। তেমনি অনন্তকে আন্দাজ করবার চেষ্টায় তার পাশে রাখো একটি শান্ত মূর্তি। মাকে পাশে রেখে বুঝতে চাও সেই জগম্মাতাকে।

দশ আঙুল ভূমি হচ্ছে হৃদয়। সেই ভূমিতে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষের স্থান হবে কি করে ? তাই তাকে ছোট করে নাও। যিনি মহতো মহীয়ান তিনি অণোরণীয়ানও হতে জানেন। তাই তোমার আনন্দের জন্যে তাকে সগুণ করো, সশরীর করো। তিনি অচক্ষু হয়ে দেখেন অকর্ণ হয়ে শোনেন, অপাণিপাদ হয়ে সর্বনৈবেদ্য গ্রহণ করেন। তারপর যদি একদিন বলেন, দিবং দদামি তে চক্ষুঃ, বলে প্রজ্ঞানয়ন খুলে দেন তখন আর রূপ-কূপে ডুবব না, যাব না আর নাম-ধামে, তখন শুধু একটি চিম্মাত্রবিস্তার। একটি চৈতন্যদ্যুতি।

তার আগে করি কদিন পুতুল-খেলা। প্রান্তরে ডাক পড়বার আগে সেরে নি আমাদের প্রাঙ্গণের লুকোচুরি।

১২

কি করে মূর্তি থেকে চলে আসব বোধে, সাকার থেকে নিরাকারে, তার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন রামকৃষ্ণ : হিন্দুর মূর্তিসাধনার অভিনব কাব্যরূপায়ণ। যেমন তত্ত্বের দিক দিয়ে তেমনি সাহিত্যের দিক দিয়ে অনন্য।

'মনে করো দশভুজা ভগবতীর মূর্তি। দশপ্রহরণধারিণী দশ দিকে দশ হাত প্রসারিত করে রয়েছেন। এত বড় ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তি আর দুটি নেই। চতুর্দিকে ভগবানের এত যে ঐশ্বর্য তার একটা মূর্তি দেব না? তাই করেছি এই ভগবতীর কল্পনা। সিংহবাহনা সৌন্দর্যারূঢ়া দুর্গা। দরদৈন্যদুঃখদুরিতদলনী। কিন্তু ঐখানেই কি বিস্তীর্ণ করে রেখেছি নিজেকে? না ক্রমে-ক্রমে ঐশ্বর্য কমিয়ে এনেছি, ধ্যানকে সংহত করতে গিয়ে ধ্যেয়কে ছোট করে এনেছি! দশভুজা ষড়ভুজা জগদ্ধাত্রী হয়েছেন। ষড়ভুজাকে করেছি চতুর্ভুজা কালী। কলিদর্পঘ্নী, করুণামৃত-সাগরা। চতুর্ভুজা কালীকে কমিয়ে এনেছি আবার দ্বিভুজ কৃষ্ণে। কৃষ্ণকে নিয়ে এসেছি বালগোপালে। সে কচি শিশু, নিষ্পাপ নির্মল, নির্ভূষণ, ঐশ্বর্যের বালাই নেই এক বিন্দু। ছোট হাতখানি তুলে নবনী যাচঞা করছে, মাতৃস্নেহের নবীন নবনী। বালগোপালকে কমিয়ে নিয়ে এসেছি শিবলিঙ্গে। শিবলিঙ্গকে ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে, শালগ্রাম শিলায়।

তারপর? তারপর নিষ্প্রতীক। আর প্রতীক নেই প্রতিমা নেই, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। তখন ভুবনময় একটি অখণ্ড জ্যোতি, একটি অখণ্ড পরিস্পন্দ। তখন তাতে লীন হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। আদি অন্ত শূন্যে অরূপ সমুদ্রে। তখন আর আমি-তুমি নেই—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মবিভা। একটি ক্ষুদ্র-ক্ষীণ শিলা হয়ে ছিলাম ধরণীর এক কোণে, মিশে গেলাম আয়ত্তাতীত আদিত্যে। সাকার থেকে চলে গেলাম নিরাকারে। তারপর? এইখানেই রামকৃষ্ণের কবিত্বের সম্পূর্ণতা। 'ঐখানেই লীন হয়ে রইলাম না। আবার উন্মীলন হল। আবার চোখ খুললাম। দেখলাম সব কিছুতেই ভগবান প্রতিমূর্তি। নিরাকার থেকে আবার এলাম সাকারে, এবার সত্যিকার সাকারে। নিরাকারে ছিল সমচেতনা, এবারকার সাকারে সমদৃষ্টি। সর্বত্র সমদৃষ্টি স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে। সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিভাস। সমস্ত জীবে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।'

এই জাগরণের বাণীটিই একটি সর্বভাসক দীপ্তমন্ত্র।

'জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা জীবে শ্রদ্ধা জীবে প্রেম।'

অন্নচিন্তা চমৎকারা'র পর এটিতেই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ সম্পূর্ণতা পেল। শুধু ঔদরিক অভাবের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েই তিনি তৃপ্ত পেলেন না, প্রত্যেকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করলেন পরমাত্মার মর্যাদা। মহৎ-বংশোদ্ভবের গরিমাময় কৌলীন্য। কোথাও আপজাত্য নেই, আমরা প্রত্যেকে সেই ব্রহ্মের সন্তান, আমরা সহোদর, এক গোত্র, অমৃতত্বে আমাদের সমান অধিকার।

ভূমাই যদি আনন্দ হয়, আনন্দ লাভ করো রামকৃষ্ণের এই উদার বিশ্ববোধে।

যেখানে যত মানুষ, সব আমার প্রভুর প্রতিভূ, আমার মিত্রের মিত্র। এই অনুভবটি না পেলে কি করে আমি ভূমাতে এসে পৌঁছুতে পারি? যদি সমস্ত জীবকে আমি না পাই, আমার আনন্দতীর্থে তা হলে তোমাকে পাওয়া হল কই? শুধু বন্ধ ঘরে তোমার বিগ্রহটি নিয়ে দিন কাটালেই আমার চলবে না। আমাকে তুমি সমগ্রের প্রেমিক করো। আমি সামগ্রীর সুখ চাই না, কিন্তু চাই সামগ্রিক সুখ। চাই আত্যন্তিকী শান্তি। চাই ভূমানন্দ। 'না পুরে অল্প ধনে দারিদ্রতিয়াস।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি সমস্ত বেলটিকে চাই।'

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। আমার অন্তরে যে ব্যথা, আর তরুশাখে যে পুষ্পভার সব তাঁরই স্পর্শ। আমার অন্তরে যে কথা আর বিহঙ্গকণ্ঠে যে সুর সব তাঁরই বাণী। তিনি আগুনে আছেন জলে আছেন, হাসিতে আছেন অশ্রুতে আছেন। পুণ্যে আছেন, পাপে আছেন, শুচিতে আছেন, অশুচিতে আছেন। ভালো-মন্দ এমন কিছু নেই যা তিনি-ছাড়া। জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি সমস্ত বেলটিকেই চাই। শাঁস-বিচি-খোল সমস্ত নিয়েই বেল।'

একটি হৃদয়স্পন্দী কবিতা। নিজেই আবার তার ব্যাখ্যা করলেন সুন্দর করে: 'বেলের শাঁস-বিচি-খোল আলাদা আলাদা করে রেখেছিল একজন। কিন্তু বেলটা কত ওজনের জানতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে চলবে না। শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যাবে? খোলা-বিচি শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। খোলা নয়, বিচি নয়—শাঁসটিই সার পদার্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচার করে দেখ যার শাঁস, তারই বিচি, তারই খোলা। আগে নেতি-নেতি। জীব নেতি জগৎ নেতি। ব্রহ্মই শাঁস। শেষে দেখবে যা থেকে ব্রহ্ম তা থেকেই ফের খোলা-বিচি, জীব-জগৎ।'

যেমন ঊর্ণনাভ আর ঊর্ণা। মাকড়সার থেকে লূতাতন্তু, আবার লূতাতন্তুর মধ্যেই মাকড়সা। আকাশের মধ্যে ঘট, আবার ঘটের মধ্যেই আকাশ। ব্রহ্মময় হয়ে গেলে সমস্ত তখন আনন্দময় দেখে। দেখে সকলই ঈশ্বরপরবশ, ঈশ্বরসমাশ্রিত। এই ভাবটি রামকৃষ্ণ ভাষায়িত করেছেন। এটি কি একটি কবিতা নয়?

'অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে-ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকেও শ্যামবোধ হল। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে-ভেবে নিশ্চল হয়ে থাকে আরশুলা। কুমুরে পোকাই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।' পরে বললেন: 'আরশুলা যখন কুমুরে পোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল।'

তখন একমাত্র ব্রহ্ম। অনাদি, নিরতিশয়। অস্তিনাস্তিহীন। অসঙ্গ হলেও সর্বাধার। নিগুর্ণ হয়েও গুণভোক্তা। অন্তরে-বাহিরে, দূরে-অন্তিকে। অচরং চরমেব। স্থাবর জঙ্গম। আবার অরূপ, অবিজ্ঞেয়। কারণস্বরূপে এক, কার্যস্বরূপে

নানা। ভূত-ভর্তা। জ্যোতির জ্যোতি, প্রকাশকের প্রকাশক। জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তমসঃ পরং। ব্রহ্ম হচ্ছে সত্তা। প্রকৃতি শক্তি। ব্রহ্ম হচ্ছে মন, শক্তি হচ্ছে ইচ্ছা। এই ইচ্ছারই নাম মায়া। দুর্ঘট-ঘটন-পটীয়সী এই মায়া। কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'কোথাও কিছু নেই, ধুমধাড়াক্কা। বেশ রোদ হয়েছে, হঠাৎ মেঘ হল, চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। বৃষ্টি জল বজ্রপাত হল, আবার তখুনি মেঘ গেল কেটে, রোদ উঠল। বাস, এর নাম মায়া।'

এটি কি কবির বর্ণনা নয়? রামকৃষ্ণকে কি বলব না আমরা সাহিত্যিক?

১৩

রামকৃষ্ণের যেমন উদার বোধ, তেমনি উদার বুদ্ধি। ধর্মের জগতে তিনি সর্ব-সমন্বয়ের প্রবর্তক। সেই প্রবর্তনের বাণীটি কি একটি ছন্দে গাঁথা ধ্বনি নয়? 'যত মত তত পথ।' জল পড়ে পাতা নড়ে—এরই মত একটি সহজ-সরল কবিতা। কিন্তু মন্ত্রের মত জমাট। চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তিই মন্ত্র। এই সামান্য চারটি ছন্দোবন্ধ শব্দে কালকল্লোলের চিরন্তন ধ্বনি সংহত হয়ে আছে। একটি হীরকখণ্ডে যেন বিধৃত হয়ে আছে সপ্তসূর্যের প্রদীপ্তি। তেমনি আবার কবিতায় গেঁথেছেন: 'যেমন ভাব তেমন লাভ।'

এ যেন যেমন সাধ তেমন স্বাদ। এ যেন যেমন ক্ষুধা তেমন সুধা। এই তত্ত্বটিই রামকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন উদাহরণ দিয়ে। সহজ রেখায় ছবি এঁকে।

'তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। যে কোনো রকমে হোক ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, মই-দড়ি, আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পারো। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। আমার কালীঘাটে যাওয়া নিয়ে কথা। কেউ আসে নৌকায়, কেউ গাড়িতে, কেউ পায়ে হেঁটে। নানা নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। সমুদ্রে গিয়ে সব একাকার।'

সর্বধর্মসমন্বয়। এককেন্দ্রসম্মিলন। বিশ্বভাবের পর আবার স্ব-ভাব। এই ভাবটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে: 'রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু এক হয়ে যায় মিলে-মিশে। আবার সন্ধ্যার সময় যখন নিজের-নিজের বাড়ি ফেরে তখন আবার আলাদা হয়ে যায়। যার-যার নিজের ঘরে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকে।'

তেমনি সব ধর্মের সঙ্গেই মেলামেশা, সবাইকেই ভালোবাসা। তার পরে মাঠ ছেড়ে চলে আসবে অঙ্গনে। নিজের ঘরে গিয়ে পাবে নিজের স্বস্থা, নিজের স্বধাম-শান্তি।

প্রত্যেকে মনে করে আমার পথটাই ঠিক পথ। যেহেতু আমি বলছি, আমিই জিতেছি, আর সব হেরেছে। 'কিন্তু', বললেন রামকৃষ্ণ, 'কিন্তু কে জানে, যে

এগিয়ে এসেছে সে হয়তো একটুর জন্যে আটকে গেল। পেছনে যে পড়ে ছিল সে-ই গেল এগিয়ে। গোলকধাম খেলায় অনেক এগিয়ে এসে শেষে পোয়া আর পড়ল না।'

তার পরেই একটি কবিত্বময় উক্তি করলেন, মনোহর উপমায় : 'হার-জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য বোঝা যায় না। দেখ না ডাব উঁচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি। এদিকে পানিফল জলে থাকে—গরম গুণ। আবার মানুষের শরীর দেখ। যেটা তার মূল, মানে মাথা, সেটাই উপরে চলে গেল।'

কে বুঝবে এই ঈশ্বরের লীলা? যদি বুঝতে চাও, তাঁকেই গিয়ে সরাসরি জিগগেস করো, তোমার এ লীলা কেন? তুমি কেন এত সব রচনা করেছ? কেন এত সব জীব-জগৎ, এত চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র? তিনি ছাড়া আর কে তার ঠিক-ঠিক ব্যাখ্যা দেবে?

'তাঁর খুশি।' এক কথায় বলে দিলেন রামকৃষ্ণ।

উপনিষদের সেই বিখ্যাত বাণীটিরই প্রতিধ্বনি। সবই আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গ। আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই যাত্রা, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। তাঁর আনন্দটি জেগে রয়েছে ফুলের মধ্যে গন্ধ হয়ে, ফলের মধ্যে রস হয়ে, আমাদের বুকের মধ্যে প্রেম হয়ে। দুঃখ? বলতে চাও, তোমার মত দুঃখী নেই কেউ সংসারে? সংসারে তুমি একাই দুঃখী নও। প্রত্যেকেই দুঃখী। যে ভাবেই সংজ্ঞা দাও না কেন, এই দুঃখ হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হচ্ছে না বলে। আমরা যে সুখ সন্ধান করি তার মানে ঈশ্বরকেই সন্ধান করি। চরমতম সুখ কোথাও আছে এ জ্ঞানটি আছে বলেই সন্ধানে বিরত হই না। এক থালা ভোজ্য পাবার পর আবার আরেক থালার জন্যে হাত বাড়াই। মনে হয় চরম ভোগের থালাটি এখনো পাওয়া হল না। সেই চরম ভোগ-সুখের থালাই ঈশ্বর।

শান্তি চাওয়ার নামই ঈশ্বর চাওয়া। শান্তির আরেক নাম বিরতি। আরেক নাম পূর্ণতা। তাই ঈশ্বর হচ্ছেন—বিরতির স্থির-তীর।

সেই কথাই হচ্ছিল সেদিন নন্দ বোসের বাড়িতে। কথা হচ্ছিল ঈশ্বরের কেন এত সৃষ্টির আয়োজন। কী প্রয়োজন ছিল? কেন এত ক্রীড়াকৌতুক? কী এর রহস্য? একজন ভক্ত ছিলেন কাছে বসে, কেদার চাটুজ্জে, তিনি বললেন, 'যে মিটিং-এ ঈশ্বর সৃষ্টির মতলব করেছিলেন সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না। তাই কি করে বলব?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর খুশি।'

সব তাঁর আনন্দ। কেউ বদ্ধ হচ্ছে কেউ মুক্ত হচ্ছে কেউ ডুবছে কেউ উঠছে সব তাঁর খেয়াল। কিন্তু কেউই পৃথক-কেউ নয়। সব তিনি। তিনিই বাঁধা পড়ছেন তিনিই ছাড়া পাচ্ছেন। তিনিই তলিয়ে যাচ্ছেন তিনিই আবার মাথা তুলছেন। সব তিনি। আমি বলে কি কেউ আছে? আছে তো তার পরিচয় কী, তার বাড়ি-ঘর কোথায়? আমি-র সন্ধান নিতে গিয়ে তিনিই বেরিয়ে পড়বেন শেষ পর্যন্ত। তাই সব আমিই একদিন তিনি-তে গিয়ে উপনীত হবে।

একদিন-না-একদিন সকলেই তাঁকে জানতে পাবে, দেখতে পাবে। এক জন্ম পরে হোক বা হাজার জন্ম পরে। কত জন্ম ঘুরে এই আমি-র বাহাদুরি করবার সুযোগ পেয়েছ তার খেয়াল আছে? চূড়ান্ত চূড়ায় গিয়ে উঠতে আরো কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তা কে জানে। তবে এটুকু জানো, সকলেই জানতে পারবে ঈশ্বরকে, তোমার আপনার স্বরূপকে। এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপমা দিলেন: 'কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়িতে কেউ অভুক্ত থাকে না। তবে কেউ সকাল-সকাল খেতে পায়, কেউ বা দুপুর বেলা, কারু বা সন্ধে পর্যন্ত বসে থাকতে হয়।'

তবে অনিমন্ত্রিত থাকব না কেউ। কেউ হব না অপাঙক্তেয়।

পরজন্ম আছে তা হলে! তত্ত্বের কথা যাই হোক, উপমাটি ভারি রমণীয়। বললেন: 'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি-সরা রৌদ্রে শুকতে দেয়। ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয় তাহলে তৈরি লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয় কুমোর। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে আবার চাকে দেয়।'

মাটির বাসনের মত বাসনা যদি ভেঙে যায় ধূলি হয়ে তা হলেই মুক্তি। জলের বিম্ব হয়ে জলে ছিলাম আবার জল হয়ে জলে মিশে যাব। জলৌকা যেমন এক তৃণ ত্যাগ করে আরেক তৃণ ধরে তেমনি এক দেহ ছেড়ে আরেক দেহ ধরব। ক্রমে-ক্রমে জন্মমরণপ্রবাহের সমুচ্ছেদ হবে। মিলবে অপবর্গ, অভয় পদাশ্রয়। তার নামই শান্তি, বিরতি, মোক্ষ।

পরজন্ম থাক এখন পরবাসে। ইহজন্মের খবর কি?

১৪

যাকে দেখা যায় না তারই জন্যে বিরহ। যাকে স্পর্শ করা যায় না সেই আবার জল-স্থল ঘর-বাড়ি দেহ-মন সব ভরে রয়েছে। যা শীর্ণ হয় তাই শরীর। যা সরে-সরে যায় তাই সংসার। এক দিকে কাল, আরেক দিকে সংসার। অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, আর চিরপ্রবহমান সংসারস্রোত। কী ভাবে থাকবে এই সংসারে? কত ভাবে কত উপমা গেঁথেছেন রামকৃষ্ণ। একেকটি উপমা একেকটি নক্ষত্র।

'নর্তকীর মতন থাকবে।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'নর্তকী যেমন মাথায় বাসন করে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখনি? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে-হাসতে কথা কইতে-কইতে যাচ্ছে।'

'তেমনি ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করবে।'

আকাশকে মাথায় রেখে পৃথিবী যেমন কাজ করছে, ঘুরছে তার অক্ষদণ্ডকে আশ্রয় করে।

একটি ছন্দের মধ্য দিয়ে দেখতে চাইলেন সৃষ্টিকে। ছন্দ থেকেই বিশ্ব

বিবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব ছন্দের পরিণাম। একটি ছন্দের প্রস্ফুরণ। গতি এগিয়ে চলেছে কিন্তু চরম লক্ষ্য হচ্ছে স্থিতি। ক্রমশই একটি অপরিবর্তনীয় ভাবের সমীপবর্তী হবার চেষ্টা। ক্রমশই সাম্য, স্থৈর্য, সন্নিধি। একটি ধ্রুব শান্তির দিকে লক্ষ্য। গান যেমন বারে-বারে মূলে ফিরে আসে তেমনি সমস্ত গতি বারে-বারে ফিরে আসবে শরণাগতিতে। তার শান্তির মন্দিরে। দুরন্ত ক্লান্ত শিশু যেমন তার মা'র অঞ্চল-প্রান্তে।

'থাকো পানকৌটির মত।' বললেন আবার রামকৃষ্ণ। 'পানকৌটি জলে সর্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই গায়ে আর জল থাকে না।'

একটি পাখির সঙ্গে উপমা।

প্রবৃত্তির মধ্যে আছ, কিন্তু তুমি ব্রহ্মময়ীর বেটা, পঙ্ক ছেড়ে উঠে এস নিবৃত্তির গিরিচুড়ে। বারে-বারে পাখা ঝাড়া দাও। বারে-বারে মেঘ আসে, মুছে ফেল সে মেঘের মালিন্য। দেখাও তোমার সেই অগাধ নীল-কান্তি। ঝড় আনো। সমস্ত মেঘবিকার দূর করে দিয়ে দেখাও তোমার সেই সুনীল সরলতা। স্বচ্ছ অনাবরণ।

আরেকটি পাখির উপমা দেখবে? এ কি কবিতা, না, বিরল চিত্রপট?

'সমুদ্র দিয়ে একটা জাহাজ চলেছে। কখন কে জানে একটা পাখি এসে উড়ে বসেছিল মাস্তুলে খেয়াল নেই। চারদিকে কুলকিনারা নেই দেখে হঠাৎ তার চমক ভাঙল। তখন মনে হল ডাঙায় ফিরে যাই। যাত্রা করল উত্তরে, কোথায় উত্তর? একটি তরুরেখার দেখা নেই, তাই ফের ফিরে এল মাস্তুলে। ভাবল, দক্ষিণে বোধহয় দাক্ষিণ্য আছে, তাই আবার দক্ষিণমুখে পাখা ঝাপটালো। কোথায় দক্ষিণ! দক্ষিণও প্রতিকূল। কূলের সংকেত নেই কোনোখানে। তাই আবার মাস্তুলে এসে হাঁপ ছাড়ল। তারপর, এবার চলল পুবে। পুবেও পূর্ববৎ। শুধু জলের একটানা শুভ্রতা। শ্যামলিমার লেশ নেই। আবার উড়ে এসে মাস্তুল ধরল। সব দিক হল, পশ্চিম দেখতে দোষ কি। হয়তো সেদিকেই মিলবে রঙিন বৃক্ষ-শাখা। হায়, প্রতীচীও পরাঙ্মুখ। তখন পাখি আর কি করে। মাস্তুলের উপরেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ল। আর কোনো দিকে চায় না, কোনো দিকে যায় না। ভাবে, সমুদ্রে এই মাস্তুলই আমার স্থির আশ্রয়। সংসার-সমুদ্রে সমস্ত দিক ঘুরে সমস্ত দিক ত্যাগ করে বোসো এসে বৈরাগ্যের একাসনে।'

আরো একটি পাখি আছে। তার নাম হংস। হংসের এক অর্থ পরমাত্মা। আরেক অর্থ প্রাণবায়ু। পরমাত্মাই প্রাণবায়ু। বলছেন, 'জলে-দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মত দুধটি নিয়ে জলটি ত্যাগ করো।'

পিঁপড়ের যখন পাখা হয়, তখন সে কি পাখি হয়? সেটা তখন তার অহঙ্কারের পাখা, তাই সে তখন মরে। কিন্তু এমন যখন সে ক্ষুদ্র পিপীলিকা, তখন তার থেকেও শেখবার জিনিস আছে। তার আগে, তার পায়ে যে নূপুরের শব্দ হয় তা জানো? সে নূপুরের শব্দ শুনেছেন রামকৃষ্ণ। বলেছেন, 'ঈশ্বর উৎকর্ণ হয়ে আছেন। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরগুঞ্জন শুনতে পান।'

তেমনি তিনি শুনছেন আমার হৃদয়-ঘড়ির টিকটিক। রক্তের ঝুনু-ঝুনু।

এ হেন যে পিঁপড়ে সে কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। সে আমাদের গুরু।

'পিঁপড়ের মত সংসারে থাকো। বালিতে-চিনিতে মিশিয়ে রয়েছে সংসারে। নিত্যে আর অনিত্যে। বালিটুকু ছেড়ে চিনিটুকু নাও।'

একটি মিষ্টত্তার সঙ্গে ঈশ্বরস্বাদের তুলনা দিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কি শুধু মধুরের বৃষ্টিধারা? ক্ষুধার দুঃখ ছাড়া ভোজনের সুখ কই? সারা দিন মন যদি উম্মনা না হয়, তবে কিসের মিলনসন্ধ্যা? যদি উন না থাকে তবে কিসের পূর্ণ? না, ঈশ্বর একটি ব্যথার মত। নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা। নিদ্রাহীন নিরঙ্কুশ ব্যথা। রামকৃষ্ণ বললেন, 'দাঁতের ব্যথার মত।'

এমন কোনো যন্ত্রণা নয় যে বিছানায় নিশ্চল করে রাখে। হাত-পা সুস্থ, তাই ব্যথা সত্ত্বেও কাজ করতে হয়, কিন্তু যাই কাজ করো, সর্বক্ষণ মন পড়ে থাকে ব্যথার দিকে। তেমনি দু হাতে কর্তব্য করে যাও কিন্তু মন রাখো সেই ব্যথার দিকে। ঈশ্বরের দিকে। এমন ব্যথা নয় যে তোমাকে কাজ থেকে ছুটি দিচ্ছে—অথচ এমন ব্যথা যে তোমাকে একদণ্ডও ভুলে থাকতে দিচ্ছে না। ঈশ্বর তোমাকে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন, অথচ নিয়ত জাগ্রত হয়ে আছেন একটি নিরুচ্ছেদ ব্যথার মত।

ব্যথা হয়ে প্রথমে মনে করান, পরে মন ভোলান আনন্দ হয়ে। যে ব্যথা সেই উপশম। যে ব্যাধি সেই চিকিৎসা। ব্যথা আর আনন্দের মধ্যে মনে হচ্ছে পারাপারের সেতু। এই হাটে ব্যথা তো ঐ হাটে আনন্দ।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাটা তিনি বুঝিয়েছেন আরেকটি তীক্ষ্ন উপমা দিয়ে: 'সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মতো থাকো।'

নষ্ট স্ত্রী নীরবে হাসিমুখে ভালোমানুষটির মত ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু মন পড়ে রয়েছে উপপতির উপর। কেউ জানতেও পাচ্ছে না তার মনের চঞ্চলতা, তার মনে ঔৎসুক্য। চোখ দুটি তার সমস্তক্ষণ পিপাসু হয়ে রয়েছে কখন তার বন্ধুর সে একটি ইশারা পায়। গায়ের রক্ত উৎকর্ণ হয়ে আছে কখন তার একটি শব্দ শোনে। নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আছে কখন বাতাসে আসে তার একটি সুবাসের আভাস। তেমনি সর্বক্ষণ উচাটন হয়ে থাকো। থেকে-থেকে ঈশ্বরের সংকেতটি কুড়িয়ে নাও। বেণু কোথায় কে জানে, তার ধ্বনিটি শোনো। দীপ কোথায় কে জানে, তার আলোটি দেখ। তোমার আশে-পাশে, সংসারের চার দিকে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কত ইশারা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় চক্ষুষ্মান হও। বৃষ্টিবিন্দুতে দেখ সেই আকাশের প্রতিবিম্ব।

সংসারে অভ্যাগত এই যে একটি নবজাত শিশু—এর মুখের হাসিটি কার হাসি? প্রথম মমতার স্পর্শে মা'র চোখে যে কোমল-বিহ্বল দৃষ্টি, এটি কার দৃষ্টি? তুমি না দেখবে তো তোমার জানলার ওপারে চাঁদ কেন? তুমি যদি না শুনবে তবে সমুদ্র কেন মাথা কুটে মরছে? তুমি ঘরে এসে স্তব্ধ হলেও সে কেন স্তব্ধ হচ্ছে না? কোন অজানা অরণ্যে বিজনে যে একটি ফুল ফুটেছে সে তো তুমি একদিন এসে দেখবে বলেই। এবারের বসন্তটি চলে গেল। ভয় নেই, তুমি

যদি দেখ সে আশায় আবার সে আসবে। নিয়ে আসবে তার মুহূর্তের প্রজাপতি। তুমি দেখবে সেই আনন্দে আবার সে ফুল ফোটাবে, রঙ ধরাবে, উঁকিঝুঁকি মারবে। বারে-বারে তাকে ফিরিয়ে দিলেও সে ফেরে না। শুধু অপেক্ষা করে। ঝরা-পাতার কান্নার পর পুঞ্জে-পুঞ্জে কিশলয় হয়ে কচি-কচি আঙুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যদি তুমি সাড়া দাও। দিনে-রাত্রে তারায়-তৃণে তোমাকে অসংখ্য চিঠি লেখে, যদি মন-কেমন-করা ভাষায় কখনো একটা উত্তর দিয়ে ফেল।

১৫

রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ।' জোরদার ভাষায় একটি বাস্তব বর্ণনা দিলেন: 'দহে একবার নৌকো পড়লে আর রক্ষে নেই। শেঁকুল কাঁটার মত একটা ছাড়ে তো আরেকটা জড়ায়। গোলকধাঁধায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা-পোড়া হয়ে যায়।'

তবুও মানুষ ঢোকে। জেনে-শুনে চোখ-কান খোলা রেখেই ঢোকে। জানে কোথায় যাচ্ছে তবু ফেরবার উপায় নেই।

'উটের মত।' রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন: 'উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে তত রক্ত পড়ে দরদর করে। তবু সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না।'

এইটেই মানুষের ট্র্যাজেডি। যদি সে না-বুঝত, না-জানত, যদি সে মাত্র একটা কায়িক যন্ত্র হত, তবে হয়তো জমত না এই বিয়োগান্ত নাটিকা। সে জানে-শোনে-বোঝে, তবু আগুনে হাত দেয়, শৃংখল পরে, সুখের আশায় বাসা বাঁধে।

কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন: 'পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে বিলের ধারে বা মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির মধ্যে জল চিকচিক করে দেখে ছোট মাছগুলির ভারি ফুর্তি। সুখের আশায় ঢোকে গিয়ে সেই ঘুনির মধ্যে। যে পথে ঢুকেছে সে-পথেই বেরিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দে আর অন্য মাছের সঙ্গে খেলায় ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না। পরে প্রাণে মরে।'

এই সংসারের চাকচিক্য। নয়নহরণ প্রচ্ছদপট। সার নেই, শুধু সঙের মিছিল। তাই আবার ছন্দ গেঁথেছেন: 'সংসার হচ্ছে আমড়া। আঁটি আর চামড়া।' তারপর সেই 'কৌপীনকা ওয়াস্তে'-র গল্পটি মনে করো: 'সামান্য কুটির বেঁধে সাধন-ভজন করে সাধু। জগতে সম্বলের মধ্যে একটি কাপড় আরেকটি কৌপীন। হয়তো দিনে ভিক্ষায় বেরিয়েছে কিংবা রাতে ঘুমিয়েছে ইঁদুর এসে কৌপীন কেটে দেয়। গৃহস্থের দুয়ারে বস্ত্রখণ্ড ভিক্ষা করতে লাগল সাধু। কাঁহাতক কে কাপড় দেবে, সবাই বললে, ইঁদুর তাড়াবার জন্যে বেড়াল পুষুন।

ন্দ কি। সাধু বেড়াল পুষল। কিন্তু বেড়ালকে খাওয়ায় কি ? দুধ ভিক্ষা করতে বরুল সাধু। কিন্তু কাঁহাতক লোকে দুধ দেবে ? পরামর্শ দিলে, গাই পুষুন। সই ভালো। বেড়ালকে দিতে পারবে, নিজেও খেতে পাবে কিছুটা। গাই কিনে আনল সাধু। কিন্তু গরুর আবার খড় দরকার। খড়ের জন্যে আবার ভিক্ষায় বেরুল। কাঁহাতক লোকে খড় দেবে ? কুটিরের সামনে পোড়ো জমি আছে তাতে চাষ করুন। বহুত আচ্ছা। সাধু চাষ দিয়ে ধান ফলালো।' এখন ফসল তোলে কোথায় ? মস্ত এক গোলাবাড়ি তৈরি করলে। এমন সময় সাধুর গুরু এসে উপস্থিত। চারদিকের কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব বনে গেল। জিজ্ঞেস করলে, এ সব কি ? সাধু অপ্রতিভ মুখে বললে, প্রভুজী, সব কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এইখানেই ট্র্যাজেডি। এইখানেই গল্পরচকের রসবোধ। গুরুর মুখ দিয়েই তিরস্কার করানো যেত : তুমি এ সব কী করেছ ? তুচ্ছ একটা কৌপীনের জন্যে এত মেহনৎ, এত আয়োজন ? না, গুরুকে দিয়ে বলালেন না, সলজ্জমুখে শিষ্যকে দিয়েই বলালেন, প্রভুজী, এক কৌপীনকা ওয়াস্তে। তার মানে যখনই সাধু বেড়াল কিনেছে তখনই জেনেছে, ফাঁদে পা দিলুম। ফাঁস দিলুম গলায়। ফাটকে আটক পড়লুম।

তেমনি আমরাও জেনে-শুনে সংসারের পিঞ্জরে এসে ঢুকেছি। একটার পর একটা জিনিস জমা করছি। ভারের পর আবার সম্ভার, সঙ্গের পর আবার অনুষঙ্গ। একটা জিনিসের জন্যে আরেকটা জিনিস। স্তূপের পর স্তূপ। শুধু প্রাণহীন প্রয়োজনের আয়োজন। কিন্তু যত কিছু দিয়েই না ঘর সাজাই, শূন্য দেখায়, শুকনো দেখায়। সে ঘরে ঈশ্বরকে আনা হয়নি। ঈশ্বরকে আনলে ঘর এমনিতেই পূর্ণ হয়ে থাকত। জিনিস রাখবার আর জায়গা হত না। সংসারকে আবার বলেছেন, 'কাজলের ঘর। কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, একটু না একটু দাগ লাগবেই।'

তা লাগুক। উপায় নেই। কেননা, রামকৃষ্ণেরই কথায়, 'যে বাটিতে রশুন গুলেছ সে বাটি হাজার ধোও, রশুনের গন্ধ যায় না।' তা না যাক, তবু ধোও। ক দিয়ে ধোবে ? চোখের জল দিয়ে। চোখের জল দিয়ে যদি ধোও, মুছে যাবে কাজলের দাগ, দূরে যাবে রশুনের গন্ধ।

মানুষের মন কী !

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি।'

এমন একটি ব্যঞ্জনাময় উপমা নেই আর বাংলা ভাষায়। ঐ পুঁটলিটির মধ্যে বিস্ময়রসের রহস্য ভরা। নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। 'সরষের পুঁটলি যদি একবার ছড়িয়ে যায় তবে তা কুড়োনো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি মন যতই কামে-কাঞ্চনে ছড়িয়ে যাবে ততই তাকে গুটোনো শক্ত হবে।'

তাই পুঁটলির ফাঁসটা সম্পূর্ণে খুলে দিও না। মনের কিছু সঞ্চয় পুঁটলির মধ্যে জমা রাখো। দেখছ না বালকের মন ? পুঁটলির গ্রন্থি তার আঁট, কোনো কিছুতেই তাই তার আঁট নেই। তার মন সে ছড়িয়ে দেয়নি, দেয়নি বিলিয়ে।

কিন্তু উপায় কী ? যখন থাকতেই হবে সংসারে, তখন কী ভাবে থাকবে ?

'কচ্ছপের মতন থাকো। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু ডিম থাকে আড়াতে। যেখানে ডিম সেখানেই তার মন পড়ে থাকে।

আরো একটি সুন্দর উপমা দিলেন অন্য উপাদানে। এবারে একটি মনিব-বাড়ির ঝিয়ের উপমা। 'ঝি মনিবের বাড়িতে চাকরি করছে মন দিয়ে। মনিবের বাড়িকেই আমার বাড়ি বলছে। কিন্তু মন পড়ে আছে তার দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলে হরিকে মানুষ করছে, আর বলছে, আমার হরি। হরি আমার ভারি দুষ্টু হয়েছে, হরি আমার মিষ্টি খেতে একদম ভালোবাসে না। মুখে আমার হরি বলছে বটে, কিন্তু মন বলছে ও আমার কেউ নয়। ওর মন পড়ে আছে দেশের বাড়িতে যেখানে হয়তো আছে ওর নিজের পেটের ছেলে।'

এ পৃথিবী পান্থনিবাস। রেলস্টেশনের যাত্রীখানা। কিংবা ধরো চাঁদনি-বাজার। কাজ শেষ হলেই দেশে যাব। বাজার থেকে সওদা করে নিচ্ছি। কিন্তু যা সওদা করছি তা কি দেশে যাবার পাথেয় ? বিদেশভ্রমনে গেলাম, কিন্তু মন ঠিক আছে বাড়ি ফিরব। প্রবাসবাসই আমার স্ববাস নয়। মন পড়ে আছে কতক্ষণে মাকে গিয়ে দেখব, দেখব আমার আর সব প্রিয়জন। পাব ফিরে আমার স্বাভাবিক পরিবেশ। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকেই যাই, অলি-গলি যেখানেই ঘোরাফেরা করি মন খাঁটি করে রেখেছি কোথায় আমার বাড়ি-ঘর। কিন্তু এই যে দু-দিনের জন্যে এসেছি এই পৃথিবী-প্রবাসে, হাটে ঘুরে-ঘুরে ভুষিমাল সওদা করছি, এর পর কোথায় যাব ? সমস্ত গমনা-গমনের অবস্থাতেই একটা গন্তব্যের কল্পনা আছে, শুধু এই মর্তযাত্রার পরিশেষেই কোনো আশ্রয়-আচ্ছাদন নেই ? জংশন-স্টেশনে যখন গাড়ি বদল করব তখন সে-গাড়ি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ? যেখানে আমাদের নিয়ে যাবে সেখানেই কি আমাদের আসল বাড়ি নয় ? সেখানেই কি আমাদের মা দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে নেই আমাদের পথ চেয়ে ? সব বাড়ির ঠিকানা জানি, আর এ বাড়ির ঠিকানা জানব না ? সে ঠিকানা তারার অক্ষরে আকাশময় লেখা হয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। দুধ যদি জলে ফেলে রাখো, দুধের আর পাত্তা পাবে না। তা হলে কী করবে ? দুধকে দই পেতে মন্থন করে মাখন করবে। মাখন করে ফেলে রাখো জলের উপর। ভাসো। জ্ঞানভক্তিতে ঘনীভূত হয়ে ভাসো সংসারসমুদ্রে।'

একেই আবার বলেছেন, 'থাকো পাঁকাল মাছের মত। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁকের চিহ্ন নেই। গা পরিষ্কার, ঝকঝক করছে।'

উপমার মধ্যে কত বৈচিত্র্য। থাকবে যে, করবে না কিছু ? কী করলে তেমন-তেমন থাকা হবে ? রামকৃষ্ণ বললেন, 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙবে। হাতে তেল মেখে নিলে আঠা আর জড়ায় না।'

এই তেল হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। সমস্ত মনে রগরগে করে ঈশ্বরভক্তির তেল মেখে নেবে। তা হলেই আর আসক্তিতে আঠার মত আটকে থাকবে না সংসারে। সংসারে

কাজ করতে এসেছ কাজ করে যাও, কিন্তু মন রাখো মুষলের দিকে। এবার উপমা দিলেন ঢেঁকির: 'ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আরেকজন নেড়ে-নেড়ে দেয়। হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এ দিকে ছেলেকে মাই দেয়, আরেক হাতে বা খোলায় ভিজে ধান ভেজে নেয়। ওদিকে আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে—তোমার এত বাকি আছে, দিয়ে যাও।'

একটি অপূর্ব চিত্র। ঈশ্বরে মন আকৃষ্ট রাখবার একটি অভিনব দৃষ্টান্ত। শুধু দাঁড় টেনে যাও, চোখ রাখো ধ্রুবতারার দিকে। মোট কথা, চার দিকে গোলমাল। তা হোক। রামকৃষ্ণ বললেন, 'গোলমালের মধ্যেও বস্তু আছে। গোলমালের গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'

এমন সহজ করে আর কি কোথাও বলা আছে? সংক্ষিপ্ততার মধ্যে আর কোথাও কি আছে এমন সন্দীপ্তি?

১৬

কিন্তু যতই বলো, 'থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে'—এ তুলনার তুলনা নেই। যেমন আশ্চর্য তেমনি অদ্ভুত। মৌলিকতায় দুঃসাহসিক। চারদিকে এলোমেলো ঝড় বইছে। আর এই সংসারের ভোজনশালা থেকে বেরিয়ে আসা এঁটো পাতা ছাড়া আর আমরা কী! একবার বলেছেন, নষ্ট স্ত্রী। এবার বললেন, উচ্ছিষ্ট পাতা। প্রথমটা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা বোঝাবার জন্যে। দ্বিতীয়টাতে বোঝালেন শরণাগতি, সর্বসমর্পণের আনন্দ।

'এঁটো পাতা পড়ে আছে বাইরে—যেমন হাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি উড়ে যাচ্ছে। কখনো ঘরের ভিতর, কখনো বা আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায় পাতাও সেই দিকে যায়। কখনো ভালো জায়গায় কখনো মন্দ জায়গায়। তোমাকে যখন সেখান থেকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন, তখন যা হয় হবে। চৈতন্যবায়ু যেমনি মনকে ফেরাবে তেমনি ফিরবে।'

একেই বলে শরণাগতি। শরণাগতি নিষ্ক্রিয়তা নয়, নিষ্কামক্রিয়তা। কাজের জন্যে কাজ করা, ফলের জন্যে নয়। খেলার জন্যে খেলা, জিতের জন্যে নয়। ফল যদি জোটে ভালো, যদি না জোটে তাও ভালো। যদি জিতি আনন্দ আছে, যদি হারি আপত্তি নেই। এরই নাম শরণাগতি। আমি করছি, গড়ছি, লড়ছি। তবু জানি তোমার হাতের জয়মাল্য আমার জন্যে নয়। না হোক, দুঃখের নির্দয় রূক্ষতা সইতে আমাকে যে তুমি ডেকেছ সেই তো তোমার দয়া। রেখেছ যে আমাকে ক্ষমাহীন সংগ্রামের কাঠিন্যে সেই তো তোমার কোমলতা। আমি তোমার নির্বাচিত। তোমার চিহ্ন বহন করবার জন্যেই সইছি এত প্রসন্ন প্রহার। ক্ষতের ব্রত উদ্‌যাপন করছি। আমি নইলে আর কে পেত তোমার মনোনয়ন?

আমার জয় নয়, আমার অভয়। আমার বিলাস নয়, জীবনোল্লাস। মনোনয়ন কি আর সাধে পেয়েছি? আমার মনের মধ্যে তোমার নয়ন দুটি নিত্য হয়ে রয়েছে। এই শরণাগতির ভাবটি আবার ফুটিয়েছেন আদালতের ভাষায়। বললেন, 'ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দাও।'

বলেই বাঁদর-বেড়ালের দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, 'বাঁদরের বাচ্চা হয়ো না, বেড়ালের বাচ্চা হও।'

একটি সার্থক কবিতা। ব্যঞ্জনা সুদূরপ্রসারী। বাঁদরের বাচ্চা কি করে? এক ডাল থেকে লাফিয়ে আরেক ডালে সে তার মাকে ধরতে যায়। কখনো-কখনো ঠিক মাপ বুঝে লাফ দিতে পারে না, ডাল ফসকে পড়ে যায় মাটিতে। মাটিতে পড়ে গিয়ে কিচিমিচি করে। আর বিল্লির বাচ্চা করে কি। বিল্লির বাচ্চা শুধু মিউ-মিউ করে ডাকে। কোনো কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই। কোথায় যাবে কি করবে কিছুই জানি না। তার মা এসে তার ঘাড় কামড়ে ধরে যেখানে নিয়ে যাবে সে সেখানেই রাজী। কোনো বিতর্ক নেই বিরুদ্ধতা নেই। প্রতিবাদ নেই পরিবাদ নেই। কখনো নিয়ে যাচ্ছে ছাইয়ের গাদায়, পুঞ্জীকৃত দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে—কখনো বা হেঁশেলে আখার ধারে, মধ্যবিত্ত উত্তাপ ও বিপন্নতার মধ্যে, যেখানে উষ্ণতা আছে আবার গিন্নির হাতে ঠ্যাঙা খাবারও ভয় আছে—কখনো বা বাবুদের বিছানায়, দুগ্ধফেননিভ শুভ্র আভিজাত্যে, কোমল-উচ্ছল বিলাসিতায়।

আমি কি জানি কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমি যে একা-একা যাচ্ছি না, পায়ে-পায়ে তুমি যে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছ এইটুকুই আমার সাহস, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। দারুণ-পিশুন খরতাপের মধ্য দিয়ে- নিয়ে চলেছ, চলেছি একটানা—জানি না কোথায় তোমার বৃক্ষছায়া। তুমি আমার কাছে ছায়া হয়ে আসোনি, এসেছ রৌদ্র হয়ে। শান্তি হয়ে আসোনি, এসেছ ক্লান্তি হয়ে। তোমার কৃপা দেখা দিয়েছে কষ্টের মূর্তিতে। আমাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছ, পূব-দিগন্তে নেই তোমার জ্যোতির মন্ত্রোচ্চার। না থাকুক, এই অন্ধকারই তোমার উচ্চারণ। আমার অমাবস্যা, উন্নিদ্র রাত্রির নিস্তপন তপস্যা। সেই তপস্যাতেই আমার সূর্য-সৃষ্টি। আমার যত ভার সে হচ্ছে অপহার। তোমার যত ভার সে হচ্ছে উপহার। আমার নিজের জন্যে কান্না সে হচ্ছে আর্তনাদ, আর তোমার জন্যে কান্না সে হচ্ছে সঙ্গীত। আমি বৃষ্টিহীন মরুভূমি। হে জীবন্ত সবুজ, হে জ্বলন্ত সবুজ, তোমার স্পর্শে আমাকে শ্যামায়মান করো। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই তাকে ধরিস না, এমন কর যেন সে তোকে ধরে।'

কবির গভীর ভাবে ভরা এই কথাটি।

যদি নিজের থেকে তোমাকে ধরি তবে নিজের থেকেই তোমাকে কখন আবার ছেড়ে দেব। যতক্ষণ কণ্টকে আছি ততক্ষণ তুমি আছ একটি শাণিত নিশ্চিতির মতো। যেই আবার কুসুমে যাব অমনি আবার ডুবে যাব সুকোমল বিস্মৃতিতে। যতক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকবে দুঃখের অমানিশা ততক্ষণই জেগে থাকবে আমার জাগ-প্রদীপ। যেই উৎসারিত হয়ে পড়বে সুখের সূর্যালোক অমনি ঘৃতের প্রদীপটি

নিবিয়ে দেব ফুঁ দিয়ে। ভাবব এ আলো বুঝি আমার অহংকারের অলংকার। কিন্তু আবার মিলিয়ে যাবে এ জলের আলপনা। চকিত-চিত্রিত রামধনু। হায়, যতক্ষণ ভালো আছি ততক্ষণ ভুলে আছি। যখনই আবার মন্দে যাব তখন আবার মৃদুমন্দ তোমার গন্ধ এসে গায়ে লাগবে।

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'এমন এক অবস্থা সৃষ্টি কর যাতে সে তোকে ধরে। সে যদি একবার ধরে, তাহলে সে আর কখনো ছেড়ে দেবে না। বলে এক গল্প ফাঁদলেন : 'সরু আল পথ দিয়ে বাপ দুই ছেলেকে নিয়ে চলেছে। বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরেছে। আর ছোট ছেলেটিকে বাপ আরেক হাতে বুকে করে নিয়ে চলেছে। সে দাদার মত সেয়ানা নয়, স্বাধীন নয়, সে আছে বাপের নির্ভয়ের দুর্গে। তারপর হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক শংখচিল উড়ে গেল—'

আকাশের নীল দিঘিতে ফুটে উঠল গুচ্ছ-গুচ্ছ শ্বেতপদ্ম। রামকৃষ্ণ যে কবি এই শংখচিলই তার প্রমাণ।

'পাখি দেখে দুই ভাই হাততালি দিয়ে উঠল। তার মানে, দুই ভাই-ই হাত ছেড়ে দিল। তার ফল হল কি ? হাত-ছাড়া বড় ভাই পড়ে গেল নিচে, পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল। আর ছোট ভাই ? সে নিঃশংক। সে কিছুতেই পড়বে না। তাকে বাপ ধরে আছে। সে স্বচ্ছন্দে হাততালি দিয়ে যাবে।'

সম্পদে-বিপদে পদে-পদে ঈশ্বর আমাকে ধরে থাকুন। নয়ন নিজেকে দেখতে পায় না। তাই যিনি নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছেন তাঁকে কী করে দেখব ? তিনি থাকুন আমার দর্পণ হয়ে। নয়নে-নয়নে তাঁকে দেখি।

রামকৃষ্ণের প্রথম কাব্যচেতনা এসেছিল মেঘের কোলে ওড়া এই উড়ন্ত বকের ঝাঁক দেখে। রামকৃষ্ণ তখন ছ বছরের ছেলে, কোঁচড়ে করে মুড়ি খেতে-খেতে চলেছে গাঁয়ের আল-পথ দিয়ে। আকাশে নিকষ-ঘন নিবিড় কালো মেঘ জমেছে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল রামকৃষ্ণ। দেখল সেই দলিত-অঞ্জন মেঘের প্রান্ত ঘেঁষে এক ঝাঁক শাদা বক উড়ে চলেছে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল চোখ দুটি। ভাবল এই দুটি কবিতার পঙক্তি কার রচনা, কে লিখেছে এই শাদা-কালোর, অশ্রু-আনন্দের শ্লোক ? একটি পঙক্তি কৃষ্ণ মেঘশ্রেণী, আরেক পঙক্তি শ্বেত হংসবলাকা। দুয়ে মিলে এক বিচিত্র দিব্যকাব্য।

কোথায় চলেছে এই বকের পাঁতি। কোন নিরুদ্দেশের সন্ধানে ? দিনের শেষে কোন সুন্দর অন্ধকার ওদের ডাক দিল ? পথ দেখাল ?

তেমনি আমার মন যে ভোলাল সে কোথায় ? চিনি নে, জানি নে, বুঝি নে, তবু তার দিকে প্রাণ-মন ছুটে চলে। সে কি একটুখানি দিয়ে ভুলিয়েছে ? অজস্র হয়ে অকৃপণ ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছে দশ দিকে। কত সুধা কত সুখ কত শোভা কত সুর ! তাই না ছুটে চলেছি মেঘের কোলে ঘর ছাড়া বকের পাঁতির মত ! অন্ধকারে তার দেখা পাব কিনা জানি না, তবু তাকে দেখতে যে যাত্রা করেছিলাম একদিন, সেই যাত্রার ছন্দটুকু কম্পিত হোক আমাদের পাখার আন্দোলনে !

শরণাগতির আরেকটি গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'বনে ভ্রমণ করতে-করতে পম্পা সরোবরের ধারে চলে এসেছে রাম-লক্ষ্মণ। স্নান করতে নামবে, লক্ষ্মণ সরোবরের পারে মাটিতে তার ধনুক পুঁতে রাখল। স্নানের পর উঠে এসে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি? রাম বললে, ভাই দেখ-দেখ বোধ হয় কোনো জীবহিংসা হল। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখল মস্ত একটা কোলা ব্যাঙ! মুমূর্ষ অবস্থা! রাম করুণ স্বরে বললে ব্যাঙকে লক্ষ্য করে, তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা জানতে পারতাম, তা হলে তোমার আর এমন দশা হত না। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চেঁচাও। ব্যাঙ বললে, রাম, যখন সাপে ধরে, তখন রাম রক্ষা করো রাম রক্ষা করো, বলে ডাকি। এখন দেখছি স্বয়ং রামই আমাকে ধরেছেন। তাই চুপ করে আছি।'

একেই বলে দুঃখে-মরণে স্থির বুদ্ধি। একেই বলে আত্মসমর্পণ।

১৭

মানুষ কে? রামকৃষ্ণ একটি বিস্ময়কর সংজ্ঞা দিলেন। বললেন, 'মান-হুঁস-মানুষ।' যার নিজের মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই মানুষ।

মানুষের মধ্যে যে যমক ছিল সেটা লাগে এসে চমকের মত। যেমন, 'যে শিরদার সে সরদার,' তেমনি 'যে মান-হুঁস সে মানুষ।'

কিসের মান? আমি প্রকাণ্ড রাজা-রাজড়ার ছেলে সে মান নয়, আমি অমৃতের সন্তান। আমি অনৃতের সন্তান নই, আমি অমৃতের সন্তান। আমি নিষ্কিঞ্চন নই, আমি সর্বেশ্বর। চাই এই বোধশক্তি। এই চৈতন্যের প্রাপণা। কিন্তু আমি যদি তাঁর ছেলে তবে আমার এই দীন বেশ কেন? কেন শুধু আমার দিনগত পাপক্ষয়? রামকৃষ্ণের আবার একটি মুক্তোর মত সূক্তি: 'রাজার বেটা হ, ঠিক মাসোয়ারা পাবি।'

আমরা কি রাজার বেটা হয়েছি? সেই রাজটিকা কি পরেছি? আমাদের রক্তে লিখে নিয়েছি কি সেই স্বাক্ষরের ঔজ্জ্বল্য? যদি তাই নিতাম, তবে জীর্ণ নির্মোকের মত খসে যেত এই দীনসাজ। উত্তীর্ণ হতাম এক জ্যোতির্ময় উদ্ঘাটনে।

'একটি ছোকরা সন্ন্যাসী গৃহস্থ বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েছিল।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'সে আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটি যুবতী মেয়ে এসে তাকে ভিক্ষে দিলে। সন্ন্যাসী বললে, মা, এর বুকে কি ফোঁড়া হয়েছে? মেয়েটির মা বললে, না বাবা। ওর পেটে ছেলে হবে বলে ঈশ্বর স্তন দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বললে, তবে আর ভাবনা কি! আমি আর কেন তবে ভিক্ষে করব? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে খেতে দেবেন।'

এ কি সত্য ? এক হাতে কাজ করছি আরেক হাতে তাঁকে ধরে আছি। কিন্তু যখন একদিন দু হাত ছেড়ে দিতে পারব তখন কি তিনি নুয়ে পড়ে আমাকে তুলে ধরবেন না ? কিন্তু দু হাত ছেড়ে যে দেব, তিনি কি আছেন ?

প্রত্যেক ছন্দোবন্ধ কবিতার একজন কবি আছে আর এ সৃষ্টি-কবিতার একজন কাব্যকর্তা নেই ? নেই তো এত ছন্দ কেন, এত ঐক্য কেন, বৈচিত্র্যের মধ্যেও কেন এত পারম্পর্য ? এই ঋতুর পর্যায়, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আবার শীতের পর মধুমাস। এই বয়সের ক্রমান্বয়, বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন। কেন বা একটি অবধারিত অবসান। যেখানে এমন একটা রীতির দৃঢ়তা, সেখানে কি একজন নিয়ন্তা নেই ? সে গৃহে আমরা সহজেই একজন গৃহস্বামী কল্পনা করি যে গৃহে আলো জ্বলে, যে গৃহের ঘর-দোর সাজানো-গোছানো। তবে এই বিশ্ব-সৃষ্টির ঘরে এত যে আলো জ্বলছে, সূর্যে-চন্দ্রে আর নক্ষত্রে, সে ঘরের কি একজন কেউ কর্তা নেই ? যেখানে এত সৌষ্ঠব এত পারিপাট্য সেখানে কি নেই কোনো কারিগর ? গ্রন্থ আছে প্রণেতা নেই, চিত্র আছে শিল্পী নেই, এ কখনো শুনিনি।

অকূল সমুদ্রে যতক্ষণ আস্ত গাছ ভেসে এসেছে, বলেনি কিছু কলম্বস। কিন্তু যেই কাটা কাঠের টুকরো একটা ভেসে আসতে দেখল তখন সে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল। কাটা কাঠের টুকরো যখন, তখন নিশ্চয়ই আছে একজন কর্তক। সেই আশ্বাসেই ঢেউ ভাঙল। মিলল একদিন আমেরিকার মাটি।

তেমনি এ পৃথিবী যদি কারু ছিন্ন পাতার তরণী হয়, তবে এর পেছনেও আছে একজন নির্মাতা। খামখেয়ালী বলতে চাও বলো, কিন্তু আছে একজন নিয়ামক। ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে আসা অকারণ দুর্ঘটনা বলতে পারো না। দুর্ঘটনাই যদি হবে, তবে রোজ সূর্য উঠবে কেন, কেন সকলে মরবে ? এমনও তো হতে পারত, একদিন সূর্য উঠল না, কে একজন অমর হয়ে রইল। তা যখন নেই তখন বলো একটা কিছু আছে। সে একটা কী, নাম দাও। বলতে চাও, বলো, শক্তি, প্রকৃতি, নীতি, কিংবা যা আর তোমার মনে ধরে। আমি নামের মধ্যে অন্তরঙ্গতার একটু সুর মিশাই। তোমরা তাকে পোশাকী নামে ডাকো আমি ডাকি ডাক-নামে। আমি বলি, হরি, রাম, কৃষ্ণ। হরি মানে যে মনোহরণ করে। রাম মানে যে রমণীয় নয়নাভিরাম। কৃষ্ণ মানে যে নিরন্তর আকর্ষণ করে তার দিকে।

তোমরা জজসাহেব বলো, আমি তার কোট-কলার-গাউনের অন্তরালের মানুষটিকে খুঁজি, ডাকি তাকে অমুক বাবু বলে। কিন্তু, যে নামই দাও, তাকে কি দেখা যায় ? তৃপ্তিকর ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ : 'দিনের বেলায় তো তারা দেখা যায় না, তাই বলে কি বলবে তারা নেই ? যদি তারা দেখতে চাও দিনান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। দুধে যে মাখন আছে তা কি দুধ দেখে ঠাহর হয় ? যদি মাখন দেখতে চাও তবে দুধকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে দই পাতো। তারপর সূর্যোদয়ের আগে সে দই মন্থন করো। তবেই দেখতে পাবে মাখন।'

একটি বাস্তবধর্মী কবিতা। কাঠে আগুন আছে শুধু এ তত্ত্বে তো ভাত রান্না

হবে না। কাঠের নিহিত আগুনকে নিষ্কাশিত করতে হবে। মাটির নিচে জল আছে এ জ্ঞানে কি তৃষ্ণা নিবারণ হবে ? পরাঙ্মুখ মাটিকে খনন করতে হবে। যেতে হবে গভীর থেকে গভীরতরে। এরই নাম সাধন। কিন্তু কি করে মিলবে সেই জীবনসাধনকে ? আরেকটি বাস্তবপন্থী উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু কাব্যমণ্ডিত : 'কোনো বড় পুকুরে মাছ ধরতে হলে কী করো ? যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের কাছ থেকে খোঁজ নাও। খোঁজ নাও কী মাছ আছে, কী চার লাগে, কী টোপ গেলে। খোঁজখবর নিয়ে সে রকম ব্যবস্থা করো। ছিপ ফেলা-মাত্রই মাছ ধরা পড়ে না, স্থির হয়ে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করো। তারপর ক্রমে ঘাই আর ফুট দেখতে পাও। মনে তখন আনন্দময় বিশ্বাস আসে যে মাছ সত্যি আছে আর তুমিও ধরতে পারবে সে মাছ।'

এই সৃষ্টি হচ্ছে পুকুর। মাছ হচ্ছে ঈশ্বর। যাদের থেকে খোঁজ করতে হবে তারা গুরু। চার হচ্ছে ভক্তি। মন ছিপ, প্রাণ কাঁটা, নাম টোপ। আর ঘাই আর ফুট হচ্ছে ঈশ্বরের ভাবরূপ। আগে বিশ্বাস করো তিনি আছেন, তবে তো তাঁকে পাবার চেষ্টা করবে। যদি বিশ্বাসের সহজ পথে না আসতে চাও, আরোহণ করো জ্ঞানের উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া। সে পর্বতপথ আরোহণ করবার মত, আমরা সংসারী লোক, আমাদের স্নায়ুও নেই আয়ুও নেই। আমরা আছি বিশ্বাসের সমতলে। বলে কিনা, ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কী ? তোমার বাবা যে অমুক চন্দ্র অমুক, প্রমাণ কী ? প্রমাণ, বিশ্বাস। মা বলে দিয়েছেন অমুক তোমার বাবা, বিশ্বাস করেছ। বিশ্বাস করেছ, কেননা মাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো।

তেমনি খুঁজে দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে ঘর-করা এমন কাউকে পাও কিনা যাকে মা'র মতো ভালোবাসতে পারো। বিশ্বাস করতে পারো মা'র মতো। সে যদি বলে ঈশ্বর আছেন, তবে মানবে না কেন ? আর, যদি একবার মানো, তবে কী ওজুহাতে ফিরে যাবে ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুই হাসপাতালে এলি কেন ? যদি একবার এলি, তবে যতক্ষণ না বড় ডাক্তার তোকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে ততক্ষণ তুই ছাড়তে পাবি না হাসপাতাল। তুই এলি কেন ?'

ঈশ্বর সন্ধানে আসা মানে আরোগ্য সন্ধানে আসা। বড় ডাক্তার মানে গুরু—ভবরোগবৈদ্য। যতক্ষণ না গুরু বলছেন ভালো হয়েছি ততক্ষণ নিষ্কৃতি নেই।

১৮

তাই প্রথমতম এই প্রার্থনা : ভগবান, তোমার অস্তিত্বে আমাকে বিশ্বাসবান করো। আর কিছুই চাই না, সত্যিই তুমি যে আছ শুধু এইটি আমাকে ঠিক-ঠিক বুঝতে দাও। বুঝতে দাও আমার পথ চলায় আমার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তুমিই যে আমার সব, তুমি ছাড়া ঘরে-বাইরে আমার যে কোথাও কিছু নেই এইটিই

আমাকে বুঝতে দাও মনেপ্রাণে। জীবনে আর সব বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, তোমার প্রতি বিশ্বাসটি যেন অটুট থাকে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের গল্প বললেন: 'চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী পার হয়ে পণ্ডিতের বাড়ি দুধ যোগাতে চলেছে বুড়ি গয়লানি। এই দুর্যোগে নৌকো নেই একটাও—বুড়ি অন্ধকার দেখল। কি করে পার হবে এই ঝোড়ো নদী? বুড়ি ভাবলে, রাম নামে ভবসাগর পার হয় শুনেছি, আর আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। রাম-রাম নাম করতে-করতে বুড়ি নদী পার হয়ে গেল স্বচ্ছন্দে। পণ্ডিত তো অবাক! এই দুর্যোগে কেমন করে এলি—জিগগেস করলে বুড়িকে। কেন বাবা-ঠাকুর, বুড়ি বললে সহজ সুরে, রাম-রাম করতে করতে পার হয়ে এলুম। পণ্ডিতের তখন মনে পড়ল ওপারে তার কি কাজ আছে। বলেল, আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। ফিরতি-মুখে দুজনে নদী পার হতে গেল। বুড়ি তো রাম-রাম করতে-করতে দিব্যি পার হতে লাগল। জলে নেমে পণ্ডিতও রাম-রাম করতে লাগল। এক পা এগোয় অমনি কাপড় গুটোয় সঙ্গে-সঙ্গে। পিছন ফিরে বুড়ি তখন বললে, বাবা-ঠাকুর, রাম-নামও করবে, আবার কাপড়ও সামলাবে, তা হলে হবে না। তাই হল না। পণ্ডিত পারল না পার হতে।'

এই বুড়ি গয়লানির শুধু বিশ্বাস নয়, অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস যত অন্ধ ততই তার জোর। যত নীরন্ধ্র ততই অপ্রতিরোধ্য। নিজে অন্ধ হয়েও আলো দেয় এ কে, যদি জিগগেস করো, তবে তার উত্তর হবে, বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের আলোটি বাঁচিয়ে রেখে চলেছি ঝড়ের অন্ধকারে। অন্ধকার মানে সংশয়, ঝড় মানে দুঃখ-কষ্ট আঘাত-অপঘাতের সংসার। কিন্তু আলোটি বিশ্বাসের আলো! আঘাতে সে কাঁপে না, স্খলনে সে টলে না, শত বিক্ষোভের মধ্যেও সে অনির্বাণ। সে শুধু পথই দেখায় না, শোক-শীত আর্তিতে উত্তাপ আনে, জীবনের সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে গেলেও সে আশ্রয় দেয়, সমস্ত বঞ্চনার শেষেও সে জের টানে জমার ঘরে। বিশ্বাসের জোর কত!

'রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমানের কোনো আয়োজন নেই। তার শুধু রামনামে বিশ্বাস। সে এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করলে।'

আর দ্বিধা নয়, দ্বন্দ্ব নয়, এবার শুধু স্বীকৃতি, শুধু সমর্পণ। শুধু বিশ্বাসের স্পর্শমণি। যখনই তোমাকে ভাবব তখনই দেখব তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ হাসিমুখে। যখন কাঁদব, দেখব তুমি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছ কান পেতে। যখন চলব, দেখব পাশে-পাশে তুমিও চলেছ। যখন ঘুমুব, দেখব তোমারই কোলে মাথা রেখে শুয়েছি। যখন সময় আর কিছুতে কাটবে না, তখন দেখব তুমিও বিমনা হয়ে বসে আছ বাতায়নে।

বিশ্বাস করব, জীবনে যা পাই তাই তুমি, যা না পাই তাও তুমি। যা পাই তাতে তোমার স্পর্শ, যা না পাই, তাতে তোমার আভাস। খেতে বসে দেখব

অন্নরূপে তুমি। নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখব বিস্মৃতিরূপে তুমি। বায়ুস্পর্শে তোমারই আলিঙ্গন। বারিস্নানে তোমারই নির্মলতা। প্রত্যেক নৈশ ঘুমে ক্ষণকালিক মৃত্যুর পর আবার প্রভাত-জাগরণটি তোমারই স্মিতদীপ্ত হাসির প্রতিশ্রুতি।

আরেকবার বিশ্বাস করব। তুমি আছ। আর-সবাই আমাকে ভুলে থাকে, তুমি আমাকে ভোলো না। আর-সবাই ভুল বোঝে, তোমার হিসেবেই ঠিক কখনো ভুল নেই। আর-সবাই বাইরে থেকে দেখে, তুমি দেখ বুকের মধ্যিখানে বাসা বেঁধে। আর সবাই বিচার করে, তুমি অপেক্ষা কর। আর-সবাই ফিরিয়ে দেয়, তুমি শেষ-দিন পর্যন্ত বসে থাকো শিয়রে।

আরেকবার, শেষবার বিশ্বাস কর। আমি সত্যিই নিষ্কিঞ্চন নই নিরাশ্রয় নই, নই আমি পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত—আমার আর কেউ নেই, না থাক, তুমি আছ। তুমি শুধু আছ এর মধ্যে আমার তৃপ্তি নেই—তুমি একান্ত আমার হয়ে আছ। আমাকে খুশি করবার জন্যে তোমার কত রাশীকৃত আয়োজন, কত আপ্রাণ চেষ্টা। দূর আকাশে ধূসর একটি তারা এঁকে রেখেছ যদি আমি দেখি। কোন দুষ্প্রবেশ্য জটিল অরণ্যের মধ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী এঁকে রেখেছ যদি আমি কোনো দিন এসে শুনি। পুষ্পে-পর্ণে শস্যে-তৃণে কত অকৃপণ বর্ণচ্ছটা ঢেলে দিয়েছ যদি চকিতেও একটু আভাস পাই। কত পীত-লোহিত, নীল-লোহিত, কত সিত-কৃষ্ণ, পাটল-পিঙ্গল, কত কপিশ-কপিল, ধূসর-পাণ্ডুর, কত হরিৎ-অরুণ, শ্যামল-সুনীল—যদি এত সব বর্ণের মধ্যে খুঁজে পাই অবর্ণনীয়কে। এত তোমার মহিমা অথচ আমার কাছে তুমি কমনীয়, এত তোমার প্রতাপ অথচ আমার কাছে তুমি সহজ-সামান্য। তোমার রাজ-সাজ ছেড়ে পরে এসেছ পীত-ধড়া, তোমার ঐশ্বর্যের রাজ-মুকুট ফেলে দিয়ে হাতে নিয়ে এসেছ মোহন মুরলী।

বিশ্বাস করতে ভালো লাগে বলে বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করব, যা চরমতম ভালো তাই তুমি করছ আমাদের জীবনে। তুমি যে আমাদের দুঃখ দিচ্ছ, অশ্রুজলে মার্জনা করে পরিচ্ছন্ন করে নিচ্ছ—পরিপূর্ণতম ভালোটিকে বিকশিত করবার জন্যে। এত যে আঘাত দিচ্ছ, প্রহারে জর্জর করছ, শুধু একটি কল্যাণ-আলোকে অন্ধ চোখকে জাগিয়ে দেবার জন্যে। আমাদের চিরন্তন যাত্রাও এই মঙ্গললোকে। ত্যাগের মরুপথ দিয়ে, দুঃখের কাঁটাবন ভেদ করে, শোকের দুরন্ত সমুদ্র ঠেলে। তুমি আনন্দময়, প্রেমময়, ক্ষমাময় যাই কেননা বলি, আসলে তুমি মঙ্গলময়। বিশ্বাস করব, তুমি আমার অধমার্থ বুঝে আমাকে সুখ দেবে না, তুমি আমার পরমার্থ বুঝে আমাকে মঙ্গল দেবে। যদি পদপ্রান্ত থেকে পথপ্রান্তে ফেলে রাখো বুঝব সেইটিই আমার মঙ্গল।

রামকৃষ্ণ কী বললেন? বললেন, 'পাথর হাজার বছর জলে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখনো ঢোকে না। কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখুনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত তারা হাজার-হাজার আপদ-বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়। চকমকির পাথর শত বছর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না,

তুলে লোহায় ঘা মারামাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার-হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর পড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস-ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ কথা হলেই সে জ্বলে ওঠে।' আবার বলেছেন এক কথায়, সুন্দর কথায়: 'যার গলা একবার সাধা হয়েছে তার সুরে শুধু সারেগামাই এসে পড়ে।'

সমস্ত কাজের মূলেই একটি বিশ্বাস চাই। এ কাজে আমার পর্যাপ্ত প্রাপ্তি ঘটবে এ বিশ্বাস না থাকলে কাজে প্রবৃত্ত হই না। আর যে কাজই করি না কেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে একভাবে না আরেকভাবে সুখ-আহরণ। আহরণটি আছে বলেই অন্বেষণের আনন্দ। সুখ পেলেই যে থামি তা নয়, আরো একটা সুখ, আরো একটা তুঙ্গতর শৃঙ্গের সন্ধানে ধাওয়া করি। সেটা পেলেও আরো উচ্চতর চূড়ার অভিমুখে। যখন তর আছে তখন তম-ও আছে। যখন অধিকতরকে পেয়েও থামছি না তখন নিশ্চয়ই অধিকতম আছে, আছে পরমতম। সেই পরমতমের কি একটা নাম দেবে না? মানুষ নাম রেখেছে, ভগবান। সুতরাং এই দাঁড়াচ্ছে, সুখানুসন্ধানই ঈশ্বরানুসন্ধান। পূর্ণতা লাভের চেষ্টাই ঈশ্বর লাভের চেষ্টা। শান্তিপ্রাপ্তির প্রার্থনাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রার্থনা।

শেষে তুমি আছ এই জন্যেই তো সুরু। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সাধু গাঁজা তয়ের করছে, তার সাজতে সাজতে আনন্দ।'

যত বিশ্বাসের জোর তত তার উপলব্ধির ঔজ্জ্বল্য। তত তার আনন্দের ঘনিমা। রামকৃষ্ণ একটি তেজী উপমা দিলেন: 'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু গবগব করে খায় সে হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।'

শুধু উপমার তেজ নয়, বাংলা ভাষার তেজ। সে যুগের সংস্কৃত শব্দাবলী গায়ে দেওয়া আড়ষ্ট-অস্পন্দ ভাষা নয়। রামকৃষ্ণ বাংলা ভাষায় তীক্ষ্ন স্বচ্ছতা আনলেন। স্বচ্ছতা হচ্ছে গতিশক্তির প্রতিবিম্ব। আর তীক্ষ্নতা হচ্ছে প্রাণশক্তির।

১৯

কিন্তু যে পরমতম আনন্দকে সন্ধান করছি সে আনন্দটি কোথায়?

সে আনন্দ আমাদের মধ্যেই বিরাজমান। হৃদয়ের গহন গুহাশয়ে। মাটির গভীর উৎস থেকে যেমন শীতলের উৎসার, তেমনি শীতলতমের উৎসার হৃদয়ের দুঃসহ অন্ধকার থেকে। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে হবে, উদ্ঘাটিত করতে হবে নিজের দেহায়তনে। হায়, আমিই তাঁর কুহেলিকা, আমিই তাঁর আবরণ, সে সূর্যোদয়কে আমিই আড়াল করে রেখেছি। তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছি না। কবে নিজেকে ছিন্ন করতে পারব, বিদীর্ণ করতে পারব এই মেঘপট, সেই ধ্রুব জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় হবে।

কত দূরে-দুর্গম দেশের আমরা পথ চিনি, শুধু নিজের অন্তরে যাবার রাস্তাই আমাদের জানা নেই। জেনেই বা দরকার কি। এই রাস্তার শেষে নির্জন শান্তিতে কে বাস করছে তার খবর তো পৌঁছোনি এখনো।

নিজের খবরই নিজে রাখি না। অন্যের খবরের জন্যে এখানে-ওখানে ঘোরা-ঘুরি করি। ঠিকানার খোঁজে যাই এ-দোরে ও-দোরে। একটি কাব্যময় উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী থাকে, তা হরিণ জানে না। গন্ধে দশদিক আমোদ হচ্ছে দেখে উন্মনা হয়ে ছুটে বেড়ায়। অথচ নিজের নাভির মধ্যেই যে এ সুগন্ধের উৎস এ তাকে কে বলে?'

তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটছি আমরা। এ সুগন্ধময় আনন্দের বাসা যে আমাদের বুকের মধ্যে তারই আমরা খবর পাইনি। হৃৎপিণ্ডের শব্দে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে তবু আমাদের খেয়াল নেই। তারপরে সশব্দে যখন মন্দিরের সিংহ-দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে তখন কি করব! মজার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'একজন তামাক খাবে তো প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। রাত তখন অনেক। প্রতিবেশীর বাড়ির লোকরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলি করবার পর একজন এসে দোর খুলে দিলে। খুলে লোকটিকে দেখে সে বলে উঠল, সে কি গো, কি মনে করে? আর কি মনে করে! লোকটি বললে, তামাকের নেশা আছে জানো তো! টিকে ধরাবার আগুনের জন্যে এসেছি। তখন প্রতিবেশীর বাড়ির লোক বললে, বাঃ, তুমি তো বেশ লোক! এত রাত করে এত কষ্ট করে আসা, আর এই দোর ঠেলাঠেলি! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে!'

আঙ্গিকের দিক থেকেও গল্পটি নিখুঁত। তামাকখোর লোকটির হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে তা গল্পের গোড়ায় বলা হয়নি। শেষ ছত্রে সে আলোটি জ্বলে উঠে সমস্ত গল্পটিকে অর্থে-ইঙ্গিতে আলোকিত করেছে। আমরাও তেমনি লণ্ঠন হাতে করে টিকের আগুনের সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ যে উলঙ্গ অগ্নি জ্বলছে আমাদের হৃদয়কুণ্ডে তা আমরা টের পাই না। আমরা না পাই উষ্ণতা না দেখি ঔজ্জ্বল্য। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'যতক্ষণ বোধ সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা-হেথা, তখনই জ্ঞান।'

তবু বিশ্বাসের সঙ্গে চাই একটি ব্যাকুলতা। আগুনের সঙ্গে চাই সমীর-সঞ্চার। পাখির পায়ের সঙ্গে চাই পক্ষপুট। কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা যমুনা গোদাবরী জলে জলময়, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়বে তবে খাবে।'

শুধু 'ফটিক জল' বলে আর্তনাদ করছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে। ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে আছে সকাতরে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জলে রুচি নেই।

তাই আবার বলছেন রামকৃষ্ণ: 'চাতক পাখির বাসা নিচে কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে।'

কোথায় আমাদের সেই ফটিক-জল। সেই স্ফটিক-স্বচ্ছ নির্মল-নিরাময়

বারিধারা। চারধারে স্তূপীকৃত ভোগের উপকরণ, বিলাস-কাননের ফুল-ফল, তবু কিছুতেই পিপাসা মেটে না। কোথায় তোমার অচ্ছোব অমিয়বৃষ্টি। লোকলজ্জার ভয়ে কাঁদতে পর্যন্ত আমাদের বাধা। কপট সংসারে সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে আটকা পড়ে আছি। পাছে ওরা হাসে তাই কাঁদি না। নাচি না হরিনামে। লোকে কি বলবে তাই তোমার আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়তে আমাদের লজ্জা করে। রামকৃষ্ণ এক কথায় একটি ছন্দোবন্ধ কথায় উড়িয়ে দিলেন: 'লোক না পোক।'

মানুষ অষ্ট পাশে বাঁধা। ঘৃণা লজ্জা মান অপমান মোহ দম্ভ দ্বেষ আর পৈশুন্য। গোপীদের বস্ত্রহরণের মানে কি? গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শেষ পাশ লজ্জা এবার ছিন্ন হল। রামকৃষ্ণ বললেন, 'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।'

তাই কেউ যখন পরীক্ষায় পাশ করে আসে, রামকৃষ্ণ বলেন, 'পাশ করা না পাশ পরা?'

গ্রন্থ না গ্রন্থি। যত বই তত বোঝা। যত বেশি বোঝা ততই ভারি বোঝা। শুধু অভিমানের ব্যোমযান। শুধু বন্ধনের জটাজুট। রামকৃষ্ণ বললেন, 'আজ বাগবাজারের পুল হয়ে এলাম। কত বাঁধনই দিয়েছে। অনেক শিকল—একটা বাঁধন ছিঁড়লে পুলের কিছু হবে না, অন্যগুলো টেনে রাখবে।'

তেমনি সংসারীদের অনেক রজ্জু, অনেক নাগপাশ। একটা যায় তো আরেকটা আটকে রাখে। সংসার ছেড়ে গেরুয়া পরল, তারপর আবার গেরুয়ার অহমিকা। নিজেকে গৌরব দিতে গিয়ে পদে-পদে নিজেকেই অপমান! রামকৃষ্ণ বললেন, 'গুটিপোকা আপনার নালে আপনি মরে।'

২০

অহঙ্কারই কিছুতেই যায় না। কী সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'অশ্বথ গাছ কেটে দাও আবার তার পরদিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।'

একটা কিছু শক্তি হল অমনি অহঙ্কার। এমন যে ভক্তি তার পর্যন্ত অহঙ্কার —আমার মত ভক্ত আর কজন আছে! ত্যাগ করে এসে রিক্ততায়ই মদমত্ত। কিছুতেই যায় না ফেঁকড়ি। বাণ যায় তো পুঙ্খ থাকে। আগুন নেবে তো ছাই ওড়ে। কোথায় আবার একটি ফুলকি থাকে লুকোনো। কুকার্য যায় তো কুচিন্তা যায় না। সিল্কের ব্যান্ডেজ দিয়ে ঘা ঢাকা। কখনো বা গেরুয়ার ব্যান্ডেজ দিয়ে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ছুঁচের ভেতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।'

তাই তো প্রার্থনা—আমার সমস্ত রোগযন্ত্রণার যে বীজ, যে অহং, তাকে তুমি উৎপাটিত করো, উন্মূলিত করো। আমাকে তুমি ভাঙো, ভেঙে-ভেঙে তোমার

নৌকো করো। আমাকে তুমি দগ্ধ করো যদি দাহ থেকেই আভার কোনো আভাস জাগে। উন্মথিত করো এই বিষসমুদ্র, যদি কোথাও খুঁজে পাও একটু সুধাকণা।

আমি কে তুমি করো। জীবের এই আমি নিয়েই যন্ত্রণা। উপাধি নিয়েই আধি। যত ধার তার চেয়ে আধার বেশি। পদ নেই তো।পদবীর চাকচিকা। এই আমি-র আর কিছুতেই মূলোচ্ছেদ নেই। আবার বললেন রামকৃষ্ণ ঃ 'ছাগল কেটে ফেলা হয়েছে তবু নড়ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।' এই যায় এই আবার আসে সেই অহঙ্কার। ছোট এক টুকরো মেঘ, খরকরোজ্জ্বল সূর্যকে আড়াল করে রাখে। ছোট তুচ্ছ একটা ছিদ্র হয়েছে টেলিগ্রাফের লাইনে, আর আওয়াজ আসে না।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তাহলে আর খবর নেই।'

তবে উপায় কি? ত্রাণ কিসে?

আমাকে 'তুমি' করো। যখন আমার তোমাতে বিস্তার, তখনই আমার একমাত্র নিস্তার। সেই এক গুরুর গল্প আছে, শিষ্যকে বললেন, অরণ্যে গিয়ে দুশ্চর তপস্যা করে সিদ্ধ হও। শিষ্য বারো বৎসর তপস্যা করে ফিরে এল খবর দিতে। দেখল গুরুর গৃহাদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। দরজায় করাঘাত করল শিষ্য। ভিতর থেকে গুরু প্রশ্ন করলেন—কে? শিষ্য উত্তর দিল: 'আমি'। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন গুরু। বললেন, 'তোমার তপস্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। সিদ্ধি এখনো অনেক দূরে।' শিষ্য আবার দুঃসাধ্যতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হল। কাটালো আরো বারো বৎসর। আবার ফিরে এল গৃহদ্বারে। দেখল এখনো দ্বার রুদ্ধ। আবার করাঘাত করল। গুরু প্রশ্ন করলেন—কে? শিষ্য উত্তর দিল: 'তুমি।' অমনি মুক্ত হল গৃহদ্বার।

একটি অভিনব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। বাংলা সাহিত্যে এর জুড়ি নেই: 'গরু যতক্ষণ হাম্বা-হাম্বা করে—তার মানে হাম-হাম, আমি-আমি করে—ততক্ষণই তার যন্ত্রণা। তাকে লাঙলে যোড়ে, কত রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, তারপর আবার কশাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়, তখন আবার খুব পেটে। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ি-ভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈরি হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে তুঁহুঁ, তুঁহুঁ—অর্থাৎ, তুমি-তুমি। যখন তুমি-তুমি বলে তখনই নিস্তার।'

তুমি-র পর আর কিছু হয় না। তোমার পর আর কিছু হবার নেই। মানুষের এই শুধুই চিরন্তন কান্না, আমাকে প্রকাশিত করো। শুধু মানুষের কেন, অঙ্কুর থেকে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির। কিন্তু এই প্রকাশের জন্যে অনুকুল একটি শূন্যতার দরকার। একটি শূন্যতা না পেলে অঙ্কুর কি করে বৃক্ষে প্রকাশিত হবে? তেমনি আমরা প্রকাশের জন্যে চাই একটি শূন্যতা। সেটি হচ্ছে বিরহের শূন্যতা। তুমি নেই—এই বিরহ। তুমি নেই—এই বিরহে আমার বিশ্বভুবন যখন শূন্যময় হয়ে উঠবে তখনই আমার বিকাশের সম্ভাবনা ঘটবে। আর সেই শূন্যের

আশ্রয়ে এসে ধীরে ধীরে তুমি হয়ে উঠব। আমাকে ত্যাগ করলেই তোমাকে পাওয়া যাবে। আমি হচ্ছি কৃত্রিম তুমি সহজ। আমি হচ্ছি ক্ষোভ তুমি হচ্ছ শান্তি। আমি হচ্ছি অহঙ্কার তুমি হচ্ছ হচ্ছ প্রেম। আমি হচ্ছি সুখ তুমি হচ্ছ মঙ্গল। আমি কপট থেকে সরলে যাব, ক্ষোভ থেকে শান্তিতে। সুখ ছেড়ে মঙ্গলে উপনীত হব, অহঙ্কার ছেড়ে ভালোবাসায়। দ্বারে-দ্বারে না ঘুরে যাব সেই অন্তরের স্থিরধামে। এক কথায় আমি তুমি হয়ে উঠব।

তা হলে সংসার চলে কই? কেশব সেন বললেন, 'তা হলে মশাই দল-টল থাকে না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, আমি যখন কিছুতেই যায় না তখন থাক দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের ছেলে, আমি ঈশ্বরের দাস—সেই আমি হয়ে। এ আমি হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি। যে আমি কাঁচা, যে আমি বজ্জাত, সে আমি বর্জন করো। বলে একটি আশ্চর্য উপমা দিলেন। একটি দুরূহ তত্ত্বকে বুঝিয়ে দিলেন জল করে:

'সংসারীর আমি, অবিদ্যার আমি—একটা মোটা লাঠির মত। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করছে। কিন্তু ঈশ্বরের দাস আমি, বালকের আমি, বিদ্যার আমি—এ হচ্ছে জলের উপরে রেখার মত। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটি রেখা—যেন দু ভাগ জল। বস্তুত এক জল—এক সমানস্রোত।'

এই জলে নামো হলুদ গায়ে মেখে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে আর কুমীরের ভয় থাকে না।'

বিবেকবৈরাগ্য হচ্ছে হলুদ। সদসৎ বিচার করার নাম বিবেক। আর বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরের উপর অনুরাগ। আবার বললেন, 'জলে নৌকো থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোর মধ্যে না জল ঢোকে। তা হলেই ডুবে যাবে।' আবার এই ভাবটিই ব্যক্ত করলেন অন্যভাবে: 'এমনি যদি বনবন করে ঘুরতে থাকো, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তবে যদি খুঁটি ধরে ঘোরো, আর ভয় নেই।'

কোথায় ঘুরবে? ও কি জল, না, জলভ্রম? স্বর্ণমৃগেরই আরেক নাম মৃগতৃষ্ণা। কার পশ্চাদ্ধাবন করবে? রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই খোঁড়ো। খুঁড়তে খুঁড়তে সেখানেই জল মিলবে।'

আর কিছু না মিলুক অন্তত চোখের জল মিলবে। চোখের জলেই সেই পিপসার পানীয়। আর, এ আমার যত পান তত পিপাসা।

তাই যেখানে আছি সেখানেই বসলুম তোমার জন্যে। যারা বলে, পেঁছেছি, তারা পথই পায়নি। আমি না জানি পথ না জানি পেঁছুনো। আমি যেখানে আছি সেই আমার পথ, সেই আমার পথারম্ভ ও পথশেষ। তুমিই এবার পথ চিনে এস আমার কাছে। সেই কবে থেকেই তুমি আসছ—কবে থেকেই তাকিয়ে আছ আমার দিকে। এবার যখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি, এবার ঠিক চোখের উপর চোখ পড়বে।

আমাকে না হলে বা তোমার চলে কই? গন্ধ যেমন ফুলকে চায়, ফুলও

তেমন চায় গন্ধকে। আমিই তোমার সেই গন্ধ। তুমি সুন্দর, আমি মধুর। মাধুর্যকে না পেলে সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ। ভাব যেমন রূপকে চায়, রূপ চায় তেমনি ভাবকে। আমিই তোমার সেই ভাব। তুমি কবিতা, আমি রস। রসকে না পেলে কবিতা প্রাণহীন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর বৎসহারা গাভীর মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কেঁদে বেড়াচ্ছেন—'

একটি মধুলোভী ভৃঙ্গ গুঞ্জরণ করে ফিরছে। ঘুরে ঘুরে দেখছে কোথায় ফুটেছে সেই মধুপূর্ণ শতদল! কিছু-বলতে হবে না, ভ্রমর এসে বসবে সেই পদ্মে। পান করবে কমলমধু।

এত ডাকছি, শুনছেন কই? কিন্তু জলে-স্থলে তিনি যে এত ডাকছেন, তা শুনছ? রামকৃষ্ণ বললেন, তিনি খুব কানখড়কে। সব শুনতে পান। যখন যত ডেকেছ সব শুনেছেন। তাঁকে ডাকবার আগেই এগিয়ে আসেন তিনি। মানুষ যদি এক পা এগোয় তিনি দশ পা বাড়ান। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই।' এই বলেই একটি গল্প জুড়লেন: 'এক মুসলমান নমাজ করতে-করতে হো আল্লা হো আল্লা বলে চীৎকার করে ডাকছিল। একজন তার চীৎকার শুনে বললে, তুই আল্লাকে অত চীৎকার করে-করে ডাকছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান।'

সত্যি শুনতে পান? আমার বুকে যে এত অবরুদ্ধ কান্না, এত প্রকাশহীন স্তব্ধতা—শুনতে পান তিনি? তিনি আছেন?

২১

আবার সংশয়। থেকে-থেকেই সংসারীর এই সন্দেহ, তিনি আছেন? আছেন তো দেখাও আমাকে। প্রমাণ দাও। দুটি বিস্ময়কর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। দুটি হীরক-দ্যুতি: 'কিন্তু একদিনেই কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হয়। তখন কোনটা কফের কোনটা বায়ুর কোনটা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়।' আবার বললেন: 'অমুক নম্বরের সুতো, যে-সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে তাদের দোকানে কিছুদিন থাকো, তবে কোনটা চল্লিশ নম্বর, কোনটা একচল্লিশ নম্বরের সুতো, ঝাঁ করে বলতে পারবে।'

প্রেমের প্রথম অনুভূতিটি পাবার জন্যে যৌবন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয়। একটা বীজ পুঁতলেই তক্ষুনি একটা গাছ হয় না। কত তমিস্রার তপস্যা করে রাত্রি-প্রভাত-তপনের মুখ দেখে!

এ কি ইন্দ্রজাল? মাটি খুঁড়লেই কি শস্য পাবে? অশ্রুজলে সিক্ত করো মাটি। তার পরে হলকর্ষণ করো। বীজ বোনো। আবার যদি সুখের রৌদ্রে বিস্মরণের অনাবৃষ্টি আসে, আরেকবার মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করো। আবার

কাঁদো মাঠ ভরে, মাটি ভিজিয়ে। দেখবে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। অঙ্কুর থেকে দেখা দেবে সেই প্রশস্য শস্য।

চতুর্দিকে অব্যক্ত ছিল, প্রাণের আবির্ভাব হল। নির্বাক ছিল, নামল ধ্বনির নির্ঝরিণী। অমূর্ত ছিল, দেখা দিল নয়নমোহন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'নবানুরাগের বর্ষা।'

সেই বিদ্যাপতির "নব অনুরাগিণী রাধা। কিছু নহি মানয় বাধা॥" সেই "যামিনী ঘন আঁধিয়ার। মনমথ হিয় উজিয়ার॥"

রামকৃষ্ণ বললেন, 'প্রথম অনুরাগে সব সমান বোধ হয়। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে, তখন আম গাছ তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম গাছ এটা তেঁতুল গাছ চেনা যায় না।'

একবার যদি নবীন মেঘের নীল অঞ্জন চোখে লাগে, তখন সমস্ত বিশ্বই শ্যামময়। জীবনের সমস্ত হরণ-পূরণই হরিময়। কৃষ্ণ ছাড় আর বর্ণ নেই। শিব ছাড়া জীব নেই। রাম ছাড়া কাম নেই। সেই হচ্ছে নবানুরাগের বর্ষা। বিদ্যাপতির "ভুবন ভরি বরি-খন্তিয়া।" ভাদ্রের বাদর-বিধুরে শূন্য মন্দিরে বসে হরির জন্যে কাতরতা। "কৈসে গমাওবি হরিবিনু দিন রাতিয়া।" শুধু রাতটুকু নয়, দিন-রাতি কি করে কাটবে হরি-হারা হয়ে? শুধু দুঃখের নিবিড় তিমির রাতটুকুই নয়, বিভ্রান্তিময় বিস্মরণের দিনটুকুও।

টুকরো-টুকরো উপমা দিয়েছেন, এবার একটি সম্পূর্ণ কাব্যচিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণ : 'ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেই দিকে সর্বদা রাখবে। দেখেছ তো দুর্গা পূজার সময় একটা জাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ জাগ-প্রদীপ সর্বদা জেবলে রাখতে হবে। সংসারে কাজ করতে-করতে মাঝে-মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখবে সে প্রদীপটি জ্বলছে কিনা।'

এমন একটি প্রসাদস্নিগ্ধ কাব্যচিত্র বাংলা ভাষায় আর কোথায় দেখেছি!

এই প্রদীপটি যে জ্বালব তার বহ্নিকণাটি পাব কোথায়? বিরহের অনল থেকে আহরণ করতে হবে সেই শ্বেতশিখা। ধরিয়ে নেব প্রেমের প্রশস্ত দীপভাণ্ড। সেই প্রদীপের বিমুগ্ধ আলোকে মুখচন্দ্রিকা হবে। মুখচন্দ্রিকা হবে চিরবিরহিণী মানবাত্মার সঙ্গে চিরমিলনোৎসুক পরমাত্মার। কিন্তু সেই বিরহব্যথার ব্যাকুল বাদল-অন্ধকারটি পাই কোথা? কি করে দূরের মানুষটিকে বুঝি বুকের মানুষ বলে?

যাই বলো, শেষ পর্যন্ত, সেই করুণাবরুণালয়ের এক বিন্দু কৃপা। একটি চকিততড়িৎ কটাক্ষ। তাতেও হলো না। এই কৃপাকে আকর্ষণ করি কি করে? প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি নিহিত আছে। কৃ—করো, পা-পাবে। কৃপা পেতে হলে কাজ করতে হবে। ছুটোছুটি করতে হবে। 'ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হলেই মা এসে ধরেন ছেলেকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'টেনে নেন কোলের মধ্যে।'

কেন এমন ছুটোছুটি করান ? এমনি খেলিয়ে নিয়ে লাভ কি ?

'তাঁর ইচ্ছা।' কী গম্ভীরসুন্দর, কী গভীরসহজ ভাবে বললেন রামকৃষ্ণ : 'তাঁর খুশি। তাঁর ইচ্ছা তিনি সব নিয়ে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতে ছুঁলে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় না। সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে, খেলা কেমন করে হয় ? সকলেই ছুঁয়ে ফেললে বুড়ি খুশি হয় না। খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।'

আমাকে নিয়ে তুমি খেলবে তারই জন্যে তো এত বড় আকাশ-অঙ্গনে, এত ঋতু-রঙ্গিমা। পুষ্পবনে এত বিহঙ্গকাকলী। শর্বরীর কবরীতে এত নক্ষত্রকর্ণিকার মণিকা। চতুর্দিকে শুধু অন্তহীন অকারণের আয়োজন। সব আমার জন্যে। আমার সঙ্গে তোমার খেলা হবে তারই সঙ্গে আনন্দ-উজ্জ্বল দীপাবলী।

কিন্তু এত আলোক, তবু তোমাকে দেখি কই ?

রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না।'

কর্ম হচ্ছে, রামকৃষ্ণের কথায়, আদিকাণ্ড। কর্মের জন্যেই কর্ম নয়, কৃপার জন্যে কর্ম। যেমন খেতে-খেতে খিদে, কাঁদতে-কাঁদতে শোক, তেমনি যদি কর্ম করতে-করতে কৃপা পাই !

'সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায় ; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে। আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ দেখতে চায় সার্জনকে তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

কী সুন্দর কাব্যরসাশ্রিত প্রার্থনা ! এত বর্তিকা জ্বলছে দশদিকে অথচ তোমাকেই দেখছি না সমীপবর্তী। তোমার হাতে আলো অথচ তোমার মুখ-খানিই অন্ধকার। একবার আলোর শিখাটি তোমার মুখের উপর তুলে ধরো, আর আলো না দেখে দেখি তোমার উদ্ভাসিত মুখ।

কিন্তু যে আলো দিয়ে তোমার মুখ দেখব সে তোমার আলো নয়, সে আমার আলো। তুমি শুধু দয়া করে তোমার নিজের হাতে সে আলোটি জেবলে দিয়ে যাও। জেবলে দিয়ে যাও আমার হৃদয়ের নির্জনতায়। 'বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে—' সেই আলো জ্ঞানের আলো। তোমার কৃপাকোমল স্পর্শে সেই জাগপ্রদীপ সেই জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলে উঠুক। তোমাকে একবার দেখি। শুধু দেখলেই চলবে না। তোমাকে চিনি। চিনি তোমাকে অন্তরঙ্গ বলে। অন্তর্যামী বলে। যদি সেই একটিমাত্র প্রদীপও না জ্বলে তবে তো আমি হৃত-দরিদ্র, একেবারে অধম-অধন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরে যদি আলো না জ্বলে সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। বড়-লোকের লক্ষণই এই তার ঘরে-ঘরে আলো জ্বলে।'

তুমি যদি দয়া না করো তবে আমি কী করব ! আমি যত চেষ্টা করি আলো জ্বালতে ততই তা নিবে-নিবে যায়। নিবে যায় তোমার নিবাত নিষ্ঠুরতায়। আলোর জন্যে যে একটি বহমান বায়ু চাই সেইটেই কৃপা। যদি সেই সমীরসঞ্চার

না হয় দাও অরূপণ অন্ধকার। সেই গভীর অন্ধকারেই তোমার আসন প্রসারিত হোক জীবনে। সেই তিমিরভারই হোক তোমার পুঞ্জ-পুঞ্জ করুণা।

২২

শুধু এগোও। এগিয়ে যাও। ঢেউ ঠেলে-ঠেলে শুধু দাঁড় টানো। পরে কখন ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে।

'প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।' নৌকো-নদীর উপমা বাছলেন রামকৃষ্ণ : যতক্ষণ ঢেউ ঝড় তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয় ততক্ষণ মাঝিকে দাঁড়িয়ে থেকে হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলেই আর হয় না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটি ঠেকিয়ে রাখে। তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে।'

শান্তশীলা নদীর একটি মৃদুচ্ছন্দ গতি-চিত্র। তামাকটি হচ্ছে একটি উপলব্ধির আরাম। বায়ুটি হচ্ছে অহেতুক করুণা। পাল হচ্ছে বিশ্বাসের ধ্বজপট। এবার ধরলেন মাঝি ছেড়ে স্বর্ণকারকে : 'স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় চোঙ, পাখা, হাপর সব নিয়ে বসে। সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনের খুব তেজ হয়ে সোনাটা শিগগির গলে যায়। কাজ শেষ হলে বলে, তামাক সাজ।'

স্বর্ণকার হল, এবার কুম্ভকার : 'মাটি পাট করা না হলে হাঁড়ি তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি-ঢিল থাকলে হাঁড়ি ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটি পাট করে।'

কুম্ভকারের পর পটকার। আর এই ছবিটি প্রসন্নহাস্য প্রতিমার মত কান্তি-মতী : 'চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তার পর বসে-বসে রঙ ফলাও। প্রতিমা প্রথমে একমেটে তারপর দোমেটে তারপর খড়ি তারপর রঙ—পরে-পরে করে যাও।' তারপর সরকারী কর্মচারী অধর সেনকে বুঝিয়ে দিলেন এক কথায় : জীবনে খাটনি। শেষকালে পেনসান।'

শুধু এগোও। ভেসে যেও না, এগিয়ে যাও। একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। হঠাৎ এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। ব্রহ্মচারী বললে, ওহে এগিয়ে পড়ো। সে আবার কী কথা! দিব্যি কাঠ কাটছি বনের নিরিবিলিতে, এগোব কী! তবু কি ভেবে এগিয়ে গেল পরদিন। খানিকটা কৌতূহলে খানিকটা বা প্রলোভনে। এগিয়ে গিয়ে দেখলে অগণন চন্দনের গাছ। কী আনন্দ! দিকে-দিকে সুগন্ধের অভিনন্দন। গাড়ি-গাড়ি চন্দনের কাঠ কাটতে লাগল কাঠুরে। অবস্থা ফিরিয়ে ফেলল বাজারে সেই কাঠ বেচে-বেচে। ভাবল, আর কী চাই! এতদিন যত আজে-বাজে কাঠ কেটেছি, এগিয়ে এসে মিলেছে এবার চন্দন বন। ভাগ্যিস এগিয়েছিল! হঠাৎ মনে পড়ল ব্রহ্মচারী তো বলেছিল এগিয়ে

পড়তে—তবে এই চন্দনেই বন্ধন মানি কেন ? আবার এগুলো কাঠুরে। এগিয়ে গিয়ে দেখল রুপোর খনি। এই তো স্বপ্নের অতীত। অঢেল রুপসাগর। আঁজলা ভরে-ভরে রুপো বেচতে লাগল। আপ্লুত হয়ে গেল কাঠুরে। আবার মনে পড়ল ব্রহ্মচারীর কথা। এই অল্পেই থামি কেন ? এগোও, এগিয়ে পড়ো। এবার রুপোর পর সোনার খনি। হোক সোনার খনি, তবু থামব না। কে জানে এর পরে আরো না জানি কী আছে! এর পরে হীরে-মাণিক—কুবেরের ঐশ্বর্য। তবুও ইতি নেই, স্থিতি নেই, নেই কোনো পরিমিতি। তবু এগিয়ে পড়ো।'

চলো রূপ থেকে অরূপে, অল্প থেকে ভূমায়, ক্ষুদ্র থেকে নিরতিশয়ে। চলো আপ্তি থেকে ব্যাপ্তিতে। অন্ত থেকে অন্তহীনতায়। চলো সেই পরমের দিকে, চরমের দিকে—তার মানে, চলো আপন মরমের দিকে। বুকের সব চেয়ে কাছে তারই অভিসারে বেরিয়ে পড়েছি। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়।' কিন্তু কাকে দেখব বলে যে বাইরে এলাম তার নাম জানি না। সেই কবে যে এসেছি বেরিয়ে কোন জন্মে কোন জগৎ থেকে, তারও হদিস নেই। নির্ঝরধারা কি জানে কবে তার প্রথম যাত্রা ? ঐ দূর নক্ষত্রের দ্যুতির রেখাটি কি জানে কত দিনে আমার নয়নের আলোর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে ? শুধু এগিয়ে পড়ো। যাত্রা কর যাত্রীদল।

ঈশ্বরকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'সুধার হ্রদ।'

আমাদের মানস-সরোবর। আমাদের মনের মধ্যেই সে জলনিধি। চলো সেই স্নানতীর্থে। সেই মানসতীর্থে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যতই গঙ্গার কাছে যাবে ততই পাবে ঠাণ্ডা হাওয়া।' আবার বললেন অন্য উপমার সাহায্যে : 'যতক্ষণ না হাটে পৌঁছুনো যায়, দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছুলে আরেক রকম। তখন স্পষ্ট দর্শন স্পষ্ট শ্রুতি। তখন দেখছ দোকানি-খদ্দের, পসার-বেসাতি। তখন শুনছ আলু নাও, পয়সা দাও—এই সব রোল-বোল।'

কিন্তু এগিয়ে যে যাবে, প্রাণে একটি ব্যাকুলতা চাই। চাই একটি কস্তুরীগন্ধ। বিশ্বাসের অগ্নিদাহের সঙ্গে চাই ব্যাকুলতার তুফান। শুধু এগুনো নয়, রামকৃষ্ণ আরো জোরালো ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেন। বললেন, ঝাঁপ দাও। ঝাঁপ দিলে হবেই হবে।'

ও মন হবেই হবে। এই ব্যাকুলতা না হলে কী হয় ? কবিতার মত করে বললেন রামকৃষ্ণ, ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হয়। তখনই বোঝা যায় সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই।'

'একজনের একটি ছেলে প্রায় যায়-যায়। কে তখন বললে, স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই জল থাকবে মড়ার মাথার খুলিতে, তখন একটা সাপ তেড়ে যাবে এক ব্যাঙকে, ব্যাঙকে ছোবল মারবার জন্যে যেই সাপ ফণা তুলবে, অমনি ব্যাঙ যাবে পালিয়ে, লাফ দিয়ে, আর অমনি সেই সাপের বিষ পড়ে যাবে সেই মড়ার

মাথার খুলিতে। সেই বিষজল যদি একটু খাওয়াতে পারো, তবেই বাঁচবে তোমার ছেলে।'

দিন-ক্ষণ-নক্ষত্র দেখে বেরুলো সেই ছেলের বাপ। বেরিয়েই খুঁজতে লাগল ব্যাকুল হয়ে। আর এক মনে ডাকতে লাগল ঈশ্বরকে। ডাকে আর এগোয় আর খোঁজে। ক্লান্তিহীন পথ ভাঙে বিরতিহীন অনুসন্ধানের। হঠাৎ দেখতে পেল মড়ার খুলি পড়ে রয়েছে এক পাশে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! মেঘ করে এল দেখতে-দেখতে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তখন সেই লোক বললে ব্যাকুল হয়ে, গুরুদেব, আর কটি জিনিসের যোগাযোগ ঘটিয়ে দাও। ডাকছে এক মনে, এমন সময় দেখে, বিষধর সাপ! আনন্দে বুক দুরুদুরু করতে লাগল। তবে কি ব্যাঙও এসে পড়বে? ঘটবে কি সে অসম্ভব ঘটনা? নিশ্চয় ঘটবে। ব্যাকুলতার কাছে পাহাড় টলে সমুদ্র শুকোয় আবার মরা নদীতে কোটাল ডাকে। সাপের মুখে একটা ব্যাঙ এসে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! ছেলের বাপ ডাকতে লাগল ব্যাকুল হয়ে, অনুসন্ধানের মধ্যে রেখেছিল একটি স্থির প্রতীক্ষা। অমনি এসে গেল ব্যাঙ!'

তারপর? 'তারপর যেমনটি হবার তেমনি হল। ব্যাঙকে সাপ তাড়া করলে। মড়ার মাথার খুলির কাছে যেই ব্যাঙ এল অমনি সাপ ছোবল তুলল। ব্যাঙ অমনি লাফিয়ে পড়ল ওদিকে, আর বিষ পড়ে গেল খুলির ভিতর। তখন ছেলের বাপের আনন্দ দেখে কে। সে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।'

এমনি করেই ব্যাকুলতার ফসল ফলে। শুকনো কাঠে মঞ্জরী-রঞ্জন। যা ভাবনার বাইরে তাই হয় সহজ-সম্ভব। বুঝতেও দেয় না কি করে তা সম্ভব হল? এই সবে নৌকোতে পা দিলাম, কি করে কি হয়ে গেল, পালে লাগল কোন সদয় সমীর, দেখতে-দেখতে চলে এলাম ওপারের বন্দরে। কে যেন নিয়ে এল বায়ুভরে! ঊষর মরু দেখে বিরত হইনি, চেয়ে দেখলাম, ছায়া-শ্যামল হয়ে উঠেছে, ঘুমের মতই কেটে গিয়েছে দারুণ রাত্রি। এই ছিলাম পর্বতের পদমূলে, এই আবার শিখরমন্দিরে। একটি বাঁশির সুরের মত কেটে গিয়েছে দীর্ঘ পথ।

স্বাতীনক্ষত্রের দৃষ্টি, মড়ার মাথার খুলি, ব্যাঙ, পশ্চাদ্ধাবিত সাপ—আর সর্বোপরি মড়ার খুলিতে দংশনস্খলিত বিষ—রামকৃষ্ণ একটি অসম্ভবের তালিকা দিলেন। একটি আশ্চর্য তালিকা। কল্পনায় অভিনব। বর্ণনাব্যঞ্জনায় অপরূপ।

অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটছি দিন-রাত। তুমিই আমার সেই অসম্ভব। মাথা কুটতে-কুটতে এক সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখি তুমিই কখন সুলভ-সম্ভব হয়ে উঠেছ। আমার সমস্ত প্রয়াস কখন তোমার প্রসাদে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি যদি ব্যাকুল হই, যদি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, সাধ্য কি তুমি কূলে বসে থাকো? আমি যদি অকূলে পড়ি, তুমি কি করে বসে থাকো গোকুলে?

ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হওয়া কি রকম জানো? রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেমন কেরানীর চাকরি চলে যাওয়া।'

একটি সাংসারিক, অথচ সার্থক উপমা। কেরানীর চাকরি ছুটে গেলে কেরানী

কি করে? পাগলের মত ছুটোছুটি করে। এখানে যায় ওখানে যায় একে ধরে ওকে ধরে। জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত লিখে-লিখে হন্দ হয়ে যায়। মান-অপমান গায়ে মাখে না। যদি বলে ভাড়া দেব না ইণ্টারভিয়ুতে যেতে হবে দিল্লি, তাই ছোটে। যা কোনো দিন করেনি, ফুটপাতের জ্যোতিষীকে হাত দেখায়, চেনা হোক অচেনা হোক পথের ধারে একটা মূর্তি বা মন্দির দেখলেই মনে-মনে কপাল ঠোকে। বলে, তুমি যদি সত্যিই থাকো, আমি না বললেও তুমি আছ—আমার না-বলায় তোমার কী আসে যায়—তাই সত্যি যদি আছ, একটি চাকরি জুটিয়ে দাও। এমনি করে অনেক না-মানা জিনিস মানে, অজানা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা, একটি চাকরি চাই। যতক্ষণ না জুটছে ততক্ষণ ছুটছে যত্র-তত্র, আথাল-পাথাল করছে। আরেকটা চাকরি যোগাড় না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হচ্ছে না।

আমরা কি এই চাকরি-হারা কেরানীর মত ছুটছি ব্যাকুল হয়ে? করছি হিল্লি-দিল্লি? তার যেমন জীবিকার জন্যে কাতরতা, আমাদের কি তেমনি জীবনের জন্যে অস্থৈর্য? ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতার আরেকটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'কী হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শিষ্য এসে জিজ্ঞেস করলে গুরুকে। এস দেখিয়ে দিই। বলে গুরু তাকে নিয়ে গেল এক পুকুরে। জলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে রাখল জোর করে। শিষ্যের প্রাণ যায়! কতক্ষণ পরে তাকে তুলে দিলেন গুরু। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছিল তোমার? শিষ্য বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল—প্রাণ যায়! গুরু বললেন ভগবানের জন্যে প্রাণ যখন অমনি যায়-যায় হবে, তখন জানবে দর্শনের আর বাকি নেই!'

আছি নিরন্তর হাঁপের মধ্যে। নীরন্ধ্র বন্ধকূপের মধ্যে। প্রাণ যায়! কোথায় আমার সেই খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস! কোথায় আমার সেই সহজ নিশ্বাস! প্রাণ যায়-যায় না হলে আসবে কি প্রাণ-সম? আসবে কি প্রাণাধিক?

২৩

সাধন করবে কখন থেকে? সেই গোড়াগুড়ি থেকে। যত সকাল-সকাল যাত্রা তত ত্বরিত-তাড়িৎ দর্শন।

'একজন গিয়েছিল যাত্রা শুনতে।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন: 'গিয়েছিল মাদুর বগলে করে। গিয়ে দেখলে যাত্রার দেরি আছে। বসে থেকে লাভ কি, মাদুর পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠলো, দেখলো সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আর কি! তখন মাদুর বগলে করে ফিরে গেল বাড়ি।'

যখন একবার এসেছ এই বিশ্বসৃষ্টির 'যাত্রা' দেখতে, তখন বসে থাকো প্রতীক্ষা করে, বিলম্ব দেখে ঘুমিয়ে পোড়ো না। আরম্ভের বিলম্বটি কার? তোমার দেখার? না, তাঁর দেখানোর? তাঁর দেরি হয় কই! তাঁর সূর্য ঠিক সময়ে রোজ

ওঠে তোমার জানলায়। তাঁর পাখিটি ঠিক ডাকে তোমার নাম ধরে। তোমার চোখে চোখ ফেলে হাসবার জন্যে একটি প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে নিত্য জেগে আছেন তোমার পথের পাশে। বর্ষা হয়ে বিরহের আভাস আনেন, বসন্ত হয়ে মিলনের সূচীপত্র। তোমার জন্যে কবে থেকে তাঁর আরম্ভ, কত তাঁর ছোট-বড় আয়োজন। শুধু তুমিই দেরি করে ফেলছ! তোমার সময় অল্প, তাই যত শিগগির পারো আরম্ভ করে দাও। যত আগে রওনা হবে ততই আগে পাবে জায়গা।

প্রথম-প্রথম যা একটু নিয়মের কড়াকড়ি, শেষকালে অভ্যাসের অনায়াস। সব সাধনাতেই তাই। সেইটিই বোঝালেন নানা উপমায়: 'প্রথমেই বানান করে লিখতে হয়, তার পরে অমনি টেনে চলো।' সোনা গলাবার সময় লাগতে হয় খুব উঠে পড়ে। এক হাতে হাপর, এক হাতে পাখা, মুখে চোঙ, যতক্ষণ না সোনা গলে। গলার পর যেই গড়ানেতে ঢালা হল অমনি নিশ্চিন্ত।

'ফুটপাথের গাছ চারা অবস্থায় বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে দেয়। তাই প্রথম অবস্থায় বেড়া দিতে হয়। আস্তে-আস্তে শেষে যখন গুঁড়ি হয়, তখন হাতি বেঁধে দিলেও গাছের কিছুই হয় না।'

দাও তাই একটি নিশ্চল নিষ্ঠা, একটি অশ্রুমার্জিত নির্জনতা। আমি যদি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় না হই, প্রতীক্ষায় নির্বিচল না হই, তা হলে তোমাকে টলাব কি করে আসন থেকে? যদি নির্জন না হই তবে তোমার অনিমেষ নেত্রপাতটি অনুভব করব কি করে? যদি নিঃশব্দ না হই কি করে শুনব তোমার পদধ্বনি? যদি বিরলে না যাই তুমি আমার একাকী হবে কী করে?

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর আবার নির্জনে বসে মন্থন করো সে দই। তখনই তুলতে পারবে মাখন।' আবার বললেন: 'নির্জন না হলে ভগবান-চিন্তা হয় না। সোনা গলাবার সময় যদি কেউ পাঁচবার ডাকাডাকি করে, তা হলে কেমন করে গলানো যায়? চাল কাঁড়বার সময় একলা বসে কাঁড়তে হয়। আবার মাঝে-মাঝে তুলে দেখতে হয়, কেমন পরিষ্কার হল। কাঁড়তে-কাঁড়তে পাঁচবার ডাকলে ভালো কাঁড়া হয় না।'

আমাকে নির্জন করো। জনতার মাঝে বাস করছি, তবু আমার অন্তরে রাখো একটি নিভৃতির শুচিতা। চারদিকে ভিড়, ঠাসাঠাসি, ঠেলাঠেলি, দাঁড়িয়ে আছি একে-অন্যের গা ঘেঁষে, তিলধারণের স্থান নেই কোথাও। তবুও সেই স্থান-হীনতায়ও যেন তোমার জন্যে একটি জায়গা থাকে। সে জায়গাটি থাকবে, আর কোথাও নয়, আমার হৃদয়ের পদ্মাসনে। যেন শত ভিড় হলেও তোমার স্থানের না অভাব হয়। বাইরে স্থান না হলেও অন্তরে যেন সংস্থান থাকে। চারদিকের কোলাহল ছাপিয়েও যেন শুনতে পাই অন্তরের সেই সকরুণ রাগিণী। সেই একতারার একাকী সুর। তোমাকে শোনবার জন্যে, তোমাকে দেখবার জন্যে, দাও আমাকে একটি গভীর নীরব শান্তি। তোমার সঙ্গস্পর্শটি পাবার জন্যে দাও আমাকে একটি অন্তরঙ্গ নিঃসঙ্গতা।

'কাঁচা মাটিতেই গড়ন হয়।' যত শিগগির সম্ভব, ছেলেবেলা থেকেই যে ঈশ্বরভাবনায় চালিত হওয়া দরকার সেই কথাটিই বোঝাচ্ছেন উপমা দিয়ে, 'পোড়ামাটিতে আর গড়ন চলে না। যার হৃদয় একবার বিষয়-বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তার দ্বারা ভগবান লাভ কঠিন।'

'যেমন টিয়া পাখির গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না। ছানাবেলায় শেখালে শিগগির পড়ে। তেমনি বুড়ো হলে সহজে মন যায় না ঈশ্বরে। ছেলেবেলায়ই মন স্থির হয় অল্পেতে।'

আবার বললেন: 'সূর্যোদয়ের পরে দধি মন্থন করলে যেমন উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হলে আর তেমন হয় না।'

এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু এক সের দুধে তিন পোয়া জল থাকলে সহজে ক্ষীর হবে? শুধু কাঠ-খড় পোড়ানোই সার।

'আম পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফলই ঠাকুরসেবায় দিতে হয়। কাকে ঠুকরে দাগী করলে কি সে ফল দেবসেবায় দেওয়া চলে?'

দেরি করে ফেলেছি বলে কি তোমার করুণার দেরি হবে? তুমি তো আমার চেয়েও আমাকে বেশি জানো। তুমি তো জানো কেন আমার এত দেরি হল, কিসের মোহে ভুলে ছিলাম এত দিন? তুমি তো জানো, মুখে যাই বলি, কাজে যাই করি, মনে-মনে মন শুধু তোমাকেই চেয়ে-চেয়ে ফিরেছে। শুধু নেতির ঘরে গিয়ে-গিয়ে ঘুরে-ঘুরে এসেছি এত দিন, প্রেরিত ঘরের ঠিকানা না পেয়ে। আমার দেরি, না, তোমার দেরি হল? তুমি কেন এতদিন দেরি করে ঠিকানা জানালে তোমার? অন্তরে অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছ আর জানছ আমার মনের সুদূরতম বাসনা, অথচ সব জেনে-শুনেও জানান দাওনি এত দিন। সে কি আমার অপরাধ? তুমি প্রিয়তম পরমস্নেহী হয়েও যদি এমন ছলনা করো তবে আমার উপায় কি। কিন্তু আজ তোমার ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছি। তোমার দেখা না পেলেও আজ তোমারই পথ চেয়ে বসে থাকব। তোমাকে না পাই কিছু যায়-আসে না। তবু তোমাকেই চাইব অহরহ। সঙ্গী-সাথী কেউ না-ই থাক, তোমাকে চাই—এই চাওয়াটিই নিলাম পথের সঙ্গী করে। তুমি কে জানি না, আমার এই চাওয়াটিই তুমি। না-পাওয়াটিও তুমি।

'নতুন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই-পাতা হাঁড়িতে রাখতে গেলে নষ্ট হয় দুধ।' যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'ওরা যে নির্মল আধার, চোকেনি বিষয়বুদ্ধি।'

যদি কেউ নিঃশেষহীন নবীন থাকে, সে তুমি। তুমি পুরাতন হয়েও চিরনবীন, নিত্য নবীন। পুরাতনকে তো শুধু পুরা বললেই চলে, আবার পুরাণ বলি কেন? পুরাণ কথাটির মধ্যে 'ন'-টি কি আতিশয্য নয়? না, ঐ 'ন'-টির মধ্যে একটি সংকেত রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। ঐ 'ন'-টি হচ্ছে নব বা নবীনের দ্যোতক। তার মানে তুমি পুরা হয়েও নবীন। তুমি শিকড়ে পুরোনো কিন্তু

পল্লবে নবীন। তুমি মূলে পুরোনো কিন্তু প্রকাশে নবীন। দিনে-দিনে আমিই কেবল পুরোনো হয়ে গেলাম। তোমার ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডটি পর্যন্ত নতুন। শুধু দিনে-দিনে আমিই ক্ষয় করে ফেললাম নিজেকে। তোমার দিন-রাত্রির আকাশের আলোটির একটুকু ক্ষয় হল না। জীবনের আরম্ভে যে নীল আকাশটি দেখেছিলাম আজ জীবনের প্রদোষেও সেই পরিচ্ছন্ন নীলিমাটিই দেখছি। দেখছি তোমার অপর্যাপ্ত প্রসন্নতা। আজও তার এতটুকু হ্রাস নেই। কত লোক চলে গেল জীবন থেকে, কিন্তু তোমার আকাশ-ভরা তারার হিসেবে এতটুকু কম পড়ল না। ভোরবেলায় তোমার সোনার হাসিটি আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে। তুমি আমাকে ছোঁও। ছুঁয়ে আমাকে নবীন করে দাও। নবীন হোক আমার চক্ষু, নবীন হোক আমার কর্ণ, নবীন হোক আমার রসনা। আমার যাত্রা নতুন হোক পন্থা নতুন হোক, লক্ষ্য নতুন হোক। তুমি যে আমার চিরনতুন।

২৪

'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। জমিদার তার জমিদারির যে কোনো জায়গায়ই থাকতে পারে বটে, কিন্তু লোকে বলে অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ আনাগোনা।'

ভক্তির মানে কায়মনোবাক্যে ভজনা। কায় মনে, চোখে তাঁকে দেখা সর্বঘটে, কানে তাঁর নামকীর্তন শোনা। হাতে সেবা করা পায়ে তীর্থে যাওয়া। আর মন মানে, স্মরণ-মনন চিন্তন-অনুধ্যান। আর বাক্য মানে তাঁর কথাকীর্তন করা। ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভয় আছে মানেই ভগবান আছে। ধূম আছে মানেই আগুন আছে। সুবাসটি আছে মানেই ফুল আছে অদূরে। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বিশ্রাম। গল্প-গুজব রঙ-তামাশার আড্ডাখানা। রামকৃষ্ণ বলে দিলেন এক কথায়: 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।'

কলিযুগের পক্ষে যাগ-যোগ ক্রিয়া-কাণ্ড নয়, শুধু নারদীয় ভক্তি। একে পরমায়ু অল্প, তায় অন্নগত প্রাণ—কঠোর তপস্যা কি করে চলবে? তাই শুধু স্বচ্ছ শুদ্ধ ভালোবাসা! এটিকেই প্রকাশ করলেন প্রতীকের সাহায্যে: 'আজ-কালকার ম্যালেরিয়া জ্বরে দশমূল পাঁচজন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রুগী কাবু হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিকচার।'

ভালোবাসার টানে বেরিয়ে পড়ো। ঠিকানা জানে না অথচ প্রাণ যাই-যাই করে তার নাম ভক্তি। পথ ভুল হলেও শুধু গতির জোরে ভক্তি নিয়ে যাবে ঠিক জায়গায়।

'কার্তিক আর গণেশ ভগবতীর কাছে বসে আছে।' গল্প বললেন রামকৃষ্ণ, 'ভগবতী তাঁর গলার মণিময় রত্নমালা দেখিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আগে

ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে পারবে তাকে এই রত্নমালা দেব। কার্তিক তো তক্ষুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ মাকে ভালোবাসে, ভাবলে মার বাইরে আবার ব্রহ্মাণ্ড কি! মাকে আস্তে-আস্তে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে যেমনটি বসেছিল তেমনি বসে পড়ল। অনেক পরে কার্তিক ফিরে এল হন্তদন্ত হয়ে। এসে দেখল দাদা দিব্যি বসে আছেন হার পরে।'

ভগবানকে ভালোবাসতে পারার মত কিছু নেই। ভগবানকে যখনই 'আমার' বলব তখনই মমতায় সমস্ত মন বিগলিত হবে। চোখের জলে পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব। পাছে কাঁটা ফোটে দেহ বিছিয়ে দেব পথের উপর, যেমন গোপীরা দিয়েছিল বৃন্দাবনে।

পর্ণে যেমন দিয়েছ বর্ণ, ফুলে দিয়েছ সৌরভ, ফলে দিয়েছ স্বাদসুধা, তেমনি আমার হৃদয়ে ভক্তি দাও। এই ভক্তি তোমারই আনন্দের আস্বাদন। তোমারই প্রসাধন। আমার নিজের রচনা নয় তোমারই নিজের রুচি। নিজের আস্বাদন।

'ভক্তের যে আমি,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'সে সোঽহং নয়, সে দাসোঽহং। এ আমি আমি-র মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, কিন্তু হিঞ্চে শাকে পিত্ত নাশ হয়। উল্টে উপকার। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, মিছরিতে অম্বল যায়। অন্য মিষ্টিতে অপকার। প্রণব বর্ণের মধ্যে নয়। তেমনি ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না।'

অহেতুক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তোমার কাছে কিছু চাই না অথচ তোমাকে ভালোবাসি—এইটিই অতুলন। তুমি আমাকে বিশেষ কোনো একটা সুখের বস্তু দেবে, তার বিনিময়ে তোমাকে ভালোবাসব এই হীন কাঙালপনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। প্রত্যক্ষে-অলক্ষ্যে তুমি যে আমাকে কত দিয়েছ, কত দিচ্ছ দিন-রাত তার কি কোনো হিসেব আছে? জীবনের পেয়ালা বারে-বারে ভরে দিয়েছ সুধা ঢেলে। বারে-বারে তা পান করে পেয়ালা খালি করেছি, আবার রিক্ত পেয়ালা তুলে ধরে ভিক্ষে করেছি তোমার স্নেহসিক্ত সুধাসার। আবার পেয়ালা উপচে পড়েছে। তবু কি ভালোবেসেছি তোমাকে? আর সয় না এ কাঙালপনা। ভিক্ষার পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ভেঙে। এবার আমি আর নেব না, এবার আমি দেব। এবার তুমিই কাঙাল হয়ে আমার দুয়ারে এসে হাত পাতবে। তোমার দু-হাত আমি ভরে দেব ভালোবাসায়। যদি একবার ভালোবাসা জাগে তবে কি আর সুখকামনা থাকে? তখন কি আর কেউ বলে, আমাকে সুখে রাখো? তখন বলে, আমাকে তোমার কোলে রাখো। আমি সুখ-দুঃখ সম্পদ-দারিদ্র্য বুঝি না, আমি বুঝি তোমার সুনিবিড় উৎসঙ্গ।

তোমার দীপান্বিতার রাত্রিতে আমিও একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ দীপ। জ্বলছি মিটমিট করে। তুমি আমাকে তেল দিয়েছ বলেই তো দিচ্ছি এই আলোটুকু। কাঙালের মত চাইব না আর তেল। যদি দীপ নিবে যায় দেব তোমাকে একটি শোভন শান্ত অন্ধকার। এই অন্ধকারটিই আমার ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার ঘর অন্ধকার করে দিলেই তুমিও আসবে অন্ধকারের মত।

'তিন বন্ধু বন দিয়ে যেতে-যেতে একটা বাঘ দেখতে পেল,' গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'একজন বললে, ভাই, আমরা সব মারা গেলুম। আরেক বন্ধু বললে, কেন, মারা যাব কেন ? এস ঈশ্বরকে ডাকি। তৃতীয় বন্ধু বললে, না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কী হবে ? এস এই গাছে উঠে পড়ি। যে লোকটি বললে, আমরা মারা গেলুম, সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। সে অজ্ঞানী। আর, যে বললে, এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি, সে জ্ঞানী। তার বোধ আছে যে ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর, যে বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস গাছে উঠি, তার ভিতরে ভালোবাসা জন্মেছে। প্রেমের স্বভাবই এই আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে। পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালোবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে।'

রসেই হবে রসবর্ষণ। আমার ভিক্ষা আনবে তোমার দান। আমার কান্না আনবে তোমার অনুকম্পা। কিন্তু আমার ভালোবাসা আনবে তোমার ভালোবাসা। তখন কে দেবে কে নেবে আর প্রশ্ন নেই। তখন তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে, আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে !

শাস্ত্রে বলে তাই ভক্তি করছি তাকে বলে বৈধী,ভক্তি। কিন্তু অকারণ ভালোবাসা থেকে যে ব্যাকুলতা হয় তাকে বলে রাগ-ভক্তি। একটি উজ্জ্বল উপমার সাহায্যে ছবি তুললেন রামকৃষ্ণ : 'বাঁকা নদী দিয়ে গন্তব্যস্থানে যেতে অনেক সময় অনেক কষ্ট। কিন্তু যদি একবার বন্যে হয়, তা হলে সোজাপথে অল্প সময়ের মধ্যেই চলে যাবে। তখন ডাঙাতেই এক বাঁশ জল। প্রথম অবস্থায় ঘুরতে হয় অনেক, পোয়াতে হয় অনেক হাঙ্গামা। কিন্তু রাগ-ভক্তি এলে সব জলের মত সোজা।'

জল ছেড়ে আবার নিলেন স্থলের উপমা : 'মাঠে ধান কাটার পর আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে যেতে হয় না। তখন যেখান দিয়ে ইচ্ছে যাওয়া যায় এক টানা। যদি পায়ে জুতো থাকে, তার মানে, যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস আর বিবেক-বৈরাগ্য থাকে, তা হলে সামান্য খোঁচা-খোঁচা খড় থাকলেও কষ্ট নেই।'

একবার আনো সেই ভাবের বন্যা। তখন বন মনে হবে বৃন্দাবন, সমুদ্র মনে হবে নীল-যমুনা। সমস্ত সংসার দেখবে ভগবন্ময়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় তার উপর পর্যন্ত মমতা থাকবে না। ঘুচে যাবে সব স্বার্থের শৃঙ্খল, অহঙ্কারের নাগপাশ। যাঁর কোনো দাবি নেই অথচ যিনি সমস্তই ত্যাগ করেছেন আমাদের জন্যে, ভাবের বন্যায় তাঁর মতই ত্যাগী হব। প্রেমেরই আরেক নাম ত্যাগ। প্রয়োজন নেই তাঁর, তবু তাঁর এত প্রেম। তেমনি কামনা নেই আমার তবু তাঁকে আমি ভালোবাসি। যেমন তাঁর অকারণ সৃষ্টি তেমনি হোক আমার অকারণ ভালোবাসা। কেন ভালোবাসো ভগবানকে ? কেন ভালোবাসি তা জানি না। ভালোবাসি বলে ভালোবাসি। ভালোবাসতেই ভালো লাগে।

একটি অপূর্ব উদাহরণ দিলেন রামকৃষ্ণ। দৃষ্টান্তটি গল্পের আকারে : 'মনে করো তুমি এক জ্ঞানী-গুণী বড়লোকের বাড়ি গেছ তাকে দেখতে। তার কাছে

তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই—শুধু তাকে তুমি দেখতে চাও, তাকে দেখতেই তুমি ভালোবাস। তুমি গেলে তার বাড়ি, তার বৈঠকখানায়—সে তোমাকে চেনে না, দেখা হতেই সে কুণ্ঠিত হয়ে শুধোল : কি চান মশাই ? কিছুই চাই না—তুমি বললে বিনীত স্বরে, এই আপনাকে একটু দেখতে এসেছি। এ আবার কি রকম আসা ! বড়লোক কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করবে না, চোখ বাঁকা করে তাকাবে, ভাববে নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তুমি চলে গেলে। তারপর আবার আরেক দিন গিয়েছ। কি চান মশাই ? সন্দিগ্ধ কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল বড়লোক। কিছুই চাই না, শুধু আপনাকে একটু দেখতে এসেছি। বড়লোক আবার দৃষ্টি কুটিল করবে। ভাববে নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী শত্রু নয়তো গুপ্তচর। নিশ্চয়ই কোনো মন্দ অভিসন্ধি আছে। চোখ নামিয়ে নেবে তোমার থেকে। তোমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, তুমি আবার আরেক দিন গিয়ে হাজির। এমনি কদিন পরে-পরেই, শেষকালে নিত্যি। কি চান মশাই ? কিছুই চাই না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। বড়লোক এদিকে খোঁজ নিয়েছে তোমার সম্বন্ধে, কিন্তু কোনো আকাঙ্ক্ষা বা কোনো অভিসন্ধির পাত্তা পায়নি। তখন আস্তে আস্তে বড়লোকের মন টলবে। তোমাকে বলবে, বসুন। শেষে একদিন কাঁধে হাত রেখে বলবে, এত দেরি করে এলে কেন ভাই। তোমাকে না দেখে যে থাকতে পারি না।'

এরই নাম অহেতুকী ভক্তি।

কিন্তু তুমি যদি বড়লোকের কাছে গিয়ে বলতে, আমি আপনার প্রতিবেশী, আপনার গাড়িতে একটু চড়তে দেবেন ? প্রথম দিন হয়তো দেবে ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু আবার আরো একদিন গিয়ে যদি চাও সেদিন চড়তে দিলেও কাছে বসতে দেবে না। বসতে বলবে কোচোয়ানের বাক্সে। আরো একদিন চাইলে সরাসরি মুখের উপর না করে দেবে। কিছু চাইতে গেলেই এই দুর্ভোগ। তোমার দর্শনেই তার বিরক্তি—'

তেমনি ভগবানের সম্পর্কে। তাঁর কাছে তুমি বসেছ আসন পেতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে, কি চাই ? তুমি বললে, কিছুই চাই না, শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি। ভগবান তোমাকে পরখ করবেন নানা ভাবে, যাচাই করে দেখবেন সত্যিই তুমি নিরাকাঙ্ক্ষ কিনা। যখন নিঃসন্দেহ হবেন তোমার কোনোই কামনা-বাসনা নেই, তখন একদিন হাত রাখবেন তোমার কাঁধের উপর। বলবেন, এত দেরি করে এলে কেন ভাই। তোমাকে না দেখে যে থাকতে পারি না। কিন্তু ধরো কামনা করে বসলে ভগবানের কাছে। ভগবান তোমার কামনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু কামনা পূর্ণ হলেও সুখ হল না। পুত্র চেয়েছিলে, পুত্র কুলাঙ্গার হল। ধন চেয়েছিলে, ধনের জন্যে গৃহবিভেদ হল। একটা মোটরগাড়ি চেয়েছিলে, হয়তো সেটা প্রতিবেশীর ছেলেকে চাপা দিলে। তখন মনে হবে বঞ্চনাটাই করুণা। তাছাড়া আমি কি সত্যিই জানি কি আমার চাই, কি হলে আমার বাসনার উপশম হবে ? কি পেলে কি খেলে আমি হজম করতে পারব ? তাও তো আমার

চেয়ে তুমি ভালো জানো। তা হলে তোমার কাছে চাইতে যাই কেন, কেন মিছিমিছি তোমার কাছে চেয়ে তোমাকে ক্লেশ দিই? তার চেয়ে তোমাকে ভালোবাসি, তোমার উপরেই সব ভার সমর্পণ করেছি। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করবে। তুমিই বুঝবে কি আমার রুচিকর নয়, কি আমার উপযোগী। কিসে আমার ভালো হবে। যদি বোঝো বঞ্চনাতেই আমার কল্যাণ, তবে তোমার সেই বঞ্চনাই আমি আস্বাদ করব তোমার অরুপণ করুণার মত।

২৫

তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'রাজার বেটা হ, মাসোয়ারা পাবি।'

আমাদের শুধু মাসোয়ারার দিকেই নজর। রাজার বেটা হবার দিকে লক্ষ্য নেই। কেন চেয়ে-চেয়ে নিজেদের ছোট করি, যার কাছে চাইছি তার ঘটাই অবমাননা? যাঁর ব্রহ্মাণ্ডভরা ভাণ্ডার তাঁর কাছে কী চাই—কটা ছোটখাটো পার্থিব জিনিস টাকা-কড়ি, বাড়ি-গাড়ি, মান-যশ, প্রভাব-প্রতাপ? আমি কেন তাঁকে আমার চাওয়া দিয়ে সীমাবদ্ধ করি? তিনি ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণাতেও অসীম। তাঁর ঐশ্বর্যের কি শেষ আছে? আমাদের কত বড় রাজা। এমন বিচিত্র তাঁর রাজত্ব আমরা আবার প্রত্যেকেই রাজা। আমরা তাঁরই বিন্দু-বিন্দু প্রতিবিম্ব। তাঁর রাজত্বে যেমন আমাদের বাস, আমাদের রাজত্বেও আবার তাঁর বসতি। আমাদের রাজত্ব সীমা টেনে। তাঁর রাজত্ব অনন্তে। অন্ত আর অনন্ত দুটি পাখী। কিন্তু বসেছে একেবারে পরস্পরের গা ঘেঁষে। একটি নইলে আরেকটি অচল। আরেকটি নির্বাক। এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে প্রেমের যোগ। সীমা কাঁদে অসীমের জন্যে, অসীম কাঁদে সীমায়িত হবার পিপাসায়।

'দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ।' যোগের তত্ত্বটি মধুর উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ: 'নিক্তির একদিকে ভার বেশি হলে উপরের কাঁটাও নিচের কাঁটার মুখ এক হয় না। উপরের কাঁটা ঈশ্বর, নিচের কাঁটা মানুষের মন। এই দুই কাঁটা এক হওয়ার নামই যোগ। ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়—তেমনি।'

যেন চুম্বক আর ছুঁচ। একে অন্যেকে টেনে নিলেই যোগ।

'কিন্তু ছুঁচে মাটি মাখানো থাকলে চুম্বক টানে না।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তবে মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কিন্তু মাটি ধোবে কি করে? চোখের জলে মাটি ধোবে। তখন ঠিক টেনে নেবে চুম্বক। সেই টান হলেই যোগ।'

এই কথাটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে: 'শুধু কাঁচের উপর ছবির দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি মাখানো কাঁচের উপর ছবি ওঠে। যেমন ফোটোগ্রাফ। তেমনি মনে ভক্তিরূপ কালি মাখিয়ে নাও, ভগবানের ছবি উঠবে।'

অন্তরে যদি ভক্তি থাকে তবে আর ভয় নেই। 'তখন', বললেন রামকৃষ্ণ:

'পায়ে যেন জুতো পরে নিয়েছিস। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনেও যাওয়া যায় অনায়াসে।'

আমার আর কিসের ভয়। দুই কাঁটা এক করে নেব। নয়নতারাকে মিলিয়ে নেব ধ্রুবতারার সঙ্গে। আমি যেখানে যাব, সেখানে তোমাকেও নিয়ে যাব। কিংবা সেখানেই আমি যাব যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। একবার যখন তুমি হৃদয়ে এসে বসেছ তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার হৃদয় হয়ে উঠেছে, তুমিময় হয়ে উঠেছে। যা আছে ভাণ্ডে তাই ব্রহ্মাণ্ডে। আমার আর ভয় কি। আমি তো পথের দিকে চেয়ে চলছি না, পড়লুম কি উঠলুম—আমি চলেছি ধ্রুবতারার দিকে চেয়ে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে। যদি তোমার মুখ একবার দেখি তখন কি আর পথ দেখবার সময় হবে। তখন তুমিই পথ তুমিই রথ, তুমিই চক্র তুমিই কেন্দ্র, তুমিই গতি তুমিই ইতি। কত সাধন করলুম তোমার জন্যে তবু তোমাকে পেলুম না—এ নালিশ আমি করব না কোনোদিন। আমি যে তোমাকে ভালোবাসতে পারছি এই আমার আনন্দ। সুখের বিপরীত দুঃখ, বিষাদের বিপরীত প্রসাদ। কিন্তু আনন্দের কোনো বিপরীত নেই। সে সব সময়েই আনন্দ। সে নির্বিশেষ, বিষয়বিরহিত। তাই আমার সুখেও আনন্দ দুঃখেও আনন্দ। চাওয়াতেও আনন্দ, না পাওয়াতেও আনন্দ।

আমার তো বৈধীভক্তি নয়, যে, এত জপ এত ধ্যান এত যাগ এত যজ্ঞ করব। আমার হল রাগভক্তি। আমার শুধু ভালোবাসা। আমার শুধু কান্নার আনন্দ। বৈধীভক্তি, রামকৃষ্ণের কথায়, 'হতেও যেমন যেতেও তেমন।' দুঃখ করে বলে, কত ভাই হবিষ্য করলুম, কতবার বাড়িতে পুজো দিলুম, কিছুই হল না। রাগভক্তির আপসোস নেই। তার পতন নেই বিচ্যুতি নেই। সে হচ্ছে খানদানি চাষা, দু দিনের ভুঁইফোঁড় চাষা নয়।

সুন্দর একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'যারা নতুন চাষ করে, মানে যাদের বৈধীভক্তি, তাদের যদি ফসল না হয় জমি ছেড়ে দেয়। খানদানি চাষা, মানে যাদের রাগভক্তি, তাদের ফসল হোক আর না হোক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে তারা জানে যে চাষ করেই খেতে হবে।'

আমাকে চাষ করতে দাও। তোমার কৃপাবারি যদি বর্ষণ না-ও করো, দাও আমাকে চোখের জল ফেলতে। চোখের জলে শুষ্ক মাটি সিক্ত করতে। হাজাশুকোয় পুড়ে যাক মাটি, ফসলের আশায় বাজ পড়ুক, তবু চাষ করতে দিও বছর-বছর। চেয়ে থাকতে দিও ঊর্ধ্বমুখে তোমার করুণাবাহী বারিবাহের জন্যে। শোভন-শ্যামলের দেখা না পাই আমি থাকব আমার এই তাপ আর তৃষ্ণার তপস্যায়। আমার এই প্রতীক্ষাই ভিক্ষা। প্রতীক্ষাই প্রাপ্তি।

'জটিল বালক রোজ বনের পথ দিয়ে একলা পাঠশালায় যায়।' গল্প ফাঁদলেন রামকৃষ্ণ: 'যেতে বড় ভয় করে। মা বললেন, ভয় কি? তোর তো মধুসূদনই আছে। মধুসূদনকে ডাকবি। জটিল জিজ্ঞেস করলে মধুসূদন কে? মধুসূদন তোর দাদা। বলে দিলেন মা। তখন, পরের দিন, একলা পথে যেতে যেই জটিল

ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকে উঠেছে—মধুসূদন দাদা। কেউ কোথাও নেই। শুধু বনের জটিলতা! তখন কেঁদে উঠল অবোধ ছেলে : কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে। তখন ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে আমি, ভয় কি! এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। বললেন, যখনই তুই ডাকবি, আসব। ভয় নেই। ভয় কি!'

জটিলকে সহজ করে দাও। সহজ করে দাও এই বালকের মত বিশ্বাসে, বালকের মত ব্যাকুলতায়। যিনি ত্রিভুবনপালক তিনিও গোপাল-বালক। ছোটটি না হলে ভক্তের বাড়িতে ঢুকবেন কি করে? দরজার চৌকাঠে যে মাথা ঠেকে যাবে। ভক্তের বাড়িতে এসে তিনি তো আর সিংহাসনে বসতে চান না, বসতে চান কোলের উপরে। ছোট ছেলেটি না হলে কোলের উপর বসবেন কি করে?

ঈশ্বরের বালকস্বভাবের একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ : 'ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন, ধরো, কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে বসে আছে। রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে কত লোক, লক্ষ্যও করছে না। কেউ যদি তার কাছে এসে রত্ন চায়, কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না, কিছুতে দেবো না। আবার হয়তো যে চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে সমস্ত—'

আবার আরেকটি ছবি : 'বালকের আঁট নেই। এই খেলাঘর করলে, কেউ হাত দেবে তো, ধেই-ধেই করে নেচে কাঁদিতে আরম্ভ করবে। আবার কি খেয়ালে নিজেই ভেঙে ফেলবে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, বলছে আমার বাবা দিয়েছে, আমি কাউকে দেব না। আবার একটা পুতুল দিলেই পরে ভুলে যায়, কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায় আরেক দিকে।'

বালক আছে ঈশ্বরের কাছাকাছি। তেমনি যে ঈশ্বরের কাছাকাছি হবে সেও বালক হয়ে যাবে। তেমনি সরল, তেমনি বিশ্বাসী, তেমনি নিরাসক্ত, তেমনি কলঙ্ককালিমাশূন্য। উদাসীন শিশু ভোলানাথ।

দেশের ছেলে শিবুর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ—চার-পাঁচ বছরের হবে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। শিবু বলছে জ্ঞানীর মত মাথা নেড়ে, খুড়ো, ঐ চকমকি ঝাড়ছে। একদিন দেখি, ফড়িং ধরতে যাচ্ছে একলা। কাছেই গাছের পাতা নড়ছিল। তাই দেখে পাতাকে বলছে চুপ-চুপ, আমি ফড়িং ধরব। সব চৈতন্যময় দেখছে বালক। চাই এমনি বালকের সরল বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস না হলে পাওয়া যায় না ভগবানকে।'

প্রকাশই তো সত্তা। আমি যে আছি তার মানে আমি প্রকাশিত হয়ে আছি। যা ভাবছি বা করছি, নিজেকে প্রকাশিত করব বলেই। আমাদের করা শুধু এই হওয়ারই জন্যে। প্রকাশই সত্য, প্রকাশই স্থির। আমি একটি শুচি-শুদ্ধ প্রসন্ন-পরিপূর্ণ বালকে প্রকাশিত হব। শুক্তিকে বিদীর্ণ করে বিকশিত হব মুক্তোয়। সেই তো আমার মুক্তি।

'তবে', বললেন রামকৃষ্ণ : ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছ, কিন্তু সুতোর ভেতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর প্রবেশ করবে না।'

তার মানে কামনার তন্তুলেশ থাকলেই বন্ধন। যা তন্তু তাই শেষে রজ্জু। যা মাল্য তাই শেষে শৃঙ্খল।

চারদিকে মায়ার জিনিস ছড়িয়ে রেখেছেন ঈশ্বর, আমাদের মন ভোলাবার জন্যে। যদি তা দেখে তাঁকে ভুলে যাই তবেই সেটা মায়া। আর যদি তা সত্ত্বেও তাঁকেই মনোহরণ বলে দেখি ও অনুভব করি তবেই সেটা সত্য। সংসারে কাম-কাঞ্চনের মধ্যে থাকতে-থাকতে আর মান-হুঁস থাকে না। কেমন যেন নিস্তেজ নিশ্চেতন হয়ে পড়ে। আমরা যে অমৃতের সন্তান, ব্রহ্মময়ীর বেটা, তাই ভুলে থাকি।

নানা উপমায় প্রকাশ করেছেন এই অবস্থাটা : 'ময়লার ভার বইতে বইতে মেথরের আর ঘেন্না হয় না। বিশালাক্ষীর দ—নৌকো একবার দহে পড়লে আর রক্ষে নেই। কেল্লায় যাবার সময় একটুও বোঝা যায় না যে গড়ানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কেল্লার ভেতরে গাড়ি পৌঁছুলে দেখা গেল যে চারতলা নিচে নেমে এসেছি।'

'ভূতে যাকে পায় সে নিজে বুঝতে পারে না যে ভূতে পেয়েছে।'

তাই তো সকাতর প্রার্থনা করছি মায়ার কাছে, মায়া তুমি সরে দাঁড়াও। যার তুমি ছলনা তাকেই দেখতে দাও শান্তিতে। মেঘ হয়ে তুমি ঢেকে রেখো না সূর্যকে। ধূলি হয়ে আকাশকে। তুমি উড়ে যাও দূরে যাও। কিংবা যদি বা না যাবে, দেখাও তুমি আর কিছু নয়, তাঁরই ছায়া। তাই ছায়াকে দেখে যেন সেই কায়াকেই ধরতে যাই। তুমি শুধু ভুল হয়েই থেকো না, ভুলকে ফুলে পরিণত কোরো। যেন সেই ফুলটিকে তাঁর চরণে দিতে পারি ফেরাফিরতি।

বিষয়-বিষ-বিকার হয়েছে সংসারীর। জমি, টাকা, আর স্ত্রী—এই তিনটি জিনিসের উপরই তার বেশি মন। এই তিনের উপরে মন রাখতে গেলেই ভগবানের সঙ্গে আর যোগ নেই।

'এই তিন টান ছেড়ে আর তিন টান নাও।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপরে টান আর সতীর পতির উপরে টান। এই তিন টান যদি মেশে এসে কারু রক্তে, তবে সে সটান ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছুবে।'

কিন্তু তুমিই আমাকে টানবে আমি তোমাকে টানবো না? তুমিও কি কাঙালের বেশে বেরিয়ে পড়নি অভিসারে? তোমার তরী কি আমার ঘাটে এসে ভিড়বে না? আমি যদি একটি পূজোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারি, আঁচলের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তার ক্লান্তিহীন শিখাটিকে, তবে কি তুমি সেই আলোতে পথ চিনবে না? আমাকে পেরিয়ে গেলেই কি তুমি পার পাবে? আমার

মাঝে তোমার বিচিত্র লীলা হবে বলেই তো আমি এখানে এসেছি। হোক তা বৈফল্যের লীলা, তবু তা তোমারই তো বিলাস-বিভ্রম। তুমি যে বিশাল বিশ্বসংসারের ছক পেতেছ তাতে আমিও তো একটা ঘুঁটি—আমাকে ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না তোমার শতরঞ্জ খেলা। আমি ছাড়া কে প্রকাশ করবে তোমার এই বিশেষ ব্যঞ্জনাটি ? ওটির জন্যেই তো আমি। আমার হৃদয়ে বাস করছে যে বিনিদ্রা বিরহিনী সে যতই হতভাগিনী হোক, তোমার বরমাল্যটি তারই জন্যে।

'সব কলায়ের ডালের খদ্দের।' সংসারী লোকের সংজ্ঞা দিলেন রামকৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, আরো সুন্দর প্রতীক অবলম্বন করলেন : 'খই যখন ভাজা হয় দু-চারটে খই খোলা থেকে টপ টপ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকাফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, গায়ে দাগ থাকে একটু। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকাফুলের মত দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাকলে একটু লালচে দাগ হতে পারে। সংসারী জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে সে দাগে কোনো ক্ষতি নেই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।'

মলিন কামনা, মলিন সঞ্চয়, মলিন অহংকার—বহু ক্লেশকলুষের দাগ ধরা এই জীবন। একে পরিমার্জন করো। অশ্রুজলে স্নান করিয়ে দাও। দাও তোমার করুণা-রস বর্ষণ। অশ্রুজলই তো তোমার করুণার আসর। তাইতেই আমি শান্ত হব শীতল হব, আমার গায়ে লাগবে সৌরভস্পর্শ। আমাকে করো তুমি মৃদুগন্ধ শুভ্র মল্লিকাফুল।

কি করে বিভ্রান্ত হয় সংসারী জীব তারই আরেকটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ : 'চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরগুলো ঐ চালের সন্ধান পায় তাই দোকানদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি মিষ্টি লাগে, আর সোঁদা-সোঁদা গন্ধ লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না। কিন্তু দেখ, এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়। কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দের অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশি।'

যিনি বিশ্বপ্রকৃতিতে এত সুন্দররূপে বিরাজমান, তিনি আমাদের হৃদয়েও এই সুন্দররূপেই আছেন প্রচ্ছন্ন হয়ে। আমাদের কামনাই তাঁকে আবৃত করে আচ্ছন্ন করে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই কামনার আবরণটুকু না সরালে পরমকামনীয়কে দেখতে পাব না। আমার লুব্ধতা আমার ভীরুতা আমার অসহিষ্ণুতাই বাধা। আমি নিজেকে আর দেখতে চাই না। আমি এখন তোমাকে দেখি। আমাকে অপ্রমত্ত করো, বীর্যবান করো, প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ করো, ছিঁড়ে দি ঐ বন্ধ বাসনার বধির যবনিকা। সুন্দরকে সত্যদৃষ্টিকে একবার দেখি। দেখি ঐ তারকিনী রাত্রির দীপাবলীতে, দেখি ঐ তৃণাঙ্কিত প্রান্তরের শ্যামলতায়।

হায়-হায়, ঈশ্বরের যে সঙ্গ করবে সংসারী লোকের অবসর কই ?

মজার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে, একটি ভালো পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ দেখতে হয়। চারখানা লাঙল, আটটা হেলেগরু। সর্বদা তদারক করতে হয় কিনা, অবসর নেই। তখন, যে লোক পণ্ডিত চেয়েছিল, বললে, আমার এমন পণ্ডিতের দরকার নেই যার অবসর নেই। লাঙল-হেলেগরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শোনাতে পারে।'

ভগবৎকথা ছেড়ে লাঙল-গরুর কথায় বেশি স্পৃহা। যে শান্তি বা সন্তোষের দাম হত লক্ষ টাকা তা ফেলে পাঁচসিকে-পাঁচআনার সন্ধান। সময় নেই, সময় নেই। সমস্ত সংসার সরে-সরে যাচ্ছে আর বলছে, সময় নেই। ঈশ্বরকে ডাকবার, জানবার, ধরবার সময় নেই। কত কাজ, কত সঙ্কল্প, কত প্রগতি! সত্যি সময় নেই—তাই তো এত ত্বরা করছি তোমাকে ধরবার জন্যে, আকুলতায় এত কাতরতা মিশিয়েছি তোমাকে ডাকবার জন্যে। দিন-রাত্রির সব কটি মুহূর্ত জ্বালিয়ে রেখেছি রক্তের প্রদীপে যদি কখনো না কখনো তোমার দেখা পাই। না-ই বা পেলাম তোমাকে। এই শুধু জানি, সময় নেই, ছুটতে হবে, নিজেকে বিসর্জন দিতে হবে নিঃশেষে। পাওয়া মানেই তো থামা। পাওয়া মানেই তো পর্যাপ্তি। আমি তাই নিতে চাই না, পেতে চাই না, শুধু দিতে চাই। দেওয়া মানেই তো চলা। দেওয়া মানেই তো অসীম হওয়া, অফুরন্ত হওয়া। আমি আলো দেব হাসি দেব সুর দেব স্নেহ দেব—কে নিবি আয়! সময় নেই, সময় নেই!

২৭

সংসারী লোক সব স্ত্রীর দাস। এই বক্তব্যটিই কেমন রসালো করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'যত সব দেখিস হোমরাচোমরা বাবুভায়া, কেউ জজ কেউ মেজেস্টর, বাইরেই যত বোল-বোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম। অন্দর থেকে কোনো হুকুম এলে অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারু ক্ষমতা নেই। ভালোই হোক মন্দই হোক নিজের-নিজের পরিবারকে সকলেই সুখ্যাত করে। স্ত্রীকে বোধ হয় অমন আপনার লোক পৃথিবীতে আর হবে না। যদি জিজ্ঞেস করো, তোমার পরিবারটি কেমন গা, অমনি বলবে, আজ্ঞে খুব ভালো।'

তারপর দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বললেন : 'একজন একটি কর্মের জন্যে আফিসের বড়বাবুর কাছে আনাগোনা করে হায়রান হয়ে গেল। বড়বাবু বললেন, এখন খালি নেই, তবে মাঝে-মাঝে এসে দেখা করো। যতবার যায় দেখা করতে ততবার ঐ কথা। অনেক কাল কেটে গেল, চাকরি আর হয় না। সেই কথাই দুঃখ করে একদিন বন্ধুকে বলছে সে উমেদার। বন্ধু বললে, তোর যেমন বুদ্ধি। ওটার কাছে আনাগোনা করলে কিছু হবে না। তুই এক কাজ কর, গোলাপীকে

ধর, কালই তোর কাজ হয়ে যাবে। উমেদার বললে, সত্যি? তবে এক্ষুনি আমি চললাম তার কাছে। গোলাপীর কাছে এসে সেই উমেদার বললে, মা, আমি মহাবিপদে পড়েছি। অনেক দিন কাজকর্ম নেই; ছেলেপিলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই, আপনি একবার বলে দিলেই আমার একটি কর্ম হয়। গোলাপী বললে, বাছা কোন বাবুকে বললে হয়? উমেদার বললে, আপনি দয়া করে যদি বড়বাবুকে একটু বলে ঠিক করে দেন তাহলেই হয়ে যায়। গোলাপী বললে, আজই বাবুকে বলে ঠিক করে রাখব। পরদিন সকালেই খবর এল সেই উমেদারের কাছে, আজ থেকেই বড়বাবুর আপিসে বেরুতে হবে। সাহেবকে বড়বাবু বোঝালে, এ খুব উপযুক্ত লোক, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে। একে তাই বহাল করেছি।'

সংসারে দুরকম স্বভাবের লোক আছে। একটি গ্রাম্য অথচ সমীচীন উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'কতকগুলোর স্বভাব কুলো, কতকগুলোর চালুনি। কুলো অসারবস্তু ত্যাগ করে সারবস্তু গ্রহণ করে। আর চালুনি? সারবস্তু ত্যাগ করে অসারবস্তুগুলি নিজের মধ্যে রেখে দেয়।'

সংসারে সঞ্চও আছে সারও আছে। সঞ্চ হচ্ছে মায়া, সার হচ্ছে ভগবান। সঞ্চয়ে মানুষের স্পর্ধা, ত্যাগে মানুষের মহত্ত্ব। তার সার্থকতা ভূরিতায় নয়, ভূমায়। তার মধ্যে যে অর্থটি অন্তর্নিহিত আছে সেটিকে প্রকাশিত করা, উচ্চারিত করাই তার সাধনা। সে অর্থের উচ্চারণ উপকরণে নয় আত্মার লাবণ্যবিস্তারে। যিনি আমারো মধ্যে অসীম হয়ে বিরাজ করছেন তাঁকে আমারই সীমিত জীবনে রূপায়িত করা। এইটুকুই সার। জীবনকে করব তাই ঈশ্বরের সারানুবাদ।

মানুষকে আবার দু ভাগে ফেললেন রামকৃষ্ণ। মাটির দেয়াল আর পাথরের দেয়াল। বললেন: 'মাটির দেয়ালে পেরেক পুঁততে কোনো কষ্ট হয় না। পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তবু দেয়ালের কিছু হবে না।'

আমাকে মাটির দেয়াল করো। নরম ও সহনশীল। চাই না আমি অহঙ্কারে নিরেট হতে, দৃঢ় হতে মূঢ়তায়। আমাকে কোমল করে বিদ্ধ করো, দীর্ণ করো আমাকে। তা হলেই তো তুমি সেই দুঃখের রন্ধ্রটিতে লগ্ন হবে আমাতে, মগ্ন হবে সেই রসক্ষরণে। নইলে দুর্ভেদ্য পাথর হয়ে তোমাকে যদি ফিরিয়ে দি তা হলে সেই নীরন্ধ্র শুষ্কতায় বাঁচব কি করে? সে উদ্ধত স্পর্ধা দাঁড়িয়ে থাকবে তখন একটা অতন্দ্র হাহাকারের মত। তুমি আঘাত করো আমাকে। আমার মর্মমূলে তোমার অনাবৃত হাতের যে নিবিড়-নির্মল স্পর্শ তাই তো দুঃখ। দুঃখ থেকে কান্নার ভাষাটি না পেলে প্রকাশের মন্ত্র কি করে রচনা করব? দাহই যদি না পাই তবে একটি অক্ষুন্ন দীপ্তি বহন করব কি করে? যদি আঘাতই না আসে তবে মঙ্গলসুধার উৎসমুখটি খুলবে কিসে?

এই ভাবেই আবার বলেছেন রামকৃষ্ণ, অন্য প্রতীকের সাহায্যে: 'তরোয়ালের

চোটে কুমিরের কিছু হয় না। তরোয়াল ঠিকরে পড়ে যায়, তার গায়েও লাগে না। তেমনি বদ্ধজীবের কাছে যতই ধর্ম-কথা বলো, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগবে না।'

'এরা যেন সাধুর কমণ্ডলু। সাধুর তুম্বা চারধামে ঘুরে আসে, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে।'

তার পর একটি কবিতার মলয় হাওয়া বইয়ে দিলেন: 'মলয় পর্বতের হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। সে-হাওয়া যে গাছে লাগে তাই চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু যে গাছে সার নেই যেমন কলা আর বাঁশ, তা আর চন্দন হয় না।'

হে দক্ষিণ, তোমার স্নিগ্ধ দাক্ষিণ্য প্রসারিত করো। আমাকে একবার স্পর্শ করতে দাও। আমার মধ্যে সারবস্তু কিছু আছে কিনা জানি না তবু সর্বাঙ্গ ভরে তোমার নিশ্বাস নিই একবার। হে আকাশ, নিরন্তর তোমার যে সুধাবর্ষণ হচ্ছে তার নিচে আমার শূন্য হৃদয়কুম্ভটি এনে রাখি। হয়তো কোথাও একটা ছিদ্র আছে, পরিপূর্ণ হবে না সে কুম্ভ। তবু তোমার সুধাস্পর্শের তো একটু সিঞ্চন পাই। আবার কত রকম আছে। সাধুর কাছে এসে যখন বসে তখন যেন কতই বৈরাগ্যের ভাব। বিষয়কথা বিষয়চিন্তা সব রেখে দেয় লুকিয়ে। পরে যখন উঠে যায় সেখান থেকে, আবার সেই কথা সেই চিন্তা নিয়ে খতাতে বসে।

একটি অদ্ভুত উপমার মধ্য দিয়ে বলেছেন তা রামকৃষ্ণ: 'পায়রা মটর খেল, মনে হল সব বুঝি হজম হয়ে গেল। কিন্তু সব লুকিয়ে রেখে দেয় গলার মধ্যে। যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজগজ করছে।'

আরেক ধরনের লোক আছে, ভিতরে কামকাঞ্চনভোগ, বাইরে নামগুণকীর্তন ধ্যান-জপ কত কি অনুষ্ঠান। এ যেন সেই দাঁতওয়ালা হাতি! বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ: 'হাতির বাইরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাইরের দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়।'

আবার আরেক রকম আছে, ঈশ্বরচিন্তা করে অথচ বিশ্বাস নেই ঈশ্বরে, সংসারে আসক্ত হয়ে আবার ভুলে যায়।

আবার সেই হাতির উপমা: 'মন মত্ত করী। হাতির স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবারধুলো-কাদা মাখে। কিন্তু মাহুত নাইয়ে দিয়ে যদি তাকে আস্তাবলে সাঁদ করিয়ে দিতে পারে তা হলে আর ধুলো-কাদা মাখতে হয় না।'

মাহুত হয়ে একমাত্র গুরুই রক্ষা করতে পারে। একবার ঈশ্বর-সত্তায় স্নান করিয়ে যদি রাখতে পারে তার রক্ষণাবেক্ষণে, তবে আর ভয় নেই। গুরুই আত্মদর্শন ঘটিয়ে নিয়ে যেতে পারে স্বধামে।

এবার একটি অপূর্ব গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। তাৎপর্যে তীক্ষ্ন একটি গল্প: 'একটি ছাগলের পালে বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে একটা শিকারী তাকে মেরে ফেললে। অমনি তার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। ছাগলেরাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা-ভ্যা করে, সেও ভ্যা-ভ্যা করে। ক্রমে ক্রমে ছানাটা বড় হল। একদিন ঐ

ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে উপস্থিত। বাঘ দেখে ছাগলের পালের সঙ্গে বাঘের বাচ্চাটাও ছুটে দিল পালাবার জন্যে। বাঘ তখন সে ঘাসখেকো বাঘের বাচ্চাটাকে ধরল। সে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল প্রাণপণে। বাঘ তখন তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল। বললে, এই জলের ভিতরে তোর মুখ দ্যাখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস—খা। বলে জোর করে খানিকটে মাংস তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে। সে কিছুতেই খাবে না প্রথমটা, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। বাঃ, বেশ তো খেতে—একেবারে স্বভাবের খাদ্য। তখন আততায়ী বাঘটা বললে, এখন বুঝেছিস, আমি যা তুইও তা। এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

ছাগলের পালে বাঘের ছানা মানে আত্মবিস্মৃতি অমৃত-পুত্র। ঘাস খাওয়া মানে অসার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলের মত ডাকা আর পালানো মানে সামান্য বন্ধ জীবের মত ব্যবহার করা। আততায়ী বাঘের আগমন মানে আকস্মিক গুরুলাভ। জলে প্রতিবিম্ব দর্শন মানে স্বরূপ-দর্শন। রক্তের স্বাদ মানে হরিনাম স্বাদ। বনে চলে যাওয়া মানে চৈতন্যদাতা গুরুর শরণাগত হওয়া। সহজের মধ্য দিয়ে এমন গভীর বিশ্লেষণ আর কোথায়!

গুরুকৃপায় যদি জ্ঞান লাভ হয় তবে সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়। সংসার তো ছাড়তে বলেননি রামকৃষ্ণ, সংসারে থাকতেই বলেছেন, সঙ ছেড়ে সারটুকু নিয়ে থাকতে। সংসারের ঘর ছাড়লেও দেহ-ঘর তো ছাড়তে পারবে না, তবে আর এই বিড়ম্বনা কেন? ঘর ছেড়েও তো আবার কুটির বাঁধে সন্ন্যাসী, কুটির না বাঁধলেও মঠ। নিজের বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। পুত্র ছেড়ে দিয়ে আসে, কিন্তু চেলা জোটায়। এও একরকম মায়া। একরকম অহংকার।

রামকৃষ্ণ বললেন: গেরুয়ার অহমিকা।'

তাই, সংসারে এসেছ সংসারেই থাকো। থাকো গুরুজ্ঞানাশ্রয়ে ঈশ্বরযুক্ত হয়ে। এই ভাবটিই বোঝালেন একটি ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে: 'যদি কেরানীকে জেলে দেয় সে জেল খাটে। কিন্তু যখন তাকে ছেড়ে দেয় জেল থেকে তখন সে কী করে? সে কি তখন রাস্তায় এসে ধেই-ধেই করে নেচে-নেচে বেড়ায়? মোটেও নয়। সে আবার একটি কেরানীগিরি জুটিয়ে নেয়, সেই আগেকার কাজই করে।'

হৃদয়ে শুধু জেবলে রাখো একটি অনির্বাণ জ্ঞানবর্তি। জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিই ঐ জ্ঞানচক্ষু। কিন্তু সদগুরু ধরা চাই। সচ্চিদানন্দ গুরু। যে ঈশ্বরলাভ করেনি, পায়নি তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ, যে ঈশ্বরশক্তিতে শক্তিমান নয় তার কী সাধ্য শিষ্যের ভববন্ধন মোচন করে! যদি সদগুরু হয় জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা।

এখানে আরেকটি রসাশ্রিত চিত্র আঁকলেন রামকৃষ্ণ: 'শুনতে পেলুম একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পর যখন ফিরে আসছি তখনও দেখি, ব্যাঙটা ডাকছে খুব। কি হয়েছে—একবার উঁকি মেরে

দেখলুম। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়াতেও পাচ্ছে না, গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটারও যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলুম, ওকে যদি জাত-সাপে ধরত তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।'

২৮

তাই, যে-ঘরে আমাকে রেখেছ আমি সেই ঘরেই থাকব। যে ঘরেই থাকি সেই ঘরেই তোমার ঘট, সে ঘরের বাইরেই তোমার আকাশ। আমার দৃষ্টি আর ঘরের দিকে নয়, ঘেরের দিকে। তার মানে, কতটা নিজেকে আড়াল করলাম সেদিকে নয়, কতটা তোমাকে আড়াল করলাম সেদিকে নয়, কতটা তোমাকে ঘিরতে পেলাম সেই দিকে। যে ঘর তোমার খুশি, সেই ঘর দাও, কিন্তু বেড়া দিও না। যে ঘরেই থাকি, ঘরকে যেন বাহির করতে পারি। ঘরকে যেন বন বলে মনে হয়। সেই ঘরই দাও যেখানে মন উন্মনা হয়ে থাকে। যেখানে বনবাসীর মত বাস করতে পারি। নয়নে যদি কটাক্ষ না থাকে, তবে কাজল দিয়ে কী হবে? তেমনি অন্তরের স্থিরধামে যদি তুমি না থাকো, তবে কী হবে আমার ঘর-দ্বারে?

চুপ করে বসে থাকতে তো পারি না। জীবন চলেছে, জগৎ চলেছে, চোখের উপরে কাজ করছে অনল-অনিল। তেমনি আমাকেও কাজ করতে হবে। কাজ করে ক্লান্ত না হলে তুমি তো টেনে নেবে না তোমার বাহুর মধ্যে, অঞ্চলে মুছে দেবে না স্বেদধারা। কিন্তু কাজ যে করবো, কী ভাবে করবো? যেমন গান কাজ করে। গান তার কথায় মাঝে-মাঝে সুরের জন্যে ফাঁক রাখে। তেমনি আমার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তোমার সুর ভরে-ভরে উঠবে। আমার কথা তোমার সুরে দুয়ে মিলে সঙ্গীত। তেমনি আমার কাজ তোমার দৃষ্টি দুয়ে মিলে আনন্দ। আমার ব্যথার বাঁশিতে তুমি আনন্দের সুর বাজাও।

'আমি দেখছি, যেখানে থাকি,' বললেন রামকৃষ্ণ: 'রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎসংসারই রামের অযোধ্যা।'

যেখানেই থাকি তোমার প্রেমপ্রসন্ন মুখের বিভাটি দেখতে পাই—তাই সর্বত্রই আমার রামের অযোধ্যা। তুমি সমস্ত অনুভব করছ, তেমনি তোমার মধ্যে সমস্তকে অনুভব করি। কিন্তু পারি কই সব সময়? যখন তুমি রিক্ত করে দাও তখন দুয়ারে বসে কাঁদি, ভাবি না এই রিক্ততা তুমি আবার রসে ভরে দেবে। যখন আহত হই, ভাবি না এই আঘাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোমার আরাম-রমণীয় আলিঙ্গন।

'যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন কেল্লার মধ্যে থেকেই করা সহজ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধে, অনেক বিপদ। গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, খিদে-তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ গৃহে থেকেই

ভালো। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।'

ঘরই হচ্ছে কেল্লা। ঘরই হচ্ছে তীর্থ। ঘরই হচ্ছে তপোবন। আর যুদ্ধ হচ্ছে কর্ম। আর সংসারী হচ্ছে বীর।

'সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই, তাতে আর বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে—সে যেন বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে। তাই সে-ই ধন্য, সে-ই বাহাদুর, সে-ই বীরপুরুষ।'

সংসারীর কত দৈন্য, কত দায়। কত ক্লেশ, কত নৈরাশ্য। কত লজ্জা, কত লাঞ্ছনা। তবু তারি মধ্যে সে ঈশ্বরের দিকে মুখ রাখে। পুঞ্জিত হয়ে ওঠে অবিশ্বাসের অন্ধকার। তা অতিক্রম করে অন্তরে একটি নিভৃতি খুঁজে পায়। তারপর সঙ্গহীন নগ্নতায় বসে এসে ঈশ্বরের মুখোমুখি। আনন্দময়ের কাছে বেদনা জানায়। অবশেষে অশ্রুজলে স্নান করে বেদনাটি আনন্দে বেশবদল করে। যা মনে হল দুঃসহ তাই শেষে আস্বাদময়। আবার ঘানি টানে। তাই রামকৃষ্ণ বললেন: 'এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দু হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।'

কিন্তু কর্ম শেষ হবে কখন? যতই ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে আসবে। বলেই একটি উপমা দিলেন: 'যেমন দেখনি ব্রাহ্মণ-ভোজনে প্রথমে খুব হৈ-চৈ। যত পেট ভরে আসে ততই হৈ-চৈ কমে যায়। শেষে নিদ্রা-সমাধি।'

আরো একটি উপমা দিলেন কাব্যমণ্ডিত করে: 'অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাওনি। এখনও একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। কেবলই অন্তর খুঁড়বে।'

তারপর একটি সুন্দর সাংসারিক উপমা: 'গৃহস্থের বউ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী কর্ম কমিয়ে দেয়। দশ মাসে কর্ম প্রায় করতে হয় না। ছেলে হলে একেবারে কর্মত্যাগ। মা তখন ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে। ঘরকন্নার কাজ করে শাশুড়ী ননদ বা জায়েরা।'

আসল হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসা হলেই কর্ম চলে যায়। যেমন ফল হলেই ঝরে যায় ফুল। এইটিই একটি কাব্যে প্রকাশ করলেন রামকৃষ্ণ: 'যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি আপনি হাওয়া আসে তা হলে আর পাখা দিয়ে কী হবে?'

তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যেমন করাও তেমনি করি। কাজ করা ছাড়া আমার আর কী করবার আছে? কাজই আমার উপাসনা, তোমার কাছে এসে বসা। কেননা কাজটি কেমন ভাবে করছি তুমি নিরন্তর লক্ষ্য করছ পিছে দাঁড়িয়ে। আফিসের মনিবকে ফাঁকি দিতে পারি কিন্তু ত্রিভুবনের যিনি প্রভু তাঁকে ফাঁকি দিতে পারব না। তুমি অনিদ্র চক্ষু মেলে দেখছ আমার কাজ, এতেই তো আমি তোমার সামীপ্য অনুভব করছি দিবানিশি। জনে-জনে ইচ্ছে মত তুমি

কাজ বেঁটে দিয়েছ, কেউ মেথর কেউ মজুর কেউ কেরানী কেউ আড়তদার। সব তোমার কাজ। তোমার যন্ত্র। তোমার যন্ত্রের ছোট-বড় অংশ একেকজন। তোমার দেওয়া কাজ যখন, তখন কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। হেয় নয়, সামান্য নয়। বিভিন্ন কুশীলবে বিচিত্র নাটক। সে নাটকের লেখক তুমি, দর্শক-শ্রোতাও তুমি। আর-যারা সব দেখছে উঁকি-ঝুঁকি মেরে তারা 'লোক না পোক'! তাদের মুখ চেয়ে কাজ করব না, তোমার মুখ চেয়ে কাজ করব। তাদের নিন্দা-প্রশংসায় দাম নেব না, দাম নেব তোমার রসগ্রহণে। বহু লোকের জনপ্রিয়তার জন্যে লুব্ধ হব না, মুগ্ধ হব তোমার একলার ভালোবাসায়।

চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দেখছ এই বোধেই আমার কাজের আনন্দ। হার বা জিত যা তুমি দাও দেবে, শুধু ঠিকঠাক খেলাটি খেলে যাই। তাই রামকৃষ্ণ বললেন : 'বুড়ির ইচ্ছে যে খেলাটা চলে। বুড়ির ইচ্ছে নয় যে সকলে ছোঁয়। সবাই যদি বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা আর চলে না।'

সবাই যদি মুক্ত হয়ে যায় তা হলে আর খেলায় মজা কি। তাঁর ইচ্ছায়ই কেউ বদ্ধ কেউ মুক্ত। তার মানে তিনিই তরী হয়ে ডুবছেন উঠছেন। প্রত্যেকের মাঝে সেই একের রকমফের।

তাই কাজ করে-করে বন্ধনী কাটো। তারপর যখন নির্বন্ধন প্রেম আসবে তখনই নৈষ্কর্ম্য। নৈষ্কর্ম্যের একটি ঘরোয়া ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ : 'গৃহিণী বাড়ির কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সেরে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে যায়, তখন আর হেঁসেল-ঘরে ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও না।'

একবার যদি তোমার প্রেমের নাগাল পাই ফিরব না আর হেঁসেলে, সেইকালি-ঝুলির অন্ধকূপে।

২৯

'আত্মীয় কালসাপ, ঘর পাতকুয়ো।' বললেন রামকৃষ্ণ। বললেন : 'ঈশ্বর ছাড়া সব ফক্কাবাজি।'

সব আমার-আমার করছি। কিন্তু সব ধোঁকা, ভানুমতীর খেল। কিছুই আমার নয়, সব তাঁর। মায়া ছেড়ে দয়ার দিকে যাও। কিন্তু মায়া-দয়া কাকে বলে?

কী সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'নিজেকে ভালোবাসার নাম মায়া, পরকে ভালোবাসার নাম দয়া। শুধু নিজের পরিবারের লোকদের ভালোবাসি এর নাম মায়া। শুধু নিজের দেশের লোকগুলিকে ভালবাসি এর নামও তাই। কিন্তু সব দেশের লোককে সব ধর্মের লোককে ভালোবাসি এর নাম দয়া। মায়াতে মানুষ বদ্ধ, ভগবানের থেকে বিমুখ। দয়াতে মানুষ মুক্ত, ভগবানের প্রতি অভিমুখী।'

আসল উৎসটি হচ্ছে ভগবানকে ভালোবাসা। ভগবানকে ভালোবাসলেই সকলকে ভালোবাসব। কিন্তু ভগবানকে না ভালোবেসে যদি নিজেকে ও নিজের জনকে ভালোবাসি, সেটা হবে আত্মরতি। তার নামই মায়া।

আমার-আমার যে করছ তার দৌড় কতদূর? সুন্দর একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ: 'বড় মানুষের বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, বাগানের সরকার বলে এ বাগান আমাদের। কিন্তু মনিব যদি কোনো দোষ দেখে ছাড়িয়ে দেয় তাহলে আমকাঠের সিন্দুকটি লয়ে যাবার পর্যন্ত মুরোদ থাকে না।'

তার পরেই একটি মজার গল্প বললেন: 'গুরু শিষ্যকে বললে, সংসার মিথ্যে, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়! ঈশ্বরই তোর আপনার, আর কেউই তোর আপনার নয়। শিষ্য বললে, সে কি কথা, আমার মা, আমার বাপ, আমার স্ত্রী—এদের ছেড়ে কেমন করে যাব। ও সব তোর মনের ভুল। কেউ তোর আপনার নয়। এক কাজ কর, তোকে একটা ওষুধের বড়ি দিচ্ছি, তুই তা খেয়ে শুয়ে থাকগে বাড়িতে। লোকে মনে করবে তুই মরে গেছিস। আসলে সব দেখতে-শুনতে পাবি তুই, তোর টনটনে জ্ঞান থাকবে। আমি সেই সময়ে গিয়ে পড়ব। যেমন বলা তেমনি—বড়ি খেয়ে শিষ্য মড়ার মতন হয়ে গেল। কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। এমন সময় কবরেজের বেশে গুরু এসে উপস্থিত। সব শুনে বলল, এর ওষুধ আছে, বেঁচে উঠবে রুগী। বাড়ির সবাই হাতে স্বর্গ পেল। তখন ফের কবরেজ বললে, কিন্তু একটা কথা আছে। ওষুধটা আগে একজনকে খেতে হবে। তারপর রুগীকে দেব। আগে যিনি খাবেন তিনি কিন্তু অক্কা পাবেন। তা এখানে ওর মা কি পরিবার এঁরা তো সব আছেন, একজন-না-একজন কেউ খাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা হলেই ছেলেটি বেঁচে ওঠে। তখন সবাই কান্না থামিয়ে চুপ করে রইল। শিষ্য সমস্ত শুনছে। কবরেজ আগে মাকে ডাকলো। মা বললে, তাই তো এ বৃহৎ সংসার, আমি গেলে কে এসব দেখবে শুনবে, তাই ভাবছি। স্ত্রী এতক্ষণ—দিদি গো, আমার কী হল গো—বলে কাঁদছিল। এখন কবরেজের ডাকে বললে, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আমার অপোগণ্ডগুলোর এখন কী হবে! আমি যদি যাই, কে দেখবে এদের? শিষ্যের তখন বড়ির নেশা ছুটে গিয়েছে। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে বলল গুরুদেব চলুন।'

এই তো সংসার। রামকৃষ্ণ বললেন, 'রোগটি হচ্ছে বিকার। আর যে ঘরে বিকারের রুগী সেই ঘরেই কিনা তেঁতুলের আচার আর জলের জালা। আচার-তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে। বিকারের রুগী বলে, এক জালা জল খাব। তাতে কি আর বিকার সরে? যদি বিকারের রুগী আরাম করতে চাও ঘর থেকে ঠাঁইনাড়া করতে হবে। যেখানে আচার-তেঁতুল নেই, নেই বা জলের জালা। তার পর নিরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এসে থাকলে আর ভয় নেই।'

আচার-তেঁতুল হচ্ছে যোষিৎসঙ্গ, আর জলের জালা হচ্ছে বিষয়ভোগ। তাই নির্জনে না হলে চিকিৎসা হবে না। আমাকে নির্জন করো। চারদিকে জনতার জলকল্লোল, মধ্যস্থলে আমার নির্জন হৃদয়দ্বীপ। আসঙ্গ-সঙ্গ থেকে চলে আসব

এবার অসঙ্গ-সঙ্গে। তাই দাও এবার নিরাশা-নিবিড় নিঃসঙ্গতা। আমাকে রিক্ত করো যাতে পূর্ণ হতে পারি। আমাকে চূর্ণ করো যাতে নির্মিত হতে পারি নতুন করে। যাতে নতুন করে সাজাতে পারি সৌন্দর্যের অর্ঘ্যমালা। তোমার প্রসাদ বহন করবার পবিত্র পাত্র করতে পারি এ জীবনকে।

যেখানে অনুরাগ সেখানেই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য হচ্ছে অনুরাগের প্রগাঢ় রঙ, তাই রক্তিম না হয়ে গৈরিক। প্রেমের সঙ্গে ত্যাগ মেশালেই রঙ ধরবে গেরুমাটির। আকাঙ্ক্ষার কোমলতার সঙ্গে ত্যাগের কাঠিন্য। অনুরক্তির সঙ্গে অনাসক্তি।

'কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তেমনি জীবে কামকাঞ্চনরূপে তেল লাগলে তাতে আর সাধন চলে না। কিন্তু তেলমাখা কাগজে খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে লেখা যায়। তেমনি জীবে কামকাঞ্চনরূপে তেল লাগলে ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘষে দিলে তবে সাধন হয়।'

যা আমাদের বাঁধছে প্রতিনিয়ত তার গ্রন্থি শিথিল করে দেয়ার নামই ত্যাগ। ভোগে দাসত্ব, ত্যাগেই স্বাধীনতা। যেটুকু ধরে রাখব সেটুকুই বাঁধবে প্রাণপণে। যদি কিছুই না ছাড়ি, সঞ্চয়ের পাষাণস্তূপে ধরিত্রীর শ্বাসরোধ হবে। ছাড়তে পারি বলেই আমরা বাঁচি, বড় হই, যাত্রা করি পরিপূর্ণতার দিকে। ত্যাগ তো শূন্যতার শুষ্কতা নয়, পূর্ণতার অভিষেক। আমাকে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে নতুন করে ভোগ করতে দাও তোমাকে। আমি কিছুই চাই না এইটিই একটি বৃহৎ চাওয়া হয়ে তোমাকে আবৃত করুক। শূন্য আর পূর্ণের এক আকার, তুমি আমার শূন্যের মধ্যেই পূর্ণ হয়ে ওঠো। তোমার জন্য যত ছাড়ব ততই তুমি ভরে-ভরে উঠবে। মানুষকে যা আমরা দিই তার মধ্যে একটা অহংকার থাকে, লোকে তা দেখুক, গুণগান করুক, থাকে এমনি একটা প্রচ্ছন্ন কামনা। সে দান বহন করে কিছু ফিরে-পাবার প্রত্যাশা। কিন্তু তোমাকে যে দান সে দান প্রেমে, অগোচরে, সে দান বিনিঃশেষে। সে দানের নামই ত্যাগ।

তিনিই বা কি আমাদের জন্য কম ত্যাগ করছেন? কী প্রয়োজন ছিল তাঁর এত আলো-হাসার এত ভালোবাসার, এমন করে অসীম শক্তিকে অসীম মাধুর্যে রূপান্তরিত করার? তিনি যে এত ত্যাগ করছেন আমাদের জন্যে আমরা শুধু তা সংগ্রহই করব দু হাতে, কিছুই তাঁকে ফিরিয়ে দেব না? তিনিও তো কাঙালের মত ফিরছেন আমাদের দ্বারে-দ্বারে, রিক্ত ভিক্ষাপাত্র হাতে, তাঁকে আমরা কী দেব? তাঁর জন্যে যদি কিছু ত্যাগ না করতে পারি, তবে আমাদের কিসের তাঁকে ভালোবাসা?

'গীতা পড়লে যা হয় আর দশবার গীতা-গীতা বললে তাই হয়। গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী-ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার সব বইটা পড়বার দরকার নেই— ত্যাগী-ত্যাগী বলতে পারলেই হল। তাই গীতার সার অর্থাৎ, হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা করো। এই গীতার সার কথা। গীতা সব শাস্ত্রের সার।'

ত্যাগী আর তাগী দুই-ই প্রত্যয়গত রূপে ও অর্থে সমতুল।

আমার মাথায় কত বোঝা-ই যে চাপিয়েছি দিনে-দিনে। তোমাকে প্রণাম

করে-করে সে বোঝা একেক করে নামিয়ে দেব তোমার পায়ে। এমনি করেই ভারমুক্ত হব। নির্ভার হতে পারলেই চরম নির্ভর আসবে তোমাতে।

৩০

তীব্র বৈরাগ্যের গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একবারে ঘোর অনাবৃষ্টি হয়েছে দেশে। কিন্তু চাষারা চাষ দিতে ছাড়েনি। জল হয় না, কি আর করা—সবাই খাল কেটে নদী থেকে জল আনবার চেষ্টা করছে। সবাই রোজ একটু-একটু করে কাটে। তার মধ্যে একজনের মাথায় হঠাৎ ভাবনা ঢুকল, আজই খালে-নদীতে যোগ করে দেব। কে জানে, কাল যদি মরে যাই, ছেলেগুলো সব তো না খেয়ে মরবে। এই ভেবে সে এক নাগাড়ে কেটে চলল। এদিকে বেলা অনেক হল দেখে গিন্নি মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে চাষাকে নেয়ে নিতে বললে। চাষার এক ধমক খেয়ে পালিয়ে গেল মেয়ে। বেলা আরো বেড়ে গেল দেখে গিন্নি মনে করলে, যাই মিনসেকে আমিই একবার বুঝিয়ে বলি। ভালো জ্বালা, আজ আবার ঘাড়ে কী ভূত চাপল! আমি হাঁড়ি নিয়ে আর কতকাল বসে থাকব? একটা বিবেচনাও কি নেই যে, হ্যাঁ, খেয়ে নিয়ে কাজ করি? কাজের হেপায় নিজের খিদে-তেষ্টা নেই বলে কি সবার তাই? আপনার মনে বকতে-বকতে স্ত্রী এসে বললে চাষাকে, বলি হাঁগো, ভাতগুলো যে কড়কড়িয়ে গেল, নেয়ে-খেয়ে—চাষা কোদাল উঠিয়ে তাড়া করলে স্ত্রীকে। স্ত্রী তো দৌড়। চাষা অমনি আবার মাটি কাটতে লেগে গেল। আর কোনো দিকে তার হুঁস নেই। সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার একটু আগে নদীর সঙ্গে খানার যোগ করল চাষা, আর কুলকুল করে খাল দিয়ে জল আসতে লাগল ক্ষেতে। চাষা তখন মহানন্দে জলের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললে, নে এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর তেল মেখে নেয়ে-খেয়ে সুখে ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমতে লাগল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।'

সিদ্ধি জানি না, জানি সাধন। সাফল্য জানি না, জানি সংকল্প। ক্লিষ্টতা মানি না, মানি চেষ্টা। মানি নিষ্ঠা নিঃসংশয়। শুষ্কতার পথে উড়ুক মরুবালুর ঝড়, না মিলুক আমার খর্জুরকুঞ্জের শ্যামচ্ছায়া, তবু পথ চলব খররৌদ্রে। বিরুদ্ধ-বিমুখ সমুদ্র যতই প্রখর-নখর তরঙ্গের আঘাত হানুক তবু কিছুতেই হাল ছাড়ব না। আমার পথই প্রাপ্তি। কূল না পেয়ে যদি ডুবেও যাই, তবু জানি আমি তোমাকেই পেলাম।

'আর একজন চাষা, সেও মাঠে জল আনছিল', রামকৃষ্ণ দিলেন এবার একটি মন্দ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত : 'তার স্ত্রী যখন গিয়ে বললে, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই, এখন এস, অনেক বেলা হয়েছে, তখন সে কোদাল রেখে বেশি উচ্চ-বাচ্য না করে স্ত্রীকে বললে, তুই যখন বলছিস তবে চল। তার আর মাঠে জল আনা হল না।'

চাই অর্জুনের পুরুষকার। চাই নৈরাশ্যনাশী নিষ্ঠা। চাই আঘাতপ্রসন্ন প্রতিজ্ঞা। রামকৃষ্ণ বললেন, 'খুব রোক না হলে চাষার মাঠে যেমন জল আসে না তেমনি মানুষেরও হয় না ঈশ্বরলাভ।'

তোমাকে যদি আমি নিজের মধ্যে ব্যক্ত করতে পারি তবেই তো তোমাকে আমার লাভ করা হল। তুমি যে কল্পনার নও তাই আমি প্রণাম করব আমার মধ্যে তোমাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করে। কিন্তু কি করে তোমাকে প্রকাশিত করি? তোমাকে প্রকাশিত করবার আমার একটিমাত্র উপায় আছে। সে হচ্ছে আমার কর্ম। আমার কর্ম কর্মের জন্যে নয়, তোমাকে প্রকাশিত করবার জন্যে। কর্মই কর্মের শেষ নয়, কর্মের শেষ হচ্ছে হওয়া। করতে-করতে একদিন হয়ে উঠব আমি। আলো জ্বালতে-জ্বালতে হয়ে উঠব তোমার দেবমন্দিরের প্রদীপ। প্রত্যেকের মনের বীণায় সুর তুলতে-তুলতে হয়ে উঠব তোমারই মনোবীণা।

কর্মই আমার ধর্ম। কিন্তু ধর্ম আমার কর্মকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে। আমার জীবনের আয়-ব্যয়ের হিসেবের উপর চিরকাল একটি উদ্বৃত্ত বেঁচে থাকবে। সেই উদ্বৃত্তেই আমার প্রকাশ, আমার ঐশ্বর্য। ধর্ম বলতে আর কী বুঝি? যেখানে আমার এই আশ্চর্য প্রকাশ, এই ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, সেখানেই আমার ধর্ম। এই কর্ম দিয়ে তোমাকে প্রকাশ করব। তোমার মন্দিরে গিয়ে উঠব এরই জন্যে কর্ম আমার সোপান, ওপারে তোমার কাছটিতে গিয়ে পৌঁছুব এরই জন্যে কর্ম আমার সেতু। সমীর হয়ে সৌরভের আভাস নিয়ে বেড়াবে তাই কর্ম আমার মাধ্যম। তুমিও তো বিশ্বকর্মা। তুমিও তো চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে নেই। তোমারই মত আমার কর্মে আমি প্রকাশমান হব। আমার অপরিমাণ কর্মে প্রকাশ করব আমার অপরিমাণ প্রেম। আর যেখানেই প্রেম সেখানেই তো তুমি।

রামকৃষ্ণ বললেন: 'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতরে পড়েছে, পিষে যাবে। তবে জাঁতার খুঁটির কাছে যে কটি ডাল থাকে তারা যেমন পিযে যায় না তেমনি ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবার ভয় নেই।' আবার বললেন নতুনতরো উপমায়: সংসার শেঁকুল কাঁটার মত, এক ছাড়ে তো আরেকটি জড়ায়।'

এর থেকে ছাড়া পাব কি করে?

এর থেকে ছাড়া পাবার উপায়, নির্জনে রাত-দিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ। চিন্তা করবে, রামকৃষ্ণ বললেন, 'মনে বনে কোণে।' নির্জনে গৃহকোণটিতে গিয়ে বসো। সঙ্কীর্ণ অন্ধকার সীমা থেকে চলে যাও নীহারিকার মহা-অঙ্গনে, জ্যোতিষ্কলোকের জয়ধ্বনির সঙ্গে তোমার স্তব্ধতার স্তবটি সম্মিলিত করো। তুমি সংসারী লোক, বনে তুমি যেতে পারবে না বুঝি। কিন্তু কোণে বসতেই যদি তোমার বিঘ্ন ঘটে, যদি ঘরের লোকের নিন্দা বা বিদ্রূপে নির্বিচল থাকতে না পারো, তবে, মনেই যোগাসন পাতো। একটি অনির্বাণ হোমহুতাশন নিরন্তর জ্বালিয়ে রাখো অন্তরের মধ্যে। তারপর যখনই সুযোগ পাও সাধুসঙ্গ করো।

কী সুন্দর একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'মন একলা থাকলেই ক্রমশ শুষ্ক হয়ে যায়। এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের মধ্যে যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো তা হলে আর শুকুবে না।'

আমার এ হৃদয়ের ঘটটি তোমার আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়ে রাখব। কিন্তু তুমি যে শুধুই আনন্দ, এ হিসেব মাঝে-মাঝে ভুল হয়ে যায়। তাই মাঝে-মাঝে একটি কবিবন্ধুর সঙ্গ দরকার। সেই কবি-বন্ধুই, চলতি ভাষায়, সাধু। তোমার যখন খবর দিচ্ছে তখন সে নিশ্চয়ই কবি। কবি ছাড়া কবিকে আর কে বোঝে? আর তোমার খবরটি যখন সে আমাকেই বলছে একান্তে, তখন সে আমার বন্ধু ছাড়া আর কি! তখন আবার শুষ্ক তরুতে বসন্তের শিহরণ লাগবে। আবার আশ্বাসের শাখায় জাগবে বিশ্বাসের রক্তজবা।

'সাধুসঙ্গ কেমন জানো?' বিবিধ-বিচিত্র উপমা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ : 'যেন চালধোয়ানি জল। সৎ কথা শুনতে-শুনতে বিষয়-বাসনা একটু-একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্যে একটু-একটু চালধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তাহলেই নেশা ছুটতে থাকে।'

ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে।

মন কেমন জানো? যেন স্প্রিং-এর গদি। যতক্ষণ গদির উপর বসে থাকা যায় ততক্ষণই নিচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে।

কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার যদি আলাদা করে রাখো, তা হলে যেমন কালো লোহা তেমনি কালো লোহাই হয়ে যাবে। তাই লোহাকে মধ্যে-মধ্যে দাও হাপোরে।

আমাকে তোমার নামের মধ্যে, তোমার গানের মধ্যে নিমগ্ন করে রাখো। তোমার মার্জনা দিয়ে ক্ষালন করো আমাকে। আমার অশ্রুতে আমি আবার মার্জন করব। যতই বিপদে পড়ি তোমার শ্রীপদ যেন না ছাড়ি। তোমার যেমন অভিরুচি, আমাকে আঘাতে চূর্ণ করো যেন তোমার সামান্যতম ধূলিকণাটিকে মনে করতে পারি সগোত্র, আমাকে দুঃখে বিস্তীর্ণ করো যেন দূরতম দুঃখীজনকে স্পর্শ করতে পারি আত্মীয় বলে। হে অনিমেষ, আমার দিন-রাত্রির প্রতিটি নিমেষ যেন তোমার প্রতি অশেষ হয়ে থাকে।

৩১

কিন্তু যাই বলো, ভোগান্ত না হলে মন যায় না ঈশ্বরের দিকে। হতে হয় পর্যাপ্তকাম। তার পরেই ত্যক্তকর্মা।

'সব ঘর না ঘুরলে ঘুঁটি চিকে ওঠে না।' একটি চমৎকার উপমায় ব্যক্ত করলেন রামকৃষ্ণ। সুখে-দুঃখে পাপে-পুণ্যে, উত্থানে-পতনে মানে-অপমানে চলেছি এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক পৃষ্ঠায়, এক খণ্ড থেকে আরেক খণ্ডে। একটি সমাপ্তি

বা পরম পর্যাপ্তির দিকে। চলেছি তোমারই অভিমুখে। নানা ঘাটেই নৌকো ভিড়ছে, কিন্তু বন্দরের দেখা নেই, কে জানে হয়তো বা পথই ভুল করেছি। তবু, জানি, যখন তোমার জন্য যাত্রা তখন সব ঘাটেই আমার তীর্থ। ঠিকানা না জানি, আমার জিজ্ঞাসাটি যেন ঠিক থাকে।

'বৈদ্য বলে দিন কাটুক, তার পর সামান্য ওষুধে উপকার হবে?'

দিনই বুঝি আর কাটে না। তোমার জন্যে ব্যাকুলতার ঝড়টি যদি আসে তবে কি মিলবে না তোমার কৃপার বারিবিন্দু? দাবদাহের দীর্ঘ দিন আর সহ্য হয় না, আনো এবার একটি পুঞ্জিত-অঞ্জন মেঘের ব্যাকুলতা! একটি ঝড় তোলো জীবনে। স্তম্ভিতকে ধাবিত করো। প্রগাঢ়কে করো বিগলিত। মূককে উন্মুখর। শুকনো মরুহাওয়ার ঝড় নয়। করুণাকণাবাহিনী সুধাসান্দিনী বৃষ্টিধারা।

'ফোঁড়ার কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।'

যতক্ষণ ভোগ ততক্ষণ জ্বালা। ততক্ষণই ভাবনা। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। এবার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'একটা চিল একটা মাছ মুখে করে আসছে, তাই দেখে হাজার কাক তাকে ধরে ফেললে। যে দিকে চিল মাছ মুখে করে যায়, কাকগুলো কা-কা করতে-করতে তার পিছনে-পিছনে সেই দিকে যায়। মাছটা যখন চিলের মুখ থেকে আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক সেই চিলটাকে ছেড়ে ছুটল মাছের দিকে। চিল তখন একটা গাছের ডালে বসে ভাবতে লাগল—ঐ মাছটাই যত গোল করেছিল। এখন মাছটা কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্ত হলুম।' ঐ মাছ হচ্ছে উপাধি। নামৈশ্বর্য। কৌলীন্যের অভিমান। চিলের মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল আকস্মিক ভাবে। কিন্তু আমাদের এ ভার পরিত্যাগ করতে হবে সরল হবার নির্মল হবা নির্মুক্ত হবার সাধনায়। যখন বুঝব এ বস্ত্রভার উন্মোচন না করলে তোমার পরশসরস বাতাস আর লাগছে না গায়ে তখনই ভারমুক্ত হব। যতক্ষণ আবরণ উন্মোচন না হচ্ছে ততক্ষণই তো প্রকাশ বাধা। আর প্রকাশে যখন বাধা তখন সে বাধার আর পার নেই।

কিন্তু যে যাই বলো, মন নিয়েই কথা। ধ্বনি নেই কিন্তু বাণীটি তিনি শুনতে পান। আমার ভাষা আড়ষ্ট কিন্তু ভাবটি সরল। তুমি পর্বতের গহন ভেদ করে এস আমার নির্জন-উৎসে। নাও আমার স্বচ্ছতার শুভ্র স্বাদ। উৎসস্থল পেরিয়ে এসেই আমার ভঙ্গি জটিল, গতি কুটিল, স্রোত ব্যাহত। কিন্তু যেখানে তোমাকে ডাক দিচ্ছি সেখানে আমি অস্পৃষ্ট, নির্মল, তুমি যদি সেইখানে এসে স্পর্শ করো আমাকে, তবে আমারই তৃষ্ণানিবারণ ঘটে। আর যদি মনে করি তুমি আমার জল-রেখাটি অনুসরণ করছ সমস্ত প্রস্তর-অরণ্য অতিক্রম করে-করে, তবে আমার গতি-ভঙ্গি, স্ফীতি-স্ফূর্তি সমস্তই সরলতা ও মধুরতার স্রোতস্বিনী হয়ে উঠবে। তোমার মাঝে নিজেকে সমর্পণ করেই আমি সম্পূর্ণ হব।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙই

হয়ে যাবে।'

আমি মনকে ফেলে রাখব না মিথ্যেতে। রাখব না তমসায় আবিষ্ট করে। মন আমার মুক্ত খড়্গের মত জ্বলবে। জ্বলবে সত্যের বিভাসনে। যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সে দীপ্তি কিছুতেই বাধিত হবে না, বাইরে তার আভাস জাগবেই জাগবে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঘরে আলো না জ্বলা দারিদ্রতার চিহ্ন।' আমার মনের সমস্ত কুঠুরিতে আলো জ্বলবে, এমন কি ঘরের সিঁড়ি-গলিটিও থাকবে দীপান্বিত। সে আলো প্রেমের আলো, ক্ষমার আলো, শান্তির আলো। সাধ্য কি তুমি আমার মনের ঘরটিতে এসে না বোস। তোমাকে আমি ধন দিয়ে ভোলাব না, মন দিয়ে ভোলাব।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায় সেই চাতুরীই চাতুরী।'

সে চাতুর্যটি কী! সেই চাতুর্যটি মাধুর্য। সেই মাধুর্যের উৎসটি কোথায়? সে মাধুর্যের উৎসটি ভালোবাসায়। আমার নয়নে সেই চাতুরী দাও যাতে সূর্য-চন্দ্রকে তোমার নিয়ত-জাগ্রত কোমল দৃষ্টিপাত বলে দেখতে পারি। অনুভবে এমন চাতুরী দাও যাতে সুখকে মনে করতে পারি তোমার প্রসাদ বলে, দুঃখকে মনে করতে পারি তোমার অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন। এমন চাতুরী দাও যাতে তোমার চাতুরীটি ধরে ফেলতে পারি। প্রাণের মাধুরী দিয়ে তোমার প্রেমের মাধুরীকে।

ঈশ্বর একা, কিন্তু তিনি সকলের। যে কেউই ইচ্ছে করলে যুক্ত হতে পারে তাঁর সঙ্গে। তাঁর ঘরে সকলের সমান হিস্সা। কী সুন্দর উপমার সাহায্যে তা বললেন রামকৃষ্ণ: 'গ্যাসের নল সব বাড়িতেই খাটানো আছে। গ্যাস কোম্পানির কাছে গ্যাস পাওয়া যায়। আরজি করো। করলেই গ্যাস বন্দোবস্ত করে দেবে—ঘরেতে আলো জ্বলবে। শিয়ালদহে আপিস আছে।'

যেখানে আর্জি করলেই গ্যাস পাওয়া যাবে সেখানে কেন ঘরে আলো জ্বালবো না? গ্যাসের আলো পেলে কে আর অন্ধকারে থাকে?

'বড়মানুষের বাড়ির একটি লক্ষণ যে সব ঘরে আলো থাকে।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'গরিবরা তেল খরচ করতে পারে না, তাই তত আলো বন্দোবস্ত করে না। এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নেই, জ্ঞানদীপ জেবলে দিতে হয়। জ্ঞানদীপ জেবলে পরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না!'

আবার বললেন, 'অনন্তকে কে বোঝাবে? পাখি যত উপরে ওঠে, তার উপর আরো আছে।'

তবু যতটুকু পারি, তোমাকে দেখি। আর যতটুকু দেখি তাতেই তোমার অন্ত পাই না। রূপ থেকে কেবল রূপান্তরের শোভাযাত্রা দেখি। সে শুধু তৃপ্তিহীন স্পৃহা থেকে স্পৃহাহীন তৃপ্তির দিকে যাত্রা। আমার স্পৃহাও তুমি তৃপ্তিও তুমি। যা আছে তাও তুমি যা চলছে তাও তুমি। যা পেয়েছি তোমাকেই পেয়েছি, আর যা আমার না-পাওয়া তা তোমারেই না-পাওয়া। চারদিকে রূপের তরঙ্গ উঠেছে, কিন্তু হে রঙ্গময়, তুমি কোথায়? রূপ দিয়ে তুমি আমাদের আচ্ছন্ন করেছ, কিন্তু নিজে রয়েছ প্রচ্ছন্ন হয়ে। রূপে-রূপে অপরূপ হয়ে। এই রূপের মধ্য থেকেই

আবিষ্কার করব অপরূপকে। শক্তি বিদীর্ণ করেই আনতে হবে সে মুক্তির মুক্তাফল। ঈশ্বরের শক্তিতেই সব শক্তিমান। একটি বিস্ময়কর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'একটা হাঁড়িতে আলু-পটল-উচ্ছে ভাতে দিয়ে উনুনে চড়িয়েছ। যখন ভাত ফুটছে তখন আলু-পটলগুলো লাফাচ্ছে! ভাবছে, আমরা আপনি লাফাচ্ছি। ছোট ছেলেরাও ভাবছে, তারা বুঝি জীবন্ত। জ্ঞানী লোকেরা বুঝিয়ে দেয়, ওরা নিজে লাফাচ্ছে না, হাঁড়ির নিচে আগুন আছে বলেই লাফাচ্ছে। আগুন টেনে নিলে আর নড়বে না।'

শরীর হচ্ছে হাঁড়ি, মন-বুদ্ধি জল। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে ভাত, আলু, উচ্ছে, পটল। অহং হচ্ছে তাদের অভিমান, ভাবছে নিজেই টগবগ করছে নিজের জোরে। সচ্চিদানন্দ হচ্ছে অগ্নি। অগ্নি সরে গেলেই সব নিশ্চুপ নিষুপ্ত। একটু কি শক্তি হল বা ঐশ্চর্য হল, ভাবছি নিজের পৌরুষ, নিজের কৃতিত্ব-কৌশল। কিংবা এমন একটা ভাব করি যে সৃষ্টির নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন যে একজন বিচারক আছেন তিনি বুঝেছেন আমার গুণগ্রাম, পাঠিয়েছেন অবধারিত পুরস্কার। এই নিয়ে তেজ কত! অহংকারের কণ্টকে সকলকে ক্ষতবিক্ষত করি। সে কণ্টকিত বৃন্তে গোলাপ ফোটে না, শুধু প্রলাপ ফোটে। আমার মধ্যে যেটুকু বৈশিষ্ট্য সেটুকু তোমারই বিকাশ। তোমারই উচ্চারণ। আমি কোথাও নেই, শুধু তুমি। শুধু তোমারই উদ্ভাসন। তোমারই কৃপা, আমি শুধু তোমার কৃপাপাত্র। তোমারই প্রসাদ, আমার শুধু করপত্র। যা কিছু প্রকাশ করি, তোমাকেই প্রকাশ করি। আমার সংকীর্ণ ঘট তোমারই আকাশে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার শূন্য ঘর হয়ে ওঠে সসাগরা পৃথিবী। তুমি দাও, আমি নিই। কিন্তু আমি যে নিই তোমাকেই ফিরিয়ে দেবার জন্যে। আমার যা কিছু অর্জন তোমারই উৎসর্জনে। আমি সংগ্রহ করি, সঞ্চয় করি, রাশীকৃত করি: এ দিয়ে অহং তৃপ্ত হয় কিন্তু আত্মা তৃপ্ত হয় না। আত্মার তৃপ্তি না হলে আত্মতৃপ্তি কোথায়?

আমি বর্জন করব না, আমি দান করব। বর্জনে মুক্তি নেই বিস্তারেই মুক্তি। আর, দান সেই বিস্তার। শুধু পরিহার নয়, প্রসারণ। পরিহারে কার্পণ্য, প্রসারণেই ঐশ্বর্য। আমি ছাড়তে-ছাড়তে বাড়ব। এগোব পথের দিকে চেয়ে নয়, তোমার দিকে চেয়ে। চারদিকে আমার উত্তাল ঢেউ, কিন্তু আকাশে আমার স্থিরলক্ষ্য ধ্রুবতারা।

৩২

ঈশ্বরই সব করছেন। গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'একদিন এক সাধু কোন এক গ্রামে গিয়েছিল ভিক্ষে করতে। দেখলে গাঁয়ের জমিদার একটা লোককে মারছে। কেন মারছ? সাধু জমিদারকে থামাতে গেল। জমিদার উলটে সাধুকেই দু ঘা বসিয়ে দিলে। ফলে সাধু অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তাই দেখে পথ-চলতি এক লোক

ছুটে গিয়ে মঠে খবর দিলে। মঠের সাধুরা ধরাধরি করে আহত সাধুকে মঠে নিয়ে এল। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। ভালো কথা, যদি কিছুটা বল পায় শরীরে। মুখে দুধ দিতেই সাধু চোখ চাইল। তখন সেবারত মঠের এক সাধু খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহারাজ, চেয়ে দেখ তো, এখন তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু তখন আস্তে-আস্তে বললে, ভাই যিনি মেরেছিলেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'

এক হাতে তোমার প্রহার, আরেক হাতে উপশম—দুটি মিলিত হাতে কল্যাণ। তোমার এক পদে আঘাত, আরেক পদে নৃত্য—দুটি মিলিত পায়ে আশ্রয়। এক চোখে ভ্রূকুটি, আরেক চোখে আশ্বাস—মিলিত দৃষ্টিপাতে প্রসন্নতা। তুমি যখন আঘাত করো যেন বুঝতে পারি আমাকে নিবিড় করে আলিঙ্গন করেছ। যখন বঞ্চিত করো যেন বুঝতে পারি তুমি দিয়েছ আমাকে তোমার অকৃপণ আশীর্বাদ। যখন অপমানিত করো যেন বুঝতে পারি এ ধূলিশয্যাতে তুমিই আমার পার্শ্ববর্তী। আমাকে যদি না কাঁদাও, তোমার নিজের কাঁদা যে হয় না। আর, তুমি যদি না কাঁদো তবে এ সৃষ্টি যে শুকিয়ে যাবে। শাশ্বত একটি কান্না অহর্নিশ নিহিত আছে বলেই তোমার এ কবিতাটি নিত্য সজীব। পুরোনো হল না কোনো দিন। প্রতিটি দিন একটি নতুন দেশ হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু তুমি কেমন? রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেন অচীনে গাছ। দেখে কেউ চিনতে পারে না।'

এসেছ নরবেশে, কিন্তু চিনি তোমাকে সেই চোখ কোথায়? গাছ দেখি না, কিন্তু ছায়াটি দেখি। শুনি তার পত্রমর্মর। গায়ে তার সুখস্পর্শ হাওয়া লাগে। ঘ্রাণে পাই তার স্নেহসৌরভ। কানে আসে কোকিল-কাকলী। আভাসে নয়, বিভাসে কবে চিনব তোমাকে? চিনব কবে গোচরীভূত করে? শুধু প্রকারে নয়, আকারে! ইঙ্গিতে নয়, ভঙ্গিতে! চিনব কবে তোমাকে সাক্ষাৎ আমার চক্ষুর সামনে? তোমাকে দেখব কবে আকাশের নীলিমায়, ধরণীর শ্যামলিমায়, তারকাবিকীর্ণ বিভাবরীতে? প্রতিটি মুহূর্তের প্রজাপতির পাখার আলিম্পনে? তুমি আনন্দময় হয়ে আছ আমার শূন্যতায়, রসময় হয়ে আছ আমার শুষ্কতায়, মধুময় হয়ে আছ আমার কাঠিন্যে, জ্যোতির্ময় হয়ে আছ আমার অন্ধকারে। আমার স্নানে পানে গন্ধে গানে বাক্যে ধ্যানে কর্মে জ্ঞানে, আমার অণুতে-রেণুতে। ভালোমন্দে পাপে-পুণ্যে, উত্থানে-পতনে, সুরে-বেসুরে! স্বেদে-ক্লেদে শোণিতে-অশ্রুতে। দেহে-মনে সঙ্গীতে-আর্তনাদে। নির্লক্ষ্য নিশ্বাস-বায়ু হয়ে।

'আদ্য-অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।' যত যত্ন করেই তোমাকে অগম-অগোচরে রাখি না কেন তুমি আমার এই দেহ-ঘটের মধ্যেই দীপ্যমান। তোমাকে কেমন করে প্রচ্ছন্ন করি? এই ভালোবাসা সে বসন-ভূষণ দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি না। আমার এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র সূর্য, দেহের মধ্যেই সপ্ত সমুদ্রের রঙ্গলীলা। দেহেই আমার দ্বারকা-মথুরা, দেহেই আমার কাশী সর্বপ্রকাশিকা। এই অখণ্ড বসুন্ধরাকে আমি দেহেই ধরে রেখেছি। আর কোন ঘরে আমি পরবাসী হব?

এই দেহই আমার ঘর-দুয়ার। "ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।"

এই দেহকেই ঘৃতের প্রদীপ করি। তারপর চলি সেই মন্দিরের অন্ধকারে। হোক প্রস্তর-কঙ্করে কঠিন, তবু অন্তর খুঁড়লেই জল মিলবে। এই অন্তরেই সুচির নীর-নিবাস। মনের মধ্যেই সেই মানসসরোবর। মনমালাই জপমালা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশি। তেমনি ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষে।'

তাই তো সর্বজীবে শিব দেখলেন তিনি। 'জীবে দয়া'—কেটে লিখে দিলেন, জীবে সেবা, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম। লিখে দিলেন রক্তের অক্ষরে, অশ্রুজলে। বেদনায়, নির্ব্যবধান ভালোবাসায়।

তুই কীটানুকীট, কী তোর স্পর্ধা, তুই মানুষকে দয়া করবি? রামকৃষ্ণ নতুন সাম্যবাদের পত্তন করলেন। ভূমি আর ভূমা এক করে দিলেন। শুধু কাঙালী ভোজনের সমান পঙক্তিতে না বসিয়ে, সমান অধিকার দিলেন ক্ষয়হীন অমৃতের ভোগ-ভাগে। শুধু পঙক্তি সমান নয়, পাত্র সমান। একই ব্রহ্ম, তার বিচিত্র প্রতিবিম্ব।

'কোনো বাঁশের ফুটো বড়, কোনোটা বা ছোট।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'ঈশ্বরবস্তুর ধারণা কি সকল আধারে সম্ভব?'

তাই যেটুকু আমি সেইটুকু তুমি। আমার যা কিছু কান্না তোমার জন্যেই কান্না। আমার যা কিছু সন্ধান তোমাকেই সন্ধান। আমার যা কিছু ক্লান্তি তোমার অভাবে, তোমার কালহরণে। কান্নার মধ্যেই আমার তৃপ্তি, সন্ধানের মধ্যেই প্রাপ্তি, ক্লান্তির মধ্যেই আমার ক্লেশহরণ। কিন্তু আমিই কি কাঁদছি? না, এ তোমার কান্না? রামকৃষ্ণ বললেন, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' না, তুমিই কাঁদছ। তুমি যে আমাকে পাচ্ছ না এ দুঃখেরও তো সীমা নেই। তুমি আমাকে পাচ্ছ না মানে তুমি আমার মধ্যে তোমাকে প্রকাশিত করতে পারছ না। অবরুদ্ধ গুহায় তোমার সে অসহায় কান্না আমি দিবানিশি শুনতে পাচ্ছি। আমার কণ্টকিত বৃন্তে যে তুমি পুষ্পায়িত হতে পাচ্ছ না এ দুঃখের কি শেষ আছে? নিজেকে যে মুক্ত করতে পারছ না উচ্ছ্বতে নির্ঝরস্রোতে সে প্রস্তরপ্রতিহত কান্না বাজছে আমার বক্ষের পঞ্জরে। তোমাকে বন্দী করে রেখেছি বলেই আমিও বন্দী। আমার যা বন্দনা তা তোমারই ক্রন্দন।

অমল তোমার প্রেমাশ্রু। অমল প্রেমাশ্রু থেকে তোমার জন্ম বলেই তুমিই আমলকী। তোমাকে যদি প্রকাশিত করতে পারি তবেই আমি হস্তামলক।

আমার এ দেহ-গেহ তুমিই নির্মাণ করেছ। আবার নিজেই হয়েছ তার অধিবাসী। ভেবেছিলে আমাকে নিয়ে সুখে ঘর করবে এ নির্জন নিকেতনে। কিন্তু অভিমান আর কাপট্যের দেয়াল দিয়ে তোমার জানলা-দুয়ার সব বন্ধ করে দিয়েছি। তোমাকে সেই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে একা রেখে আমি বাইরে এসেছি বিচরণ করতে। দেবায়তন ছেড়ে ভোগায়তনে। প্রজাপতিকে গুটি কেটে বের হতে দিলাম না। নিজেই প্রজাপতি সাজতে গিয়ে শুঁয়োপোকাই হয়ে রইলাম। তোমাকে যদি বাইরে আনতে পারতাম, তবে আমার সমস্ত জগৎসংসার শাশ্বত

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। নিজের সুখ প্রচারিত করতে গিয়ে তোমার আনন্দটিকে আর প্রকাশ করা হল না। তোমার হাসিটি আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত করে নিতে পারছি না বলেই তোমার কান্না। নিজের কান্নাই শুধু উঁচু গলায় জাহির করলাম। সেই আর্তনাদের কোলাহলে তোমার কান্নাটি আর শোনা হল না।

৩৩

কৃপা করো। আমার হাজার বছরের অন্ধকার গুহায় একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করো। তোমার সেই কৃপার বহ্নিকণায় আলো হয়ে যাবে আমার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। রামকৃষ্ণ বললেন, 'হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটি মাত্র দেশলায়ের কাঠিতে আলো হয়ে ওঠে।'

ঈশ্বরের কৃপা বোঝাবার জন্যে কাব্যান্বিত উপমা। যেমন আমার অহেতুক ভক্তি, তেমনি তোমার অহেতুক কৃপা। কেন যে কৃপা করবে, আর কখন যে কৃপা করবে কিছুই জানি না! শুধু নিজের 'কৃ'-টুকু করে যাচ্ছি যদি 'পা'-টুকু পাই। মাঠ কর্ষণ করে রাখছি যদি তোমার মেঘবারির বর্ষণ হয় সহর্ষে। তোমার কৃপার এক বিন্দুতেই আমার সহস্র সিন্ধু। সেই বিন্দুটির জন্যেই আমার প্রতীক্ষা। আমার হাজার বছরের অন্ধকার ঘর আলো করবার জন্যে হাজারটি দেশলায়ের কাঠি লাগে না, লাগে না হাজার-ঝালর-ওয়ালা হাজার দীপের ঝাড়লণ্ঠন। একটি বহ্নিকণাতেই হবে বিরাট বিস্ফোরণ।

তোমার করুণায় নিঃস্ব বিশ্বজয়ী হবে। অকৃতী হবে অসাধ্য-সাধক। মরা নদীতে বান ডাকবে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হবে। বোবা কণ্ঠে ফুটবে নামগুণগান। আরো একটি উপমা দিলেন: 'এক-একটি জোয়ানের দানায় এক-একটি ভাত হজম করিয়ে দেয়। কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না।'

তাঁর কৃপায় বাতাসটি না বইলে তুমি অমল ধবল পাল তুলবে কি করে? তাঁর কৃপাটি আছে বলেই তো ভাবতে সাহস পাচ্ছ কূল আছে। নইলে এই অজ্ঞাত সমুদ্রে কোথায় তোমার যাত্রা? কোন বন্দরের অভিমুখে?

কৃপা করেই তো তুমি ছোটটি হয়েছ আমার জন্যে। তুমি এত মহনীয়, কিন্তু আমার জন্যে সহনীয় হয়েছ। এত অপরিমেয় তোমার প্রতাপ কিন্তু আমার কাছে রাজার মুকুট পরে আসোনি—এসেছ নিভূর্ষণ কাঙালের বেশে। আমার দরজায় তোমার মুকুট যে ঠেকে যেত! এত অপরিমেয় তোমার ঐশ্বর্য কিন্তু আমার কাছে এসেছ মধুর হয়ে, কোমল হয়ে, স্নেহলাবণ্যপুঞ্জিত হয়ে। বাল-গোপাল হয়ে। ছোট্টটি না হলে তোমাকে বুকের মধ্যে ধরব কি করে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান। যেমন ঠিক সূর্যো-

দয়ের সময়ে সূর্য। যে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়, চক্ষু ঝলসে যায় না, বরং চোখের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেন তিনি ভক্তের কাছে।'

এ কি এক কবির বর্ণনা নয়? মধ্যাদিনের খররৌদ্রে তুমি বিকট-প্রকট, সাধ্য নেই তোমাকে দেখি। তোমার শুধু বিদ্যমানতা নয়, তোমার অভ্যুদয়। তোমার শুধু থাকা নয়, তোমার আসা, তোমার দেখা দেওয়া। কিন্তু আমি যেমন করে তোমাকে সইতে পারি তেমন করেই তো তুমি দেখা দেবে। তাই তুমি আমার প্রথম জাগরণের মুক্ত মুহূর্তে ভোরবেলাকার সূর্যটি হয়েই দেখা দিয়েছ। নম্রতায় রক্তিম হয়ে, অনুরাগে সুন্দর হয়ে, তমসাস্নানে পবিত্র হয়ে। সোনার থালায় নিয়ে এসেছ সানন্দপ্রসাদ।

তোমাকে ছোট করি এমন সামর্থ্য নেই। তুমি নিজের ইচ্ছায় ছোট হয়েছ। আমার ঘটটি ছোট বলে তুমি, হে আকাশ, ছোট হয়ে আমার ঘটে ঢুকেছ। আমার কল্পনাটি ছোট বলে, হে সমুদ্র, তুমি ছোট হয়ে ধরা দিয়েছ আমার সীমাবদ্ধ কবিতায়। তুমি নিজেই ছোট হও, তোমাকে কেউ ছোট করে না?

'ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য।' বললেন রামকৃষ্ণ।

ভক্তি নরম, শীতল, গদগদ। সূর্য তীব্র, প্রখর, জ্যোতির্ময়। চন্দ্র ভাব, সূর্য যুক্তি। চন্দ্র কল্পনা, সূর্য বিচার। তাই সূর্যের চেয়ে চন্দ্রের দৌড় বেশি। রামকৃষ্ণ বললেন, 'জ্ঞান যায় বৈঠকখানা পর্যন্ত, ভক্তি যায় অন্তঃপুর পর্যন্ত।'

বিচারের শেষ আছে, ভাবের শেষ নেই। যুক্তি নিয়ে যাবে তিন-ধাপ কল্পনা নিয়ে যাবে গহন গুহার অন্ধকারে। তুষার যেমন স্থিতি পায় বিগলিত নদীস্রোতে, জ্ঞান তেমনি আশ্রয় পায় ভাবের তরলীভবনে। ভক্তি ছাড়া জ্ঞানের দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়? সর্বভূতে ভগবান, এ জেনে আমার কী হবে যদি আমি কাউকে ভালোবেসে না কাঁদতে পারি? জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলেই ভক্তি। দ্রবীভূত হতে পারার নামই সিদ্ধ হওয়া।

তাই বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণ যখন বললেন, তুমি সেদ্ধ গো, বিদ্যাসাগর তখন আশ্চর্য হবার ভাব করে বললে, কই, আমি তো ডাকি না ভগবানকে। তখন 'সিদ্ধ' হবার অপূর্ব একটি সংজ্ঞা দিলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'আলু পটল সেদ্ধ হলে কি হয়? নরম হয়। তোমার চিত্তও নরম হয়েছে। দ্রবীভূত হয়েছে। পরের দুঃখে তুমি কাঁদছ। তোমার অত দয়া!'

পরের দুঃখে যদি সত্যি-সত্যি কাঁদি, তবে এই ভেবেই কাঁদি, সে আর আমি এক, তার দুঃখ আমার নিজেরই দুঃখ। আমার নারায়ণ তার নারায়ণকে চিনতে পারে। তাই লোকের দুঃখবারণই ঈশ্বরভজন। তাই পরোপকার মানে, এমন এক কাজ যা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। 'পর' মানে ঈশ্বর, 'উপ' মানে সমীপস্থ হওয়া, 'কার, মানে কার্য। ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করে এমন যে কাজ তার নামই হচ্ছে পরোপকার।

তাই, শুধু এ প্রার্থনা, আমাকে তুমি ভক্তি দাও। আমাকে তুমি শীতল

করো আর্দ্র করো। রসে-রহস্যে ডুবিয়ে রাখো। আমি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হতে চাই নাই। আমি চাই না প্রখর-প্রহর-মধ্যাহ্নের মরুভূমি। আমাকে দাও তুমি ভক্তির নিশীথ জ্যোৎস্না। জ্ঞানের রৌদ্র সইতে পারব না, দাও ভক্তির হিমকনা। জ্ঞানদাহের বদলে ভক্তির শ্বেতচন্দন। জেনে আমার তত সুখ নেই যত সুখ কাছে টেনে। তুমি আছ শুধু এ জেনে আমার লাভ কি, যদি তোমাকে কাছে না টানতে পারি? কিন্তু টানি কি দিয়ে? এই টানবার দড়িটি হচ্ছে ভক্তি। জ্ঞান হচ্ছে মস্তিষ্ক, ভক্তি হচ্ছে হৃদয়। কি-কি বিষয় নিয়ে ব্যঞ্জন রান্না হয়েছে এটি হচ্ছে জ্ঞান—জিহ্বায় এর আস্বাদ নেওয়াটি হচ্ছে ভক্তি। রামকৃষ্ণ বললেন, 'আধ বোতল মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে খোঁজে আমার দরকার কি?'

ভগবান আস্বাদ্য এটি হচ্ছে জ্ঞান, ভগবান সুস্বাদু এটি হচ্ছে ভক্তি।

৩৪

'এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে এক ছোকরা ছিল।' রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'লোকে তাকে পোদো বলে ডাকে। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির আছে। ভেতরে ঠাকুরবিগ্রহ কিছু নেই, চামচিকে বাসা করেছে। মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ, আগাছার জঞ্জাল। লোকজনের যাতায়াত নেই মন্দিরে।

একদিন সন্ধ্যের পর গাঁয়ের লোকেরা হঠাৎ শঙ্খধ্বনি শুনতে পেল। কি ব্যাপার? মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ-ভোঁ করে। গাঁয়ের লোকেরা ভাবলে, কেউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে বোধহয়, সন্ধ্যের পর আরতি হচ্ছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই দৌড়ে-দৌড়ে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত। সবার আশা ঠাকুরদর্শন করবে আর আরতি দেখবে। কাকস্য পরিবেদনা। মন্দিরের দ্বার বন্ধ। একজন সাহস করে আস্তে-আস্তে খুলে দিল দরজা। দেখল পদ্মলোচন এক পাশে দাঁড়িয়ে ভোঁ-ভোঁ শাঁখ বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দূরস্থান, মন্দির মার্জনাই হয়নি। তখন সে-লোক চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'মন্দিরে তোর নাহিক মাধব,
পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল!'

পরিহাসরসাশ্রিত অনবদ্য গল্প। একটি জীবন্ত বর্ণনা। আমরাও এমনি ফাঁকা শঙ্খধ্বনি করছি। তাঁকে প্রকাশ করছি না, শুধু আত্মপ্রচার করছি। মন্দিরে মাধব-প্রতিষ্ঠা নেই, শুধু স্তোত্রপাঠের অনুষ্ঠান। সে স্তোত্র আরাধনা নয়, আত্মস্তুতি। তাঁকে জানানো নয়, শুধু নিজের বিজ্ঞাপন।

'তাই সবার আগে চিত্তশুদ্ধি।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'মন শুদ্ধ করলেই ভগবান এসে বসবেন সে পবিত্র আসনে।'

তিনি শঙ্খধ্বনি শুনে আসেন না, তিনি আসেন কান্না শুনে। আর শুদ্ধ

চোখে যদি একবার কান্না আসে, তবে সে চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। ভক্তের ভগবানকে চাই, আবার ভগবানেরও ভক্তকে চাই। একজনের আর একজন ছাড়া গতি নেই, ভগবান যখন সূর্য, ভক্ত তখন পদ্ম। আবার ভক্ত যখন পদ্ম, ভগবান তখন অলি।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছ কিন্তু আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তোমার চেয়ে আমার কত বেশি ক্ষমতা। এত তোমার প্রভুত্ব কিন্তু আমার কাছে তুমি দুর্বল, স্নেহল, খর্বকায়। তোমার এত বৃহৎ রাজকার্য, তার মধ্যে তুমি এই নগণ্যতমকে মনে করে রাখতে পারো না। কিন্তু সর্বক্ষণ তোমাকে ভেবেই আমার দিন কাটছে। তোমার স্মৃতিটি বয়ে-বয়েই জীবনের পথ ভাঙছি চিরদিন।

আশ্চর্য, তুমি কে! আমি যে তোমাকে ভাবি, সেই তো তোমারও আমাকে ভাবা। আমি যে তোমাকে দেখবার জন্যে তাকাই, সেই তো তোমার আমাকে দেখে নেওয়া। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেই তো আমাকে তোমার ভালোবাসা। তুমিই যদি না ভালোবাসো তবে আমার ভালোবাসা জাগত কি করে? তুমি গোপন বলেই তো আমার ভালোবাসা এত স্বপ্নময়!

কিন্তু তুমি কোথায়?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেখানে।'

রোক চাই, ব্যাকুলতা চাই, তবেই না মিলবে সেই জলসত্র। হলো হলো, না হলো না হলো—এই ভাবে কিছু হবে না। চাই নিষ্কাশিত তরবারির মত উজ্জ্বলন্ত ব্যাকুলতা। ব্যাখ্যা করলেন রামকৃষ্ণ: 'জলের দরকার হয়েছে, কুয়ো খুঁড়ছে। খুঁড়তে-খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে-খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালিই বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ সেখানেই খুঁড়বে। ছাড়বে না। তবে তো জল পাবে।'

একটার উপর দৃঢ় হতে হবে। একটাকে ধরতে হবে জোর করে। উপর-উপর না ভেসে ডুব দিতে হবে অতলে। এক ডুবে রত্ন না মিললে অনন্তবার দিতে হবে। তিনি ভাবে অনন্ত আমি ডুবে অনন্ত। তাঁর রূপসাগর, আমার ডুব-সাগর।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তিনি তো ধর্ম-মা নন, আপন মা। ব্যাকুল হয়ে মা'র কাছে আবদার কর। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।'

কিন্তু কে ব্যাকুল হচ্ছে? সবাই বাবুর বাগান দেখে অবাক, বাবুকে দেখবার কথা কেউ ভাবে না! এই সৃষ্টি দেখেই সকলে বিভোর—যার এই সৃষ্টি তার কথা নিয়ে কে মাথা ঘামায়! কেমন মধুর করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক, কেমন গাছ কেমন ফুল, কেমন ঝিল কেমন বৈঠকখানা, কেমন ছবি, এই সব দেখেই খুশি। কিন্তু বাগানের মালিক যে বাবু

তাকে খোঁজে কজন ?'

কত দেশ-দেশান্তরে যাই আমরা। প্রকৃতির কত রূপ দেখতে। কখনো রুদ্র কখনো স্নিগ্ধ। কখনো ভয়াল-উত্তাল, কখনো শ্যামল-শীতল। কত সে বিচিত্র কত সে বহুলবর্ণ। তবু এত সব দেখে-দেখেও একবার কি ভাবি কে শিল্পী কে এই লিপিকার। শুধু কবিতাটিই পড়ব, যাব না একবার কবি-দর্শনে ?

আমি যাব। পরব উৎসববেশ। নইলে চারদিকের এই রূপসজ্জার মানে কি ? জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কেন এত গীত-গন্ধ, কেন এত লীলাছন্দ, কেন এত দীপাবলী ? এই রূপবাসর তবে কেন রচিত হল ? কেন তবে এত রাগরাগিণী বেজে চলেছে বাতাসে ? সর্বশোভার যিনি সভাপতি হয়ে আছেন যাব সেই কবির অট্টালিকায়। মুখোমুখি বসে আলাপ করে আসব।

'তাই', রামকৃষ্ণ বললেন, 'পগার ডিঙিয়েই হোক, প্রার্থনা করেই হোক, বা দারোয়ানের ধাক্কা খেয়েই হোক, যদুবাবুর সঙ্গে আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞেস করলেই বলে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আমলারাও মানে।'

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তাঁর যদি কটাক্ষের কণা মেলে তবে মিলবে জগতের দৃষ্টি। কিন্তু জগতের আনন্দের দিকে তোমার দৃষ্টি নয়, তোমার দৃষ্টি জগদানন্দের দিকে। এই ভাবটিই আবার ব্যক্ত করলেন অন্য উপমায় : 'আলো জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না।'

তিনি যদি হৃদয়ের মধ্যে আসেন তবে বহু লোক এসে আঙিনায় ভিড় করবে। তিনি কিন্তু ভিড়ে নন, তিনি নিবিড়ে।

৩৫

কিন্তু তুমি কতক্ষণ কাঁদবে তাঁর জন্যে ? ছেলে কতক্ষণ কাঁদে ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'ছেলে কাঁদে কতক্ষণ ? যতক্ষণ না স্তন পান করতে পারে। তার পরেই কান্না বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেবল আনন্দ। আনন্দে মা'র দুধ খায়। তবে একটি কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে-মাঝে খেলা করে, আবার হাসে।'

যদি একবার মা'র দেখা পাই, যদি পাই তাঁর সঙ্গস্পর্শস্বাদ, তবে আর বিচার কি ! তখন আর সন্ধান নেই তখন সন্ধি। শুধু প্রাপ্তি হলেই চলে না, তৃপ্তি চাই। প্রাপ্তির প্রান্তর মরুভূমি হয়ে যায় যদি তৃপ্তির তরুচ্ছায়াটি না থাকে। মা হচ্ছে প্রাপ্তি, তাঁর স্তন্যসুধা হচ্ছে তৃপ্তির গঙ্গাধারা।

'এটা সোনা, এটা পেতল—এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা—এর নাম জ্ঞান।'

অদ্বৈতানন্দের ভাবটি চমৎকার করে বোঝালেন রামকৃষ্ণ। লিখলেন সোনার অক্ষরে। ঘটি যদি পেতলের হয়, কলঙ্ক পড়ার ভয়ে তাকে মাজতে হয় প্রত্যহ। কিন্তু যদি সোনার হয়ে যায়, আর মাজবার দরকার হয় না। কর্মযোগে অঙ্গার

যদি হীরক হয়, পেতল কি সোনা হবে না ? আমাকে সোনা করো। ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন ও তাড়ন করো। আগে কষ্টিপাথরে ঘষো। পরে আগুনে পোড়াও। তার পরে ছেনি দিয়ে কাটো টুকরো-টুকরো করে। শেষে হাতুড়ির ঘায়ে পীড়ন করো। এই ভাবে পাকা করে অলংকারে নিয়ে যাও আমাকে। আমার অহংকার থেকে তোমার অলঙ্কারে। যদি একবার অলংকার হতে পারি তবে কি দুলবো না তোমার কণ্ঠহার হয়ে ?

সেই কলসীর কাহিনীটি স্মরণ করো। অলস চাকর, কর্তব্যকার্যে স্পৃহা নেই, নিত্য প্রভুত গঞ্জনা সয়ে দিন কাটায়। পালাবার মতলবে কলসী নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে। কলসীটি নির্জনে কোথাও ফেলে দিয়ে চম্পট দেবে। এমন সময় কলসী কথা কয়ে উঠল : 'শোনো, আমিও প্রথমে মাটি ছিলাম। কত দূরে দেশ থেকে আমাকে খুঁড়ে এনেছে কোদাল দিয়ে। জলে ভিজিয়ে রেখেছে। কঙ্কর আর পাথর বার করবার জন্যে পায়ে-পায়ে দলেছে। তার পরে পাট করে তুলেছে কুম্ভকারের চাকে। চাকে পাক দিয়েছে। ঘুরিয়ে মেরেছে। হাতের কায়দায় ছাঁচ গড়েছে কলসীর। এততেও শেষ নেই। কাঁচা কলসকে রোদে পুড়িয়েছে, আগুনে দিয়েছে। শেষেই না আমি কলসী হলাম! এখন দেখ কত সন্তর্পণে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ নিয়ে যায় কক্ষে, কেউ বা মাথায়। কত আমার প্রতি যত্ন, কত কোমলকরুণ ব্যবহার। ছিলাম মলিন মাটি, এখন পবিত্র তৃষ্ণাবারি বিতরণ করছি।'

লোহার খড়্গ হয়ে পড়ে আছি। কাম ক্রোধ আর হিংসার প্রহরণ। কিন্তু, রামকৃষ্ণ বললেন, 'লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়, খড়্গ সোনা হয়ে যায়।'

সে তখন নিজেই হয়ে ওঠে কমনীয়। তাকে দিয়ে তখন আর হিংসা-ক্রোধের কাজ হয় না। তরবারির আকারটা শুধু থাকে। দেহবোধ যায় কিন্তু দেহ যাবে কোথায় ? তাই ঐ আকারবিকারটুকু যায় না। আসলে সেটা পোড়া দড়ি, কোনো রকমে ঝুলে আছে মাত্র। দিলেন আবার আরেক উপমা : 'দূর থেকে পোড়া দড়ি বোধ হয়, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে উড়ে যায়।' মনে হয় ষড়রিপুর ষড়ৈশ্বর্যই রয়েছে বুঝি, কিন্তু কাছে এলে বোঝা যায় ছলনা-ছায়া !

এই হল আসল জ্ঞানীর লক্ষণ। এ ভাবটিই বোঝালেন আবার এক অদ্ভুত উপমায় : 'নারকোল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এই শুধু টের পাওয়া যায় যে এককালে ঐখানে নারকেলের বেল্লো ছিল।'

একবার সিদ্ধ যদি হতে পারো, তা হলে আর নতুন সৃষ্টি হবে না তোমাকে দিয়ে। তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। কী সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। 'সিদ্ধ ধান পুঁতলে কী হবে ? গাছ আর হয় না।'

আলু-পটল সেদ্ধর কথা এক অর্থে বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। এবার ধান সেদ্ধর কথা বললেন অন্য অর্থে। এ হচ্ছে জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ। জ্ঞানাগ্নি যদি

একবার জ্বললে, তখন আগুনেই বা কি, জলই বা কি। কাকে বলে জাগরণ, কাকেই বা স্বপ্ন। এবার একটা গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক কাঠুরে স্বপন দেখছিল। কে একজন এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? তেড়ে এল কাঠুরে। কেমন সুন্দর রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম! ছেলেরা সর্ব লেখা-পড়া অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি? তখন সে লোক বললে, ও তো স্বপন, ওতে আর কী হয়েছে! কাঠুরে বললে, দূর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। কাঠুরে যদি সত্য হয়, স্বপনে রাজা হওয়াও বা সত্য হবে না কেন?'

যা ভাবছি জাগরণ, কে জানে তাই সত্যি স্বপন কিনা! যখন শেষবারের মত ঘুমোব, যে ঘুমের আর জাগা নেই, কে জানে তখনই ঠিক জেগে আছি বলে অনুভব করব কিনা! আর যা এতদিন জাগরণ বলে মনে করে এসেছি তাই হয়ে দাঁড়াবে না আকাশকুসুম! তাই কোথায় তুমি যাবে? যদি তিনি বনে থাকেন তবে তিনি মনেও আছেন। যদি থাকেন গুহায় তবে আছেন শয্যায়। যদি আছেন বিজনে, তবে আছেন জনে-জনে।

'তাই', রামকৃষ্ণ বললেন এক টুকরো এক রামায়ণের গল্প : 'রামচন্দ্র যখন জ্ঞানলাভের পর বললেন, থাকবো না সংসারে, তখন দশরথ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন বশিষ্ঠকে! পাঠিয়ে দিলেন রামচন্দ্রকে বোঝাবার জন্যে। বশিষ্ঠ বললেন, রাম! যদি সংসার ঈশ্বর-ছাড়া হয়, তুমি ত্যাগ করতে পারো। রামচন্দ্র চুপ করে রইলেন। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হল না।'

হায়, গৃহ তো ছাড়ব, কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়ি কি করে? গৃহ ছেড়ে যেখানে যাব সেখানেই তো নিয়ে যাব এই দেহ-গেহকে। ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসীর আবার কুটির নির্মাণ নিজের বৃত্তি ছেড়ে দ্বারে দ্বারে ফিরি করে বেড়ানো। পুত্র ছেড়ে চেলা-গ্রহণ। হায়-হায়, এ আবার কী অপরূপ মায়া। মায়া ছাড়তে মায়াপাশেই ফের বাঁধা পড়া!

৩৬

তাই, আমি থাকবো আমার হকের ঘরে, যাব না কুহকের সন্ধানে। সংসারেই থাকবো, কিন্তু থাকবো সং ফেলে সারকে নিয়ে। একটি জোরালো ঘরোয়া উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ। সেই কুলো আর চালুনির উপমা। চালুনি না হয়ে কুলো হবে। কিন্তু একদল আছে যারা জাঁতি। যা পায় দু টুকরো করে দু টুকরোকেই ত্যাগ করে। তাদের শুধু তর্ক আর বিতণ্ডা। তাদের শুধু উড়িয়ে দেওয়া।

রামকৃষ্ণের ভাষায়, তারা হচ্ছে 'আদাড়ে'। কিন্তু 'আদাড়ে'ই যদি না থাকবে

তবে 'বাগাটে'ই বা হবে কেন ? বিষবৃক্ষ আছে, আবার আছে চন্দনতরু। বিদ্যার পাশাপাশি আছে আবার অবিদ্যা। মহা বিদ্যা আর মহা অবিদ্যা দুই-ই মহাবিদ্যা। রামকৃষ্ণ আরেক টুকরো গল্প বললেন রামায়ণ থেকে: 'অযোধ্যায় সব বাড়ি যদি অট্টালিকা হত তা হলে বড় ভালো হত। রামকে বলেন জানকী। অনেক বাড়ি দেখেছি ভাঙা, পুরোনো। রাম বললেন, সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রিরা কি করবে ?'

মন্দটি আছে বলেই তো ভালোটি আনন্দকর। দুষ্ট আছে বলেই তো শিষ্টকে এত মিষ্টি লাগে। জটিলা-কুটিলা আছে বলেই তো কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণলীলা।

কী একটি অপূর্ব উক্তি করলেন রামকৃষ্ণ।

'জটিলে-কুটিলে না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

তোমার লুকোচুরি খেলা কী করে জমবে যদি আলো-আঁধারের না জাল বোনো অরণ্যে। তোমার অবগুণ্ঠনটি আছে বলেই তো তোমার অনাবৃতিটি এত মধুর। দুই চোখ অশ্রুতে ভরে দেখি বলেই তো তোমার মুখ এত সুন্দর লাগে। যাই বলো, ভগবানকে দেখার শক্তি যদি চাও আসক্তি কমাও। বাইরে মালা জপলে, তীর্থে গেলে, গঙ্গাস্নান করলে কী হবে ? আসল হচ্ছে মনের মার্জনা। মুখের গর্জন কিছুই হবার নয়। পরিহাস মিশিয়ে বললেন রামকৃষ্ণ: টিয়াপাখি সহজ বেলা বেশ রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি বেরোয়—ক্যাঁ ক্যাঁ।'

ভিজে দেশলাই হয়ে থাকব না। শুকনো দেশলাই হয়ে থাকব। শুকনো দেশলাই একবার ঘষলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। ঈশ্বরের নাম শুনলেই উদ্দীপনা হয়। অশ্রু আর পুলক একসঙ্গে দেখা দেয় হাত-ধরাধরি করে। কে যে কোনজন বুঝে ওঠা যায় না। কিন্তু বিষয়াসক্ত মন ?

'বিষয়াসক্ত মন', বললেন রামকৃষ্ণ: 'ভিজে দেশলাই। হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জ্বলবে না, কাঠি ভেঙে গেলেও না। কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হয়।'

তেমনি, 'ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না।'

আগুন জেবলে ভিজে দেশলাই শুকিয়ে নাও। আগুন মানে ত্যাগের আগুন, অনাসক্তির আগুন। জল ঢেলে ছুঁচের কাদা ধুয়ে ফেল। জল মানে অশ্রুজল, ভালোবাসার কান্না।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, ভগবানের কৃপা না হলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে দেখি এমন সাধ্য কি। কৃপা কি সহজে হবে ? অহঙ্কার যতদিন থাকবে ততদিন তাঁর আসবার লগ্ন আসবে না। আর অহঙ্কার কি সহজে যায় ? অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ি বেরিয়েছে !'

'নিজে কর্তা হয়ে বসলে ঈশ্বর আর আসবে না। বলেন, ও তো আর নাবালক নয় যে অছি হব। ও এখন সেয়ানা হয়েছে, লায়েক হয়েছে, তেমনি গোঁফে চাড়া দিয়ে বসেছে সাইনবোর্ড মেরে, আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াই এমন

সাধ্য কি !'

বলে ঘরোয়া একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'ভাঁড়ারে একজন আছে, তখন বাড়ির কর্তাকে যদি কেউ বলে, মশায়, আপনি এসে জিনিস বার করে দিন, তখন কর্তা বলে, ভাঁড়ারে একজন যে রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব !'

কিন্তু আমার 'আমি' যাবে কি করে ?

'আমি একেবারে যায় না। আবার উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ কিন্তু কাটা ছাগলের মত ভ্যা-ভ্যা করে।'

'আমি' হচ্ছে উ'চু ঢিপি। উ'চু ঢিপিতে কি জল জমে ? চমৎকার বললেন রামকৃষ্ণ : 'আমি-রূপে ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপাজল জমে না।' তবে উপায় ? উপায় হচ্ছে কান্না। দুঃখে একবার কান্না, আনন্দে একবার কান্না। তোমাকে না পেয়ে কান্না, তোমাকে পেয়ে কান্না। না পেয়ে কান্না, কবে তোমাকে পাব ? পেয়ে কান্না, এতদিন তুমি ছিলে কোথায় ? না পেয়ে কান্না, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। পেয়ে কান্না, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফেল।'

আমাকে কাঁদাও। আমাকে সমতল করো। আমাকে দুঃখের দীক্ষা দাও। যদি দুঃখ না দাও তবে আমার হিসেবে যে কম পড়ে যাবে। তোমার কাছে যে আমার অনেক পাওনা। যদি প্রহার না পাই তবে কি করে পাব তোমার প্রলেপের পেলবতা ! যদি রোগের রাত্রি না আসে কি করে পাব তোমার আরোগ্যের সুপ্রভাত ! যদি তোমার জন্যে কলঙ্কসাগরে না ভাসি কি করে হব তোমার বুকের অলঙ্কার !

তোমার কাছে আমার এত পাওনা, অথচ উলটে, আমারই কাছে তোমার অফুরন্ত দাবি। বললে, দুঃখ দিলাম, একে আনন্দে রূপান্তরিত করো। বন্ধন দিলাম, একে নিয়ে যাও মুক্তিতে। সংকোচ দিলাম, একে নিয়ে যাও প্রকাশে। মাটি দিলাম, একে এখন স্বর্গ বানাও।

কত বড় দুষ্কর ব্রত সাধন করতে বসেছি আমি, বেদনাকে নিয়ে যাব আনন্দে, কামনাকে নিয়ে যাব নির্মলতায়, দীনতাকে নিয়ে যাব মহত্ত্বে। শূন্য হাতে এসেছি সংসারে, বিনা-উপকরণে স্বর্গসৌধ নির্মাণ করে যাব। ক্ষীণায়ু ক্ষুদ্র প্রাণী হয়ে নিজেকে ভাবব অনন্তের আয়তন। এই সংসারে তোমাকে আনতে পারলেই তা স্বর্গ হয়ে উঠবে। তুমি পৃথিবীকে বর্ণে-স্বর্ণে গন্ধে-ছন্দে রূপান্তরিত করেছ, আমি স্বর্গে সংসারের রূপান্তর ঘটাব।

আমি কী করতে পারি ? তুমি যদি করুণা না করো তবে কিছুই হবার নয়। না আসে মেঘ, না হয় বৃষ্টি, না বয় হাওয়া। আমি কী করতে পারি ? শুধু পাখা চালাতে পারি, কিন্তু তোমার কৃপার দক্ষিণবায়ু যদি না আসে তবে সবই অদক্ষিণ। তোমার কৃপা আকর্ষণ করবার জন্যেই তো আমার কর্ম। যদি একবার তোমার কৃপার হাওয়া ভেসে আসে কে আর তখন পাখার হাওয়া খায় ? বললেন রামকৃষ্ণ : 'হাওয়ার জন্যে পাখার দরকার। কিন্তু পাখা

তখুনি ফেলে দেয় যদি বয় একবার দক্ষিণে হাওয়া।'

ঈশ্বরের উপর যদি অনুরাগ আসে, তবে কিসের আর জপতপ উপাসনা? হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হতে পারলে বৈধী কর্ম কে করে?

কিন্তু, হে সর্বান্তর্যামী, তুমি সমস্ত জানো। তুমি তো জানো মন দিগন্ত-ধাওয়া কিন্তু কর্মটি কত ক্ষীণ। ইচ্ছার অনুপাতে ক্ষমতা কত সংক্ষিপ্ত। তুমি কি খর্ব কর্ম দেখবে, দেখবে না আমার পর্বত-ছোঁওয়া ইচ্ছাটিকে? হে অখিল-লোকলোচন, তুমি এত দেখতে পাও, আর এটুকু দেখবে না? কর্ম দেখবে মন দেখবে না? ভাষা দেখবে ভাব দেখবে না? কি বলতে পারিনি তাই দেখবে, কি বলতে চেয়েছি তা দেখবে না? আমি যদি তোমার চোখের আড়ালে নই, তুমি কেন আমার চোখের আড়ালে? রূপে-রূপে মিশে তুমি অরূপ হয়ে আছ। আমার রূপে কেন তুমি ধরা দেবে না আমার কাছে? আমার রূপটি যদি ধরো তবে কি আমার মনটিও ধরবে না?

'ভগবান মন দেখেন।' কেমন সরল অথচ সতেজ ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ: 'কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না।'

তারপর এবার দেখুন রামকৃষ্ণের কথাশিল্প: 'শোর-গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য করে যদি কামিনীকাঞ্চনে মন রাখে তা হলে সে ধিক। যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে কামিনীকাঞ্চনে মন, তাকে বলি ধিক। আর যে খায়দায় বেড়ায়, কামিনীকাঞ্চনে মন নেই, তাকে বলি ধন্য।'

বলে ফের বললেন, 'মন্তর মানে মন তোর। যার ঠিক মন তার ঠিক করণ।'

মানুষ কি বুঝতে পারে কোথায় পড়ে আছি! ভুলকেই মনে করে সে ফল-শয্যা। বিপথকেই মনে করে পান্থনিবাস। কিন্তু মন যদি গভীর থেকে একবার কেঁদে ওঠে মুক্তির জন্যে, তা হলেই তুমি উন্মুক্ত হলে। একটি বিস্ময়কর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। শুচিবায়ুগ্রস্ত সন্ন্যাসীর বলা নয়, এক উদাররসবুদ্ধি সাহিত্যিকের বলা: 'দুই বন্ধু বেড়াতে চলেছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। একজন বললে, এস ভাই, একটু ভাগবত শুনি। আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখলে। তারপর সে সেখান থেকে চলে গিয়ে বেশ্যালয়ে গেল। সেখানে খানিকক্ষণ পরে তার মনে বড় বিরক্তি এল। সে আপনা-আপনি বলতে লাগল, ধিক আমাকে। বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে আর আমি কোথায় পড়ে আছি। এদিকে যে ভাগবত শুনছে তারও ধিক্কার হয়েছে। সে ভাবছে আমি কি বোকা! কি ব্যাড়ব্যাড় করে বকছে, আর আমি এখানে বসে আছি। বন্ধু আমার কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছে! এরা যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল, তাকে যমদূত নিয়ে গেল। আর যে বেশ্যালয়ে গিয়েছিল তাকে নিয়ে গেল বিষ্ণুদূত—নিয়ে গেল বৈকুণ্ঠে।'

'আর একজন একটু উঁকি মেরে দেখল'—কী চমৎকার একটি ব্যঞ্জনা। ছবিটি যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম যখন একটু উঁকি মেরে দেখি তখন যেন স্বাদ পাই না। পরে মন কেমন করে, কেন দু চোখ ভরে দেখিনি শুনিনি দু কান ভরে। তোমাকে কি শুধু উঁকি মেরে দেখলে চলে? তুমি আমার অপরিচ্ছিন্ন সুখ, আমার ভূমা। তুমি আমার দশদিগ্বিকাশী আকাশ। তোমাকে আমি অনবগুণ্ঠিত করে দেখব।

তুমি রস আমি ভাব। রস ধারণ করবার জন্যে পাত্র চাই, তাই ভাব। তুমি রসিকশেখর। তোমাকে আস্বাদ করবার জন্যে চাই মহাভাব। বিরাট ভোগের জন্যে বিরাট ভাবের পাত্র। তুমি কুসুম আমি গ্রন্থনসূত্র। হায় কুসুম যদি ফুটল গ্রন্থনসূত্র নেই, গ্রন্থনসূত্রে যদি জুটল, দেখা নেই কুসুমের। কবে তোমাকে গাঁথতে পারব আমার দিন-রাত্রির মালা করে।

৩৭

মন নিয়েই সব। কিন্তু এমন করে কে বলেছে মনের কথা? বললেন রামকৃষ্ণ, 'মন নিয়েই সব। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান। পরিবারকে এক ভাবে, সন্তানকে আর এক ভাবে আদর করে। কিন্তু একই মন।'

আমার এই একের মধ্যে তুমি বহু হয়ে বিরাজ করছ। আমার ভাবে আর কর্মে বোধে আর প্রকাশে আনন্দে আর সৌন্দর্যে বহুধা হয়ে বিকীর্ণ হচ্ছ। কিন্তু একই তুমি। অন্তরে-বাহিরে যে দিকে তাকাই, মন কম্পাসের কাঁটার মত শুধু সেই ধ্রুবতারাকেই দেখে। তোমাকে খুঁজি কান্তারে-প্রান্তরে, পর্বতগুহায়। চেয়ে দেখি অন্তরেই সেই নির্জন বনানী, সেই গহন গুহা। তোমাকে খুঁজি তারা-ভরা বিভাবরীতে। দেখি দুঃখের বিভাবরীতে তুমি আমার আনন্দের শুকতারা।'

মন নিয়েই কথা। এই মনটিই যদি স্থূলে সংসারে বন্ধক দিয়ে ফেলি তা হলেই পড়ে যাই বন্ধনে। আর তোমার জয়ধ্বনি করি না। আর তখন দান করি না নিজেকে, ক্ষয় করি। শুধু কান্না আর হুতাশের আগুন জ্বালি, জ্বালি না আর আনন্দ-হোমকুণ্ডের নির্ধূম হুতাশন।

'মন নিয়েই কথা।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'মনেই বন্ধ, মনেই মুক্ত।'

আমি রাজাধিরাজের ছেলে, আমাকে আবার বাঁধে কে? এ জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ তুমি আমার জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে বলে। এ জীবনে তাই আমি অপরিমাণরূপে বেঁচে যাব, বীরের মত স্বীকার করব হাসিমুখে তারপর নিজেকে দান করব, ছেড়ে দেব, ঢেলে দেব প্রাণপণে, বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ কর্মের মধ্যে। তুমি যে কত কাজ করছ, অহোরাত্র তা দেখছি না চোখের সম্মুখে। গতির উল্লাসে উজ্জ্বল একটি স্থিতি হয়ে বিরাজ করাই তোমার কাজ। তার গতির মধ্যে নদী একটি স্থিতি পায় সমুদ্রের শাশ্বত শান্তিতে। আমি আমার গতির মধ্যে পাব এই একটি বিস্তীর্ণ হবার শান্তি। ফুল যেমন বহমান বাতাসে

গন্ধটি ত্যাগ করে তৃপ্ত মুখে অবস্থান করে, তেমনি আমার অবস্থান। কর্মের মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে ক্ষয় করব না দান করব, ব্যয় করব না বিতরণ করব। আমার শুধু পরিবর্তন। 'পরি'-উপসর্গের আরেক অর্থ বর্জন, ত্যাগ। পরিবর্তন মানে বর্জনপূর্বক বর্তন। ত্যাগ করে অবস্থান। দান করে অদৈন্য।

কর্মফল আছেই আছে। কত উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'লঙ্কা মরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে। পাপ আর পারা কেউ হজম করতে পারে না। কেউ যদি লুকিয়েও পারা খায়, কোনো দিন না কোনো দিন গায়ে ফুটে বেরুবেই। মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর বেরোয়।'

তবু জমি পাট করো। নিষ্কণ্টক করো। বললেন রামকৃষ্ণ, 'জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে।'

সংসারে যখন থাকবে তখন জানো সংসারের কোথায় সঙ কোথায় সার। সেটুকু জেনে নিয়ে 'সারে মাতো'। এক কথায় বললেন রামকৃষ্ণ, 'ছুরির ব্যবহারের জন্য ছুরি হাতে করো।'

কিন্তু, যাই বলো, ভোগেই শান্তি না হলে বৈরাগ্য আসে কই? ঢেউ যখন আসে তার চেয়ে বেশি শক্তি যখন সে চলে যায়। ভোগের নেশার চেয়েও ত্যাগের নেশা বেশি জোরালো। খেলনা পাবার জন্যে ছেলে যতটা কাঁদে, খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মা'র কোলে যাবার জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশি কান্না।

ধনুকের ছিলা নিজের কাছে যত জোরে টানি তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ছুঁড়ে মারি তীর। যত কাছে আসে তার চেয়ে ঢের বেশি দূরে ছোটে। নিজেকে নিয়ে বড় কাছাকাছি ছিলাম, স্বার্থপরতার কারাবাসে। তোমাকে নিয়ে চলে যাই দূর মাঠের উন্মুক্তিতে। ভোগের দিনে গায়ে ধুলো লেগেছে বলে শোক করছি, এখন ত্যাগের দিনে সেই ধুলোতেই গড়াগড়ি দিচ্ছি। শোক এখন শ্লোক হয়ে উঠেছে। যা মনে হত দারিদ্র্য তাই এখন বৈভব। যা মনে হত রিক্ততা তাই শক্তি আর শান্তির সমাহার।

কিন্তু সুসময়টি আসা চাই। বললেন রামকৃষ্ণ, 'ডিমের ভিতর ছানা বড় হলেই পাখি ঠোকরায়। সময় হলেই ডিম ফুটোয় পাখি।'

কবে আসবে আমার সেই শুভলগ্ন? স্বর্ণবর্ণ পর্ণ দুলছে গাছের শাখায়। দুলে-দুলে খেলা করছে। দেখতে দেখতে সোনার বর্ণ ছেড়ে ধরেছে হরিতবর্ণ। দেখতে দেখতে শেষে বিবর্ণ হয়ে যায়। জীর্ণতায় ঝরে পড়ে মাটিতে। ধুলোর সঙ্গে উড়ে বেড়ায় শুকনো হাওয়ার হাহাকার। কে বলবে এ একদিন কাঞ্চনবর্ণ কমনীয় কিশলয় হয়ে বিরাজ করছিল শাখাশ্রয়ে?

আমিও কি তেমনি কাল-সমীরণে সমীরিত হতে হতে ঝরে পড়ব একদিন? এমনি অপ্রতিরোধ্য জীর্ণতায়? তোমার দেখা কি পাব না? এই তো সামান্য একটি সংকীর্ণ জীবনপাত্র! এই পাত্রমেয় ভিক্ষা—সেটুকু করুণাও কি পাব না তোমার হাত থেকে? কিন্তু তুমি আছ এই বাঙ্ময় বিশ্বাস কি আছে? তুমি নেই, তবে চারদিক এত আশ্চর্য কেন? কেন সব কিছু পেয়েও মনে হয় তোমাকে

পেলাম না ? সব নেতি করে দিচ্ছি, তবু তোমায় কেন নস্যাৎ করতে পারছি না ? সব ত্যাগ করতে পারি তবু তোমাকে ফেলতে পারি না কেন ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অন্ধকার ঘর, বাবু শুয়ে আছে। একজন হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজছে বাবুকে। একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয় ; জানলায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নেতিনেতিনেতি। শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, ইহ, এই বাবু।'

অন্ধকারে কবে পাব তোমার গায়ের স্পর্শ ? কিন্তু তুমি অন্ধকারে আছ, দাও আগে আমাকে এই আলোকিত বিশ্বাস। একটি প্রণিহিত প্রত্যয় দাও, আর রেখো না, রেখো না সংশয়ে। অন্ধকারে যদি তোমার স্পর্শের চমক নাও লাগে, যদি নাগাল না পাই হাত বাড়িয়ে, তবু এ যেন অন্তত বুঝি তুমি ছাড়া সব কিছু অন্ধকার। অন্তত এ যেন বুঝি তোমাকে না ছুঁলে বাঁচব না, তোমাকে না পেলে চলবে না কিছুতেই।

'বিশ্বাসের জোর কত শোনো।' গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন লঙ্কা থেকে সমুদ্দুর পার হবে। বিভীষণ বললে, কাপড়ের খুঁটে এই জিনিসটা বেঁধে নাও। কিন্তু, দেখো, খুলে দেখো না কিন্তু। এর জোরে তুমি নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবে। লোকটি বেশ হেঁটে যাচ্ছিল সমুদ্রের উপর দিয়ে। খানিক পরে আশ্চর্য হয়ে ভাবলে, কী এমন বেঁধে দিল বিভীষণ যার গুণে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। এই ভেবে খুঁট খুলে দেখলে কি ব্যাপার! কিছুই নয়, একটি পাতায় কেবল রাম-নাম লেখা। ওমা, এই জিনিস! এরই জন্যে এত! যেমনি এই ভাবা অমনি ডুবে যাওয়া।'

বলেই একটি কাব্যময় উক্তি সংযোজন করলেন : 'পাহাড়ে গুহায় নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ।'

কিন্তু শুধু বিশ্বাসেই কি তোমাকে দেখতে পাব ? শুধু নিশ্বাসেই কি পাব আমার প্রাণধারণের প্রচুরতা ? অন্ধকারে তোমাকে দেখি কি করে ? শুধু ছুঁলেই কি আমার চলবে, তোমাকে দেখব না ?

যতক্ষণ ভালোবাসা না আছে ততক্ষণ চোখ ফোটে না। কান ভুল শোনে। মন বসে থাকে না। কথা শুকিয়ে যায়। সেই প্রেম জাগে, বিপর্যয় ঘটে যায়। কান দেখে। চোখ শোনে। মন কথা কয়। তাকেই বলে প্রেমের শরীর। ভাগবতী তনু। বললেন রামকৃষ্ণ : 'তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে-করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—প্রেমের চক্ষু প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁকে শোনে।'

একটি অনবদ্য কবিতা। বলে যোগ করলেন : 'তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চারদিকে দেখা যায়। যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকো তবে খানিকক্ষণ পরে চারদিকে শিখাময় দেখা যায়।'

কিন্তু তোমাকে যদি ভালো না বাসি, তবে তোমাকে রাত-দিন চিন্তা করি কি করে ?

বিশ্বাসের আরেক নাম সরলতা। তোমার প্রেমে গরল নেই। সে যেমনি তরল তেমনি সরল। শুধু তাই নয়, বিরামবিহীন। প্রেম আমার দায় নয়, তোমার দয়া। তোমাকে ভালোবাসি কেন? হায়, যে আমার পরমতম সুখ তার প্রতি আমার অনুরাগ হবে না? আমার বৈরাগ্যের বসনটি অনুরাগের রঙেই গেরুয়া হয়েছে।

সরলতার দুটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'এক সাধুর কাছে গিয়ে একজন উপদেশ চাইলে। সাধু বললে, আর কি উপদেশ দেব, ভগবানকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসো। লোকটি বললে, ভগবানকে কখনো দেখিনি, তাঁর বিষয়ে কিছু জানিও না, কি করে তাঁকে ভালোবাসব? সাধু তার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। জিজ্ঞেস করলে, এ সংসারে কাকে তুমি ভালোবাসো? লোকটি বললে, আমার কেউ নেই। শুধু একটা মেড়া আছে, ঐটিকেই ভালোবাসি। ব্যস ওতেই হবে। সাধু বললে, ঐ মেড়ার মধ্যেই নারায়ণ আছে জেনে ঐটিকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসো আর সেবা করো। এই বলে সাধু চলে গেল। লোকটিও মেড়ার মধ্যে নারায়ণ আছে বিশ্বাস করে তার প্রাণপণ সেবা করতে শুরু করলে। বহুদিন পরে সাধুর সঙ্গে ফের লোকটির দেখা। কি হে কেমন আছ? লোকটি প্রণাম করে বললে, গুরুদেব আপনার কৃপায় বেশ আছি। আপনি যেমন বলেছিলেন সেইরূপে ভাবনা করে আমার খুব উপকার হয়েছে। কি রকম? মেড়ার ভেতরে এক অপরূপ মূর্তি দেখতে পাই—তাঁর চার হাত—তাঁকে দর্শন করে পরমানন্দে আছি।'

সাধু ভাবছে আমার দর্শন হল কই? প্রেমচক্ষু বুজে আছে, কি করে দর্শন হয়? তারপর সেই গোবিন্দ-স্বামীর গল্প: 'খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়েছে। স্বামীর মুখ কখনো দেখেনি। অন্য মেয়েদের স্বামী আসে, দেখে। একদিন বাপকে বললে, বাবা, আমার স্বামী কই? তার বাপ বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী। তাঁকে ডাকলেই তিনি দেখা দেন। ব্যস, আর কোনো কথা নয়। বাপের কথাতেই মেয়ের অটল বিশ্বাস। ঘরে দ্বার দিয়ে বসল। কাঁদতে লাগল অঝোরে, গোবিন্দ, তুমি এস, আমাকে দেখা দাও। কেন তুমি আসছ না? কেন তুমি লুকিয়ে থাকছ? মেয়েটির কান্না শুনে ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না, দেখা দিলেন।'

চাই এই বালকের মত বিশ্বাস। বালকের মত সরলতা। মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয় সেই উৎকণ্ঠা। মা'র কথা মনে পড়েছে, ছেলেকে তখন কে আটকায়! হও এই সরল ছেলে। পাগল ছেলে। এত কিছুর জন্যে পাগল হলে একবার ঈশ্বরের জন্যে পাগল হও। লোকে একবার বলুক অমুক লোকটা ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়ে গেছে। আমাকে পাগল করে দাও। 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

সংসারে তুমি একমাত্র স্থির, একমাত্র ধ্রুব, একমাত্র শাশ্বত। আর সব বস্তু-মূল্যের অদলবদল হয়, তোমার মূল্যের ব্যাহতি নেই ব্যতিক্রম নেই। তোমাতে

যে বুদ্ধি তাই তো স্থির বুদ্ধি। লোকে বলবে পাগল! রামকৃষ্ণ বললেন, 'পাত-কুয়োর ব্যাঙ, বিশ্বাস করবে না যে একটা পৃথিবী আছে।' কিন্তু তুমি আমার পৃথিবী হয়েও উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা। ঘূর্ণ্যমান চক্রের মধ্যে স্থির বিন্দু। ঐটিতেই লক্ষ্যভেদ।

বালকের ব্যাকুলতার কী সুন্দর ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ: 'ছেলে ঘুড়ি কিনবে। মা'র আঁচল ধরে টানাটানি করছে, পয়সা চায়। মা গল্প করছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। ছেলের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন টানাটানি বেড়ে গেছে, আর উপেক্ষা করা যায় না, মা নানারূপে ওজর তুলল—না, উনি বারণ করে গেছেন, উনি এলে বলে দেব, এখুনি একটা কাণ্ড করবি নাকি? ছেলে কোনোমতে ভুলবে না, কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দিলে। তখন বলতে বাধ্য হল মা, রোসো, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দিলে ছেলেকে।'

ছেলের কান্নার কাছে মা করবে কি? সাধ্য নেই বধির হয়ে থাকেন। বিরক্ত হলেও ছুঁড়ে দেবেন পয়সা। তাঁর রুপার কাঞ্চনখণ্ড। আর তা দিয়ে আমি কী করব? ঘুড়ি কিনব। আকাশে ওড়াব। আমার আনন্দের পত্রটি পাঠিয়ে দেব নীলাকাশের রাজধানীতে। বেঁধে তো আদায় করতে পারব না, কেঁদে আদায় করব। কান্না দেখতে জল ভিতরে আগুন। বাইরে কোমল ভিতরে অনমনীয়। যাবে কোথায়? রামকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বরের ঘরে আমাদের হিসসা আছে। বেশি বাড়াবাড়ি বুঝলে বেগতিক বুঝে ফেলে দেবেন আমাদের হিসসা।'

চাই তাই এই বালকের ব্যাকুলতা। সর্বভঞ্জন প্রভঞ্জন।

সার্থক কথাশিল্পীর মত মনোরম একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ: 'যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ-খচমচ করে। তখনো কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নেই। সাজ পরে আপনমনে তামাক খাচ্ছে, গল্প করছে। যখন সে সব থামল, নারদ ব্যাকুল হয়ে বীণা বাজাতে-বাজাতে আসরে নেমে গান ধরল, প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন, তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারল না। হুঁকোটা নামিয়ে রেখে আসরে নেমে পড়ল।'

যদি ব্যাকুলতা না থাকে তীর্থভ্রমণ ব্যর্থভ্রমণ। যদি ব্যাকুলতা থাকে এখানেই বারাণসী। সরলতা হল, ব্যাকুলতা হল, এখন একটু সাধন করো। জীবনসাধনকে দেখবে, একটু সাধন করবে না? সুখদুঃখমন্থনধনকে দেখবে, একটু মন্থন করবে না? পর-পর উপমা সাজালেন রামকৃষ্ণ: 'বড় মাছ ধরতে হলে চার ফেলতে হবে। দুধ থেকে মাখন তুলতে হলে মন্থন করতে হবে। সরষে থেকে তেল বার করতে হলে সরষে পিষতে হবে। আর, এইটিই অভিনব উপমা: 'মেদীতে হাত রাঙা করতে হলে মেদী বাটতে হবে।'

তাই, আর যাই হোক, পুঁথিতে হবে না। কান্নার সময় কি পুঁথি লাগে? মা'র কাছে ছেলে যখন ঘুড়ির পয়সা চায় তখন কি তার তত্ত্বজ্ঞান লাগে কি করে ঘুড়ি আকাশে ওড়ে? তবু শুধু কথা আর কথা। বাক্যের চাকচিক্য। শব্দের শোভাযাত্রা। কথার কারুকাজ।

'পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়, তাও না।'

পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। তাদের সব পণ্ড বলেই তাদের বোধ হয় পাণ্ডিত্য। বলিষ্ঠ উপমা চয়ন করলেন রামকৃষ্ণ: 'পণ্ডিত খুব লম্বাচওড়া কথা বলে, কিন্তু নজর শুধু দেহের সুখে, কামিনী-কাঞ্চনে। কেমন? যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাড়াড়ে। কেবল খুঁজছে কোথায় মরা জানোয়ার কোথায় ভাগাড়! শুধু-পণ্ডিতগুলো দরকচা-পড়া। না এদিক, না ওদিক।'

না পক্ক না অপক্ক, না সিদ্ধ না অসিদ্ধ। দরকচা বাদ দিয়ে খাবে তারও উপায় নেই, সবটাই শুষ্ক, আর্দ্র নেই কোনোখানে। তাই তো রামকৃষ্ণের দুই সাধ ছিল জীবনে। 'আমি ভক্তের রাজা হব, আর আমি শুঁটকে সাধু হব না।'

'তোমরা সারে-মাতে থাকো, আমি রসে-বশে থাকব'—তাই বলেছেন রামকৃষ্ণ। আমি গোমড়ামুখো গোঁয়ারগোবিন্দ সন্নেসী নই, আমি রসের সাগরে ভাসব। আমি জ্ঞানের আগুন নই, আমি প্রেমের চন্দ্রিকা। আমি বন্ধ ঘরের অন্ধ বাতাস নই, আমি মুক্তিময় অনাময় সমীরণ। আমি গুরুগম্ভীর নই, আমি মেদুরমধুর। আমি বৈরাগ্যের রাজমুকুট নই, আমি ভালোবাসার কণ্ঠমাল্য। আমি অর্থীপ্রার্থীর গুরুদেব নই, আমি বঞ্চিত ও অকিঞ্চনের বন্ধু। যেখানেই করুণতম ব্যথা সেখানেই আমার মধুরতম গান।

আমার বসনটি সাদা, রঙিন নয়। আমি মূর্তিমান সরলতা, বাইরের রঙের ধার ধারি না। কোথায় যাব রে আর বাইরে, ঘরেই তো তাঁর কত ফাগ-রাগ! আমার রাগভক্তি, ওদের মত বৈধীভক্তি নয়। বললেন রামকৃষ্ণ: 'রাগ ভক্তি স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মত। তার জড় খুঁজে পাওয়া যায় না।' আর বৈধীভক্তি? 'বৈধীভক্তি আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ।'

শাস্ত্র পড়ে শুধু তর্ক করার জন্যে, বিদ্যে জাহির করবার জন্যে। শাস্ত্র বেশি পড়লেই তর্কবিচার এসে পড়ে। তিনি আছেন শুধু এটুকু জানবার জন্যেই শাস্ত্র। অনেক কিছুই তো লিখলে শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে সব বৃথা। জোরালো ভাষার জাদুতে সুন্দর একটি রসিকতা করলেন রামকৃষ্ণ: 'যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্ক যুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি ঈশ্বরকে কেউ একবার জানতে পারে, তাহলে ওসব হাবজা-গোবজা বিষয় জানতে ইচ্ছেও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে—আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাব। আমি এক জালা জল খাব। বৈদ্য তখন বলে, খাবি, আচ্ছা খাবি। এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে কি বলবে তা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে।'

যখনই সৌরভের স্থানটির সন্ধান মেলে নিজের হৃদয়ের মধ্যে, তখনই বই বন্ধ করে দিতে হয়, তখনই জ্ঞান হয় ও 'হাবজাগোবজা'।

'এই বলে বৈদ্য তামাক খায়।' কী সুন্দর করে বললেন কথাটা! বিকার

কাটবার আশায় অপেক্ষা করছেন। বিষক্ষয় করবার জন্যে বিষ ওষুধই দিয়েছেন। দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার জন্যেই দিচ্ছেন অনন্ত দুঃখ। শুধু পড়লেই হবে না, করতে হবে। খুঁজতে হবে। কিনতে হবে। ছোট একটি গল্প, কিন্তু ইঙ্গিতটি গভীরে। 'কুটুম্ববাড়ি থেকে চিঠি এসেছে তত্ত্ব করতে হবে। সে চিঠি আর খুঁজে পাচ্ছে না। কি-কি জিনিস পাঠাতে হবে কেউ বলতে পাচ্ছে না ঠিক-ঠিক। খোঁজ্, খোঁজ্—কোথায় সে চিঠি! অনেক কষ্টে বহু খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। কী লিখেছে? সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়ে দেখলে, পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে, আর একখানা রেলপেড়ে কাপড়। ব্যস জানা হয়ে গেছে তত্ত্ব। এবার উড়িয়ে দাও পুড়িয়ে দাও চিঠি। কোনো প্রয়োজন নেই। যা জানবার তা জেনে নিয়েছি। তখন চিঠিটা ফেলে দিলে। এতেই কি শেষ হল? হল না। এখন আবার বেরুতে হবে সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড়ে।'

রামকৃষ্ণ যে কথার চারুকারু তার প্রমাণ তাঁর কাছে কাপড় শুধু কাপড় নয়, রেলপেড়ে কাপড়। তেমনি, তুমি যে আছ এ খবর কেমন করে যেন এসে গিয়েছে আমাদের কাছে। এত বেগচাঞ্চল্যের মধ্যে কোথায় একটি মৌন হয়ে বিরাজ করছ তুমি। এত সংশয়বাধার মধ্যে কোথায় একান্ত সহজে হাসছ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। তুমি আমার সঙ্গে-সঙ্গে জন্মেছ বলেই তুমি সহজ। সহজেই তোমাকে আমি উদ্ধার করব, আবিষ্কার করব। সন্ধান জেনে ডুব দেবো নিজের মধ্যে। তুমি তো অন্তরে নও, তুমি অন্তরে। তোমার তত্ত্ব মানে আমার তত্ত্ব। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান! আরো অন্তরঙ্গ করে বললেন কথাটা। ভাষায় আরো চমক ফুটিয়ে।

'সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বললেই হবে না। সাধন চাই, তবেই তো বস্তু। সিদ্ধি গায়ে মাখলেও হবে না, কুলকুচো করলেও হবে না। নেশা করতে হলে সিদ্ধি খেতে হবে।'

বালিতে-চিনিতে মিশেল হয়ে আছে শাস্ত্রে। 'যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর।'

সা চাতুরী চাতুরী

৩৯

শাস্ত্র জোটে কিন্তু সাধুসঙ্গ জোটে কই? শাস্ত্র নিষ্প্রাণ কথা, সাধু প্রাণময় উদাহরণ। দুটো প্রাণের কথা কইবার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুধু কইবার জন্যে নয়, শোনবার জন্যে। একা ঘরে বসে তোমাকে যখন ডাকি তখন তো কথা কই। কথার প্রীতি জিভে লেগে থাকে। কিন্তু কান শোনে না যে অন্য কারু কান্না। আমার মত আর কেউ কাঁদছে এ শোনবার জন্যে কান উন্মুখ হয়ে আছে। কানে কে করে সে রোদন-মধু-বর্ষণ?

স্বচ্ছ ঘটে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেই হচ্ছে সাধু। সেই দীপটি হচ্ছে ভক্তির আলো। আমার মাটির ঘরটি অন্ধকার। প্রদীপ কবে নিবে গিয়েছে খোড়ো হাওয়ার ঝাপটায়। আমার দীপমুখে লাগুক একবার সেই বহ্নি-চুম্বক, আমি জ্বলে উঠি। আলোকিত হই। আমি আলোকিত না হলে তুমি অবলোকিত হবে কি করে ?

তাই তো বলি, জীবনের মরুভূমিতে পাঠিয়ে দাও দু-একটি নির্জন নদীধারা। সাধুরাই নদী, তোমার রসই তাদের সলিল, সেখানে অবগাহন করে শীতল হই। জলও শীতল নয়, শিশিরও শীতল নয়, যে ভগবানের প্রেমে প্রেমিক একমাত্র শীতল সে-ই। আমার জীবনের উৎসবে দাও সেই শীতল-ভোগ।

পরশমণির খনি নেই, চন্দনের বন নেই, তেমনি সাধুও নেই স্তূপাকার হয়ে। তাই তো সেই দুর্লভের জন্যে এত দুর্লোভ। পরশমণি নিজে থেকে বলে না, আমার স্পর্শে সোনা। চন্দন নিজে থেকে বলে না আমার মধ্যে সুগন্ধ। কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পরশমণির সঙ্গ পাই স্বর্ণ হয়ে যাব। যদি চন্দনের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে জীবনের সর্বক্ষণ চলবে শুধু সুগন্ধ-বন্দনা। যেদিকে পরশমণি সেইদিকেই কনকদ্যুতি। যেদিকে চন্দন সেইদিকেই সুবাসের আবাস। সাধু দেখলে ভগবানের ভাব উদ্দীপন হয়।

'যেমন', বললেন রামকৃষ্ণ : 'উকিল দেখলে মামলা ও কাছারির কথা মনে আসে। ডাক্তার কবরেজ দেখলে মনে পড়ে রোগ আর ওষুধের কথা।'

সাধুর যত কাছে যাবে ততই পাবে মাধুর্যনদীর সংবাদ। আবার উপমা দিলেন : 'গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই পাবে শীতল হাওয়া। স্নান করলে আরো শান্তি।'

হায়, পড়ে আছি বিষয়বিষের অরণ্যে, কোথায় সেই শীতলবাহিনী গঙ্গা। শুধু উপদেশ শুনিয়ে কী হবে ? লেকচারে কিছুই করতে পারবে না। রামকৃষ্ণ উপমা দিলেন : 'পাথরের দেয়ালে কি পেরেক মারা যায় ? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমিরের কী হবে ? সাধুর কমণ্ডলু চারধাম ঘুরে আসে কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো।'

অন্তরে যদি একটি অস্থিরতা না আসে, যদি শুধু ভোগে-রোগেই মন জরে থাকে, তা হলে কোথায় পাব সে অমৃতপানের পিপাসা ? না, মাঝে মাঝে ঘোরতর সংসারীও মাথা তুলে তাকায় চারদিকে, জলে পড়লে লোকে যেমন হাত তোলে ঊর্ধ্বাকাশে। কোথায় কে একটু আশ্রয়-আশার সংবাদ দেবে, নিশ্বাসে আশ্বাস আনবে জড় দেহে। রামকৃষ্ণ বললেন : 'কুমির জলে অনেকক্ষণ থাকে, এক-একবার ভেসে ওঠে নিশ্বাস নেবার জন্যে। সেই তার সাধুসঙ্গ। তখন সে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।'

জ্যৈষ্ঠের রোদে সেই তার শ্রাবণমেঘের স্নিগ্ধ ছায়া। সাধুসঙ্গের পিপাসা এলেই সদগুরু এসে জোটে। এ গুরু লেকচার দেয় না, চৈতন্য দেয়। রামকৃষ্ণের সরল-গভীর ভাষায় 'সেথোর মত হাত ধরে নিয়ে যায়।' একবার নিয়ে গিয়ে

পৌঁছে দিতে পারলে আর গুরু-শিষ্য ভেদ নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

গুরু নাম দেন। বিশ্বাস করে সেই নামটি নিয়ে গুঞ্জরিত হও। একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে বর্তিত হও তরঙ্গে-তরঙ্গে। তনুমনকে নামমালা করে তোল। গুরুদত্ত নামটি নিয়ে সাধনভজন করো—এই তো কথা! কিন্তু কী একটি বিস্ময়কর কবিতা রচনা করলেন রামকৃষ্ণ : 'সমুদ্রে একরকম শামুক আছে। তার ভিতর মুক্তো তৈরি হয়। তারা সর্বদা স্বাতীনক্ষত্রের এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্যে হাঁ করে জলের উপর ভাসে। যেই এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়ে অমনি মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নিচে চলে যায়। যতদিন না মুক্তো হয় ততদিন আর উপরে আসে না।'

আমি কোথায় পাব সেই নামবৃষ্টিবিন্দু! তোমার নামটি ঠিক কি, কে আমাকে বলে দেবে! আমি শুধু তুমি-তুমি বলে কাঁদি। কে জানে, তারই জন্যে হয়তো নিরুত্তর হয়ে থাকো। তোমার নামটি পৌঁছে দাও আমার কানে-কানে। তোমার নাম পেলে ঠিকানাও জুটে যাবে। তখন আমার ডাকে সাড়া না দিয়ে আর পারবে না। পিঁপড়েও যদি এসে সমুদ্র স্পর্শ করে, তার স্পর্শে সমুদ্রে মৃদুতম হলেও একটি কম্পন তো ওঠে। আমার ক্ষীণকণ্ঠের কান্নাভরা ডাকে তোমার মৌনের সমুদ্রও কেঁপে উঠবে। তুমি উঠে বসবে। এ কি, এ পথ চিনল কি করে, কি করে আমার নাম জানল!

উপেক্ষার পাহাড় হয়ে থেকো না, কৃপার বাতাস হয়ে বয়ে এস। আমি তোমার দয়া চাইতে জানিনে বলেই কি তুমি নির্দয় হয়ে থাকবে? তুমি গুরুরূপে চলে এস। যে গুরু সে-ই তুমি। গুরু তোমারই কৃপার ঘনীভূত বিগ্রহ। যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার সরিয়ে আলোকের পথ দেখায় সে তুমি ছাড়া আর কে। সে আলোর স্পর্শে হাজার বছরের বন্ধ ঘরের অন্ধকার এক পলকে পালিয়ে যাবে। আলো জ্বললে সঞ্চিত-পুঞ্জিত অন্ধকার একটু-একটু করে যায় না। সম্পূর্ণটাই এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়। তেমনি তোমার স্পর্শে এক মুহূর্তেই আমার গ্রন্থিমোচন হবে—দৃষ্টির গ্রন্থি, স্পর্শের গ্রন্থি, আকাঙ্ক্ষার গ্রন্থি।

সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'ভেলকিবাজিতে একগাছা দড়ি একটা জায়গায় বাঁধে, তাতে অনেক গেরো দেওয়া থাকে। তার নিজের হাতে এক ধার ধরে দড়িটাকে নাড়া দেয়, অমনি গেরোগুলো সব খুলে যায়। কিন্তু আর কেউ খুলতে পারে না সেই গেরোগুলো। গুরুর কৃপা হলে খুলে যায় এক মুহূর্তে।'

কিন্তু গুরু যদি লোকশিক্ষা দিতে নামে, আদেশ পেয়ে চাপরাশ পরে নামতে হয়। নিজের অভিমানের প্রভাবে কিছু হবে না। কবির ভাষায় বললেন রামকৃষ্ণ : 'বাগবাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে তা হলে তার এমন শক্তি হয় যে বড়-বড় পণ্ডিতগুলো তার কাছে কেঁচোর মত হয়ে যায়।'

আর, তুমি ষোলো টাং করলে তো লোককে এক টাং করতে বলবে। তুমি যদি ষোলো আনা 'ত্যাগী' না হও তবে লোককে কী করে বলবে 'গীতা'র কথা!

এইখানে একটা গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক রুগী এসেছিল এক কবরেজের কাছে। ওষুধ দিয়ে কবরেজ বললে, আর একদিন এসো, পথ্যের কথা বলে দেব। রুগীর বাড়ি অনেক দূর। কি আর করে, আরেক দিন এসে দেখা করল। কবরেজ বললেন, খাওয়া-দাওয়া সাবধানে করবে, গুড় খাবে না। রুগী চলে গেলে একজন বৈদ্য বলল, ওকে এত কষ্ট দিয়ে ফের আনা কেন? সেইদিন বললেই তো হত। কবরেজ হেসে বললে, ওর মানে আছে। সেইদিন আমার এ ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সেদিন যদি বলতাম, রুগীর বিশ্বাস হত না। মনে করত, ওঁর ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি, উনি নিশ্চয়ই কিছু কিছু খান। তা হলে গুড় জিনিসটা তত খারাপ নয়! আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।'

পরকে যদি প্রকাশিত দেখতে চাও নিজে উদ্ঘাটিত হও। যদি তোমার মধ্যে সত্যি-সত্যি ভাব আসে তবে তোমারও অজানতে অন্যের উপর প্রভাব পড়বে। কত কবিত্বময় ব্যঞ্জনায় রূপ দিলেন ভাবটিকে : 'চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বলতে হয় না। লোহা তার টানে আপনি ছুটে আসে। লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে সে যথার্থ প্রচার করে। মুক্ত হলে, শত-শত লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা নেয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। একজন আগুন করলে দশজনে পোয়ায়।'

আর যদি নিজের অভিমানে প্রচার করতে যাও, সে কেমনতরো হবে?

'দিনকতক লোকে শুনবে, আর বলবে, আহা, ধনি বেশ বলছেন। তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা হুজুক আর কি।' তারপরেই উপমা : 'দুধের নিচে যতক্ষণ জ্বাল দেওয়া যায় ততক্ষণ দুধটা ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল টেনে নিলেই যেমন তেমনি কমে যায়।'

৪০

জ্ঞানীকে দিয়ে হবে না। প্রেমীকে দিয়ে হবে। মস্তিষ্ক দিয়ে হবে না, হবে হৃদয় দিয়ে। আমরা এমন জিনিস চাই যা আমাদের নেই। যা সংসার আমাদের দিতে পারে না। সে হচ্ছে সুখ। ভগবান এমন জিনিস চান যা আমাদের প্রত্যেকের আছে। যা আমরা ইচ্ছে করলেই দিয়ে দিতে পারি। সে হচ্ছে ভালোবাসা। জ্ঞান দিয়ে বোঝাতে পারব কিনা জানি না ভালোবাসা দিয়ে পারব ভোলাতে। হৃদয় সব চেয়ে বড় জায়গা। হৃদয়ের দিগন্ত নেই। বললেন রামকৃষ্ণ : 'পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তার চেয়ে বড়, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পদে স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সাধুর হৃদয়মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ।'

তাই ভগবানকে যে হৃদয়ে এনে বসিয়েছে, মাথায় নয়, তার কথাই লোকে শোনে। যে শোনে সেও যে হৃদয়াসীন। উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ : 'জ্ঞানীর আমার হলেই হল। তিনি অল্পসার। আর যারা প্রেমী তারা ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, আবার কেউ দশজনকে খাওয়ায়। ঝুড়ি কোদাল পাতকুয়ো খোঁড়বার সময় আনা হয়, কেউ কাজ হয়ে গেলে ঝুড়ি কোদাল কুয়োতেই ফেলে দেয়, কেউ আবার পরের দরকারের জন্যে তুলে রাখে।'

জ্ঞান নির্বিচল থাকে, ভক্তি-ভালোবাসা ঢুকলে তোলপাড় হয়ে যায়। অপূর্ব দুটি উপমা দিয়ে বোঝালেন রামকৃষ্ণ : 'জ্ঞানী যেন কামারশালার লোহা, হাতুড়ি পিটছে, তবু নির্বিকার। আর ভক্তি যেন কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করার মত। কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। ভাবহস্তীও তেমনি। শরীরকে সুস্থ থাকতে দেয় না। বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যাবার সময় কিছু বোঝা যায় না। খানিক পরে দেখা যায়, কিনারার উপর জল ধপাস-ধপাস করছে—হয়তো কিনারার খানিকটা মাটি ভেঙেই পড়ে গেল জলে।'

এই দেহ তো তোমাকে দেখবার জন্যে। বাহুপাশে তোমাকে ধরবার জন্যে। যতদিন তুমি না আস ততদিন তোমার নামমন্ত্র গুঞ্জরণ করবার জন্যে। আমার উপাসনা অর্থ তোমার কাছে বসা। আমার উপবাস মানে তোমার কাছে থাকা। আমার উপরতি মানে তোমাকে স্পর্শ করা। কিন্তু তুমি যদি আমার মধ্যে এসে ধরা দাও তবে এ মাটির শরীর রেখে কী হবে? ভাবহস্তী এসে ঢুকলে কুঁড়েঘরকে সামলানো যাবে না।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পাবার জন্যেই সাধনা। আপনাকে আপনার ভেতর দেখতে পেলে তো সব হয়ে গেল। ঐ সাধনার জন্যেই শরীর। মাটির ছাঁচ ততক্ষণ দরকার যতক্ষণ না সোনার প্রতিমা ঢালাই করে নেওয়া হয়। ঢালাই কাজ হয়ে গেলে কারিকর মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙে ফেলতেও পারে।'

বলে আরেকটি অভিনব উপমা দিলেন। কত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, কি তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ! 'কবরেজ মকরধ্বজ তৈরি করবার সময় বোতলের চারদিকে মাটি দিয়ে আগুনে ফেলে রাখে। বোতলের ভেতরের সোনা আগুনের ঝাঁজে অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজ হয়। তখন কবরেজ বোতলটি আগুন থেকে তুলে নিয়ে ভেঙে ফেলে মকরধ্বজ বার করে নেয়। তখন বোতল থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি। ভগবানের লাভের পর শরীর থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি।'

কিন্তু যতদিন তোমাকে না পাই ততদিন দেহবৃক্ষমূলে বসে হাততালি দিয়ে পাপ-পক্ষী তাড়াতে থাকি। 'তাঁর নামগুণকীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহ-বৃক্ষে পাপ-পাখি—তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছের উপরের পাখি সব পালায় তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণগানে চলে যায়।' ততদিন বীণা করি এই দেহকে। গভীরের যে গুঞ্জনটি মৃদু-মৃদু

শুনতে পাচ্ছি তাকে সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত করি। এই দেহকেই পুঁথি করে প্রতি রক্তবিন্দুতে শ্রীহরির মহিমা লিখি। সেই যে এক সাধু প্রকাণ্ড এক পুঁথি নিয়ে প্রত্যহ পড়ত প্রত্যেক পৃষ্ঠা, প্রথম থেকে শেষ—প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু এক কথা, ওঁ রাম লেখা—তার মত। তেমনি রক্তের প্রতিটি রণনে তোমারই গুণঝংকার।

তারপর প্রেমভরে এই দেহ যদি একদিন ছোঁও, তখন কি আর বোধ থাকবে স্পর্শের মধ্যে কোনটি আমার আর কোনটি তোমার দেহ! নুনের পুতুল হয়ে গলে যাব সমুদ্রের মধ্যে। চার বন্ধুর গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'চার বন্ধু বেড়াতে-বেড়াতে পাঁচিল-ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলে। খুব উঁচু পাঁচিল। ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে সকলে বড় উৎসুক হল। পাঁচিল বেয়ে উঠল একজন। উঁকি মেরে যা দেখল তাতে অবাক হয়ে হাহাহাহা বলে ভিতরে পড়ে গেল। আর কোনো খবর দিল না। যে-ই ওঠে সে-ই হাহাহাহা করে পড়ে যায়। তখন খবর আর কে দেবে!'

একেই বলে মনের নাশ হওয়া। মনের লয় হলেই ব্রহ্ম। দেহকে শাসন করা যায় কিন্তু মন দুঃশাসন। সময় বা স্থানের ব্যবধান মানে না, সমুদ্র-পর্বত কিছুই তার বাধা নয়, তাকে বশে আনা সুদুষ্কর। শুধু আসে আর যায়, দিনেরাতে নানা রূপ ধরে। কখনো সিংহ কখনো কীট। মনের এই যাওয়া-আসা বন্ধ করার জন্যই সাধন। বললেন রামকৃষ্ণ: 'মন কতক দিল্লী কতক ঢাকা কতক কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করে পরমাত্মাতে স্থির করতে হবে। ষোলো আনা মন তাঁকে দিলে তবে তাঁকে পাবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার উপায় নেই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তা হলে আর খবর পৌঁছুবে না।'

শুধু একটু ফুটো? হায়, টেলিগ্রাফের তারই এখনো খাটানো হয়নি। বেতারে যে খবর নেব এ জীবন নয় সেই নিখুঁত বেতারযন্ত্র। জীবনের জল কেবল হেলছে-দুলছে, তোমার স্থির প্রতিবিম্বটি আর দেখতে পাই না। তাই তো বাসনাগুলো একে-একে ভোগ করে নিয়ে ছুঁড়ে দাও বাসন। পান হয়ে গিয়েছে কি হবে আর পীত-পাত্রে? বাসনা কি, কত তো দেখলাম। এখন নির্বাসনা কি একবার দেখি।

ভোগ করতে-করতে ভোগ ছাড়তে-ছাড়তেই আমার যোগ হবে। কী অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'বাসনাগুলো ভোগ হয়ে গেলেই আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে। আবার সেই যোগের অবস্থা। সটকা কল জানো? বাঁশ নুইয়ে তাতে সুতো বেঁধে বঁড়শি লাগিয়ে রাখে। আর সেই বঁড়শিতে টোপ গাঁথে। মাছ যেই সেই টোপ খায়, বাঁশটাও অমনি সড়াৎ করে আগের মত উঁচু হয়ে উঠে পড়ে। মাছ ধরে সেই সটকা কল দিয়ে। বাঁশ সোজা থাকবার কথা, তবে নোয়ানো হয়েছে কেন? মাছ ধরবে বলে। বাসনা হচ্ছে মাছ। তাই মন নোয়ানো হয়েছে সংসারে। বাসনা না থাকলে মনের সহজেই ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয় ঈশ্বরের দিকে।'

বাসনা যখন শান্ত হয়ে আসে, জল যখন স্থির হয়, স্বচ্ছ বা সরল হয়,

ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই স্থির হওয়া শান্ত হওয়ার জন্যেই যোগ। সেই স্থির হওয়াটিকেই বোঝাচ্ছেন নানা উপমা দিয়ে।

'দীপশিখা দেখনি? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল। সংসার-হাওয়া মন-রূপ দীপকে চঞ্চল করেছে। যোগাবস্থা দীপশিখার মত, সেখানে হাওয়া নেই তাই কম্পনও নেই।'

তারপর কটি ঘরোয়া ছবি, নিপুণ শিল্পীর রচনা: 'মেয়েদের ভেতর যদি কেউ অবাক হয়ে কোনো কিছু দেখে বা শোনে, তখন অন্য মেয়েরা তাকে বলে, কি লো তোর ভাব লেগেছে নাকি? বায়ু স্থির হওয়াতেই সে অমনি অবাক হয়ে হাঁ করে থাকে। তেমনি বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় মানুষ বাকশূন্যে হয়। তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। একজন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় খবর পেলে যে অমুকে লোকটা মারা গেছে। সে লোকটা যদি আপনার কেউ না হয় তা হলে সে ঝাঁটও দিচ্ছে আবার মুখে বলছে, আহা, খুব ভালো লোক ছিল! আর যদি সে লোকটা আপনার কেউ হয় তাহলে খবর শোনামাত্র তার হাত থেকে ঝাঁটা পড়ে যায়, আর সে এঁ্যা বলে বসে পড়ে। মুখে আর কোনো কথা নেই। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে। কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না।'

তেমনি তুমি আমাকে স্থির করে দাও। যাতে বুঝতে পারি তুমি নিরন্তর হয়ে আছ, নিরন্তরাল হয়ে। তৈলধারার মত আমার ধ্যান। অমৃতধারার মত তোমার আবির্ভাব।

আমার যুক্ত হয়ে মুক্তি হওয়া। তাই তো আমি ভক্ত। ফুলের মুক্তি ফলে। আর ফলের মুক্তি? ফলের মুক্তি তখনি যখন সে রসে আর বর্ণে নিটোল হয়েছে, যখন ভরপুর হয়েছে গন্ধে আর মধুরতায়। সব মিলে ফলের যেটি প্রকাশ, সেটি আনন্দের প্রকাশ। আমিও তোমাকে, সেই আনন্দময়কেই প্রকাশ করব।

৪১

কিন্তু যোগ করবে কি সিদ্ধাই দেখাবার জন্যে? ব্যায়াম বা ম্যাজিক দেখিয়ে অর্থোপার্জনের জন্যে? হায়, শুধু অষ্ট সিদ্ধি নিয়ে করবে কি, সর্বসিদ্ধির জন্যে যোগ। একটি বিস্ময়কর গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ: 'দুই ভাই। বড় ভাই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। ছোটটি লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে বিয়ে-থা করে সংসার করছে। সন্ন্যাসীদের রীতি আছে, বারো বছর অন্তে ইচ্ছে করলে একবার দেশে ফিরতে পারে। তাই বারো বছর পর বড় ভাই বাড়ি এসেছে। দাদাকে দেখে ছোট ভাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। আহারান্তে কথাপ্রসঙ্গে ছোট ভাই বড় ভাইকে প্রশ্ন করলে, দাদা, এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি জ্ঞান লাভ করলে আমাকে বলো। দাদা বললে, দেখবি? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। মন্ত্রবলে জলের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে এপার হতে

ওপার চলে গেল। আবার ফিরে এল ওপার থেকে এপারে। গর্বভরে বললে, দেখলি? অল্প একটু হাসল ছোট ভাই। বললে, দাদা, কি দেখলুম! আমি খেয়ার নৌকোর মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে ঐ নদী পারাপার হই। তা তুমি বারো বছর এত কষ্ট করে এই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো হলো মোটে আধ পয়সা!'

বারো বছরের তপস্যা ছার হয়ে গেল। ভোজবাজি দেখাবার জন্যেই কি কুম্ভক-প্রাণায়াম? সংসারে আছি বহু কর্মের আহবানে, ও-সব ব্যায়াম করবার সময় কোথায়, স্নায়ু কোথায়? ভগবান কাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, সে কাজের থেকে পালালে রেহাই পাব কেন? অকর্মা হয়ে কি নৈষ্কর্ম্য পাব? কাজ করব না তো কি? দিবারাত্রি ভগবান কত কাজ করছেন চোখের সমুখে! সূর্য আলো দিচ্ছে, বাতাস জীবন দিচ্ছে, মাটি ফসল ফলাচ্ছে। ঈশ্বরই বা এত কাজ করছেন কেন? শুধু অহেতুক ভালোবাসার অজস্রতায়। কী তাঁর প্রয়োজন ছিল এত অনন্ত অকার্পণ্যের? একেই বলে ভালোবাসা। যে আমাদের এত ভালোবাসে তার প্রতি আমাদের কোনো প্রেমের দায় নেই? আছে। সেই দায়েই আমরা কাজ করব। এই কাজের মধ্যে দান করব নিজেদের। সেবা দিয়ে উৎসর্গ দিয়ে আত্মনিবেদন দিয়ে কর্ম আমাদের প্রেমকেই প্রকাশ করবে।

তোমাকে ভালোবাসি এ শুধু মুখের কথায় বলে-বলে কি তৃপ্তি পাব? তোমার জন্যে কাজ করে যাব, দিয়ে যাব এ জীবন!

সব কিছু তুমি একা-একা সৃষ্টি করেছ। কিছু একটি সৃষ্টি আমাতে-তোমাতে যুক্ত হয়ে করতে হবে। সেটি আমার সংসার। একা-একা স্বর্গ তৈরি করার তোমার সাধ্য নেই। তখন ডাক পড়েছে আমাকে। কেননা স্বর্গ তো এই সংসারে। গেরুয়ার পতাকা-ওড়ানো মঠে-মন্দিরে নয়।

যে মা-বাপ নরদেহে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সে তো সংসারে। যে শিশুর স্বভাব ঈশ্বরের স্বভাব সেও সংসারের উপহার।

'কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালোবাসো বলো দেখি? ভাইপোকে? বেশ তো, তার জন্যে যা কিছু করবে, খাওয়ানো-পরানো সব গোপাল ভেবে কোরো। যেন গোপালরূপী ভগবান তারই ভেতরে রয়েছেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্ছ-পরাচ্ছ সেবা করছ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মানুষের করছি ভাববে কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।'

রামকৃষ্ণ মহত্তম গৃহী। সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহীকে বৃহত্তম সম্মান দিয়েছেন।

'তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা! যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে তার বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।'

কী শক্তিশালী উপমা! বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে। সন্ন্যাসীরা তো নির্ঝঞ্ঝাট। ছেলে মানুষ করতে হয় না, মেয়ের বিয়ে দিতে হয় না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয় না প্রাণান্ত। শোক নেই দারিদ্র্য নেই অপমানের ভয়

নেই। গায়ে ফু দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কী সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন, অনেক ব্যাঘাত। তা তোমাদের বলতে হবে হবে না। রোগ-শোক দারিদ্র্য, আবার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদাই অমিল, ছেলে মূর্খ গোঁয়ার অবাধ্য। নানা গোল, ওদিকে যাবি ঝাঁটা ফেলে মারবো, এদিকে যাবি জুতো ফেলে মারবো—'

এই অবস্থায় যোগস্থ হওয়া! এ কি চারটিখানি কথা? তার পরেই গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ: 'নারদ ভাবল তার মত ভক্ত নেই আর ত্রিসংসারে। তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন ভগবান। বললেন, অমুক জায়গায় অমুক লোক আছে। সে আমাকে খুব ভক্তি করে। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারো। তখুনি নারদ হাজির হল সেখানে—দেখি কেমন ভক্তির চেহারা! ওমা, সামান্য একটা চাষা, ভোরে ঘুম থেকে উঠে একবার মাত্র হরি নাম উচ্চারণ করে লাঙল নিয়ে মাঠে যায় আর দিনমান চাষ করে। রাত হলে শুতে যায়, আবার শোবার আগে আরেকবার হরি আওড়ায়। এই ভক্ত? সারাদিন সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরনধারণ কিছুই নেই কোথাও। এ আবার কেমনধারা ভক্ত? ভগবানের কাছে ফিরে গেল নারদ। চাষার সম্বন্ধে উপহাস করলে। ভগবান তখন নারদের হাতে এক বাটি তেল দিলেন। বললেন, এই তেলের বাটিটা হাতে করে আমার বাড়ির চারদিকে ঘুরে এস। দেখো, সাবধান, এক ফোঁটা তেলও যেন না পড়ে। তথাস্তু। তেলের বাটি হাতে করে নারদ ঘুরে এল। ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, বাটি নিয়ে ঘোরবার সময় কবার আমার নাম করেছিলে? একবারও না। বললে নারদ। কি করে করি? কানায়-কানায় ভরতি তেলের বাটির দিকে তাকাব না আপনার নাম করব? তবেই দেখতে পাচ্ছ, বললেন ভগবান, তুমি হেন যে নারদ, তোমাকে এই এক সামান্য তেলের বাটি ঈশ্বরবিস্মৃত করে দিয়েছে। আর গরিব ওই চাষা, কত বড় সংসার কত বড় তেলের বাটি বহন করছে মাথায় করে। তবু অন্তত দুবার আমার নাম করে প্রত্যহ।'

সন্ন্যাসী তো আছে প্রত্যয়ের শান্তিতে। সংসারী সংশয়ের ঘা খাচ্ছে আবার বিশ্বাসে এসে নিশ্বাস ফেলছে। যে নিরাশ্রয় করছে তাকেই আবার ধরছে আশ্রয়স্বরূপ বলে। যাকে দেখে ভয় পাবার কথা তাকেই দেখতে চাচ্ছে মধুর বলে।

এই সংসারী লোকের ব্রত কি? ব্রত সহিষ্ণুতা।' একটি অপূর্ব মন্ত্রের মত করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'স, স, স।'

'বর্ণের মধ্যে তিনটি স কেন? শ ষ স। শুধু এই কথা বলবার জন্যে,—তিন সত্য বলার মত করে—স স স। সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। যার সহ্য করবার শক্তি নেই কোনো সাধনাই তার সফল হবার নয়।' বলে ছন্দ দুলিয়ে দিলেন: 'যে সয় সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।'

শ ষ স—তার পরে কী? তার পরে হ। যে সহ্য করে সে-ই হয়, মানুষ হয়। যে মানুষ দেবতার চেয়েও বড়। সেই সহিষ্ণুতা, সেই তন্ময়তাই তো ধ্যান। গল্প

বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। তার ফাতনা যখন নড়ছে, সে তখন টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় পথ-চলতি কে এক লোক তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, মশাই, বাঁড়ুযোদের বাড়িটা কোন্ দিকে বলে দিতে পারেন ? কোনো উত্তর নেই। ও মশাই, শুনছেন ? বলুন না। তবুও মাছধরা লোকের হুঁস নেই। হাত কাঁপছে, শুধু ফাতনার দিকে দৃষ্টি। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে—মাছটাকে টান মেরে ডাঙায় তুললে। ও মশাই, শুনুন-শুনুন—চীৎকার করে পথিককে ডাকতে লাগল। অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল পথিক। কেন, আবার ডাকাডাকি কেন ? তখন মাছ-ধরা লোক জিজ্ঞেস করলে, তখন আপনি আমাকে কী বলছিলেন ? পথিক তো চটে আগুন ! তখন অতবার করে জিজ্ঞেস করলুম—আর এখন বলছেন, কী বলছিলেন ? মাছ-ধরা লোকে বললে, ভাই, তখন যে ফাতনা ডুবছিল।'

৪২

চাই এই নিবিড় একাগ্রতা, উদ্দাম আগ্রহ। ধ্যানে বসা, মানে রামকৃষ্ণের ভাষায়, 'যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়ল।'

'আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা—'

সংসারে থাকতে গেলে কখনো উঁচু কখনো নিচু। কখনো ঈশ্বর-চিন্তা, হরিনাম করে, কখনো বা কামিনীকাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। 'যেমন সাধারণ মাছি,' উপমা বুনলেন রামকৃষ্ণ : 'কখনো সন্দেশে বসছে, কখনো বা পচা ঘায়ে।'

কিন্তু ভক্তি যদি আসে তখন উন্মাদ। এই উন্মাদ ভক্তির অপরূপ বর্ণনা দিলেন, 'যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদ-বিধি মানে না। দুর্বা তোলে তো বাছে না। যা হাতে আসে তাই লয়। তুলসী তোলে, পড়-পড় করে ডাল ভাঙে। ভক্তি-নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল—'

তারপর, 'মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা কে চায় !'

কিন্তু সংসার কি থাকতে দেয় স্ববশে ? 'পাখি এই হয় তো একটু দাঁড়ে বসে রাম নাম করছে, বনে উড়ে গেলেই আবার ক্যাঁ-ক্যাঁ শুরু করবে।' এই আছে হয়তো একটু ভালো মনে আবার পরক্ষণেই হয়তো 'কাজলের ঘরে'র কালি লাগিয়ে বসল। সদসৎ বিচার করবে কজন ? কোথায় সেই জ্ঞানী সংসারী ! জ্ঞানী সংসারীর সুন্দর বর্ণনা দিলেন রামকৃষ্ণ। 'কি রকম জানো ? যেন শার্সির ঘরে কেউ আছে। ভিতর-বার দুইই দেখতে পায়।'

মায়ার ভেলকিতে ভোলে না এমন জ্ঞানী সংসারী দু-একজন। জোরদার ভাষায় গ্রাম্য উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'আঁতুড়ঘরের ধুলহাঁড়ির খোলা যে পায়ে পরে তার বাজিকরের ড্যাম-ড্যাম শব্দের ভেল্কি লাগে না। বাজিকর কী করছে সে ঠিক দেখতে পায়।'

কিন্তু আসল কথা কি, বিষয়চিন্তাই সংসারীযোগীকে যোগভ্রষ্ট করে। অভিনব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'ও দেশে দেয়ালে গর্তের ভেতর নেউলগুলো বেশ আরামে থাকে। কেউ-কেউ ল্যাজে ইঁট বেঁধে দেয়, তখন ইঁটের ভারে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভেতরে গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে, ততবারই ইঁটের ভারে এসে পড়ে বাইরে। বিষয়চিন্তা এমনি।'

এই বিকার কাটবে কি করে? শুধু ভক্তিতে। ব্যাকুলতায়। বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতায়। নতুন কথায় গল্প গাঁথলেন রামকৃষ্ণ: 'ভক্ত বিল্বমঙ্গল রোজ বেশ্যালয়ে যায়। একদিন বাড়িতে বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ, বেশ্যালয়ে যেতে অনেক রাত হয়েছে। তা হোক; রাজ্যের খাবার নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে। ছুটছে দিশেহারার মত। বেশ্যার উপর মন এত একাগ্র, কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছু হুঁস নেই। যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেই পথে চোখ বুজে ধ্যান করছে এক যোগী। তার উপর দিয়ে, গায়ে পা দিয়েই চলে যাচ্ছে। যোগী রেগে উঠল। আমি ঈশ্বর-চিন্তা করছি, আর তুই কিনা আমায় মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস? কানা নাকি? তখন বিল্বমঙ্গল বললে, আমায় মাপ করবেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি? বেশ্যাকে চিন্তা করে আমার তো কোনো হুঁস নেই, কিন্তু আপনি ঈশ্বরচিন্তা করছেন, আপনার তো দেখছি বাইরের সব হুঁসই রয়েছে। এ কি রকম ঈশ্বরচিন্তা? বিল্বমঙ্গল শেষে বেশ্যাকে গুরু বলে ঈশ্বরলাভের জন্যে সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আর বেশ্যাকে বলেছিল, কি করে ঈশ্বর অনুরাগ করতে হয় তা তুমিই আমায় শিখিয়েছ।'

দাও এই নির্বিচল সম্মুখগতি, দাও চক্ষুহীন উন্মুখতা। পথকে অপ্রতিবন্ধ করে দাও। যদি বাধা পড়ে সে-বাধা অনতিক্রম্য করো না। বাধার মধ্যে যে বেদনা সে বেদনা প্রেরণার মত আমার গায়ে লাগুক। আমার উৎসাহকে নিরলস করো। যে ছিল দুর্বল সে আজ তোমার স্পর্শে দুর্জয় হয়ে উঠুক। যাকে এতদিন প্রলুব্ধ করেছ তাকে এবার প্রবুদ্ধ করো। আমার যাত্রা ভূমা পর্যন্ত, তাই আমার পথও অপরিসীম। আমার পথ-চলাতেই আনন্দ। তুমি তো শুধু ইতিতে নও, গতিতেও। শুধু তো প্রাপ্তিতে নও, পথেও। তুমি যে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছ এই জন্যেই তো পথ আমার বাঁশী। রথের রথী হও তুমি, আমি পথের পন্থী হব।

গণিকাকে মা বলেছিল বিল্বমঙ্গল। যাকে দেখেছিল ভোগবতীরূপে তাকেই আবার দেখল ভগবতীরূপে।

অবধূতের কাছে পিঙ্গলাও গুরু। জনকের রাজত্বের বেশ্যা এই পিঙ্গলা। লোকের আশায় সারারাত ঘর-বার করছে। কেউই নেই, কেউই আসবে না। হতাশ হয়ে ঘুমুতে গেল শেষরাত্রে। নিকটেই অবধূত ছিলেন, বলে উঠলেন পিঙ্গলাকে উদ্দেশ করে, তুমি সমস্ত আশা ত্যাগ করে সুখে নিদ্রিত হয়েছ, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার গুরু।

দাও আমাকে এই আশারাহিত্য। তোমার যদি আসা নেই, আমারও আশা

নেই। আমার তো উত্তরণ নয়, আমার যাত্রা। আমার তো পৌঁছুনো নয়, আমার শুধু চলা।

তেমনি গুরু কুমারী। গুরু কুমারীর কঙ্কণ। কুমারীর কাছ থেকে শিখবে সঙ্গরাহিত্য। তার কঙ্কণের কাছ থেকে একচারিতা। এক কুমারীর হাতে কয়েকগাছি কঙ্কণ। ধান কুটছে কুমারী আর কঙ্কনের শব্দ হচ্ছে। বাইরের লোক শুনতে পাচ্ছে সে কঙ্কণের আওয়াজ। উন্মনা হয়ে উসখুস করছে। বুঝতে পেরেছে কুমারী। হাতে দু-গাছি করে রেখে বাকি চুড়ি খুলে ফেলল। তবুও মৃদু-মৃদু শব্দ হচ্ছে। শেষে একগাছি করে রেখে বাকি গাছিও খুলে ফেলল। তখন আর শব্দ নেই। পথিকও নেই বাইরে।

এই কুমারীর হাতের একক কঙ্কণ হও। একা-একা থাকো। পুরুষসিংহ হও। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সিংহ একলা থাকতে একলা বেড়াতে ভালোবাসে।'

অবধূতের চব্বিশ গুরু। তার মধ্যে এক হচ্ছে চিল। বাসনাত্যাগের গুরু। চিলের মুখে যতক্ষণ মাছ থাকে ততক্ষণ অন্য পাখিরা তাকে তাড়া করে। যেই মাছ ফেলে দেয় অমনি নিশ্চিন্ত। কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'এখন মাছ কাছে নেই, নিশ্চিন্ত হলুম।'

'অবধূতের আরেক গুরু মৌমাছি। মৌমাছি সঞ্চয় করে ভোগ করে না। আর একজন এসে তার চাক ভেঙে নিয়ে যায়। মধুকরের কাছ থেকে শেখ এই মাধুকরী। সঞ্চয়েই সন্ন্যাসীর নাশ।

'কিন্তু সংসারীর পক্ষে নয়।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'পাখির ছানা হলে সঞ্চয় করে। ছানার জন্যে মুখে করে খাবার আনে। কিন্তু বড় হলে ঠোঁটের খোঁচা মেরে তাড়িয়ে দেয় বাসা থেকে। নিজে-নিজে উড়ে-উড়ে খা গে।'

কিন্তু প্রথমা গুরু হচ্ছে পৃথিবী। সে শেখায় ক্ষমা। সহিষ্ণুতা।

'গুরু সকলেই হতে চায়, শিষ্য হতে কে চায়?'

সেই এক গল্প আছে, গুরুর কাছে একজন চেলা হতে গিয়েছিল। বললে, আমাকে চেলা বানিয়ে নাও। তুমি কি পারবে চেলা হতে? চেলা হতে হলে জল তুলতে হয়, কাঠ কাটতে হয়, সেবা করতে হয়—এসব কি তুমি পারবে? আজ্ঞে গুরুর কী করতে হয়? গুরুর আর কী করতে হবে? তিনি বসে থাকেন, কখনো-সখনো একটু-আধটু উপদেশ দেন, এই আর কি। বেশ তো, লোকটা তখন বললে, চেলা বনা যদি কষ্ট হয়, আমাকে গুরু করে নিন না।

'যে লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাশ চাই।' বলেই একটা সুন্দর উপমা দিলেন: 'অপরকে বধ করবার জন্যে ঢাল-তরোয়াল চাই। আপনাকে বধ করবার জন্যে একটি ছুঁচ বা নরুন হলেই যথেষ্ট।'

একটি নাম বা একটি স্বপ্ন নিয়ে নিজে বিভোর থাকতে পারি কিন্তু অন্যকে দলে টানতে গেলে অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। বাক্য দিয়ে যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, বাক্যই আবার তাঁর বিভূতি। অকথনীয়ের সীমা নেই, কিন্তু কথারই বা কি শেষ আছে? আর কথা ছাড়াই বা অকথনীয়ের আভাস আনি কি করে?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'গুরু যেন সেখো।'

নমসাকে নিয়ে এলেন একেবারে বয়স্য করে। বললেন, যেন হাত ধরে নিয়ে যায়। ভগবান দর্শন হলে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। তাই গুরু জনক শিষ্য শুকদেবকে বললেন, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান একবার হয়ে গেলে গুরু-শিষ্য ভেদ-বুদ্ধি থাকবে না।'

মানুষ গুরুমন্ত্র দেয় কানে, জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। কানের মন্ত্র অনেক শুনেছি। এখন প্রাণের মন্ত্র দাও। গভীর মাটিতে নিচে প্রসুপ্ত আছে জলধারা। মন্ত্র হবে সেই মাটির মধ্যে ছিদ্র, যে-ছিদ্র দিয়ে উদ্রিক্ত হবে প্রস্রবণ।

৪৩

'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না। নদীরই হিল্লোল, হিল্লোলের কি নদী?'

আবার এই কথাটাই বললেন অন্য বিন্যাসে: 'ভগবান আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই ওঁর হাতে পড়েছি।'

সমস্তই তাঁর, সমস্তই তিনি। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই কথাটাই বোঝালেন আবার অন্য উপমায়। শক্তিশালী উপমা: 'সেই কামার, সেই বলি, সেই হাঁড়িকাঠ।'

এবার সর্বভূতে নারায়ণের গল্পটি শোনো। মাহুত-নারায়ণের গল্প: 'গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন, সর্বভূতে নারায়ণ। শিষ্যও তাই বুঝলে। একদিন পথের মধ্যে এক হাতির সঙ্গে দেখা। উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্য ভাবলে, সরব কেন? সবই তো নারায়ণ। সে সরল না, হাতি শুঁড়ে করে দূরে তাকে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। হাড়গোড় সব ভেঙে গেল শিষ্যের। সুস্থ হয়ে এল সে গুরুর কাছে, সমস্ত জানালে আদ্যোপান্ত। গুরু বললেন, ভালো বলেছ! তুমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, কিন্তু মাহুত কি? সে নারায়ণ নয়? হাতি যে চালাচ্ছিল সেই মাহুতরূপী নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিলেন। বলো, বলেছিলেন কিনা? তুমি মাহুত-নারায়ণের কথা শুনলে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।'

সদসৎ বিচারের নাম বিবেচক। বিবেক এই মাহুতরূপী নারায়ণ। বিবেকের কথাই যে শুনতে হবে, আর কোনো কথা নয়—এ কথা বোঝবার জন্যে এমন সারালো গল্প বাংলা ভাষায় আর দুটি নেই। এই বিবেক-মাহুতের হাতেই ডাঙশ। তাই আবার উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে ডাঙশ মারে।'

সুখের রাজপথ দিয়ে গজেন্দ্রগমনে চলে যাব এ আকাঙ্ক্ষা আমার নয়। তুমি ডাঙশ মারো। তুমি দুঃখ দাও। দৈন্যে-দুর্দিনে ফেলে রাখো। মুখের কাছে

পূর্ণ পাত্র তুলে নিমেষে শূন্যমাত্র করে ফেল। ঘাটে এনে ভরাডুবি করো। কেনই বা না-করবে? আমরা তো নিষ্কণ্টক সুখের পথে যাত্রা করিনি। আমরা যাত্রা করেছি মঙ্গলের পথে। আমাদের তো দেবতা বানাতে চাওনি, মানুষ বানাতে চেয়েছ। তাই আমরা চলেছি ধৈর্যের পথে, বীর্যের পথে, মাধুর্যের পথে। যে মাধুর্য অশ্রুজল দিয়ে তৈরি। দেবতারা কি কাঁদে?

ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব কেমন সহজ কথায় বোঝালেন রামকৃষ্ণ: 'শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ। কিন্তু সকল জল কি খাওয়া যায়? কোনো জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোনো জলে পা ধোয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা চলে। কিন্তু মুখ ধোয়া, খাওয়া, ঠাকুর পুজো চলে না। তেমনি সর্বত্র ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় যাওয়া যায়, আবার কোনো জায়গায় দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়।' দূরে থেকে গড় করে পালাতে হয়—এইটিই হচ্ছে রামকৃষ্ণের ভাষার তুলিতে ছবি আঁকা।

ঈশ্বর যে আবার বুদ্ধিরূপে বিরাজমান। তাই সদসৎ নিত্যানিত্য বিচার দরকার। তা না হলে মানুষ কেন? এই বিচারের জন্যে বিবেককে ডাকো। জাগাও তোমার সেই অংকুশধারী মাহুতকে। গজকুম্ভে আঘাত নাও, নইলে গজমুক্তা পাবে কি করে? সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা, তেমনি বিবেকের সঙ্গে একটু বৈরাগ্য মেশাও। বিচারের সঙ্গে একটু অনাসক্তি। বললেন রামকৃষ্ণ: 'বিবেকবৈরাগ্য নির্মলি। সংসারী জীবের মন ঘোলা হয়ে আছে বটে, কিন্তু তাতে নির্মলি দিলে আবার পরিষ্কার হতে পারে।'

বিবেকের আর এক নাম জল-ছাঁকা। বললেন, 'জল-ছাঁকা দিয়ে ছেঁকে নিলে ময়লাটা একদিকে পড়ে, ভালো জল আরেক দিকে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। সেই হবে বিদ্যার সংসার।'

কিন্তু কী সংসারই পেতেছি আমরা! রামকৃষ্ণের কথায়, 'সব দেখছি কলায়ের ডালের খদ্দের।'

আবার বললেন, 'বিয়ে করে নদের হাট বসিয়ে আর হাট তোলবার জো নেই।'

বাগান বাঁচাবার জন্যে বেড়া দিয়েছিলাম এখন বেড়াই বাগান খাচ্ছে। মাঠের চারধারে আল বেঁধেছিলাম, আলের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জল। শোনো রামকৃষ্ণের গল্প: 'একজন তার ক্ষেতে জল ছেঁচছে। সমস্ত দিন জল ছেঁচে সন্ধ্যার সময় মনে করলে, একবার দেখি কতটা জমি ভিজল। এসে দেখে একটা আলের মধ্যে একটা গর্ত দিয়ে বেরিয়ে গেছে সব জল। এক ছটাক জমিও ভেজেনি।'

এই গর্তই হচ্ছে বিষয়বুদ্ধির গর্ত। বিষয়েই বিষিয়ে গেল সব মানসবারি। 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর'। এই হল চাতকের কান্না। স্বাতী-নক্ষত্রের জল ছাড়া সব ধুলো। ঈশ্বরের কৃপা-বারি ছাড়া নিষ্ফল জীবনের মাঠ-ঘাট। কোথায় বা পাব ফসল কোথায় বা মিটবে পিপাসা।

'জয়পুরের গোবিন্দজীর পূজারীরা প্রথম-প্রথম বিয়ে করেনি। তখন খুব

তেজস্বী ছিল। রাজা ডেকে পাঠালেন তো গেল না। বললে, রাজাকে আসতে বলো। তারপর, রাজা আর পাঁচজনে ধরে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হুড়োহুড়ি। আর ডাকতে হয় না কাউকে। নিজে-নিজেই উপস্থিত। মহারাজ, আশীর্বাদ করতে এসেছি, নির্মাল্য, এনেছি, ধারণ করুন। কাজে-কাজেই আসতে হয়, আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ ছেলের হাতে খড়ি—এই সব।'

কাম-কাঞ্চনেই যদি ডুবে থাকব তবে তোমাকে দেখব কখন। তুমি যে বাসনার মধ্যে সোনা। তুমি রাম-কাঞ্চন।

'কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রবে থাকলে কোনো কালেও তাদের ঈশ্বরলাভ হবে না।' বলেই সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না। কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই।'

কাজলের ঘরে থেকে কালি লাগার কথা বলেছেন আগে, কিন্তু সে-সঙ্গে এও বললেন, 'ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না।'

পাপ স্পর্শ করতে পারে না আত্মাকে। শরীরে রোগ হয়, বলি আমার অসুখ। আসলে অসুখ আমার নয়, অসুখ শরীরের। তাই রামকৃষ্ণ যখন কাশী-পুরের বাগানে ব্যাধির কঠোর কবলে কষ্ট পাচ্ছেন তখন তিনি বলে উঠলেন, শুধু সাধকের উক্তিতে নয়, সুধাস্যন্দী কবির কবিতায় : 'দুঃখ জানে শরীর জানে মন তুমি আনন্দে থাকো।'

আমার মনের আনন্দ কে হরণ করে ? বাইরে আমি নিষ্কিঞ্চন, কিন্তু অন্তরে আমি রাজ্যেশ্বর। বাইরে আমি আঘাতে জর্জর কিন্তু অন্তরে আমার অগাধ শান্তি। যা কিছু বোঝাপড়া দুঃখ আর শরীরের মধ্যে, মন, তুমি অসম্পৃক্ত। মন, তুমি অনাবিল। মন, তুমি অনাময়!

'বালিশ ও তার খোল—দেহী আর দেহ।' আবার বললেন অন্য ভাবে, 'দেহটি আবরণ, লণ্ঠনের মধ্যে আলো জ্বলছে।' -

দেহ থাকতে কর্মত্যাগের উপায় নেই। রাকরুষ্ণের উপমায় : 'পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।'

দেহকে কষ্ট দিও না। তোমার বীণাযন্ত্রটিকে যত্ন করে বাঁচাও। ধুলো থেকে তুলে রাখো। যখন যাবার যাবে, কিন্তু যতক্ষণ বাজাবার, ততক্ষণ বাজাতে হবে তো। কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'তবে দেহের যত্ন করি কেন ? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব, তার জন্যে।'

আমার তনুমালা নামমালা হয়ে উঠুক। যতদিন তা না হয়, ততদিন বসে-বসে মন-মালা ফেরাই।

কামিনীকে ত্যাগ করো, দামিনীকে নয়। ভোগিনীকে ত্যাগ করো, যোগিনীকে নয়। তামসীর মধ্যে তাপসীকে উদ্বুদ্ধ করো। লোভিনীর মাঝে প্রতিষ্ঠিত করো শোভিনীকে। বিদ্যার সংসারে বিদ্যমান থাকো। যে স্ত্রী বৃহতের দিকে নিয়ে যায় মহতের দিকে নিয়ে যায়, সে-ই বিদ্যা। সে জগদ্ভাসিনী জগদ্ধাত্রী, তাকেই অভিষেক করো প্রত্যেক নারীদেহে। রমণীর মধ্যে জননীকে দেখ।

রামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদামণি যখন জিজ্ঞেস করলেন রামকৃষ্ণকে, আমি তোমার কে, তখন কী অপরূপ বললেন রামকৃষ্ণ!

বললেন, তুমি আমার আনন্দময়ী!

একেবারে কবির মত বললেন।

অনেক গদ্যময় সংকীর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন একটি বিশ্ব-ব্যাপিনী অভিধা। তুমি আমার আনন্দময়ী। জীবনে আনন্দের নীহারকণাই হোক বা নির্ঝরিণীই হোক, তুমিই তার দিব্য প্রতিমা। তুমিই তার ব্যাখ্যাস্বরূপা সরস্বতী। অমিতা, অপরাজিতা। সর্বমন্ত্রময়ী দীপ্ত চেতনা।

আবার রমণী, রতির মা-র বেশেও দেখা দিলেন মহামায়া। তেমনি ম্যাথর রসিকের মধ্যে দেখলেন সচ্চিদানন্দকে। বলছেন রামকৃষ্ণ, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা, ঐখানে থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোলা মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষট্চক্র।'

কবি চণ্ডীদাস মানুষকে সবার উপরে সত্য বলেছেন। কবি রামকৃষ্ণও তাই বললেন বটে, কিন্তু অনেক চমকপ্রদ ব্যঞ্জনায়: 'প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর মানুষে হবে না? শালগ্রাম হতেও বড়ো মানুষ। নরনারায়ণ।'

ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়ুদার নয়। তাই জনে-জনে প্রত্যেককে রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের শিরোপা দিলেন। যে পতিত-ব্যথিত, অধম-অধন তাকেও। বললেন, এমন কথা কোথাও আর কেউ বলেছে কিনা জানি না, 'সাধুরূপে নারায়ণ, ডাকাতরূপে নারায়ণ, জলরূপে নারায়ণ, খলরূপে নারায়ণ, লুচ্চোরূপে নারায়ণ—'

ডাকাতিটাই তার দেখছ প্রকটরূপে, দেখছ না হয়তো সে কত পরোপকারী, কত মাতৃভক্ত। ছলনাটাই দেখছ, দেখছ না হয়তো তার কত সত্যরূপ। বিচ্যুতিটাই দেখছ, দেখছ না কত সংগ্রামে কত বার তার কঠিন চিত্তদমন। সুতরাং, যখন কিছুই জানো না, প্রণাম করো। অসহিষ্ণু হোয়ো না। মরুপ্রান্তরেই মিলবে নির্জন নীরধারা।

শুধু কামিনীই নয়, আছে আবার টাকার টঙ্কার। কিন্তু কত তুমি জাঁক করবে? তোমার আকাঙ্ক্ষার চেয়েও আরেকজনের প্রাপ্তি বড়। তোমার নাগালের চেয়েও আরেকজনের গ্রাস বড়ো। ভেবো না তুমিই এক মস্ত ধনী। মস্ত জ্ঞানী। মস্ত সাধু। তোমার চেয়েও ঢের-ঢের বড়লোক আছে, জ্ঞানী-গুণী আছে, ভক্ত-

সন্ত আছে। কবির ভাষায় সুন্দর বর্ণনা করলেন রামকৃষ্ণ :

'সন্ধ্যার পর জোনাকিরা মনে করে, আমা হতেই জগৎ আলো পাচ্ছে। তারপর যাই তারা ফুটল জোনাকিরা ম্লান হয়ে গেল। তখন তারাগুলো ভাবলে আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর চাঁদ উঠল আকাশে। নিমেষে তারাগুলো ম্লান হয়ে গেল লজ্জায়। চাঁদ মনে করল আমারই জয়-জয়কার, আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল। সূর্য উঠলে কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি!'

এবার এক গল্প শোনো রামকৃষ্ণের : 'এক ফকির বনে কুটির করে থাকে, বড় ইচ্ছে অতিথিসৎকার করে। তখন আকবর শা দিল্লির বাদশা। ফকির ভাবলে, টাকা-কড়ি না হলে কেমন করে অতিথিসৎকার করি। তাই একবার যাই আকবর শা'র কাছে। বাদশার কাছে সাধু-ফকিরের অবারিত দ্বার। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসল। দেখলে আকবর শা নমাজের শেষে বলছেন, হে আল্লা, ধন দাও, দৌলত দাও, আরও কত কি! এই শুনে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করল ফকির। আকবর শা ইশারা করে বসতে বললেন। নমাজ শেষ হলে বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এসে বসলেন, আবার চলে যাচ্ছেন কেন? ফকির বললে, সে আর মহারাজের শুনে কাজ নেই। আমি চললুম। বাদশা অনেক জেদ করাতে ফকির বললে, আমার ওখানে অনেকে আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে এসেছিলাম আপনার কাছে। তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? জিজ্ঞেস করলো আকবর শা। ফকির বললে, যখন দেখলুম আপনিও ধন দৌলতের ভিখারী, তখন মনে করলুম ভিখিরীর কাছে চেয়ে আর কী হবে? চাইতে হয় তো আল্লার কাছে চাইব।'

চাইতে হয় তো তোমার কাছেই চাইব। কিন্তু তোমার কাছে চাইতে বসে কি তুমি-ছাড়া আর কিছুতে মন উঠবে? কাঞ্চনের খনির কাছে কেন আমি কাঁচ কামনা করব? যদি ভালোবাসতেই হয় তুমি ছাড়া আর আমার ভালোবাসবার কে আছে? রাজার বেটা হয়ে কোটাল-কোটাল খেলব না।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক রাজার চার বেটা। কিন্তু খেলা করছে, কেউ মন্ত্রী কেউ পাত্র কেউ মিত্র কেউ কোটাল। রাজার বেটা হয়ে কোটাল-কোটাল খেলছে।'

আমরা অমৃতের সন্তান হয়ে কেন অনৃত নিয়ে খেলব? হৃদয়ে যদি সুবাস আসে ভালোবাসার, সে খবর পাঠিয়ে দেব বাতাসে। সে সুঘ্রাণ যদি একবার টের পাও তুমি, থাকতে পারবে কি স্থির হয়ে? কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ : 'গন্ধ পেয়ে "গম্ভীর" জল থেকে মাছ আসবে।'

তুমি আমার গম্ভীর, আমার অগাধ। তুমি গহন-নিবিড়, তুমি দুরবগাহ। কিন্তু যতই তুমি অতলস্পর্শ হও, যে মুহূর্তে আমি সরল হব সে মুহূর্তেই তুমি তরলীকৃত হয়ে যাবে। হয়ে উঠবে সুধারস। ফুলের মধ্যে গোপন গন্ধটির মত যে মুহূর্তে পাবে তুমি আমার হৃদয়ের প্রেমমধু, সে মুহূর্তেই তুমি অনন্ত হয়েও একান্ত হয়ে উঠবে আমার।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'অনুরাগের লক্ষণ দেখলেই ঠিক বলতে পারা যায় ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নেই।'

সুন্দর একটি রেখাচিত্র আঁকলেন : 'বাবু খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখে ঠিক ঠাহর করা যায়। প্রথমে বনজঙ্গল কাটা হয়, ঝুল ঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। তারপর বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড়গুড়ি এইসব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এইসব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না বাবু এই এসে পড়লেন বলে।'

কিন্তু যদি দুঃখ আসে, অপমান আসে, অকৃতার্থতা আসে—তা হলেও কি তুমিই আসছ না? তাই তো বলি, প্রেমকে একবার আনো। যদি প্রেম আসে, তবে কিসের বা দুঃখ কিসের বা ব্যর্থতা? কিন্তু প্রেম হওয়া কি সহজ? বললেন রামকৃষ্ণ : 'চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তারপর আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম। প্রেমে কোমল, নরম হয়ে যায়। প্রেম কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন। প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে।'

এই প্রেমের কথাটিই আবার বলছেন রসের মাধ্যমে : 'যত রস জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে। প্রথম আকের রস—তারপর গুড়—তারপর দোলো—তারপর চিনি—তারপর মিছরি, ওলা এইসব। ক্রমে-ক্রমে আরো রেফাইন হচ্ছে। কিন্তু খোলা নামবে কখন? তার মানে সাধন কবে শেষ হবে? যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে।'

খালি জ্বলো, খালি জ্বাল দাও। কেবল এগোও। মনের চোর-কুঠুরিতে গিয়ে প্রবেশ করো। ভক্তি যার পাকা হয়ে গেছে তার ভক্তসঙ্গও আর দরকার হয় না। বরং কখনো-কখনো ভালোই লাগে না ভক্তকে। এ ভাবটির জন্যেও রামকৃষ্ণের উপমা আছে : 'পংখের কাজের উপরে চুনকাম ফেটে যায়।'

অর্থাৎ, যার অন্তরে-বাইরে ভগবান, সর্বত্র যার ব্রহ্মস্বাদ, তার আবার কী প্রয়োজন সাধুসঙ্গের, কী প্রয়োজন সাধন-ভজনের? কিন্তু রামকৃষ্ণ কী? কী কবিত্বময় করে বললেন কথাটি : 'আমি ভক্তের রেণুর রেণু।'

৪৫

এমন করে কে আর কবে বলেছে! আমি তোমার পথের ধুলোর ধুলো। আমি তোমার ছিন্ন মালার বাসিফুলের পাপড়ি। তোমার চকিত-চাওয়ার একটি ক্ষণিক দৃষ্টি-কণা।

রামকৃষ্ণ বললেন, তোমার আপনার কেবল একজন।

আমার একতারার সেই একটিমাত্র তার। আমার কাননের সেই একটিমাত্র ফুল। আমার ঘরের অন্ধকারে সেই একটিমাত্র দীপ। আমার ভোরের আকাশে

সেই একমাত্র শুকতারা। শুকতারা না সুখ-তারা!

যখন আলো নিবে যায় তখন তোমাকে অন্তরে দেখি, আর যখন আলো জ্বলে তখন দেখি বাহিরে-প্রান্তরে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়।'

ধু-ধু করছে মাঠ, দিগন্তকে যেখানে ছোঁয়-ছোঁয় রেখা সেখানে ধূসর হয়ে গেছে। কোথাও একটি বৃক্ষের বাধা নেই। মানুষের সংকীর্ণবাসের প্রাচীর কোথাও উদ্ধত হয়ে দাঁড়ায়নি। অব্যাহত, অবিঘিত মাঠ। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে, চারদিক দেখতে-দেখতে মনে হয়, বুকটা খুব বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গেছে আলিঙ্গনের পরিসর। মনে হবে সকলকে যেন দু হাত বাড়িয়ে-জড়িয়ে ধরতে পারি বুকের মধ্যে। যেন বুকে করে রাখলেও বুকের ব্যথা হবে না কোনো দিন। যেন ছুটতে পারি দিগন্তকে ধরতে। আর, এইটিই তো ঈশ্বরীয় ভাব!

'আমায় বেলঘোরে মতি শীলের ঝিলে গাড়ি করে নিয়ে যাবে?' শুধোলেন রামকৃষ্ণ: 'সেখানে মুড়ি ফেলে দাও, মাছ সব এসে মুড়ি খাবে। আহা! মাছ-গুলি ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে, দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে।'

কী সুন্দর উপমা! সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে। যেন ভক্তির সমুদ্রে উঠছে কতগুলো বিশ্বাসের বুদ্বুদ! পুকুরের মাছ হয়ে হাঁড়িতে এসে বাসা নিয়েছি। হাঁড়ি ছেড়ে কবে আবার পুকুরে যাব? রামকৃষ্ণ বললেন, 'শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।'

তেমনি প্রতিমা দেখলে মনে হয় ভগবতী। যদি মাটির মূর্তিতে তোমাকে দেখি তবে হাড়-মাংসের মূর্তিতেই বা তোমাকে দেখব না কেন? সার তাই তো সর্বজীবে শিবদর্শন। তাই তো তীর্থে-মন্দিরে যাই এই উদ্দীপনাটুকুর আশায়। তাই তো সমুদ্রে যাই পাহাড়ে যাই এই বিরাটের সঙ্গস্পর্শের আভাস পেতে। তাই তো প্রেমপবিত্র সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে থাকি সেই অমল-কোমল অনুভূতির আস্বাদটি জাগবে বলে।

কিন্তু সংসারশৃংখলে বাঁধা পড়ে আছি। বেরুতে পারি না শিকল কেটে। কোথায় বা মন্দির, কোথায় বা তীর্থ! কত দূরে সেই নীলকান্ত সমুদ্র, কত দূরে বা শ্যামকান্ত পাহাড়। মনশ্চিত্রে নেই, সব মানচিত্রে আছে। নাই বা বেরুতে পারলুম! আমার চোখের সামনে ভোরবেলাটি তো আছে, আছে তো আমার মধ্যরাত্রির অনিদ্রা। আছে তো বাদলের বেদনার দিন, আছে তো দক্ষিণের সুদাক্ষিণ হাওয়া! আছে তো শিশুর কলকণ্ঠ। আছে তো মা'র ব্যথাভরা কথাহারা স্নেহচক্ষু। এই ঘরে বসেই আমার হবে। খুব বেশি চাই, ঘরের জানালাটি খুলে দিলেই হবে। অনুভব করব এই দেহমন ভূমানন্দে ভরে গিয়েছে।

কত সহজ করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে-যেতে দেখে, কতগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে

হয়েছিল ঐ কাঠে শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাঁট হয়। অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে। যখন গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছে ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেই দেখা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হল।'

কেন শিশিরশুভ্র ফুলটি দেখে তোমার প্রেমমুখচ্ছবি মনে পড়বে না? কেন বিহঙ্গের গান শুনে ভাবব না তোমার কণ্ঠস্বর? আমারই মনোবীণায় তোমারই বনবাণী! ফুল-পাখি না পাই, আমার আকাশের তারা ক'টি তো আছে। এমন দেশ তো কোথাও নেই যেখানে আকাশ নেই। আকাশের দূরে ক'টি তারা দেখে কেন ভাবব না এ তোমারই অতন্দ্র ইশারা! আকাশ যদি বা মেঘে মুছে যায়, আমার রুদ্ধ কক্ষের অন্ধকারটি তো আছে। আছে তো আমার রুদ্ধ বক্ষের শূন্যতা। তোমার উদ্দীপনা পেতে কোথায় আমাকে যেতে হবে কোন্ উদ্দেশে। আমার ঘরেই তো তোমার আনাগোনা। আমার দিন-রাত্রেই তো তোমার হাসি-অশ্রুর টানা-পোড়েন।

আমি যদি তোমাকে ভুলে থাকি, তাতে তোমার ভয় নেই। কেননা তুমি অপেক্ষা করতে জানো, তোমার প্রেম অফুরন্ত, ক্ষমা অফুরন্ত। তুমি যদি আমাকে ভুলে থাকো, তাতে আমারও ভয় নেই। কেননা আমি জানি তুমি নিমেষের তরেও ভুলতে পারো না আমাকে। আমি বন্ধ কুঁড়ি খুলি আর না খুলি তোমার অকৃপণ বসন্তবায়ু বন্ধ হবে না। আমি বন্ধ জানালা খুলি আর না খুলি তোমার তারা-ফোটানো তারা-ছড়ানোর খেলা চলবে সারা রাত, রাতের পর রাত। আমি যতই দূর-পথে ঘুর-পথে চলে যাই না কেন, তুমি আছ একেবারে কাছে-কাছে। আমার কাছেই দূর, তোমার কাছে দ্বারপ্রান্ত।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখি—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজো হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া।'

এ কি একটি কাব্যাশ্রিত বর্ণনা নয়? বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! প্রকৃতির যা কিছু শোভাশ্রী সব ঐ বিরাটের পুজোপকরণ। তেমনি কবে আমার প্রাণ বিরাটের পুজোর পুষ্পার্ঘ্য হবে? কবে ফুটবে তাতে শোভা, কবে জাগবে তাতে গন্ধ, কবে ছিন্ন করতে পারব তাকে কাম-কণ্টকের বৃন্ত থেকে?

যার ভিতর যেটুকু শক্তি সেটুকু ঐ বিরাটেরই আত্মপ্রকাশ। যেমন আধার তেমনি ওজন। যেমন কাঁচ তেমনি প্রতিবিম্ব। রামকৃষ্ণ বললেন, 'সব সেই একই পুলি, কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর বা কলায়ের ডালের।'

সবই সেই ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য। সদরালা জজকে বলছেন রামকৃষ্ণ: 'আপনি জজ, তা বেশ। এটি জানবেন ঈশ্বরের শক্তি। বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। ছাদের জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় সিংহটাই বুঝি মুখ দিয়ে জল বার করছে। কিন্তু দেখ তো কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ, জল বেরুচ্ছে সিংহের মুখ দিয়ে।'

শুধু অভিমান। অহংকারের ঝঙ্কার। আমিই ডিক্রি ডিসমিস করলুম।

ঠুকে দিলুম সাত বচ্ছর। হয়তো রায় গেল উলটে, আসামী খালাস হয়ে গেল। কার কর্ম কে করে! সিংহের মুখের জল হয়তো চলে গেল নর্দমা দিয়ে।

কিন্তু সেই তাঁতি কী বলেছিল? গল্প বললেন রামকৃষ্ণ: 'এক তাঁতি থাকে এক গাঁয়ে। বড় ধার্মিক। হাটে গিয়ে কাপড় বেচে। যা দাম ধরে বা মুনাফা নেয় সব রামের ইচ্ছেয়। একদিন, রাত হয়েছে, ঘুম হচ্ছে না বলে বসে-বসে তামাক খাচ্ছে তাঁতি। একদল ডাকাত যাচ্ছে ডাকাতি করতে। মাল বইবার একটা মুটে দরকার। এই, তুই চল আমাদের সঙ্গে। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল তাঁতিকে। তারপর এক গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে ডাকাতি করলে। তাঁতি মোট মাথায় নিয়ে চলেছে, পুলিশে ধরলে। আর সব ডাকাতরা পালিয়ে গেল। তাঁতি চালান হল বিচারের জন্যে। গাঁয়ের লোক হাকিমকে এসে বললে, হুজুর, এ লোক কখনো ডাকাতি করতে পারে না। কেন, কি হয়েছে? তাঁতিকে জিজ্ঞেস করলে হাকিম।

তাঁতি বললে, হুজুর, রামের ইচ্ছে, রাত্রে ভাত খেলুম। রামের ইচ্ছে, বসে আছি চণ্ডীমণ্ডপে; রামের ইচ্ছে, তামাক খাচ্ছি আর নাম করছি; রামের ইচ্ছে, একদল ডাকাত এসে উপস্থিত। রামের ইচ্ছে, তারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল; রামের ইচ্ছে, ডাকাতি করলে গৃহস্থবাড়িতে। রামের ইচ্ছে, আমার মাথায় মোট দিলে; রামের ইচ্ছে, পুলিশ এসে পড়ল আচমকা। রামের ইচ্ছে, আমি ধরা পড়লুম, রামের ইচ্ছে, আমাকে হাজতে ঠেললে। আজ সকালে, রামের ইচ্ছে, হুজুরের কাছে নিয়ে এসেছে আমাকে।

তাঁতিকে ছেড়ে দিল হাকিম। রাস্তায় নেমে গ্রামবাসীদের বললে তাঁতি, 'রামের ইচ্ছে, আমাকে ছেড়ে দিলে।'

যা কিছু হচ্ছে ঘটছে সব তাঁর ইচ্ছে। শুধু রোদটুকু হলেই চলে না, চাই বৃষ্টিবিন্দু। ধান গাছ যে বাঁচবে, জল চাই। প্রাণ যে বাঁচবে দুঃখ চাই। যিনি তুষের মধ্যে তণ্ডুল আনছেন তিনিই ঢালছেন বর্ষা-বন্যা। জীবনে অশ্রুর বাদল আনছেন আনন্দের নীলকান্ত আকাশটি ফোটাবার জন্যে। এক ছত্র দুঃখ এক ছত্র সুখ—এমনি ছন্দে বেজে চলেছে সৃষ্টির কবিতা, এক ছত্র আঘাত এক ছত্র উপশম এক ছত্র বা রিক্ততা এক ছত্র বা ঐশ্বর্য—কিন্তু সব মিলিয়ে হল কি? সব মিলিয়ে কল্যাণ। সব মিলিয়ে শিব।

সর্বত্রই যেন তোমার প্রসন্ন স্থিতিটি দেখতে পাই, তোমার শাশ্বতী স্থিতি। তুমি যখন রুদ্র হয়ে ভয়ংকর হয়ে দেখা দাও, তখনো সেটাও যে তোমার মঙ্গলমূর্তি তা যেন বুঝতে পারি। তোমার আগুনের ইন্ধন আমাদের পাপ, তবে সে আগুনকে অবাঞ্ছনীয় বলব কেন? সে আগুন পবিত্রতা নিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে ক্ষতশান্তির অনাময়। আমার যে শোক, সে তো তোমার শুচিস্পর্শ, তবে কেন তাকে আস্বাদনীয় বলব না? কেন দুঃখকে এড়িয়ে বেড়াব? আমি তো তোমার সংসারে সুখী হতে আসিনি, আমি বড়ো হতে এসেছি। না ছাড়লে না হারালে বড়ো হবো কি করে?

তাই সর্বদা রামের ইচ্ছে। আমার জীবন-সংসারে আমার ইচ্ছেই কাজ করছে এমনি একটা অহংকারের বিকারে আচ্ছন্ন আছি। সূচীমুখে ঘা মেরে-মেরে বোঝাও যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনটি হল না। আবার এক চাকা ছেড়ে আরেক চাকায় পাক দিই। আবার দেখি,মনের মত ঘোরে না। চাকা ঘোরে তো গাড়ি চলে না। আবার ঠেলাঠেলি শুরু করি। শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে আমার ইচ্ছাটি তোমার করতলে তুলে দিই। বলি, তোমার ইচ্ছে। আমার ইচ্ছাটি তোমার ইচ্ছার সঙ্গে এসে মেশে। আমার ইচ্ছা যখন তোমার ইচ্ছার সঙ্গে এসে মিশল তখনই তো প্রেম। সর্বত্র রামের ইচ্ছে, তার মানেই তো সর্বত্র প্রেমের রমণীয়তা।

৪৬

এই ভাবটিই আবার অন্য কথায় বলেছেন : 'উকিল বলে, আমি যা বলবার বলেছি, এখন হাকিমের হাত।'

যা কর্তব্য দিয়েছ করেছি, এখন তার ফলাফল তোমার হাতে। আমি শুধু মাটি কোপাতে পারি, ফল ফলাবার ভারটি তোমার উপরে। বাইরে তুমি ফল না দাও অন্তরে দাও সন্তোষের সরসতা। তোমার দেওয়া কাজটুকু আমি করেছি বীরের মত, এই তপস্যার তৃপ্তি। অহরহ অন্তরে বসে তুমি আমার এই তপস্যাটুকু দেখেছ এই আমার পুরস্কার। তুমি যদি আমাকে কিছু না-ও দাও, তবু তা তোমার হাতের পুরস্কার হয়েই থাকবে।

যা আমার করবার কাজ, তা তুমিই দিয়েছ করতে, তুমিই তা বুঝে নাও। ফাঁকি দিয়ে আর যাকে ঠকাই তোমাকে ঠকাতে পারব না। তোমাকে ঠকাতে গেলে শুধু নিজেকেই ঠকানো হবে, আনন্দের ভাগে কম পড়ে যাবে আমার। কর্মই তো আমার পূজা, কর্মের মধ্যে দিয়েই তো আমার আত্মনিবেদন। যে মুহূর্তে ভাবি এ কর্ম তোমারই নির্বাচন, তখনই কর্মকে ভার মনে হয় না, মনে হয় ছুটির দিনের গন্ধভরা মন-পবনের খেলা। মালা কণ্ঠে ভার হয়ে ওঠে-যদি তা শুধু জয়ৈশ্বর্যই বহন করে : যদি তাতে প্রেমের স্পর্শ লাগে তখনই সে মালা বরমালা। আমার কর্মে তোমার প্রেমের স্পর্শ লাগুক। যতই শৃঙ্খল থাক সে কর্মে তোমার প্রেমের স্পর্শে তাতে গান ঝরুক, যেন তারে বাঁধা বীণাযন্ত্র। বন্ধনের ক্রন্দনে আনন্দের স্পন্দন।

এমনি করে জীবনের জানালাটি খুলে রাখো যেন তাঁর দক্ষিণ-সমীরটি গায়ে লাগে। বললেন রামকৃষ্ণ, 'মলয় পর্বতের হাওয়া লাগলে সব গাছ চন্দন হয়।'

আমাকে চন্দন করো। অকারণে আনন্দে আমি যেন তোমার সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে পারি। সেই সুগন্ধই তো তোমার জয়ধ্বনি। তুমি যে আছ তা যেন লোকে বুঝতে পারে আমার এই আনন্দের সংস্পর্শে, এই সুগন্ধের সংবাদে। চন্দন দেখে লোকে যেন মলয়-হাওয়ার খবর নেয়। ফলভারনত লতার নম্রতায় লোকে যেন

বুঝতে পারে তোমার রসের শ্রাবণ-উৎসবের কথা। আমার হৃৎস্পন্দনে বাজে যেন নক্ষত্রের প্রাণযাত্রা। আমি যেন তোমারই ঠিকানাটি বহন করে বেড়াই। পাখি দেখে কলম্বস যেমন মনে করেছিল মানুষ আছে, তেমনি আমাকে দেখে অন্ধ-পথযাত্রীরা যেন বিশ্বাস করে তুমি আছ।

আমি যেন হই তোমার ডাকহরকরা। জনে-জনে আমি যেন তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াই। তোমারই স্পর্শের ঢেউয়ে ভেসে-ভেসে বেড়াই তট ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, তোমার ডাক মাঠ-ভরা, ঘর-ভরা, আকাশ-ভরা। সেই ডাকটি যেমন জেগেছে ফুলের রঙে পাখির কাকলীতে জলের কলস্বরে তেমনি আমার বেঁচে থাকায়। আমি তো একা-একা বাঁচি না, সবাইকে নিয়ে বাঁচি। তাই সবাইকে নিয়েই তোমার কাছে আসি। আমার তোমাকে নিয়ে সবার কাছে গিয়ে হাজির হই। তোমাকে ধরেই সব। আবার, সবকে ধরেই তুমি। তাই রামকৃষ্ণ বললেন সুন্দর করে, 'সেইখানে সন্তোষ করলে সকলেই সন্তুষ্ট।'

কিন্তু কী করে তোমাকে সন্তুষ্ট করি? আমার কী আছে যা দেখে তুমি আকৃষ্ট হবে? আমার কি ধন আছে না ধ্যান আছে? আমার কি ভজন আছে না ভক্তি আছে? সাধন কি আমার সাধ্য? কোথায় পাব আমি বিশ্বাসব্যাকুলতা, কোথায় বা বিবেক-বৈরাগ্য? আমার থাকার মধ্যে আছে এক কর্ম, যাতে তুমি কৃপা করে নিযুক্ত করেছ আমাকে। তোমার সঙ্গে যোগ নেই তাই বলে অভিযোগও নেই। কাজ দিয়েছ, হোক তা অগণ্য, হোক তা নগণ্য, তাই করে যাব আপন মনে, ফলাফল বিচার না করে। কাজ করে-করে ক্লান্ত হব। ক্লান্ত হয়েই খুশি করব তোমাকে। ক্লান্ত হলেই তুমি আমাকে ধরবে। তোমার সে স্পর্শ ক্ষান্তি-ভরা শান্তি-ভরা। তোমার সে স্পর্শ মার্জনামধুর।

তোমাকে কাছে টানবার আমার আর কোন উপায় নেই। শুধু এই কর্মক্লান্তি। শুধু এই ক্লেশগ্লানি। কর্মেই আমার গতিমুক্তি। না ছুটলে ক্লান্ত হব কি করে? ক্লান্ত না হলে তো তুমি ধরবে না, করবে না ক্লেশ-মোচন। তাই শিখার মধ্য দিয়ে আগুন যেমন ছোটে তেমনি করে ছুটব, তারপরে একদিন নামবে তোমার করুণার ধারাশ্রাবণ। নদীর মধ্য দিয়ে স্রোত যেমন ছোটে তেমনি করে ছুটবে, তারপরে একদিন জাগবে তোমার স্নেহ-সঞ্চিত শ্যামল মৃত্তিকা।

কর্ম-নদীই প্রীতি-প্রবাহিনী। ছুটতে-ছুটতে ছুঁয়ে যাব সবাইকে, ধুয়ে যাব সবাইকে। নিযুক্ত থেকে সংযুক্ত হব সবার সঙ্গে। নিয়োগে তোমাকে না বুঝি, যেন বুঝি সংযোগে। শ্রম না বুঝি, বুঝি যেন বিশ্রামে।

তুমি বায়ু, আর আমি বায়ু-ভরে ওড়া একটি পাখি—এমনি অনুভব করতে দাও। তুমি জল, আর আমি অগাধসঞ্চারী মাছ—এমনি দাও আমাকে একটি আপন-বোধের আবেষ্টন। তুমি শুধু আমার গানের নীলাকাশ নও, আমার স্নানের সরোবর, পানের নির্ঝরধারা। নিজের আচ্ছাদনটি যেমন নিজের সঙ্গে সহজ হয়ে আছে তুমি তেমনি হয়ে থাকো। যেমন হাড়কে জড়িয়ে আছে মাংস, মাংসকে চামড়া, তেমনি। হয়ে থাকো ঘুমের মধ্যে নির্ভুল নিশ্বাসের মত। তুমি সাধনার

ধন এ কে না জানে ! তুমি একবার বিনা-সাধনার ধন হও। তুমি অনন্ত এ কে না জানে ! তুমি একবার আমার একান্ত হও।

মণির মধ্যে যে আলোটি সহজ হয়ে আছে স্নিগ্ধ হয়ে আছে তুমি তেমনি করে অনুস্যূত হও। তোমাকে ধরতে পারি এমন সাধ্য কি ! তোমাকে শুধু দেখি। তুমি আমার পরশ-মণি না হও, দরশ-মণি হও। বললেন রামকৃষ্ণ, 'ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায় সে মণির আলো। মণির আলো উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পোড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয় আনন্দ হয়।'

তুমি উজ্জ্বল, এর মধ্যে বাহাদুরি কী। তুমি উজ্জ্বল হয়েও শীতল, এইখানেই তুমি তুলনাহীন। তাই তো রামকৃষ্ণ বললেন, জ্ঞানে কতদূর যাবি, ভক্তিতে চলে যায়। জ্ঞান বড় প্রখর, সইবে না তার প্রদীপ্তি। ভক্তি বড় পেলব, সুধাননা বধূটির মত। নির্জন মাঠে অশ্রুসিক্ত জ্যোৎস্নারাত্রি। মন্ত্রের মত বললেন রামকৃষ্ণ : 'জ্ঞান সূর্য, ভক্তি চন্দ্র।'

পরিব্যাপী অর্থকে সহজ একটি উক্তিতে সংহত করলেন। জ্ঞান হলে তো নিজেকে প্রধান ভেবে স্পর্ধা—রামকৃষ্ণের ভাষায় জ্ঞানী যেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে'—আর ভক্তি হলে, প্রেম হলে নিজেকে অধম ভেবে পরিতৃপ্তি। আমি যদি না দীন হই তুমি দীনবন্ধু হও কি করে ? আমি যদি না ধুলোয় গড়াগড়ি দিই, তবে কি করে তোমার কোলে উঠি !

'নিচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়।' সুন্দর উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'চাতক পাখির বাসা নিচে, কিন্তু ওঠে উঁচুয়।'

তাই তো বলি, আমি নিজে না আনত হই তুমি আমাকে প্রণত করে দাও। আমার সমস্ত জীবন একটি নমস্কারে ভরে উঠুক। যেন পথহারা বৈশাখের মেঘের মত নিরুদ্দেশ হয়ে না উড়ে যায়, শ্রাবণের স্থির মেঘের মত যেন জলে ভরে ওঠে। যেন বর্ণের বিদ্যুৎ খেলিয়ে ফুল হয়েই না ঝরে পড়ে, যেন পর্যাপ্ত ও পরিণত ফলের মত রসে ভরে ওঠে। সেই জলে আর রসে শুধু সেই নমস্কারের নম্রতা। জীবনে সেই নমস্কারের নম্রতাটিই তোমার প্রসাদ-সুধা, তোমার প্রসাদ-পরিমল।

'কলঙ্ক সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়।' বললেন তাই রামকৃষ্ণ। কী করে লাগবে ! সে সাগর তো আর অহঙ্কারের সাগর নয়, নমস্কারের সাগর।

ভগবান কিছুই নেন না, কেবল দিয়েই যাচ্ছেন। যেখানে দান সেইখানেই তো ঐশ্বর্য। আমরা কেবল নেবার জন্যে হাত বাড়াই, আর সে নেওয়াও শুধু নিজের জন্যে নেওয়া। নিয়ে-নিয়ে ঘর ভরে গিয়েছে, কিন্তু চেয়েও দেখি না যা জমিয়েছি এত দিন তা শুধু শ্মশানের ভস্মমুষ্টি।

কাউকেই কিছু দিইনি। জনে-জনে কাকেই বা কী দেব কিছুই জানি না। শুধু তোমাকে একটি জিনিস দিই আজ। তোমাকে দিলেই সকলকে দেওয়া হবে। সেটি আমার নমস্কার।

'ওরে তারে কেউ চিনলি না রে।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'সে পাগলের বেশে, দীনহীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে।'

এটিই তো ভগবানের নিরুপাধি মাধুর্য-বিগ্রহ। ঐশ্বর্য চমৎকৃত করে, মাধুর্য করে আকর্ষণ। রাজ্যেশ্বর যখন কাঙালের বেশ ধরে তখন তাকে মধুরবন্ধু বলে মনে হয়। যদি কেউ তখন তাকে দোর খুলে ভিতরে ডেকে আশ্রয় দেয় দয়া করে।

৪৭

জ্ঞানীর কাছে মায়া, ভক্তের কাছে মহামায়া। ভক্তের জন্যে একটি মূর্তি চাই, ভাব চাই, মমতা চাই। হনুমানের চাই সীতারাম, যশোদার চাই গোপাল, গোপিনীদের চাই রাখাল-রাজা। রুক্মিণীকৃষ্ণে হনুমানের মন ওঠে না, যশোদার দরকার নেই গোবিন্দ-নারায়ণে, পাগড়িপরা মথুরার রাজাকে মানে না গোপীরা—তাদের চাই পীতধড়া-মোহনচূড়াপরা। উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'কি রকম জানো ? যেমন বাড়ির বউ। দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই সম্বন্ধ !'

তাই, আবার বললেন রামকৃষ্ণ, 'জ্ঞানীর কাছে সংসার ধোঁকার টাটি, ভক্তের কাছে তা মজার কুঠি।'

ভক্তের জন্যে ভগবান ভাবের স্বভাব ধরেছেন। তিনি ভাবগ্রাহী। যদি তাঁকে ভাব করে ডাকা যায় তিনি জ্ঞানহীন ভাবেন না।

'যেমন ভাব তেমন লাভ।' এবার একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'একজন বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে, রাজা টাকা দেও, কাপড় দেও। বলতে বলতে তার জিভ তালুর মূলের কাছে উলটে গেল। অমনি কুম্ভক হয়ে গেল। আর কথা নেই, শব্দ নেই, স্পন্দন নেই। তখন সবাই ইটের কবর তৈরি করে তাকে সেই ভাবেই পুঁতে রাখল। হাজার বৎসর পর সেই কবর কে খুঁড়েছিল। তখন লোকে দেখে কে একজন সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। সবাই তাকে সাধু মনে করে পুজো করতে লাগল। এমন সময় নাড়া-চাড়া খেতে-খেতে জিভ সরে এল তালু থেকে। যেই চৈতন্য ফিরে এল, চীৎকার করে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ। রাজা টাকা দেও, কাপড় দেও।'

হায়, আমাদেরও কি তেমনি ভাবের অচিরদ্যুতি ? রামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন, 'যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে ?' মা'র কোলে নগন শিশুর মত খানিকক্ষণ বসে আবার আমাদের মোহ-আবরণ ? কুম্ভকের সমাধি কেটে যাবার পর আবার আমরা বাজিকরের মতই ভেলকির মুনাফা চাইব ? স্নান করে এসে আবার গড়াগড়ি দেব ধুলোয় ? একবার পরশমাণিক ছুঁয়ে সোনা হয়ে মাটির নিচে

গেলে কি আবার মাটি হয়ে যাব ?

আমাকে ভাব দাও। তোমার ভাবের সায়রে মৎস্য করো আমাকে। রঙ্গমঞ্চের যে তুমি সে জ্ঞানের তুমি, নেপথ্যের যে তুমি সে ভাবের তুমি। রঙ্গালয়ের নর্তকীকে যেন তার সাজঘরে ধরে ফেলেছি এবার। তুমি আমার রঙ্গমঞ্চের নর্তকী নও, সাজঘরের নর্তকী। তোমার সঙ্গে আমার ধামলীলা নয়, নিত্যলীলা। তুমি আমার সাধারণ প্রভাতটিতে, সাধারণ প্রাত্যহিকতায়, ক্লান্তিশেষের স্বাভাবিক ঘুমটুকুতে। সাজগোজ করে ঐশ্বর্যে আরূঢ় হবার আগেই তুমি ধরা পড়েছ। ধরা পড়েছ আমার দৈন্যে, আমার শূন্যতায়, আমার এ একাকিত্বে। তুমি তো পৃথক কিছু নও যে তোমাকে স্বতন্ত্র করে দেখব। মাটির নিচে জলধারার মত, বল্কলের নিচে রসধারার মত, ত্বকের নিচে রক্তধারার মত তুমি মিশে আছ, খণ্ড-খণ্ড গীতিকবিতার মধ্যে একটি অমেয় মহাকাব্য।

তুমিই সমস্ত মাল্যের গ্রন্থি, সমস্ত ব্যঞ্জনের নুন। তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙে রাঙিয়ে দাও। একটি অপূর্ব গল্প বললেন রামকৃষ্ণ। সাধকের জন্যে ভগবান যে নানা ভাবে নানা রূপে দেখা দেন তার কাহিনী: 'একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড়ে রঙ করাতে আসে। একজন বললে, আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই। তাকে তাই ছুপিয়ে দিলে রঙওয়ালা। তুমি ? আমি চাই নীল। এই নাও তোমার নীল রঙের কাপড়। আমি বেগনি, আমি হলদে, আমি সবুজ। যে যেমন চায় তার তেমনি রঙ। যার যেমন ছাঁচ তার তেমনি গড়ন। যার যেমন পুঁজি তার তেমন পসরা। একজন দূরে থেকে দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তার দিকে তাকিয়ে রঙওয়ালা বললে, কেমন হে, তোমার কী রঙে ছোপাতে হবে ? তখন সে লোকটি বললে, ভাই তুমি যে রঙে রঙেছ, আমাকে সেই রঙে রাঙিয়ে দাও।'

গভীর ব্যঞ্জনাভরা একটি আনন্দঘন কথা: আমাকে তোমার রঙে রঙিন করো। আমাকে তুমি-ময় করে দাও। জলের মধ্যে যেমন জল, তেমনি তোমার স্বভাবসমুদ্রে আমার স্বভাবটি ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, মিশিয়ে দাও। তুমি-আমি একীকৃত হয়ে যাই। ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি। যে জলে উৎপত্তি সেই জলেই লয়। বললেন রামকৃষ্ণ: 'তবু জলই সত্য। ভুড়ভুড়ি এই আছে এই নেই।'

নাই বা থাকল ভুড়ভুড়ি, তবু জল থাক। জলের মধ্যেই আছি আমি বুদ্বুদ। সাধ্য কি জল স্থির হয়ে থাকে ? জলকে যে খেলতে হবে, হেলতে-দুলতে হবে। তখন ভুড়ভুড়ি না ফুটিয়ে তার উপায় কি ? আমি ছাড়া তিনি হন কি করে ? ভক্ত নেই তো ভগবানও নেই। সেই ভাবটিই বললেন আবার কাব্য করে: 'চন্দ্র যেখানে তারাগণও সেখানে।'

কিন্তু আমরা তো শুদ্ধ জল নই, ঘটের মধ্যে জল। তাই জলের সঙ্গে জল হয়ে মিশতে পাচ্ছি না। ঘট আমাদের আবৃত, অবরুদ্ধ করে রাখছে। ঘট না ভেঙে ফেলা পর্যন্ত মুক্তি নেই, মিশ্রণ নেই। এই ঘট হচ্ছে অহঙ্কার। আর যে

মহাসমুদ্রের মধ্যে ঘটটি বসিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর, সেটা হচ্ছে কৃপার পয়োনিধি। অহঙ্কার যতক্ষণ না ত্যাগ হচ্ছে ততক্ষণ লাগছে না এই কৃপাস্পর্শ।

ঘরোয়া উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারি করা যায়, যতক্ষণ সে ভাঁড়ারে থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।'

তারপর বললেন সেই লক্ষ্মীনারায়ণের গল্প : 'বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, কোথা যাও ? নারায়ণ বললেন, আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। কতদূর গিয়ে ফের ফিরে এলেন নারায়ণ। এ কি, এত শিগগির ফিরলে যে ? জিজ্ঞেস করলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ বললেন, ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছিল, ভক্তটি পায়ে মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে লাঠি নিয়ে তাকে মারতে গিয়েছিল ধোপারা। তাই আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মী উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ফিরে এলে কেন ? নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইঁট তুলেছে দেখলাম।'

আমার হাতের ইঁট তুমি কেড়ে নাও। আমি যে তোমার শক্তিতে শক্তিমান এইটি বুঝতে দাও। তুমিই যে আমাকে সমস্ত পাপ সমস্ত দৌর্বল্য সমস্ত পীড়ন-পেষণ থেকে মুক্ত করবে দাও আমাকে সেই শরণাগতির দুর্গাশ্রয়। যার তুমি আছ তার আর কিসের ভয়, কিসের কাতরতা। তার সর্বত্র জয়-জ্যোতি।

৪৮

তাই শুধু জয় চাই তোমার কাছে। রূপং দেহি জয়ং দেহি বলে প্রার্থনা করি। তুমি যদি আমার আপনার লোক হও তবে চাইবই তো তোমার কাছে। আর দ্বিতীয় কে আছে তুমি ছাড়া ? তোমার কাছেই যে চাই তার একমাত্র কারণ তোমাকেই একান্ত বলে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি, তোমার অনন্ত ভাণ্ডার, ইচ্ছে করলেই তুমি দিতে পারো। প্রার্থনা পূর্ণ হলেই তো বুঝি আমার বিশ্বাসটি সত্য হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে ঠিক-ঠিক স্থির হয়েছে তাই দেখবার জন্যে তুমি কল্পতরু হও।

সকাম প্রার্থনাই সরল প্রার্থনা। সকাম না হলে নিষ্কাম হব কি করে ? সব ঘর না ঘুরলে ঘুঁটি পাকবে কোথায় ? তাই বললেন রামকৃষ্ণ : 'সকাম ভজন করতে-করতেই নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্যে তপস্যা করেছিলেন, ভগবানকে পেয়ে গেলেন।' বলেই একটি উপমা দিলেন : 'যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায় তা ছাড়বে কেন ?'

আমরাও কাঁচ কুড়িয়ে চলেছি। কিন্তু এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে কোথাও কি এক কণা সোনা লুকিয়ে নেই? আছে, কুড়ুতে-কুড়ুতে যদি মিলে যায়। কামনার আগুনে জ্বালাতে-জ্বালাতে যদি জ্বলে ওঠে প্রেমপ্রদীপ। যদি ক্লান্তির পর ক্ষমা মেলে! কাঁচ কুড়োচ্ছি বটে, কিন্তু লক্ষ্য, যদি একবিন্দু সোনা পাই। এই কথাটিই আবার বলেছেন অন্য ভাবে: 'যে শুধু পাখির চোখটি দেখতে পায়, সেই বিঁধতে পারে লক্ষ্য।'

পাখির পুচ্ছ দেখেই আমরা মজে আছি। গাছের পাতার আড়ালে চোখটি তার ঢাকা পড়েছে। পাতার আবরণ সরিয়ে স্থির করতে হবে চোখ। তার পরে লক্ষ্যভেদ। নাটকীয় ভাবে বললেন সেই লক্ষ্যভেদের কাহিনী: 'দ্রোণাচার্য জিজ্ঞেস করলেন অর্জুনকে, কি-কি দেখতে পাচ্ছ? এই রাজাদের চেহারা? অর্জুন বললে, না। আমাকে দেখতে পাচ্ছ? উত্তর হল, না। গাছ দেখতে পাচ্ছ? না। গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ? তাও না। তবে কি দেখতে পাচ্ছ? শুধু পাখির চোখ।'

একেই বলে বুদ্ধিমান। রামকৃষ্ণের ভাষায়: 'যে কেবল দেখে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু, সেই চতুর।'

তোমাকে ছাড়া আমার কী করে চলবে? তরু ছাড়া কি ফল থাকতে পারে? আকাশ ছাড়া কি বায়ু? মৃত্তিকা ছাড়া কি জল? রামকৃষ্ণ বললেন, 'তিনি ইঞ্জিনিয়র, আমি গাড়ি।' প্রাণ ছাড়া কি দেহ চলে, রশ্মি ছাড়া কি অশ্ব? রথ কি চক্রে চলে? গান ধরলেন রামকৃষ্ণ, 'যে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে।' তাই রথ দেখব না, সারথি দেখব। ঢেউ দেখব না, সমুদ্র দেখব। মেঘ দেখব না দেখব অন্তরীক্ষ।

আমাকে দেখব না, দেখব তোমাকে। তোমার তীর্থমন্দিরচূড়ে পতাকা দেখতে পাচ্ছি। আর কে মনে করে রাখে পথশ্রম? যত কাঁটা বিঁধেছে পায়ে-পায়ে কে আর তার যন্ত্রণার হিসেব করে? সময়ও নেই, যদি পথের মাঝে বসে এখন কাঁটা তুলতে যাই, তোমার মন্দিরে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে। পথই বেশি হবে আমার মন্দিরের চেয়ে! আমার অন্তরের আনন্দের চাইতে বেশি হবে আমার শরীরের কণ্টকক্লেশ! শুধু কাঁটাই যদি তুলব, কুসুমচয়ন করব কখন? তাই দেহ-গহন-বন ছেড়ে চলো যাই মানসতীর্থের মন্দিরে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'দুঃখ জানে শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।' একটি ছন্দে বাঁধা ছত্র।

একা হয়ে যাও। মনকে নিয়ে একা-একা বিচরণ করো। তিনিও তো একা-একা ঘুরছেন। যে অদ্বিতীয় তাকে পেতে হলে তোমাকেও অদ্বিতীয় হতে হবে। তারপর একা পেয়ে যখন তোমাকে ডাকবেন তখন যে মনটি নিয়ে এতক্ষণ ছিলে সে-মনটি ফেলে দিয়ে তাঁর কোলে গিয়ে উঠবে, তাঁতে নিলীন হয়ে যাবে। দেখবে যে একা ছিল সে-ই এক হয়ে উঠল। আগে একা হবার সাধনা। শেষে এক হবার। আমার কেউ নেই, আমি একা—আগে এই ভাব। শেষে আমিই সমস্ত, আমিই

সম্পূর্ণ, আমিই আদ্যোপান্ত। তাই আবার বললেন অন্য উপমায় : 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে খুশি চলে যা।'

যার কায়া তারই ছায়া। আরে এই কায়াচ্ছায়াটিই মায়াময়।

'একই ব্রাহ্মণ।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যখন পুজো করে তখন পুজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনী বামুন।'

মরুভূমিতে যেমন জলভ্রম, আকাশে যেমন নীলিমাভ্রম, ব্রহ্মেও তেমনি জগৎভ্রম। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল যেমন একই মানুষ, হীরক আর অঙ্গার যেমন একই পদার্থ, তেমনি ঈশ্বর আর জীব একই প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ মানুষে। তাঁর শ্রেষ্ঠ লীলা নরলীলা।

'অবতার যেন গাভীর বাঁট।' অদ্ভুত একটি উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। আর এই ক্ষীর হচ্ছে প্রেম আর ভক্তি। আর শুষ্ক জ্ঞান? আবার একটি সার্থক উপমা। 'শুষ্ক জ্ঞান যেন ভস-করে-ওঠা তুবড়ি। খানিকটা ফুল কেটে ভস করে ভেঙে যায়।'

ব্রহ্মকে শক্তির এলাকা মানতে হয়। অবতারকে মানতে হয় পঞ্চভূতের শৃঙ্খলা। সেইটেই বোঝালেন ছন্দে গেঁথে। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' আবার অন্য উপমায় বোঝালেন, আদালতী উপমায়। 'জজসাহেব পর্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তাঁকে সাক্ষীর বাক্সে এসে দাঁড়াতে হয়।' দেহ ধরে মানতে হয় সব দেহের শাসন।

কিন্তু তোমাকে চিনি কি করে? অর্জুন দেখল বিশ্বরূপ। দুর্যোধন দেখল ভোজবাজি। বুঝি কি করে? কাঁটাবৃক্ষের তলা ছেড়ে কি করে দাঁড়াই এসে কল্পতরু ছায়াসত্রে?

এই গহন-ঘন অন্ধকারে কোথায় তোমাকে হাতড়ে বেড়াব? শুধু হাতটি বাড়িয়ে দিলাম অন্ধকারে। আমি না ধরতে পারি তুমি পারবে। তুমিই আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাও।

৪৯

ভক্ত যখন ভগবানের কাছাকাছি আসে তখন তার কেমন অবস্থা? কে একজন জিজ্ঞেস করলে রামকৃষ্ণকে।

'মনে করো উত্তাল সমুদ্র।' বর্ণাঢ্য উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'তার মধ্য দিয়ে জাহাজ চলেছে। সমুদ্রের তীরে কোথায় রয়েছে এক চুম্বকের পাহাড়। সহসা সেই চুম্বক পাহাড়ের কাছে এসে জাহাজের যেমন অবস্থা, ভক্তেরও তেমনি।'

জাহাজের কেমন অবস্থা? যখন সেই চুম্বক পাহাড়ের টানের মধ্যে এসে পড়বে জাহাজ, তখনই জাহাজের যা কিছু দামী পদার্থ যা কিছু ভারি পদার্থ—লোহা-লক্কড় ইসক্রুপ-পেরেক নাট-বলটু—সব কাঠ উপড়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে

পাহাড়ে লেগে থাকবে। তেমনি ভক্ত যেই ঈশ্বরের এলেকার মধ্যে এসে পড়বে অমনি হবে তার সর্বনাশ বিস্ফোরণ। জীবনে তার যা কিছু মূল্যবান যা কি সারবান—তার কামনা-বাসনা সাধনা-আরাধনা সব গিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন, লীপ্ত, লীন হয়ে থাকবে। আর যা কিছু তার অসার পদার্থ, যা কিছু অবস্তু—কাঠ-বাঁশ, চট-দড়ি—সব পড়ে থাকবে জলের উপর। আর পড়ে থাকবে, জীবনভোর জাহাজে যা এতদিন সে বোঝাই করেছে, তার মাল-পত্র, পণ্যাপণ্য, তার সব অভিযানের আসবাব। তার সব কাঠ-কুটা নেতা-কাতা হাঁড়িকুঁড়ি, তার সব বাঁধন-ছাঁদন। যা কিছু বিজ্ঞাপনের জারিজুরি। সোনার অক্ষরে সাইনবোর্ড।

উপমার উপাদান তিনটি বিবেচনা করো : উত্তাল সমুদ্র, মালবাহী জাহাজ, আর চুম্বকের পর্বত। চুম্বকের সূচিকা নয়, শলাকা নয়, চুম্বকের গিরিরাজ। মহিমময় প্রতীক। সমুদ্র হচ্ছে সংসার, জাহাজ হচ্ছে মানুষ আর চুম্বকের পাহাড় হচ্ছেন ভগবান।

যেতে হবে আরো তাৎপর্যের গভীরে। যদি জানি ঐ সমুদ্রতটে বিজন-বিদেশে রয়েছে এক চুম্বকের পাহাড়, তবে কে যায় আর ঐ দিক দিয়ে! যেখান দিয়ে গেলে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাব, কাঠ-লোহা আলাদা হয়ে যাবে, সে পথ কে মাড়ায়! সমুদ্রের কি অন্য তীর নেই? যাব সেই অন্য তীরের গা ঘেঁষে। যাব সেই নিরিবিলে, নিরাপদের ছায়ায়-ছায়ায়। পলানে খাতকের মতো এড়িয়ে যাব মহাজনকে। যেখানে অমন সর্বস্বহরণ সর্বনাশ কে সেদিকে মরতে যাবে? পাশ কাটিয়ে এলেকা বাঁচিয়ে চলে যাব নির্ভাবনায়।

কিন্তু হায়, আমরা কি জানি কোথায় চলেছি জল ঠেলে-ঠেলে? কোথায় আমাদের বন্দর? কোথায় আমাদের নোঙর নামাবার ঠিকানা? পথ জানা নেই, শুধু ভেসে চলেছি স্রোতের টানে, উজিয়ে-ভাটিয়ে। জীবনের সরজমিনতদন্ত হয়নি, হয়নি মাপ-জরিপ, হয়নি কাঠা-কালি। কেউ জানি না সীমা-সরহদ্দ, কেউ জানি না চিঠে-খতেন। শুধু ভোগ-দখল করে চলেছি, শুধু চলেছি ভাসতে-ভাসতে। কেউ জানি না জীবনের কোন মোড়ে, কোথায় কোন বাঁক নিতেই, সহসা দেখা হয়ে যাবে সেই চুম্বক পাহাড়ের সঙ্গে। কেউ জানে না। কেউ বলতে পারে না। সহসা একটা সশব্দ বিদারণে জেগে দেখব, কোথায় জাহাজ, কোথায় সেই সম্ভার-সঞ্চয়।

হে অয়স্কান্ত, হে কান্তপাষাণ, আমাকে টানো, আমাকে আকর্ষণ করো। তুমি আকর্ষণ করো বলেই তো তুমি কৃষ্ণ। তুমি আমার সমস্ত ভেঙে-চুরে আমার সমস্ত ভাঙা-চোরা দূর করে দাও। আমার পাত্র ভেঙে যাক, শুধু আমার রিক্ত অঞ্জলি তোমার প্রসাদে পূর্ণ হয়ে উঠুক। সর্বনাশের আশায় আমি আমার সমস্ত নিয়ে বসে আছি কেননা আমি জানি আমার সব গেলেই তুমি আমার সর্ব হয়ে উঠবে।

'জোয়ার-ভাঁটা কি আশ্চর্য!' বললে একজন ভক্ত।

'কিন্তু দ্যাখো, সমুদ্রের কাছেই নদীর ভিতর জোয়ার-ভাঁটা খেলে। সমুদ্রের থেকে অনেক দূর হয়ে গেলে একটানা হয়ে যায়।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'তার মানে

কি ? যারা ঈশ্বরের খুব কাছে তাদেরই ভাব-ভক্তি এইসব হয়। আর যারা দূরে—'

অনেক দূরে পড়ে আছি, তাই শুধু অভ্যাসের একটানা। এবার টান দাও, ছিঁড়ে ফেল টানাপোড়েন। শেষ করে দাও গতাগতি। কিন্তু যতক্ষণ আছ দুই হাতে কাজ করে যাও। আর অন্তরে রাখো একটি আনন্দধ্বনি। বিশ্বাসের অমৃতবর্তি।

'কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। সে আনন্দের অনুভবেই তার কর্মের প্রবৃত্তি।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন সাধু গাঁজা তয়ের করছে। তার সাজতে-সাজতে আনন্দ।'

গৃহ-অঙ্গন সাজাচ্ছি কবে থেকে, সাজাচ্ছি গীত-গন্ধে, লীলা-ছন্দে, বিচিত্র দীপাবলিতে। তুমি আসবে বলে। নিজেকে সাজাচ্ছি কত আবরণে-আভরণে, পরছি উৎসববেশ। তোমার সঙ্গে মিলব বলে। মরুস্থলীতে ফোটাচ্ছি প্রেমের মাধবী-মঞ্জরী। বরবর্ণিনী অশোক-মঞ্জরী। শুধু তোমার হাতে উপহার দেব বলে। এইটিই আমার বিশ্বাস। আমার আঁচলের আড়ালে কম্পমান দীপশিখা। তোমার প্রেমমুখটিই তো আমার প্রতীক্ষার স্বপ্ন। আমার এ ঘর তো তোমারই ঘর। যতই কেননা অর্গল রুদ্ধ করে রাখি তুমি বলভরে প্রবেশ করবে। আমাকে হরণ করে নেবে। হে আমার জীবনশেষের শেষজাগরণ, তোমার জন্যে আমি জেগে থাকব। তুমি আমাকে উন্মূলিত করো। তুমি যখন আমার মূলে, তখন উন্মূলিত হতে পারলে তোমারই কোলে আশ্রয় পাব। তাই আমার আর ভয় নেই। তুমি যদি টানো আমার উৎপাটনেই আমার উদ্ঘাটন।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়-সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পাবে বলে গাছ ভালো করে গজাবে।'

দাও দুঃখের মন্থনবেগ। অশ্রুর অশ্রান্ত বর্ষণ। তারপর ফোটাও সে আরক্ত গোলাপ। আঘাত দাও। কিন্তু জানি সে আঘাত তোমার সকরুণ করপল্লবের স্পর্শ। দাও রৌদ্রতেজ। কিন্তু জানি সে নির্দয়তাই তোমার প্রেমদৃষ্টি। হে মহাদুঃখ, তুমিই আমার মহাদেব।

৫০

আসল কথা, সহজ কথা, ছোট কথা : বিশ্বাস চাই।

'সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'বিশ্বাস চাই। বালকের মত বিশ্বাস। মা বলেছে ওখানে ভূত আছে, তা ঠিক জেনে আছে যে ভূত আছে। মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়, তা জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা।'

তেমনি কোথা থেকে একটা সংবাদ এসে যাবে জীবনে, দুর্যোগের রাত্রে বিদ্যুৎরেখার মত, আর সমস্ত মন-প্রাণ বলে উঠবে তুমি আছ! চাকা একটা

ঘুরছে বটে কিন্তু চাকার আছে কোথাও ধ্রুব বিন্দু। সেই ধ্রুব বিন্দুটিই তুমি। আবর্তের মধ্যে কোথাও আছে একটি স্থৈর্য, কোলাহলের অন্তরে আছে কোথাও শান্তি। হাল নেই পাল নেই চলেছি ভেসে অজানা জলের উপর দিয়ে, কিন্তু জানি, কূল আছে।

শুধু রঙিন স্বপ্ন নয়, দৃঢ়মুষ্টি বদ্ধপরিকর বিশ্বাস। যা শূন্য দেখছি তা আসলে শূন্য নয়, পূর্ণেরই উদ্ঘাটন। বুকের রুদ্ধ অন্ধকারে অতন্দ্র করাঘাত, জাগো এবার প্রসুপ্ত বহ্নি। দৈন্যশীর্ণ শুষ্ক শাখায় বাতাসের ব্যাকুলতা, জাগো এবার বনশোভনা পুষ্পমঞ্জরী। কঠিন-মলিন মৃত্তিকায় নখের আঁচড় কাটছি, দাও এবার তাপভঞ্জন তৃষ্ণার পানীয়।

ক্ষণে-ক্ষণে নিশ্বাসে-নিশ্বাসে এই শুধুই বিশ্বাস যে, কোথাও কিছু একটা আছে। একটা ছন্দ, একটা শক্তি, একটা নীতি। সেটাকে পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে না রেখে নিয়ে আসি গভীর-গোচরে। একেবারে সহজ পাশটিতে। জ্ঞানকে প্রেম বলে সম্ভাষণ করি। জানাকে নিয়ে আসি ভালোবাসার সামীপ্যে। দূরের আকাশ ধরা দিলো এখন দুটি আঁখির তারকায়। পরিচয়ের জিনিস হয়ে উঠল এবার স্পর্শের প্রসাদ। দেখি শক্তিটি তোমার আকর্ষণে, নীতিটি তোমার অন্তহীনতায়, ছন্দটি তোমার মিলনে-বিরহে।

তুমি নেই, শীত-দরিদ্র দিনে নেই তবে আর বসন্তের লাবণ্যরেখা, গ্রীষ্মের বহ্নিবৃষ্টির পরে নেই তবে আর বন্ধন-বিদারিণী বর্ষার উচ্ছলতা। তুমি নেই আমার চোখে তবে এই আনন্দদৃষ্টিটিও নেই। যদি তুমি কোথাও আনন্দের ধারণাটি হয়ে না থাকো, তবে, কেন তবে এই প্রাণধারণ? ধারাসিক্ত বাতাসে ফুলের সৌরভটি যেমন বেঁচে থাকে, তেমনি জীবনের ব্যথার সমুদ্রে এই বিশ্বাসটি বাঁচিয়ে রাখব, তুমি আছ।

সরল বিশ্বাসে কী না হয়! শোনো এবার সেই গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনের গল্প। গল্পটিও সরল।

'গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে—শিষ্যেরা যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন করেছে। একটি গরীব বিধবা—সেও শিষ্য। তার থাকবার মধ্যে আছে একটি গরু, সে এক ঘটি দুধ এনেছে। শুধু একঘটি? গুরু ভেবেছিলেন দুধ-দধির সমস্ত ভারই বুঝি মেয়েটি নেবে। তাই ঘটি দেখে চটে গেলেন। দুধ ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন—তুই জলে ডুবে মরতে পারিসনি? এই বুঝি গুরুর আজ্ঞা, মেয়েটি নদীতে ডুবতে গেল। সরলতার সমুদ্র থেকে উঠে এলেন নারায়ণ, দর্শন দিলেন মেয়েটিকে। বললেন, এই পাত্রটি নিয়ে যাও, এতে দধি আছে, যত ঢালবে ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন। পাত্র দেখে গুরু তো অবাক, দধির ভাণ্ডার যে অফুরন্ত। সব শুনলেন মেয়েটির কাছে। বললেন, নারায়ণকে যদি দর্শন না করাও তবে আমি জলে ডুবব। গুরুকে নিয়ে মেয়েটি এল সেই নদীর ধারে। নারায়ণ দর্শন দিলেন। কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি বললে, প্রভু, গুরুদেব যদি তোমার দর্শন না পেয়ে প্রাণত্যাগ করে তবে আমিও জলে ডুবব।

তখন অনুপায়, নারায়ণ দর্শন দিলেন গরুড়কে।'

কিন্তু কোথায় পাব এই বিশ্বাস? বন্দী হয়ে আছি, থাকলামই বা। কেন বিশ্বাস করতে পারব না, আমারও কাছে কারামোচন! অন্ধকারের সনদে জ্যোতি-মুক্তির স্বর্ণস্বাক্ষর।

'যেন গুটিপোকা।' উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'মনে করলেই কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈরি করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না।'

আবার উপমা: 'যেন ঘুনির মধ্যে মাছ। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু মাছের সঙ্গে খেলা, জলের মিষ্টি শব্দ—এই সব পেয়ে ভুলে থাকে। বেরিয়ে আসার চেষ্টাও করে না। মাছ হচ্ছে পরিবার-পরিজন। আর জলের মধুর শব্দ হচ্ছে ছেলে-মেয়ের আধ-আধ কথা—'

আবার বললেন অন্যভাবে: 'জীব যেন ডাল, যাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তার যে ক'টি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা আস্ত থাকে, পিষে যায় না। ঈশ্বরকে ধরে থাকো, নইলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।'

কিন্তু তোমাকে ধরি কি করে? আমার কি ধন মান আছে, না কি সৈন্য-সামন্ত আছে? শাস্ত্র আছে, না কি আছে অস্ত্রবল? আমার যে আছে শুধু তোমার পুত্র হবার অধিকার। তাই আমি ধরতে না পারি টানতে পারব; স্তবগান দিয়ে নয়, শুধু হৃদয়ের গীতহারা স্তব্ধতা দিয়ে। আমার তো যাত্রা নয়, আমার শুধু অভিমুখিতা। আমি যে তোমার দিকে মুখ করে চেয়েছি এই তো আমার অভিসার। আমার একটি নির্জন দীপশিখার জন্যে তোমার গগন-মগন-করা অগণন তারাবলী।

আমার একটি অলিখিত চিঠির উত্তরে তোমার এত আলোকিত অক্ষয়! কী সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'মনে করো এক বাপের অনেক ছেলে। বড় ছেলেরা কেউ বাবা কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি-শিশু ছোট ছেলে হদ্দ "বা" কি "পা" বলতে পারে। তাই বলে তার উপর বাবা কি রাগ করবেন? বাবা জানেন ও আমাকেই ডাকছে তবে ভালো উচ্চারণ করতে পারে না—'

তেমনি যে কথাটি বলি-বলি করেও বলতে পারছি না সেটি তুমি বুঝেছ। যে কান্নাটি কাঁদতে পারলাম না এখনো তার ব্যথাটি পেঁছেছে তোমার কাছে। এত আলোকের কণা বিকীর্ণ করছ দিকে-দিকে, অথচ হৃদয়ের দীপমুখে পড়ল না তার ক্ষণিকস্পর্শ। কিন্তু বিশ্বময় তোমার অস্তিত্বের যে উত্তাপ সেটি রেখেছ সেই অনুভবের অন্ধকারে।

একবার তোমাকে যদি ছুঁতে পারি, আর আমাকে কে ছোঁয়! বললেন রামকৃষ্ণ, যে বুড়ি ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করবার জো নেই। ইট বা টালি যদি ছাপসুদ্ধু পোড়ানো হয় তো সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না।'

আমি শুকনো শূন্য বাঁশ, তুমি দুঃখের তপ্ত শলাকা দিয়ে আমাকে সছিদ্র

করো, তবেই তো বাঁশি হয়ে বাজতে পারব। যখন দগ্ধ করছিলে তখনো জানিনি এ দগ্ধমুখে তোমার অধরস্পর্শ রাখবে। হায় মোটে সপ্তস্বরের জন্যে সাতটি ছিদ্র। এখন আবার কাঁদছি তোমার হাতে উঠে। আমায় তুমি শতচ্ছিদ্র কেন করোনি?

শুধু সংগ্রাম করে যাব। সংগ্রামই মন্ত্র। কর্মই পুজো। ক্লান্তিই নৈবেদ্য।

মুক্তিতে যেমন তিনি, বন্ধনেও তিনি। যাঁর রোগ তাঁরই চিকিৎসা। বন্ধনে রেখেছেন ক্রন্দন শোনবার জন্যে। সংগ্রামে রেখেছেন সন্ধি করবার জন্যে। কারাগারে শুধু করাঘাত করে যাব। করাঘাতই প্রণিপাত।

বলো, ভালো আছি, ভালোবাসি। আলোও ভালো কালোও ভালো। কষ্টিপাথরের রাত যেমন ভালো তেমনি ভালো পাকা সোনার টকটকে ভোর। জীবন-ভোর ভোর হবার স্বপ্নেই বিভোর থাকো।

৫১

'ছিলে দিগম্বর, হলে সাম্বর—আবার হবে দিগম্বর।'

শুধু বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসা। ঘুরতে-ঘুরতে প্রথম বিন্দুতে। গান যেমন ফিরে আসে প্রথম কলিতে। শিশু যেমন মা'র কোলে। দেশ বেড়িয়ে নিজের ঘরটিতে।

গতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে প্রগতি। প্রগতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আগতি। এই ফিরে-আসা। শুধু ছোটা নয়। ছুটতে-ছুটতে ছুটি নেওয়া। ঢেউয়ের মধ্যেই অবগাহন। আনন্দ থেকে যাত্রা, আনন্দেই প্রত্যাবর্তন। যে বিন্দুতে আরম্ভ, সেই বিন্দুতেই শেষ। আবার যা শেষ তাই আরম্ভ। আমার কাছে তুমি আরম্ভ, তোমার কাছে আমি শেষ। আবার তোমার কাছে আমি তোমার তুমি। আমার কাছে তুমি আমার তুমি। তাই শুধু ঈশ্বরের দিকে চোখ রাখো। কি রকম? উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গিন চড়ানো। কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি।'

এর নামই যোগ। সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন: 'থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পরদা ওঠে, ততক্ষণ লোকে বসে নানারকম গল্প করে—বাড়ির কথা, আফিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই পরদা ওঠে অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ। যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক-আধটা কথা কয়, সে ঐ নাটকের কথা।'

ঈশ্বরেরই কথা। এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন: 'মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।'

দাও আমাকে এবার শুধু আনন্দের কথা কইতে। দুঃখের মধ্যে যে আমার কান্না সে তো আমার দুঃখের মুহূর্তের আনন্দ। যদি কান্নাটিও না দিতে, তবে

সে দুঃখের পাহাড় দীর্ণ করতুম কি করে? যদি না থাকত চোখের জলের ধারা কি করে হত তবে এই দাবাগ্নি-নির্বাণ? পৃথিবীর সমস্ত কান্না ছাপিয়ে ভেসে আসছে একটি হাসির কলরোল। সমস্ত শবগন্ধ ছাপিয়ে একটি অম্লান ফুলসৌরভ। সমস্ত মৃত্যু ছাপিয়ে একটি নব-জন্মের শঙ্খধ্বনি। একমাত্র আনন্দেই সৃষ্টির নিশ্চয়স্থিতি। সর্বস্থাবরজঙ্গম একমাত্র আনন্দেই স্থাণু-চরিষ্ণু। সমস্ত অন্ধকারের অন্তরলোকে একটি তমোহারী সুপ্রভাত।

চক্ষুচকোর অতৃপ্ত হয়ে আছে, কেন দেখতে পাই না তোমাকে? অপরূপ করে বললেন রামকৃষ্ণ: 'ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে, মা ততক্ষণ আসে না। লাল চুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে যখন চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে।'

রঙিন চুষি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ। নাম-যশ টাকা-কড়ি কুল-বিদ্যা। কিন্তু অমৃতস্তন্যবঞ্চিত হয়ে আছি এই উপবাসের বোধ যদি একবার জাগে আর যদি একবার চুষি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেঁদে উঠতে পারি দিগন্ত পর্যন্ত, তুমি কি না এসে থাকতে পারবে? আর কিছুর জন্যেই নয় কাঁদছি তোমার উত্তপ্ত উৎসঙ্গের পিপাসায়। সেই যে উত্তাপের অনুভব এইটিই কি দেখা নয় তোমাকে?

কান্নার চাবি দিয়ে খুলল সেই আনন্দের সিন্দুক। কান্নাই সেই উদ্ঘাটিনী কুঞ্চিকা।

'তবু সব সন্দেহ যায় কই?' জিগগেস করলেন ডাক্তার।

'আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তারপর বেশি কিছু শুনতে চাও, তাঁর কাছে একলা-একলা বলবে। তাঁকে জিগগেস করবে কেন তিনি এমন করেছেন।' বলেই অপূর্ব উপমা দিলেন: 'ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেলভাড়া যদি দিতে হয় তো কর্তাকে জানাতে হয়।'

তাই বলি কর্তাকে ধরো। কারণ-কর্তা বিকর্তা গহন-গূঢ়কে। একের পিঠের শূন্যগুলোকে ধোরো না। এককে ধরো। এক বই দুই নেই। এক থেকেই অনেক। 'এক সের চালের চৌদ্দগুণ খই।'

তারপর বললেন কবির মত: 'একটা পথ দিয়ে যেতে-যেতে যদি তাঁর উপর ভালোবাসা হয় তা হলেই হল।'

পথটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসার আলো জ্বললেই সব ভালো হয়ে যাবে, সব আলো হয়ে যাবে। অন্তর-খনির সে মণির মাল্যটি তোমাকে উপহার দিতে পারলেই পাব তোমার কণ্ঠের বরমাল্য। শুধু একটু ভালোবাসা, চকিতের আভাসে চিরকালের চাহনি। কিন্তু কি করে ঘুমের গহন থেকে উদ্ধার করি সেই স্বপ্নকে, অন্ধকারের কষপাষাণে সেই বিদ্যুতের লেখা। আমার মূল্যহীন শক্তির অন্তরালে রয়েছে সেই মুক্তাকণা। কি করে উদ্ঘাটন করি সেই অমিয়রতন।

ব্যথা দিয়ে জাগাবো সেই ভালোবাসাকে। আঘাত দিয়ে জাগাবো সেই শৃঙ্খলিত ঝঙ্কার। অখ্যাত অন্ধকারের তপস্যায় জাগাবো সেই অবরুদ্ধ মুকুল।

কিন্তু তার আগে একটু ভোগরাগ দরকার। বললেন রামকৃষ্ণ : 'ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলেই বলে, মা যাবো। হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করছিল। আয় আয় তি-তি! ডাকছে কত পায়রাকে। যেই খেলায় তৃপ্ত হল, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন একজন অচেনা লোক এসে বললে, আমি তোকে মা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছি আয়। বলা-কওয়া নেই, উঠে পড়ল তার কাঁধের উপর।'

কিন্তু কই সেই অচেনা লোক যে মা'র খবর দিয়ে নিয়ে যাবে কাঁধে তুলে। ঘরের ঠিকানাই জানি না তো পথের ঠিকানা জানব। তবু যে মুহূর্তে শুনলাম এ আমার মাকে চেনে, নিয়ে যাবে মা'র কাছে, উড়িয়ে দিলাম সব সুখের পায়রা। রিক্ত হলাম লঘু হলাম। পুঁটলি বাঁধার বস্ত্রখন্ডটি তুলে দিলাম কর্ণধারের হাতে। বললাম একে কাজে লাগাও, তোমার নৌকোর পাল করো। অচেনা মানুষ অজানা পথ তবু ভয় নেই একটুকু। কেননা মা যে সর্বব্যাপিনী, চিরপ্রতীক্ষমানা। নৌকো যদি কোথাও ভেড়ে সেই ঘাটেই মা আসছেন, আর যদি ডুবে যায় তবে সেই অতলতলেও মা'র কোল। সর্বত্রই তাঁর আশ্রয় তাঁর অঞ্চলছায়া। সমস্ত গতির মধ্যেই তাঁর শান্তি। সমস্ত যবনিকার অন্তরালেই তাঁর প্রতীক্ষা।

সমতল কলকাতা বেড়িয়ে এসে ওঠো এবার মনুমেণ্টে। 'ঈশ্বর আমাদের মনুমেণ্ট।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'মনুমেণ্টের নিচে যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ গাড়ি-ঘোড়া সাহেব-মেম এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশসমুদ্র—সব ধূধূ করছে। তখন গাড়ি-ঘোড়া বাড়ি-মানুষ এ সব আর ভালো লাগে না—এ সব পিঁপড়ের মতন দেখায়।'

ঐ সিঁড়ি ভাঙাটিই সাধন। ঘোড়া না দেখে সওয়ার দেখাই আসল দেখা। 'ঘোড়ায় চড়ে সওয়ার আসছে। খুব সাজগোজ, হাতে অস্ত্রশস্ত্র।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'কিন্তু এর মধ্যে সত্য কি? ঘোড়া সত্য নয়, সাজগোজ অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। সত্য হচ্ছে সওয়ার। শেষকালে দেখবে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে।'

একটি বর্ণারূঢ় চিত্র। 'সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়।'

ঐ মেঘ হচ্ছে বিষয়বাসনা, ইন্দ্রিয়সুখ। বালিশ-চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন মা। মোহের বালিশ, অহঙ্কারের বালিশ, বিষয়-বিকারের বালিশ। ঘুমের মধ্যে যে কেঁদে উঠি না তা নয়, কিন্তু কান্নার মধ্যেই আবার বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি। বালিশকেই মা ভাবি। কিন্তু যদি একবার ছুঁড়ে ফেলতে পারি বালিশ, দূরে ফেলতে পারি মেঘ তখন সেই জাগরণের মুক্তিতে মাকে জাগরিত দেখব, তাঁর বিনিদ্র দুই নয়নে অক্লান্ত ক্ষান্তি পরিপূর্ণ করুণা।

ছোট্ট একটি গল্প বললেন এখানে : 'ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ এসে ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে এসে পড়ে বাইরে।

বিষয়চিন্তা এমনি। ইটের ভার। যোগীও যোগভ্রষ্ট হয়।'

কিন্তু কি করে কাটি এই বন্ধন? কোথায় মিলবে সেই নিবন্ধ-ছেদনী কর্তরী? প্রথমে হও নির্বিকার। শেষে তেজস্বী। সহ্যশক্তি আর পুরুষকার।

'নির্বিকার, হাজার দুঃখকষ্ট বিঘ্নবিপদ হোক, নির্বিকার।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যেমন কামারশালার লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার, দারুণ রোখ। কাম-ক্রোধ আমার অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ। কি রকম? যেমন কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।'

তারপর বললেন একটি আশ্চর্য গল্প: 'একজনের পরিবার বললে, তুমি কোনো কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনো তুমি আমাকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারো না। কিন্তু অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে, তার ষোলো স্ত্রী—এক-একজন করে ত্যাগ করছে ক্রমে-ক্রমে। স্বামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা—বললে, ক্ষেপি, সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না। একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়? এই দেখ, আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, আমি চললুম ত্যাগ করে। বাড়ির কোনো গোছগাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল। বাড়ির দিকে স্ত্রীর দিকে একবার পিছন ফিরেও চাইল না।'

গল্পটির মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ঐ "ক্ষেপি" সম্বোধন!

৫২

নরেন্দ্রনাথকে বোঝাবার জন্যে উপমার মালা গাঁথলেন রামকৃষ্ণ: যেমন রসে ঠাসা তেমনি শুনতে নতুন। জল-জীয়ন্ত। গ্রাম্য পরিবেশটি থাকার দরুন শ্যামল সজীবতা মাখানো। অকাপট্যে পরিস্ফুট।

'অন্যেরা কলসী ঘটি, নরেন্দ্র জালা।'

'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘি। যেমন হালদার পুকুর।'

'আর সবাই পোনা কাঠিবাটা, নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই।'

'বড় ফুটোওয়ালা বাঁশ—অনেক জিনিস ধরে।'

সব গ্রাম্য ছবি। শুধু নরেনের প্রতি স্নেহ নয়, গ্রামের প্রতি মমতা।

অন্যরকমও আছে।

'যেন খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'ও বসানো শিব নয়, পাতাল-ফোঁড়া শিব।'

'ও পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়—মাদী পায়রা চুপ করে থাকে।'

'ও পদ্ম মধ্যে সহস্রদল।'

কেশব সেনকে বলেছিলেন, 'ল্যাজ খসেছে।'

ব্যাঙাচির যতক্ষণ ল্যাজ না খসে ততক্ষণ তাকে জলে থাকতে হয়। ল্যাজ খসলে সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। অবিদ্যাই হচ্ছে ল্যাজ। অবিদ্যা চলে গেলে মুক্ত হয়েও বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে সংসারেও থাকতে পারে।

বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'বিদ্যার সাগর। ক্ষীর-সমুদ্র।' বলেছিলেন, 'আমরা জেলে ডিঙি, আপনি জাহাজ—'

গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'রসুন-গোলা বাটি।'

বাবুরামকে, 'নতুন হাঁড়ি। দুধ রাখলে খারাপ হবে না।'

রাখালের বাপকে বলেছিলেন, 'ওল যদি ভালো হয় তার মুখীটিও ভালো হয়।'

শশধর পণ্ডিতকে পূর্ণচন্দ্র না বলে 'দ্বিতীয়ার চাঁদ'।

দ্বিতীয়ার চাঁদই দিনে-দিনে বাড়ে। পূর্ণচন্দ্র ক্ষয় পায়।

শ্রীমাকে বলেছিলেন, 'ছাইচাপা বেড়াল।'

আর নিজেকে, 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই শান্তিরাম সিং।'

সিংহ অথচ শান্ত। ভানু অথচ অণু।

অণু না থাকলে ভানু দীপ্যমান হত না। পৃথিবীর ধুলোবালি আকাশের দিকে উড়ছে বলেই তো তাকে আশ্রয় করে সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে। সূর্য যদি সোজাসুজি আমাদের কাছে আসত, কালো দেখাত। আলো দেখাবার জন্যেই তো ধুলোর প্রয়োজন। আমি আছি বলেই তো তুমি প্রতিভাত।

আমি অণু বলেই তো তুমি আমার অনুধ্যানে।

৫৩

বাংলা সাহিত্যে একটা বড় রকম ত্রুটি, এতে হাসি কম। কিন্তু রামকৃষ্ণ হাসির রসে ভরপুর। দুরূহকে সহজ করবেন, গম্ভীরকে সরস, না হাসলে তা হবে কেন? হাসতে পারাই তো বন্ধু হয়ে যাওয়া, নিজের অন্তরের কাছে টেনে নিয়ে আসা। হাসিই তো সমস্ত বাণীর নির্মল প্রাণশক্তি। একমাত্র সদানন্দ বালকই তো হাসে। আর যে ঈশ্বরের সন্নিহিত সে তো বালক।

'ওরে এখানকার যাত্রার প্যালা দিতে হয় না। যদুর মা তাই বলে, অন্য সাধু কেবল দাও-দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই।' বলে এক মজার গল্প ফাঁদলেন:

'এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের বসে শোনবার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু সে উঁকি মেরে দেখল যে আসরে প্যালা পড়েছে, তখন সেখান থেকে আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেল। খোঁজ নিয়ে জানলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারি ভিড়। সে দুই হাতে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে-ঠেলে আসরে গিয়ে

উপস্থিত। আসরে ভালো করে বসে গোঁফে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল।'

আমাদের এমনি সস্তায় কিস্তি হাসিলের মতলব। তীর্থকৃত্য করতে এসেও চাই যথাসম্ভব ফাঁকি দিতে। অর্থাৎ যত কম আয়াসে প্রসাদের বড় ঠোঙাটা হাতানো যায়। নোট পড়ে যেমন পাশ, তেমনি নমো-নমো করে পুজো।

কিন্তু যেখানে আন্তরিকতার অনন্ত আকাশ সেখানেই আমরা আশ্রয় নেব। তুমি যেমন অজস্র প্রশ্রয় মেলে রেখেছ তেমনি আমরাও মেলে ধরব। আমাদের নিরবকাশ তন্ময়তা। তোমাকে শুধু দেখব বসে-বসে। তোমার অভিমুখে পথ-যাত্রা করতে না পারি, তোমার উন্মুক্ত আকাশের দিকে মুখ করে যেন বসে থাকতে পারি। তুমি শুধু আমার চলার মধ্যে নেই, আমার বসে থাকার মধ্যেও তুমি। তুমি শুধু প্রয়াস নও, তুমি প্রতীক্ষা।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার ভাব কি জানো? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালোবাসি। মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটিচচ্চড়ি, এ সবতাতেই আছি। আবার মুড়িঘণ্টতেও আছি, কালিয়া-পোলোয়াতেও আছি।'

বিচিত্রতমকে বিবিধ ভাবে আস্বাদ। যে ভাবেই মাছ রান্না করো সর্বত্রই সেই অমোচ্য আমিষ। আমি সাকারে আছি, নিরাকারে আছি, মন্দিরে আছি, মসজিদে আছি, গির্জায় আছি, গুরুদ্বারে আছি। আবার আছি এই মুক্ত আকাশের অঙ্গনে, আমার হৃদয়ের নিভৃতে। সব পথই পথ, কিন্তু পথটাই ঈশ্বর নয়। আসল হচ্ছে আন্তরিকতা, পথে-রথে এক হাওয়া। যদি 'যাব' এই বাণীটি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তবে পথই ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। অন্তর যদি সরল হয়, ভুল পথও সোজা হয়ে উঠবে। 'যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয়, আর ভুলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে যায়, তা হলে', বললেন রামকৃষ্ণ, 'একদিন-না-একদিন পথে কেউ নিশ্চয় বলে দেবে, ওহে ওদিকে নয়, দক্ষিণ দিকে যাও। তার জগন্নাথ দর্শন হবেই হবে একদিন।'

আন্তরিকতার গুণে ভুলও ফুল হয়ে ফোটে।

'ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব নয়।' তারপর কী পরিহাস-সরস করেই আঁকলেন সেই বালকের ছবিটি! 'বালক কোনো গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। দেখ, তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তক্ষুনি তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! রজোগুণের বশ নয়। এই এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল, মার কাছে ছুটেছে। হয়তো একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্ছে; খানিক পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় তো কাপড়খানি বগলদাবা করে বেড়াচ্ছে। যদি ছেলেটাকে বলো, 'বেশ কাপড়খানি তো, কার কাপড় রে?' অমনি বলবে, আমার কাপড়। আমার বাবা দিয়েছে। যদি বলো, লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড়খানি দাও না, অমনি ফোঁস করে উঠবে, ঈস। তারপর ভুলিয়ে একটি পুতুল কি আর একটি বাঁশি যদি হাতে দাও তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার সেই ছেলের সত্ত্বগুণেরও

আঁট নেই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালোবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না—কিন্তু বাপ-মা'র সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল তখন নতুন খেলুড়ে হল। তাদের উপর ভালোবাসা পড়ল, পুরোনো খেলুড়েদের একরকম ভুলে গেল। তারপর দেখ, জাত-অভিমান নেই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোলো আনা জানে যে এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয় আরেকজন যদি কামারের ছেলে হয় তো এক পাতে বসে ভাত খাবে।'

এই হচ্ছে বালকের আমি, পাকা আমি। এবারে বুড়ো আমি'র ছবি আঁকলেন : 'বুড়োর আমি কাঁচা আমি। সেটা কি রকম জান? আমি কর্তা, আমি এত বড়লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে। এইসব ভাব। যদি কেউ বাড়িতে চুরি করে, আর তাকে যদি ধরতে পারে, প্রথমে সব জিনিসপত্র কেড়ে নেয়, তারপর উত্তম-মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয়। বলে, কি জানে না! কার চুরি করেছে? যদি কারু উপর আক্রোশ হয় তো সহজে যায় না, হয়তো যতদিন বাঁচে ততদিন যায় না। যদি বলা যায়, অমুকে জায়গায় একটি সাধু আছে, দেখতে যাবে? অমনি নানা ওজর করে বলবে, যাবে না। আর মনে-মনে বলবে, আমি এত বড়লোক, আমি যাব? সব তমোগুণের খরিদ্দার। তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে অহঙ্কার, ক্রোধ। প্রায় হনুমানের মত।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। লঙ্কা পোড়ালেন, অথচ এ জ্ঞান নেই সীতার কুটিরখানাও নষ্ট হবে।'

'আমি' কি আর যায়? কিছুতেই যায় না। এই যায় তো আবার আসে। তাই বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি একান্তই আমি না যায়, থাক শালা দাস-আমি হয়ে।'

সোহহং নয়, দাসোহহং। আমি কর্তা-ভোক্তা কেউ নই, আমি সেবক, আমি পরিচারক।

'আমি বই-টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নেই তরোয়াল নেই, শান্তিরাম সিং।'

তুমি শান্তি আর আরামের অক্ষয় উৎস। তুমি নরসিংহ। তুমি ভারতবর্ষের তপোবনে জ্যোতির্ময় পুরাণ পুরুষ। তুমি রাজচক্রবর্তী।

৫৪

বদ্ধজীবের কথা আর বোলো না।

'যদি অবসর পায়, হয় আবোল-তাবোল ফালতো গল্প করে, নয়তো মিছে কাজ করে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি; হয়তো সময় কাটে না দেখে তাশ খেলতে আরম্ভ করে। আবার এমনি

মায়া যে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও যদি দেখে প্রদীপটাতে বেশি সলতে জ্বলছে তো বলে, তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও। যদি তীর্থ করতে যায়, নিজে ঈশ্বরচিন্তা করবার সময় পায় না, কেবল পরিবারের পুঁটলি বইতে-বইতে প্রাণ যায়।'

'সকলকেই দেখি, মেয়েমানুষের বশ।' একদিনের ঘটনা বলছেন রামকৃষ্ণ: 'কাপ্তেনের বাড়ি গিছলাম। তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাব তাই কাপ্তেনকে বললাম গাড়ি-ভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বললে। সে মাগও তেমনি—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে রামেরাই দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে!

আবার: 'যাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্ত্রীটি ভালো। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়। সকলেই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে।'

কিন্তু সংসারে থেকে সাধন-ভজন করতে হলে সংসারকে ঠান্ডা রাখা চাই। সেইটি বোঝাবার জন্যে একটি অপূর্ব কৌতুককর উপমা গাঁথলেন: 'শবসাধন করতে হলে পাশে চাল ভাজা ছোলা ভাজা রাখতে হয়। সাধনার সময় মাঝে-মাঝে ঐ শব হাঁ করে ভয় দেখায়। তখন ঐ চাল ছোলা ভাজা তার মুখে দিতে হয় মাঝে-মাঝে। শবটা ঠান্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। তেমনি সংসারের মধ্যে থেকে সাধন করতে হলে আগে পরিবারদের ঠান্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবেই সাধন-ভজনের সুবিধে।'

সংসার-কর্তব্যে উদাসীন থাকো, সংসারই দেবে না তোমাকে স্থির থাকতে। আগে ওর ব্যবস্থা, পরে তোমার নির্লিপ্ত।

'ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমন কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে। সেও বেড়ালের মাছ-দুধ ঘুরে-ঘুরে যোগাড় করবে আর বলবে, মাছ-দুধ না হলে বেড়ালটা খায় না, কি করি!'

কী অকিঞ্চিৎকর রঙিন খেলনাতেই ভুলিয়ে রেখেছ! তোমার থেকে বিমুখ করে রেখেছ। আমার দৃষ্টিটি জাগল না, অঞ্জনটি ঠিক লাগল না নয়নে। ঘরের তাপে বাইরে এসে দাঁড়ালুম কতবার, কিন্তু তোমার নীলাম্বর আর চোখে পড়ল না। আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। তুমি যদি আমার দিকে চোখ না ফেরাও, তবে সাধ্য কি তোমাকে দেখি! যেদিকে আসল তুমি সেদিকেই যে পিঠ ফিরিয়ে রয়েছি। যেদিকে চোখ মেলা, সেদিকে শুধু ধু-ধু বালুচর—শুধু দিন-রাত্রির মরুভূমি।

আবার রসিকতা করলেন রামকৃষ্ণ: 'হয়তো বড় বনেদি ঘর। পতিপুত্রের সব মরে গেল। কেউ নেই, রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি। তাদের মরণ নেই। বাড়ির এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ—তার সঙ্গে দু-চার গাছা ডেঙ্গো-ডাঁটাও জন্মেছে—রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে আর সংসার করছে। কেন? ভগবানকে ডাক না কেন? তা হবে না।'

তুমি যদি না ডাকাও তবে কি করে ডাকি ? যদি তুমি না বাজাও হাতে তুলে নিয়ে তবে কি করে বাঁশি হই ? আমার জীবনকে যে এত দুঃখে-কষ্টে বিদ্ধ করছ, কি করে বুঝি এ তোমার শিল্পরচনার সূচীছিদ্র ? এই যে দুর্বহ শূন্যতা, কি করে বুঝি এ তোমারই আলিঙ্গন ? তোমাকে আমি দেখি না বললে তুমিও কি আমাকে দেখবে না। ঘরে-বারান্দায় বিজলীর তার আর বাতি বসালেই চলবে না, তোমার হেড-আপিসের সঙ্গে যদি সংস্পর্শ না হয়, তবে যে তিমির সেই তিমির !

আবার পরিহাস করছেন : 'হয়তো বা কারুর বিয়ের পর স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাক না কেন, তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হল। মাথায় কাগাখোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে হাত নেড়ে গিন্নিপনা করছেন—সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াসুদ্ধ লোক ডরায় ! আর বলে বেড়াচ্ছেন—আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না। মর, তোর কি হল তা দ্যাখ—তা না।'

সর্বদা বহিরঙ্গেই আছি, হরি-রঙ্গে থাকি কই ? কেবল কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের লোভ, কেবল কৃত্রিমের রূপচর্যা। তোমার পরিচর্যা নয়, নিজের রূপচর্যা। তোমার জন্যে সাধন নয়, নিজের প্রসাধন। কৃত্রিমকে লঙ্ঘন করে চলো যাই সহজের মধ্যে। বলাটাই সহজ, কিন্তু তুমি নিজে যদি না হাত ধরো তবে চলাটাই অসাধ্য। আমি প্রদীপ জেবলে কী করব যদি আমার নয়নই না জবালতে পারি ? তাই ঠিক শিশিরবিন্দুটি না পড়লে পুষ্প বিকশিত হবে না। চাই ঠিক আলোকের চুম্বন। তেমনি যখন তোমার কৃপার বারিবিন্দুটি পড়বে আমার জীবনে, তখনই আমি জাগব, তার আগে নয়। তোমার করুণার মুহূর্তটিই হবে আমার জাগরণের লগ্ন। এই কথাটিই রামকৃষ্ণ বোঝালেন একটি গ্রাম্য উপমায়। কথাচ্ছলে কথা, তাই গ্রাম্যতাটি উপেক্ষণীয়। আর যাকে গ্রাম্যতা বলছি আসলে সেটি সারল্যের রূপ, অন্য চোখে দেখতে গেলে প্রসাদরম্যতা।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমুই, আমার যখন হাগা পাবে তখন আমায় তুলে দিও। মা বললে, বাবা, আমায় তুলতে হবে না। হাগাতেই তোমায় তুলবে।'

যখন আসবে তোমার ডাক, তখন কে আর বাঁধবে আমাকে ? সেই ভাবজলতরঙ্গ রোধবন্ধনহীন। তখন আরাম-বিরামের সংকীর্ণ শয্যা ছেড়ে চলে আসব ব্যথার মুক্তদীপ্ত আকাশের নিচে। তখন যা পেয়েছি তার তুলনায় যা পাইনি তাই বড় হয়ে উঠবে। এতদিন শুধু অনুকূলের দিকেই চলেছি, যা সহজ সুখ সংকীর্ণ আরাম তার দিকে—এখন তুমি যদি ডাকো, তবে যাব প্রতিকূলের দিকে, যেদিকে দুঃখ আঘাত, অস্বীকার। এই প্রতিকূলের পথেই তুমি, তুমি যে অকূলে থেকেও প্রতিকূলে ! তাই তুমি রিক্ত করে দাও, ভারমুক্ত করে দাও। সরল করে দাও, হালকা করে দাও। তোমার ডাক যে শুধু চলার ডাক। যদি রিক্ত না হই, ত্যক্তভার না হই তবে চলব কি করে ? যদি সরল না হই তবে তোমার দেওয়া ব্যথাটির ব্যাখ্যা সরল হয়ে প্রতিভাত হবে কি করে ?

কাজ করো, কাজের সঙ্গে-সঙ্গে আবার নাম করো। ভেবো না কাজটি তোমাকে তোমার আপিসের বড়বাবু দিয়েছেন যে তাঁরই নাম করবে। কাজটি ভগবান পাইয়ে দিয়েছেন। কাজটি তাঁরই। এই বিশ্ব-সংসারটি তাঁরই আপিসখানা। সুতরাং তাঁরই যখন কাজ, তাঁরই নাম করো।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'নামের অনন্ত মাহাত্ম্য। তবে অনুরাগ না থাকলে হয় না। ঈশ্বরের জন্যে মন ব্যাকুল হওয়া চাই। মন পড়ে রইল কামকাঞ্চনে অথচ নাম করছি, তাতে কী ফল হবে? রুচি চাই, বিশ্বাস চাই।' বলেই পরিহাসপ্রসন্ন উপমা দিলেন: 'বিছে বা ডাকুর কামড় শুধু মন্ত্রে সারে না, ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়।'

আবার বললেন, 'সংসারাসক্ত বদ্ধজীব মৃত্যুকালে বিকারে খেয়ালে হলুদ, পাঁচ-ফোড়ন, তেজপাতা বলে চেঁচায়। শুকপাখি সহজবেলা বেশ রাধাকৃষ্ণ বলে, বিল্লি ধরলেই নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ-ক্যাঁ করে।

তাই নামের সঙ্গে-সঙ্গে অনুরাগ বাড়াও। শুধু একটা অভ্যস্ত নিষ্প্রাণ বুলি নয়, একটা প্রজ্বলন্ত প্রেম-মন্ত্র। যাকে ভালোবাসি তার ডাক-নামটিকে যেন হৃদয়ের সুর দিয়ে ডাকা। সেই ডাকের সংঘর্ষে বাতাস সমীরিত হবে, সঞ্জীবিত হবে সেই নিরুত্তর নিষ্ঠুর কাষ্ঠ। তারই প্রত্যুত্তর একদিন পুষ্পায়িত হবে সেই কাষ্ঠে।

বারবার এই তনু পাবে না, পাবে না এই বিরহবারিভরা মানস-সরোবর। কত তীর্থ তুমি ঘুরে বেড়াবে, তোমার এই মানব দেহেই সেই নবনবীন নরনারায়ণের মিলনতীর্থ। তোমার ধনকাঞ্চন দিয়ে কী হবে, কী হবে তোমার বৈভবভার নিয়ে? এই মানবজন্ম পেয়েছএই-ই তো তোমার পরম ঐশ্বর্য। এই যে বুকভরা ব্যাকুলতা পেয়েছ, এই যে পেয়েছ ভালোবাসার শক্তি, এই-ই তো তোমার মহান সম্ভাবনা।

নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। ভাষায় কি হবে, চাই প্রচ্ছন্ন ভালোবাসাটুকু। যত পেশাকী ভাষাই ব্যবহার করো না কেন, অন্তরে ঠিক ভালোবাসাটি আছে কিনা এটি ঠিক বুঝতে পারে অন্তর্যামী। -

রামকৃষ্ণ গল্প বললেন, 'একজনের শ্বশুর-ভাশুরের নাম হরি-কৃষ্ণ। এখন হরিনাম তো করতে হবে, কিন্তু হরেকৃষ্ণ বলবার জো নেই। তাই সে জপ করছে:

'ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।
ফরে রাম ফরে রাম রাম রাম ফরে ফরে॥'

অনুরাগ নিয়ে কথা। মাটি যতই শক্ত হোক, যদি অনুরাগের বর্ষণ থাকে, তবে নাম-বীজ, বীজের অঙ্কুর যতই কোমল হোক, মাটি ঠিক ভেদ করে উঠবে।

নামে আর প্রণামে তফাত নেই। নামটি প্রকৃষ্ট হলেই প্রণাম। নাম অর্থ যা নামাব, অহঙ্কার থেকে অবিদ্যা থেকে নামায়, নামায় চিরচলার পথে, রিক্ততার পথে উন্মুক্তির আহবানে।

যা নমনীয় করে নমস্কারে তাই নাম।

কিন্তু সংসারী লোকদের ব্যবহারটা দেখেছ ? বলছেন রামকৃষ্ণ :

'অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নেই বলে মুখ বুজে যত রকম ইশারা করতে থাকে। আবার কেউ কেউ মালা জপ করবার সময় তার ভেতরেই মাছ দর করে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ মাছটা। নারায়ণ পুজো হবে, পুজোর আয়োজন সব হচ্ছে—ঈশ্বরের কথাটি নেই, কেবল সংসারের কথা। গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, কোথায় ভগবানের চিন্তা করবে, তা না, যত রাজ্যের গল্প জুড়ে দিলে। তোর ছেলের বিয়ে হল, কি গয়না দিলে ? কেউ আবার বললে, হরিশ আমার বড় নেওটা। আবার কেউ বললে, মা দুর্গাপুজো আমি না হলে হয় না। শ্রীটি গড়া পর্যন্ত। দেখ দেখি কোথা গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, যত রাজ্যের সংসারের কথা। বিশ্বাস নেই তবু পাখি-পড়ার মত করে যাচ্ছে জপ-তপ।'

আর গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কী চমৎকার বললেন :

'গঙ্গাস্নান করলেই পাপ মুক্তি হয় না ? কিন্তু আসলে গঙ্গাস্নানের সময় পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গাতীরের গাছের উপর বসে থাকে। যাই তুমি গঙ্গা-স্নান করে তীরে উঠছ অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে।'

আমার পুজো কি বাইরের অনুষ্ঠানে ? আমার তো বৃন্তচ্যুত ফুল দিয়ে পুজো নয়, আমার হৃৎসংলগ্ন রক্ত দিয়ে পুজো। আমি মন্দির কোথা পাব, এই দেহই আমার মন্দির। পুজো তো আমার বাইরের বসনে নয়, আমার মেদমজ্জায়। তাই আমার পুজোকে জীবনের সঙ্গে অনুস্যূত করে নিতে হবে। পুজো যদি জীবন থেকে বিযুক্ত হয় সে পুজো অর্থহীন। সে পুজো অপবিত্র। রক্ত যদি দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায় তবে সে রক্তে গতি-শক্তি কই, শুচিতা কই ?

আসল হচ্ছে ভালোবাসা। শাখাপল্লব ছেড়ে দিয়ে-দিয়ে বারে-বারেই ফিরে আসতে হচ্ছে মূলে।

বললেন রামকৃষ্ণ : 'ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা এলে কেবল তারই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালোবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভালো লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে-বলতে লাল পড়ে ! যদি কেউ ছেলের সুখ্যাত করে তো অমনি বলবে, ওরে তোর খুড়োর জন্যে পা ধোবার জল আন।'

আবার জের টানলেন :

'যারা পায়রা ভালোবাসে, তাদের কাছে পায়রার সুখ্যাত করলে বড় খুশি। যদি কেউ পায়রার নিন্দে করে, তাহলে বলে উঠবে, তোর বাপ চৌদ্দ পুরুষ কখনো কি পায়রার চাষ করেছে ?'

তুচ্ছ উপকরণই রাশীকৃত করছি। আমাদের যেটুকু পুজো সেটুকুও হয়তো ঐ উপকরণেরই লোভে। পুজো করছি পুণ্যার্জনের জন্যে এই লোভবুদ্ধি এসে ঢুকলেই পুজো প্রসাদহীন হবে। ভালোবাসার মধ্যে ঢুকবে এসে ব্যবসায়।

উপাসনা তখন রূপো-সোনার নামান্তর হবে।

আধ্যাত্মিকতার সেই অপমৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমার ভালোবাসা সঞ্চয়ে নয় বিসর্জনে। বিনিময়ের ভালোবাসা নয়, বিনিমূল্যের ভালোবাসা। তোমার আনন্দ যেমন অহেতুক, আমার ভালোবাসাও তেমনি।

তুমি হাতে-হাতে কিছু দেবে তাই তোমাকে ভালোবাসব এ তো হাটের হিসেব। তোমার কাছ থেকে কোনো মূল্যই নেব না অথচ তোমাকে দেব এই-খানেই তো আমার জয়। তুমি আমাকে কণ্টকে বিদ্ধ করবে আর আমি কণ্টকিত বৃন্তে একটি রক্তগোলাপ বিকশিত করব এইখানেই তো আমার ঐশ্বর্য।

৫৬

কিন্তু যাই বলো, সময় না এলে কিছু হবার নয়।

কখন যে কি করে সময় ঠিক আসে কেউ জানে না। কেউ জানে না হঠাৎ কোনদিন কি এক বিরল মুহূর্তে মন খারাপ করে বসবে। কবে কোন এক অজানা মুখকে মনে হবে বহুজন্মের পরিচিত। কবে আলোতে, না অন্ধকারে, হঠাৎ বিশ্বাস করে বসব, আরেকজন কে আছে কাছে বসে।

সমস্ত অবিচারের পর কোথায় যেন বিচার আছে। সমস্ত জমা-খরচের পর কোথায় যেন মিলবে জীবনের হিসেবের অঙ্ক। সমস্ত বিভেদ আর বিরোধের পর আছে কোথাও সামঞ্জস্য। সমস্ত বিতর্কের পর আছে কোথাও সমাধানের শান্তি। সমস্ত জটিল তত্ত্বের দুরূহতা কোথায় যেন একটি সহজ ব্যাখ্যায় তরল হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সেই সরল সময়টি আসা চাই। তাই কৌতুকচ্ছলে বোঝালেন রামকৃষ্ণ : 'ভক্তসঙ্গে কেউ-কেউ এখানে এসেছে নৌকো করে। তাদের ভারি বিষয়-বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভালো লাগছে না, কেবল ছট্‌ফট করছে। বার-বার ভক্ত বন্ধুটির কানে ফিসফিস করে বলছে, কখন উঠবে, কখন উঠবে? যখন দেখল বন্ধুটি কোনোরকমে উঠল না, তখন বিরক্ত হয়ে বললে, তবে তোমরা কথা কও, আমি নৌকোয় গিয়ে বসি।'

আবার বলছেন : 'যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নেই, তাদের আমি বলি, তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বোসো। অথবা বলি, বিল্‌ডিং দেখ গে।'

আমরাও এই বিল্‌ডিংই দেখছি। দেখছি ইট কাঠ চুন সুরকি। মেদ-মজ্জা মাংস চর্ম। ধন যশ প্রভাব প্রতিপত্তি। মন্দিরের দেবতাকে দেখি না। দেখি না তাঁকে যিনি প্রাণরূপে প্রতীয়মান, প্রাণরূপে প্রবহমাণ। রূপের অন্তঃপুরে দেখি না সেই অপরূপকে। ব্যক্তের মাঝে সেই বচনাতীতকে। আমরা অকৃতার্থ। আমাদের দেখা স্থূলকে দেখা, স্থির-কে দেখা নয়। কিন্তু যাই দেখি, আধার যদি না বড় হয়, তবে কি বেশি জিনিস ধরাতে পারব? রেড়ির তেলের ম্যাড়মেড়ে

বাতি হয়ে আলো করতে পারব কি রাজসভা ?

যাকে যা দেবার তা কি ঈশ্বর আগে থেকেই ঠিক করে রাখেননি ?

'ঠিক করে রেখেছেন।' বলেই একটি মজার গল্প ফাঁদলেন : 'একখানি সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাদের তাতে পেট ভরতো না। একদিন সরাখানি হঠাৎ ভেঙে গেল। তাতে বৌদের ভারি ফুর্তি। তাই দেখে শাশুড়ী বলছে, নাচো কোঁদো বৌমা, আমার হাতের আটকেল ঠিক আছে।'

তোমার কাছে আরো পাব এই তো আমার প্রার্থনা নয়। তোমার কাছে যা পেয়েছি তাই তো আমার অন্তহীন। তবু আরো যদি কিছু চাই সে তোমাকে, তোমার হাতের পারিতোষিককে নয়। কর্ণধারকে, নয় কোনো সম্ভার-ভরা তরণী। নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে চাই তোমার সঙ্গে মহাতরঙ্গে দুলতে। তোমাকে যদি আরো চাই, তার মানে একলা ঘরের অন্ধকারে চাই না, চাই জগদ্ভাসক সূর্যের আলোতে, বিশ্বব্যাপী জীবের জনতায়।

কিন্তু যখনই চাই ঐ কামকাঞ্চনই চেয়ে বসি। রামকৃষ্ণ বললেন আরেকটি মজার কাহিনী : 'কেশব সেন একদিন এসেছিল। রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ-কেউ বললে, আজ থেকে যাব। কেশব বললে, না, কাজ আছে, যেতে হবে। তখন আমি হেসে বললাম, আঁশ-চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না ? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল, মাছ বিক্রি করে আসছে, চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। বাড়ির গিন্নি সেই অবস্থা দেখে বললে, কি গো, ছটফট কচ্ছিস কেন ? সে বললে, কে জানে বাপু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। আমার আঁশ-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো ? তা হলে বোধহয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁশ-চুপড়ি আনাতে, জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুতে লাগল।'

একটি নিখুঁত হাসির গল্প। অথচ অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ। আঁশ-চুপড়ি হচ্ছে কামকাঞ্চনের সংসার। পুষ্পবাস হচ্ছে সাধুসঙ্গ। রসের সরোবর হচ্ছে সাধু। তরুণ চন্দনতরু। তৃষ্ণার দেশে কলস্বরা জলধারা।

সৎগ্রন্থ তো তবু জোটে, সাধুসঙ্গই দুর্লভ। ঈশ্বরের কথা বলে এমন লোক কজন ? কজন তেমনি জ্বলন্ত তলোয়ার ? সব কথা পুরোনো হয়ে গেল কিন্তু ঈশ্বরের কথার মাধুর্যস্রোত বেড়েই চলেছে। যার চোখের কালোতে ভালোবাসার আলো ফেললাম, সে কালোর আলো আর শেষ হবার নয়। সেই তো ভঙ্গুর দেহবল্লী, তবু এখনো সেই ব্যাকুলতার বাঁশিই বাজিয়ে চলেছে। সেই ব্যথার সুরে এখনো সেই আনন্দের সুরধুনী।

ভক্ত দেখে ভক্তের বড় আনন্দ।

'গাঁজাখোরকে দেখে গাঁজাখোরের যেমন আনন্দ। হয়তো বা কোলাকুলি করে বসে।'

কেশব সেন বললেন, 'আপনার কাছে এত লোক আসে কেন ? একদিন কুটুস

করে কামড়ে দেবেন, তখন পালিয়ে যেতে হবে।'

'কুটুস করে কেন কামড়াব ? আমি তো লোকদের বলি এও কর ওও কর। সংসারও কর, ঈশ্বরকেও ডাকো। সব ত্যাগ করতে বলি না।' বলে পরিহাস-স্নিগ্ধ কাহিনী বললেন : 'কেশব সেন একদিন খুব লেকচার দিলে। বললে, হে ঈশ্বর, এই করো যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি, আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি। মেয়েরা সব চিকের আড়ালে ছিল। আমি কেশবকে বললাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে ? তা হলে ওঁদের দশা কী হবে ? এক-একবার আড়ায় গিয়ে উঠো, আবার ডুব দিও, আবার উঠো।'

তাই তো বারে-বারে উঠে আসি। সাগর ছেড়ে আবার উঠে আসি মাটিতে। নোঙর খুলে দি একবার, আবার নিগড় পরি। তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন শক্তি কোথায় ? তোমার সে যে সর্বস্বখোয়ানো প্রেম। তাই ক্ষেত বাঁচাবার জন্যে বেড়া বাঁধি। হায়, কত যত্ন করে এই ক্ষেতটুকু নির্মাণ করেছি। অন্তত এই ক্ষেতটুকু যেন বাঁচে। এমন দেখছি সেই বেড়াই ক্ষেতকে খেয়ে যাচ্ছে।

সংসারীদের দেখে তাই রামকৃষ্ণ বলছেন, 'এ একরকম বেশ। সারে মাতে। সারও আছে মাতও আছে। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। নক্সা খেলা জানো ? সতেরো ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। একরকম তাশ খেলা ! যারা সতেরো ফোঁটার কমে থাকে, যারা পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে, তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।'

আমরা খুব সেয়ানা। খুব চতুর। আমরা হচ্ছি, যাকে বলে "এনে দাও বসে মারি, তোর বাপের পুণ্যে নড়তে নারি"-র দল। যাকে রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আঠারো মাসে এক বৎসর।' কিন্তু বুদ্ধির দৌড় কতদূরে ?

৫৭

শুধু ষোলো আনা হলে চলবে না, পাঁচ-সিকে পাঁচ-আনা চাই। ভক্তি-বিশ্বাস এমন হওয়া চাই যেন পাত্র ছাপিয়ে যায়। ভক্তি ঈশ্বরের কিরূপ প্রিয়। রামকৃষ্ণ বললেন, 'খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়।'

ভক্তের স্বভাব কি জানো ? ব্রাহ্মসমাজের বেচারাম আচার্যকে বলছেন রামকৃষ্ণ : 'আমি বলি তুমি শোনো। তুমি বলো আমি শুনি। তোমরা আচার্য কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ ! তোমরা জাহাজ, আমরা জেলে-ডিঙি।'

'ভক্তদের ঠিক গাঁজাখোরের মত স্বভাব। গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কলকেতে ভরপুর এক দম লাগিয়ে কলকেটা অন্যের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে— অন্য গাঁজাখোরের হাতে ঐরূপে কলকেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না—ভক্তেরাও তেমনি একসঙ্গে জুটলে একজন ভাবে তন্ময় হয়ে ভগবানের কথা বলে আনন্দে চুপ করে ও অন্যকে আবার ঐ কথা বলবার

অবসর দিয়ে শুনে আনন্দ পায়।'

যেন দুজনে এক বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে, কিংবা একই খেলা দেখে। শুধু দেখে আর পড়ে সুখ নেই। এখন চাই কিছু মুখরতা, চাই কিছু স্তব্ধতা। আমি উদ্বেল হয়ে বলি, তুমি শোন। তারপর তুমি বলো আমি শুনি রুদ্ধ নিশ্বাসে।

ভক্তি যদি একবার ধরে, তবে আনন্দরসে মাতাল করে রাখে। ভক্তির আরেক নাম হরিরসমদিরা। 'হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।' শোনা যায়, গিরিশ ঘোষকে রামকৃষ্ণ নিজের হাতে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুই এ নেশা করছিস কেননা তুই আরেক নেশার খবর পাসনি বলে। যখন তোকে সে নেশা পেয়ে বসবে তখন দেখবি এ নেশা কোন ছার!'

এবার একটি মজাদার কাহিনী জুড়লেন রামকৃষ্ণ যখন দেখলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার, যিনি বিজ্ঞানের বাইরে আর কোনো বিস্ময় আছে বলে মানতে রাজী নন, হরিনাম গান শুনে ভাববিভোর হয়েছেন।

'ছেলে বলেছিল, বাবা একটু মদ চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বলো তো ছাড়া যাবে। বাবা খেয়ে বললে, তুমি বাছা ছাড়ো আপত্তি নেই—কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'

শুধু পুঁথি পড়ে কী হবে? ভক্তি চাই। চাই অন্তরের টান।

'লম্বা-লম্বা কথা বললে কী হবে?' তাই বলছেন রামকৃষ্ণ: 'বাণশিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়—তারপর শরগাছ—তারপর সলতে, তার পর উড়ে যাচ্ছে যে পাখি—'

সাম্যাধ্যায়ী পণ্ডিত অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, ঈশ্বর নীরস।

'একজন বলেছিল', রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে। গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?' তেমনি ঈশ্বরে কি থাকতে পারে নীরসতা?'

কথাটা হচ্ছে, অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। বললেন রামলালকে, 'হ্যাঁরে রামলাল, হাজরা ওটা কি করে বলেছিল? অন্তস্ বহিস যদি হরিস? যেমন একজন বলেছিল মাতারং ভাতারং খাতারং—অর্থাৎ মা ভাত খাচ্ছে।'

শুধু শব্দের আড়ম্বর। পাণ্ডিত্যের জড়পিণ্ড।

'যত গোলমেলে কথা।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'শাস্ত্র পড়ার দোষই ওই, তর্ক-বিচার এনে ফেলে।' শশধর পণ্ডিত কাছেই ছিলেন। বললেন, আজ্ঞে উপায় কি কিছু নেই?'

'তুমি তো ছানাবড়া হয়ে আছ। এখন দু-পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভালো, পরের পক্ষেও ভালো। দু-পাঁচ দিন।'

শশধর বললেন, 'ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে।'

'না, না, আরশুলার রঙ ধরেছে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্বন্ধেও এই উক্তিই করেছিলেন রামকৃষ্ণ: 'আহা! শিবনাথের

কি ভক্তি ! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া !'

কিন্তু যাই হও, একটাতে দৃঢ় হও। হয় সাকারে নয় নিরাকারে। হয় এ ভাবে নয় ও ভাবে। বিশ্বাসের যখন বায়ুবেগ তখন তা ব্যাকুলতা, আর ব্যাকুলতা যখন স্থির তখনই তা দৃঢ়।

বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো ? 'সব ভাসা-ভাসা। যেমন', মজাদার দৃষ্টান্ত দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেমন, খুড়ি-জেঠির কোঁদল শুনে ছেলেরা খেলা করবার সময় পরস্পর বলে, আমার ঈশ্বরের দিব্য, আর যেমন কোনো ফিটবাবু পান চিবুতে-চিবুতে স্টিক হাতে করে বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে, ঈশ্বর কী বিউটিফুল ফুল করেছেন ! কিন্তু বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণিক, যেন', এবার গম্ভীর উপমা দিলেন : 'যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।'

আমি ভাসব না, আমি ডুবে যাব তলিয়ে যাব। এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন ভাবব না। আমি সম্পূর্ণ নিজেকে ছেড়ে দেব, ঢেলে দেব, মেলে দেব। তিনিও কি দেননি মেলে, দেননি ঢেলে ? তেমনি যেমন করে দিয়েছেন আমিও তেমনি করে দেব। কোনো ফাঁক রাখব না। একটি মুহূর্তের ধ্যানে তন্ময় না হয়ে সমস্ত জীবনকে একটি মুহূর্তে সংহত করে তাঁতেই আবিষ্ট, আবিদ্ধ হয়ে থাকব। যা ভাবছি তাঁর ভাবনাই ভাবছি, যা ভুগছি তাঁকেই ভোগ করছি, যা করছি সব তাঁরই করণীয়।

কেশব সেন বললে, 'মশায় যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক করে ঈশ্বর-চিন্তা করে—তা পারে না ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়ো, আত্মীয় কালসাপের মত বোধ হয়। তখন টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করবো এসব হিসেব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু এই চিন্তাই পেয়ে বসে।' বলে একটি গল্প ফাঁদলেন : 'একটি মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটি কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে—তারপর ওগো, আমার কী হল গো, বলে আছড়ে পড়লো, কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।'

৫৮

তারপর সেই দু বেয়ানের গল্প শোনো। ঘরের বেয়ান আর বাইরের বেয়ান। ঘরের বেয়ানের সঙ্গে বাইরের বেয়ান দেখা করতে এসেছে। ঘরের বেয়ান তখন সুতো কাটছিল, নানারকমের রেশমের সুতো। বাইরের বেয়ানকে দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। বললে, 'তুমি এসেছ, আজ আমার কি আনন্দের দিন, যাই তোমার জন্যে কিছু জলখাবার আনিগে।' জলখাবার আনতে গেছে, সেই সুযোগে সুতো দেখে বাইরের বেয়ানের লোভ হয়েছে—রঙ-বেরঙের সুতো। কি করি, কি করি—হঠাৎ একতাড়া সুতো বগলে করে লুকিয়ে ফেললে।

জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান ঠিক বুঝতে পারল বাইরের বেয়ান সুতো সরিয়েছেন। তখন সে বললে, 'বেয়ান, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে আজ দেখা। বড় আনন্দের দিন আজ। আমার ভারি ইচ্ছে করছে দুজনে নৃত্য করি।' তথাস্তু। দুই বেয়ানে নৃত্য করতে লাগল। তখন ঘরের বেয়ান বললে, 'এ নৃত্য ঠিক হচ্ছে না। এস হাত তুলে নাচি। হাত না তুলে নাচলে আবার নাচ কি!' বাইরের বেয়ান এক হাত তুলে নাচতে লাগল। আর এক হাতে বগল টেপা। ঘরের বেয়ান বললে, 'এও ঠিক হচ্ছে না। এস দু হাত তুলে নাচি। দু হাত তুলে নাচ না হলে আবার নাচ! এই দেখ আমি দু হাত তুলে নাচছি।' ঘরের বেয়ান দু হাত তুলে দিলেন। কিন্তু বাইরের বেয়ান বগল টিপে এক হাত তুলেই নাচতে লাগল, আর বললে 'যে যেমন জানে ব্যান!'

আমরাও যেমন জানি। বগলের নিচে যত পেরেছি চেপেছি প্রাণপণে। টাকা-কড়ি বাড়ি-গাড়ি লোক-লস্কর দলিল-দস্তাবেজ—রঙ-বেরঙের সুতো। আর এক হাত তুলে দিয়েছি তোমার দিকে। যে হাতে সুতো চেপেছি সে হাত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে বলে যে হাত তুলে দিয়েছি সে হাতও সংকুচিত। অর্থাৎ পার্থিব সঞ্চয়ের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছি বলে তোমার দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত হতে পারি না। তোমাকে ধরবার একটা ভান করি মাত্র। আসল মন বগলের নিচে, সেই আড়ষ্ট অনড় হাতের দৃঢ়তার দিকে। সেই কারণে অন্য হাতের উত্তোলনের মধ্যে ছলনাই ষোলো আনা। আর যা সব পুরেছি বগলের নিচে, বিদ্যা-বিত্ত, মান-যশ, পুত্র-কন্যা—কিছুই আমার নিজের নয়, সব চোরাই মাল!

তাই নাচতে যদি চাও, দু হাত ছেড়ে দিতে হবে। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বোঁচকা বেঁধেছিলে তাই খুলে এবার নৌকোয় পাল খাটাও।

'আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি।'

এক হাত ছাড়লে এড়িয়ে বেড়াও। দু হাত ছাড়লেই জড়িয়ে ধরো।

কিন্তু আমরা 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর' হয়ে আছি।

'সে জানো না বুঝি?' বললেন রামকৃষ্ণ: 'বাড়িতে এক-একজন পুরুষ থাকে, মেয়েছেলেদের নিয়ে থাকে রাতদিন, আর বাইরের ঘরে বসে ভুড়ুর-ভুড়ুর করে তামাক খায়। নিষ্কর্মার শিরোমণি। তবে কখনো-কখনো বাড়ির ভিতর গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই ছেলেদের দিয়ে বলে পাঠায়, বড়ঠাকুরকে ডেকে আনো। কুমড়োটা দুখান করে দেবেন। তখন সে এসে কুমড়োটা দুখান করে দেয়। এই পর্যন্ত পুরুষত্ব। তাই নাম হয়েছে "কুমড়ো-কাটা বড়ঠাকুর"।'

এমনি করেই কি অপদার্থ হয়ে থাকব? শুধু অসার কুমড়ো নয়, কাটতে পারি যে জন্মমৃত্যুবন্ধন তা দেখাব না?

'চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারে, তা হলে ওসব হাবজা-গাবজা জিনিস জানতে ইচ্ছে হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে,

আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো রে। বৈদ্য বলে, খাবি ? আচ্ছা খাবি। এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে কি বলবে তারই জন্যে অপেক্ষা করে।'

পশুপতি বললে, 'আমাদের বিকার বুঝি চিরকাল থাকবে ?'

'কেন ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।'

'আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে।'

'তা হোক।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'ক্ষণকাল যোগ হলেও মুক্তি।'

সেই ক্ষণকালটিই শাশ্বত। শুভক্ষণে একটি প্রগাঢ় শুভদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতেই সমস্ত জীবন আভাময় হয়ে উঠুক। প্রতিদিনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে থাক, একটি অর্থময় পরিপূর্ণতা। আসলে মন নিয়ে কথা। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে। যদি উন্মন হবার রঙটি একবার মনে লাগাও তাহলেই হল! ফুলকে যদি মনে বলে সুন্দর, তা হলে মনও সুন্দর। যদি প্রভাতের আলোকে মন বলে আনন্দময়, তা হলে সে আনন্দ মনে।

রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন : 'মন ধোপা ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজে ছোপাও সবুজ। দেখ না, যদি একটু ইংরিজি পড় তো মুখে অমনি ইংরিজি কথা এসে পড়বে। ফুটফাট ইট-মিট। আবার পায়ে বুট জুতো, শিশ দিয়ে গান করা—এইসব এসে জুটবে। আবার পণ্ডিত যদি সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়বে।'

আবার বললেন, 'যে কালোপাড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে নিধুবাবুর টপ্পা শুরু হয়েছে। রোগা লোকও যদি বুট জুতো পরে, শিশ দিতে আরম্ভ করে, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ, কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস-ফ্যাস করে টান দিতে থাকে।'

তেমনি অন্তরে যদি ঈশ্বরসঙ্গের সুধা থাকে তবে বচনে-ব্যবহারে শুধু সেই স্বাস্থ্যের সৌরভ পড়বে ছড়িয়ে। সেই কান্তির মঙ্গল জ্যোতি।

কিন্তু যদি থাকে টাকার অহংকার, তা হলে ঝাঁজ কিছুটা বেরিয়ে আসে।

'এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। বাইরে বেশ বিনয়ী। একদিন আমরা কোন্নগর গেছলুম, আমি আর হৃদে।' গল্প বলছেন রামকৃষ্ণ, 'নৌকো থেকে যাই নামছি দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে। হাওয়া খাচ্ছে বোধ হয়। আমাদের দেখে বলছে, কি ঠাকুর! বলি আছো কেমন ? তার কথার স্বর শুনে হৃদেকে বললাম, ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এ রকম কথা। হৃদয় হাসতে লাগল।'

টাকা হয়েছে তো হোক না! মনে কোরো না এ তোমার ঐশ্বর্য। এ ভগবানের ঐশ্বর্য। এ ভগবানের কৃপা। অতএব আসক্তিশূন্য হও। তাঁকে পাওয়াই সব পাওয়া। তাঁর দেশই সব-পেয়েছির দেশ।

বিশ্বম্ভরের মেয়ে, ছ-সাত-বছর বয়েস, প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে। বললে অভিমানের সুরে, 'আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলেন না !'

'কই দেখিনি তো !' বললেন রামকৃষ্ণ।

'তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি।' বললে সেই বালিকা। 'দাঁড়াও, এ পা-টা করি।'

রামকৃষ্ণ আভূমি মাথা নুইয়ে কুমারীকে প্রতিনমস্কার করলেন। বললেন, 'গান জানো ? গান গাও।'

মেয়েটি বললে, 'মাইরি, গান জানি না।'

রামকৃষ্ণ আবার অনুরোধ করলেন।

'মাইরি বললে আর বলা হয় ?'

নিজেই তখন গান শোনাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। 'আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি। তোর ভাতার এলে বলবে কি।'

বালকস্বভাব আনন্দময় রামকৃষ্ণ। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দেখলেন সেবার। স্নান সেরে যাত্রাওয়ালারা রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছে। যে ছেলেটি বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয় খুব ভালো লেগেছে রামকৃষ্ণের। বললেন, তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। যদি কেউ গাইতে বাজাতে নাচতে কি একটা কোনো বিদ্যাতে ভালো হয় সে যদি চেষ্টা করে, শিগগিরই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। তোমার কি বিয়ে হয়েছে ? ছেলেপুলে ?'

'আজ্ঞে একটি কন্যা গত। আরো একটি সন্তান হয়েছে।'

'এর মধ্যে হোল-গেল ! তোমার এই কম বয়স। বলে, সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত !'

পরে আবার বললেন, 'সংসার-সুখ তো দেখছ ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া। যাত্রাওয়ালার কাজ করছ, তা বেশ ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা ! এখন কম বয়স তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা ঐ রকম হয়। গাল-তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা—'

আবার বলছেন, 'অর্থই আবার অনর্থ। ভাই-ভাই বেশ আছো, কিন্তু হিস্যে জুটলেই গোল। কুকুররা গা-চাটাচাটি করছে, পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যদি ভাত দুটি ফেলে দেয় তা হলেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে।'

যেখানে লাভ করতে যাই সেইখানেই লোভ এসে পড়ে। যেখানে ভালোবাসতে যাই সেখানে ত্যাগ। সূচ্যগ্রভূমি নিতে গেলেই শুরু হয় কুরুক্ষেত্র। আর যদি ভালোবাসা দিতে যাই হৃদয়ে-হৃদয়ে আসমুদ্র রাজ্যবিস্তার।

'কিসে কি হয় বলা যায় না' বললেন মহেন্দ্র সরকার। 'পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরি কাশি। আমি দেখতে গেছলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক [illegible]তে পারি না। শেষে জানতে পারলুম গাধা ভিজেছিল। যে গাধার দুধ সে মেয়েটি খেত—'

'কি বলো গো !' রামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন : 'তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গেছল—তাই আমার অম্বল হয়েছে।'

এই মহেন্দ্র সরকারকেই রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'শালা যেন গরুর জিভ টিপলে!' অসুখের স্থানটি দেখতে চেয়েছিল ডাক্তার। তাই এই হাসিমেশানো যন্ত্রণা-বেঁধা কথা।

ভগবান ডাক্তার বললে, 'তিনি বোধহয় ইচ্ছে করে এমন করেননি।'

'না, না, তা নয়, খুব ভালো করে দেখবে বলে টিপেছিল ! কিন্তু শালা যেন গরুর জিভ টিপলে।' একটি যন্ত্রণার সঙ্গে একটি স্নেহ এসে মিশেছে। স্নেহ যখন মেশে তখন আর কাতরতা নেই, প্রসন্নতা।

নরেনকে বললেন, 'একটু গা না।'

নরেন বললে, 'ঘরে যাই অনেক কাজ আছে।'

'তা বাছা আমাদের কথা শুনবে কেন ? যার আছে কানে সোনা, তার কথা আনা-আনা। যার আছে পোঁদে ট্যানা তার কথা কেউ শোনে না।'

'বলছেন যন্ত্র নেই, শুধু গান— 'নরেন ফের আপত্তি করল।

'আমাদের বাছা যেমন অবস্থা। এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত।'

এবার বলরামের একটি ছবি আঁকলেন রামকৃষ্ণ।

'বলরাম বলে, আপনি নৌকো করে আসবেন, একান্ত না হয় গাড়ি করে আসবেন। খ্যাঁট দিয়েছে, তাই আজ বিকেলে নাচিয়ে নেবে। এখান থেকে একদিন গাড়ি করে দিছলো—বারো আনা ভাড়া। আমি বললাম, বারো আনায় দক্ষিণেশ্বর যাবে ? তা বলে, ও অমন হয়। গাড়ি রাস্তায় যেতে-যেতে একধার ভেঙে পড়ে গেল। আবার ঘোড়া মাঝে-মাঝে থেমে যায় একেবারে। কোনো মতে চলে না। গাড়োয়ান এক-একবার মারে, তখন এক-একবার দৌড়োয়। তারপর রাম খোল বাজাবে, তাতে আবার তালবোধ নেই। বলরামের ভাব, আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ করো।'

'বলরামের আয়োজন কি জানো ? বামুনের গোষ্ঠি খাবে কম, দুধ দেবে হুড়হুড় করে। বলরামের ভাব, আপনারা গাও আপনারা বাজাও।'

তারপর ছবি দেখ জয়গোপাল সেনের : 'সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুটো পচা ডালিম।'

শুধু রসিকতা নয়, নিপুণ কথাশিল্প।

কেশব-বিজয়ের ঝগড়া নিয়ে বলছেন : 'তোমাদের ঝগড়া বিবাদ, যেন শিব-রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধ হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূত-প্রেতগুলো আর রামের বাঁদরগুলো—ওদের ঝগড়া-কিচিকিচি আর মেটে না।' আবার বললেন, 'জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। মা'র মঙ্গল আর

মেয়ের মঙ্গল যেন আলাদা !'

মহিমাচরণকে দেখে বলছেন, 'এ কি ! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত ! এমন জায়গায় ডিঙ্গি-টিঙ্গি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ !'

বিদ্যাসাগরকেও বললেন ঐ কথা।

'আমরা জেলে ডিঙি। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ। কি জানি চড়ায় পাছে লেগে যায় !'

বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন : 'বঙ্কিম ! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো !' বঙ্কিম বললেন, 'আর মশায় ! জুতোর চোটে। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

'তুমি কি বুঝছ না মনের ভাব ?' বললেন মহেন্দ্র সরকার : 'কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখতে আসছি !'

'না গো, মূর্খের জন্যে কিছু বলো। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায়নি। বলেছিল, রাম, তোমাকে পেয়েছি, আবার রাজা হয়ে কি হবে ! রাম বললেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্যে রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হল—তাদের শিক্ষার জন্যে রাজা হও।'

মহেন্দ্র সরকার প্রশ্ন করলেন : 'এখানে তেমন মূর্খ কই ?'

বললেন রামকৃষ্ণ : 'না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়িগুগলিও আছে।'

ডাক্তার দুটি গ্লবিউল দিলেন রামকৃষ্ণকে, বললেন, 'এই দুটি গুলি দিলাম, পুরুষ আর প্রকৃতি।'

'হ্যাঁ, ওরা একসঙ্গেই থাকে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'পায়রাদের দেখনি ? তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ।'

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা গান গাইছে। 'তোমরা গান গাচ্ছিলে, ভালো হয় না কেন ? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই।'

'নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানে রাত-দিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে। "তাকুটি" "তাকুটি" করছে। রব উঠে গেল, সাতবার মরে সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে। পাছে সর্দি-গরমি হয়, হৃদে টেনে নিয়ে যায় মাঠে। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল-করতাল—তাকুটি, তাকুটি।'

সেখানকার গোঁসাইয়েরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতোও নিই নাই। কে বলেছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইয়েরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞেস করলে, এর মালা-তিলক নেই কেন ? তাদেরই একজন বললে, নারকোলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে।'

জ্ঞান হলেই খসে যাবে উপাধি। প্রেম হলেই খসে যাবে আবরণ।

এই সব বর্ণনায় রামকৃষ্ণের যে প্রফুল্ল-নির্মল মনোমোহন মূর্তিটি দেখতে

পাই এইটিই হচ্ছে তাঁর সরল-সাধনার পরিচয়। যে হাসতে জানে সে-ই বাঁচতে জানে—বাঁচাতেও জানে। তুলতে পারে তিক্ততার কাঁটা। উড়িয়ে দিতে পারে মনোমালিন্যের মেঘ। হাসির ছিটে দিয়ে শোধন করতে পারে মনের মণ্ডপ মণ্ডপের সামনে মন্দির। হাসির দেউড়ি পেরিয়েই আনন্দময়ের আয়তন।

৬০

যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। হাসির মধ্য দিয়েই মেলালেন রামকৃষ্ণ।

'বৈষ্ণবচরণকে অনেক সুখ্যাত করে আনালুম সেজবাবুর কাছে। সেজবাবু খুব খাতির-যত্ন করলে। রুপোর বাসন বের করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি, আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।'

আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি! একটি কৌতুককুশল পরিচ্ছন্ন মনের স্বাচ্ছন্দ্য।

'শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে। কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, কুকুরের ল্যাজ ধরে পার হওয়াও তা।' একটু গম্ভীর হলেন কি রামকৃষ্ণ? 'সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।' পরে একটি হাসির রসস্রোতে সবাইকে মিলিয়ে দিলেন, ভাসিয়ে দিলেন। 'শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন—শাক্তরা বলে, তা তো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী, তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্যে।'

সবাই হেসে উঠল।

'নিজের-নিজের মত নিয়ে আবার অহঙ্কার কত!' পরিহাসের ধারাটি ঠিক টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। 'শ্যামবাজারের তাঁতীদের মধ্যে অনেক বৈষ্ণব। তাদের লম্বা-লম্বা কথা। বলে, ইনি কোন বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! ও আমরা ছুঁই না। কোন শিব? আমাদের আত্মারাম শিব। কেউ আবার বলছে, তোমরা বুঝিয়ে দাও না কোন হরি মানো? তাতে কেউ বলছে, না, আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক। এদিকে তাঁত বোনে, আবার এ সব লম্বা-লম্বা কথা।'

আমি সব মানি, সব টানি, সকলকে মিলিয়ে দিই। আমার নিখিলের দরজায় কোথাও খিল পড়েনি। সর্বপথেই তিনি আমার পাথেয়, সর্বজীবনে তিনিই আমার নিশ্বাস-সমীর। বিশ্বের প্রাঙ্গণে তিনিই নানা বিশেষত্বের বৃক্ষচ্ছায়া। আমি আছি সমতায়, সামঞ্জস্যে। সমস্ত ছায়ার অন্তরালে একই সূর্যদীপ্ত তারই উজ্জ্বল উল্লেখে। যিনি পরিকীর্ণ হয়েছেন তিনিই পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। যিনি আগুন তিনিই কণা-কণা স্ফুলিঙ্গ। যিনি তরঙ্গ তিনিই বিন্দু-বিন্দু বুদ্বুদ।

যিনি প্রাণস্বরূপ তিনিই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন।

তাই যখন বিজনে আছি আছি তাঁর ধ্যানে, যখন সজনে থাকি আছি তাঁর স্নানস্পর্শে। যখন অন্তরে আছি আছি তাঁর স্মরণে, যখন বাইরে আসি থাকি তাঁর পাশে-পাশে, ছুটি তাঁর পিছু-পিছু। স্মরণেও তিনি অনুসরণেও তিনি। সীমানির্মাণেও তিনি, তাঁর নিবিড়তা ; সীমালঙ্ঘনেও তিনি, তাঁর নির্মুক্তি। তিনিই একমাত্র অনতিক্রম্য। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সমস্ত মত্ততার পর তিনিই একমাত্র অপ্রমত্ত শান্তি। অব্যাহত সমন্বয়।

কিন্তু কে চেনে তোমাকে। আমরা সব বেগুনওয়ালা। হীরের মূল্য বুঝি এমন সাধ্য কই ?

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বেগুনওয়ালাকে হীরের দাম জিজ্ঞেস করেছিল। সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি। এর একটাও বেশি দিতে পারি না।'

ঈশ্বর অনন্ত হোন আর যাই হোন, তাঁর যা সারবস্তু, মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে। তাই তিনি অবতার। অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা মেটে কই ? জীবের প্রয়োজনে অবতার। পরিহাস-পরিচ্ছন্ন উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'কি রকম জানো ? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকেই ছোঁয়া হয় বটে। শিঙটা ছুঁলেও গাইকে ছোঁয়া, ল্যাজটা ছুঁলেও তাই। কিন্তু গরুর সারবস্তু হচ্ছে দুধ, সেটি আসে বাঁট দিয়ে।'

মহিমারঞ্জন বললে, 'দুধ যদি দরকার হয়, গাইটার শিঙে মুখ দিলে কি হবে ? বাঁটে মুখ দিতে হবে।'

'কিন্তু বাছুর প্রথম-প্রথম এদিক-ওদিক ঢু঳্ মারে', বললেন বিজয়কৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ বললেন শেষ কথা : 'আবার কেউ হয়তো বাছুরকে ঐ রকম করতে দেখে বাঁটটা ধরিয়ে দেয়।'

তুমিই ধরিয়ে দাও তোমাকে। তুমি প্রকাশ, তুমিই প্রকাশিত হও আমার হয়ে। তুমি যদি না প্রকাশিত হও তবে এই প্রেম যে অকৃতার্থ হয়ে যাবে। তুমি যে শুধু নক্ষত্রদ্যুতিতে নও, আছ আমার নয়নদ্যুতিতে এই অনুভবটি জীবনে প্রদীপ্ত করে তোলো। তুমি অন্তরে আছ বলেই বাইরে তোমাকে দেখি, দাও সেই দৃষ্টির বিমুক্তি। তুমিই তোমাকে চিনিয়ে দাও। তুমি ছাড়া আর যে কেউ নেই কিছু নেই দাও সেই দ্বারহীন উদার উপলব্ধি।

'যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে, গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত তার ছুঁতে হয় না।'

তাই একটিমাত্র বিন্দুতেই অনন্তকে দেখি। একটি শিশিরবিন্দুতে পরিপূর্ণ নীলাম্বর। একটি অশ্রুবিন্দুতে তোমার আনন্দঘন মুখচ্ছবি। নির্জন দীর্ঘশ্বাসের মুহূর্তে একটি নিবিড় নৈকট্যের আশ্বাস।

রামকৃষ্ণ বললেন কেশবকে, 'কেশব, তুমি আমায় চাও, কিন্তু তোমার চেলারা

আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলছিলুম এখন আমরা খচমচ করি, তারপর গোবিন্দ আসবেন।' কেশব হাসল। বললে, 'আপনি কতদিন এরূপ গোপন থাকবেন? ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে।'

'ও তোমার কি কথা! আমি খাই-দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড়ো করা আমি জানি না। কে জানে তোর গাঁইগুঁই, বীরভূমের বামুন মুই।'

'আচ্ছা আমি লোক জড়ো করব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের আসতে হবে।'

'আমি সকলের রেণুর রেণু।' এইখানেই রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ : 'যদি দয়া করে আসবেন, আসবেন।'

আমি যদি দয়া করে তোমার কাছে আসি! কিন্তু তুমি যদি দয়া করে না টানো যাই কি করে? তোমার দয়া কি করে চাইতে হবে সেইটুকুই শিখিয়ে দাও দয়া করে।

সাধুসঙ্গ না হলে জীবন নীরস লাগে! সেইটিই বলছেন সরস করে: 'গাঁজাখোর গাঁজাখোরের সঙ্গে থাকে, অন্য লোক দেখলে মাথা নীচু করে চলে যায় বা লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু আর একজন গাঁজাখোর দেখলে মহা আনন্দ! হয়তো কোলাকুলি করে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে।'

কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরানুরাগটি না থাকলে সবই তেতো।

বললেন রামকৃষ্ণ : সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে সব চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু শিমুল, অশ্বথ, আমড়া—এরা আর চন্দন হয় না।'

আগাছা হয়ে আছি, হয়তো বা এরণ্ড। তবু তোমার মলয় পাহাড়ের হাওয়া আমার গায়ে লাগুক! আমি নিজে না চন্দন হই, চন্দন যে হওয়া যায় এ আনন্দের সংবাদটিতে অন্তত বিশ্বাস করি। অসার হয়ে আছি বলেই এবার নিঃসাড় হয়ে রইলাম। কিন্তু তোমার স্পর্শে, কে জানে, অঘটন ঘটে যেতে পারে। ঘর্ষণে যদি আগুন বেরোয়, স্পর্শনে কি সৌরভ জাগবে না? ধূলিম্লান হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু তোমার পদধূলি যদি মাথায় নিতে পারি, যাবে না কি মালিন্য?

৬১

'আমি সংসার ত্যাগ করে চললুম। একজন তার স্ত্রীকে বলেছিল।' বলছেন রামকৃষ্ণ : 'স্ত্রীটি একটু জ্ঞানী। বললে; কেন তুমি ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের ভাতের জন্য দশ ঘরে যেতে না হয়, তবে যাও।'

ঘর তো ছাড়বে কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়তে পারবে?

কিন্তু সংসারে যারা আছ তারাও তো কামিনীকাঞ্চনের অধীন। কত রঙ্গরসই

করেছেন রামকৃষ্ণ : 'হ্যাঁ গা, লোকে বলে খেটে-খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে বসলে নাকি খুব আনন্দ হয় ?' হাসলেন রামকৃষ্ণ : 'মা বলে ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি। রোদে ঝলসাপোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে।'

শুধু স্ত্রী নয়, বড়বাবুর আবার গোলাপী আছে।

'বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচ্ছে না। একজন বললে, গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম হবে। উমেদার তখন দেখা করে বললে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না। ব্যস্, গোলাপী ধরলে বড়বাবুকে। আর যায় কোথা ! পরদিনই বড়বাবুর আপিসে বেরুতে লাগল উমেদার। বড়বাবু বললে এ খুব উপযুক্ত লোক, এর দ্বারা আপিসের বিশেষ উপকার হবে।'

এ আবার একটি করুণ বর্ণনা : 'আবার কারু-কারু স্ত্রীকে আগলাতে-আগলাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার খোট্টা বুড়ো—তার চৌদ্দ বছরের বউ। বুড়োর সঙ্গে তার থাকতে হয়। গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে-খুলে লোকে দেখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।'

সাধু কপনি নিয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভার্যা নিয়ে।

'কিন্তু, খবরদার, মেয়েমানুষ যদি কেঁদে ভাসিয়েও দেয়, বিশ্বাস করবিনে। ঘোমটা দিয়ে শিকনি ফেলতে-ফেলতে কান্না, ওতে ভুলিসনে।'

সংসারে থাকা মানেই সাবধানে থাকা।

'অসৎ লোক দেখলেই আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, হুকোটুকো আছে ? আমি বলি আছে। তারপর মাতাল। তাকে রাগিয়ে দিলে, তোর চৌদ্দ পুরুষ, তোর হেন-তেন, বলে গালাগাল করবে। তাকে যদি বলি, কি খুড়ো কেমন আছ ? তা হলে খুব খুশি হয়ে কত রকম গল্প করবে, তামাক খাবে।'

ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন ?

'লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে ? ঠিক-ঠিক জিনিস দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি। ওজনে কম দিলে কি না দেখে নিবি। আবার যে সব জিনিসের ফাউ পাওয়া যায়, সে সব জিনিস কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি না।'

কামড়াবিনে, কিন্তু ফোঁস করবিনে কেন ? ফোঁস করবি।

'আবার গেরুয়া কেন ? গেরুয়াধারী সন্নেসীকে বললেন, 'একটা কি পরলেই হল ? একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো এখন ঢাক বাজায়।'

আমার অহঙ্কার দূর করো। 'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' হাতের জলাঞ্জলি ফেলে দিয়ে রিক্ত করব হাত। ঐ রিক্ততাই আমার প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষার দীপটির নাম রামনামমণিদীপ। বাতাসে এ বাতি বাধা পায় না বরং জ্বলে। অহঙ্কারের বাতি নিবিয়ে এবার প্রেমের বাতি জেলেছি। তাই আর নেববার নাম নেই। এবার দেখব কার বেশি জোর ? তোমার ঔদাস্যের, না, আমার ঔৎসুক্যের। তোমার দাঁড়িয়ে থাকায়, না, আমার বসে থাকায় ?

ভক্তের বর্ণনা দিচ্ছেন। 'ভক্তের ভিতর একটানা নয়। জোয়ার-ভাটা খেলে।

হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনো ডোবে কখনো ওঠে কখনো সাঁতার কাটে। যেন জলের ভিতর বরফ টাপুর-টুপুর টাপুর-টুপুর করে।'

এ কি শুধু রসিকতা ? কথাশিল্প নয় ? নৈরাশ্যের রাশীকৃত মৃতপত্র উড়িয়ে দেবার মত নয় কি এ মর্মর মুখর চঞ্চলবায়ু ? অনাবৃষ্টির খরতাপের পর নয় কি এ শ্যামলবিমল স্নিগ্ধতা ? তারপর দেখ এবার ভাষার শক্তি : 'যে গরু বাছকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু গাব-গাব করে খায় সে হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।' বুঝিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ : 'উত্তম ভক্ত হুড়-হুড় করে দুধ দেয়।' এই ভক্তিকেই আবার বলেছেন, 'উংপেতে ভক্তি।'

মহিমাচরণ ফোড়ন দিল : 'তবে দুধে একটু গন্ধ হয়।'

'হয় বটে, তবে একটু আওটাতে হয়।' রামকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে চলে গেলেন গভীরে : 'একটু আগুনে আউটে নিতে হয়। জ্ঞানাগ্নির উপর একটু দুধটা চড়িয়ে দিতে হয়, তা হলে আর গন্ধটা থাকবে না।'

ঈশ্বর দয়াময়। বলছিল কেউ-কেউ।

'কিসে দয়াময় ?' জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণ।

'কেন, তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন, আহার যোগাচ্ছেন।'

রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন : 'যদি কারো ছেলেপুলে হয়, তাদের খবর, তাদের খাওয়াবার ভার বাপে নেবে না তো কি বামুনপাড়ার লোকে এসে নেবে ?'

সে কি ? ঈশ্বর কি তবে দয়াময় নন ?

'তা কেন গো ! ও একটা বললুম।' রামকৃষ্ণ এবার পরিহাসচ্ছলে অন্তরঙ্গ হলেন। 'তিনি যে বড় আপনার লোক। তাঁর উপর জোর চলে। আপনার লোককে এমন কথা পর্যন্ত বলা যায়, দিবি না রে শালা !'

একেই বলে ডাকাতে ভক্তি। শত্রুতাতে চিত্তবিনোদ। নিন্দা করে স্তবস্তুতি ; রুদ্ররূপে প্রসন্নতা ! তুমি আমার আপনার চেয়েও আপন এ কথাটি বুঝতে দাও। আমার যা কিছু আছে তাও তুমি, যা কিছু নেই তা-ও তুমি। যা পেয়েছি তোমাকেই পেয়েছি, যা পাইনি তাও তোমাকেই পাওয়া। ইতি বা নেতি, সমস্ত কিছু তোমারই আবরণ, তোমারই আলিঙ্গন। ঢেউ হয়ে আছড়ে ফেলছ, আবার পালে বাতাস লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছ সেই ঢেউয়েরই উপর দিয়ে। যখন চলি তখনও তুমি আমার সঙ্গী। যখন থামি তখনও তুমি আমার সহচর। তুমি অনবরত আমাতে লেগে আছ। আমার কিছুতে মুক্তি নেই। বিনাশও নেই। তোমাতে আমার নিত্য প্রকাশ।

'মানুষগুলো দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারকেল-ছাই, কারু ভিতর কলায়ের পোর।' বলেই অপরূপ ছবি আঁকলেন। মহৎ কথাশিল্পীর নিপুণ তুলিকায়। 'সত্ত্বগুণ কি রকম জানো ? বাড়িটি এখানে ভাঙা, ওখানে ভাঙা,

মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে। উঠোনে শ্যাওলা পড়েছে হুঁস নেই। আসবাবগুলো পুরোনো, ফিটফাট করবার চেষ্টা নেই। কাপড় যা তাই একখানা হলেই হল। হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে। সবাই জানছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয়নি, তাই দেরি হচ্ছে উঠতে। শরীরের উপর আদর পেট চলা পর্যন্ত। শাকান্ন হলেই হল—'

আর রজোগুণের লক্ষণ—ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই-তিনটি আংটি। বাড়ির আসবাব খুব ফিটফাট। দেওয়ালে কুইনের ছবি, রাজপুত্রের ছবি, কোনো বড়মানুষের ছবি। নানা রকমের ভালো পোশাক, চাকরদেরও পোশাক। হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে, কিন্তু সেই মালার মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পুজো করে, গরদের কাপড় পরে পুজো করে।

আর যার ভক্তির তমঃ হয়, তার জ্বলন্ত বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে নেওয়া। মারো কাটো বাঁধো। ডাকাতপড়া ভাব। কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ।

সজীব ভাষায় উত্তপ্ত বর্ণনা। অথচ সহজ, প্রাণস্পর্শী!

মানুষকে কি অপরিসীম মর্যাদা দিলেন রামকৃষ্ণ: 'আমি জানি যেমন সাধু-রূপী নারায়ণ, তেমন ডাকাতরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ! কি বলো গো? সকলেই নারায়ণ!'

কার কি আদ্যোপান্ত পরিচয় জানি! যে ডাকাত তার ডাকাতিটাই দেখি, হয়তো সে মাতৃভক্ত, দেখি না তার মাতৃভক্তি, হয়তো সে পরোপকারী দেখি না তার পরোপকার, হয়তো সে মহানুভব দেখি না তার মহানুভবতা! কত প্রলোভনের সঙ্গে নীরব সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল সে, তার খোঁজ রাখি না। তার এক মুহূর্তের স্খলনকেই দেখি বড় করে। স্খলনকেই শাসন করব দমনকে প্রমাণ করব না? সুতরাং বিচার নয় স্বীকার। প্রত্যাহার নয় প্রতিস্থাপন! কেউ অশ্রদ্ধেয় নয় কেউ অপাঙ্‌ক্তেয় নয়—সবার মধ্যে ঈশ্বরসত্তা, উজ্জীবন ও উদ্ঘাটনের প্রতিশ্রুতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই চিরমানব সেই মহামানবের অস্তিত্ব। দীপ আলাদা, শিখা এক, দীপের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করেই তার দীপ্তি। মানুষের মধ্যে তিনিই মনুষ্যত্ব। মনের মাঝখানে তিনিই মনের মানুষ।

'মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে।' বললেন রামকৃষ্ণ।

অহংবুদ্ধির সংকীর্ণ সীমা থেকে চলে যেতে পারে বৃহতের উপলব্ধিতে। প্রাত্যহিকতার অভ্যাস থেকে ভূমার আনন্দলোকে। শাশ্বত সত্যের মত একটি চরম আনন্দের স্বীকৃতি যদি না থাকত সৃষ্টিতে, তবে প্রাণধারণের উত্তেজনা আসত কি করে?

'মানুষের ভিতর নারায়ণ। দেহটি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো।'

তবু মানুষ ভুলে আছে আত্মপরিচয়। নিজের কৌলীন্যগর্ব।

'মাথায় মানিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।' কি সুন্দর করে বললেন রামকৃষ্ণ। অমৃতের পুত্র হয়ে পড়ে আছে অকিঞ্চিৎকর জীবসীমায়। মুক্তি

কোথায় ? মানুষকে মুক্তি দিয়েই মানুষের মুক্তি। আর সেই মুক্তি নিজেকে প্রকাশিত করে। নিজের মধ্যে সে মহত্তম সত্তাকে প্রমাণিত করে।

৬২

তুমি সব পথ হেঁটে-হেঁটে এসেছ। দীর্ঘ জটিল, উপলবন্ধুর পথ। কিন্তু এসে উঠলে কোথায় ? উঠলে এসে সংসারে। সমস্ত স্রোত ঠেলে সংসারই তোমার উত্তরণের ঘাট। এই সংসারের নিকেতনেই তোমার সাধনার ঘট।

তাই সংসারে যখন থাকি তখন তোমাকেই পাশে নিয়ে থাকি। তোমার প্রতিবেশিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তোমার হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সংসারে স্বর্গ রচনা করব; ক্ষণিকের খেলাঘরকে নিয়ে যাব অমৃতের নিত্যধামে। তুমি এস আমাদের মাঝখানে। আমাদের আধিব্যাধি জরামৃত্যু শোক-বিচ্ছেদের কারাবাসে। তুমি এস একটি শান্ত-শুভ্র মঙ্গলরশ্মির মত। প্রাণ-ঢালা প্রেম-ঢালা সরলতার মত। সমস্ত স্বার্থ আর ঔদ্ধত্য, ভীরুতা আর দারিদ্র্য মার্জিত হোক। দাও একটি অমোঘ সন্তোষ যা রাজৈশ্বর্যকেও ম্লান করে দেবে। দাও একটি অমূল্য দৃষ্টি যাতে ঘোরতর দুর্দিনেও দেখতে পারি তোমার প্রেমমুখের প্রসন্নতা। এই শরীর মন তোমার প্রসাদধারণের পবিত্র পাত্র করে তোলো। পূর্ণ করবার আগে শূন্য করে নাও। অনুরাগী করবার আগে নিঃসম্বল করো। তোমার উপস্থিতির অবিরাম আনন্দ আমার সমস্ত অস্তিত্বে সঞ্চারিত হোক। তোমার স্পর্শে আমরাও কবি হব, প্রীতিতে মৈত্রীতে প্রসারিত হব সর্বভূতে, আপনার মাঝে নিহিত ও সমাহিত যে পরমাত্মা, তাকে প্রকাশিত করব অস্তিত্বের অবারিত আনন্দে।

এই প্রকাশের মন্ত্রটি প্রেম। আর এই প্রেমেই মহাকবির শাশ্বত কাব্য। মনের মাধুর্য প্রাণের আরাম আত্মার প্রশান্তি ॥

সং ক ল ন

পরমহংস

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

[পৃথিবীতে পাঁচটি বৃহৎ ধর্মের মধ্যে তিনটিই মহান মানব দ্বারা প্রবর্তিত। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম লোকায়ত, এবং তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় এড়িয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধের-তিরোধানের পরে আচারনিষ্ঠ যে হীনযান এবং মহাযান সম্প্রদায়গত বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনা হয় খৃষ্টান ধর্মের যীশুর বাণী এবং ইসলাম ধর্মের কোরাণ সংকলিত হয় যীশু এবং মোহাম্মদের তিরোধানের অনেক বৎসর পরে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সংকলিত হয়েছে তাঁর জীবৎকালেই। এই বাণীসকলের প্রধান সংকলয়িতা পরমহংসদেবের শেষজীবনের প্রায় নিত্যসহচর 'শ্রীম', অর্থাৎ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২।

ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন ১৫ই আগষ্ট, ১৮৮৬।

এই সমকালীন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ বাণী তিনি সংকলন করে প্রকাশ করেছেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে (পাঁচ খণ্ড)। তৎপূর্বেও সমকালীন পত্রপত্রিকায় রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ এবং তাঁর কিছু কিছু বাণী প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল পত্রিকাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ধর্মতত্ত্ব', 'সংবাদ প্রভাকর', 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'সুলভ সমাচার', 'ধর্মপ্রচারক', 'পরিচারিকা', 'তত্ত্ব-কৌমুদী', ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই 'রামকৃষ্ণ-উপনিষদ'। এই বাণী সম্বন্ধে স্থানাভাববশতঃ মাত্র দুটি মতামত নিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। ঠাকুরের প্রায় সহস্রাধিক বাণী ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। সেই সকল বাণী হতে কিছু বাণী নিয়ে উদ্ধৃত হলো।]

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও রূপক-গল্প ব্যাখ্যা করে "শ্রীরামকৃষ্ণ-উপনিষদ" নামে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যে গ্রন্থ (১৯৫০ সনে) প্রকাশ করেন, তার সূচনায় লিখেছেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে উপনিষদ বলা মোটেই অত্যুক্তি নয়। প্রাচীন ঋষিদের মতোই এক মহাজ্ঞানী আমাদের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।...যে-সকল শিষ্যগণ তাঁর কাছে বসে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁর কথা শুনতে চাইতেন, তাঁদের কাছে তিনি কথা বলতেন। শিষ্যগণই গুরুর বাণীসকল লিপিবদ্ধ করেছেন।... যাঁরা ঐশ্বরিক জীবন যাপন করেন, তাঁদের কথায় এক অদ্ভুত শক্তি থাকে। সাধারণ পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবীর রচনায় যা নেই, সেই শক্তি সেখানে আছে।

যখন কোন মহর্ষি কথা বলেন, তখন তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যক্ত হয় তাঁর মুখে— সেগুলো কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব মতবাদ, যত সুন্দর হোক, তার মধ্যে যত বস্তুই থাক, ঈশ্বর-প্রাণিত ব্যক্তির মুখোচ্চারিত কথার সঙ্গে কদাপি তার তুলনাই হতে পারে না।'

ফ্রায়েড্রীখ্ ম্যাক্স-মুলার তাঁর বই 'রামকৃষ্ণ : তাঁর জীবন ও বাণী' গ্রন্থের (অক্টোবর, ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত) মুখবন্ধে লিখেছেন : 'যে দেশে (বেদান্তের) এই সকল চিন্তাধারা পরিব্যাপ্ত, যে সকল বাণী রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, সেই দেশকে মূর্খ পৌত্তলিকদের দেশ বলে হেয় করা যায় না ..রামকৃষ্ণের বাণীর পশ্চাতে রয়েছে বেদান্ত। সেইজন্য তাঁর দার্শনিক মতবাদ-সম্পৃক্ত কিছু বাণী সংযোজন করা আমি সমীচীন মনে করেছি।' (উক্ত পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত শ্রীরামকৃষ্ণের ৩৯৫টি বাণী সংযোজিত হয়েছে)।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে বিশিষ্ট জনের প্রচুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সংকলন করা যায়। স্থানাভাববশতঃ এখানে তা সম্ভব নয়। পরমহংসদেবের অমৃতবাণী হতে নিম্নে কিছু সংকলিত হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য উঠলে দেখতে পাওনা ব'লে কি বলবে দিনের বেলায় আকাশে তারা নাই। সেইরকম অজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখতে পাও না বলে কি বলবে ঈশ্বর নাই?

*   *   *

যেমন এক জলকে কেউ বারি বলে, কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার বলে, কেউ একোয়া বলে, তেমনি এক সচ্চিদানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কেউ আল্লা বলে, কেউ হরি বলে, কেউ ব্রহ্ম বলে, কেউ গড্ বলে।

*   *   *

দু'জন লোক ঘোর তর্ক আরম্ভ করছে। একজন বলছে অমুকে খেজুরগাছে সুন্দর লাল রঙের একটা গিরগিটি আছে। আর একজন বলছে তোমার ভুল হয়েছে গিরগিটি লাল নয়—নীল। তর্কে ঠিক না হওয়ায়, শেষে দু'জনে খেজুর-তলায় গিয়ে যে সেখানে থাকতো তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হে, তোমার এই গাছে লাল রঙের গিরগিটি আছে?" সে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" আর একজন বললে "বল কি? সেট্য তো লাল নয়, নীল।" সে বললে "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সে জানতো গিরগিটি বহুরূপী, এই জন্যে যে যে রং বললে সে তাতেই হ্যাঁ দিলে। সচ্চিদানন্দ হরিরও বহু রূপ। যে সাধক হরির যে রূপ দেখেছে, সে তাঁর সেই রূপই জানে। কিন্তু যে তাঁর বহু রূপ দেখেছে সেই কেবল বলতে পারে এ সকল রূপ সেই এক হরিরই বহু রূপ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার এবং তাঁর আরো কত আকার আছে তাহা আমরা জানি না।

*   *   *

গ্যাসের আলো নানাস্থানে নানাভাবে জ্বলছে, কিন্তু এক আধার হ'তে আসছে। নানা দেশের নানা জাতির ধার্মিক লোক সেই এক পরমেশ্বর হ'তে আসছে।

*   *   *

লুকোচুরি খেলায় বুড়ী ছুঁলেই আর চোর হয় না, সেই রকম ঈশ্বর ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, তাকে আর চোর করবার যো নাই। সংসারেও সেইরকম ঈশ্বরকে ছুঁতে পারলে আর ভয় থাকে না। যিনি ঈশ্বরকে ছুঁয়েছেন, সংসারে সকল অবস্থাতেই তিনি নিরাপদ থাকেন, কিছুতেই তাঁকে আর বদ্ধ করতে পারে না।

লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটির ভিতর রাখ, আর আঁস্তাকুড়েই ফেলে রাখ সোনাই থাকবে লোহা হবে না। যিনি ঈশ্বর পেয়েছেন তাঁর অবস্থা সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন তাঁর গায়ে আর কিছুতেই দাগ লাগবে না।

* * *

লোহার তরবারে স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তরবার হয়, কিন্তু গড়নটা সেই-রকমই থাকে, তবে কিনা তাতে আর হিংসার কাজ চলে না। সেইরকম ঈশ্বরকে ছুঁলে আকার সেইরকমই থাকে, কিন্তু তার দ্বারা আর অন্যায় কাজ হয় না।

* * *

সমুদ্রের ভিতরে লুকানো চুম্বক পাথর যেমন হঠাৎ জাহাজের লোহার পেরেক খুলে ফেলে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ডুবিয়ে দেয়, সেই রকম জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে অহঙ্কার ও স্বার্থপূর্ণ জীবনকে মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ক'রে ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

* * *

দুধে জলে একসঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মাখন করতে পারলে জলের সঙ্গে মেশে না। ঈশ্বরকে লাভ করতে পারলে হাজার হাজার সংসারী বদ্ধ জীবের সঙ্গে থাকলেও আর বদ্ধ করতে পারে না।

* * *

গৃহস্থের বৌ নানারকম সংসারের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকে, সন্তান হবার সময় হ'লে সমস্ত কাজ ছেড়ে দেয়। প্রসব হ'লে তার আর অন্য কাজ কর্ম করতে ভাল লাগে না, তখন সে সমস্ত দিন কেবল আপনার ছেলেটীকে লালন পালন করে ও তাহার মুখচুম্বন করে আনন্দ পায়। মানুষও অজ্ঞান অবস্থায় নানা কাজ করে, কিন্তু ঈশ্বরদর্শন পেলে আর সে কাজ ভাল লাগে না, তখন সে তাঁর কাজ ছাড়া অন্য কাজে সুখ পায় না, আর তাঁকে এক মুহূর্তও ছাড়তে চায় না।

* * *

হোমা পাখী আকাশে থাকে, আকাশেই ডিম পাড়ে, ডিমটা পড়তে থাকে, পড়তে পড়তে শূন্যেতেই ফোটে, ছানা হয়ে উড়ে যায় নিচে আসে না। নিত্যসিদ্ধ জীবও তেমনি, তারা কখন সংসারে বদ্ধ হয় না। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নিয়েই মত্ত থাকে।

* * *

হাট হ'তে দূরে থাকলে কেবল হাটের হো হো শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু হাটের ভিতর ঢুকলে আর সে শব্দ শুনতে পায় না, তখন স্পষ্ট শুনতে পায় কেউ আলু চাচ্ছে, কেউ পটল চাচ্ছে। ঈশ্বর হ'তে দূরে থাকলে কেবল তর্ক যুক্তি মীমাংসার গোলমালের মধ্যে পড়ে থাকতে হয়, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে পারলে আর তর্ক মীমাংসা থাকে না, তখন সকলই স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়।

মার পাঁচটী ছেলে আছে, তিনি কাহাকে চুষী, কাহাকে পুতুল, কাহাকে বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজের কাজ করছেন। তার ভিতর যে ছেলেটি খেলনা ফেলে মা ব'লে কাঁদচে তিনি তাকেই কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করছেন। মানুষ তুমিও অন্য জিনিষ নিয়ে ভুলে আছ এ সব ফেলে দিয়ে যখন তুমি ঈশ্বরের জন্য কাঁদিবে তখনই তিনি এসে তোমায় কোলে নিবেন।

* * *

ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান তবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কেন?

পানায় ঢাকা পুকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে তোমরা বলচো পুকুরে জল নাই। যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোক নিয়ে তোমরা বলচো ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কেন? যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেল।

* * *

মলয়-বাতাস বইলে যে গাছে সার আছে সে গাছে চন্দন হয়; কিন্তু অসার পেঁপে, বাঁশ, কলাগাছে কিছু হয় না। ভগবৎকৃপা হ'লে যাদের সার আছে, তারাই মুহূর্তের মধ্যে বদলে পবিত্র হ'য়ে ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হয় কিন্তু অসার বিষয়াসক্ত মানুষের কিছু হয় না।

* * *

মানুষ বালিশের খোল, যেমন বালিশের খোলের উপর দেখতে কোনটা লাল, কোনটা কাল, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখতে কেউ সুন্দর, কেউ কাল, কেউ সাধু, কেউ অসাধু, কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

* * *

সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল জায়গায় ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোওয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, কোনও জল বা ছোঁয়া যায় না, তেমনি কোন জায়গার কাছে যাওয়া যায়, কোন জায়গার দূরে থেকে গড় করে পালাতে হয়।

* * *

বাঘের ভিতর ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু বাঘের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

* * *

গুরু বললেন, সকল পদার্থই নারায়ণ—শিষ্য তাই বুঝলে। পথের মধ্যে একটা হাতী আসছিল, উপর হতে মাহুত বলছিল, "সরে যাও", "সরে যাও।" শিষ্য ভাবলে "আমি সরব কেন? আমিও নারায়ণ—হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি?" সে সরল না। শেষে হাতী শুঁড়ে দিয়ে তাকে দূরে

ফেলে দিলে। তার বড় লাগলো পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে। গুরু বললেন, "ভাল বলছ, তুমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ কিন্তু উপর হ'তে মাহুতরূপে আর একজন নারায়ণ তোমাকে সাবধান হ'তে বলছিল, তুমি তার কথা শুনলে না কেন?"

* * *

একজন সমস্ত দিন আখের ক্ষেতে জল দিয়ে শেষে দেখলে যে এক ফোঁটাও জল ক্ষেতে যায় নাই, দূরে একটা গর্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়বাসনা, সাংসারিক মানসম্ভ্রম ও সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে মন রেখে উপাসনা করছেন, সারাজীবন উপাসনা ক'রে শেষে তিনিও দেখতে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছ্যাঁদা দিয়ে তাঁর সমুদায় উপাসনা বেরিয়ে গেছে, তিনি যেমন মানুষ, তেমনি পড়ে আছেন, একটুও উন্নতি করতে পারেন নাই।

* * *

বেদ, তন্ত্র, পুরাণ সমুদায় উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গিয়েছে, কেন না বার বার মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম এ পর্যন্ত উচ্ছিষ্ট হয় নাই, কেননা কেহই আজও তাঁকে মুখে বলতে পারে নাই।

* * *

যখন বন্যা আসে তখন খানা ডোবা সমস্ত ভাসিয়ে নে যায়। বৃষ্টিতে সামান্য নালা দিয়ে কষ্টে জল যায় মাত্র। যখন মহাপুরুষ আসেন; সকলেই তাঁহার কৃপায় ত'রে যায়। সিদ্ধ লোকে কষ্টেসৃষ্টে আপনি ঈশ্বর লাভ করে চলে যান।

* * *

বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন কত লোক তার উপর চ'ড়ে ভেসে যায়। তাতে সে ডোবে না। হাবাতে কাঠে সামান্য একটা কাক ব'সলেও ডুবে যায় তেমনি যখন মহাপুরুষ আসেন; কত লোক তাঁকে আশ্রয় ক'রে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টেসৃষ্টে যায় মাত্র।

* * *

রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নে যায়। অবতারেরাও সেই রকম পাপ বোঝাই সংসারী লোকদের ঈশ্বরের নিকট টেনে নে যায়।

* * *

বজ্র বাঁটুলের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেইরকম ধর্মপ্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

* * *

লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেইরকম মহাপুরুষদের কাছের লোকেরা বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

* * *

একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলেন, সুমুখে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে মহা জাঁকজমকে একটি বর আসছে, পাশে একটা ব্যাধ এক-মনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে। এমন যে জাঁকজমকে বর আসছে, তার দিকে সে একবারও চেয়ে দেখছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে প্রণাম ক'রে বললেন, "প্রভু! তুমি আমার গুরু, যখন আমি ধ্যানে বসবো, তখন যেন ঐ রকম লক্ষ্য করি।"

* * *

একজন মাছ ধ'র্‌ছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই! অমুক জায়গায় কোন্‌ পথে যাব?" তখন তার ফৎনায় মাছ খাচ্চে, সে কোন উত্তর না দিয়ে আপনার মনে ফৎনার দিকে লক্ষ্য করে রৈল। কাজ শেষ ক'রে পিছোন ফিরে বললে, "আপনি কি বলছেন?" অবধূত প্রণাম ক'রে বললেন, "আপনি আমার গুরু, আমি যখন পরমাত্মার ধ্যানে বসবো তখন যেন এইরকম আপন কাজ শেষ না করে অন্যদিকে মন না দিই।"

* * *

এক বক আস্তে আস্তে একটা মাছ ধ'রতে যাচ্ছে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বককে লক্ষ্য করছে; কিন্তু বক সে দিকে চেয়েও দেখছে না। অবধূত সেই বককে প্রণাম ক'রে বললেন, "আমি যখন ধ্যানে বসবো তখন যেন ঐ রকম পেছনে চেয়ে না দেখি।"

* * *

একটা চিল মাছ মুখে ক'রে যাচ্ছে, শত শত কাক, চিল এসে তার পিছোনে ঠুকরে কামড়ে বিরক্ত ক'রে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে যে দিকে যায়, সমস্ত কাক চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছোনে পেছোনে যায়। শেষে সে বিরক্ত হ'য়ে মাছটা ফেলে দিলে আর একটা চিল এসে সেটা নিলে, সমুদয় কাক চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছোনে যেতে লাগলো। প্রথম চিলটী নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছে ব'সে রইল। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম ক'রে ব'ললেন, বুঝলুম সংসারের ভার ফেলে দিতে পারলেই শান্তি; নতুবা মহা বিপদ।

* * *

তিন চার জন অন্ধ লোক হাতী দেখতে গেছে। তার ভিতর কেউ হাতীর পায়ে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী থামের মত; কেউ শুঁড়ে হাত দিয়ে এসে ব'ল্‌লে যে, হাতী মোটা লাঠির মত; কেউ পেটে হাত দিয়ে এসে ব'ললে যে, হাতী জালার মত; কেউ কাণে হাত দিয়ে এসে ব'ললে যে, হাতী কুলোর মত। এইরকম সবাই হাতীর চেহারা লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। গোলমাল দেখে একজন এসে ব'ল্‌লে, "তেমরা কি গোলমাল ক'রছ?" তাহারা সকলে তাহাকে

মধ্যস্থ করিল, সে সমুদয় শুনিয়া ব'ল্লে, "তোমরা কেহই ঠিক হাতী দেখ নাই ; হাতী থামের মত নয়—হাতীর পা থামের মত ; মোটা লাঠির মত নয়—হাতীর শুঁড় লাঠির মত ; জালার মত নয়—হাতীর পেট জালার মত ; কুলোর মত নয়—হাতীর কাণ কুলোর মত। এ সকল একত্র করিলে যা হয়, তাই হাতী।" সেই রকম ঈশ্বরের এক দিক যাহারা দেখিয়াছে ; তাহারা পরস্পর ঝগড়া করে।

* * *

ব্যাঙাচির ল্যাজ খ'সে গেলে ব্যাঙ হয়, তখন সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙ্গায়ও থাকতে পারে। অবিদ্যারূপ ল্যাজ খ'সে গেলে মানুষ মুক্ত হয়। তখন সে সচ্চিদানন্দেও থাকতে পারে, সংসারেও থাকতে পারে।

* * *

অসতী স্ত্রীলোক বাপ মা ও সমস্ত পরিবারের ভিতর থেকে সংসারের কাজ-কর্ম করে, কিন্তু তার মন থাকে সেই উপপতির প্রতি। হে সংসারী জীব! মন ঈশ্বরে রেখে তুমিও বাপ মা ও পরিবারের কাজ করিও।

* * *

এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে দুঃখকষ্টে দিন কাটাত। হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যেতে যেতে তার দুঃখ দেখে ব'ল্লেন, "বাপুহে এগিয়ে যাও।" কাঠুরে ব্রাহ্মণের কথা শুনে কিছু এগিয়ে গিয়ে একটা চন্দনবন পেলো এবং সেদিন যত পারলে চন্দনকাঠ কেটে এনে বাজারে বেচে অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেলো। পরদিন সে মনে মনে ভাবতে লাগলো যে ঠাকুর মহাশয় আমাকে চন্দন কাঠের কথা তো কিছুই বলেন নাই, শুধু "এগিয়ে যাও" বলেছিলেন। অতএব আমি এগিয়ে যাই। সে এগুতে লাগলো এবং কিছুদূর গিয়ে একটা তামার খনি পেলো। সেদিন যত পারলে তামা এনে বেচে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেলো। কিন্তু সে তাতে না ভুলে দিন দিন আরও যত এগুতে লাগলো, ক্রমে ক্রমে রূপা, সোণা, হীরার খনি পেয়ে ধনী হ'য়ে প'ড়লো। ধর্মরাজ্যেরও ঐ কথা, যদি জ্ঞানী হতে চাও তবে এগিয়ে যাও। সাধনার কোন বিশেষ অবস্থা (যেমন অষ্ট সিদ্ধাই ইত্যাদি) পেয়ে আহ্লাদে ভুলো না। এগুতে থাক, অমূল্যধনে ধনী হবে।

* * *

কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ। যে ভগবান পায়নি সেই ভগবান সম্বন্ধে নানা গোল করে আর যে তাঁর দর্শন পেয়েছে, সে স্থির হ'য়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

* * *

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন গুন করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে সে আর গুন্ গুন্ করে না, চুপ্ ক'রে মধু পান করে। মানুষ

যতক্ষণ ধর্ম ল'য়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায় নাই, পেলে চুপ ক'রে যায়।

*　　　*　　　*

জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে কোন ভয় থাকে না।

*　　　*　　　*

হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় ক'রে চার পাঁচটি জলভরা কলসী নিয়ে যায়, পথে আত্মীয়দের সঙ্গে গল্প করে, সুখ-দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে মাথার কলসীর উপর, যেন সেগুলি পড়ে না যায়। ধর্মপথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভিতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখতে হবে, মন যেন তাঁর পথ থেকে সরে না যায়।

*　　　*　　　*

সমুদ্রে একরকম ঝিনুক আছে, তারা সদাসর্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে, কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে প'ড়লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরুমন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্যদিকে চেয়ে দেখে না।

*　　　*　　　*

চকমকি পাথর শত বৎসর জলের ভিতর প'ড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারবামাত্র আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত, হাজার হাজার অপবিত্র সংসারীর ভিতর প'ড়ে থাকলেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎকথা হ'লেই সে উন্মত্ত হয়।

*　　　*　　　*

স্রোতের জল বেগে যেতে যেতে এক এক জায়গায় ঘুরতে থাকে, কিন্তু তখনি আবার সোজা হ'য়ে বেগে চলে যায়। পবিত্র আত্মা ধার্মিকদের মনেও কখন কখন অবিশ্বাস, নিরাশা, দুঃখ প্রভৃতির আভা পড়ে, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকতে পারে না। শিগ্‌গীর চলে যায়।

*　　　*　　　*

নুনের পুতুল, কাপড়ের পুতুল ও পাথরের পুতুলকে সমুদ্রে ফেলে দিলে নুনের পুতুল একেবারে গলে যায়, তার অস্তিত্ব থাকে না। কাপড়ের পুতুলে জল ঢোকে বটে, কিন্তু সে জলের সঙ্গে মেশে না, ইচ্ছে করলে তাকে জল থেকে ভিন্ন করা যায়। পাথরের পুতুলে জল কোনমতে ঢোকে না। মুক্ত জীব নুনের পুতুলের মত, সংসারী জীব কাপড়ের পুতুলের সমান, আর বদ্ধ জীব পাথরের পুতুলের মত।

গ্রুটিপোকা যেমন নিজের ঘরে নিজে বন্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার ঘরে আপনি বন্ধ হয়। যেমন প্রজাপতি হ'লে ঘর কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হ'লে সংসারী বন্ধ জীব ঘর থেকে বেরুতে পারে।

* * *

প্রেম তিন রকম—সামর্থা, সামঞ্জস্যা, সাধারণী। উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। উচ্চ—তুমি ভাল থাকলেই হ'লো, আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নাই। মধ্যম—তুমিও ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি। নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাব? তুমি যেমন ক'রে পার অমুক জিনিষ আমায় দাও।

* * *

ঈশ্বর যেন চিনির পাহাড়; তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষুদে পিঁপড়ে একটি ছোট দানা নিলে। ডেঁও পিঁপড়ে না হয় তার চেয়ে একটু বড় দানা নিলে, কিন্তু পাহাড় যেমন তেমনি রইল। ভক্তেরা সেইরকম তাঁর একটা ভাব নিয়ে মেতে যায়, কেউ তাঁর সব ভাব নিতে পারে না।

* * *

সাধুসঙ্গ চালের জলের মত। চালের জলে নেশা কাটায়। যার অত্যন্ত নেশা হ'য়েছে চালের জল খাওয়াও দেখবে তার নেশা চ'লে যাবে। সংসারমদে মত্ত জীবের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

* * *

ভিজে কাঠ উনুনের উপর রাখ্‌লে তাত লেগে তার জল শুকিয়ে জ্বলে উঠে, সেইরকম সাধুসঙ্গ সংসারী লোকের ভিতর কামিনী-কাঞ্চনরূপ জল শুকিয়ে গিয়ে বিবেক-আগুন জ্বলে উঠে।

* * *

মানুষের ভিতর দুটো "আমি" কাজ ক'রছে। একটা "পাকা আমি" আর একটা "কাঁচা"। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ছেলে, আমার শরীর এইটা "কাঁচা আমি"। আর যা কিছু দেখছি যা শুনছি কিছুই আমার নয়, এ শরীর পর্যন্ত আমার নয়, আমি নিত্য-মুক্ত-জ্ঞানস্বরূপ এইটিই "পাকা আমি"।

* * *

জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—স্ত্রীলোক। ঈশ্বরের বাহিরবাটীতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।

* * *

পার্থিব লাভের আশায় সংসারীরা অনেকরকম ধর্মকর্ম ক'রে থাকে, কিন্তু বিপদ, দুঃখ, দারিদ্র্য ও মৃত্যু আসলে তারা সব ভুলে যায়। পাখী সমস্ত দিন "রাধাকৃষ্ণ" বলে, কিন্তু বেড়ালে ধ'রলে কৃষ্ণনাম ভুলে ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রতে থাকে।

সংসারী লোকদের যদি বল সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্যে গৌর নিতাই দু'ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে ব্যবস্থা কল্লেন 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'। প্রথম দু'টীর লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনামের একটু আস্বাদ পেলে তারা বুঝতে পারলে যে, মাগুর মাছের ঝোল আর কিছু নয় কেবল হরিপ্রেমে যে অশ্রুধারা পড়ে তাই, আর যুবতী মেয়ে কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধুলোয় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।

*　　　*　　　*

যেমন আরসিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না, তেমনি হৃদয়ে ময়লা প'ড়লে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছে ফেললে যেমন আরসিতে মুখ দেখা যায়, তেমনি হৃদয় নির্মল হ'লে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

*　　　*　　　*

স্প্রিংএর গদির উপর ব'সলেই নুয়ে যায়, উ'ঠলেই আবার তেমনি সমান হ'য়ে যায়। সংসারী মানুষেরা সেইরকম, যখন ধর্মকথা শোনে তখন ধর্মভাব হয়, কিন্তু সংসারে ঢুকলেই সব ভুলে যেমন তেমনি হ'য়ে পড়ে।

*　　　*　　　*

যেমন কামারশালে লোহা যতক্ষণ হাপোরে থাকে ততক্ষণ লাল থাকে, হাপোর থেকে বার ক'রলেই কাল হ'য়ে যায়, সেইরকম সংসারী মানুষ যতক্ষণ ধর্মমন্দিরে বা ধার্মিক লোকের নিকট থাকে ততক্ষণ ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে ভাব চ'লে যায়।

*　　　*　　　*

পথে যেতে যেতে রাত্রি হ'য়ে পড়ায় এক মেছুনি এক মালীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়, মালী যথাসাধ্য তার সেবা ক'রলে, কিন্তু কিছুতেই তার ঘুম হ'ল না। শেষে সে বুঝতে পারলে বাগানের ফুলের গন্ধে তার ঘুম হ'চ্ছে না। সে তখুনি আঁশ চুপড়িতে জল ছিটিয়ে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ঘুমোলো। বিষয়ী বদ্ধ জীবেরও মেছুনির মত সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না।

*　　　*　　　*

ছোট ছোট ছেলেরা ঘরের ভিতর ব'সে আপন মনে পুতুল খেলছে কোনো ভাবনা নাই; কিন্তু যেই মা এল, অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা মা' বলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন মান যশের পুতুল ল'য়ে সংসারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখে খেলা ক'রছ, কোন ভয় ভাবনা নেই। যদি মা আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখতে পাও, তা হ'লে আর তোমাদের ধন মান যশ ভাল লাগবে না, সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।

*　　　*　　　*

ফল পেকে প'ড়ে গেলে বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু কাঁচা ফল পাড়লে মিষ্টি লাগে

না, ফুটকে যায় ; জ্ঞান চৈতন্য হ'লে জাতিভেদ থাকে না, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে জাতিভেদ বড়ই দরকার।

*　　*　　*

ঝড় উঠলে অশ্বত্থগাছ বটগাছ চেনা যায় না। জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'লে জাতিভেদ থাকে না।

*　　*　　*

কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর আবার তাতে হাঁড়ি তৈয়ার ক'রে, কিন্তু পোড়া হাঁড়ি ভাঙলে আর তাকে নেয় না। তেমনি অজ্ঞান অবস্থায় মরিলে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান-চৈতন্য উদয় হ'য়ে মরিলে আর জন্ম নিতে হয় না।

*　　*　　*

সেদ্ধ ধানে গাছ হয় না, অসেদ্ধ ধানে হয়। সিদ্ধ হ'য়ে মানুষ মরলে আর জন্ম হয় না, কিন্তু অসিদ্ধ অবস্থায় মরলে আবার জন্ম নিতে হয়।

*　　*　　*

আগুন দেখলে কোথা হ'তে পতঙ্গ উড়ে এসে তাহাতে প্রাণ দেয়, আগুন কোনদিন পতঙ্গকে ডাকতে যায় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের প্রচারও সেইরূপ। তাঁহারা কাহাকেও ডাকিতে যান না, অথচ কোথা হ'তে শত শত লোক এসে তাঁদের নিকট শিক্ষা লয়।

*　　*　　*

যে মাছ ধ'রতে ভালবাসে সে যদি শোনে অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, তবে যারা সেই পুকুরে মাছ ধরেছে সে তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কিনা। যদি থাকে তবে কিসের চার ফেলতে হয়, কি টোপ খায় এ সব বিষয় জেনে নিয়ে পরে সে সেই সব নিয়ে তথায় মাছ ধ'রতে যায়, মাছ ধ'রতে গেলে একেবারেই মাছ ধরা যায় না, সেখানে ছিপ্ ফেলে ব'সে থাকতে হয়। তারপর সে মাছের ঘাই ও ফুট দেখতে পায় এবং তারপর মাছ ধ'রতে পারে। ধর্মরাজ্যেও সেইরূপ ; মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস ক'রে ও ভক্তি চার ফেলে, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায় নাম টোপ দিয়ে বসে থাকতে হয়।

*　　*　　*

মাছ যতদূরেই থাক্ না কেন, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবানও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র আসিয়া উদিত হন।

*　　*　　*

শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক। ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে। কখনও কাঁদে কখনও মারে ; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার হইতে আপনার জানিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করেন, তাঁহাকে ভগবান দেখা না দিয়া থাকতে পারেন না।

যেমন ঘণ্টার শব্দ যতক্ষণ শোনা যায় ততক্ষণ সাকার তারপর নিরাকার। ব্রহ্মও সেইরূপ সাকার এবং নিরাকার।

*　　　*　　　*

যেমন সোলার আতা, মাটির হাতী দেখে আসল আতা ও হাতী মনে পড়ে, সেই রকম প্রতিমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।

*　　　*　　　*

আগে গোটা লেখা অভ্যাস হ'লে পরে ছোট হরফ্ সহজে লিখতে পারা যায়; সেইরূপ আগে সাকারে মন বসিলে সহজেই নিরাকারকে ধরিতে পারা যায়।

*　　　*　　　*

যেমন টিপ্ (লক্ষ্য) শিখতে হ'লে আগে মোটা জিনিসের উপর টিপ্ করতে হয়, তারপর সূক্ষ্ম জিনিসেও টিপ্ করা যায়, সেইরকম সাকার মূর্তিতে মন স্থির হ'লে নিরাকার মূর্তিতে মন সহজে স্থির করা যায়।

*　　　*　　　*

যেমন এক চিনিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মঠ প্রস্তুত হয়, তেমনি এক ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হ'য়ে থাকেন।

*　　　*　　　*

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ি যাবার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।

*　　　*　　　*

যেমন এক সোনাতে নানারকম গহনা তৈয়ার হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হ'লেও যেমন সকলেই এক সোনা, সেইরকম ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হ'লেও সকলকার ভেতর সেই এক ঈশ্বর।

*　　　*　　　*

আঁধারে লণ্ঠন হাতে পাহারাওলা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না, তবে যদি পাহারাওলা লণ্ঠনটি আপনার দিকে ফেরায় তবেই সকলে তাহাকে দেখতে পায়। ভগবানও সেইরূপ সকলকে দেখতে পান, কিন্তু কেউ তাঁহাকে দেখতে পান না; তবে যদি তিনি দয়া ক'রে আপনাকে প্রকাশ করেন তবেই লোকে তাঁহাকে দেখতে পায়।

*　　　*　　　*

একজন ব্রাহ্ম সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মে ও হিন্দুধর্মে প্রভেদ কি?" তিনি বললেন "পোঁ বাজানো ও সুর বার করা। ব্রাহ্মধর্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধরিয়া আছে, হিন্দুধর্ম তাহার উপরে নানারকম সুর তান লয় বাহির

করিতেছে।" অর্থাৎ হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মদিগের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিধিও আছে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাভাবে ও নানারূপেও উপাসনা আছে।

* * *

জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবে তাঁহার নাম করিলেই তাহার ফল হইবে। যেমন কেহ তেল মেখে নাইতে যায় তাহারও যেমন স্নান হয়, আর যাহাকে ঠেলে জলে ফেলে দেওয়া যায় তাহারও স্নান হয়, আর কেহ ঘরে শুয়ে আছে তাহার গায়ে জল ফেলে দিলে তাহারও তেমনি স্নান হয়।

* * *

মানুষের দেহটা যেন হাঁড়ি আর মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো যেন জল, চাল ও আলু। হাঁড়ির ভেতর জল, চাল ও আলু দিয়ে তার নীচে আগুন জেলে দিলে যেমন সেই জল, চাল ও আলুগুলো তেতে উঠে এবং তাদের গায়ে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায় অথচ সে শক্তিটা তাদের নয়, আগুনের ; সেই রকম মানুষের ভেতর ব্রহ্মশক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মানুষের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য করে এবং সেই শক্তির অভাব হ'লেই আর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি কার্য করিতে পারে না।

* * *

সকলের অসমক্ষে যিনি ভগবান দেখিতেছেন বলিয়া অধর্মাচরণ না করেন তিনিই যথার্থ ধার্মিক। জনশূন্য মাঠের মাঝে যুবতী সুন্দরীকে দেখে ধর্মভয়ে ভীত হ'য়ে যিনি তার প্রতি কুদৃষ্টি না করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক, আর যিনি কেবল প্রকাশ্যে ধর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ঠিক ধার্মিক নন। অন্ধকারের (যেখানে কেহ দেখিতেছে না) ধর্মই ধর্ম ; আলোর (সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যে) ধর্ম ঠিক নয়।

* * *

চিকের ভিতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তাহারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না। ভগবানও সেইরূপ।

* * *

সচ্চিদানন্দ সাগরের কিনারা থেকে জল খাবে ? না ডুবে খাবে ? যদি সাংসারিক ভোগবাসনা থাকে তাহা হইলে জলে নামিও না ; ঐ সাগরের পরিমাণ করিতে যিনিই গমন করিয়াছেন, তিনিই আর এ সংসারে ফিরিয়া আসেন নাই।

* * *

অবতার ঈশ্বরের কর্মচারী—যেমন জমিদার ও তাহার নায়েব। আপন অধিকারের যে প্রদেশে গোলমাল হয়, জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে প্রেরণ করেন ; সেইরূপ জগতের যে কোন স্থানে ধর্মহানি হয় সেই স্থানেই অবতারকে আসিতে হয়।

সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হ'লেন, ওখানে উঠে যীশু হ'লেন।

* * *

সত্য; ত্রেতা যুগের তপস্যার কথায় বলিতেন, বাদসাই আমলের টাকা এখন চলে না। কেন না সে ক্ষমতা এখন নাই, এখনকার অবতারের মতে চলা চাই।

* * *

এখন নেজা মুড়ো বাদ দিতে হবে, তবে লোকে নেবে। এখনকার লোকে সার জিনিষ চায়।

* * *

যেমন সুতোতে এক গাছা ফেঁসো থাকলে ছুঁচের ছিদ্রে ঢোকে না, তেমনি বাসনার লেশ থাকতে ভগবানলাভ হয় না।

* * *

যেমন উকিলকে দেখলে মকদ্দমার কথা মনে পড়ে, সেইরকম ভক্তকে দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

* * *

পানাকে সরিয়ে দিলে আবার পানা এসে জোটে। মায়াকে ঠেলে দিলে আবার মায়া এসে জোটে। পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দিলে যেমন পানা আর আসতে পারে না, সেইরকম মায়াকে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিলে আর মায়া আসতে পারে না। ঈশ্বর প্রকাশ থাকেন।

* * *

উঁচুতে উঠলে সকলেই এক সমান দেখায়। ঈশ্বর পেলে ভালমন্দ আর থাকে না।

* * *

পাহাড়ে উঠতে গেলে তার তলায় বড় বড় শালগাছ ও ছোট ছোট ঘাস দেখে মনে হয়, ঘাস কি ছোট, শালগাছ কত বড়। পরে সে পাহাড়ের উপর উঠে দ্যাখে, ঘাস ও শালগাছ সমান হয়ে গেছে। সেইরকম পার্থিব দৃষ্টিতে বাপ মা কত বড়, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি প'ড়লে সকলেই সমান হ'য়ে যায়; তখন তাঁর সেবাই কর্তব্য-কাজ হয়।

* * *

আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে তো সব হ'য়ে গেল; এইটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয় ততক্ষণ মাটীর ছাঁচের দরকার।

* * *

সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান দীপের আলোর ন্যায়, ঘরের ভিতরটাই আলো হয়, নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছুই

বুঝতে পারে না কিন্তু সর্বত্যাগীর জ্ঞান সূর্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বাহির সব দেখা যায়।

* * *

অন্য সময়ে কুয়ো খুঁড়ে জল পায়, আর বন্যে এলে যেখানে সেখানে জল, সেই-রকম অন্য সময় অতি কষ্টে সাধন ভজন ক'রে ঈশ্বরলাভ হয়, আর যখন অবতার আসেন, তখন তাঁর দর্শন যেখানে সেখানে মেলে।

* * *

ভগবানের সংগে জীবের খুব নিকট সম্পর্ক, যেমনি লোহা ও চুম্বুক। তবে জীবের প্রতি ঈশ্বরের আকর্ষণ হয় না কেন জান ? যেমন লোহাতে কাদা মাখান থাকলে চুম্বুক টানে না, সেইরকম জীবেতে মায়ারূপ কাদা মাখান থাকলে ঈশ্বর টানেন না। লোহার কাদা ধুয়ে গেলে চুম্বুক টানে, সেইরকম তাঁর কাছে কাঁদলে যখন জীবের মায়ারূপ কাদা ধুয়ে যায়, তখন ভগবান টানেন।

* * *

যতই এগিয়ে যাবে ততই ঈশ্বরের উপাধি কম দেখবে। ভক্ত প্রথম দর্শন ক'রলে দশভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে ষড়ভুজা, আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে দ্বিভুজ গোপাল। যত এগুচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে গেল তখন জ্যোতিদর্শন হ'ল।

* * *

সরকারী হাওয়া এলে পাখা ফেলে দিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপা হ'লে সাধন ভজনের দরকার হয় না।

* * *

যোগ চারি প্রকার—হঠযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। শরীরকে আয়ত্তে আনবার জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া করতে হয়, তাহাকে হঠযোগ বলে। এ যোগে শরীরের উপরই বেশী মনোযোগ হয়। কলিতে হঠযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ? তাদের উদ্দেশ্য তো সেই ভগবান।" তাতে তিনি ব'ললেন, "শেষকালে শরীরে মন এসে পড়ে। যেমন কর্তাভজাদের সাধনা ক'রতে গিয়ে শেষকালে রমণে মন এসে পড়ে।" কর্তাভজাদের মত ভাল বটে, তবে ওরা খারাপ করে ফেলছে, ওদের মত হ'চ্চে "মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোঁজা, তবে হবি কর্তাভজা।" (অর্থাৎ দুজনেই কামজিৎ হওয়া চাই, তবে ঠিক ঠিক কর্তাভজা।)

* * *

অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নাম কর্মযোগ। যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কেবল সেই অনাসক্ত হয়ে কর্ম ক'রতে পারে। তা না হ'লে আসক্তি এসে পড়ে। কর্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ সময় কৈ ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম ক'রতে ব'লেছে তা করবার সময় নেই। কেননা কলিতে আয়ু কম। তারপর অনাসক্ত হ'য়ে, ফলকামনা না করে কর্ম

করা ভারি কঠিন। ঈশ্বরলাভ না ক'রলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা—কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে। সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম ক'রলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে। তখন কেবল রাম নাম, কি হরি নাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হ'ল।

* * *

জ্ঞান, বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার যে উপায় তারই নাম জ্ঞানযোগ। আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ; তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোনমতে যায় না। এদিকে দেহ-বুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে আমি সেই ব্রহ্ম, আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ, শোক, সুখ, দুঃখ এ সব বোধ থাকে তবে জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দর দর কোরে রক্ত ঝরছে—অথচ ব'লছে কৈ হাত তো কাটেনি, আমার কি হ'য়েছে।

* * *

জ্ঞান, জ্ঞান বল্লেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ। প্রথম অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান বিচার ক'রছি কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নেই, ভালবাসা নেই, সে মিছে। আর একটি লক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না; যেই তার নিদ্রা ভাঙ্গে, অমনি ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা আরম্ভ হয়। ব'সে ব'সে বই প'ড়ে যাচ্ছি, বিচার ক'রছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নেই সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

* * *

জড়ভরত রাজা রহুগণের পাল্কি বইতে বইতে যখন আত্মজ্ঞানের কথা ব'লতে লাগলো, রাজা রহুগণ তখন পাল্কি থেকে নীচে নেমে এসে ব'ললে "তুমি কে গো?" জড়ভরত বল্লেন, "আমি নেতি নেতি শুদ্ধ আত্মা। একেবারে ঠিক বিশ্বাস আমি শুদ্ধ আত্মা।"

* * *

জ্ঞানী নেতি নেতি বিচার করে ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়; বিচার ক'রতে ক'রতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হইয়া সমাধি হয় তখন তার ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়।

* * *

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়, প্রণব সমাধিতে লয় হয়, যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অম্। যোগী নাদ ভেদ করে পরমব্রহ্মে

লয় হয়। সমাধিমধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়, এইরূপে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।

* * *

কোন একটি ভাব অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম ভক্তিযোগ। কলিতে ভক্তিযোগই শ্রেয়।

* * *

ভক্তিযোগে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। হঠযোগ, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

* * *

ভক্তিযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের নাম গুণগান করা ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করা; 'হে ঈশ্বর, আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।'

* * *

ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হ'তে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল ফলেই ফলে। যেমন কেউ বাড়ির কার্ণিশের উপর বীজ রেখে গেছলো, অনেক দিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখন সে বীজ মাটীতে প'ড়ে গাছ হ'লো ও তার ফল হ'ল।

* * *

মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা! আবার বিদ্যা মায়াও দুই প্রকার—বিবেক ও বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় কোরে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। অবিদ্যা মায়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বন্ধ করে রাখে; কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।

* * *

যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে ততক্ষণ চন্দ্র সূর্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না। মায়াও তেমনি আমি ও আমার এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায় আত্মার সাক্ষাৎকার ততক্ষণ ঠিক হয় না।

* * *

যে সূর্য পৃথিবীকে আলো করে রেখেছেন, সামান্য একখানা মেঘে সেই সূর্যকে যখন ঢেকে ফ্যালে, তখন সে সূর্য আর দেখা যায় না। তেমনি সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়ার আবরণে দেখতে পাচ্ছি না।

* * *

পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও আবার তখনি পানা এসে জোটে; সেইরকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশ ঠেলে আসতে

পারে না। সেইরকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতর আসতে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবলমাত্র প্রকাশ থাকেন।

* * *

যদি বল কোন্ মূর্তির চিন্তা করবো? যে মূর্তি ভাল লাগে তার চিন্তা করবে। কারও উপর বিদ্বেষ ক'রতে নাই; শিব, কালী, হরি, সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—সবই এক।

* * *

যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দেরই কথা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

* * *

অনন্ত মত অনন্ত পথ, একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে উঠতে গেলে পাকা সিঁড়ি দে উঠা যায়, এক খানা মই দে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়ি দে উঠা যায়, একগাছা দড়ি দে উঠা যায়, আবার একগাছা বাঁশ দেও উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা ওতে খানিকটা পা দিলে উঠা যায় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

* * *

তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম ও নানা মত। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে, আর নানারকম লোকও যায়। হরপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি থাকে, আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে ভিড়ও হয়। যারা বৈষ্ণব তারা বেশীক্ষণ রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে, যারা রামভক্ত তারা সীতারামের মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার বারোয়ারীতে বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে এমন মূর্তিও থাকে। যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নেই সেই সব লোক হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই সব দ্যাখে আর বন্ধুবান্ধবদের চিৎকার ক'রে বলে 'আরে ও সব কি দেখ্ছিস এদিকে আয়।'

* * *

সমুদ্রের জল পান করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার মধ্যে যেমন লবণের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্ব সেইরূপে নিশ্চয়রূপে বোঝা যাইতে পারে।

* * *

বেদান্তমতে নিদ্রিত অবস্থাও যা জাগ্রত অবস্থাও তা। এক কাঠুরে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছিল যে সে রাজা হয়েছে। সাত ছেলের বাপ হয়েছে। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা শিখছে, আর সে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছে। এমন সময় একজন লোক তার ঘুম ভাংগানতে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "তুই কেন আমার ঘুম ভাংগালি, আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম, তুই কেন

আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি ?" সে ব্যক্তি বললে "ও তো স্বপন, ওতে আর কি হয়েছে ?" কাঠুরে বললে, "দূর ! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয় তা হলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য ।"

* * *

যেমন ঘরের ভিতর একটু আলো ছাদের ফাঁক দিয়ে আসছে, যে ভিতরে আছে তার আলোর জ্ঞান সেইটুকু। যার ঘরে অনেক ছ্যাঁদা সে অধিক আলো দেখতে পায়, আবার দরজা জানালা খুলিলে আরও আলো হয় ; কিন্তু যে মাঠে আছে, তার কাছে আলোয় আলো। ভগবান সেইরূপ লোকের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে যতটুকু সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যায়, সে ততই তাঁহার নূতন নূতন ভাবসকল দেখিতে পাইয়া ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

* * *

ধর্মাচরণ কেহ জোর করিয়া করিতে পারে না। ধর্মপিপাসা উপস্থিত হইলেই জীব আপনা হইতে ব্যাকুল হইয়া ধর্মান্বেষণ করে ও তদাচরণে প্রবৃত্ত হয়। 'ধর্ম-সাধন কর্তব্য' এ কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় না।

* * *

ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বানর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ ও দানবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলতেন, "ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্তি দেখিতেছ মনে কর। কিন্তু মনমধ্যে যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না'।"

* * *

শত বৎসরের অন্ধকারপূর্ণ ঘরে যেমন এক প্রদীপের আলোয় আলোকিত করে, ঈশ্বরের কৃপায় সেইরূপ আমাদের জীবনের সমুদয় পাপ এক মুহূর্তে দূর হইয়া যায়। যাহার হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রভুত্ব করিতেছে, যাহার আমড়ার অম্বল খাইবার (কাম-কাঞ্চনের) এখনও সাধ রহিয়াছে, সে ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তনের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্ত হৃদয়ে প্রতিদিন উপাসনা করে। কিন্তু প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তি বলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় আমি এই মুহূর্তে পবিত্র হইব।"

* * *

অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক একবার পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়। কেহ যদি স্তব-স্তুতি ক'রে পড়ে—সেও অমর হয় ; আর যদি কাহাকেও জোর ক'রে বা কোন প্রকারে ফেলে দেওয়া যায়—সেও অমর হয়। তেমনি ভগবানের নাম যে কোন প্রকারে হউক করিলেই তাহার ফল হইবেই হইবে।

তরঙ্গপূর্ণ ময়লা জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব যেমন খণ্ড খণ্ড দেখায় ; মায়াপূর্ণ সংসারী মানবের অন্তরে সেইরূপে ঈশ্বরের আংশিক আভামাত্র দেখা যায়।

*　　　　*　　　　*

যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিও, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করিও না।

*　　　　*　　　　*

ময়লা আয়নাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ, ময়লা ও অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা দেখিতে পান। অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।

*　　　　*　　　　*

যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারে না, ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হয়।

*　　　　*　　　　*

যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবানের চিন্তা করে, সেই বুঝতে পারে যে তাঁর স্বরূপ কি। যে ব্যক্তি সর্বদা গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপী গিরগিটীর নানা রং—কখনও হলদে, কখনও সবুজ, কখনও লাল, আবার কখনও বা কোন রং নাই, ভগবানও সেইরকম ; তিনি নানাভাবে, নানারূপে তাঁর ভক্তদের দেখা দিয়ে থাকেন। যারা তাঁর কোন খোঁজখবর রাখে না, তারাই তাঁর স্বরূপ নিয়ে তর্ক ঝগড়া করে।

*　　　　*　　　　*

নিত্য থেকেই লীলা, আবার লীলা থেকেই নিত্য। লীলা ধ'রে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে যেতে হয়। মহাকারণে এলেই সব চুপ, সেখানে কোন কথা চলে না। আবার সেখান থেকে ক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলে আসতে হয়। মহা-সমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রে উঠছে আবার তাতেই লয় হ'চ্ছে।

*　　　　*　　　　*

যতক্ষণ ঈশ্বর না পাওয়া যায়, ততক্ষণ নেতি নেতি ক'রে বিচার দ্বারা তাঁকে ধরতে হয় ; তাঁকে পেলে তখন দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনিই সব হ'য়েছেন। ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ, ভাল, মন্দ, শুচি, অশুচি—সকলই তিনি।

*　　　　*　　　　*

সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডায় যেমন সাগরের জল বরফ হ'য়ে সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য উদয় হ'লে বরফ গলে আগেকার যেমনি জল তেমনি হয় ; অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। সমুদ্র জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে স্তব ক'রেছে—ঠাকুর তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার, আমাদের সামনে তুমি মানুষরূপে লীলা ক'রছ, আবার বেদে তোমাকেই বাক্য মনের অতীত ব'লছে।

* * *

একমতে, শুধু শব্দ শুনলে কি হবে? দূরে থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা যায়। সেই শব্দ-কল্লোল ধরে গেলে সমুদ্রে পেঁছান যায়। যে কালে কল্লোল আছে সে কালে সমুদ্রও আছে। অনাহত ধ্বনি ধরে ধরে গেলে তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর কাছে পেঁছান যায়। তাঁকেই পরমপদ বলেছে। 'আমি' থাকতে ওরূপ দর্শন হয় না। যেখানে 'আমি'ও নাই 'তুমি'ও নাই, একও নাই অনেকও নাই, সেখানেই এই দর্শন।

* * *

মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে! প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটি সূর্য ও দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া যায়, তা হলে বাকি থাকে একটি সূর্য ও একটি প্রতিবিম্ব সূর্য। এক একটি ঘট যেন এক একটি জীব। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় পেঁছান যায়। জীব যদি সাধন ভজন করে তা হলে পরমাত্মা দর্শন করতে পারে। শেষের ঘটটি ভেঙে দিলে কি আছে বলা যায় না!

* * *

জীব প্রথমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। ঈশ্বরবোধ নাই, নানা জিনিস বোধ—অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর একটি কাঁটা জোগাড় করে এনে ঐ কাঁটাটি তোলা। অর্থাৎ কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা। আবার বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া—অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্চে—শুধু দর্শন নয়। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে। যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।

* * *

হৃদয় ডংকাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে, এগুলি আইনের ধ্যান-শাস্ত্রে আছে। তবে তোমার যেখানে অভিরুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই তো ব্রহ্মময়; কোথায় তিনি নেই।

* * *

বিদ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্মিণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। দু-একটি ছেলের পর দুজনে ভাই-ভগিনীর মত থাকে। দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত—দাস ও দাসী। তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক—অনন্তকালের আপনার! সুখে-দুঃখে তাঁকে ভুলে না—যেমন পাণ্ডবেরা।

* * *

যেমন বাঁকা নদী দিয়ে অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে গন্তব্যস্থানে যাচ্ছ। কিন্তু যদি বন্যে হয় তা হলে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্যস্থানে

পেঁছান যায়। তখন ড্যাংগাতেই এক বাঁশ জল। প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। রাগভক্তি এলে খুব সোজা। যেমন মাঠের উপর ধান-কাটার পর যেদিক দিয়ে যাও। আগে আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হত, এখন যেদিক দিয়ে যাও। যদি কিছু খড় থাকে—জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেলে আর কোন কষ্ট নাই। বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এ সব থাকলে আর কোন কষ্ট নাই।

* * *

তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, অবিদ্যাও আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর আরো মহিমা প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তিনি দিয়েছেন কেন ? মহৎ লোক তয়ের করবেন বলে। ইন্দ্রিয়জয় করলে মহৎ হয়। জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে ? ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে পারে। আবার অন্যদিকে দেখো, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি-লীলা চলছে।

* * *

যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে ; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সবাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল ; তাঁর উপরে ভালবাসা, টান থাকলেই হল। তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান, ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা, এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন ? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।

* * *

আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে ; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে, বলছে জল ; মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল খাচ্ছে, বলছে পানি ; ইংরেজরা আর এক ঘাটে জল খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার ; আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে 'একোয়া'।

* * *

যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞানলাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাঁচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়।

* * *

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল যে, আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে।

খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটো আঙুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, 'রাজা, এই দেখ, এই দেখ।' রাজা অবাক হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো আঙুল একটা আঙুল হ'য়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, 'রাজা, এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটো বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। অভেদ! এক! যে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্।

* * *

বেদান্তের সপ্তভূমি, আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর। এই তিন ভূমিতে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ, অনাহত পদ্মে জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধক বলে— 'এ কি! এ কি!' পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়, এখানে বিশুদ্ধ চক্র। ষষ্ঠ ভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর-দর্শন হয়। কিন্তু, যেমন লণ্ঠনের ভিতরে আলো—ছুঁতে পারে না, মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে বলে।

* * *

সত্ত্ব গুণে ভক্তি হয়। কিন্তু ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ আছে। ভক্তির সত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্ব, এ হলে—ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না: কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয়, ঐটুকু শরীরের উপর মন থাকে।

* * *

শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

* * *

আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।

* * *

যে অজ্ঞান সেই বলে, ঈশ্বর 'সেথায় সেথায়'—অনেক দূরে! যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়'—অতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, আবার নিজে এক একটি রূপ ধরে রয়েছেন।

* * *

ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে 'ঐ ঈশ্বর', অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আছেন।

আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব হয়েছেন,—যা কিছু দেখছি সবই তার এক একটি রূপ।

*　　　*　　　*

জ্ঞানী 'নেই নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।

*　　　*　　　*

ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেবলে রাঁধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী।

*　　　*　　　*

যাদের রাগভক্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার লন। হাসপাতালে নাম লেখালে, আরাম না হলে ডাক্তার ছাড়ে না।

*　　　*　　　*

তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়েরপ্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তা হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

*　　　*　　　*

ঈশ্বর যেন মহাসমুদ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়। ছেলেমেয়ে—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচটা ছয়টা ছোট ভুড়ভুড়ি।

*　　　*　　　*

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন তাকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শক্তি লীলাতেই অবতার। অবতার প্রেমভক্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। দুগ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম,' 'তাই হলুম'। 'আমিই তুমি', 'তুমিই আমি'।

*　　　*　　　*

ভক্ত তোমরা, তোমাদের বলতে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে দিচ্ছে। আমার স্বভাব ঈশ্বরের রূপ দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, তুমি দেহ ধারণ করেছ, সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর। তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ। মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না। অন্য জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন, কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।

———

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

তথ্যপঞ্জী

ও

গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

বাঙলাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ অবদান মহাপুরুষদের জীবন-চরিত। এই জীবনী-সাহিত্যের প্রথম অমৃতফল : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।' এই গ্রন্থে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপনিষদের অপূর্ব ব্যাখ্যা। ভক্ত অচিন্ত্যকুমারের অমৃত-লেখনীতেই এই শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা রচনা সম্ভব হয়েছে। রামকৃষ্ণ-যুগে যাঁরা ছিলেন রামকৃষ্ণ-পরিজন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের জীবনীরও অপূর্ব ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সেই যুগের রামকৃষ্ণ-পরিজনদের নিয়ে তিনি নিম্নলিখিত জীবনী-গ্রন্থাবলী রচনা করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন—

১। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ড)
২। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ
৩। রামকৃষ্ণ পরিজন
৪। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি
৫। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)
৬। ভক্ত বিবেকানন্দ
৭। রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
৮। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
৯। গরীয়সী গৌরী

উপরোক্ত গ্রন্থসকলের মধ্যে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' প্রথম দুই খণ্ড এবং 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। বর্তমান ষষ্ঠ খণ্ডে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের বাকি দুই খণ্ড এবং 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' সংযোজিত হলো। তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণীর একটি দীর্ঘ সংকলনও সংযোজিত হয়েছে। আশা করা যায় রচনাবলীর পরবর্তী দুটি খণ্ডে অবশিষ্ট গ্রন্থ-কয়টি সংযোজিত করা যাবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত

['পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনী-সাহিত্য হলেও জীবন-চরিত নয়। এই গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাণীর সুললিত ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যা হতে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারাবাহিক জীবনের ইতিহাস জানা যায় না। সেই জন্য পরিপূরক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতামৃত সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্চম খণ্ড হতে সংযোজিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—বাল্যলীলা, সাধনলীলা, প্রচারলীলা এবং লীলাসংবরণ। উক্ত সাধনলীলার প্রায় শেষ পর্যন্ত, ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতামৃত রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গের অবশিষ্টাংশ নিয়ে বিবৃত হলো।]

১২৭৩ সালের শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন পেটের পীড়ায় ভুগতে থাকেন। প্রায় ছয়মাস রোগভোগের পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেন। বর্ষাগমে গংগার জল লবণাক্ত হলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে পুনরায় তাঁর পেটের পীড়া দেখা দিতে পারে। সেইজন্য ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মথুরবাবু ও অন্যান্য ভক্তগণ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁর জন্মভূমি কামারপুকুরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। প্রায় সাড়ে ছয় বছর পরে কামারপুকুরে ঠাকুরের পুনরাগমন হলো।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিচিত্র জীবনের কথা লোকমুখে কামারপুকুর ও তার আশ-পাশের গ্রামে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। তাই দলে দলে তাঁকে দেখবার জন্য জনসমাগম হতে লাগল।

সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা-বধূর স্বামীসন্দর্শনলাভ বলতে গেলে বিবাহের পরে মাত্র একবারই হয়েছিল। অতএব, আত্মীয়-পরিজনের নির্দেশে বধূ সারদামণিকে আনবার জন্য জয়রামবাটিতে লোক পাঠানো হলো। সংবাদ শুনে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ আপত্তি করলেন না। চতুর্দশবর্ষীয়া সারদামণি এবার ঠাকুরের উপস্থিতিতেই কামারপুকুরে এলেন।

নিজের স্ত্রীর বিষয়ে উদাসীন থাকলেও তিনি যখন কাছে এলেন তখন তাঁর সাংসারিক শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যত্নবান হলেন। ঠাকুরের সংগে ভৈরবী ব্রাহ্মণীও কামারপুকুরে এসেছিলেন। স্ত্রীর সংগে ঠাকুরের এই সান্নিধ্য তিনি সু-দৃষ্টিতে দেখলেন না। শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী কিন্তু ঠাকুরকে বলেছিলেন, '...স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।'

আত্মীয়পরিজনদের ভিতরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরের দিনগুলি ভালোই কাটছিল। সারদামণিকেও যেন তিনি একটু সমীহ করেই চলতেন। একদিনের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি ভক্তদের বলেন, 'আমি এক জায়গাতে যেতে চেয়েছিলুম। রামলালের খুড়িকে (সারদাদেবীকে) জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম, উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তাতেই এই। সংসারীরা না জানি পরিবারের কাছে কি রকম বশ।'

বস্তুতপক্ষে পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণদর্শনে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর হয়। হৃদয়ের সঙ্গে এই নিয়ে কলহও পর্যন্ত হয়। অবশেষে তিনি ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে কাশীধামে গমন করেন।

প্রায় সাতমাসকাল কামারপুকুরে অবস্থানের পরে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে মথুরবাবু সদলবলে পশ্চিম ভারতের তীর্থসকল দর্শনের অভিলাষ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করায় তিনিও এই যাত্রার সঙ্গী হতে রাজি হলেন। ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মাঝামাঝি এই যাত্রা হলো শুরু। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর এই তীর্থযাত্রা হয়েছিল এক রাজকীয় ব্যাপার। রেলের তৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর চারখানা বগী রিজার্ভ করা হলো এবং সঙ্গী হলো প্রায় শতাধিক যাত্রী। রেলের সঙ্গে ঠিক হলো যে, হাওড়া ও কাশীর মধ্যে মথুরবাবুর ইচ্ছামত যে কোন স্থানে ঐ চারখানি গাড়ি কাটিয়ে নিতে পারবেন। অবশ্য যাত্রাপথে ঠাকুর এবং যাত্রীদল মাত্র বৈদ্যনাথধামই দর্শন করেন।

এই তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার থেকেই কিছু উদ্ধৃত হলো : তীর্থে গেলুম। তা এক একবার ভারি কষ্ট হতো। কাশীতে সেজবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলুম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে। টাকা জমি—'এত টাকা লোকসান হয়েছে'—এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলুম।···তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা।···পাইরাগে (প্রয়াগে) দেখলুম, সেই পুকুর, সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা।

'···সেজবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবন গেলুম।...কালীয়দমনঘাট দেখামাত্র উদ্দীপন হতো। আমি বিহ্বল হয়ে যেতুম। হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মত নাওয়াত। যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল। উন্মত্তের মত আমি দৌড়তে লাগলুম—'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই'—এই বলতে বলতে। প্যালকি করে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলুম। গোবর্ধন দেখবামাত্র একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপর দাঁড়িয়ে পড়লুম। বাক্যশূন্য হয়ে গেলুম।···শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, পাখি, হরিণ···এই সব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলুম। চক্ষের জলে কাপড়

ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণ রে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলুম। পনের দিন রেখেছিলুম। সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন করতুম, তবে শান্তি হত।···মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলুম, অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বাসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলুম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তারপরই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যেই দেখা অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ' বলে বেহুঁশ হয়ে গেলুম।'

'কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধু দেখেছিলুম। আমায় বলত প্রেমী সাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন সেখানে আমায় নিমন্ত্রণ করে লয়ে গেল। মোহান্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, উপায় কি ? সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।...একদিন গীতাপাঠ করলে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়ল। সেজবাবু ছিল। সেজবাবুর দিকে পিছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায় নারদীয় ভক্তি।'

'কাশীতে একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে। আমি বললুম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগল। আমি মনে করলুম, এইবার বুঝি জপধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য করতে আরম্ভ করলে।···ভেবেছিলুম কাশীতে সবাই চব্বিশঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাবো। বৃন্দাবনে সবাই গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখবো। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত।...ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখলুম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীর আশ্রয় করে প্রকাশ হয়েছেন। তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোন হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য— সেই বালির উপরেই সুখে শুয়ে আছেন। পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলুম। তখন কথা কন না—মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, ঈশ্বর এক না অনেক ? তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক, নইলে, যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক। তাঁকে দেখিয়ে হৃদেকে বলেছিলুম, একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।···'

কাশী থেকে মথুরবাবু গয়াতে যাবেন। ঠাকুর বিশেষ আপত্তি করলেন। প্রায় চারমাস তীর্থভ্রমণের পর ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। এখানে এসে তিনি বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড হতে সংগৃহীত তীর্থরজঃ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চারদিকে ছড়িয়ে দেন, এবং অবশিষ্টাংশ নিজ

সাধনকুটীরের মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করে বলেন—'আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের পুত্র অক্ষয়। ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। জন্মগ্রহণকালে মাতার মৃত্যু হওয়ায় শিশুকালে ঠাকুর তাঁকে সর্বদা আদরযত্ন করতেন। পিতা এই পুত্র সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীনই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, এ ছেলে বাঁচিবে না।' ভবিষ্যতে হলো তাই। ১২৭৬ সালের বৈশাখমাসে অক্ষয়ের বিবাহ হয়। তার কয়েকমাস পরে শ্বশুরালয়ে গিয়ে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে এনে অনেক চিকিৎসা করানো হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মাসখানেক ভোগান্তির পরে অক্ষয়ের মৃত্যু হলো। প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুর বিষম আঘাত পেলেন। অক্ষয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, 'অক্ষয় মলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভিতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে। তলোয়ারের কিছু হল না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হল, খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা নিংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। ভাবলুম, মা, এখানে পোঁদের কাপড়ের সংগে সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সংগে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়, তাই দেখাচ্ছিস বটে!'

অক্ষয়ের মৃত্যুজনিত আঘাত ভুলাবার জন্যই যেন মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে সাতক্ষীরায় তাঁর জমিদারিদর্শনে গেলেন। নিকটেই সোনাবেড়ে গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটে অদূরবর্তী তালামাগুরো গ্রামে মথুরবাবুর গুরুগৃহ। তিনি ঠাকুরকে হাতীতে চড়িয়ে সেখানে নিয়ে গেলেন। সপ্তাহখানেক গুরুপুত্রগণের সযত্নপরিচর্যায় কাটিয়ে সেখান থেকে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন।

কলকাতার কলুটোলা অঞ্চলে কালীনাথ দত্তর বাড়িতে হরিসভার অধিবেশন হতো। নিমন্ত্রিত হয়ে ঠাকুর তথায় গমন করেন। সেখানে ভক্তিভরে একখানি আসন রেখে, উহাতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব কল্পনা করে পূজা, পাঠ প্রভৃতি সমুদয় অনুষ্ঠান হতো। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভাগবতের অমৃতোপম কথা শুনে ঠাকুর আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে রক্ষিত আসনের উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ হাত ঊর্ধ্বে তুলে গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন। উপস্থিত বৈষ্ণব ও ভক্তসকল ঠাকুরের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে অনির্বচনীয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন।

এর কিছুকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীনবদ্বীপধামদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জায়গায় পরিভ্রমণ করেন।

নবদ্বীপ পরিক্রমণের ইতিহাস বলতে গিয়ে ঠাকুর বলেন : 'সেজবাবুর সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম চৈতন্য যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারবো। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোঁসাই এর বাড়ি, ছোট গোঁসাই-এর বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্ভুত-দর্শন। দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলো রে, এলো রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলো বলতে না বলতে তারা কাছে এসে এর ভিতরে (নিজের দেহকে দেখিয়ে) ঢুকে গেল, আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে কাছে ছিল, ধরে ফেললে। এইরকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, বাস্তবিকই অবতার, ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ।

কলকাতা ফিরবার কয়েকমাস পরে ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে মথুরবাবু কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। ক্রমশঃ অসুখ বেড়ে মথুরের বাক্‌রোধ হলো। ঠাকুর বুঝলেন, তাঁর অন্তিম সময় সমাগত। হৃদয়কে পাঠিয়ে রোজ মথুরের সংবাদ নিতেন, কিন্তু তিনি নিজে যেতেন না। এদিকে মথুরের অন্তিমকাল আগত দেখে তাঁকে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো। সেদিন ঠাকুর হৃদয়কেও আর পাঠালেন না মথুরবাবুকে দেখে আসবার জন্য। অপরাহ্ণে তিনি দু-তিনঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গের পরে হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে উঠাইয়া লইলেন—তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।'

গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কর্মচারিগণ ফিরে এসে হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু বিকেল পাঁচটার সময় দেহরক্ষা করেছেন। (জুলাই, ১৮৭১)।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে অবশ্য দক্ষিণেশ্বরের জীবনপ্রবাহ সমভাবেই চলতে লাগল। মথুরের স্ত্রী জগদম্বা তখনও জীবিত। এদিকে প্রায় চার বছর হলো শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর ছেড়ে এসেছে। শ্রীমা তখন অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। চার বছর পূর্বে দেবতুল্য স্বামীর দর্শনলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরের কথা নানাভাবে পল্লবিত হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছাতে লাগল। তাঁর স্বামী নাকি 'উন্মাদ'—সব সময় পরিধেয় বস্ত্রও নাকি দেহে থাকে না। এইপ্রকার পল্লবিত কথা শুনে তিনি স্বচক্ষে ঠাকুরকে দেখবেন বলে মনস্থ করলেন।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। সুদূর হতে ঐদিন যাত্রীসকল পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করবার জন্য কলকাতায় আগমন করে।

অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সংগে সেই বছর শ্রীমা-ও তীর্থযাত্রা করেন। ১২৭৮ সালে ১৩ই চৈত্র ছিল দোলপূর্ণিমার দিন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে পেঁছাতে দেরি হয়ে গেল। অবশেষে একদা রাত্রি নয়টার সময়ে শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীমায়ের রোগাক্রান্ত শরীরের প্রতি লক্ষ্য করে ঠাকুর বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁর শয়নের বন্দোবস্ত করে দিলেন। তিনি দুঃখ করে বারংবার শ্রীমাকে বলতে লাগলেন, 'তুমি এতদিনে এলে ? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে ?'

যাহা হোক সুচিকিৎসা এবং ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও বিশেষ যত্নে শ্রীমা কয়েকদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করলেন। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণি দেবী বহুদিন হতেই দক্ষিণেশ্বরে বাস করছিলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল নহবৎখানার ছোট্ট ঘরে। আরোগ্যলাভের পরে শ্রীমায়ের থাকবার বন্দোবস্ত হলো নহবৎঘরে শ্বাশুড়ীর সংগে।

এই সময়ে ঠাকুর নানাবিষয়ে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিষয়ে শ্রীমাকে বিশেষ শিক্ষাদান করতে লাগলেন। শ্রীমা একদিন ঠাকুরের পদসেবা করছেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয় ?' উত্তরে ঠাকুর বললেন, '...সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।'

যেন নিজেকে পরীক্ষা করাবার জন্যই ঠাকুর রাত্রিতে নিজ শয্যাপার্শ্বে শয়ন করবার অনুমতি দিলেন। এক নিশীথ রাত্রে শয্যাপার্শ্বে উদ্ভিন্নযৌবনা নিজ স্ত্রীর অংগস্পর্শ করে পরীক্ষা করতে গিয়ে ঠাকুর সহসা গভীর সমাধিতে বিলীন হয়ে যান। পরদিন বহুযত্নে তাঁর সেই সমাধিভংগ করা হয়। তারপরে বৎসরকাল কেটে গেলেও ঠাকুরের মনে আর স্ত্রী বিষয়ে দেহভাব উদয় হলো না। পরবর্তীকালে এইসকল দিনের কথা স্মরণ করে ঠাকুর ভক্তদের বলেছেন, 'ও (শ্রীমা) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে। বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম 'মা, আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর (শ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।'

অতঃপর ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালিকা-পূজার পুণ্যদিবস সমাগত। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব। তৎকালে ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় মন্দিরে রাত্রিকালে ৺জগদম্বার বিশেষ পূজা করবে। এদিকে ঠাকুর তাঁর গুপ্তভাবে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করবার মানস করেছেন। পূজার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন হলো। এমনকি দেবী-স্থাপনের জন্য আলপনাযুক্ত একটি আসনও পূজকের সম্মুখে স্থাপিত হলো। শ্রীমাকে পূজাকালে উপস্থিত থাকতে ঠাকুর নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাইরে ঘোর অমাবস্যা। রাত্রি নয়টা বাজল। শ্রীমা

পূজাস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের ইঙ্গিতে শ্রীমা মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই আসনে উপবেশন করলেন।

সম্মুখস্থ কলস হতে মন্ত্রপূত বারির দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীমাকে যথাবিহিত অভিষিক্তা করে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন : 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!'

অতঃপর শ্রীমাকে দেবীজ্ঞানে যথাবিহিত ষোড়শোপচারে পূজা করে ভোগ নিবেদন করে বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়ে শ্রীমা সমাধিস্থ হলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিমগ্না দেবীর সঙ্গে আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে ঠাকুর ৺দেবীকে সাধনার ফল, জপের মালা ও আত্মনিবেদন করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রণাম করলেন—'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।'

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ৺ষোড়শী-পূজা সমাপ্ত করলেন। বস্তুতপক্ষে এইসঙ্গেই তাঁর সাধনলীলার পরিসমাপ্তি হলো।

প্রচারলীলা ও ভক্তসমাগম ।।

১২৮০ সালের কার্তিক মাসে শ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করেন। এর পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সংসারে পর পর কয়েকটি মৃত্যুর স্পর্শ লাগে। ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীমায়ের কামারপুকুরে আগমনের কিছুকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়। রামেশ্বরের পরে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে এসে পূজকের পদ গ্রহণ করেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে কলকাতার সিঁদুরিয়াপটিনিবাসী শম্ভুচরণ মল্লিক ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার হলেন। শ্রীমা দ্বিতীয়বার ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করে যথারীতি নহবৎগৃহেই অবস্থান করেন। এই ঘরটি অত্যন্ত ছোট। শাশুড়ী এবং বধূর থাকবার বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে দেখে শম্ভুবাবু নিকটেই একখণ্ড জমি কিনে শ্রীমায়ের জন্য একখানি সুপরিসর চালাঘর তৈরি করে দেন। নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (পরে তিনি কাপ্তেন বিশ্বনাথ নামে পরিচিত) উক্ত ঘরের জন্য কাঠ সরবরাহ করেন।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের কথা ইতিমধ্যে ঠাকুরের শ্রবণে এসেছে। ১২৮১ সালের চৈত্রমাসের মাঝামাঝি (মার্চ, ১৮৭৫) তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ-নেতা কেশবচন্দ্র

সেনকে দেখবার ইচ্ছা হলো ঠাকুরের। কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিতে কেশবচন্দ্র তখন সশিষ্যে সাধনভজন করছেন। ঠাকুর একদা অপরাহ্নে কাপ্তেন বিশ্বনাথের গাড়িতে সেই উদ্যান-বাটিতে উপস্থিত হলেন। তখন দুপুরবেলা। কেশবচন্দ্র শিষ্যদের উদ্যানমধ্যে এক পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসে আছেন। হৃদয় এসে তাকে জানাল, 'আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন...আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।'

কেশবচন্দ্র সম্মতি জানালে হৃদয় ঠাকুরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে সেখানে নিয়ে এলো। সেখানে এসে কেশবচন্দ্রের সংগে ঈশ্বর বিষয়ে আলাপের সূত্রপাতেই ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। প্রথমে উপস্থিত সকলে এই ভাবান্তরকে বিশেষ আমল দিল না। বাহ্যাবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হবার পরে কেশবচন্দ্রকে ঠাকুর বললেন, 'তোমার ল্যাজ খসিয়াছে।' ঐ কথার অর্থ না বুঝতে পেরে কেশবচন্দ্রের অনুচরবর্গ কিছুটা অসন্তুষ্টই হলো। ঠাকুর তখন বললেন, 'দেখ, ব্যাংগাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাংগাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে; উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে।'

সেইদিন ঠাকুরের বাণী শুনে কেশবচন্দ্র এবং উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হলেন। শীঘ্রই কেশবচন্দ্রের মন ঠাকুরের প্রতি এত আকৃষ্ট হলো যে, তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগলেন, এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরের দিব্যসংগলাভের জন্য তাঁকে কলকাতার নিজালয় 'কমল কুটীরে' নিয়ে আসতেন।

কেশবচন্দ্র সেনের বিষয়ে ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলুম, কেশব সেন বেদীতে বসে, ধ্যান করছে। তখন ছোকড়া বয়েস। তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলুম যেন কাষ্ঠবৎ। আমি সেজবাবুকে (মথুরবাবুকে) বললুম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার ফাতনা ডুবেছে, বঁড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।...'

'কেশবকে দেখতে যাবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে বললুম, তুমি একবার যাও, দেখে এসো কেমন লোক। সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে সিদ্ধ।...তখন আমি হৃদেকে সংগে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলুম। দেখেই বলেছিলুম, এরই ল্যাজ খসেছে। আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলুম।...কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, আজ বড় যে রঙ, লালপেড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।...'

'আমাকে পরখ করবার জন্য তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়িতে পাঠিয়েছিল। ...রাতদিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দেবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল—কেবল 'দয়াময় দয়াময়' করতে লাগল। আর আমাকে বলে, তুমি কেশববাবুকে ধর, তাহলে তোমার ভাল হবে। আমি সাকার মানি। তবু দয়াময় দয়াময় করে। তখন আমার একটা অবস্থা হল।...ঘরের মধ্যে কোনোমতে থাকতে দিলুম না। তারা বারান্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।...'

'কেশব সেন, প্রতাপ (প্রতাপ মজুমদার), এরা সব বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনকরাজার মত। আমি বললুম, জনকরাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে তো জনকরাজা হবে।...আরও বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন করে। রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী সেই ঘরেই আচার, তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? দিনকতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার, তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নেই। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হতে পারবে।...'

'আমি কেশবকে বলেছিলুম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশি প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে, তাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে এ ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়। ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়। ঐ চৌদ্দ পোয়া মানুষের ভিতর জগৎমাতা প্রকাশ হন।

শম্ভুবাবুর তৈরি চালাঘরে শ্রীমা প্রায় বৎসরকাল বাস করলেন। ওখানে থেকেই তিনি যথাসাধ্য ঠাকুরের সেবা করতেন। ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে তিনি আমাশয়রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হলেন। শম্ভুবাবু অবশ্য চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করলেন না। কিছুটা আরোগ্যলাভের পরে শ্রীমা পিত্রালয়ে জয়রামবাটীতে গমন করলেন।

শ্রীমা জয়রামবাটীতে যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের মাতাঠাকুরাণী পঁচাশী বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর গঙ্গাতীরে ইহলীলা শেষ করবার বাসনা পূর্ণ হলো। মাতৃবিয়োগে হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণের মর্যাদা রক্ষা করে ঠাকুর অশৌচগ্রহণাদি কোনো কার্য করেন নাই। জননীর জন্য পুত্রোচিত কোনো কার্য করা হলো না ভেবে অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন গঙ্গাজলে তর্পণ করতে নাবলেন। কিন্তু, অঞ্জলি ভরে তর্পণের জল তোলবামাত্র ভাবাবেশে সমস্ত জল আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল। ঐরূপ অকৃতকার্যতার পরে তিনি নিজের চোখের জলে জননীর উদ্দেশে আপন অর্ঘ নিবেদন করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একসময়ে ভক্তদের বলেছিলেন, 'কেশব সেনের আসবার পর থেকে

তোদের মতো 'ইয়ং বেঙ্গলের' দলই সব এখানে আসতে শুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু-সন্ত, ত্যাগী সন্ন্যাসী, বৈরাগী বাবাজি সব আসত যেতো, তা তোরা কি জানবি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা পথ ধরে সাগরে চান করতে ও ৺জগন্নাথ দেখতে আসত।...'

কেশবচন্দ্র সেন ও 'ইয়ং বেঙ্গলদের' আগমন আরম্ভের সময় হতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে এক নবভাবের প্রকাশ পেতে লাগল। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন, '...১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিব্যভাবের প্রকাশ এবং তাহার ধর্মসংস্থাপনকার্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দেশ করিতেছি তাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের প্রেরণায়, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞান-মূলক যে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীতভাবাপন্ন করিয়া সনাতন ধর্মমার্গ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে সর্বদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।'

কেশবচন্দ্র সেনের পরিচালিত পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পাঠ করে রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্র ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হলেন। দুজনেই ঠাকুরের গৃহী ভক্ত। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত" গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁদের আগমন ১২৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে।

ঐরূপে ১২৮৮ সালের শেষভাগ হতে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্ত-বৃন্দ একে একে তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এলেন মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের ভগ্নী-জামাতা রাখালচন্দ্র। সন্ন্যাসগ্রহণ করবার পরে তাঁর উপাধি হলো স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ত্যাগী ভক্তদলের মধ্যে একজন।

কলকাতার সিমলা-পল্লী নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভ করেন। অল্পকালের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন হয়। ১২৮৮ সালের নভেম্বর মাসে একদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, এবং গান শুনতেও ভালোবাসতেন। ঠাকুরের আগমনে সুরেন্দ্রনাথ-গৃহ আনন্দমুখর হয়ে উঠে। একজন সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র সুকণ্ঠ গায়ক নরেন্দ্রনাথকে নিজালয়ে নিয়ে আসেন। নরেন্দ্রনাথ ঐ সালে জেনারেল এ্যাসেম্ব্রি ইনস্টিটিউসনের ছাত্র এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দর্শনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে বললেন: 'নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে, কিন্তু চোখমুখ দেখে বোধ হল ভিতরে কিছু আছে।...দেখলুম নিজের শরীরের দিকে নজর নাই, মাথার চুলের,

পোষাকের কোন পরিপাটি নাই, বাইরের কোনো জিনিষেই সাধারণ লোকের মত একটা আঁট নাই। সবই যেন আলগা। চোখ দেখে মনে হল, মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করে টেনে রেখেছে।...মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললুম। যেখানে গঙ্গাজলের জালা রয়েছে তার কাছেই বসল। গান গাইবার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলুম, বাংলা গান দুচারটি মাত্র তখন শিখেছে। তাই গাইতে বললুম। তাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরল, আর ষোল আনা মনপ্রাণ ঢেলে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গাইতে লাগল। শুনে আর সামলাতে পারলুম না, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লুম।'

এবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের কথা নরেন্দ্রনাথ কি বলেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক: 'গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারান্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল; সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারান্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে...' ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি।'

'আমি তো তাঁহার এইরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক-স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে?·· গৃহমধ্যে প্রবেশ-পূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম। বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্যসত্যই তিনি ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন।'

নরেন্দ্রনাথ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, 'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে—ওর মত একটিও নেই।

এক একবার বসে থতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল, কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।'

এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা ও ধর্মপ্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।*

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নরেন্দ্রনাথের আগমনের কয়েকমাস পরে, অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রণেতা শ্রীম'র (শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের দর্শনলাভ হয়। তিনি বরাহনগরে বাস করতেন বলে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনসৌভাগ্য হয়েছিল। এই সময় হতে ১৮৮৬ সন (১২৯৩ সাল) পর্যন্ত ঠাকুরের সংগলাভ করে তাঁর অমৃতবাণী ও বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী যুগকে অমূল্য সম্পদ দান করেছেন।

ক্রমশই রামকৃষ্ণ-পরিজন ও ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। রামকৃষ্ণ-যুগের মনীষীবৃন্দ একে একে পরিচিত হলেন ঠাকুরের সংগে। একটা জিনিষ অবশ্যই লক্ষ্যণীয়, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজের সংগে পরিচয় এবং ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের আগমনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সংগ আর তেমন জমেনি। বরং বাঙলার গৃহী ও তরুণ ভক্তদের তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা গৃহত্যাগী-ভক্ত তাঁদের উপরেই বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কল্পিত ভবিষ্যৎ কর্মভার প্রদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এবং নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) বিষয়ে পূর্বে কিছু বলা হয়েছে। অন্যান্যদের বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

গৃহী-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বিহারী বালকভৃত্য রাখতুরাম। ঠাকুরের সেবা-যত্নের জন্য একটি বালক দরকার। রামচন্দ্রের পরিবারমধ্যে ঠাকুরের বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হতো। তাঁর কথা শুনে বালকভৃত্য রাখতুরামের তীব্র আকাংখা হলো রামকৃষ্ণদর্শনের। রামচন্দ্র মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন ও ফলমূল পাঠাতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। রাখতুরাম তার বাহক। এই পথে ঠাকুরের দর্শনলাভের সৌভাগ্যও তার ঘটে। রামচন্দ্র এই বালককেই ঠাকুরের সেবার জন্য নিয়োগ করলেন। বালকও কৃতার্থ হয়ে গেল। ঠাকুর নাম দিলেন, লাটু বা লেটো। ক্রমশই তার ভিতরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ পেতে লাগল। ইনিই পরবর্তীকালে সন্ন্যাসনামধারী স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে যাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল ঘোষ বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন কাগজের ব্যবসায়ী। স্ত্রী-বিয়োগের

---

*'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' পরেই অচিন্ত্যকুমারের বিশিষ্ট জীবনী-গ্রন্থ 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। রচনাবলীর পরবর্তী যে খণ্ডে উক্ত জীবনী-গ্রন্থে সংযোজিত হবে সেই খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে বিশেষ তথ্যপঞ্জী সংযোজিত হবে। স.।

আঘাত তাঁকে ধর্মাভিলাষী করে। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি দুঃখবিমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে সন্ন্যাসী হলেন। নাম হলো স্বামী অদ্বৈতানন্দ।

হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ১৮৬১ সনে এক ধার্মিকবংশে বাবুরাম ঘোষের জন্ম। গৃহী ভক্তদের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের শেষ কয়েকবছর বলরাম বোস বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। বাবুরাম তাঁরই শ্যালক। তাঁর পাঠ্য-জীবন শুরু হয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ে। ঐ মহেন্দ্রনাথই 'শ্রীম'। রাখাল ছিল তাঁর সহপাঠী। ১৮৮২ সনের শরৎকালে এই রাখালই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে। এই বালকের ভিতর অসাধারণ অধ্যাত্মজীবনের ইঙ্গিত পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আহ্বান জানালেন। মাতার অনুমতি ভিন্ন তা সম্ভব নয়। শুধু বাবুরাম নয়, তাঁর স্ত্রী-ও ঠাকুরের একান্ত ভক্ত। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন, বাবুরাম সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। নাম নিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০২ হতে ১৯১৬ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনিই মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন।

আঠারো বছরের বালক নিত্যরঞ্জন ঘোষ, অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী। বালক বয়সে তাঁর দিব্যদৃষ্টি (ক্লেয়ারভয়ান্স) হতো। তিনি 'প্লানচেটের' একজন ভালো 'মধ্যম' ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন তাঁর এক আত্মিকতাবাদী বন্ধুর সংগে। বালক শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মিডিয়াম' হতে অনুরোধ করে। প্রথমে তিনি রাজিও হয়ে যান। পরক্ষণেই নিত্যরঞ্জনকে ভর্ৎসনা করে বলেন, ভূত নিয়ে খেলা করতে করতে একদিন তুমিই হয়তো ভূত হয়ে যাবে, যদি তুমি তোমার মন ঈশ্বরে স্থাপন কর, তবে তোমার জীবনও ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। তুমি কোন্‌টি চাও ?

নিত্যরঞ্জন শেষেরটাই বেছে নিলেন এবং যথাকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করে নাম নিলেন নিরঞ্জনানন্দ।

প্রায় কুড়ি বছর বয়সের সময়ে যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। অতি কোমল স্বভাব। বাক্সের ভিতরে জামাকাপড়ে আরশুলা পড়েছে। জামা-কাপড়গুলো বাইরে নিয়ে আরশুলাগুলো মেরে ফেলবার নির্দেশ দিলেন ঠাকুর যোগেন্দ্রকে। তিনি অবশ্যই জামাকাপড় বাইরে নিয়ে আরশুলাগুলো ঝেড়ে ফেললেন, কিন্তু কোমলহৃদয়ে সেগুলোকে বধ করতে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে যাঁদের 'ঈশ্বরকোটি' বলেছিলেন, যোগেন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। সন্ন্যাসগ্রহণ করবার পরে তাঁর নাম হলো স্বামী যোগানন্দ।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এবং শশীভূষণ চক্রবর্তী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একসংগেই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তখন একজনের বয়স আঠার এবং আরেকজনের কুড়ি। শরতের পিতার ওষুধের কারবার ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল শরৎ একজন ডাক্তার হয়। কল্যকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিনি ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিদারুণ অসুখে শয্যাশায়ী তখন পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে তাঁর গুরুর সেবায় নিযুক্ত

হলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পূর্বেই পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস-গ্রহণ করে নাম নিলেন স্বামী সারদানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধর্মসভায় গমন করেন। তিন বছরেরও বেশী তিনি আমেরিকা এবং য়ুরোপে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী সারদানন্দকে পশ্চিমে তাঁর প্রারব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য আহ্বান জানান। সারদানন্দ লণ্ডনে গিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। বিবেকানন্দ দেশে ফিরে এলে তিনি আমেরিকায় গিয়ে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সনে তিনি স্বদেশে ফিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনে তিনি পরলোক-গমন করেন। সেই পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের পদেই নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর কর্মময় জীবনের মধ্যেও তিনি বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৯০৮ সনে প্রথম প্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা। তাদের মধ্যে তাঁর অমর কীর্তি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'।

শশীভূষণ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন ঐকান্তিক ভক্ত। ঠাকুরের মৃত্যুর পরে শ্মশান থেকে তাঁর পূতাস্থি তিনিই সংগ্রহ করেন, এবং পরে কাঁকুড়গাছির মন্দিরে স্থাপন করেন। সন্ন্যাসী-ভাইদের তিনি মায়ের মতো সেবা-যত্ন করতেন, এবং দরকার হলে ভিক্ষা করতেও দ্বিধা করতেন না। ঠাকুরের তিরোধানের পরে নরেন্দ্রনাথ যখন ভ্রাতা-সন্ন্যাসীদের নাম দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামটি শশীভূষণেরই প্রাপ্য বলে নির্ধারণ করলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা স্থাপন করলেন, এবং তার অধ্যক্ষ হয়ে রইলেন ১৯১১ সন পর্যন্ত। ঐ বছর তিনি পরলোকগমন করেন।

তারকনাথ ঘোষাল ছিলেন রাণী রাসমণির আইন-পরামর্শদাতা। ১৮৮০ সনে প্রথম তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ ঘটে রামচন্দ্র দত্তর বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। তার কিছুকাল পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। নরেন্দ্র-নাথের মত প্রথম জীবনে তিনিও ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। দক্ষিণেশ্বরে এক সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন। তিনি দেবীকে প্রণাম করলেন এবং তারকনাথকেও প্রণাম করতে বললেন। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে তিনি দেবীকে প্রণাম করলেন। নিরাকারবাদী তারকনাথ প্রণামান্তে ভাবলেন, আমি কেন দ্বিধা করছি। ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিরাজমান, তবে ঐ প্রতিমার ভিতরেও তিনি রয়েছেন।

তারকনাথের মনের অবস্থা বুঝে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। স্বভাবে শান্তশীল হলেও তিনি কখনো কর্মবিমুখ ছিলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর সন্ন্যাসজীবনে নাম হলো স্বামী শিবানন্দ। ১৯০২ সনে তিনি বেনারসে আশ্রমের একটি শাখা স্থাপন করেন। ১৯২২ সনে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পরে তিনি মিশনের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হলেন। ১৯৩৪ সনে তিনি পরলোকগমন করেন।

হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৩ সনে, কলকাতায়। বালকজীবন হতেই তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কিন্তু বাইরে তাঁর গোঁড়ামি মোটেই প্রকাশ পেত না। পড়তেন খৃষ্টান মিশনারী স্কুলে, এবং বাইবেল-ক্লাশেও যোগ দিতেন। পরমহংসদেবের নাম তিনি পূর্বেই শুনেছিলেন। যখন তাঁর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তখন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ ঘটে পাড়ার একটি বাড়িতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ১৮৮০ সনে, দক্ষিণেশ্বরে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্য। প্রথম দর্শনেই বন্ধুদের মধ্যে ঠাকুর চিনে নিলেন হরিনাথকে।

সন্ন্যাস-জীবনে হরিনাথের নাম হলো স্বামী তুরীয়ানন্দ। সন্ন্যাস-জীবনের প্রথম তের বছর তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতোই কাটালেন, আর চলতে লাগল গভীর ধ্যান।

১৮৯৯ সনে বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা পরিভ্রমণে যাবার বন্দোবস্ত করছেন তখন স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাঁর সংগী হবার জন্য আহ্বান করেন। বিশেষ অনুরোধের পরে স্বামীজির সঙ্গী হতে তিনি রাজি হয়ে যান। ঐ বছর জুন মাসে তাঁরা আমেরিকা যাত্রা করেন। তুরীয়ানন্দের ভিতরে একজন প্রকৃত ধ্যানগম্ভীর ভারতীয় সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখে আমেরিকার ভক্তগণ মুগ্ধ হলেন।

বিবেকানন্দের এক ভক্ত ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার সাণ্টা ক্লারা কাউণ্টির সান্ এণ্টোনিও ভ্যালীতে আশ্রম করবার জন্য একটি সম্পত্তি দান করবার ইচ্ছা-প্রকাশ করলেন। বিবেকানন্দ দানটি গ্রহণ করে উক্ত আশ্রমের দায়িত্ব তুরীয়ানন্দের উপর ন্যস্ত করলেন। আশ্রমটির নাম হবে 'শান্তি আশ্রম'।

ঐ বছর ডজনখানেক পুরুষ এবং মহিলা ভক্তবৃন্দসহ তুরীয়ানন্দ সান্ ফ্রান্সিস্কো হতে সান্ এন্টোনিওর দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। প্রথমে ফেরি-জাহাজে সাগর পার হয়ে যাত্রীদল রেলে এলো সান্ জোস্-এ। তারপর ষ্টেজকোচ-এ মাউণ্ট হ্যামিল্টন ঘুরে যাত্রীদল এমন একটি জায়গায় এসে পৌঁছল যে, আশ্রমে পৌঁছবার পরবর্তী কুড়ি মাইল ঘোড়ায় বা সাইকেলে ছাড়া যাবার উপায় নেই। উষর পার্বত্যভূমিতে তখন নিদারুণ গ্রীষ্ম। আশ্রমে পৌঁছে দেখল যে, সেখানে ছোট্ট একটি ক্যাবিন-ঘর ও একটি চালা ব্যতীত আর কিছুই নেই। পানীয় জল ছয় মাইল দূরে। সংগে খাবারের পরিমাণও সামান্য। প্রথমটায় হতাশ হলেও তুরীয়ানন্দ দমবার পাত্র নন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। সান্ ফ্রান্সিস্কো থেকে টেণ্ট ও জিনিসপত্র এসে পৌঁছল। আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুরকমেই শুরু হলো।

সেখানে প্রায় দু'বছর কাটাবার পরে তাঁর স্বাস্থ্যভংগ হয়। বিবেকানন্দ-দর্শনের জন্য প্রাণ উৎকণ্ঠিত। ১৯০২ সনে ভক্তবৃন্দ জাহাজের টিকেট করে তাঁকে স্বদেশের পথে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু রেঙ্গুনে পৌঁছে তিনি দুঃসংবাদ পেলেন যে

স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহজগতে নেই। নিদারুণ আঘাত পেয়ে প্রায় আট বৎসরকাল তিনি নির্জনে প্রায়-অজ্ঞাতবাসে জীবনযাপন করেন। তারপরে পুনরায় আশ্রমে ফিরে এসে তিনি তরুণ ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণ কাজে নিযুক্ত হন। ১৯২২ সনে তিনি পরলোকগমন করেন।

সারদাপ্রসন্ন মিত্রের জন্ম ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে। বড়লোকের ঘরের মেধাবী ছেলে। পড়েন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্কুলে। পরীক্ষায় ভালো ফল করবেন এইটাই তাঁর আশা। কিন্তু পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁর সোনার ঘড়িটি হারিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পরীক্ষার ফল ভালো হয় না, দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ব্যথিত সারদাপ্রসন্নকে মহেন্দ্রনাথ নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ-দর্শনে। ঠাকুরের কৃপা-লাভ করে পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। নাম হলো স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ১৯০২ সনে তুরীয়ানন্দ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। সেখানে ফিরে যাবার মতো আর তাঁর মনের অবস্থা নয় জেনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ত্রিগুণাতীতানন্দকে আমেরিকায় সান্ ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের ভার দিয়ে পাঠিয়ে দেন। এই বছরের শেষের দিকে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯০৬ সনে সান্ ফ্রান্সিস্কোতে তিনি প্রথম হিন্দু দেবমন্দির স্থাপন করেন। আজিও সেটি বিদ্যমান। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও তিনি রবিবারের প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করছিলেন। একটি অপ্রকৃতিস্থ-মস্তিষ্ক ভূতপূর্ব ছাত্র তখন তাঁকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোড়ে। নিজের বোমার আঘাতে তক্ষুনি ছাত্রটি মারা যায়। স্বামীজি আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে যান। সেখানে ১৯১৫ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুবোধচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৬৭ সনে, কলকাতায়। তিনি ধার্মিক মাতাপিতার পুত্র। তাঁর যখন ষোল বছর বয়স তখন তাঁর পিতা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-সম্বলিত একটি বই তাঁকে দেন। ঐ বইখানা পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় এবং প্রথম সুযোগেই তিনি দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। পূর্ব হতেই সুবোধের পিতাকে ঠাকুর জানতেন। তাই তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তাঁর নাম হলো স্বামী সুবোধানন্দ। বয়সে সকলের ছোট বলে তাঁকে সকলেই অত্যন্ত ভালোবাসত এবং 'খোকা' নামে ডাকত। যদিও তাঁর সন্ন্যাস-নাম সুবোধানন্দ, তবুও 'খোকা মহারাজ' নামেই তিনি ছিলেন সকলের কাছে পরিচিত। তিনি ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন।

হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) ১৮৮৪ সনে গংগাধর ঘটককে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন। হরিনাথ তাঁকে নরেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলে। তিনিও সেই আদেশই পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বামীজির সামাজিক দর্শনের কর্মযজ্ঞ বিশেষভাবে পালন করেন। নিরাশ্রয় শিশুদের অনাথ-আশ্রম ও শিক্ষার ভার তিনি নিলেন। ১৮৮৬ সনে সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁর নাম হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ। তিনি ১৯৩৭ সনে পরলোকগমন করেন।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৬৮ সনে। বালকবয়সেই কলকাতার এক বাড়িতে তাঁর ঠাকুরের দর্শনলাভ হয়। তাঁর সতেরো আঠারো বছর বয়সের সময়ে কলেজের সহপাঠী শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) তাঁকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যান। প্রচুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসে সেদিন তিনি মুগ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করেন। পরে একে একে ভক্তবৃন্দ চলে গেলে তিনি দেখলেন যে, একাই তিনি বসে আছেন ঠাকুরের সম্মুখে। তিনিও প্রণাম করে ফিরে যাবেন এমনি সময়ে ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, কুস্তি করতে পার? এসো দেখি কেমন তুমি কুস্তি কর।

হরিপ্রসন্ন অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে! শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে এলেন হাসিমুখে, জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তাঁর সর্বাঙ্গে যেন এক তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। ঠাকুর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমিই জয়ী হলে।

তারপর আর একদিন ঠাকুরদর্শনের পর হরিপ্রসন্ন বললেন, ধ্যানে তাঁর একাগ্রতা আসছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জিহ্বাস্পর্শ করে বললেন, এবার থেকে তুমি গভীরভাবে ধ্যান করতে পারবে।

কিন্তু আর বেশিদিন হরিপ্রসন্নের ঠাকুরের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর পরিজনদের সঙ্গে শীঘ্রই তাঁকে বিহারের বাঁকিপুর যেতে হলো, এবং সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য পুণায়। সেখানে একদিন তিনি দিব্যস্বপ্নে দেখলেন, রামকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। পরের দিনই তিনি খবর পেলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েছেন।

পরবর্তীকালে উচ্চপদে সরকারি চাকরি করে, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে, বিধবা মাতার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তাঁর নাম হলো স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। বেলুড় মঠ, সেখানে গঙ্গাপাড়ের বাঁধ ইত্যাদি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরই পরিচালনায় তৈরী। ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে তিনিই রামকৃষ্ণ মঠের শেষ অধ্যক্ষ। ১৯৩৮ সনে তিনি পরলোকগমন করেন।

কালীপ্রসাদ চন্দ্র অল্প বয়সেই সংস্কৃতে এবং পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। কোনও ধর্মবিষয়েই তাঁর কোন কুসংস্কার ছিল না। পাতঞ্জলের যোগসূত্র পড়বার পর তিনি এমন একজন গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন যিনি তাঁকে ধ্যানানুশীলনের প্রক্রিয়ার শিক্ষাদান করতে পারবেন। তাঁর একজন সহপাঠী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা তাঁকে বলে, এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে দেখেই ঠাকুর বললেন, পূর্বজন্মে তুমি একজন মহাযোগী ছিলে। এইটিই তোমার শেষ জন্ম। এস, আমি তোমাকে যোগশিক্ষা দেব।

তার পর হতেই কালীপ্রসাদের দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন শুরু হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তিনিও ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হলেন। ঠাকুরের অপ্রকট হবার পরে মঠ-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো স্বামী অভেদানন্দ।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন তিনি অভেদানন্দকে সেখানে যাবার জন্য আহ্বান জানালেন। সেখানে পেঁছেই দেখলেন বিবেকানন্দ ইতিমধ্যেই তাঁর বক্তৃতা-প্রদানের ঘোষণা করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি কখনো জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেন নি। কিন্তু প্রথম দিনেই প্রেক্ষাগৃহ-পূর্ণ শ্রোতাদের কাছে অপূর্ব বক্তৃতা দিলেন। পরে বিবেকানন্দ আনন্দিতচিত্তে অভেদানন্দের উপরে লণ্ডন কেন্দ্রের ভার দিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। তিনি বৎসরকাল লণ্ডনে ছিলেন। ১৮৯৭ সনে বিবেকানন্দ তাঁকে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ করে পাঠালেন। আমেরিকায় আশ্রমের প্রচারকার্যে এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি অসামান্য কৃতকার্য হলেন। ১৯২১ সন পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি আলাদাভাবে বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। অবশ্য বেলুড় মঠ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেও রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা অটুটই রইল। ১৯৩৯ সনে তিনি পরলোকগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সরাসরি শিষ্যদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ঐ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, তথ্যপঞ্জীর সীমিত পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা তাঁর চিহ্নিত শিষ্যগণের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তৎকালে 'ইয়ং বেংগলকে' ঠাকুর কি ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সেইটুকুই মাত্র সংক্ষেপে বলা হলো।

এই সময়ে বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণও শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, বিজয়কৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। সমসাময়িক হলেও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঠাকুরের গমনাগমন হলেও বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অবশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর নিবিড় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যাঁরা সাক্ষাৎ শিষ্য এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করেছেন ১৮৮৪ সনের মধ্যে তাঁরা সকলেই ঠাকুরের নিকট আগমন করেন। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন, 'এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্বের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না।'

১২৯২ সালের গ্রীষ্মকালে (১৮৮৫ সন) শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম তাঁর গলদেশে বেদনা অনুভব করতে লাগলেন। ভক্তগণ ভাবলেন যে, গ্রীষ্মের প্রখরতার জন্য বোধ হয় ঐ প্রকার বেদনাবোধ হচ্চে। বরফ সেবন করলে বেদনার কিছু উপশম

হয় দেখে ভক্তগণ বরফ এবং ঠাণ্ডা সরবৎ-পানীয় দিতে লাগল। কিন্তু কোন বিশেষ ফল হলো না। জ্যৈষ্ঠমাসেই ঐ বেদনা নূতন আকার ধারণ করল, তাঁর কণ্ঠতালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হয়েছে বলে দেখা গেল। প্রথমে এলেন রাখাল ডাক্তার। নানাপ্রকার ওষুধ প্রয়োগেও বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। শ্রীমা-ও এখন দক্ষিণেশ্বরেই অবস্থান করছেন।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী দিনে কলকাতার নিকটস্থ পাণিহাটির গঙ্গাতীরে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক বিশেষ মেলা বসে। ঠাকুর সেই মেলাতে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। মেলায় জনসাধারণ ঠাকুরকে দর্শন করে, 'এই আমাদের প্রেমদাতা' এসেছেন বলে মহানন্দে নৃত্য করতে লাগল। সারাদিন পাণিহাটির মেলায় অগণিত ভক্তবৃন্দকে দর্শনদান করে সন্ধ্যায় নৌকাযোগে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

উপরোক্ত উৎসবে যোগদানের পরের দিন হতে ঠাকুরের গলদেশের বেদনা আরও বৃদ্ধি পেল। ঐ ভিড়ের মধ্যে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাক্তার ভক্তগণকে বিশেষ অনুযোগ করল। ডাক্তারগণ তখনও ঠাকুরের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, জনগণকে দিবারাত্র ধর্মোপদেশপ্রদানে বাগযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহারে গলদেশে ক্ষত হবার উপক্রম হয়েছে। ধর্মপ্রচারকদিগের এরূপ ব্যাধি হবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রাবণ মাস গিয়ে ভাদ্রমাস এল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশের অসুখের কোনও-প্রকার উপশম হলো না। তার মধ্যে একদিন ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হতে রক্তপাত হলো। নরেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (শ্রীম) প্রভৃতি উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলে মহাচিন্তিত হয়ে ঠাকুরকে কলকাতায় এনে চিকিৎসা করবার বন্দোবস্ত করলেন। রাত্রে খাবার সময়ে এক যুবক বিষণ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলল যে, বিভিন্ন ডাক্তারি বই পড়ে এবং ঠাকুরের রক্তপাতজনিত অবস্থা দেখে তার মনে হয় এ রোগ ক্যান্‌সার। এ-রোগের ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এ-কথা শ্রবণে ভক্তগণ সকলেই গভীর চিন্তিত হলেন। পরের দিনই ঠাকুর এলেন কলকাতায় এবং বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করলেন।

তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণ, গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরের রোগ পরীক্ষা করলেন। একবাক্যে গঙ্গাপ্রসাদও বললেন যে, ঠাকুরের রোহিণী রোগ (ক্যান্‌সার) হয়েছে। এ-রোগের চিকিৎসা প্রায় অসাধ্য। ভক্তগণ নিরুপায় হয়ে নানাজনের পরামর্শমতো হোমিওপ্যাথিক-মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করাতে লাগল। কিন্তু তাতেও কোন ফলোদয় হলো না। অবশেষে কলকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে আনয়ন করা হলো।

নিয়মিত চিকিৎসা ও সেবাযত্নেও ঠাকুরের অসুখের কোনওপ্রকার নিরাময় দেখা গেল না। ডাক্তার এবং ভক্তগণ সকলেই বিশেষ চিন্তিত হলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে

বলরাম বসুর বাড়ি হতে ঠাকুরকে শ্যামপুকুরের এক ভাড়াটে বাড়িতে আনয়ন করা হয়েছে। শ্রীমা-ও সেখানে এসেছেন। একদিকে অসুখবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ঠাকুরের ভক্তসংখ্যাবৃদ্ধি সমানতালে চলতে লাগল।

অসুখের কোনওপ্রকার উপশম হচ্চে না দেখে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের নির্দেশক্রমে কলকাতার রুদ্ধ, দূষিত বায়ুর থেকে দূরে কোনও উদ্যানবাটিতে ঠাকুরকে স্থানান্তরিত করবার বন্দোবস্ত করা হলো। কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটি মাসিক আশি টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করে ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। এই উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের আগমন হয় ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ১২৯২ সালের বর্ষাঋতু পর্যন্ত ঠাকুর সেখানে অবস্থান করেন।

ঐখানে এই আট মাস অবস্থানের সময়ে যতপ্রকার চিকিৎসা সম্ভব তাহা করাইয়াও কোন ফলোদয় হলো না। ক্রমশঃ ঠাকুরের স্বর্ণপ্রতিম দেহ কঙ্কালে পরিণত হলো। উদ্যানবাটিতে একটি বিশেষ কক্ষ শ্রীমা-এর অবস্থান করবার জন্য বন্দোবস্ত করা হলো। সেইখানে থেকে শ্রীমা অক্লান্তভাবে ঠাকুর এবং তাঁর ভক্তগণের সেবাযত্ন করতে লাগলেন। শিষ্য ও ভক্তগণ পালা করে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করল। এইরূপে গড়ে উঠল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ।

ক্রমে পৌষমাস অতিক্রান্ত হয়ে ১৮৮৬ সনের ১লা জানুয়ারি উপস্থিত হলো। ঐ দিন ঠাকুর বিশেষ সুস্থ বোধ করে বিকেল ৩টার সময়ে নিচে উদ্যানে বেড়াবার জন্য নেমে এলেন। ঐদিন ছুটি থাকায় গৃহস্থ ভক্তগণ দলে দলে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে এসে উপস্থিত হলো। ভক্তগণের মধ্যে গিরিশ, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে সকলে ক্রমে ক্রমে এসে ঠাকুরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করতে লাগল। ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের আর কি বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্যে উদয় হউক।' এই কয়টি কথা বলেই তিনি ভক্তগণের প্রতি করুণায় ও প্রেমে আত্মহারা হয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ব্যাধি হতে নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ঠাকুরকে কেহ স্পর্শ না করবার কথা ভক্তগণ ভুলে গেল। ভক্তের ঠাকুরকে সকলে পুষ্পার্ঘ এবং শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে লাগল। এই ঘটনাটিকে ভক্তগণ ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলে নির্দেশ করলেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের সেবায় অক্লান্ত-ভাবে নিয়োজিত। এই সেবাব্রতের সুশৃঙ্খলা ও পরিচালনা করছেন নরেন্দ্রনাথ। এক রাত্রে সকল বন্দোবস্ত করে তিনি শয়ন করলেন, কিন্তু ঘুম হলো না। গভীর রাত্রে তিনি উঠে পড়লেন, এবং গোপাল ঘোষ প্রভৃতিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, 'চল্ বাহিরে উদ্যানপথে পদচারণ ও তামাকুসেবন করি।' সকলেই তাঁকে অনুসরণ করে উদ্যানে এলো। বাগানের পথে বেড়াতে বেড়াতে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সঙ্কল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহারা সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারিস্

আত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন-ভজনে লাগিব, এইরূপেই তো দিনগুলো যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।'

পৌষের শীতার্ত নীরব রাত্রি ঝিমঝিম করছে। উপরে অদিতি নীলিমা, অযুত নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ। শরৎচন্দ্রও (স্বামী সারদানন্দ) ঐ সময়ে নরেন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন —নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পদচারণা না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষশাখাসমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, 'দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপে ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।' অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, এবং চতুর্দিকে অবস্থিত পূর্বোক্ত ইন্ধনস্তূপসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আহুতিপ্রদানপূর্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্যসত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রসন্ন ও নির্মল হইতেছে ও শ্রীভগবানের নিকটবর্তী হইতেছি।

১৮৮৬ সনের জানুয়ারী মাসে আরেকটি ঘটনা ঘটল। গোপাল ঘোষ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) তীর্থ হতে ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন যে, কলকাতা দিয়ে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী গমনাগমন করেন তাঁদের তিনি এই গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালাগুলি প্রদান করবার বাসনা করেছেন। ঠাকুর বললেন, সেগুলো তুমি এই ছেলেদের (নরেন্দ্র প্রভৃতি) দাও না কেন ? ওরা সম্পূর্ণ ত্যাগী, ওদের চেয়ে ভালো সন্ন্যাসী কোথায় পাবে ?

গোপাল ঘোষের নিকট বারখানা গেরুয়া ও বারটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। ঠাকুরের সে কথা শোনবার পরে তিনি সেগুলো উপস্থিত মাষ্টারমশায়ের (শ্রীম) হস্তে প্রদান করলেন। তারপর একদিন বৈকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করলেন, রাখাল, যোগীন্দ্র, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল ঘোষ, কালী ও লাটুকে। দ্বাদশ গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষের মালা তিনি রেখে দিলেন গিরিশচন্দ্রের জন্য।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের স্থাপন করলেন। অবশ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে এই সঙ্ঘ বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হয় ঠাকুর অপ্রকট হবার পরে। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণ সন্ন্যাস-নামও গ্রহণ করেন সেই সময়েই। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ প্রকার দৃঢ় সূত্রে তাঁর একান্ত ত্যাগী শিষ্যগণদের সম্মিলিত করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাশেষের তিন/চারটি মাসের ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ স্বামী

সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিপিবদ্ধ করেন নি। শ্রীম-ও 'কথামৃতে' ১৮৮৬ সনের এপ্রিল মাসের পরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন নি। অবশ্য নানাসূত্রে কয়েকটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

শেষের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ কথা বলতে পারতেন না। একদিন একখানা কাগজে লিখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দেবে।' উত্তরে নরেন্দ্র বললেন, 'আমি ও সব পারব না।' তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।'

অন্য এক সময়ে ঠাকুর বলেছেন, রাখালের ভিতরে রাজার বুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে রাজ্যশাসন করতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝেছিলেন। তাই সবাই মিলে রাখালের নাম দিল 'মহারাজ'। রাখালের নূতন নাম শুনে ঠাকুরও খুব আনন্দিত হলেন। এইভাবে ঠাকুর তরুণ সন্ন্যাসীদের নিবিড় ভ্রাতৃবন্ধনের আর একটি সূত্র দিলেন। পরবর্তীকালে রাখালের সন্ন্যাস-নাম হলো স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তিনিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ।

ক্রমে ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসটি এগিয়ে এলো। ঠাকুরের নানা ইঙ্গিতে ভক্ত সকলেই বুঝতে পারছিল যে, তাঁর মহাপ্রয়াণের সময় উপস্থিত! ৩১শে শ্রাবণের (১৫ই আগস্ট, ১৮৮৬) মহানিশা। রাত্রি দ্বিপ্রহর, ঘড়িতে একটা দুই মিনিট। কাশীপুরের লতাগুল্মবৃক্ষপরিশোভিত উদ্যানবাটি নীরব—নীরব ভক্তবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ শয্যাপার্শ্বে। সকলেই লক্ষ্য করল, ঠাকুর যেন সমাধিমগ্ন। কিন্তু সে সমাধি আর ভাঙ্গল না—সে সমাধি মহাসমাধিতে পরিণত হলো!

* * *

শ্রীমা সারদামণির সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে বলে ঐ প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা এখানে করা হয়নি। 'রত্নাকর গিরিশ' অচিন্ত্যকুমারের আরেকটি অনবদ্য জীবনী-সাহিত্য। রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে ঐ গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে। গিরিশ-প্রসঙ্গের তথ্যপঞ্জী ঐ সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' পরেই অচিন্ত্যকুমারের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দের' স্থান। রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডে ঐ গ্রন্থ সংযোজিত হবে। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ সেই সময়ে আলোচিত হবে বলে এইখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

* * *

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চারটি খণ্ডে বিভক্ত। তার দুটি খণ্ড অর্থাৎ নব্বই অধ্যায় পর্যন্ত রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। সেই সঙ্গে 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' গ্রন্থখানিও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংযোজিত হলো। অচিন্ত্যকুমারের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ ব্যতীত রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হয় না। সেইজন্য উক্ত গ্রন্থও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

* * *

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬১ সালে, এবং চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ৬ই ফাল্গুন ১৩৬৩ সালে। 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬০ সালে। উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থেরই প্রথম প্রকাশক সিগনেট প্রেস্ (কলকাতা)। তারপরে অবশ্য অন্যান্য প্রকাশকদের মাধ্যমে এই গ্রন্থগুলির অনেক পুনর্মুদ্রণ হয়। রচনাবলীতে সিগনেট-প্রেস্ সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করা হয়েছে।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে গ্রন্থসকল রচনার একটি ইতিহাস ব্যক্তিগত আলোচনাপ্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সম্পাদককে বলেছিলেন। এখানে সেই ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অচিন্ত্যকুমার তখন আসানসোলে সাব্-জজ হিসেবে নিয়োজিত। রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বা অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। অবশ্য প্ল্যান্চেটে বসতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী নীহারকণা দেবী প্ল্যান্চেটের একজন ভালো 'মিডিয়াম' ছিলেন। প্রায়ই সন্ধ্যারাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে প্ল্যান্চেটে বসতেন।

একদা সন্ধ্যাবেলায় অচিন্ত্যকুমার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বের হন। বি. এন্. আর্.-এর (বর্তমানে এস্. ই. আর্) রেলপুল পেরিয়ে যাবার সময়ে অন্ধকারে নীহারকণা দেবীর পায়ে কিসে যেন দংশন করে। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। পরে দেখা গেল একটা সাপ এঁকে-বেঁকে চলে যাচ্ছে। তখন উভয়েই বুঝল যে, নীহারকণা দেবীকে সাপেই দংশন করেছে। অচিন্ত্যকুমার ব্যস্ত হলেন। নির্জন পথে যানবাহন নেই। অনেক চেষ্টার পরে অচিন্ত্যকুমার পথগামী একটি প্রাইভেট মোটরগাড়িকে থামাতে সক্ষম হলেন। ঘটনা শুনে গাড়ির মালিক তক্ষুণি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নীহারকণা দেবীর চিকিৎসার সকলপ্রকার বন্দোবস্ত হয়। ডাক্তারগণ রোগিণীর বিষয়ে অভয় দেবার পরে অচিন্ত্য-কুমার গৃহে ফিরেন। যিনি অচিন্ত্যকুমার এবং নীহারকণা দেবীকে গাড়িতে হাস-পাতালে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বিদায় নেবার সময়ে দুখানা বই দিয়ে গেলেন অচিন্ত্যকুমারকে পড়বার জন্য। সেই ভদ্রলোককে তিনি চেনেন না এবং পরবর্তী-কালে তাঁর সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের আর দেখা হয়েছে বলে তাঁর মনেও পড়ে না। অচিন্ত্যকুমারের তখন বই দুটির নাম দেখার মত মনের অবস্থাও ছিল না। বাড়ি ফিরে এসে তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, গ্রন্থ দুটি হলো স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-এর দুটি খণ্ড! ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনকাহিনী জেনে অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিতে যেন নবদিগন্ত উদ্ভাসিত হলো।

যাহা হোক্, ভগবৎকৃপায় নীহারকণা দেবী আরোগ্যলাভ করলেন। বাড়িতে

ফিরে এসে যথারীতি সন্ধ্যাবেলায় আবার দুজনে প্ল্যানচেটে বসতে লাগলেন। একদিন প্ল্যানচেটে অশরীরী আত্মা জানালেন : তোমাদের ঘরে ঠাকুরের আসন নেই, এখানে আসতে ইচ্ছে করে না!

পরদিন বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরবার পথে অচিন্ত্যকুমারকে একজন একটি দেয়ালপঞ্জী (ক্যালেণ্ডার) দিল। গৃহে ফিরে এসে খুলে দেখলেন যে, সেখানা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবিযুক্ত একটি দেয়ালপঞ্জী। ভালোই হলো। স্বামী-স্ত্রী মিলে তক্ষুনি তাঁদের শোবার ঘরে ঠাকুরের জন্য একটি ছোট্ট আসন পাতলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেয়ালপঞ্জী-ছবিটি সেই আসনের উপরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন। সন্ধ্যাবেলায় ধূপ-ধুনো দিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন সেই আসনের পাশে। পরে যথারীতি বাইরে বসবার ঘরে দুজনে প্ল্যানচেটে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্ল্যানচেটের ছোট্ট টেবিলটিকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, সেটি কেবল ছুটে ছুটে শোবার ঘরে ঠাকুরের আসনের দিকে যাচ্ছে। দুজনে নির্বাক বিস্ময়ে এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা ভাবতে লাগলেন।

সেই ঘটনার পর থেকেই অচিন্ত্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী, আধ্যাত্মিক চেতনা ও বাণী বিষয়ে বহু গ্রন্থাদিপাঠে গভীরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সেই অধ্যয়ন ও ভক্তির ফলশ্রুতি 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'।

১৩৫৮ সনে তখনমাত্র উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ নিয়ে ভক্তিপূর্ণ পাঠকমহলে হৈ হৈ কান্ড। এমনি সময়ে একদিন সকালে ছুটির দিনে অচিন্ত্যকুমার বসে আছেন কাগজপত্র নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে, কিছু লেখবার জন্য। সেই সময়ে পিওন ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। একখানা চিঠি খুলে দেখলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫১ সনের জন্য 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিষয়-নির্বাচনের ভার তাঁরই উপরে। সেই টেবিলে বসে তক্ষুনি তিনি বিষয়-নির্বাচন করলেন : 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'! প্রথমে তাঁর সংশয় ছিল, 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি' বক্তৃতায় বোধ হয় এই বিষয় গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মতিসূচক পত্র এসে গেল! রচিত হলো 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। এক সাক্ষাৎকারে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন : প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হল্-এ এই বক্তৃতামালার বন্দোবস্ত করা হয়। সেদিন অসামান্য জনসমাগমে হল্ ভর্তি হয়েও উপচে পড়ে। পরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাংগা হল্-এ। সেইখানেও জনসমাগম উপ্চে পড়ে। তৃতীয় এবং শেষদিনে তাই হলের বাইরে মাইকের বন্দোবস্ত করা হয়। শোনা যায়, সেদিন ঐ বক্তৃতা শোনবার জন্য এতো জনসমাগম হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখের রাস্তায় যানবাহনচলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

* * *

এই তথ্যপঞ্জী লেখবার জন্য বহু আকর গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেই গ্রন্থাবলীর বিশেষ কয়টির নাম রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে উল্লেখ করা

হয়েছে। সেই সকল গ্রন্থপ্রণেতাগণের নিকট আমার অশেষ ঋণ স্বীকার করছি। বানান বিষয়ে পূর্ববর্তী পন্থাই অনুসরণ করা হয়েছে। নানাবিষয়ে এই রচনাবলী প্রকাশ ও তথ্যপঞ্জীর জন্য সহায়তা করেছেন মীরা চক্রবর্তী, দুলাল পর্বত, মুরলীধর ঘটক, আনন্দরূপ চক্রবর্তী ও সুধীর ভট্টাচার্য। মুদ্রকদের এই বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাশেষের শতবর্ষপূর্ণের পথে। এই উপলক্ষ্যে তাঁর চরিতামৃত ও অমৃতবাণী প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী